ডিগ্রী কোর্স

বাংলা সহায়িকা

বা

একের ভিতর আট

[দ্বিতীয় খণ্ড]

[বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রি বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সের জন্য]

সাধারণ সম্পাদক :

অধ্যাপক ডি. সেনগুপ্ত

প্রথম সংস্করণ—জুলাই, ১৯৬৪

প্রকাশক :
সি. ভট্টাচার্য, বি. এ. ; বি. টি.
৫৭-সি, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া "ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা" রচিত হইয়াছে। এই সহায়িকায় সম্পূর্ণ পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি বিষয় সংযুক্ত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত গ্রন্থাদির প্রশ্নোত্তর ও ব্যাখ্যা এই সহায়িকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রবন্ধ, ভাব-সম্প্রসারণ ও ভাবার্থ—অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা পরীক্ষা প্রস্তুতির যাবতীয় বিষয় এই সহায়িকায় থাকায় ইহার স্বাতন্ত্র্য সহজেই বুঝা যাইবে। এই সহায়িকার আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে অপ্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করিয়া পুস্তকের কলেবর অহেতুক বৃদ্ধি করা হয় নাই।

বাংলা পঠন-পাঠনে যাঁহারা দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সযত্ন তত্ত্বাবধানে সহায়িকাখানি রচিত হইয়াছে। আশা করা যায় ছাত্র-ছাত্রীরা এই সহায়িকা দ্বারা উপকৃত হইবে।

কলিকাতা
২০শে জুলাই, ১৯৬৪ } **প্রকাশক**

সূচীপত্র

প্রথম পত্র

কৃষ্ণকান্তের উইল

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরিদ্রাগ্রামে একঘর বড় জমিদার ছিলেন। জমিদার বাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী; তাঁহার জমিদারীর মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জিত। উভয় ভ্রাতা একত্রিত হইয়া ধনোপার্জন করেন। উভয় ভ্রাতায় পরম সম্প্রীতি ছিল, একের মনে এমন সন্দেহ কস্মিন্ কালে জন্মে নাই যে, তিনি অপর কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইবেন। জমিদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। উভয়ে একান্নভুক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল—তাহার নাম গোবিন্দলাল। পুত্রটির জন্মাবধি রামকান্ত রায়ের মনে মনে সংকল্প হইল যে, উভয়ের উপার্জিত বিষয় একের নামে আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাহার বিহিত লেখাপড়া করিয়া লওয়া কর্তব্য। কেন না, যদিও তাঁহার মনে নিশ্চিত ছিল যে, কৃষ্ণকান্তের কখনও প্রবঞ্চনা অথবা তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করার সম্ভাবনা নাই, তথাপি কৃষ্ণকান্তের পরলোকের পর তাঁহার পুত্রেরা কি করে, তাহার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু লেখাপড়ার কথা সহজে বলিতে পারিলেন না—আজি বলিব, কালি বলিব, করিতে লাগিলেন। একদা প্রয়োজনবশতঃ তালুকে গেলে সেইখানে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

যদি কৃষ্ণকান্ত এমত অভিলাষ করিতেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহা হইলে তৎসাধন পক্ষে এখন আর কোন বিঘ্ন ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তিনি গোবিন্দলালকে আপন সংসারে আপন পুত্রদিগের সহিত সমান ভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, এবং উইল করিয়া আপনাদিগের উপার্জিত সম্পত্তির যে একাংশ ন্যায়মত রামকান্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্দলালকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের দুই পুত্র, আর এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরলাল, কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল, কন্যার নাম শৈলবতী। কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে, তাঁহার পরলোকান্তে, গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা আর শৈলবতী এক আনা সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবেন।

হরলাল বড় দুর্দান্ত। পিতার অবাধ্য এবং দুর্মুখ। বাঙ্গালির উইল প্রায় গোপনে থাকে না। উইলের কথা হরলাল জানিতে পারিল। হরলাল দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পিতাকে কহিল, "এটা কি হইল? গোবিন্দলাল অর্ধেক ভাগ পাইল, আর আমার তিন আনা!"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "ইহা ন্যায্য হইয়াছে। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য অর্ধাংশ তাহাকে দিয়াছি।"

হর। গোবিন্দলালের প্রাপ্যটা কি? আমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি সে লইবার কে? আর মা বহিনকে আমরা প্রতিপালন করিব—তাহাদিগের বা এক এক আনা কেন? বরং তাহাদিগকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী বলিয়া লিখিয়া যান।

কৃষ্ণকান্ত কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন "বাপু হরলাল। বিষয় আমার, তোমার নহে। আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিয়া যাইব।"

হর। আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে—আপনাকে যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে দিব না।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে চক্ষু আরক্ত করিয়া কহিলেন, "হরলাল, তুমি যদি বালক হইতে, তবে আজি তোমাকে গুরু মহাশয় ডাকাইয়া বেত দিতাম।"

হর। আমি বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের গোঁপ পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে এই উইলও সেইরূপ পুড়াইব।

কৃষ্ণকান্ত রায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। স্বহস্তে উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন তৎপরিবর্তে নূতন একখানি উইল লিখাইলেন। তাহাতে গোবিন্দলাল আট আনা, বিনোদলাল পাঁচ আনা, কর্ত্রী এক আনা, শৈলবতী এক আনা আর হরলাল এক আনা মাত্র পাইলেন।

রাগ করিয়া হরলাল পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গেলেন, তথা হইতে পিতাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহার মর্মার্থ এই :—

"কলিকাতায় পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি মানস করিয়াছি যে, একটি বিধবাবিবাহ করিব। আপনি যদ্যপি উইল পরিবর্তন করিয়া আমাকে ॥৹ আনা লিখিয়া দেন, আর সেই উইল শীঘ্র রেজিস্টারি করেন, তবেই এই অভিলাষ ত্যাগ করিব, নচেৎ শীঘ্র একটি বিধবা বিবাহ করিব।"

হরলাল মনে করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণকান্ত ভয়ে ভীত হইয়া, উইল পরিবর্তন করিয়া, হরলালকে অধিক বিষয় লিখিয়া দিবেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের যে উত্তর পাইলেন, তাহাতে সে ভরসা রহিল না। কৃষ্ণকান্ত লিখিলেন,

"তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র। তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিবাহ করিতে পার। আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিষয় দিব। তুমি এই বিবাহ করিলে আমি উইল বদলাইব বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না।"

ইহার কিছু পরেই হরলাল সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি বিধবা বিবাহ করিয়াছেন। কৃষ্ণকান্ত রায় আবার উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নূতন উইল করিবেন।

পাড়ায় ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নামে একজন নিরীহ ভালমানুষ লোক বাস করিতেন। কৃষ্ণকান্তকে জ্যেঠা মহাশয় বলিতেন। এবং তৎকর্তৃক অনুগৃহীত এবং প্রতিপালিতও হইতেন।

ব্রহ্মানন্দের হস্তাক্ষর উত্তম। এই সকল লেখা পড়া তাহার দ্বারাই হইত। কৃষ্ণকান্ত সেই দিন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "আহারাদির পর এখানে আসিও। নূতন উইল লিখিয়া দিতে হইবে।"

বিনোদলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, "আবার উইল বদলান হইবে কি অভিপ্রায়ে?"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "এবার তোমার জ্যেষ্ঠের ভাগে শূন্য পড়িবে।"

বিনোদ। ইহা ভাল হয় না। তিনিই যেন অপরাধী। কিন্তু তাঁহার একটি পুত্র আছে—সে শিশু, নিরপরাধী। তাহার উপায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। তাহাকে এক পাই লিখিয়া দিব।

বিনোদ। এক পাই বখরায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। আমার আয় দুই লক্ষ টাকা তাহার এক পাই বখরায় তি

হাজার টাকার উপর হয়। তাহাতে একজন গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে চলিতে পারে। ইহার অধিক দিব না।

বিনোদলাল অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কর্তা কোন মতে মতান্তর করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মানন্দ স্নানাহার করিয়া নিদ্রার উদ্যোগে ছিলেন এমত সময়ে বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন যে হরলাল রায়। হরলাল আসিয়া তাহার শিওরে বসিলেন।

ব্রহ্মা। সে কি, বড় বাবু যে ? কখন বাড়ী এলে ?

হর। বাড়ী এখনও যাই নাই।

ব্র। একেবারে এইখানেই ? কলিকাতা হইতে কতক্ষণ আসিতেছ ?

হর। কলিকাতা হইতে দুই দিবস হইল আসিয়াছি। এই দুই দিন কোন স্থানে লুকাইয়া ছিলাম। আবার নাকি নূতন উইল হইবে ?

ব্র। এই রকম ত শুনিতেছি।

হর। আমার ভাগে এবার শূন্য।

ব্র। কর্তা এখন রাগ করে বল্‌ছেন, কিন্তু সেটা থাকবে না।

হর। আজি বিকালে লেখাপড়া হবে ? তুমি লিখিবে ?

ব্র। তা কি করব ভাই ! কর্তা বলিলে ত "না" বলিতে পারি না।

হর। ভাল, তাতে তোমার দোষ কি ? এখন কিছু রোজগার করিবে ?

ব্র। কিলটে চড়টা ? তা ভাই, মার না কেন ?

হর। তা নয়, হাজার টাকা।

ব্র। বিধবা বিয়ে করে নাকি ?

হর। তাই।

ব্র। বয়স গেছে।

হর। তবে আর একটি কাজ বলি। এখনই আরম্ভ কর। আগাম কিছু গ্রহণ কর।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দের হাতে হরলাল পাঁচশত টাকার নোট দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ নোট পাইয়া উলটিয়া পালটিয়া দেখিল। বলিল, "ইহা লইয়া আমি কি করিব?"

হর। পুঁজি করিও। দশ টাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও।

ব্র। গোওয়ালা-ফোওয়ালার কোন এলাকা রাখি না। কিন্তু আমায় করিতে হইবে কি?

হর। দুইটি কলম কাট। দুইটি যেন সমান হয়।

ব্র। আচ্ছা ভাই, যা বল, তাই শুনি।

এই বলিয়া ঘোষজ মহাশয় দুইটি নূতন কলম লইয়া ঠিক সমান করিয়া কাটিলেন। এবং লিখিয়া দেখিলেন যে, দুইটিরই লেখা একপ্রকার দেখিতে হয়।

তখন হরলাল বলিলেন, "ইহার একটি কলম বাক্সতে তুলিয়া রাখ। যখন উইল লিখিতে যাইবে, এই কলম লইয়া গিয়া ইহাতে উইল লিখিবে। দ্বিতীয় কলমটি লইয়া এখন একখানা লেখাপড়া করিতে হইবে। তোমার কাছে ভাল কালি আছে?"

ব্রহ্মানন্দ মসীপত্র বাহির করিয়া লিখিয়া দেখাইলেন। হরলাল বলিতে লাগিলেন, "ভাল, এই কালি উইল লিখিতে লইয়া যাইও।"

ব্র। তোমাদিগের বাড়ীতে কি দোয়াত কলম নাই যে, আমি ঘাড়ে করিয়া নিয়া যাব?

হর। আমার কোন উদ্দেশ্য আছে—নচেৎ তোমাকে এত টাকা দিলাম কেন?

ব্র। আমিও তাই ভাবিতেছি বটে—ভাল বলেছ ভাই রে!

হর। তুমি দোওয়াত কলম লইয়া গেলে কেহ ভাবিলেও ভাবিতে পারে, আজি এটা কেন? তুমি সরকারী কালি কলমকে গালি পাড়িও তাহা হইলেই শোধরাইবে।

ব্র। তা সরকারী কালি কলমকে শুধু কেন? সরকারকে শুদ্ধ গালি পাড়িতে পারিব।

হর। তত আবশ্যক নাই। এক্ষণে আসল কর্ম আরম্ভ কর।

তখন হরলাল দুইখানি জেনেরাল লেটর কাগজ ব্রহ্মানন্দের হাতে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "এ যে সরকারী কাগজ দেখিতে পাই।"

"সরকারী নহে—কিন্তু উকিলের বাড়ীর লেখাপড়া এই কাগজে হইয়া থাকে। কর্ত্তাও এই কাগজে উইল লেখাইয়া থাকেন, জানি। এজন্যে এই কাগজ সংগ্রহ করিয়াছি। যাহা বলি তাহা এই কলমে লেখ।"

ব্রহ্মানন্দ লিখিতে আরম্ভ করিল। হরলাল একখানি উইল লেখাইয়া দিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই। কৃষ্ণকান্ত রায় উইল করিতেছেন। তাঁহার নামে যত সম্পত্তি আছে, তাহার বিভাগ কৃষ্ণকান্তের পরলোকান্তে এইরূপ হইবে। যথা, বিনোদলাল তিন আনা, গোবিন্দলাল এক পাই, গৃহিণী এক পাই, শৈলবতী এক পাই, হরলালের পুত্র এক পাই, হরলাল জ্যেষ্ঠ বলিয়া অবশিষ্ট বারো আনা।

লেখা হইলে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "এখন ত উইল লেখা হইল—দস্তখত করে কে?"

"আমি।" বলিয়া হরলাল ঐ উইলে কৃষ্ণকান্ত রায়ের এবং চারি জন সাক্ষীর দস্তখত করিয়া দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "ভাল, এ ত জাল হইল।"

হর। এই সাঁচ্চা উইল, বৈকালে যাহা লিখিবে, সেই জাল।

ব্রহ্মা। কিসে?

হর। তুমি যখন উইল লিখিতে যাইবে তখন এই উইলখানি আপনার পিরানের পকেটে লুকাইয়া লইয়া যাইবে। সেখানে গিয়া এই কালি কলমে তাঁহাদের ইচ্ছামত উইল লিখিবে। কাগজ, কলম, কালি, লেখক একই; সুতরাং দুইখানা উইলই দেখিতে একপ্রকার হইবে। পরে উইল পড়িয়া শুনান ও দস্তখত হইয়া গেলে শেষে তুমি স্বাক্ষর করিবার জন্য লইবে। সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দস্তখত করিবে। সেই অবকাশে উইলখানি বদলাইয়া লইবে। এইখানি কর্ত্তাকে দিয়া, কর্ত্তার উইলখানি আমাকে আনিয়া দিবে।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ ভাবিতে লাগিল। বলিল, "বলিলে কি হয়—বুদ্ধির খেলা খেলেছ ভাল।"

হর। ভাবিতেছ কি?

ব্র। ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু ভয় করে। তোমার টাকা ফিরাইয়া লও। আমি কিন্তু জালের মধ্যে থাকিব না।

"টাকা দাও।" বলিয়া হরলাল হাত পাতিল। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নোট

ফিরাইয়া দিল। নোট লইয়া হরলাল উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ব্রহ্মানন্দ আবার তাকে ডাকিয়া বলিল, "বলি ভায়া কি গেলে?"

"না" বলিয়া হরলাল ফিরিল।

ব্র। তুমি এখন পাঁচ শত টাকা দিলে। আর কি দিবে?

হর। তুমি সেই উইলখানি আনিয়া দিলে আর পাঁচ শত দিব।

ব্র। অনেক টাকা—লোভ ছাড়া যায় না।

হর। তবে তুমি রাজি হইলে?

ব্র। রাজি না হইয়াই বা কি করি? কিন্তু বদল করি কি প্রকারে? দেখিতে পাইবে যে।

হর। কেন দেখিতে পাইবে? আমি তোমার সম্মুখে উইল বদল করিয়া লইতেছি, তুমি দেখ দেখি, টের পাও কি না।

হরলালের অন্য বিদ্যা থাকুক না থাকুক, হস্তকৌশল বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন উইলখানি পকেটে রাখিলেন, আর একখানি কাগজ হাতে লইয়া তাহাতে লিখিবার উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে হাতের কাগজ পকেটে, পকেটের কাগজ হাতে কি প্রকারে আসিল, ব্রহ্মানন্দ তাহা কিছুই লক্ষিত করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মানন্দ হরলালের হস্তকৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরলাল বলিলেন, "এই কৌশলটি তোমায় শিখাইয়া দিব।" এই বলিয়া হরলাল সেই অভ্যস্ত কৌশল ব্রহ্মানন্দকে অভ্যাস করাইতে লাগিলেন।

দুই তিন দণ্ডে ব্রহ্মানন্দের সেই কৌশলটি অভ্যস্ত হইল। তখন হরলাল কহিল যে, "আমি এক্ষণে চলিলাম। সন্ধ্যার পর বাকি টাকা লইয়া আসিব।" বলিয়া সে বিদায় হইল।

হরলাল চলিয়া গেলে ব্রহ্মানন্দের ভয়সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন যে, তিনি যে কার্যে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা রাজদ্বারে মহা দণ্ডার্হ অপরাধ—কি জানি, ভবিষ্যতে পাছে তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইতে হয়। আবার বদলের সময় যদি কেহ ধরিয়া ফেলে? তবে তিনি এ কার্য কেন করেন? না করিলে হস্তগত সহস্র মুদ্রা ত্যাগ করিতে হয়। তাহাও হয় না। প্রাণ থাকিতেও নয়।

হায়! ফলাহার! কত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুমি মর্মান্তিক পীড়া দিয়াছ! এ

দিকে সংক্রামক জ্বর, প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, তাহার উপর ফলাহার উপস্থিত! তখন কাংস্যপাত্র বা কদলীপত্রে সুশোভিত লুচি, সন্দেশ মিহিদানা, সীতাভোগ প্রভৃতির অমলধবল শোভা সন্দর্শন করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিবে? ত্যাগ করিবে, না আহার করিবে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর যদি সহস্র বৎসর সেই সজ্জিত পাত্রের নিকট বসিয়া তর্ক বিতর্ক করেন, তথাপি তিনি এ কূট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন না—এবং মীমাংসা করিতে না পারিয়া অন্যমনে পরদ্রব্যগুলি উদরসাৎ করিবেন।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ মহাশয়ের ঠিক তাহাই হইল। হরলালের এ টাকা হজম করা ভার—জেলখানার ভয় আছে; কিন্তু ত্যাগ করাও যায় না। লোভ বড়, কিন্তু বদহজমের ভয়ও বড়। ব্রহ্মানন্দ মীমাংসা করিতে পারিল না। মীমাংসা করিতে না পারিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের মত উদরসাৎ করিবার দিকেই মন রাখিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর ব্রহ্মানন্দ উইল লিখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন যে হরলাল আসিয়া বসিয়া আছেন। হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?"

ব্রহ্মানন্দ একটু কবিতাপ্রিয়। তিনি কষ্টে হাসিয়া বলিলেন,

"মনে করি চাঁদা ধরি হাতে দিই পেড়ে।
বাবলা গাছে হাত লেগে আঙ্গুল গেল ছিঁড়ে।"

হর। পার নাই নাকি?

ব্র। ভাই কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল।

হর। পার নাই?

ব্র। না ভাই—এই ভাই, তোমার জাল উইল নাও। এই তোমার টাকা নাও।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ কৃত্রিম উইল ও বাক্স হইতে পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। ক্রোধে এবং বিরক্তিতে হরলালের চক্ষু আরক্ত ও অধর কম্পিত হইল। বলিলেন, "মূর্খ, অকর্মা! স্ত্রীলোকের কাজটাও তোমা হইতে

হইল না? আমি চলিলাম। কিন্তু দেখিও, যদি তোমা হইতে এই কথার বাষ্প মাত্র প্রকাশ পায়, তবে তোমার জীবন সংশয়।"

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "সে ভাবনা করিও না; কথা আমার নিকট হইতে প্রকাশ পাইবে না।"

সেখান হইতে উঠিয়া হরলাল ব্রহ্মানন্দের পাকশালায় গেলেন। হরলাল ঘরের ছেলে, সর্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। পাকশালায় ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতৃ-কন্যা রোহিণী রাঁধিতেছিল।

এই রোহিণীতে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে। অতএব তাহার রূপ গুণ কিছু বলিতে হয়, কিন্তু আজি কালি রূপ বর্ণনার বাজার নরম—আর গুণ বর্ণনার—হাল আইনে আপনার ভিন্ন পরের করিতে নাই। তবে ইহা বলিতে হয় যে, রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত। এদিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদী-বিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, ডালনা ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলেপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সুচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে থাকিত।

রোহিণী রূপসী ঠন ঠন করিয়া দালের হাঁড়িতে কাটি দিতেছিল, দূরে একটা বিড়াল থাবা পাতিয়া বসিয়া ছিল; পশুজাতি রমণীদিগের বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষে শিহরে কি না, দেখিবার জন্য রোহিণী তাহার উপরে মধ্যে মধ্যে বিষপূর্ণ মধুর কটাক্ষ করিতেছিল; বিড়াল সে মধুর কটাক্ষকে ভর্জিত মৎস্যাহারের নিমন্ত্রণ মনে করিয়া অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছিল, এমত সময়ে হরলাল বাবু জুতা সমেত মস্ মস্ করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। বিড়াল ভীত হইয়া, ভর্জিত মৎস্যের লোভ পরিত্যাগপূর্বক পলায়নে তৎপর হইল; রোহিণী দালের কাটি ফেলিয়া দিয়া, হাত ধুইয়া, মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নখে নখ খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বড় কাকা কবে এলেন?"

হরলাল বলিল, "কাল এসেছি। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

রোহিণী শিহরিল, বলিল, "আজি এখানে খাবেন? সরু চালের ভাত চড়াব কি?"

হর। চড়াও, চড়াও। কিন্তু সে কথা নয়। তোমার এক দিনের কথা মনে পড়ে কি?

রোহিণী চুপ করিয়া মাটি পানে চাহিয়া রহিল। হরলাল বলিল, "সেই দিন, যে দিন তুমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে, যাত্রীদিগের দলছাড়া হইয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিলে? মনে পড়ে?"

রোহিণী। (বাঁ হাতের চারিটি আঙ্গুল ডাইন হাতে ধরিয়া অধোবদনে) মনে পড়ে।

হর। যেদিন তুমি পথ হারাইয়া মাঠে পড়িয়া ছিলে, মনে পড়ে?

রো। পড়ে।

হর। যে দিন মাঠে তোমার রাত্রি হইল, তুমি একা, জনকত বদমাস তোমার সঙ্গ নিল—মনে পড়ে?

রো। পড়ে।

হর। সে দিন কে তোমায় রক্ষা করিয়াছিল?

রো। তুমি। তুমি ঘোড়ার উপরে সেই মাঠ দিয়া কোথায় যাইতেছিলে—

হর। শালীর বাড়ী।

রো। তুমি দেখিতে পাইয়া আমায় রক্ষা করিলে—আমায় পাল্কি বেহারা করিয়া বাড়ি পাঠাইয়া দিলে। মনে পড়ে বই কি। সে ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।

হর। আজ সে ঋণ পরিশোধ করিতে পার—তার উপরে আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিতে পার, করিবে?

রো। কি বলুন—আমি প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব।

হর। কর না কর, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

রো। প্রাণ থাকিতে নয়।

হর। দিব্য কর।

রোহিণী দিব্য করিল।

তখন হরলাল কৃষ্ণকান্তের আসল উইল ও জাল উইলের কথা বুঝাইয়া বলিল। শেষে বলিল, "সেই আসল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল তাহার

বন্ধক রাখিয়া আসিতে হইবে। আমাদের বাড়ীতে তোমার যাতায়াত আছে। তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি অনায়াসে পার। আমার জন্য ইহা করিবে?"

রোহিণী শিহরিল। বলিল, "চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না।"

হর। স্ত্রীলোক এমন অসারই বটে—কথার রাশি মাত্র। এই বুঝি এ জন্মে তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না!

রো। আর যা বলুন, সব পারিব। মরিতে বলেন, মরিব। কিন্তু এ বিশ্বাসঘাতকের কাজ পারিব না।

হরলাল কিছুতেই রোহিণীকে সম্মত করিতে না পারিয়া, সেই হাজার টাকার নোট রোহিণীর হাতে দিতে গেল। বলিল, "এই হাজার টাকা পুরস্কার আগাম নাও। এ কাজ তোমার করিতে হইবে।"

রোহিণী নোট লইল না। বলিল, "টাকার প্রত্যাশা করি না। কর্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না। করিবার হইত ত আপনার কথাতেই করিতাম।"

হরলাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; বলিল, "মনে করিয়াছিলাম, রোহিণী, তুমি আমার হিতৈষী। পর কখনও আপন হয়? দেখ, আজ যদি আমার স্ত্রী থাকিত, আমি তোমার খোষামোদ করিতাম না। সেই আমার এ কাজ করিত।"

এবার রোহিণী একটু হাসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিলে যে?"

রো। আপনার স্ত্রীর নামে সেই বিধবাবিবাহের কথা মনে পড়িল। আপনি নাকি বিধবা বিবাহ করিবেন?

হর। ইচ্ছা ত আছে—কিন্তু মনের মত বিধবা পাই কই?

রো। তা বিধবাই হোক, সধবাই হোক—বলি বিধবাই হোক, কুমারীই হোক—একটা বিবাহ করিয়া সংসারী হলেই ভাল হয়। আমরা আত্মীয়স্বজন সকলেরই তা হলে আহ্লাদ হয়

হর। দেখ রোহিণী, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

রো। তা ত এখন লোকে বলিতেছে।

হর। দেখ, তুমিও একটা বিবাহ করিতে পার—কেন করিবে না?

রোহিণী মাথার কাপড় একটু টানিয়া মুখ ফিরাইল। হরলাল বলিতে লাগিল, "দেখ, তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাম সম্বাদ মাত্র—সম্পর্কে বাধে না।"

এবার রোহিণী লম্বা করিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া উনুন গোড়ায় বসিয়া দালে কাটি দিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া হরলাল ফিরিয়া চলিল।

হরলাল দ্বার পর্যন্ত গেলে রোহিণী বলিল, "কাগজখানা না হয় রাখিয়া যান, দেখি কি করিতে পারি।"

হরলাল আহ্লাদিত হইয়া জাল উইল ও নোট রোহিণীর নিকটে রাখিল; দেখিয়া রোহিণী বলিল, "নোট না। শুধু উইলখানা রাখুন।"

হরলাল তখন জাল উইল রাখিয়া নোট লইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐ দিবস রাত্রি আটটার সময়ে কৃষ্ণকান্ত রায় আপন শয়নমন্দিরে পর্যঙ্কে বসিয়া, উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া সটকায় তামাক টানিতেছিলেন এবং সংসারে একমাত্র ঔষধ মাদকমধ্যে শ্রেষ্ঠ—অহিফেন ওরফে আফিমের নেশায় মিঠে রকম ঝিমাইতেছিলেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে খেয়াল দেখিতেছিলেন, যেন উইলখানি হঠাৎ বিক্রয় কোবালা হইয়া গিয়াছে। যেন হরলাল তিন টাকা তের আনা দু কড়া দু ক্রান্তি মূল্যে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি কিনিয়া লইয়াছে। আবার যেন কে বলিয়া দিল যে, না, এ দানপত্র নহে, এ তমস্সুক। তখনই যেন দেখিলেন যে, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিম কর্জ লইয়া, এই দলিল লিখিয়া দিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন—মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোরক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এমত সময়ে, রোহিণী ধীরে ধীরে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা কি ঘুমাইয়াছ?"

কৃষ্ণকান্ত ঝিমাইতে ঝিমাইতে কহিলেন, "কে, নন্দী? ঠাকুরকে এই বেলা ফোরক্লোজ করিতে বল।"

রোহিণী বুঝিল যে, কৃষ্ণকান্তের আফিমের আমল হইয়াছে। হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা নন্দী কে?"

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় না তুলিয়া বলিলেন, "হুম্, ঠিক বলেছ। বৃন্দাবনে গোয়ালা-বাড়ী মাখন খেয়েছে—আজও তার কড়ি দেয় নাই।"

রোহিণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণকান্তের চমক হইল, মাথা তুলিয়া বলিলেন, "কে ও, অশ্বিনি ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী?"

রোহিণী উত্তর করিল, "মৃগশিরা আর্দ্রা পুনর্বসু পুষ্যা।"

কৃষ্ণ। অশ্লেষা মঘা পূর্বফাল্গুনী।

রো। ঠাকুরদাদা, আমি কি তোমার কাছে জ্যোতিষ শিখ্‌তে এয়েছি?

কৃষ্ণ। তাই ত? তবে কি মনে করিয়া? আফিঙ্গ চাই না ত?

রো। যে সামগ্রী প্রাণ ধরে দিতে পারিবে না, তার জন্যে কি আমি এসেছি! আমাকে কাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই এসেছি।

কৃষ্ণ। এই এই। তবে আফিঙ্গেরই জন্য।

রো। না, ঠাকুরদাদা, না। তোমার দিব্য, আফিঙ্গ চাই না। কাকা বললেন যে, যে উইল আজ লেখাপড়া হয়েছে, তাতে তোমার দস্তখত হয় নাই।

কৃষ্ণ। সে কি! আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে, আমি দস্তখত করিয়াছি।

রো। না, কাকা কহিলেন যে, তাঁহার যেন স্মরণ হচ্ছে, তুমি তাতে দস্তখত কর নাই; ভাল, সন্দেহ রাখার দরকার কি? তুমি কেন সেখানা খুলে একবার দেখ না।

কৃষ্ণ। বটে—তবে আলোটা ধর দেখি।

বলিয়া কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া উপাধানের নিম্ন হইতে একটি চাবি লইলেন। রোহিণী নিকটস্থ দীপ হস্তে লইল। কৃষ্ণকান্ত প্রথমে একটি ক্ষুদ্র হাতবাক্স খুলিয়া একটি বিচিত্র চাবি লইয়া, পরে একটা চেস্ট-ড্রয়ারের একটি দেরাজ খুলিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া ঐ উইল বাহির করিলেন। পরে বাক্স হইতে চশমা বাহির করিয়া নাসিকার উপর সংস্থাপনের উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু চশমা লাগাইতে লাগাইতে দুই চারিবার আফিঙ্গের ঝিমকানি আসিল সুতরাং তাহাতে কিছুকাল বিলম্ব হইল। পরিশেষে চশমা সুস্থির হইলে কৃষ্ণকান্ত উইলে নেত্রপাত করিয়া দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "রোহিণি, আমি কি বুড়ো হইয়া বিহ্বল হইয়াছি? এই দেখ, আমার দস্তখত।"

রোহিণী বলিল, "বালাই, বুড়ো হবে কেন? আমাদের কেবল জোর

করিয়া নাতিনী বল বইত না। তা ভাল, আমি এখন যাই, কাকাকে বলি গিয়া।"

রোহিণী তখন কৃষ্ণকান্তের শয়নমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

* * *

গভীর নিশাতে কৃষ্ণকান্ত নিদ্রা যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, তাঁহার শয়নগৃহে দীপ জ্বলিতেছে না। সচরাচর সমস্ত রাত্রি দীপ জ্বলিত, কিন্তু সে রাত্রে দীপনির্বাণ হইয়াছে দেখিলেন, নিদ্রাভঙ্গকালে এমতও শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল যে, যেন কে একটা চাবি কলে ফিরাইল। এমত বোধ হইল, যেন ঘরে কে মানুষ বেড়াইতেছে। মানুষ তাঁহার পর্যঙ্কের শিরোদেশ পর্যন্ত আসিল—তাঁহার বালিশে হাত দিল। কৃষ্ণকান্ত আফিমের নেশায় বিভোর; না নিদ্রিত না জাগরিত, বড় কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ঘরে যে আলো নাই—তাহাও ঠিক বুঝেন নাই, কখন অর্ধনিদ্রিত—কখন অর্ধসচেতন—সচেতনেও চক্ষু খুলে না। একবার দৈবাৎ চক্ষু খুলিয়া যাওয়ায় কতকটা অন্ধকার বোধ হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তখন মনে করিতেছিলেন যে, তিনি হরি ঘোষের মোকদ্দমায় জাল দলিল দাখিল করায় জেলখানায় গিয়াছেন। জেলখানা ঘোরান্ধকার। কিছু পরে হঠাৎ একটু চমক হইল। কৃষ্ণকান্ত সটকা হাতড়াইলেন, পাইলেন না—অভ্যাসবশতঃ ডাকিলেন, "হরি!"

কৃষ্ণকান্ত অন্তঃপুরে শয়ন করিতেন না—বহির্বাটীতেও শয়ন করিতেন না। উভয়ের মধ্যে একটি ঘর ছিল। সেই ঘরে শয়ন করিতেন। সেখানে হরি নামক একজন খানসামা তাঁহার প্রহরী স্বরূপ শয়ন করিত। আর কেহ না। কৃষ্ণকান্ত তাহাকেই ডাকিলেন, "হরি!"

কৃষ্ণকান্ত বারেক মাত্র হরিকে ডাকিয়া, আবার আফিমে ভোর হইয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আসল উইল, তাঁহার গৃহ হইতে সেই অবসরে অন্তর্হিত হইল। জাল উইল তৎপরিবর্তে স্থাপিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে রোহিণী আবার রাঁধিতে বসিয়াছে, আবার সেখানে হরলাল উঁকি মারিতেছে। ভাগ্যশঃ ব্রহ্মানন্দ বাড়ী ছিল না—নহিলে কি একটা মনে করিতে পারিত।

হরলাল ধীরে ধীরে রোহিণীর কাছে গেল—রোহিণী বড় চাহিয়া দেখে না। হরলাল বলিল, "চাহিয়া দেখ—হাঁড়ি ফাটিবে না।"

রোহিণী চাহিয়া দেখিয়া হাসিল। হরলাল বলিল, "কি করিয়াছ?"

রোহিণী অপহৃত উইল আনিয়া হরলালকে দেখিতে দিল। হরলাল পড়িয়া দেখিল—আসল উইল বটে। তখন সে দুষ্টের মুখে হাসি ধরে না। উইল হাতে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রকারে আনিলে?"

রোহিণী সে গল্প আরম্ভ করিল। প্রকৃত কিছুই বলিল না। একটি মিথ্যা উপন্যাস বলিতে লাগিল—বলিতে বলিতে সে হরলালের হাত হইতে উইলখানি লইয়া দেখাইল, কি প্রকারে কাগজখানা একটা কলমদানের ভিতর পড়িয়া ছিল। উইল চুরির কথা শেষ হইলে রোহিণী হঠাৎ উইলখানা হাতে করিয়া উঠিয়া গেল। যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার হাতে উইল নাই দেখিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "উইল কোথায় রাখিয়া আসিলে?"

রোহিণী। তুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

হর। আর তুলিয়া রাখিয়া কি হইবে? আমি এখনই যাইব।

রো। এখনই যাবে? এত তাড়াতাড়ি কেন?

হর। আমার থাকিবার যো নাই।

রো। তা যাও।

হর। উইল?

রো। আমার কাছে থাক।

হর। সে কি? উইল আমায় দিবে না?

রো। তোমার কাছে থাকাও যে, আমার কাছে থাকাও সে।

হর। যদি আমাকে উইল দিবে না, তবে ইহা চুরি করিলে কেন?

রো। আপনারই জন্য। আপনারই জন্য ইহা রহিল। যখন আপনি

বিধবা বিবাহ করিবেন, আপনার স্ত্রীকে ও উইল দিব। আপনি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।

হরলাল বুঝিল, বলিল, "তা হবে না রোহিণী! টাকা যাহা চাও দিব।"

রো। লক্ষ টাকা দিলেও নয়। যাহা দিবে বলিয়াছিলে, তাই চাই।

হর। তা হয় না। আমি জাল করি, চুরি করি, আপনারই হকের জন্য। তুমি চুরি করিয়াছ, কার হকের জন্য?

রোহিণীর মুখ শুকাইল। রোহিণী অধোবদনে রহিল। হরলাল বলিতে লাগিল, "আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।"

রোহিণী সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া, মাথার কাপড় উঁচু করিয়া তুলিয়া হরলালের মুখপানে চাহিল; বলিল, "আমি চোর! তুমি সাধু! কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল? কে আমাকে বড় লোভ দেখাইল? সরলা স্ত্রীলোক দেখিয়া কে প্রবঞ্চনা করিল? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নাই, যে মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা নাই, যা ইতরে বর্বরে মুখেও আনিতে পারে না, তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র হইয়া তাই করিলে? হায়! হায়! আমি তোমার অযোগ্য? তোমার মত নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই। তুমি যদি মেয়েমানুষ হইতে তোমাকে আজ, যা দিয়া ঘর ঝাঁট দিই, তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ, মানে মানে দূর হও।"

হরলাল বুঝিল, উপযুক্ত হইয়াছে। মানে মানে বিদায় হইল—যাইবার সময় একটু টিপি টিপি হাসিয়া গেল। রোহিণীও বুঝিল যে উপযুক্ত হইয়াছে—উভয় পক্ষে। সেও খোঁপাটা একটু আঁটিয়া নিয়া রাঁধিতে বসিল। রাগে খোঁপাটা খুলিয়া গিয়াছিল। তার চোখে জল আসিতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তুমি বসন্তের কোকিল! প্রাণ ভরিয়া ডাক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ যে, সময় বুঝিয়া ডাকিবে। সময়ে অসময়ে, সকল সময়ে ডাকাডাকি ভাল নহে। দেখ, আমি বহু সন্ধানে লেখনী মসীপাত্র ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাইয়া, আরও অধিক অনুসন্ধানের পর মনের সাক্ষাৎ পাইয়া কৃষ্ণকান্তের উইলের কথা ফাঁদিয়া লিখিতে বসিতেছিলাম, এমন সময়ে, তুমি আকাশ হইতে ডাকিলে, "কুহু! কুহু! কুহু!" তুমি সুকণ্ঠ, আমি স্বীকার করি, কিন্তু সুকণ্ঠ বলিয়া কাহারও পিছু ডাকিবার অধিকার নাই। যাহা হউক, আমার পলিত কেশ, চলিত কলম, এ সব স্থানে তোমার ডাকাডাকিতে বড় আসে যায় না। কিন্তু দেখ, যখন নব্য বাবু টাকার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া জমাখরচ লইয়া মাথা কুটাকুটি করিতেছেন, তখন তুমি হয় ত আপিসের ভগ্ন প্রাচীরের কাছ হইতে ডাকিলে, "কুহু"—বাবুর আর জমাখরচ মিলিল না; যখন বিরহসন্তপ্তা সুন্দরী, প্রায় সমস্ত দিনের পর অর্থাৎ বেলা নয়টার সময় দুটি ভাত মুখে দিতে বসিয়াছেন, কেবল ক্ষীরের বাটিটি কোলে টানিয়া লইয়াছেন মাত্র, অমনি তুমি ডাকিলে—"কুহু"—সুন্দরীর ক্ষীরের বাটি অমনি রহিল—হয়ত, তাহাতে অন্যমনে লুণ মাখিয়া খাইলেন। যাহা হউক, তোমার কুহুরবে কিছু যাদু আছে, নহিলে যখন তুমি বকুল গাছে বসিয়া ডাকিতেছিলে—আর বিধবা রোহিণী কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল—তখন—কিন্তু আগে জল আনিতে যাওয়ার পরিচয়টা দিই।

তা, কথাটা এই। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ দুঃখী লোক—দাসী চাকরাণীর বড় ধার ধারে না। সেটা সুবিধা কি কুবিধা, তা বলিতে পারি না—সুবিধা হউক, কুবিধা হউক, যাহার চাকরাণী নাই, তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ কোন্দল এবং ময়লা, এই চারিটি বস্তু নাই। চাকরাণী নামে দেবতা এই চারিটির সৃষ্টিকর্তা। বিশেষ যাহার অনেকগুলি চাকরাণী, তাহার বাড়ীতে নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—নিত্য রাবণবধ। কোন চাকরাণী ভীমরূপিণী, সর্বদাই সম্মার্জনীগদা হস্তে গৃহরণক্ষেত্রে ফিরিতেছেন, কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণতুল্য বীরগণকে ভর্ৎসনা করিতেছেন; কেহ কুম্ভকর্ণরূপিণী, ছয় মাস করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। নিদ্রান্তে সর্বস্ব খাইতেছেন;

কেহ সুগ্রীব, গ্রীবা হেলাইয়া কুম্ভকর্ণের বধের উদ্যোগ করিতেছেন ইত্যাদি।

ব্রহ্মানন্দের সে সকল আপদ বালাই ছিল না, সুতরাং জল আনা, বাসন মাজাটা, রোহিণীর ঘাড়ে পড়িয়াছিল। বৈকালে অন্যান্য কাজ শেষ হইলে রোহিণী জল আনিতে যাইত। যে দিনের ঘটনা বিবৃত করিয়াছি, তাহার পরদিন নিয়মিত সময়ে রোহিণী কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল। বাবুদের একটা বড় পুকুর আছে—নাম বারুণী—জল তার বড় মিঠা—রোহিণী সেইখানে জল আনিতে যাইত। আজিও যাইতেছিল। রোহিণী একা জল আনিতে যায়—দল বাঁধিয়া যত হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি হাসিতে হাসিতে হালকা কলসীতে হালকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারী, চাল-চলনও ভারী। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতা-পেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের উপর চারুবিনির্মিতা কাল ভুজঙ্গিনীতুল্যা কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী। পিতলের কলসী কক্ষে; চলনের দোলনে, ধীরে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে—যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে, বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল—অমনি সে রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে, চমকে, রোহিণী সুন্দরী সরোবরপথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল—এমন সময়ে বকুলের ডালে বসিয়া বসন্তের কোকিল ডাকিল।

কুহুঃ কুহুঃ কুহুঃ! রোহিণী চারি দিক চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রোহিণীর এই ঊর্ধ্ববিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই—ক্ষুদ্র পাখিজাতি—তখনই সে, সে শরে বিদ্ধ হইয়া, উলটি পালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া, ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু পাখির অদৃষ্টে তাহা ছিল না—কার্যকারণের অনন্ত শ্রেণী-পরম্পরায় এটি গ্রন্থিবদ্ধ হয় নাই—অথবা পাখির তত পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতি ছিল না। মূর্খ পাখি আবার ডাকিল—"কুহু! কুহু! কুহু!"

"দূর হ! কালামুখো!" বলিয়া রোহিণী চলিয়া গেল। চলিয়া গেল,

কিন্তু কোকিলকে ভুলিল না। আমাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস এই যে, কোকিল অসময়ে ডাকিয়াছিল। গরীব বিধবা যুবতী একা জল আনিতে যাইতেছিল, তখন ডাকাটা ভাল হয় নাই। কেননা, কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাই হারানোতে জীবন-সর্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কেন যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পুরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য কিছুই ভোগ করা হইল না।

আবার কুহুঃ, কুহুঃ, কুহুঃ! রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্মল অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ কুহুরবের সঙ্গে বাঁধা। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধ-পরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুনগুনে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে ফুল ফুটিয়াছে, কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজি-নির্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিতবৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতালতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল! এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল "কু উ"। তখন রোহিণী সরোবরসোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।

কেন কাঁদিতে বসিল, তাহা আমি জানি না; আমি স্ত্রীলোকের মনের কথা কি প্রকারে বলিব? তবে আমার বড়ই সন্দেহ হয়, ঐ দুষ্ট কোকিল রোহিণীকে কাঁদাইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বারুণী পুষ্করিণী লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম—আমি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ—নীল কাচের আয়নার মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম—বাগানের ফ্রেম—পুষ্করিণীর চারি পাশে বাবুদের বাগান—উদ্যানবৃক্ষের এবং উদ্যান-প্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখানা বড় জাঁকাল—লাল, কালো, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানাবর্ণ ফুলে মিনে করা—নানা ফলের পাতর বসান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়ীগুলা এক একখানা বড় বড় হীরার মত অস্তগামী সূর্যের কিরণে জ্বলিতেছিল। আর মাথার উপর আকাশ—সেও সেই বাগান ফ্রেমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না। আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর সেই ঘাসের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ বাড়ী, সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে সেই কোকিলটা ডাকিতেছিল। এ সকল এক রকম বুঝান যায় কিন্তু সেই আকাশ, আর সেই পুকুর, আর সেই কোকিলের ডাকের সঙ্গে রোহিণীর মনের কি সম্বন্ধ, সেইটি বুঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে, এই বারুণী পুকুর লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম।

আমিও গোলে পড়িলাম, আর গোবিন্দলালও বড় গোলে পড়িল। গোবিন্দলালও সেই কুসুমিত লতার অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন যে, রোহিণী আসিয়া ঘাটের রাস্তায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে। গোবিন্দলাল বাবু মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, এ, পাড়ায় কোন মেয়ে ছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া আসিয়া কাঁদিতেছে। আমরা গোবিন্দলালের সিদ্ধান্তে তত ভরাভর করি না। রোহিণী কাঁদিতে লাগিল।

রোহিণী কি ভাবিতেছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু বোধ হয় ভাবিতেছিল যে, কি অপরাধে বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না? কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ-যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী—মনে কর ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী—কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য?

দূর হৌক—পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই—কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন ? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি ?

তা, আমরা ত বলিয়াছি, রোহিণী লোক ভাল নয়। দেখ, একটুতে কত হিংসা! রোহিণীর অনেক দোষ—তার কান্না দেখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি ? করে না। কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই—পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করে না।

তা, তোমরা রোহিণীর জন্য একবার আহা বল। দেখ এখনও রোহিণী, ঘাটে বসিয়া কপালে হাত দিয়া কাঁদিতেছে—শূন্য কলসী জলের উপর বাতাসে নাচিতেছে।

শেষে সূর্য অস্ত গেলেন ; ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া পড়িল —শেষে অন্ধকার হইয়া আসিল। পাখী সকল উড়িয়া গিয়া গাছে বসিতে লাগিল। গোরু সকল গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল—অন্ধকারের উপর মৃদু আলো ফুটিল। তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহার কলসী তখনও জলে ভাসিতেছে। তখন গোবিন্দলাল উদ্যান হইতে গৃহাভিমুখে চলিলেন—যাইবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া আছে।

এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া তাঁহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল যে, এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ—আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না ?

গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রোহিণীর কাছে গিয়া, তাহার পার্শ্বে চম্পকনির্মিত মূর্তিবৎ সেই চম্পকবর্ণ চন্দ্রকিরণে দাঁড়াইলেন। রোহিণী দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "রোহিণী! তুমি এতক্ষণ একা বসিয়া কাঁদিতেছ কেন ?"

রোহিণী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না।

গোবিন্দলাল পুনরপি বলিলেন, "তোমার কিসের দুঃখ আমায় কি বলিবে না, যদি আমি কোন উপকার করিতে পারি ?"

যে রোহিণী হরলালের সম্মুখে মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল—গোবিন্দলালের সম্মুখে সে রোহিণী একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিছু বলিল না—গঠিত পুত্তলীর মত সেই সরোবরসোপানের শোভা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল স্বচ্ছ সরোবরজলে সেই ভাস্করকীর্তিকল্প মূর্তির ছায়া দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রের ছায়া দেখিলেন এবং কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর—কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর! সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ। গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন। রোহিণীকে আবার বলিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক আমাকে জানাইও। নিজে না বলিতে পার, তবে আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা জানাইও।"

রোহিণী এবার কথা কহিল। বলিল, "এক দিন বলিব। আজ নহে। একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।"

গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইয়া গৃহাভিমুখে গেলেন। রোহিণী জলে ঝাঁপ দিয়া কলসী ধরিয়া তাহাতে জল পুরিল—কলসী তখন বক্—বক্—গল্—গল্—করিয়া বিস্তর আপত্তি করিল। আমি জানি, শূন্য কলসীতে জল পুরিতে গেলে কলসী, কি মৃৎকলসী কি মনুষ্যকলসী, এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকে—বড় গণ্ডগোল করে। পরে অন্তঃশূন্য কলসী, পূর্ণতোয় হইলে রোহিণী ঘাটে উঠিয়া আর্দ্র বস্ত্রে দেহ সুচারুরূপে সমাচ্ছাদিত করিয়া ধীরে ধীরে ঘরে যাইতে লাগিল। তখন চলৎ ছলৎ ঠনাক্! ঝিনিক্ ঠিনিকি ঠিন! বলিয়া, কলসীতে আর কলসীর জলেতে আর রোহিণীর বালাতে কথোপকথন হইতে লাগিল। আর রোহিণীর মনও সেই কথোপকথনে আসিয়া যোগ দিল।

রোহিণীর মন বলিল—উইল চুরি করা কাজটা!

জল বলিল—ছলাৎ!

রোহিণীর মন—কাজটা ভাল হয় নাই।

বালা বলিল—ঠিন্ ঠিনা—না! তা ত না—

রোহিণীর মন—এখন উপায়?

কলসী—ঠনক্ ঢনক্ ঢন্—উপায় আমি,—দড়ি সহযোগে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রোহিণী সকাল সকাল পাককার্য সমাধা করিয়া, ব্রহ্মানন্দকে ভোজন করাইয়া, আপনি অনাহারে শয়নগৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গিয়া শয়ন করিল। নিদ্রার জন্য নহে—চিন্তার জন্য।

তুমি দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতামত ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়া আমার কাছে একটা মোটা কথা শুন। সুমতি নামে দেবকন্যা, এবং কুমতি নামে রাক্ষসী, এই দুইজন সর্বদা মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ করে; এবং সর্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে। যেমন দুইটা ব্যাঘ্রী, মৃত গাভী লইয়া পরস্পরে যুদ্ধ করে, যেমন দুই শৃগালী, মৃত নরদেহ লইয়া বিবাদ করে, ইহারা জীবন্ত মনুষ্য লইয়া সেইরূপ করে। আজি, এই বিজন শয়নাগারে রোহিণীকে লইয়া সেই দুইজনে সেইরূপ ঘোর বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল।

সুমতি বলিতেছিল, "এমন লোকেরও সর্বনাশ করিতে আছে?"

কুমতি। উইল ত হরলালকে দিই নাই। সর্বনাশ কই করিয়াছি?

সু। কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।

কু। বাঃ, যখন কৃষ্ণকান্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে,"এ উইল তুমি কোথায় পাইলে, আমার দেরাজে আর একখানা জাল উইলই বা কোথা হইতে আসিল," তখন আমি কি বলিব? মজার কথা! কাকাতে আমাতে দুজনে থানায় যেতে বল নাকি?

সু। তবে সকল কথা কেন গোবিন্দলালের কাছে খুলিয়া বলিয়া, তাহার পায়ে কাঁদিয়া পড় না? সে দয়ালু, অবশ্য তোমাকে রক্ষা করিবে।

কু। সেই কথা। কিন্তু গোবিন্দলালকে অবশ্য এ সকল কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে জানাইতে হইবে, নইলে উইলের বদল ভাঙ্গিবে না। কৃষ্ণকান্ত যদি থানায় দেয়, তবে গোবিন্দলাল রাখিবে কি প্রকারে? বরং আর এক পরামর্শ আছে। এখন চুপ করিয়া থাকি, আগে কৃষ্ণকান্ত মরুক, তারপর তোমার পরামর্শ মতে গোবিন্দলালের কাছে গিয়া তাহার পায়ে জড়াইয়া পড়িব। তখন তাঁহাকে উইল দিব।

সু। তখন বৃথা হইবে। যে উইল কৃষ্ণকান্তের ঘরে পাওয়া যাইবে, তাহাই

সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। গোবিন্দলাল সে উইল বাহির করিলে, জালের অপরাধগ্রস্ত হইতে পারে।

কু। তবে চুপ করিয়া থাক—যা হইয়াছে, তা হইয়াছে।

সুতরাং সুমতি চুপ করিল—তাহার পরাজয় হইল। তারপর দুই জনে সন্ধি করিয়া, সখ্যভাবে আর এক কার্যে প্রবৃত্ত হইল। সেই বাপীতীরবিরাজিত, চন্দ্রালোকপ্রতিভাসিত, চম্পকদামবিনির্মিত দেবমূর্তি আনিয়া, রোহিণীর মানস-চক্ষের অগ্রে ধরিল। রোহিণী দেখিতে লাগিল—দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে, কাঁদিল। রোহিণী সে রাত্রে ঘুমাইল না।

নবম পরিচ্ছেদ

সেই অবধি নিত্য কলসী কক্ষে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়; নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য সেই গোবিন্দলালকে পুষ্পকাননমধ্যে দেখিতে পায়, নিত্য সুমতি কুমতিতে সন্ধিবিগ্রহ উভয়ই ঘটনা হয়। সুমতি কুমতির বিবাদ বিসংবাদ মনুষ্যের সহনীয়; কিন্তু সুমতি কুমতির সদ্ভাব অতিশয় বিপত্তিজনক। তখন সুমতি কুমতির রূপ ধারণ করে, সুমতি কুমতির কাজ করে। তখন কে সুমতি, কে কুমতি চিনিতে পারা যায় না। লোকে সুমতি বলিয়া কুমতির বশ হয়।

যাহা হউক, কুমতি হউক, সুমতি হউক, গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র। দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল। তখন সংসার তাহার চক্ষে—যাক, পুরাতন কথা আমার তুলিয়া কাজ নাই। রোহিণী সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল। কুমতির পুনর্বার জয় হইল।

কেন যে এতকালের পর, তাহার এ দুর্দশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই।

আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি। সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ—এই সকল উপলক্ষে কিছুকাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল। তাহাতে কি মনে হয়, তাহা আমি জানি না, যেমন ঘটিয়াছে, আমি তেমনি লিখিতেছি।

রোহিণী অতি বুদ্ধিমতী, একেবারেই বুঝিল যে, মরিবার কথা। যদি গোবিন্দলাল ঘুণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারে, তবে কখনও তাহার ছায়া মাড়াইবে না। হয় ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। কাহারও কাছে এ কথা বলিবার নহে। রোহিণী অতি যত্নে, মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল।

কিন্তু যেমন লুক্কায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্তে তাহাই হইতে লাগিল। জীবনভার বহন করা রোহিণীর পক্ষে কষ্টদায়ক হইল। রোহিণী মনে মনে রাত্রিদিন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।

কত লোক যে মনে মনে মৃত্যুকামনা করে, কে তাহার সংখ্যা রাখে? আমার বোধ হয়, যাহারা সুখী, যাহারা দুঃখী, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কায়মনোবাক্যে মৃত্যুকামনা করে। এ পৃথিবীর সুখ সুখ নহে, সুখও দুঃখময়, কোন সুখেই সুখ নাই, কোন সুখই সম্পূর্ণ নহে, এই জন্য অনেক সুখীজনে মৃত্যুকামনা করে—আর দুঃখী, দুঃখের ভার বহিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুকে ডাকে।

মৃত্যুকে ডাকে কিন্তু কার কাছে মৃত্যু আসে? ডাকিলে মৃত্যু আসে না। যে সুখী, যে মরিতে চায় না, যে সুন্দর, যে যুবা, যে আশাপূর্ণ, যাহার চক্ষে পৃথিবী নন্দনকানন, মৃত্যু তাহারই কাছে আসে। রোহিণীর মত কাহারও কাছে আসে না। এদিকে মনুষ্যের এমন শক্তি অল্প যে, মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে না। একটি ক্ষুদ্র সূচীবেধে অর্ধবিন্দু ঔষধভক্ষণে, এ নশ্বর জীবন বিনষ্ট হইতে পারে, এ চঞ্চল জলবিম্ব কালসাগরে মিলাইতে পারে—কিন্তু আন্তরিক মৃত্যুকামনা করিলেও প্রায় কেহ ইচ্ছাপূর্বক সে সূচ ফুটায় না, সে অর্ধবিন্দু ঔষধ পান করে না। কেহ কেহ তাহা পারে, কিন্তু রোহিণী সে দলের নহে—রোহিণী তাহা পারিল না।

কিন্তু এক বিষয়ে রোহিণী কৃতসংকল্প হইল—জাল উইল চালান হইবে না।

ইহার এক সহজ উপায় ছিল—কৃষ্ণকান্তকে বলিলে, কি কাহারও দ্বারা বলাইলেই হইল যে, মহাশয়ের উইল চুরি গিয়াছে—দেরাজ খুলিয়া যে উইল আছে, তাহা পড়িয়া দেখুন। রোহিণী যে চুরি করিয়াছিল, ইহাও প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই—যেই চুরি করুক, কৃষ্ণকান্তের মনে একবার সন্দেহমাত্র জন্মিলে, তিনি সিন্দুক খুলিয়া উইল পড়িয়া দেখিবেন—তাহা হবলেই জাল উইল দেখিয়া নূতন উইল প্রস্তুত করিবেন। গোবিন্দলালের সম্পত্তি রক্ষা হইবে, অথচ কেহ জানিতে পারিবে না যে, কে উইল চুরি করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ—কৃষ্ণকান্ত জাল উইল পড়িলেই জানিতে পারিবেন যে, ইহা ব্রহ্মানন্দের হাতের লেখা—তখন ব্রহ্মানন্দ মহা বিপদে পড়িবেন। অতএব দেরাজে যে জাল উইল আছে, ইহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

অতএব হরলালের লোভে রোহিণী, গোবিন্দলালের যে গুরুতর অনিষ্ট সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তৎপ্রতিকারার্থ বিশেষ ব্যাকুলা হইয়াও সে খুল্লতাতের রক্ষানুরোধে কিছুই করিতে পারিল না। শেষ সিদ্ধান্ত করিল, যে প্রকারে প্রকৃত উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উইল রাখিয়া তৎপরিবর্তে জাল উইল লইয়া আসিবে।

নিশীথকালে, রোহিণী সুন্দরী, প্রকৃত উইলখানি লইয়া সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। খড়কীদ্বার রুদ্ধ; সদর ফটকে যথায় দ্বারবানেরা চারপাইয়ে উপবেশন করিয়া, অর্ধনিমীলিত নেত্রে, অর্ধরুদ্ধ কণ্ঠে, পিলু রাগিণীর পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, রোহিণী সেইখানে উপস্থিত হইল। দ্বারবানেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?" রোহিণী বলিল "সখী।" সখী, বাটীর একজন যুবতী চাকরাণী, সুতরাং দ্বারবানেরা আর কিছু বলিল না। রোহিণী নির্বিঘ্নে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক, পূর্বপরিচিত পথে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে গেলেন—পুরী সুরক্ষিত বলিয়া কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ হইত না। প্রবেশকালে কান পাতিয়া রোহিণী শুনিল যে অবাধে কৃষ্ণকান্তের নাসিকাগর্জন হইতেছে। তখন ধীরে ধীরে বিনা শব্দে উইলচোর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া প্রথমে দীপ নির্বাপিত করিল। পরে পূর্বমত চাবি সংগ্রহ করিল। এবং পূর্বমত, অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া, দেরাজ খুলিল।

রোহিণী অতিশয় সাবধান, হস্ত অতি কোমলগতি। তথাপি চাবি

ফিরাইতে খট্ করিয়া একটু শব্দ হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

কৃষ্ণকান্ত ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে, কি শব্দ হইল। কোন সাড়া দিলেন না—কান পাতিয়া রহিলেন।

রোহিণীও দেখিলেন যে, নাসিকাগর্জনশব্দ বন্ধ হইয়াছে। রোহিণী বুঝিলেন কৃষ্ণকান্তের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। রোহিণী নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "কে ও?" কেহ কোন উত্তর দিল না।

সে রোহিণী আর নাই। রোহিণী এখন শীর্ণা, ক্লিষ্টা, বিবশা—বোধ হয় একটু ভয় হইয়াছিল—একটু নিশ্বাসের শব্দ হইয়াছিল। নিশ্বাসের শব্দ কৃষ্ণকান্তের কানে গেল।

কৃষ্ণকান্ত হরিকে বার কয় ডাকিলেন। রোহিণী মনে করিলে এই অবসরে পলাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে গোবিন্দলালের প্রতিকার হয় না। রোহিণী মনে মনে ভাবিল, "দুষ্কর্মের জন্য সে দিন যে সাহস করিয়াছিলাম, আজ সৎকর্মের জন্য তাহা করিতে পারি না কেন? ধরা পড়ি পড়িব।" রোহিণী পলাইল না।

কৃষ্ণকান্ত কয় বার হরিকে ডাকিয়া কোন উত্তর পাইলেন না। হরি স্থানান্তরে সুখানুসন্ধানে গমন করিয়াছিল—শীঘ্র আসিবে। তখন কৃষ্ণকান্ত উপাধানতল হইতে অগ্নিগর্ভ দীপশলাকা গ্রহণপূর্বক সহসা আলোক উৎপাদন করিলেন। শলাকালোকে দেখিলেন, গৃহমধ্যে দেরাজের কাছে স্ত্রীলোক।

জ্বালিত শলাকাসংযোগে কৃষ্ণকান্ত বাতি জ্বালিলেন। স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কে?"

রোহিণী কৃষ্ণকান্তের কাছে গেল। বলিল, "আমি রোহিণী।"

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "এত রাত্রে অন্ধকারে এখানে কি করিতেছিলে?"

রোহিণী বলিল, "চুরি করিতেছিলাম।"

কৃষ্ণ। রঙ্গ রহস্য রাখ। কেন এ অবস্থায় তোমাকে দেখিলাম বল। তুমি চুরি করিতে আসিয়াছ, এ কথা সহসা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোরের অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতেছি।

রোহিণী বলিল, "তবে আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা আপনার

সম্মুখেই করি, দেখুন। পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয়, করিবেন। আমি ধরা পড়িয়াছি, পলাইতে পারিব না। পলাইব না।”

এই বলিয়া রোহিণী, দেরাজের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া দেরাজ টানিয়া খুলিল। তাহার ভিতর হইতে জাল উইল বাহির করিয়া, প্রকৃত উইল সংস্থাপিত করিল। পরে জাল উইলখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফাড়িয়া ফেলিল।

“হাঁ, হাঁ, ও কি ফাড় ? দেখি দেখি” বলিয়া কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিলেন। কিন্তু তিনি চীৎকার করিতে করিতে রোহিণী সেই খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন উইল, অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া ভস্মাবশেষ করিল।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে লোচন আরক্ত করিয়া বলিলেন, “ও কি পোড়াইলি ?”

রোহিণী। একখানি কৃত্রিম উইল।

কৃষ্ণকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন, “উইল। উইল! আমার উইল কোথায় ?”

রো। আপনার উইল দেরাজের ভিতর আছে, আপনি দেখুন না।

এই যুবতীর স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, “কোন দেবতা ছলনা করিতে আসেন নাই ত ?”

কৃষ্ণকান্ত তখন দেরাজ খুলিয়া দেখিলেন, একখানি উইল তন্মধ্যে আছে। সেখানি বাহির করিলেন, চশমা বাহির করিলেন, উইলখানি পড়িয়া দেখিয়া জানিলেন তাঁহার প্রকৃত উইল বটে। বিস্মিত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি পোড়াইলে কি ?”

রো। একখানি জাল উইল।

কৃ। জাল উইল! জাল উইল কে করিল ? তুমি তাহা কোথা পাইলে ?

রো। কে করিল, তাহা বলিতে পারি না—উহা আমি এই দেরাজের মধ্যে পাইয়াছি।

কৃ। তুমি কি প্রকারে সন্ধান জানিলে যে, দেরাজের ভিতর কৃত্রিম উইল আছে ?

রো। তাহা আমি বলিতে পারিব না।

কৃষ্ণকান্ত কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, “যদি আমি তোমার মত স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্রবুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিব, তবে এ বিষয় সম্পত্তি এত কাল রক্ষা করিলাম কি প্রকারে ? এ জাল উইল হরলালের তৈয়ারি। বোধ হয় তুমি তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া

আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে! তারপর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছ। ঠিক কথা কিনা?"

রো। তাহা নহে।

কৃ। তাহা নহে? তবে কি?

রো। আমি কিছু বলিব না। আমি আপনার ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমাকে যাহা করিতে হয় করুন।

কৃ। তুমি মন্দ কর্ম করিতে আসিয়াছিলে সন্দেহ নাই, নহিলে এ প্রকারে চোরের মত আসিবে কেন? তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য করিব। তোমাকে পুলিশে দিব না, কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আজ তুমি কয়েদ থাক।

রোহিণী সে রাত্রে আবদ্ধ রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রি প্রভাতে শয্যাগৃহে মুক্ত বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল। ঠিক প্রভাত হয় নাই—কিছু বাকী আছে। এখনও গৃহপ্রাঙ্গণস্থ কামিনীকুঞ্জে কোকিল প্রথম ডাক ডাকে নাই। কিন্তু দোয়েল প্রথম গীত আরম্ভ করিয়াছে। উষার শীতল বাতাস উঠিয়াছে—গোবিন্দলাল বাতায়নপথ মুক্ত করিয়া, সেই উদ্যানস্থিত মল্লিকা গন্ধরাজ কুটজের পরিমলবাহী শীতল প্রভাতবায়ু সেবনজন্য তৎসমীপে দাঁড়াইলেন। অমনি তাঁহার পাশে আসিয়া একটি ক্ষুদ্রশরীরা বালিকা দাঁড়াইল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আবার তুমি এখানে কেন?"

বালিকা বলিল, "তুমি এখানে কেন?" বলিতে হইবে না যে, এই বালিকা গোবিন্দলালের স্ত্রী।

গোবিন্দ। আমি একটু বাতাস খেতে এলাম, তাও কি তোমার সইল না?

বালিকা বলিল, "সবে কেন? এখনই আবার খাই খাই? ঘরের সামগ্রী খেয়ে মন ওঠে না, আবার মাঠে মাঠে বাতাস খেতে উঁকি মারেন!"

গো। ঘরের এত কি খাইলাম ?

"কেন, এইমাত্র আমার কাছে গালি খাইয়াছ ?"

গোবিন্দ। জান না, ভোমরা, গালি খাইলে যদি বাঙ্গালীর ছেলের পেট ভরিত, তাহা হইলে, এ দেশের লোক এত দিনে সগোষ্ঠী বদ হজমে মরিয়া যাইত। ও সামগ্রীটি অতি সহজে বাঙ্গালীর পেটে জীর্ণ হয়। তুমি আর একবার নথ নাড়ো, ভোমরা, আমি আর একবার দেখি।

গোবিন্দলালের পত্নীর যথার্থ নাম কৃষ্ণমোহিনী, কি কৃষ্ণকামিনী, কি অনঙ্গমঞ্জরী, কি এমনই একটা কি তাঁহার পিতা মাতা রাখিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে লেখে না। অব্যবহারে সে নাম লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার আদরের নাম "ভ্রমর" বা "ভোমরা"। সার্থকতা-বশতঃ সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল। ভোমরা কালো।

ভোমরা নথ নাড়ার পক্ষে বিশেষ আপত্তি জানাইবার জন্য নথ খুলিয়া, একটা হুকে রাখিয়া গোবিন্দলালের নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। পরে গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল,—মনে মনে জ্ঞান যেন বড় একটা কীর্তি করিয়াছি। গোবিন্দলালও তাহার মুখপানে চাহিয়া অতৃপ্তলোচনে দৃষ্টি করিতেছিলেন। সেই সময়ে, সূর্যোদয়সূচক প্রথম রশ্মিকিরীট পূর্বগগনে দেখা দিল—তাহার মৃদুল জ্যোতিঃপুঞ্জ ভূমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নবীনালোক পূর্বদিক্ হইতে আসিয়া পূর্বমুখী ভ্রমরের মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেই উজ্জ্বল, পরিষ্কার, কোমল, শ্যামচ্ছবি মুখকান্তির উপর কোমল প্রভাতালোক পড়িয়া তাহার বিস্ফারিত লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জ্বলিল, তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডে প্রভাসিত হইল। হাসি—চাহনিতে, সেই আলোতে, গোবিন্দলালের আদরে আর প্রভাতের বাতাসে—মিলিয়া গেল।

এই সময়ে সুপ্তোত্থিতা চাকরাণী মহলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তৎপরে ঘর ঝাঁটান, জল ছড়ান, বাসন মাজা, ইত্যাদির একটা সপ্ সপ্ ছপ্ ছপ্ ঝন্ ঝন্ খন্ খন্ শব্দ হইতেছিল, অকস্মাৎ সে শব্দ বন্ধ হইয়া, "ও মা, কি হবে!" "কি সর্বনাশ!" "কি আস্পর্ধা!" "কি সাহস!" মাঝে মাঝে হাসি টিটকারী ইত্যাদি গোলযোগ উপস্থিত হইল। শুনিয়া ভ্রমর বাহিরে আসিল।

চাকরাণী সম্প্রদায় ভ্রমরকে বড় মানিত না, তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। একে ভ্রমর ছেলেমানুষ, তাতে ভ্রমর স্বয়ং গৃহিণী নহেন, তাঁহার শাশুড়ী ননন্দ

ছিল, তার পর আবার ভ্রমর নিজে হাসিতে যত পটু, শাসনে তত পটু ছিলেন না। ভ্রমরকে দেখিয়া চাকরাণীর দল বড় গোলযোগ বাড়াইল—

নং ১—আর শুনেছ বৌ ঠাকরুণ?

নং ২—এমন সর্বনেশে কথা কেহ কখনও শুনে নাই।

নং ৩—কি সাহস! মাগীকে ঝাঁটাপেটা করে আসবো এখন।

নং ৪—শুধু ঝাঁটা—বৌ ঠাকরুণ—বল, আমি তার নাক কেটে নিয়ে আসি।

নং ৫—কার পেটে কি আছে মা—তা কেমন করে জান্‌বো মা—

ভ্রমর হাসিয়া বলিল, "আগে বল্ না কি হয়েছে, তারপর যার মনে যা থাকে করিস্।" তখনই আবার পূর্ববৎ গোলযোগ আরম্ভ হইল।

নং ১ বলিল—শোন নি। পাড়াশুদ্ধ গোলমাল হয়ে গেল যে—

নং ২ বলিল—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

নং ৩—মাগীর ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়িয়া দিই।

নং ৪—কি বল্‌ব বৌ ঠাকরুণ, বামন হয়ে চাঁদে হাত!

নং ৫—ভিজে বেড়ালকে চিনতে জোগায় না—গলায় দড়ি! গলায় দড়ি!

ভ্রমর বলিলেন, "তোদের।"

চাকরাণীরা তখন একবাক্যে বলিতে লাগিল, "আমাদের কি দোষ! আমরা কি করলাম! তা জানি গো জানি। যে যেখানে যা করবে, দোষ হবে আমাদের! আমাদের আর উপায় নাই বলিয়া গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি।" এই বক্তৃতা সমাপন করিয়া দুই এক জন চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। একজনের মৃত পুত্রের শোক উছলিয়া উঠিল। ভ্রমর কাতর হইলেন —কিন্তু হাসিও সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তোদের গলায় দড়ি এই জন্য যে, এখনও তোরা বলিতে পারিলি না যে, কথাটা কি। কি হয়েছে?"

তখন আবার চারি দিক্ হইতে চারি পাঁচ রকমের গলা ছুটিল। বহু কষ্টে, ভ্রমর সেই অনন্ত বক্তৃতাপরম্পরা হইতে এই ভাবার্থ সঙ্কলন করিলেন যে, গত রাত্রে কর্তা মহাশয়ের শয়নকক্ষে একটা চুরি হইয়াছে। কেহ বলিল, চুরি নহে ডাকাতি, কেহ বলিল, সিঁদ, কেহ বলিল, না, কেবল জন চার পাঁচ চোর আসিয়া লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ লইয়া গিয়াছে।

ভ্রমর বলিল, "তার পর? কোন্ মাগীর নাক কাটিতে চাহিতেছিলি?"

নং ১—রোহিণী ঠাকরুণের—আর কার ?

নং ২—সেই আবাগীই তো সর্বনাশের গোড়া।

নং ৩—সেই নাকি ডাকাতের দল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।

নং ৪—যেমন কর্ম তেমনি ফল।

নং ৫—এখন মরুন জেল খেটে।

ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "রোহিণী যে চুরি করিতে আসিয়াছিল, তোরা কেমন করে জানলি ?"

"কেন, সে যে ধরা পড়েছে। কাছারির গারদে কয়েদ আছে।"

ভ্রমর যাহা শুনিলেন, তাহা গিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন। গোবিন্দলাল ভাবিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

ভ্র। ঘাড় নাড়িলে যে ?

গো। আমার বিশ্বাস হইল না যে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয় ?

ভোমরা বলিল, "না।"

গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি ? লোকে ত বলিতেছে।

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি ?

গো। তা সময়ান্তরে বলিব। তোমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন, আগে বল।

ভ্র। তুমি আগে বল।

গোবিন্দলাল হাসিয়া বলিল, "তুমি আগে।"

ভ্র। কেন আগে বলিব !

গো। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে।

ভ্র। সত্য বলিব ?

গো। সত্য বল।

ভ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরবে রহিল।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন—আগেই বুঝিয়াছিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া এত পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রোহিণী যে নিরপরাধিনী

ভ্রমরের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অস্তিত্বে যত দূর বিশ্বাস, ভ্রমর উঁহার নির্দোষিতায় তত দূর বিশ্বাসবতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না—কেবল গোবিন্দলাল বলিয়াছেন যে, "সে নির্দোষী, আমার এইরূপ বিশ্বাস।" গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই সে কালো এত ভালবাসিতেন।

হাসিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি বলিব, কেন তুমি রোহিণীর দিকে?"

ভ্র। কেন?

গো। সে তোমায় কালো না বলিয়া উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে।

ভ্রমর কোপকুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিল, "যাও।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, 'যাই।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিলেন।

ভ্রমর তাঁহার বসন ধরিল—"কোথা যাও?"

গো। কোথা যাই বল দেখি?

ভ্র। এবার বলিব?

গো। বল দেখি?

ভ্র। রোহিণীকে বাঁচাইতে।

"তাই।" বলিয়া গোবিন্দলাল ভোমরার মুখচুম্বন করিলেন। পরদুঃখ-কাতরের হৃদয় পরদুঃখকাতরে বুঝিল—তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরের মুখচুম্বন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্ত রায়ের সদর কাছারিতে গিয়া দর্শন দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত প্রাতঃকালেই কাছারিতে বসিয়া ছিলেন। গদির উপর মসনদ করিয়া সোনার আলবোলায় অম্বুরি তামাকু চড়াইয়া মর্ত্যলোকে স্বর্গের অনুকরণ করিতেছিলেন। একপাশে রাশি রাশি দপ্তরে বাঁধা চিঠা, খতিয়ান, দাখিলা, জমাওয়াশীল, থোকা, করচা, বাকি জায়, শেহা রোকড়—আর এক পাশে নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, মুহরি, তহশীলদার, আমিন, পাইক, প্রজা। সম্মুখে অধোবদনা অবগুণ্ঠনবতী রোহিণী।

গোবিন্দলাল আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে জ্যেঠা মহাশয় ?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া রোহিণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া, তাঁহার প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ করিল। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার কথায় কি উত্তর করিলেন, তৎপ্রতি গোবিন্দলাল বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিলেন না ; ভাবিলেন, সেই কটাক্ষের অর্থ কি ? শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন, "এ কাতর কটাক্ষের অর্থ, ভিক্ষা।"

কি ভিক্ষা ? গোবিন্দলাল ভাবিলেন, আর্তের ভিক্ষা আর কি ? বিপদ্ হইতে উদ্ধার। সেই বাপীতীরে সোপানোপরে দাঁড়াইয়া যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার এই সময়ে মনে পড়িল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ের কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও।" আজি ত রোহিণীর কষ্ট বটে, বুঝি এই ইঙ্গিতে রোহিণী তাঁহাকে তাহা জানাইল।

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, "তোমার মঙ্গল সাধি ইহা আমার ইচ্ছা ; কেন না ইহলোকে তোমার সহায় কেহ নাই দেখিতেছি। কিন্তু তুমি যে লোকের হাতে পড়িয়াছ—তোমার রক্ষা সহজ নহে।" এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে জ্যেষ্ঠতাতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে জ্যেঠা মহাশয় ?"

বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত একবার সকল কথা গোবিন্দলালকে আনুপূর্বিক বলিয়াছিলেন কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীর কটাক্ষের ব্যাখ্যায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, কানে কিছুই শুনেন নাই। ভ্রাতুষ্পুত্র আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, জ্যেঠা মহাশয় ?" শুনিয়া বৃদ্ধ মনে মনে ভাবিল, "হয়েছে ! ছেলেটা বুঝি মাগীর চাঁদপানা মুখখানা দেখে ভুলে গেল!" কৃষ্ণকান্ত আবার আনুপূর্বিক গত রাত্রের বৃত্তান্ত গোবিন্দলালকে শুনাইলেন। সমাপন করিয়া বলিলেন, "এ সেই হরা পাজির কারসাজি। বোধ হইতেছে, এ মাগী তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া, আসল উইল চুরি করিবার জন্য আসিয়াছিল। তারপর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।"

গো। রোহিণী কি বলে ?

কৃ। ও আর বলিবে কি ? বলে, তা নয়।

গোবিন্দলাল রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা নয় ত তবে কি রোহিণী ?'

রোহিণী মুখ না তুলিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, "আমি আপনাদের হাতে পড়িয়াছি, যাহা করিবার হয় করুন। আমি আর কিছু বলিব না।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেখিলে বদ্‌জাতি ?"

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, এ পৃথিবীতে সকলেই বদ্‌জাত নহে। ইহার ভিতর বদ্‌জাতি ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে। প্রকাশ্যে বলিলেন, "ইহার প্রতি কি হুকুম দিয়াছেন ? একে কি থানায় পাঠাইবেন ?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারি কি। আমিই থানা, আমিই মেজেস্টর, আমিই জজ। বিশেষ এই ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে জেলে দিয়া আমার কি পৌরুষ বাড়িবে ?"

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি করিবেন ?"

কৃ। ইহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, কুলার বাতাস দিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আমার এলাকায় আর না আসিতে পারে।

গোবিন্দলাল আবার রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল, রোহিণী ?"

রোহিণী বলিল, "ক্ষতি কি !"

গোবিন্দলাল বিস্মিত হইলেন। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন, "একটা নিবেদন আছে।"

কৃ। কি ?

গো। ইহাকে একবার ছাড়িয়া দিন। আমি জামিন হইতেছি—বেলা দশটার সময় আনিয়া দিব।

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "বুঝি যা ভেবেছি, তাই। বাবাজির কিছু গরজ দেখ্‌ছি।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "কোথায় যাইবে ? কেন ছাড়িব ?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আসল কথা কি, জানা নিতান্ত কর্তব্য। এত লোকের সাক্ষাতে আসল কথা এ প্রকাশ করিবে না। ইহাকে একবার অন্দরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিব।"

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "ওর গোষ্ঠীর মুণ্ডু করবে। একালের ছেলেপুলে বড় বেহায়া হয়ে উঠেছে। রহ ছুঁচো ! আমিও তোর উপর এক চাল চালিব।" এই ভাবিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "বেশ ত।" বলিয়া কৃষ্ণকান্ত একজন নগদীকে

বলিলেন, "ও রে! একে সঙ্গে করিয়া, একজন চাকরাণী দিয়া মেজ বৌমার কাছে পাঠিয়ে দে ত, দেখিস, যেন পালায় না।"

নন্দী রোহিণীকে লইয়া গেল। গোবিন্দলাল প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "দুর্গা! দুর্গা! ছেলেগুলো হলো কি?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন যে, ভ্রমর রোহিণীকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাল কথা বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে এ দায় সম্বন্ধে ভাল কথা বলিলেও রো হণীর কান্না আসে, এ জন্য তাহাও বলিতে পারিতেছে না। গোবিন্দলাল আসিলেন দেখিয়া ভ্রমর যেন দায় হইতে উদ্ধার পাইল। শীঘ্রগতি দূরে গিয়া গোবিন্দলালকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। গোবিন্দলাল কাছে গেলেন। ভ্রমর গোবিন্দলালকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোহিণী এখানে কেন?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি গোপনে উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। তাহার পর উহার কপালে যা থাকে, হবে।"

ভ্র। কি জিজ্ঞাসা করিবে?

গো। উহার মনের কথা। আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয়, আড়াল হইতে শুনিও।

ভোমরা বড় অপ্রতিভ হইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া, ছুটিয়া সে অঞ্চল হইতে পলাইল। একেবারে পাকশালায় উপস্থিত হইয়া পিছন হইতে পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "রাঁধুনি ঠাকুরঝি! রাঁধতে রাঁধতে একটি রূপকথা বল না।"

এ দিকে গোবিন্দলাল রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বৃত্তান্ত আমাকে সকল বিশেষ করিয়া বলিবে কি?" বলিবার জন্য রোহিণীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—কিন্তু যে জাতি জীয়ন্তে জলন্ত চিতায় আরোহণ করিত, রোহিণীও সেই জাতীয়া—আর্যকন্যা। বলিল, "কর্তার কাছে সবিশেষ শুনিয়াছেন ত!"

গো। কর্তা বলেন, তুমি জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে। তাই কি ?

রো। তা নয়।

গো। তবে কি ?

রো। বলিয়া কি হইবে ?

গো। তোমার ভাল হইতে পারে।

রো। আপনি বিশ্বাস করিলে ত ?

গো। বিশ্বাসযোগ্য কথা হইলে কেন বিশ্বাস করিব না ?

রো। বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে।

গো। আমার কাছে কি বিশ্বাসযোগ্য, কি অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমি জানি, তুমি জানিবে কি প্রকারে ? আমি অবিশ্বাসযোগ্য কথাতেও কখনও কখনও বিশ্বাস করি।

রোহিণী মনে মনে বলিল, "নহিলে আমি তোমার জন্যে মরিতে বসিব কেন ? যাই হৌক আমি ত মরিতে বসিয়াছি কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব।" প্রকাশ্যে বলিল, "সে আপনার মহিমা। কিন্তু আপনাকে এ দুঃখের কাহিনী বলিয়াই বা কি হইবে ?"

গো। যদি আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারি।

রো। কি উপকার করিবেন ?

গোবিন্দলাল ভাবিলেন, "ইহার যোড়া নাই। যাই হউক, এ কাতরা—ইহাকে সহজে পরিত্যাগ করা নহে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "যদি পারি, কর্তাকে অনুরোধ করিব। তিনি তোমায় ত্যাগ করিবেন।"

রো। আর যদি আপনি অনুরোধ না করেন, তবে তিনি আমার কি করিবেন ?

গো। শুনিয়াছ ত ?

রো। আমার মাথা মুড়াইবেন, ঘোল ঢালিয়া দিবেন, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবেন। ইহার ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না—এ কলঙ্কের পর, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেই আমার উপকার। আমাকে তাড়াইয়া না দিলে, আমি আপনিই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব। আর এ দেশে মুখ দেখাইব কি প্রকারে ? ঘোল ঢালা বড় গুরুতর দণ্ড নয়, ধুইলেই ঘোল যাইবে। বাকি এই কেশ—

এই বলিয়া রোহিণী একবার আপনার তরঙ্গক্ষুব্ধ কৃষ্ণতড়াগতুল্য কেশদাম প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিতে লাগিল, "এই কেশ—আপনি কাঁচি আনিতে বলুন, আমি বৌ ঠাকুরুণের চুলের দড়ি বিনাইবার জন্য ইহার সকলগুলি কাটিয়া দিয়া যাইতেছি।"

গোবিন্দলাল ব্যথিত হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি রোহিণী। কলঙ্কই তোমার দণ্ড। সে দণ্ড হইতে রক্ষা না হইলে, অন্য দণ্ডে তোমার আপত্তি নাই।"

রোহিণী এবার কাঁদিল। হৃদয়মধ্যে গোবিন্দলালকে শত সহস্র ধন্যবাদ করিতে লাগিল। বলিল, "যদি বুঝিয়াছেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, এ কলঙ্কদণ্ড হইতে কি আমায় রক্ষা করিতে পারিবেন?"

গোবিন্দলাল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। আসল কথা শুনিতে পাইলে, বলিতে পারি যে, পারিব কি না।"

রোহিণী, "কি জানিতে চাহেন, জিজ্ঞাসা করুন।"

গো। তুমি যাহা পোড়াইয়াছ, তাহা কি?

রো। জাল উইল।

গো। কোথায় পাইয়াছিলে?

রো। কর্তার ঘরে, দেরাজে।

গো। জাল উইল সেখানে কি প্রকারে আসিল?

রো। আমিই রাখিয়া গিয়াছিলাম। যে দিন আসল উইল লেখাপড়া হয়, সেই দিন রাত্রে আসিয়া আসল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল রাখিয়া গিয়াছিলাম।

গো। কেন, তোমার কি প্রয়োজন?

রো। হরলাল বাবুর অনুরোধে।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "তবে কালি রাত্রে আবার কি করিতে আসিয়াছিলে?"

রো। আসল উইল রাখিয়া, জাল উইল চুরি করিবার জন্য।

গো। কেন? জাল উইলে কি ছিল?

রো। বড় বাবুর বার আনা—আপনার এক পাই।

গো। কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে? আমি ত কোন অনুরোধ করি নাই?

রোহিণী কাঁদিতে লাগিল। বহু কষ্টে রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "না—অনুরোধ করেন নাই—কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই—যাহা ইহজন্মে আর কখনও পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।"

গো। কি সে রোহিণী?

রো। সেই বারুণী পুকুরের তীরে, মনে করুন।

গো। কি রোহিণী?

রো। কি? ইহজন্মে আমি বলিতে পারিব না—কি। আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই—আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম। কিন্তু সে আপনার বাড়ীতে নহে। আপনি আমার অন্য উপকার করিতে পারেন না—কিন্তু এক উপকার করিতে পারেন—একবার ছাড়িয়া দিন, কাঁদিয়া আসি। তার পর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে না হয় আমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবেন।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার আহ্লাদ হইল না—রাগও হইল না—সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল। বলিলেন "রোহিণী, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি। আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন?"

গোবিন্দলাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রোহিণী বলিল "বলুন না?"

গো। তোমাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

রো। কেন?

গো। তুমি আপনিই ত বলিতেছিলে, তুমি এ দেশ ত্যাগ করিতে চাও।

রো। আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন?

গো। তোমায় আমায় আর দেখা শুনা না হয়।

রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল সব বুঝিয়াছেন। মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল—বড় সুখী হইল। তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। আবার তাহার

বাঁচিতে সাধ হইল। আবার তাহার দেশে থাকিতে বাসনা জন্মিল। মনুষ্য বড়ই পরাধীন।

রোহিণী বলিল, "আমি এখনই যাইতে রাজি আছি। কিন্তু কোথায় যাইব?"

গো। কলিকাতায়। সেখানে আমি আমার একজন বন্ধুকে পত্র দিতেছি। তিনি তোমাকে একখানি বাড়ী কিনিয়া দিবেন, তোমার টাকা লাগিবে না।

রো। আমার খুড়ার কি হইবে?

গো। তিনি তোমার সঙ্গে যাইবেন, নহিলে তোমাকে কলিকাতায় যাইতে বলিতাম না।

রো। সেখানে দিনপাত করিব কি প্রকারে?

গো। আমার বন্ধু তোমার খুড়ার একটি চাকরি করিয়া দিবেন।

রো। খুড়া দেশত্যাগে সম্মত হইবেন কেন?

গো। তুমি কি তাঁহাকে এই ব্যাপারের পর সম্মত করিতে পারিবে না?

রো। পারিব। কিন্তু আপনার জ্যেষ্ঠতাতকে সম্মত করিবে কে? তিনি আমাকে ছাড়িবেন কেন?

গো। আমি অনুরোধ করিব।

রো। তাহা হইলে আমার কলঙ্কের উপর কলঙ্ক। আপনারও কিছু কলঙ্ক।

গো। সত্য, তোমার জন্য কর্তার কাছে ভ্রমর অনুরোধ করিবে। তুমি এখন ভ্রমরের অনুসন্ধানে যাও। তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া, আপনি এই বাড়ীতেই থাকিও। ডাকিলে যেন পাই।

রোহিণী সজল নয়নে গোবিন্দলালকে দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের অনুসন্ধানে গেল। এইরূপে কলঙ্কে, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর শ্বশুরকে কোন প্রকার অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইল না—বড় লজ্জা করে, ছি!

অগত্যা গোবিন্দলাল স্বয়ং কৃষ্ণকান্তের কাছে গেলেন। কৃষ্ণকান্ত তখন আহারান্তে পালঙ্কে অর্ধশয়নাবস্থায়, আলবোলার নল হাতে করিয়া—সুষুপ্ত। এক দিকে তাঁহার নাসিকা নাদসুরে গমকে গমকে তানমূর্ছনাদি সহিত নানাবিধ রাগরাগিণীর আলাপ করিতেছে—আর এক দিকে, তাঁহার মন অহিফেনপ্রসাদাৎ ত্রিভুবনগামী অশ্বে আরূঢ় হইয়া নানা স্থান পর্যটন করিতেছে। রোহিণীর চাঁদপানা মুখখানা বুড়ারও মনের ভিতর ঢুকিয়াছিল বোধ হয়,— চাঁদ কোথায় উদয় না হয়?—নহিলে বুড়া আফিঙ্গের ঝোঁকে ইন্দ্রাণীর স্কন্ধে সে মুখ বসাইবে কেন? কৃষ্ণকান্ত দেখিতেছেন যে, রোহিণী হঠাৎ ইন্দ্রের শচী হইয়া, মহাদেবের গোহাল হইতে ষাঁড় চুরি করিতে গিয়াছে। নন্দী ত্রিশূল হস্তে ষাঁড়ের জাব দিতে গিয়া তাহাকে ধরিয়াছে। দেখিতেছেন, নন্দী রোহিণীর আলুলায়িত কুন্তলদাম ধরিয়া টানাটানি লাগাইয়াছে, এবং ষড়াননের ময়ূর, সন্ধান পাইয়া, তাহার সেই আগুল্‌ফ-বিলম্বিত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছকে স্ফীতফণা ফণিশ্রেণী ভ্রমে গিলিতে গিয়াছে—এমত সময়ে স্বয়ং ষড়ানন ময়ূরের দৌরাত্ম্য দেখিয়া, নালিশ করিবার জন্য মহাদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া ডাকিতেছেন, জ্যেঠা মহাশয়!"

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, "কার্তিক মহাদেবকে কি সম্পর্কে জ্যাঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিতেছেন?" এমত সময় কার্তিক আবার ডাকিলেন "জ্যাঠা মহাশয়!" কৃষ্ণকান্ত বড় বিরক্ত হইয়া, কার্তিকের কান মলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে হস্ত উত্তোলন করিলেন। অমনি কৃষ্ণকান্তের হস্তস্থিত আলবোলার নল হাত হইতে খসিয়া ঝনাৎ করিয়া পানের বাটার উপর পড়িয়া গেল, পানের বাটা ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ করিয়া পিকদানির উপর পড়িয়া গেল, এবং নল, বাটা, পিক্‌দানি সকলেই একত্রে সহগমন করিয়া ভূতলশায়ী হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি নয়নোন্মীলন করিয়া দেখেন যে, কার্তিকেয় যথার্থই উপস্থিত। মূর্তিমান স্কন্দবীরের ন্যায়, গোবিন্দলাল তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—ডাকিতেছেন, "জ্যেঠা মহাশয়!" কৃষ্ণকান্ত শশব্যস্তে উঠিয়া

বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা গোবিন্দলাল ?" গোবিন্দলালকে বুড়া বড় ভালবাসিত।

গোবিন্দলালও কিছু অপ্রতিভ হইলেন—বলিলেন, "আপনি নিদ্রা যান—আমি এমন কিছু কাজে আসি নাই।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল পিকদানিটি উঠাইয়া সোজা করিয়া রাখিয়া পানবাটা উঠাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, নলটি কৃষ্ণকান্তের হাতে দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত শক্ত বুড়া—সহজে ভুলে না—মনে মনে বলিতে লাগিল, "কিছু না, এ ছুঁচো আবার সেই চাঁদমুখো মাগীর কথা বলিতে আসিয়াছে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "না। আমার ঘুম হইয়াছে—আর ঘুমাইব না।"

গোবিন্দলাল একটু গোলে পড়িলেন। রোহিণীর কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে বলিতে প্রাতে তাঁহার কোন লজ্জা করে নাই—এখন একটু লজ্জা করিতে লাগিল—কথা বলি বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না। রোহিণীর সঙ্গে বারুণী পুকুরের কথা হইয়াছিল বলিয়া কি এখন লজ্জা।

বুড়া রঙ্গ দেখিতে লাগিল গোবিন্দলাল কোন কথা পাড়িতেছে না দেখিয়া আপনি জমিদারির কথা পাড়িল—জমিদারির কথার পর সাংসারিক কথা, সাংসারিক কথার পর মোকদ্দমার কথা, তথাপি রোহিণীর দিক দিয়াও গেল না। গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা কিছুতেই পাড়িতে পারিলেন না। কৃষ্ণকান্ত মনে মনে ভারি হাসিতে লাগিলেন। বুড়া বড় দুষ্ট।

অগত্যা গোবিন্দলাল ফিরিয়া যাইতেছিলেন,—তখন কৃষ্ণকান্ত প্রিয়তম ভ্রাতৃপুত্রকে ডাকিয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকাল বেলা যে মাগীকে তুমি জামিন হইয়া লইয়া গিয়াছিলে, সে মাগী কিছু স্বীকার করিয়াছে ?"

তখন গোবিন্দলাল পথ পাইয়া যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, সংক্ষেপে বলিলেন। বারুণী পুষ্করিণী ঘটিত কথাগুলি গোপন করিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "এখন তাহার প্রতি কিরূপ করা তোমার অভিপ্রায় ?"

গোবিন্দলাল লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনার যে অভিপ্রায়, আমাদিগেরও সে অভিপ্রায়।"

কৃষ্ণকান্ত মনে মনে হাসিয়া, মুখে কিছুমাত্র হাসির লক্ষণ না দেখাইয়া বলিলেন, "আমি উহার কথায় বিশ্বাস করি না। উহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, দেশের বাহির করিয়া দাও—কি বল ?"

গোবিন্দলাল চুপ করিয়া রহিলেন। তখন দুষ্ট বুড়া বলিল, "আর তোমরা যদি এমনই বিবেচনা কর যে, উহার দোষ নাই—তবে ছাড়িয়া দাও।"

গোবিন্দলাল তখন নিশ্বাস ছাড়িয়া, বুড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রোহিণী গোবিন্দলালের অনুমতিক্রমে খুড়ার সঙ্গে বিদেশ যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে আসিল। খুড়াকে কিছু না বলিয়া, ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া, রোহিণী কাঁদিতে বসিল।

"এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না—না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আমি কলিকাতায় গেলে, গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না? আমি যাইব না। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার শ্মশান, এখানে আমি পুড়িয়া মরিব। শ্মশানে মরিতে পায় না, এমন কপালও আছে! আমি যদি এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া না যাই, ত আমার কে কি করিতে পারে? কৃষ্ণকান্ত রায় আমার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবে? আমি আবার আসিব। গোবিন্দলাল রাগ করিবে? করে করুক—তবু আমি তাহাকে দেখিব। আমার চক্ষু ত কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না—কোথাও যাব না। যাই ত যমের বাড়ী যাব। আর কোথাও না।"

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, কালামুখী রোহিণী উঠিয়া দ্বার খুলিয়া আবার—"পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ"—সেই গোবিন্দলালের কাছে চলিল। মনে মনে বলিতে বলিতে চলিল,—"হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়! আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি তাহাকে যত বার দেখিব, তত বার—আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত সুখ। আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু?—রাখিব কি প্রভু?—হে দেবতা! হে দুর্গা—

হে কালি—হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও—আমার প্রাণ স্থির কর—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পা'র না।"

তবু সেই স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়—থামিল না। কখনও ভাবিল, গরল খাই, কখনও ভাবিল, গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলি, কখনও ভাবিল, পলাইয়া যাই; কখনও ভাবিল, বারুণীতে ডুবে মরি, কখনও ভাবিল, ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই। রোহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে গোবিন্দলালের কাছে পুনর্বার উপস্থিত হইল।

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন? কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল ত?"

রো। না।

গো। সে কি? এইমাত্র আমার কাছে স্বীকার করিয়াছিলে?

রো। যাইতে পারিব না।

গো। বলিতে পারি না। জোর করিবার আমার কোনই অধিকার নাই—কিন্তু গেলে ভাল হইত।

রো। কিসে ভাল হইত?

গোবিন্দলাল অধোবদন হইলেন। স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলিবার তিনি কে?

রোহিণী তখন চক্ষের জল লুকাইয়া মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। গোবিন্দলাল নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখন ভোমরা নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "ভাব্‌ছ কি?"

গো। বল দেখি?

ভ্র। আমার কালো রূপ।

গো। ইঃ—

ভোমরা ঘোরতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল, "সে কি? আমায় ভাবছ না?" আমি ছাড়া, পৃথিবীতে তোমার অন্য চিন্তা আছে?"

গো। আছে না ত কি? সর্বে সর্বময়ী আর কি! আমি অন্য মানুষ ভাব্‌ছি।

ভ্রমর তখন গোবিন্দলালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুখচুম্বন করিয়া, আদরে

গলিয়া গিয়া, আধো আধো, মৃদু মৃদু হাসিমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ত—কাকে ভাব্‌ছ বল না ?"

গো। কি হবে তোমায় বলিয়া ?

ভ্র। বল না।

গো। তুমি রাগ করিবে।

ভ্র। করি কর্‌বো—বল না।

গো যাও, দেখ গিয়ে সকলের খাওয়া হলো কি না।

ভ্র। দেখ্‌বো এখন—বল না কে মানুষ ?

গো। সিয়াকুল কাঁটা ! রোহিণীকে ভাব্‌ছিলাম।

ভ্র। কেন রোহিণীকে ভাব্‌ছিলে ?

গো। তা কি জানি ?

ভ্র। জান—বল না।

গো। মানুষ কি মানুষকে ভাবে না ?

ভ্র। না। যে যাকে ভালোবাসে, সে তাকেই ভাবে, আমি তোমাকে—তুমি আমাকে ভাব।

গো। তবে আমি রোহিণীকে ভালবাসি।

ভ্র। মিছে কথা—তুমি আমাকে ভালবাস—আর কাকেও তোমার ভালবাসতে নাই—কেন রোহিণীকে ভাবছিলে: বল না ?

গো বিধবাকে মাছ খাইতে আছে ?

ভ্র। না।

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, তবু তারিণীর মা মাছ খায় কেন ?

ভ্র। তার পোড়ার মুখ, যা কর্‌তে নাই, তাই করে।

গো। আমারও পোড়ার মুখ, যা করতে নাই, তাই করি। রোহিণীকে ভালবাসি।

ধা করিয়া গোবিন্দলালের গালে ভোমরা এক ঠোনা মারিল। বড় রাগ করিয়া বলিল, "আমি শ্রীমতী ভোমরা দাসী—আমার সাক্ষাতে মিছে কথা ?"

গোবিন্দলাল হারি মানিল। ভ্রমরের স্কন্ধে আরোপিত করিয়া প্রফুল্ল-নীলোৎপলদলতুল্য মধুরিমাময় তাহার মুখমণ্ডল স্বকরপল্লবে গ্রহণ করিয়া, মৃদু

মৃদু অথচ গম্ভীর, কাতর কণ্ঠে গোবিন্দলাল বলিল, "মিছে কথাই ভোমরা। আমি রোহিণীকে ভালবাসি না। রোহিণী আমায় ভালবাসে।"

তীব্র বেগে গোবিন্দলালের হাত হইতে মুখমণ্ডল মুক্ত করিয়া, ভোমরা দূরে গিয়া দাঁড়াইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল,—"আবাগী—পোড়ার-মুখী—বাঁদরী মরুক। মরুক। মরুক। মরুক!"

গোবিন্দলাল হাসিয়া বলিলেন, "এখনই এত গালি কেন? তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক এখনও ত কেড়ে নেয় নি।"

ভোমরা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দূর, তা কেন—তা কি পারে—তা মাগী তোমার সাক্ষাতে বলিল কেন?"

গো। ঠিক ভোমরা—বলা তাহার উচিত ছিল না—তাই ভাবিতেছিলাম। আমি তাহাকে বাস উঠাইয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম—খরচ পর্যন্ত দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম।

ভো। তার পর?

গো। তার পর, সে রাজি হইল না।

ভো। ভাল, আমি তাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি?

গো। পার, কিন্তু আমি পরামর্শটা শুনিব

ভো। শোন।

এই বলিয়া ভোমরা "ক্ষীরি!" করিয়া এক জন চাকরাণীকে ডাকিল।

তখন ক্ষীরোদা—ওরফে ক্ষীরোদমণি—ওরফে ক্ষীরাব্ধিতনয়া—ওরফে শুধু ক্ষীরি আসিয়া দাঁড়াইল—মোটাসোটা গাটাগোটা—মল পায়ে—গোট পরা—হাসি চাহনিতে ভরা ভরা। ভোমরা বলিল, "ক্ষীরি—রোহিণী পোড়ামুখীর কাছে এখনই একবার যাইতে পারবি?"

ক্ষীরি বলিল, "পারব না কেন? কি বল্‌তে হবে?"

ভোমরা বলিল, "আমার নাম করিয়া বলিয়া আয় যে, তিনি বল্লেন, তুমি মর।"

"এই? যাই।" বলিয়া ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি—মল বাজাইয়া চলিল। গমনকালে ভোমরা বলিয়া দিল, "কি বলে, আমায় বলিয়া যাস্‌।"

"আচ্ছা।" বলিয়া ক্ষীরোদা গেল। অল্পকালমধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বলিয়া আসিয়াছি।"

ভো। সে কি বলিল?

ক্ষীরি। সে বলিল, উপায় বলিয়া দিতে বলিও।

ভো। তবে আবার যা। বলিয়া আয় যে—বারুণী পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা কলসী গলায় দিয়ে—বুঝেছিস্?

ক্ষীরি। আচ্ছা।

ক্ষীরি আবার গেল। আবার আসিল। ভোমরা জিজ্ঞাসা করিল, "বারুণী পুকুরের কথা বলেছিস?'

ক্ষীরি। বলিয়াছি।

ভো। সে কি বলিল?

ক্ষীরি। বলিল যে "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ছি ভোমরা!"

ভোমরা বলিল, "ভাবিও না। সে মরিবে না।' যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে—সে কি মরিতে পারে?"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দৈনিক কার্য সমস্ত সমাপ্ত করিয়া, প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে গোবিন্দলাল দিনান্তে বারুণীর তীরবর্তী পুষ্পোদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দলালেব পুষ্পোদ্যান-ভ্রমণ একটি প্রধান সুখ। সকল বৃক্ষের তলায় দুই চারি বার বেড়াইতেন। কিন্তু আমরা সকল বৃক্ষের কথা এখন বলিব না। বারুণীর কূলে, উদ্যানমধ্যে, এক উচ্চ প্রস্তরবেদিকা ছিল, বেদিকামধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তরখোদিত স্ত্রী প্রতিমূর্তি—স্ত্রীমূর্তি অর্ধাবৃতা, বিনতলোচনা—একটি ঘট হইতে আপন চরণদ্বয়ে যেন জল ঢালিতেছে—তাহার চারি পার্শ্বে বেদিকার উপরে উজ্জলবর্ণরঞ্জিত মৃন্ময় আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপুষ্প বৃক্ষ—জিরানিয়ম, ভর্বিনা, ইউফর্বিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ—নীচে, সেই বেদিকা বেষ্টন করিয়া কামিনী, যূথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি দেশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন আমোদিত করিতেছে—তাহারই পরে বহুবিধ উজ্জল নীল পীত রক্ত শ্বেত নানা

বর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরঞ্জনকারী পাতার গাছের শ্রেণী। সেইখানে গোবিন্দলাল বসিতে ভালবাসিতেন। জ্যোৎস্না রাত্রে কখনও কখনও ভ্রমরকে উদ্যানভ্রমণে আনিয়া সেইখানে বসাইতেন। ভ্রমর পাষাণময়ী স্ত্রীমূর্তি অর্ধাবৃত দেখিয়া তাহাকে কালামুখী বলিয়া গালি দিত—কখনও কখনও আপনি অঞ্চল দিয়া তাহার অঙ্গ আবৃত করিয়া দিত—কখনও কখনও গৃহ হইতে উত্তম বস্ত্র সঙ্গে আনিয়া তাহাকে পরাইয়া দিয়া যাইত—কখনও কখনও তাহার হস্তস্থিত ঘট লইয়া টানাটানি বাধাইত।

সেইখানে আজি গোবিন্দলাল সন্ধ্যাকালে বসিয়া, দর্পণানুরূপ বারুণীর জলশোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, সেই পুষ্করিণীর সুপরিসর প্রস্তরনির্মিত সোপান-পরম্পরায় রোহিণী কলসীকক্ষে অবরোহণ করিতেছে। সব না হইলে চলে, জল না হইলে চলে না। এ দুঃখের দিনেও রোহিণী জল আনিতে আসিয়াছে। রোহিণীর জলে নামিয়া গাত্র মার্জনা করিবার সম্ভাবনা—দৃষ্টিপথে তাঁহার থাকা অকর্তব্য বলিয়া গোবিন্দলাল সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ গোবিন্দলাল এদিক ওদিক বেড়াইলেন। শেষে মনে করিলেন, এতক্ষণ রোহিণী উঠিয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া আবার সেই বেদিকাতলে জলনিষেকনিরতা পাষাণ-সুন্দরীর পদপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন। আবার সেই বারুণীর শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, রোহিণী বা কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ কোথাও কেহ নাই। কেহ কোথাও নাই—কিন্তু সে জলোপরে একটি কলসী ভাসিতেছে।

কার কলসী? হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হইল—কেহ জল লইতে আসিয়া ডুবিয়া যায় নাই ত? রোহিণীই এই মাত্র জল লইতে আসিয়াছিল—তখন অকস্মাৎ পূর্বাহ্নের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, ভ্রমর রোহিণীকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, বারুণী পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা—কলসী গলায় বেঁধে। মনে পড়িল যে, রোহিণী প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ পুষ্করিণীর ঘাটে আসিলেন। সর্বশেষ সোপানে দাঁড়াইয়া পুষ্করিণীর সর্বত্র দেখিতে লাগিলেন। জল কাচতুল্য স্বচ্ছ। ঘাটের নীচে জলতলস্থ ভূমি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। দেখিলেন, স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া ডুব দিয়া রোহিণীকে উঠাইয়া, সোপান উপরি শায়িত করিলেন। দেখিলেন, রোহিণী জীবিত আছে কি না সন্দেহ; সে সংজ্ঞাহীন; নিশ্বাসপ্রশ্বাসরহিত।

উদ্যান হইতে গোবিন্দলাল একজন মালীকে ডাকিলেন। মালীর সাহায্যে রোহিণীকে বহন করিয়া উদ্যানস্থ প্রমোদগৃহে শুশ্রূষার জন্য লইয়া গেলেন। জীবনে হউক, মরণে হউক, রোহিণী শেষ গোবিন্দলালের গৃহে প্রবেশ করিল। ভ্রমর ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক কখনও সে উদ্যানগৃহে প্রবেশ করে নাই।

বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত, সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশালদীর্ঘবিলম্বিত ঘোরকৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু—তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘ যেন জলবৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত; কিন্তু সেই মুদ্রিত পক্ষ্মের উপরে ভ্রূযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণশোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট—স্থির, বিস্তারিত, লজ্জাভয়-বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট—গণ্ড এখনও উজ্জ্বল—অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলীপুষ্পের লজ্জাস্থল। গোবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন, "মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?" এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল—এ কথা মনে করিয়া তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল।

যদি রোহিণীর জীবন থাকে, রোহিণীকে বাঁচাইতে হইবে। জলমগ্নকে কি প্রকারে বাঁচাইতে হয়, তাহা গোবিন্দলাল জানিতেন। উদরস্থ জল সহজেই বাহির করান যায়। দুই চারি বার রোহিণীকে উঠাইয়া, বসাইয়া, পাশ ফিরাইয়া ঘুরাইয়া, জল উদ্গীর্ণ করাইলেন। কিন্তু তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিল না। সেইটি কঠিন কাজ।

গোবিন্দলাল জানিতেন, মুমূর্ষুর বাহুদ্বয় ধরিয়া উর্ধ্বোত্তলন করিলে, অন্তরস্থ বায়ুকোষ স্ফীত হয়, সেই সময়ে রোগীর মুখে ফুৎকার দিতে হয়। পরে উত্তোলিত বাহুদ্বয় ধীরে ধীরে নামাইতে হয়। নামাইলে বায়ুকোষ সঙ্কুচিত হয়; তখন সেই ফুৎকার-প্রেরিত বায়ু আপনিই নির্গত হইয়া আইসে। ইহাতে কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে

বায়ুকোষের কার্য স্বতঃ পুনরাগত হইতে থাকে, কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত করাইতে করাইতে সহজ নিশ্বাস প্রশ্বাস আপনি উপস্থিত হয়। রোহিণীকে তাই করিতে হইবে। দুই হাতে দুইটি বাহু তুলিয়া ধরিয়া তাহার মুখে ফুৎকার দিতে হইবে, তাহার সেই পক্কবিম্বনিন্দিত, এখনও সুধাপরিপূর্ণ, মদনমদোন্মাদহলাহল-কলসীতুল্য রাঙ্গা রাঙ্গা মধুর অধরে অধর দিয়া ফুৎকার দিতে হইবে! কি সর্বনাশ! কে দিবে?

গোবিন্দলালের এক সহায়, উড়িয়া মালী। বাগানের অন্য চাকরেরা ইতিপূর্বেই গৃহে গিয়াছিল। তিনি মালীকে বলিলেন, "আমি ইহার হাত দুইটি তুলে ধরি, তুই ইহার মুখে ফুঁ দে দেখি।"

মুখে ফুঁ! সর্বনাশ! ঐ রাঙ্গা রাঙ্গা সুধামাখা অধরে মালীর মুখের ফুঁ—"সেটা পারিব না মুনিমা!"

মালীকে মুনিব যদি শালগ্রামশিলা চর্বণ করিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে করিলে করিতে পারিত, কিন্তু সেই চাঁদমুখের রাঙ্গা অধরে—সেই কটকি মুখের ফুঁ। মালী ঘামিতে আরম্ভ করিল স্পষ্ট বলিল, "মু সে পারিব না অবধড়।"

মালী ঠিক বলিয়াছিল। মালা সেই দেবদুর্লভ ওষ্ঠাধরে যদি একবার মুখ দিয়া ফুঁ দিত, তারপর যদি রোহিণী বাঁচিয়া উঠিয়া আবার সেই ঠোঁট ফুলাইয়া কলসীকক্ষে জল লইয়া, মালীর পানে চাহিয়া ঘরে যাইত—তবে আর তাহাকে ফুলবাগানের কাজ করিতে হইত না। সে খোন্তা, খুরুপো, নিড়িন, কাঁচি, কোদালী, বারুণীর জলে ফেলিয়া দিয়া, এক দৌড়ে ভদরক পানে ছুটিত সন্দেহ নাই—বোধ হয় সুবর্ণরেখার নীল জলে ডুবিয়া মরিত। মালী অত ভাবিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ফুঁ দিতে রাজি হইল না।

অগত্যা গোবিন্দলাল তাহাকে বলিলেন, "তবে তুই এইরূপ ইহার হাত দুইটি ধীরে ধীরে উঠাইতে থাক্—আমি ফুঁ দিই। তাহার পর ধীরে ধীরে হাত নামাইবি।" মালী তাহা স্বীকার করিল। সে হাত দুইটি ধীরে ধীরে উঠাইল—গোবিন্দলাল তখন সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া—রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন।

সেই সময়ে ভ্রমর একটা লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।

মালী রোহিণীর বাহুদ্বয় নামাইল। আবার উঠাইল। আবার গোবিন্দলাল ফুৎকার দিলেন। আবার সেইরূপ হইল। আবার সেইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিলেন। দুই তিন ঘণ্টা এইরূপ করিলেন। রোহিণীর নিশ্বাস বহিল। রোহিণী বাঁচিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রোহিণীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিলে, গোবিন্দলাল তাহাকে ঔষধ পান করাইলেন। ঔষধ বলকারক—ক্রমে রোহিণীর বলসঞ্চার হইতে লাগিল। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সজ্জিত রম্য গৃহমধ্যে মন্দ মন্দ শীতল পবন বাতায়নপথে পরিভ্রমণ করিতেছে—এক দিকে স্ফাটিকাধারে স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বলিতেছে—আর এক দিকে হৃদয়াধারের জীবনপ্রদীপ জ্বলিতেছে। এদিকে রোহিণী গোবিন্দলাল-হস্ত-প্রদত্ত মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করিয়া, মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল—আর এক দিকে তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী কথা শ্রবণপথে পান করিয়া মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল। প্রথমে নিশ্বাস, পরে চৈতন্য, পরে স্মৃতি, শেষে বাক্য স্ফুরিত হইতে লাগিল। রোহিণী বলিল, "আমি মরিয়াছিলাম, আমাকে কে বাঁচাইল?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যেই বাঁচাক, তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ এই যথেষ্ট।"

রোহিণী বলিল, "আমাকে কেন বাঁচাইলেন? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে, মরণেও আপনি প্রতিবাদী?"

গো। তুমি মরিবে কেন?

রো। মরিবারও কি আমার অধিকার নাই?

গো। পাপে কাহারও অধিকার নাই। আত্মহত্যা পাপ।

রো। আমি পাপ পুণ্য জানি না—আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি পাপ পুণ্য মানি না—কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে? আমি মরিব।

এবার না হয়, তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম বলিয়া তুমি রক্ষা করিয়াছ। ফিরে বার, যাহাতে তোমার চক্ষে না পড়ি, সে যত্ন করিব।

গোবিন্দলাল বড় কাতর হইলেন, বলিলেন, "তুমি কেন মরিবে?"

"চিরকাল ধরিয়া দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা, একেবারে মরা ভাল।"

গো। কিসের এত যন্ত্রণা?

রো। রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।

গোবিন্দলাল তখন বলিলেন যে, "আর এ সব কথায় কাজ নাই—চল তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।"

রোহিণী বলিল, "না আমি একাই যাইব।"

গোবিন্দলাল বুঝিলেন, আপত্তিটা কি। গোবিন্দলাল আর কিছু বলিলেন না। রোহিণী একাই গেল।

তখন গোবিন্দলাল, সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর!—তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইব?—আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "আজি এত রাত্রি পর্যন্ত বাগানে ছিলে কেন?"

গো। কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আর কখনও কি থাকি না?

ভ্র। থাক—কিন্তু আজি তোমার মুখ দেখিয়া তোমার কথার আওয়াজে বোধ হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে।

গো। কি হইয়াছে ?

ভ্র। কি হইয়াছে, তাহা তুমি না বলিলে আমি কি প্রকারে বলিব ? মি কি সেখানে ছিলাম ?

গো। কেন, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পার না ?

ভ্র। তামাসা রাখ। কথাটা ভাল কথা নহে, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে রিতেছি—আমায় বল, আমার প্রাণ বড় কাতর হইতেছে।

বলিতে বলিতে ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গোবিন্দলাল রের চক্ষের জল মুছাইয়া, আদর করিয়া বলিলেন, "আর একদিন বলিব ভ্রমর আজ নহে।"

ভ্র। আজ নহে কেন ?

গো। তুমি এখন বালিকা, সে কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।

ভ্র। কাল কি আমি বুড়া হইব ?

গো। কালও বলিব না—দুই বৎসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাসা রও না, ভ্রমর !

ভ্রমর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তবে তাই—দুই বৎসর পরেই লও—আমার শুনিবার বড় সাধ ছিল--কিন্তু তুমি যদি বলিলে না—তবে মি শুনিব কি প্রকারে ? আমার বড় মন কেমন কেমন করিতেছে।"

কেমন একটা বড় ভারি দুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে গিল। যেমন বসন্তের আকাশ বড় সুন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জ্বল,—কোথাও ছু নাই—অকস্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারিদিক্ আঁধার করিয়া ফেলে— মরার বোধ হইল, যেন তার বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ উঠিয়া, সা চারি দিক আঁধার করিয়া ফেলিল। ভ্রমরের চক্ষে জল আসিতে লাগিল। র মনে করিল, আমি অকারণে কাঁদিতেছি—আমি বড় দুষ্ট হইয়াছি—আমার মী রাগ করিবেন। অতএব ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গিয়া, ণে বসিয়া পা ছড়াইয়া অন্নদামঙ্গল পড়িতে বসিল। কি মাথা মুণ্ডু পড়িল হা বলিতে পারি না, কিন্তু বুকের ভিতর হইতে সে কালো মেঘখানা কিছুতেই মল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল বাবু জ্যেঠা মহাশয়ের সঙ্গে বৈষয়িক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। কথোপকথনচ্ছলে কোন্ জমিদারীর কিরূপ অবস্থা, তাহা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের বিষয়ানুরাগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা যদি একটু একটু দেখ শুন, তবে বড় ভাল হয়। দেখ, আমি আর কয় দিন? তোমরা এখন হইতে সব দেখিয়া শুনিয়া না রাখিলে, আমি মরিলে, কিছু বুঝিতে পারিবে না! দেখ, আমি বুড়ো হইয়াছি, আর কোথাও যাইতে পারি না। কিন্তু বিনা তদারকে মহাল সব খারাব হইয়া উঠিল।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আপনি পাঠাইলে আমি যাইতে পারি। আমারও ইচ্ছা, সকল মহালগুলি এক একবার দেখিয়া আসি।"

কৃষ্ণকান্ত আহ্লাদিত হইলেন। বলিলেন, "আমার তাহাতে বড় আহ্লাদ। আপাততঃ বন্দরখালিতে কিছু গোলমাল উপস্থিত। নায়েব বলিতেছে যে, প্রজারা ধর্মঘট করিয়াছে, টাকা দেয় না, প্রজারা বলে, আমরা খাজনা দিতেছি, নায়েব উশুল দেয় না। তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে বল, আমি তোমাকে সেখানে পাঠাইবার উদ্যোগ করি।"

গোবিন্দলাল সম্মত হইলেন। তিনি এই জন্যই কৃষ্ণকান্তের কাছে আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই পূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গতুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চল ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়া মনে মনে শপথ করিয়া স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিষয়কর্মে মনোভিনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিব—স্থানান্তরে গেলে নিশ্চিত ভুলিতে পারিব। এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া তিনি পিতৃব্যের কাছে গিয়া বিষয়ালোচনা করিতে বসিয়াছিলেন। বন্দরখালির কথা শুনিয়া আগ্রহ সহকারে তথায় গমনে সম্মত হইলেন।

ভ্রমর শুনিল, মেজবাবু দেহাত যাইবেন। ভ্রমর ধরিল, আমিও যাইব। কাঁদাকাটি হাঁটাহাঁটি পড়িয়া গেল। কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না। তরণী সজ্জিত করিয়া ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমরের মুখচুম্বন করিয়া, গোবিন্দলাল দশ দিনের পথ বন্দরখালি যাত্রা করিলেন।

ভ্রমর আগে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিল। তারপর উঠিয়া অন্নদামঙ্গল ছিঁড়িয়া ফেলিল, খাঁচার পাখী উড়াইয়া দিল, পুতুল সকল জলে ফেলিয়া দিল টবের ফুলগাছ সকল কাটিয়া ফেলিল, আহারের অন্ন পাচিকার গায়ে ছড়াইয়া দিল, চাকরাণীর খোপা ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিল—ননদের সঙ্গে কোন্দল করিল—এইরূপ নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া শয়ন করিল। শুইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে অনুকূল পবনে চালিত হইয়া গোবিন্দলালের তরণী তরঙ্গিণী-তরঙ্গ বিভিন্ন করিয়া চলিল।

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

কিছু ভালো লাগে না—ভ্রমর একা। ভ্রমর শয্যা তুলিয়া ফেলিল—বড় নরম—খাটের পাখা খুলিয়া ফেলিল—বাতাস বড় গরম; চাকরাণীদিগকে ফুল আনিতে বারণ করিল—ফুলে বড় পোকা, তাসখেলা বন্ধ করিল—সহচরীগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাস খেলিলে শাশুড়ী রাগ করেন। সূচ, সুতা, উল, পেটার্ণ,—সব একে একে পাড়ার মেয়েদের বিলাইয়া দিল—জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, বড় চোখ জ্বালা করে। বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে গৃহ পরিপূর্ণ। মাথার চুলের সঙ্গে চিরুণীর সম্পর্ক রহিত হইয়া আসিয়াছিল—উলুবনের খড়ের মত চুল বাতাসে দুলিত, জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রমর হাসিয়া, চুলগুলি হাত দিয়া টানিয়া খোপায় গুঁজিত—ঐ পর্যন্ত। আহারাদির সময় ভ্রমর নিত্য বাহানা করিতে আরম্ভ করিল—"আমি খাইব না, আমার জ্বর হইয়াছে।" শাশুড়ী কবিরাজ দেখাইয়া, পাঁচন ও বড়ির ব্যবস্থা করিয়া, ক্ষীরোদার প্রতি ভার দিলেন যে, "বৌমাকে

ঔষধগুলি খাওয়াইবি।” বৌমা ক্ষীরির হাত হইতে বড়ি পাঁচন কাড়িয়া লইয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল।

ক্রমে ক্রমে এতটা বাড়াবাড়ি ক্ষীরি চাকরাণীর চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্ষীরি বলিল, “ভাল বউ ঠাকুরাণি, কার জন্য তুমি অমন কর? যাঁর জন্য তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলে, তিনি কি তোমার কথা এক দিনের জন্য ভাবেন? তুমি মরছ কেঁদে কেটে, আর তিনি হয় ত হুঁকার নল মুখে দিয়া চক্ষু বুজিয়া রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধ্যান করিতেছেন।”

ভ্রমর ক্ষীরিকে ঠাস করিয়া এক চড় মারিল। ভ্রমরের হাত বিলক্ষণ চলিত। প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, “তুই যা ইচ্ছা তাই বকিবি ত আমার কাছ থেকে উঠিয়া যা।”

ক্ষীরি বলিল, “তা চড় চাপড় মারিলেই কি লোকের মুখ চাপা থাকিবে? তুমি রাগ করিবে বলিয়া আমরা ভয়ে কিছু বলি না। কিন্তু না বলিলেও বাঁচি না। পাঁচি চাঁড়ালনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি,—সে দিন অত রাত্রে রোহিণী, বাবুর বাগান হইতে আসিতেছিল কি না?”

ক্ষীরোদার কপাল মন্দ, তাই এমন কথা সকাল বেলা ভ্রমরের কাছে বলিল। ভ্রমর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষীরোদাকে চড়ের উপর চড় মারিল, কিলের উপর কিল মারিল, তাহাকে ঠেলা মারিয়া ফেলিয়া দিল, তাহার চুল ধরিয়া টানিল। শেষে আপনি কাঁদিতে লাগিল।

ক্ষীরোদা, মধ্যে মধ্যে ভ্রমরের কাছে চড়টা চাপড়টা খাইত, কখনও রাগ করিত না; কিন্তু আজি কিছু বাড়াবাড়ি, আজ একটু রাগিল। বলিল, “তা ঠাকরুণ, আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে—তোমারই জন্য আমরা বলি। তোমাদের কথা লইয়া লোকে একটা হৈ হৈ করে, আমরা তা সইতে পারি না। তা আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তুমি পাঁচিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর।”

ভ্রমর ক্রোধে দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, “তোর জিজ্ঞাসা করিতে হয় তুই করগে—আমি কি তোদের মত ছুঁচো পাজি যে, আমার স্বামীর কথা পাঁচি চাঁড়ালনীকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব? তুই এত বড় কথা আমাকে বলিস্! ঠাকুরাণীকে বলিয়া আমি ঝাঁটা মেরে তোকে দূর করিয়া দিব। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা।”

তখন সকাল বেলা উত্তম মধ্যম ভোজন করিয়া ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি

চাকরাণী রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। এ দিকে ভ্রমর ঊর্ধ্বমুখে সজল নয়নে, যুক্তকরে, মনে মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "হে গুরো! শিক্ষক, ধর্মজ্ঞ, আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ! তুমি কি সে দিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে?"

তার মনের ভিতর যে মন, হৃদয়ের যে লুকায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না—যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখান পর্যন্ত ভ্রমর দেখিলেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না। ভ্রমর কেবল একবার মাত্র মনে ভাবিলেন যে, "তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এমন দুঃখ কি? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে।" হিন্দুর মেয়ে মরা বড় সহজ মনে করে।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এখন ক্ষীরি চাকরাণী মনে করিল যে, এ বড় কলিকাল—এক রত্তি মেয়েটা আমার কথায় বিশ্বাস করে না। ক্ষীরোদার সরল অন্তঃকরণে ভ্রমরের উপর রাগ দ্বেষাদি কিছুই নাই, সে ভ্রমরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বটে, তাহার অমঙ্গল চাহে না; তবে ভ্রমর যে তাহার ঠকামি কানে তুলিল না, সেটা অসহ্য। ক্ষীরোদা তখন সুচিক্কণ দেহযষ্টি সংক্ষেপে তৈলসিক্ত করিয়া, রঙ্গকরা গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া, কলসীকক্ষে, বারুণীর ঘাটে স্নান করিতে চলিল।

হরমণি ঠাকুরাণী, বাবুদের বাড়ীর একজন পাচিকা, সেই সময় বারুণীর ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিতেছিল, প্রথমে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। হরমণিকে দেখিয়া ক্ষীরোদা আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "বলে, যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর—আর বড়লোকের কাজ করা হল না—কখন কার মেজাজ কেমন থাকে তার ঠিকানাই নাই।"

হরমণি একটু কোন্দলের গন্ধ পাইয়া, দাহিন হাতের কাচা কাপড়খানি বাঁ হাতে রাখিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি লো ক্ষীরোদা—আবার কি হয়েছে?"

ক্ষীরোদা তখন মনের বোঝা নামাইল। বলিল, "দেখ দেখি গা—পাড়ার

কালামুখীরা বাবুর বাগানে বেড়াতে যাবে—তা আমরা চাকর বাকর—আমরা কি তা মুনিবের কাছে বলিতে পারি না!"

হর। সে কি লো? পাড়ার মেয়ে আবার বাবুর বাগানে বেড়াতে কে গেল?

ক্ষী। আর কে যায়? সেই কালামুখী রোহিণী।

হর। কি পোড়া কপাল! রোহিণীর আবার এমন দশা কত দিন? কোন্ বাবুর বাগানে রে ক্ষীরোদ

ক্ষীরোদা মেজবাবুর নাম করিল। তখন দুই জনে একটু চাওয়াচাওয়ি করিয়া, একটু রসের হাসি হাসিয়া, যে যে দিকে যাইবার, সে সেই দিকে গেল। কিছু দূর গিয়াই ক্ষীরোদার সঙ্গে পাড়ার রামের মার দেখা হইল। ক্ষীরোদা তাহাকেও হাসির ফাঁদে ধরিয়া লইয়া, দাঁড় করাইয়া রোহিণীর দৌরাত্ম্যের কথার পরিচয় দিল। আবার দুজনে হাসি চাহনি ফেরাফিরি করিয়া অভীষ্ট পথে গেল।

এইরূপে ক্ষীরোদা, পথে রামের মা, শ্যামের মা, হারী, তারী, পারী যাহার দেখা পাইল, তাহারই কাছে আপন মর্মপীড়ার পরিচয় দিয়া, পরিশেষে সুস্থ-শরীরে প্রফুল্লহৃদয়ে বারুণীর স্ফটিক বারিরাশিমধ্যে অবগাহন করিল। এ দিকে হরমণি, রামের মা, শ্যামের মা, হারী, তারী, পারী যাহাকে যেখানে দেখিল, তাহাকে সেইখানে ধরিয়া শুনাইয়া দিল যে, রোহিণী হতভাগিনী মেজবাবুর বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিল। একে শূন্য দশ হইল, দশে শূন্য শত হইল, শতে শূন্য সহস্র হইল। যে সূর্যের নবীন কিরণ তেজস্বী না হইতে হইতেই ক্ষীরি প্রথম ভ্রমরের সাক্ষাতে রোহিণীর কথা পাড়িয়াছিল, তাঁহার অস্তগমনের পূর্বেই গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল যে, রোহিণী গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা। কেবল বাগানের কথা হইতে অপরিমেয় প্রণয়ের কথা, অপরিমেয় প্রণয়ের কথা হইতে অপরিমেয় অলঙ্কারের কথা, আর কত কথা উঠিল, তাহা আমি—হে রটনাকৌশলময়ী কলকলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণ! তাহা আমি অধম সত্য-শাসিত পুরুষ লেখক আপনাদিগের কাছে সবিস্তারে বলিয়া বাড়াবাড়ি করিতে চাহি না।

ক্রমে ভ্রমরের কাছে সংবাদ আসিতে লাগিল। প্রথমে বিনোদিনী আসিয়া বলিল, "সত্যি কি না?" ভ্রমর, একটু শুষ্ক মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুকে বলিল, "কি

সত্য ঠাকুরঝি ?" ঠাকুরঝি তখন, ফুলধনুর মত দুইখানি ভ্রূ একটু জড় সড় করিয়া অপাঙ্গে একটু বৈদ্যুতী প্রেরণ করিয়া ছেলেটিকে কোলে টানিয়া বসাইয়া বলিল, "বলি, রোহিণীর কথাটা ?"

ভ্রমর, বিনোদিনীকে কিছু না বলিতে পারিয়া তাহার ছেলেটিকে টানিয়া লইয়া কোন বালিকাসুলভ কোশলে তাহাকে কাঁদাইল। বিনোদিনী বালককে স্তন্যপান করাইতে করাইতে স্বস্থানে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর পর সুরধুনী আসিয়া বলিলেন, "বলি মেজ বৌ, বলেছিলুম, মেজবাবুকে অষুধ কর। তুমি হাজার হোক গৌরবর্ণ নও, পুরুষ মানুষের মন ত কেবল কথায় পাওয়া যায় না, একটু রূপ গুণ চাই। তা ভাই, রোহিণীর কি আক্কেল, কে জানে ?"

ভ্রমর বলিল, "রোহিণীর আবার আক্কেল কি ?"

সুরধুনী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "পোড়া কপাল! এত লোক শুনিয়াছে—কেবল তুই শুনিস্ নাই ? মেজবাবু যে রোহিণীকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়াছে।"

ভ্রমর হাড়ে হাড়ে জলিয়া মনে মনে সুরধুনীকে যমের হাতে সমর্পণ করিল। প্রকাশ্যে, একটা পুত্তলের মুণ্ড মোচড় দিয়া ভাঙ্গিয়া সুরধুনীকে বলিল, "তা আমি জানি। খাতা দেখিয়াছি। তোর নামে চৌদ্দ হাজার টাকার গহনা লেখা আছে।"

বিনোদিনী সুরধুনীর পর রামী, বামী, শ্যামী, কামিনী, রমণী, শারদা, প্রমদা, সুখদা, বরদা, কমলা, বিমলা, শীতলা, নির্মলা, মাধু, নিধু, বিধু, তারিণী, নিস্তারিণী, দিনতারিণী, ভবতারিণী, সুরবালা, গিরিবালা, শৈলবালা প্রভৃতি অনেকে আসিয়া, একে, একে, দুইয়ে দুইয়ে, তিনে তিনে, দুঃখিনী বিরহকাতরা বালিকাকে জানাইল যে, তোমার স্বামী রোহিণীর প্রণয়াসক্ত। কেহ যুবতী, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ বর্ষীয়সী, কেহ বা বালিকা, সকলেই আসিয়া ভ্রমরকে বলিল, "আশ্চর্য কি ? মেজবাবুর রূপ দেখে কে না ভোলে ? রোহিণীর রূপ দেখে তিনিই না ভুলিবেন কেন ? কেহ আদর করিয়া, কেহ চিড়াইয়া, কেহ রসে, কেহ রাগে, কেহ সুখে, কেহ দুঃখে, কেহ হেসে, কেহ কেঁদে ভ্রমরকে জানাইল যে ভ্রমর, তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিল। তাহার সুখ দেখিয়া সকলে হিংসায়

মরিত—কালো কুৎসিতের এত সুখ—অনন্ত ঐশ্বর্য—দেবদুর্লভ স্বামী—লোকে কলঙ্কশূন্য যশ—অপরাজিতাতে পদ্মের আদর? আবার তার উপর মল্লিকার সৌরভ? গ্রামের লোকের এত সহিত না। তাই, পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া, কেহ কবরী বাঁধিয়া, কেহ কবরী বাঁধিতে বাঁধিতে, কেহ এলোচুলে সংবাদ দিতে আসিলেন, "ভ্রমর, তোমার সুখ গিয়াছে।"—কাহারও মনে হইল না যে, ভ্রমর পতিবিরহবিধুরা, নিতান্ত দোষশূন্যা, দুঃখিনী বালিকা।

ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্ম্যতলে শয়ন করিয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "হে সন্দেহভঞ্জন! হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আজ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে, সকলে বলিবে কেন। তুমি এখানে নাই আজি আমার সন্দেহভঞ্জন কে করিবে? আমার সন্দেহভঞ্জন হইল না—তবে মরি না কেন? সন্দেহ লইয়া কি বাঁচা যায়? আমি মরি না কেন? ফিরিয়া আসিয়া প্রাণেশ্বর! আমায় গালি দিও না যে, ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।"

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এখন, ভ্রমরের যে জ্বালা, রোহিণীরও সেই জ্বালা। কথা যদি রটিল রোহিণীর কানেই বা না উঠিবে কেন! রোহিণী শুনিল, গ্রামে রাষ্ট্র যে, গোবিন্দলাল তাহার গোলাম—সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। কথা যে কোথা হইতে রটিল, তাহা রোহিণী শুনে নাই—কে রটাইল, তাহার কোন তদন্ত করে নাই, একেবারে সিদ্ধান্ত করিল যে, তবে ভ্রমরই রটাইয়াছে, নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার? রোহিণী ভাবিল—ভ্রমর আমাকে বড় জ্বালাইল। সে দিন চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ। এ দেশে আর আমি থাকিব না। কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব।

রোহিণী না পারে এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্বপরিচয়ে জানা

গিয়াছে। রোহিণী কোন প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে একখানি বানারসী শাড়ী ও এক স্যুট গিল্‌টির গহনা চাহিয়া আনিল। সন্ধ্যা হইলে সেগুলি পুঁটুলি বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া রায়দিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যথায় ভ্রমর একাকিনী মৃৎশয্যায় শয়ন করিয়া, এক একবার কাঁদিতেছে, একবার চক্ষের জল মুছিয়া কড়ি পানে চাহিয়া ভাবিতেছে, তথায় রোহিণী গিয়া পুঁটুলি রাখিয়া উপবেশন করিল। ভ্রমর বিস্মিত হইল। রোহিণীকে দেখিয়া বিষের জ্বালায় তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সহিতে না পারিয়া ভ্রমর বলিল, "তুমি সে দিন রাত্রে ঠাকুরের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিলে। আজ রাত্রে কি আমার ঘরে সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছ না কি?"

রোহিণী মনে মনে বলিল যে, তোমার মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি। প্রকাশ্যে বলিল, "এখন আর আমার চুরির প্রয়োজন নাই; আমি আর টাকার কাঙ্গাল নহি। মেজবাবুর অনুগ্রহে, আমার আর খাইবার পরিবার দুঃখ নাই। তবে লোকে যতটা বলে ততটা নহে।"

ভ্রমর বলিল, "তুমি এখান হইতে দূর হও।"

রোহিণী সে কথা কানে না তুলিয়া বলিতে লাগিল, "লোকে যতটা বলে, ততটা নহে। লোকে বলে, আমি সাত হাজার টাকার গহনা পাইয়াছি। মোটে তিন হাজার টাকার গহনা, আর এই শাড়ীখানি পাইয়াছি। তাই তোমায় দেখাইতে আসিয়াছি। সাত হাজার টাকা লোকে বলে কেন?"

এই বলিয়া রোহিণী পুঁটুলি খুলিয়া বানারসী শাড়ী ও গিল্‌টির গহনাগুলি ভ্রমরকে দেখাইল। ভ্রমর লাথি মারিয়া অলঙ্কারগুলি চারি দিকে ছড়াইয়া দিল।

রোহিণী বলিল, "সোনায় পা দিতে নাই।" এই বলিয়া রোহিণী নিঃশব্দে গিল্‌টির অলঙ্কারগুলি একে একে কুড়াইয়া, আবার পুঁটুলি বাঁধিল। পুঁটুলি বাঁধিয়া নিঃশব্দে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমাদের বড় দুঃখ রহিল। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়া দিয়াছিল, কিন্তু রোহিণীকে একটি কিলও মারিল না, এই আমাদের আন্তরিক দুঃখ। আমাদের পাঠিকারা উপস্থিত থাকিলে রোহিণীকে যে স্বহস্তে প্রহার করিতেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয় নাই। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, এ কথা মানি। রাক্ষসী বা পিশাচীর গায়ে যে হাত তুলিতে নাই, এ কথা তত মানি না। তবে ভ্রমর যে রোহিণীকে কেন মারিল না, তাহা বুঝাইতে পারি। ভ্রমর

ক্ষীরোদাকে ভালবাসিত, সেইজন্য তাহাকে মারপিট করিয়াছিল। রোহিণীকে ভালবাসিত না, এজন্য হাত উঠিল না। ছেলের ছেলের ঝগড়া করিলে জননী আপনার ছেলেটিকে মারে, পরের ছেলেটিকে মারে না।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি প্রভাত না হইতেই ভ্রমর স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। লেখাপড়া গোবিন্দলাল শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রমর লেখাপড়ায় তত মজবুত হইয়া উঠে নাই। ফুলটি পুতুলটি পাখীটি স্বামীটিতে ভ্রমরের মন, লেখাপড়া বা গৃহকর্মে তত নহে। কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলে, একবার মুছিত একবার কাটিত, একবার কাগজ বদলাইয়া আবার মুছিত, আবার কাটিত। শেষ ফেলিয়া রাখিত। দুই তিন দিনে একখানা পত্র শেষ হইত না, কিন্তু আজ সে সকল কিছু হইল না। তেড়া বাঁকা ছাঁদে, যাহা লেখনীর অগ্রে বাহির হইল, আজ তাহাই ভ্রমরের মঞ্জুর। "ম"গুলা "স"র মত হইল—"স"গুলা "ম"র মত হইল—"ধ"গুলা "ফ"র মত, "ফ"গুলা "থ"র মত, "থ"গুলা "খ"র মত, ইকারের স্থানে আকার—আকারের একেবারে লোপ, যুক্ত অক্ষরের স্থানে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর, কোন কোন অক্ষরের লোপ,—ভ্রমর কিছু মানিল না। ভ্রমর আজি এক ঘণ্টার মধ্যে এক দীর্ঘ পত্র স্বামীকে লিখিয়া ফেলিল। কাটাকুটি যে ছিল না, এমত নহে। আমরা পত্রখানির কিছু পরিচয় দিতেছি।

ভ্রমর লিখিতেছে—

"সেবিকা শ্রী ভোমরা" (তার পর ভোমরা কাটিয়া ভ্রমরা করিল) "দাস্যা (আগে দাস্যা, তাহা কাটিয়া দাস্য—তাহা কাটিয়া দাস্যো, দাস্যাঃ ঘটিয়া উঠে নাই) "প্রণামাঃ ("প্র" লিখিতে প্রথমে "স্র", তার পর "স্ত্র", শেষে "প্র") "নিবেদনঞ্চ" (প্রথমে নিবেদক, তার পর নিবেদনঞ্চ) "বিশেষ" (বিশেষঃ হইয়া উঠে নাই)।

এইরূপ পত্র লেখার প্রণালী। যাহা লিখিয়াছিল, তাহার বর্ণগুলি শুদ্ধ করিয়া ভাষা একটুকু সংশোধন করিয়া নিম্নে লিখিতেছি।

"সে দিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরি হইয়াছিল, তাহা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিলে না। দুই বৎসর পরে বলিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই তাহা শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছ তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে।

তুমি মনে জান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমারও ভক্তি; যত দিন তুমি বিশ্বাসী, তত দিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব।"

গোবিন্দলাল যথাকালে সেই পত্র পাইলেন। তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কেবল হস্তাক্ষরে এবং বর্ণাশুদ্ধির প্রণালী দেখিয়াই তিনি বিশ্বাস করিলেন যে, এ ভ্রমরের লেখা। তথাপি মনে অনেকবার সন্দেহ করিলেন—ভ্রমর তাঁহাকে এমন পত্র লিখিতে পারে, তাহা তিনি কখন বিশ্বাস করেন নাই।

সেই ডাকে আরও কয়খানি পত্র আসিয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমেই ভ্রমরের পত্র খুলিয়াছিলেন; পড়িয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন। তারপর সে পত্রগুলি অন্যমনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের একখানি পত্র পাইলেন। কবিতাপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ লিখিতেছেন—

"ভাই হে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলু খড়ের প্রাণ যায়। তোমার উপর বৌমা সকল দৌরাত্ম্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা দুঃখী প্রাণী, আমাদিগের উপর এ দৌরাত্ম্য কেন? তিনি রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ। আরও কত কদর্য কথা রটিয়াছে, তাহা তোমাকে লিখিতে লজ্জা করে—যাহা হৌক,—তোমার কাছে আমার নালিশ—তুমি ইহার বিহিত করিবে। নহিলে আমি এখানকার বাস উঠাইব। ইতি।"

গোবিন্দলাল আবার বিস্মিত হইলেন।—ভ্রমর রটাইয়াছে? মর্ম কিছুই না বুঝিতে পারিয়া গোবিন্দলাল সেই দিন আজ্ঞা প্রচার করলেন যে, এখানকার

জলবায়ু আমার সহ্য হইতেছে না—আমি কালই বাটী যাইব। নৌকা প্রস্তুত কর।

পরদিন নৌকারোহণে, বিষণ্ণমনে গোবিন্দলাল গৃহে যাত্রা করিলেন।

চতুর্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

যাহাকে ভালবাস তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে তবে সূতা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে। যাহাকে বিদায় দিবার সময়ে কত কাঁদিয়াছ, মনে করিয়াছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে না,—কয় বৎসর পরে তাহার সহিত আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছে—"ভাল আছ ত?" হয় ত সে কথাও হয় নাই—কথাই হয় নাই—আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হয় ত রাগে অভিমানে আর দেখাই হয় নাই—তত নাই হউক, একবার চক্ষের বাহির হইলেই, যা ছিল, তা আর হয় না। যা যায়, তা আর আসে না। যা ভাঙ্গে, আর তা গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ?

ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশ যাইতে দিয়া ভাল করেন নাই। এ সময়ে দুই জনে একত্রে থাকিলে, এ মনের মালিন্য বুঝি ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত। ভ্রমরের এত ভ্রম ঘটিত না। এত রাগ হইত না। রাগে এই সর্বনাশ হইত না।

গোবিন্দলাল স্বদেশে যাত্রা করিলে, নায়েব কৃষ্ণকান্তের নিকট এক রোবকারী পাঠাইল যে, মধ্যম বাবু অদ্য প্রাতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সে পত্র ডাকে আসিল। নৌকার অপেক্ষা ডাক আগে আসে। গোবিন্দলাল স্বদেশে পৌঁছিবার চারি পাঁচ দিন আগে, কৃষ্ণকান্তের নিকট নায়েবের পত্র পৌঁছিল। ভ্রমর শুনিলেন, স্বামী আসিতেছেন। ভ্রমর তখনই আবার পত্র লিখিতে বসিলেন। খান চারি পাঁচ কাগজ কালিতে পুরাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঘণ্টা দুই চারি মধ্যে একখানা পত্র লিখিয়া খাড়া করিলেন। এ পত্রে মাতাকে

লিখিলেন যে, "আমার বড় পীড়া হইয়াছে। তোমরা যদি একবার আমাকে লইয়া যাও, তবে আরাম হইয়া আসিতে পারি। বিলম্ব করিও না, পীড়া বৃদ্ধি হইলে আর আরাম হইবে না। পার যদি, কালই লোক পাঠাইও। এখানে পীড়ার কথা বলিও না।" এই পত্র লিখিয়া গোপনে ক্ষীরি চাকরাণীর দ্বারা লোক ঠিক করিয়া, ভ্রমর তাহা পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল।

যদি মা না হইয়া, আর কেহ হইত, তবে ভ্রমরের পত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারিত যে, ইহার ভিতর কিছু জুয়াচুরি আছে। কিন্তু মা, সন্তানের পীড়ার কথা শুনিয়া একেবারে কাতর হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশ্যে ভ্রমরের শাশুড়ীকে এক লক্ষ গালি দিয়া স্বামীকে কিছু গালি দিলেন, এবং কাঁদিয়া কাটিয়া স্থির করিলেন যে, আগামী কল্য বেহারা পালকি লইয়া চাকর চাকরাণী ভ্রমরকে আনিতে যাইবে। ভ্রমরের পিতা, কৃষ্ণকান্তকে পত্র লিখিলেন। কৌশল করিয়া, ভ্রমরের পীড়ার কোন কথা না লিখিয়া, লিখিলেন যে, "ভ্রমরের মাতা অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন—ভ্রমরকে একবার দেখিতে পাঠাইয়া দিবেন।" দাস দাসীদিগকে সেই মত শিক্ষা দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বড় বিপদে পড়িলেন। এদিকে গোবিন্দলাল আসিতেছে, এ সময়ে ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠানো অকর্তব্য। ওদিকে ভ্রমরের মাতা পীড়িতা, না পাঠাইলেও নয়। সাত-পাঁচ ভাবিয়া, চারি দিনের কড়ারে ভ্রমরকে পাঠাইয়া দিলেন।

চারি দিনের দিন গোবিন্দলাল আসিয়া পৌঁছিলেন। শুনিলেন যে ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছেন, আজি তাহাকে আনিতে পালকি যাইবে। গোবিন্দলাল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বড় অভিমান হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না?"

এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিলেন। কেন নিষেধ করিলেন, তাহা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সম্মতি পাইয়া, কৃষ্ণকান্ত বধূ আনিবার জন্য আর কোন উদ্যোগ করিলেন না।

পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এইরূপে দুই চারি দিন গেল। ভ্রমরকে কেহ আনিল না, ভ্রমরও আসিল না। গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরের বড় স্পর্ধা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাঁদাইব। মনে করিলেন, ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাঁদাইব। এক একবার শূন্য-গৃহ দেখিয়া আপনি একটু কাদিলেন। ভ্রমরের অবিশ্বাস মনে করিয়া এক একবার একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের সঙ্গে কলহ, এ কথা ভাবিয়া কান্না আসিল। আবার চোখের জল মুছিয়া, রাগ করিলেন। রাগ করিয়া ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন। ভুলিবার সাধ্য কি? সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে।

শেষে দুর্বুদ্ধি গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায় রোহিণীর চিন্তা। রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা, একদিনও গোবিন্দলালের হৃদয় পরিত্যাগ ক'রে নাই। গোবিন্দলাল জোর করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না কিন্তু সে ছাড়িত না। উপন্যাসে শুনা যায়, কোন গৃহে ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে, ভূত দিবারাত্রি উঁকি ঝুঁকি মারে, কিন্তু ওঝা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। রোহিণী প্রেতিনী তেমনি দিবারাত্র গোবিন্দলালের হৃদয়মন্দিরে উঁকি ঝুঁকি মারে, গোবিন্দলাল তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। যেমন জলতলে চন্দ্রসূর্যের ছায়া আছে, চন্দ্রসূর্য নাই, তেমনি গোবিন্দলালের হৃদয়ে অহরহঃ রোহিণীর ছায়া আছে, রোহিণী নাই। গোবিন্দলাল ভাবিলেন, যদি ভ্রমরকে আপাততঃ ভুলিতে হইবে তবে রোহিণীর কথাই ভাবি—নহিলে এ দুঃখ ভুলা যায় না। অনেক কুচিকিৎসক ক্ষুদ্র রোগের উপশমের জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করেন। গোবিন্দলালও ক্ষুদ্র রোগের উপশমের জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দলাল আপন ইচ্ছায় আপনি আপনার অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রোহিণীর কথা প্রথমে স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল। দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল বারুণীতটে, পুষ্পবৃক্ষপরিবেষ্টিত মণ্ডপমধ্যে উপবেশন করিয়া সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন। বর্ষাকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাদল হইয়াছে—বৃষ্টি কখনও কখনও জোরে আসিতেছে—কখনও মৃদু হইতেছে। কিন্তু বৃষ্টি ছাড়া নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। প্রাবারুণী যামিনীর অন্ধকার, তাহার উপর বাদলের অন্ধকার, বারুণীর ঘাট স্পষ্ট

দেখা যায় না। গোবিন্দলাল অস্পষ্টরূপে দেখিলেন যে, একজন স্ত্রীলোক নামিতেছে। রোহিণীর সেই সোপানাবতরণ গোবিন্দলালের মনে হইল। বাদলে ঘাটে বড় পিছল হইয়াছে—পাছে পিছলে পা পিছলাইয়া স্ত্রীলোকটি জলে পড়িয়া গিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, ভাবিয়া গোবিন্দলাল কিছু ব্যস্ত হইলেন। পুষ্পমণ্ডপ হইতে ডাকিলেন, "কে গা তুমি, আজ ঘাটে নামিও না—বড় পিছল, পড়িয়া যাইবে।"

স্ত্রীলোকটি তাহার কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। বৃষ্টি পড়িতেছিল—বোধ হয় বৃষ্টির শব্দে সে ভাল করিয়া শুনিতে পায় নাই। সে কক্ষস্থ কলসী ঘাটে নামাইল। সোপান পুনরারোহণ করিল। ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান অভিমুখে চলিল। উদ্যানদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। গোবিন্দলালের কাছে, মণ্ডপতলে গিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দলাল দেখিলেন, সম্মুখে রোহিণী।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ভিজিতে ভিজিতে এখানে কেন রোহিণী ?"

রো। আপনি কি আমাকে ডাকিলেন ?

গো। ডাকি নাই। ঘাট বড পিছল, নামিতে বারণ করিতেছিলাম। দাঁড়াইয়া ভিজিতেছ কেন ?

রোহিণী সাহস পাইয়া মণ্ডপমধ্যে উঠিল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "লোকে দেখিলে কি বলিবে ?"

রো। যা বলিবার তা বলিতেছে। সে কথা আপনার কাছে একদিন বলিব বলিয়া অনেক যত্ন করিতেছি।

গো। আমারও সে সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। কি এ কথা রটাইল ? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন ?

রো। সকল বলিতেছি। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া বলিব কি ?

গো। না। আমার সঙ্গে আইস।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল, রোহিণীকে ডাকিয়া বাগানের বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

সেখানে উভয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। কেবল এইমাত্র বলিব যে, সে রাত্রে রোহিণী, গৃহে যাইবার পূর্বে বুঝিয়া গেলেন যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিৎ নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী-শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছিল।

গোবিন্দলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে। কিন্তু যেমন বাহ্য জগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে প্রতি পদে পতনশীলের গতি বর্ধিত হয়। গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল।—কেন না, রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কেবল কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না।

ক্রমে কৃষ্ণকান্তের কানে রোহিণী ও গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্ত দুঃখিত হইলেন। গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক ঘটিলে তাঁহার বড় কষ্ট। মনে মনে ইচ্ছা হইল, গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শয়নমন্দির ত্যাগ করিতে পারিতেন না। সেখানে গোবিন্দলাল তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিত, কিন্তু সবদা তিনি সেবকগণপরিবেষ্টিত থাকিতেন, গোবিন্দলালকে সকলের সাক্ষাতে কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্তু পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইল। হঠাৎ কৃষ্ণকান্তের মনে হইল যে, বুঝি চিত্রগুপ্তের হিসাব নিকাশ হইয়া আসিল —এ জীবনের সাগরসঙ্গম বুঝি সম্মুখে। আর বিলম্ব করিলে কথা বুঝি বলা হইবে না। এক দিন গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাগান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন কৃষ্ণকান্ত মনের কথা বলিবেন মনে করিলেন। গোবিন্দলাল দেখিতে আসিলেন। কৃষ্ণকান্ত পার্শ্ববর্তিগণকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। পার্শ্ববর্তিগণ সকলে উঠিয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আজ কেমন আছেন?" কৃষ্ণকান্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আজ বড় ভাল নাই। তোমার এত রাত্রি হইল কেন?"

গোবিন্দলাল সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, কৃষ্ণকান্তের প্রকোষ্ঠ হস্তমধ্যে লইয়া নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন। অকস্মাৎ গোবিন্দলালের মুখ শুকাইয়া গেল। কৃষ্ণকান্তের জীবনপ্রবাহ অতি ধীরে, ধীরে ধীরে বহিতেছে। গোবিন্দলাল

কেবল বলিলেন, "আমি আসিতেছি।" কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহ হইতে নির্গত হইয়া গোবিন্দলাল একেবারে স্বয়ং বৈদ্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈদ্য বিস্মিত হইল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "মহাশয়, শীঘ্র ঔষধ লইয়া আসুন, জ্যেষ্ঠতাতের অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।" বৈদ্য শশব্যস্তে এক রাশি বটিকা লইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুটিলেন—কৃষ্ণকান্তের গৃহে গোবিন্দলাল বৈদ্যসহিত উপস্থিত হইলেন; কৃষ্ণকান্ত কিছু ভীত হইলেন। কবিরাজ হাত দেখিলেন। কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, কিছু শঙ্কা হইতেছে কি?" বৈদ্য বলিলেন, "মনুষ্য-শরীরে শঙ্কা কখন নাই?"

কৃষ্ণকান্ত বুঝিলেন, বলিলেন, "কতক্ষণ মিয়াদ?"

বৈদ্য বলিলেন, "ঔষধ খাওয়াইয়া পশ্চাৎ বলিতে পারিব।" বৈদ্য ঔষধ মাড়িয়া সেবন জন্য কৃষ্ণকান্তের নিকট উপস্থিত করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ঔষধের খল হাতে লইয়া একবার মাথায় স্পর্শ করাইলেন। তাহার পর ঔষধটুকু সমুদয় পিকদানিতে নিক্ষেপ করিলেন।

বৈদ্য বিষণ্ণ হইল। কৃষ্ণকান্ত দেখিয়া বলিলেন, "বিষণ্ণ হইবেন না। ঔষধ খাইয়া বাঁচিবার বয়স আমার নহে। ঔষধের অপেক্ষা হরিনামে আমার উপকার। তোমরা হরিনাম কর, আমি শুনি।"

কৃষ্ণকান্ত ভিন্ন কেহই হরিনাম করিল না, কিন্তু সকলেই স্তম্ভিত, ভীত, বিস্মিত হইল। কৃষ্ণকান্ত একাই ভয়শূন্য। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে বলিলেন, "আমার শিওরে দেরাজের চাবি আছে, বাহির কর।"

গোবিন্দলাল বালিসের নীচে হইতে চাবি লইলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেরাজ খুলিয়া আমার উইল বাহির কর।"

গোবিন্দলাল দেরাজ খুলিয়া উইল বাহির করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার আমলা মুহুরি ও দশ জন গ্রামস্থ ভদ্রলোক ডাকাও।"

তখন নায়েব মুহুরি গোমস্তা কারকুনে, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য, ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্তে ঘর পুরিয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত একজন মুহুরিকে আজ্ঞা করিলেন, "আমার উইল পড়।"

মুহুরি পড়িয়া সমাপ্ত করিল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "ও উইল ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। নূতন উইল লেখ"।

মুহুরি জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ লিখিব ?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "যেমন আছে সব সেইরূপ, কেবল—"

"কেবল কি ?"

"কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া দিয়া, তাহার স্থানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ভ্রমরের নাম লেখ। ভ্রমরের অবর্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্ধাংশ পাইবে লেখ।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কেহ কোন কথা কহিল না। মুহুরি গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিল। গোবিন্দলাল ইঙ্গিত করিলেন, লেখ।

মুহুরি লিখিতে আরম্ভ করিল। লেখা সমাপন হইলে কৃষ্ণকান্ত স্বাক্ষর করিলেন। সাক্ষিগণ স্বাক্ষর করিল। গোবিন্দলাল আপনি উপযাচক হইয়া, উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন।

উইলে গোবিন্দলালের এক কপর্দক নাই—ভ্রমরের অর্ধাংশ।

সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে তুলসী তলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোক গমন করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুসংবাদে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে, কেহ বলিল, একটা দিক্‌পাল মরিয়াছে, কেহ বলিল পর্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন। এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে যথেষ্ট দান করিতেন। সুতরাং অনেকেই তাঁহার জন্য কাতর হইল।

সর্বাপেক্ষা ভ্রমর। এখন কাজে কাজেই ভ্রমরকে আনিতে হইল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর দিনই গোবিন্দলালের মাতা উদ্যোগী হইয়া পুত্রবধূকে আনিতে পাঠাইলেন। ভ্রমর আসিয়া কৃষ্ণকান্তের জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গোবিন্দলালের সঙ্গে ভ্রমরের প্রথম সাক্ষাতে, রোহিণীর কথা লইয়া কোন মহাপ্রলয় ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের শোকে সে সকল কথা এখন চাপা পড়িয়া গেল। ভ্রমরের সঙ্গে গোবিন্দলালের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন ভ্রমর জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের জন্য

কাঁদিতেছে। গোবিন্দলালকে দেখিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দলালও অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

অতএব যে বড় হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল, সেটা গোলমালে মিটিয়া গেল। দুই জনেই তাহা বুঝিল। দুই জনেই মনে মনে স্থির করিল যে, যখন প্রথম দেখায় কোন কথাই হইল না, তবে আর গোলযোগ করিয়া কাজ নাই—গোলযোগের এ সময় নহে; মানে মানে কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া যাক—তাহার পরে যাহার মনে যা থাকে, তাহা হইবে। তাই ভাবিয়া গোবিন্দলাল একদা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভ্রমরকে বলিয়া রাখিলেন, "ভ্রমর, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে। কথাগুলি বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। পিতৃশোকের অধিক যে শোক, আমি সেই শোকে এক্ষণে কাতর। এখন আমি সে সকল কথা তোমায় বলিতে পারি না; শ্রাদ্ধের পর যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব। ইহার মধ্যে সে সকল কথার কোন প্রসঙ্গে কাজ নাই।"

ভ্রমর, অতি কষ্টে নয়নাশ্রু সম্বরণ করিয়া বাল্যপরিচিত দেবতা কালী, দুর্গা, শিব, হরি স্মরণ ক'রয়া বলিল, "আমারও কিছু বলিবার আছে। তোমার যখন অবকাশ হইবে, জিজ্ঞাসা করিও।"

আর কোন কথা হইল না। দিন যেমন কাটিত তেমনি কাটিতে লাগিল—দেখিতে, তেমনি দিন কাটিতে লাগিল; দাস দাসী, গৃহিণী, পৌরস্ত্রী, আত্মীয় স্বজন কেহ জানিতে পারিল না যে, আমাশে মেঘ উঠিয়াছে, কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে, এ চারু প্রেম-প্রতিমায় ঘুণ লাগিয়াছে। কিছু ঘুণ লাগিয়াছে ত সত্য। যাহা ছিল, তাহা আর নাই। যে হাসি ছিল, সে হাসি আর নাই। ভ্রমর কি হাসে না? গোবিন্দলাল কি হাসে না? হাসে, কিন্তু সে হাসি, আর নাই। নয়নে নয়নে মিলিতে মিলিতে যে হাসি আপনি উছলিয়া উঠে, সে হাসি আর নাই; যে হাসি আধ হাসি আধ প্রীতি, সে হাসি আর নাই; যে হাসি অর্দ্ধেক বলে, সংসার সুখময়, অর্দ্ধেক বলে সুখের আকাঙ্ক্ষা পুরিল না—সে হাসি আর নাই। সে চাহনি নাই—যে চাহনি দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত, "এত রূপ!"—যে চাহনি দেখিয়া গোবিন্দলাল ভাবিত, "এত গুণ"। সে চাহনি আর নাই। যে চাহনিতে গোবিন্দলালের স্নেহপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি প্রমত্ত চক্ষু দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত, বুঝি এ সমুদ্রে আমার ইহজীবনে আমি সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিব না,—যে চাহনি দেখিয়া গোবিন্দলাল ভাবিয়া ভাবিয়া, এ

সংসারে সকল ভুলিয়া যাইত, সে চাহনি আর নাই। সে সকল প্রিয় সম্বোধন আর নাই—সে "ভ্রমর", "ভোমরা", "ভোমর", "ভোম", "ভুমরি", "ভুমি", "ভুম", "ভোঁ ভোঁ"—সে সব নিত্য নূতন, নিত্য স্নেহপূর্ণ, রঙ্গপূর্ণ, সুখপূর্ণ সম্বোধন আর নাই। সে কালো, কালা, কালাচাঁদ, কেলেসোণা, কালোমাণিক কালিন্দী, কালায়ে—সে প্রিয় সম্বোধন আর নাই। সে ও, ওগো, ওহে, ওলো—সে প্রিয়সম্বোধন আর নাই। সে মিছামিছি ডাকাডাকি আর নাই। সে মিছামিছি বকাবকি আর নাই। সে কথা কহার প্রণালী আর নাই। আগে কথা কুলাইত না—এখন তাহা খুঁজিয়া আনিতে হয়। যে কথা অর্দ্ধেক ভাষায়, অর্দ্ধেক নয়নে নয়নে, অধরে অধরে প্রকাশ পাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। যে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল উত্তরে কণ্ঠস্বর শুনিবার প্রয়োজন, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। আগে যখন গোবিন্দলাল ভ্রমর একত্রিত থাকিত, তখন গোবিন্দলালকে ডাকিলে কেহ সহজে পাইত না—ভ্রমরকে ডাকিলে একেবারে পাইত না। এখন ডাকিতে হয় না—হয় "বড় গরমি", নয় "কে ডাকিতেছে" বলিয়া একজন উঠিয়া যায়। সে সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে। কার্ত্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছে। কে খাঁটি সোনায় দস্তার খাদ মিশাইয়াছে—কে সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে।

আর সেই মধ্যাহ্নরবিকর প্রফুল্ল হৃদয়মধ্যে অন্ধকার হইয়াছে। গোবিন্দলাল সে অন্ধকারে আলো করিবার জন্য ভাবিত রোহিণী—ভ্রমর সে ঘোর, মহাঘোর অন্ধকারে আলো করিবার জন্য ভাবিত—যম। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, প্রেমশূন্যের প্রীতিস্থান তুমি, যম। চিত্তবিনোদন, দুঃখবিনাশন, বিপদ-ভঞ্জন, দীনরঞ্জন তুমি যম। আশাশূন্যের আশা, ভালবাসাশূন্যের ভালবাসা, তুমি যম। ভ্রমরকে গ্রহণ কর, হে যম।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

তারপর কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভারি শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। শত্রুপক্ষ বলিল যে, হাঁ—ঘটা হইয়াছে বটে, পাঁচ সাত দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষ বলিল, লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উত্তরাধিকারিগণ

মিত্রপক্ষের নিকট গোপনে বলিল, আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমরা খাতা দেখিয়াছি মোট ব্যয়, ৩২৩৫৬।১২॥।

যাহা হউক, দিনকতক বড় হাঙ্গামা গেল। হরলাল শ্রাদ্ধাধিকারী, অসিয়া শ্রাদ্ধ করিল। দিনকতক মাছির ভনভনানিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে, কাঙ্গালির কোলাহলে, নৈয়ায়িকের বিচারে, গ্রামে কান পাতা গেল না। সন্দেশ মিঠাইয়ের আমদানি, কাঙ্গালির আমদানি, টিকী নামাবলীর আমদানি, কুটুম্বের কুটুম্ব, তস্য কুটুম্ব, তস্য কুটুম্বের আমদানি। ছেলেগুলা মিহিদানা সীতাভোগ লইয়া ভাঁটা খেলাইতে আরম্ভ করিল; মাগীগুলা নারিকেল তৈল মহার্ঘ দেখিয়া,মাথায় লুচিভাজা ঘি মাখিতে আরম্ভ করিল; গুলির দোকান বন্ধ হইল, সব গুলিখোর ফলাহারে; মদের দোকান বন্ধ হইল, সব মাতাল টিকী রাখিয়া নামাবলী কিনিয়া, উপস্থিত পত্রে বিদায় লইতে গিয়াছে। চাল মহার্ঘ হইল, কেন না কেবল অন্নব্যয় নয়, এত ময়দা খরচ যে, আর চালের গুঁড়িতে কুলান যায় না; এত ঘৃতের খরচ যে, রোগীরা আর কাষ্টর অয়েল পায় না; গোয়ালার কাছে ঘোল কিনতে গেলে তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল, আমার ঘোলটুকু ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে দই হইয়া গিয়াছে।

কোনমতে শ্রাদ্ধের গোল থামিল, শেষ উইল পড়ার যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। উইল পড়িয়া হরলাল দেখিলেন, উইলে বিস্তর সাক্ষী—কোন গোল করিবার সম্ভাবনা নাই। হরলাল শ্রাদ্ধান্তে স্বস্থানে গমন করিলেন।

উইল পড়িয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিলেন, "উইলের কথা শুনিয়াছ?"

ভ্র। কি?

গো। তোমার অর্দ্ধাংশ

ভ্র। আমার, না তোমার?

গো। এখন আমার তোমায় একটু প্রভেদ হইয়াছে। আমার নয়, তোমার।

ভ্র। তাহা হইলেই তোমার।

গো। তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।

ভ্রমরের বড়ই কান্না আসিল, কিন্তু ভ্রমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "তবে কি করিবে?"

গো। যাহাতে দুই পয়সা উপার্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারি, তাহা করিব।

ভ্র। সে কি?

গো। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া চাকরির চেষ্টা করিব।

ভ্র। বিষয় আমার জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের নহে, আমার শ্বশুরের। তুমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী, আমি নহি। জ্যেঠার উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। উইল অসিদ্ধ। আমার পিতা শ্রাদ্ধের সময় নিমন্ত্রণে আসিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিষয় তোমার, আমার নহে।

গো। আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না। বিষয় তোমার, আমার নহে। তিনি যখন তোমাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন তখন বিষয় তোমার, আমার নহে।

ভ্র। যদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি না হয় তোমাকে লিখিয়া দিতেছি।

গো। তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিতে হইবে?

ভ্র। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি তোমার দাসানুদাসী বই ত নই?

গো। আজি কালি ও কথা সাজে না, ভ্রমর!

ভ্র। কি করিয়াছি? আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি না। আট বৎসরের সময় আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুতুল—আমার কি অপরাধ হইল?

গো। মনে করিয়া দেখ।

ভ্র। অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—ঘাট হইয়াছে, আমার শত-সহস্র অপরাধ হইয়াছে—আমায় ক্ষমা কর; আমি আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।

গোবিন্দলাল কথা কহিল না। তাহার অগ্রে, আলুলায়িতকুন্তলা অশ্রু-বিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা। গোবিন্দলাল কথা কহিল না। গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিল, "এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এতকাল গুণের সেবা ক

সেবা করিব।—আমার এ অসার, এ

আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।”

ভ্রমর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে—ক্ষমা কর। আমি বালিকা।

যিনি অনন্ত সুখদুঃখের বিধাতা, অন্তর্যামী, কাতরের বন্ধু, অবশ্যই তিনি এ কথাগুলি শুনিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা শুনিল না। নীরব হইয়া রহিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিল। তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্তপ্রভাশালিনী প্রভাতশুক্রতারারূপিণী চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।

ভ্রমর উত্তর না পাইয়া বলিল, “কি বল?”

গোবিন্দলাল বলিল, “আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।”

ভ্রমর পদত্যাগ করিল। উঠিল। বাহিরে যাইতেছিল। চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

“কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমাকে ত্যাগ করিবে?”

এ কথা ভ্রমর গোবিন্দলালকে মুখে বলিতে পারিল না—কিন্তু এ ঘটনার পর পলে পলে, মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমার কি অপরাধ?

গোবিন্দলালও মনে মনে অনুসন্ধান করিতে লাগিল যে, ভ্রমরের কি অপরাধ? ভ্রমরের যে বিশেষ গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, তাহা গোবিন্দলালের মনে এক প্রকার স্থির হইয়াছে। কিন্তু অপরাধটা কি, তাহা তত ভাবিয়া দেখেন নাই। ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হইত, ভ্রমর যে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছিল, অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে এক কঠিন পত্র লিখিয়াছিল—একবার তাঁহাকে মুখে সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিল না, এই তাহার অপরাধ। যার জন্য এত করি, সে এত সহজে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, এই তাহার অপরাধ। আমরা কুমতি সুমতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গোবিন্দলালের হৃদয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিয়া, কুমতি সুমতি যে কথোপকথন করিতেছিল তাহা সকলকে শুনাইব।

কুমতি বলিল, “ভ্রমরের প্রথম একটি অপরাধ, এই অবিশ্বাস।”

সুমতি উত্তর করিল, “যে অবিশ্বাসের যোগ্য, তাহাকে অবিশ্বাস না করিবে

কেন? তুমি রোহিণীর সঙ্গে এই আনন্দ উপভোগ করিতেছ, ভ্রমর সেইটা সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়াই কি তার এত দোষ?”

কুমতি। এখন যেন আমি অবিশ্বাসী হইয়াছি, কিন্তু যখন ভ্রমর অবিশ্বাস করিয়াছিল, তখন আমি নির্দোষী।

সুমতি। দুদিন আগে পাছেতে বড় আসিয়া যায় না—দোষ ত করিয়াছ। যে দোষ করিতে সক্ষম, তাহাকে দোষী মনে করা কি এত গুরুতর অপরাধ?

কুমতি। ভ্রমর আমাকে দোষী মনে করিয়াছে বলিয়াই আমি দোষী হইয়াছি। সাধুকে চোর বলিতে বলিতে চোর হয়

সুমতি। দোষটা যে চোর বলে তার! যে চুরি করে, তার কিছু নয়!

কুমতি। তোর সঙ্গে ঝগড়ায় আমি পারব না। দেখ্ না, ভ্রমর আমার কেমন অপমানটা করিল? আমি বিদেশ থেকে আসছি শুনে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

সুমতি। যদি সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে সে সঙ্গত কাজই করিয়াছে। স্বামী পরদারনিরত হইলে নারীদেহ ধারণ করিয়া কে রাগ না করিবে?

কুমতি। সেই বিশ্বাসই তাহার ভ্রম—আর দোষ কি?

সুমতি। এ কথা তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ?

কুমতি। না।

সুমতি। তুমি না জিজ্ঞাসা ক'রয়া রাগ করিতেছ, আর ভ্রমর নিতান্ত বালিকা, না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিয়াছিল বলিয়া এত হাঙ্গামা? সে সব কাজের কথা নহে—আসল রাগের কারণ কি বলিব?

কুমতি। কি বল না?

সুমতি। আসল কথা রোহিণী। রোহিণীতে প্রাণ পড়িয়াছে—তাই আর কালো ভোমরা তোমার ভাল লাগে না।

কুমতি। এত কাল ভোমরা ভাল লাগিল কিসে?

সুমতি। এত কাল রোহিণী জোটে নাই। এক দিনে কোন কিছু ঘটে না, সময়ে সকল উপস্থিত হয়। আজ রৌদ্রে ফাটিতেছে বলিয়া কাল দুর্দিন হইবে না কেন? শুধু কি তাই—আরও আছে।

কুমতি। আর কি?

সুমতি। কৃষ্ণকান্তের উইল। বুড়ো মনে মনে জানিত, ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গেলে—বিষয় তোমারই রহিল। ইহাও জানিত যে, ভ্রমর এক মাসের মধ্যে তোমাকে উহা লিখিয়া দিবে। কিন্তু আপাততঃ তোমাকে একটু কুপথগামী দেখিয়া তোমার চরিত্রশোধনের জন্য তোমাকে ভ্রমরের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া গেল। তুমি অতটা না বুঝিয়া ভ্রমরের উপর রাগিয়া উঠিয়াছে।

কুমতি। তা সত্যই। আমি কি স্ত্রীর মাসহারা খাইব না কি?

সুমতি। তোমার বিষয়, তুমি কেন ভ্রমরের কাছে লিখিয়া লও না।

কুমতি। স্ত্রীর দানে দিনপাত করিব?

সুমতি। আরে বাপরে! কী পুরুষসিংহ! তবে ভ্রমরের সঙ্গে মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রী করিয়া লও না—তোমার পৈতৃক বিষয় বটে।

কুমতি। স্ত্রীর সঙ্গে মোকদ্দমা করিব?

সুমতি। তবে আর কি করিবে? গোল্লায় যাও।

কুমতি। সেই চেষ্টায় আছি।

সুমতি। রোহিণী—সঙ্গে যাবে কি?

তখন সুমতিতে কুমতিতে ভারী চুলোচুলি ঘুষোঘুষি আরম্ভ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকার মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বধূর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রীলোক ইহা সহজেই বুঝিতে পারে। যদি তিনি এই সময়ে সদুপদেশ, স্নেহবাক্যে এবং স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ অন্যান্য সদুপায়ে তাহার প্রতিকার করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে বুঝি সুফল ফলাইতে পারিতেন। কিন্তু গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা গৃহিণী নহেন, বিশেষ পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের উপরে একটু বিদ্বেষাপন্নাও হইয়াছিলেন। যে স্নেহের বলে তিনি ভ্রমরের ইষ্টকামনা করিবেন, ভ্রমরের উপর তাঁহার সে স্নেহ ছিল না।

পুত্র থাকিতে, পুত্রবধূর বিষয় হইল, ইহা তাঁহার অসহ্য। তিনি একবারও অনুভব করিতে পারিলেন না যে, ভ্রমর গোবিন্দলাল অভিন্ন জানিয়া গোবিন্দ-লালের চরিত্রদোষ-সম্ভাবনা দেখিয়া, কৃষ্ণকান্ত রায় গোবিন্দলালের শাসন জন্য ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গিয়াছিলেন। একবারও তিনি মনে ভাবিলেন না যে, কৃষ্ণকান্ত মুমূর্ষু অবস্থায় কতকটা লুপ্তবুদ্ধি হইয়া, কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়াই এ অবিধেয় কার্য করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, পুত্রবধূর সংসারে তাঁহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী এবং অন্নদাস পৌরবর্গের মধ্যে গণ্য হইয়া ইহজীবন নির্বাহ করিতে হইবে। অতএব সংসার ত্যাগ করাই ভাল স্থির করিলেন। একে পতিহীনা, কিছু আত্মপরায়ণা। তিনি স্বামীবিয়োগকাল হইতেই কাশীযাত্রা কামনা করিতেন, কেবল স্ত্রীস্বভাবসুলভ পুত্রস্নেহবশতঃ এতদিন যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে সে বাসনা আরও প্রবল হইল।

তিনি গোবিন্দলালকে বলিলেন, "কর্তারা একে একে স্বর্গারোহণ করিলেন, এখন আমার সময় নিকট হইয়া আসিল। তুমি পুত্রের কাজ কর; এই সময় আমাকে কাশী পাঠাইয়া দাও।"

গোবিন্দলাল হঠাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে আপনি কাশী রাখিয়া আসিব।" দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ভ্রমর একবার ইচ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। কেহই তাঁহাকে নিষেধ করেন নাই। অতএব ভ্রমরের অজ্ঞাতে গোবিন্দলাল কাশীযাত্রায় সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিজ নামে কিছু সম্পত্তি ছিল—তাহা গোপনে বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলেন। কাঞ্চন হীরকাদি মূল্যবান বস্তু যাহা নিজের সম্পত্তি ছিল—তাহা বিক্রয় করিলেন। এইরূপে প্রায় লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইল। গোবিন্দলাল ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে দিনপাত করিবেন স্থির করিলেন।

তখন মাতৃসঙ্গে কাশীযাত্রার দিন স্থির করিয়া ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইলেন। শাশুড়ী কাশীযাত্রা করিবেন শুনিয়া ভ্রমর তাড়াতাড়ি আসিল। আসিয়া শাশুড়ীর চরণে ধরিয়া অনেক বিনয় করিল; শাশুড়ীর পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, "মা, আমি বালিকা—আমায় একা রাখিয়া যাইও না—আমি সংসার-ধর্মের কি বুঝি?—মা—সংসার সমুদ্র, আমাকে এ সমুদ্রে একা ভাসাইয়া যাইও না।" শাশুড়ী বলিলেন, "তোমার বড় ননদ রহিল। সেই তোমাকে আমার মত যত্ন

করিবে—আর তুমিও গৃহিণী হইয়াছ।” ভ্রমর কিছুই বুঝিল না—কেবল কাঁদিতে লাগিল।

ভ্রমর দেখিল বড় বিপদ্ সম্মুখে। শাশুড়ী ত্যাগ করিয়া চলিলেন—আবার স্বামীও তাঁহাকে রাখিতে চলিলেন—তিনিও রাখিতে গিয়া বুঝি আর না আইসেন। ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—বলিল, “কত দিনে আসিবে বলিয়া যাও।”

গোবিন্দলাল বলিলেন, “বলিতে পারি না। আসিতে বড় ইচ্ছা নাই।”

ভ্রমর পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মনে ভাবিল “ভয় কি? বিষ খাইব।”

তার পরে স্থিরীকৃত যাত্রার দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রাম হইতে কিছু দূর শিবিকারোহণে গিয়া ট্রেন পাইতে হইবে। শুভ যাত্রিক লগ্ন উপস্থিত—সকল প্রস্তুত; ভারে ভারে সিন্দুক, তোরঙ্গ, বাক্স, বেগ, গাঁটরি বাহকেরা বহিতে আরম্ভ করিল। দাস দাসী সুবিমল ধৌতবস্ত্র পরিয়া কেশ রঞ্জিত করিয়া দরওয়াজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে লাগিল—তাহারা সঙ্গে যাইবে। দ্বারবানেরা ছিটের জামার বন্ধক আঁটিয়া লাঠি হাতে করিয়া বাহকদিগের সঙ্গে বকাবকি আরম্ভ করিল। পাড়ার মেয়ে ছেলে দেখিবার জন্য ঝুঁকিল। গোবিন্দলালের মাতা গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া, পৌরজন সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিবিকারোহণ করিলেন; পৌরজন সকলেই কাঁদিতে লাগিল। তিনি শিবিকারোহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন।

এদিকে গোবিন্দলাল অন্যান্য পৌরস্ত্রীগণকে যথোচিত সম্বোধন করিয়া শয়নগৃহে রোরুদ্যমানা ভ্রমরের কাছে বিদায় লইতে গেলেন। ভ্রমরকে রোদন-বিবশা দেখিয়া তিনি যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে না পারিয়া কেবল বলিলেন, “ভ্রমর! আমি মাকে রাখিতে চাহিলাম!”

ভ্রমর চক্ষের জল মুছিয়া, বলিল “মা সেখানে বাস করিবেন। তুমি আসিবে না কি?”

একথা যখন ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, তখন তাহার চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছিল; তাহার স্বরে ধৈর্য, গাম্ভীর্য, তাহার অধরে স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া গোবিন্দলাল কিছু বিস্মিত হইলেন। হঠাৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। ভ্রমর স্বামীকে নীরব দেখিয়া পুনরপি বলিল, “দেখ, তুমিই আমাকে শিখাইয়াছ,

সত্যই একমাত্র ধর্ম, সত্যই একমাত্র সুখ। আজি আমাকে তুমি সত্য বলিও—আমি তোমার আশ্রিত বালিকা—আমায় আজ প্রবঞ্চনা করিও না—কবে আসিবে?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "তবে সত্যই শোন। ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই।"

ভ্রমর। কেন ইচ্ছা নাই—তাহা বলিয়া যাইবে না কি?

গো। এখানে থাকিলে তোমার অন্নদাস হইয়া থাকিতে হইবে।

ভ্রমর। তাহাতে বা ক্ষতি কি? আমি ত তোমার দাসানুদাসী।

গো। আমার দাসানুদাসী ভ্রমর, আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানালায় বসিয়া থাকিবে। তেমন সময় সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না।

ভ্রমর। তাহার জন্য কত পায়ে ধরিয়াছি—এক অপরাধ কি মার্জনা হয় না!

গো। এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিণী।

ভ্রমর। তা নয়। আমি এবার বাপের বাড়ী গিয়া, বাপের সাহায্যে যাহা করিয়াছি, তাহা দেখ।

এই বলিয়া ভ্রমর একখানা কাগজ দেখাইলেন। গোবিন্দলালের হাতে তাহা দিয়া বলিলেন, "পড়"

গোবিন্দলাল পড়িয়া দেখিলেন—দানপত্র। ভ্রমর, উচিত মূল্যের ষ্ট্যাম্পে আপনার সমুদয় সম্পত্তি স্বামীকে দানকরিতেছেন। তাহা রেজিস্টারী হইয়াছে। গোবিন্দলাল পড়িয়া বলিল, "তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ। কিন্তু তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে। তুমি বিষয় দান করিবে, আমি ভোগ করিব—এ সম্বন্ধ নহে।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল বহুমূল্য দানপত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

ভ্রমর বলিলেন "পিতা বলিয়া দিয়াছেন, ইহা ছিঁড়িয়া ফেলা বৃথা। সরকারিতে ইহার নকল আছে।"

গো। থাকে থাক। আমি চলিলাম।

ভ্র। কবে আসিবে?

গো। আসিব না।

ভ্র। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা—তোমার দাসানুদাসী—তোমার কথার ভিখারী—আসিবে না কেন?

গো। ইচ্ছা নাই।

ভ্র। ধর্ম্ম নাই কি?

গো। বুঝি আমার তাও নাই।

বড় কষ্টে ভ্রমর চোখের জল রোধ করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল—ভ্রমর জোড়হাত করিয়া, অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তবে যাও—পার, আসিও না। বিনা অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর—কিন্তু মনে রাখিও উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও—এক দিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—এক দিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়?—দেবতা সাক্ষী। যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে, আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।"

এই বলিয়া ভ্রমর ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই আখ্যায়িকা আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে ভ্রমরের একটি পুত্র হইয়া সূতিকাগারেই নষ্ট হয়। ভ্রমর আজি কক্ষান্তরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সেই সাত দিনের ছেলের জন্য কাঁদিতে লাগিল। মেঝের উপর পড়িয়া, ধূলায় লুটাইয়া অশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল। "আমার ননীর পুত্তলী, আমার কাঙ্গালের সোনা, আজ তুই কোথায়? আজি তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত? আমি কুরূপা কুৎসিতা, তোকে কে কুৎসিত বলিত? তোর চেয়ে কে সুন্দর? একবার দেখা দে বাপ্—এই বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পারিস্ না—মরিলে কি আর দেখা দেয় না—"

ভ্রমর তখন যুক্তকরে, মনে মনে ঊর্ধ্বমুখে, অথচ অস্ফুট বাক্যে দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কেহ আমাকে বলিয়া দাও—আমার কি দোষ, এই সতের বৎসর মাত্র বয়সে এমন অসম্ভব দুর্দশা ঘটিল ; আমার পুত্র মরিয়াছে —আমার স্বামী ত্যাগ করিল—আমার সতের বৎসর মাত্র বয়স, আমি এই বয়সে স্বামীর ভালবাসা বিনা আর কিছু ভালবাসি নাই—আমার ইহলোকে আর কিছু কামনা নাই—আর কিছু কামনা করিতে শিখি নাই—আমি আজ এই সতের বৎসর বয়সে তাহাতে নিরাশ হইলাম কেন ?"

ভ্রমর কাঁদিয়া কাটিয়া সিদ্ধান্ত করিল—দেবতারা নিতান্ত নিষ্ঠুর। যখন দেবতা নিষ্ঠুর, তখন মনুষ্য আর কি করিবে—কেবল কাঁদিবে। ভ্রমর কেবল কাঁদিতে লাগিল।

এ দিকে গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ধীরে ধীরে বহির্বাটীতে আসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব—গোবিন্দলাল চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আসিলেন। বালিকার অতি সরল যে প্রীতি,—অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিনরাত্রি ছুটিতেছে—ভ্রমরের কাছে সেই অমূল্য প্রীতি পাইয়া গোবিন্দলাল সুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না। ভাবিলেন, যাহা করিয়াছি, তাহা আর এখন ফিরে না—এখন ত যাই। এখন যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই। বুঝি আর ফেরা হইবে না। যাহা হউক, যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই।

সেই সময়ে যদি গোবিন্দলাল দুই পা ফিরিয়া গিয়া ভ্রমরের রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া একবার বলিতেন—"ভ্রমর, আমি আবার আসিতেছি", তবে সকল মিটিত। গোবিন্দলালের অনেক বার সে ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলেও তাহা করিলেন না। ইচ্ছা হইলেও একটু লজ্জা করিল। ভাবিলেন, এত তাড়াতাড়ি কি ? যখন মনে করিব তখন ফিরিব। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী। আবার ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। যাহা হয় একটা স্থির করিবার বুদ্ধি হইল না। যে পথে যাইতেছেন, সেই পথে চলিলেন। তিনি চিন্তাকে বর্জন করিয়া—বহির্বাটীতে আসিয়া সজ্জিত অশ্বে আরোহণপূর্বক কশাঘাত করিলেন। পথে যাইতে যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হৃদয়মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।

———

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম বৎসর

হরিদ্রাগ্রামের বাড়ীতে সংবাদ আসিল,—গোবিন্দলাল, মাতা প্রভৃতি সঙ্গে, নির্বিঘ্নে সুস্থ শরীরে কাশীধামে পৌঁছিয়াছেন। ভ্রমরের কাছে কোন পত্র আসিল না। অভিমানে ভ্রমরও পত্র লিখিল না। পত্রাদি আমলাবর্গের কাছে আসিতে লাগিল।

এক মাস গেল, দুই মাস গেল। পত্রাদি আসিতে লাগিল। শেষ এক দিন সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাটী যাত্রা করিয়াছেন।

ভ্রমর শুনিয়া বুঝিল যে, গোবিন্দলাল কেবল মাকে ভুলাইয়া অন্যত্র গমন করিয়াছেন। বাড়ী আসিবেন এমন ভরসা হইল না।

এই সময়ে ভ্রমর গোপনে সর্বদা রোহিণীর সংবাদ লইতে লাগিল। রোহিণী রাঁধে, বাড়ে, খায়, গা ধোয়, জল আনে। আর কিছুই সংবাদ নাই। ক্রমে এক দিন সংবাদ আসিল, রোহিণী পীড়িতা। ঘরের ভিতর মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, বাহির হয় না। ব্রহ্মানন্দ আপনি রাঁধিয়া খায়।

তার পর এক দিন সংবাদ আসিল যে, রোহিণী কিছু সারিয়াছে, কিন্তু পীড়ার মূল যায় নাই। শূলরোগ—চিকিৎসা নাই। রোহিণী আরোগ্য জন্য তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইবে। শেষ সংবাদ—রোহিণী হত্যা দিতে তারকেশ্বরে গিয়াছে। একাই গিয়াছে—কে সঙ্গে যাইবে?

এ দিকে তিন চারি মাস গেল—গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিল না। পাঁচ মাস ছয় মাস হইল, গোবিন্দলাল ফিরিল না। ভ্রমরের রোদনের শেষ নাই। কেবল মনে করিত, এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন—সংবাদ পাইলেই বাঁচি। এ সংবাদও পাই না কেন।

শেষ ননন্দাকে বলিয়া শাশুড়ীকে পত্র লিখাইল—আপনি মাতা, অবশ্য পুত্রের সংবাদ পান। শাশুড়ী লিখিলেন, তিনি গোবিন্দলালের সংবাদ পাইয়া

থাকেন। গোবিন্দলাল প্রয়াগ, মথুরা, জয়পুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া আপাততঃ দিল্লী অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্র সেখান হইতে স্থানান্তরে গমন করিবেন। কোথাও স্থায়ী হইতেছেন না।

এ দিকে রোহিণীও আর ফিরিল না। ভ্রমর ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ জানেন, রোহিণী কোথায় গেল। আমার মনের্ সন্দেহ আমি পাপমুখে ব্যক্ত করিব না। ভ্রমর আর সহ্য করিতে পারিলেন না; কাঁদিতে কাঁদিতে ননন্দাকে বলিয়া শিবিকারোহণে পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

সেখানে গিয়া গোবিন্দলালের কোন সংবাদ পাওয়া দুরূহ দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া হরিদ্রাগ্রামেও স্বামীর কোন সংবাদ না পাইয়া আবার শাশুড়ীকে পত্র লিখাইলেন। শাশুড়ী এবার লিখিলেন, "গোবিন্দলাল আর কোন সংবাদ দেয় না; এখন সে কোথায় আছে জানি না। কোনও সংবাদ পাই না।" এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল। প্রথম বৎসরের শেষে ভ্রমর রুগ্নশয্যায় শয়ন করিলেন। অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভ্রমর রুগ্নশয্যাশায়িনী শুনিয়া ভ্রমরের পিতা ভ্রমরকে দেখিতে আসিলেন। ভ্রমরের পিতার পরিচয় আমরা সবিশেষ দিই নাই—এখন দিব। তাঁহার পিতা মাধবীনাথ সরকারের বয়স একচত্বারিংশৎ বৎসর। তিনি দেখিতে বড় সুপুরুষ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকমধ্যে বড়, মতভেদ ছিল। অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিত—অনেকে বলিত, তাঁহার মত দুষ্ট লোক আর নাই। তিনি যে চতুর, তাহা সকলেই স্বীকার করিত—এবং যে তাঁহার প্রশংসা করিত, সেও তাঁহাকে ভয় করিত।

মাধবীনাথ কন্যার দশা দেখিয়া অনেক রোদন করিলেন। দেখিলেন সেই শ্যামা সুন্দরী, যাহার সর্বাবয়ব সুললিতগঠন ছিল—এক্ষণে বিশুষ্কবদন, শীর্ণশরীর, প্রকটকণ্ঠাস্থি, নিমগ্ননয়নেন্দীবর। ভ্রমরও অনেক কাঁদিল। শেষে উভয়ে রোদন সংবরণ করিলে পর ভ্রমর বলিল, "বাবা, আমার বোধ হয় আর দিন নাই। আমার কিছু ধর্ম কর্ম করাও। আমি ছেলেমানুষ হলে কি হয়, আমার ত

দিন ফুরাল। দিন ফুরাল ত আর বিলম্ব কেন? আমার অনেক টাকা আছে, আমি ব্রত নিয়ম করিব। কে এ সকল করাইবে? বাবা, তুমি আমার ব্যবস্থা কর।"

মাধবীনাথ কোন উত্তর করিলেন না—যন্ত্রণা অসহ্য হইলে তিনি বহির্বাটীতে আসিলেন। বহির্বাটীতে অনেকক্ষণ বসিয়া রোদন করিলেন। কেবল রোদন নহে—সেই মর্মভেদী দুঃখ মাধবীনাথের হৃদয়ে ঘোরতর ক্রোধে পরিণত হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, "যে আমার কন্যার উপর এ অত্যাচার করিয়াছে—তাহার উপর তেমনই অত্যাচার করে, এমন কি জগতে কেহ নাই? ভাবিতে ভাবিতে মাধবীনাথের হৃদয় কাতরতার পরিবর্তে প্রদীপ্ত ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইল। মাধবীনাথ তখন রক্তোৎফুল্ললোচনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যে আমার ভ্রমরের এমন সর্বনাশ করিয়াছে—আমি তাহার এমনই সর্বনাশ করিব।"

তখন মাধবীনাথ কতক সুস্থির হইয়া অন্তঃপুরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন কন্যার কাছে গিয়া বলিলেন, "মা, তুমি ব্রত নিয়ম করিবার কথা বলিতেছিলে, আমি সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। এখন তোমার শরীর বড় রুগ্ন; ব্রত নিয়ম করিতে গেলে অনেক উপবাস করিতে হয়, এখন তুমি উপবাস সহ্য করিতে পারিবে না। একটু শরীর সারুক—"

ভ্র। এ শরীর কি আর সারিবে?

মা। সারিবে না—কি হইয়াছে? তোমার এখানে একটু চিকিৎসা হইতেছে না—কেমন করিয়াই বা হইবে? শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই, কেহ কাছে নাই—কে চিকিৎসা করাইবে? তুমি এখন আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া চিকিৎসা করাইব। আমি এখন দুইদিন এখানে থাকিব—তাহার পর তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া রাজগ্রামে যাইব।

রাজগ্রামে ভ্রমরের পিত্রালয়।

কন্যার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মাধবীনাথ কন্যার কার্যকারকবর্গের নিকট গেলেন। দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, বাবুর কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে?" দেওয়ানজী উত্তর করিল, "কিছু না।"

মাধবীনাথ। তিনি এখন কোথায় আছেন?

দেওয়ানজী। তাঁহার কোন সংবাদই আমরা কেহ বলিতে পারি না। তিনি কোন সংবাদই পাঠান না।

মা। কাহার কাছে এ সংবাদ পাইতে পারিব?

দে। তাহা জানিলে ত আমরা সংবাদ লইতাম। কাশীতে মা ঠাকুরাণীর কাছে সংবাদ জানিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম—কিন্তু সেখানেও কোন সংবাদ আইসে না। এক্ষণে অজ্ঞাতবাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ কন্যার দুর্দশা দেখিয়া স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহার প্রতিকার করিবেন। গোবিন্দলাল ও রোহিণী এই অনিষ্টের মূল। অতএব প্রথমেই সন্ধান কর্তব্য, সেই পামর পামরী কোথায় আছে। নচেৎ দুষ্টের দণ্ড হইবে না—ভ্রমরও মরিবে।

তাহারা একেবারে লুকাইয়াছে। যে সকল সূত্রে তাহাদের ধরিবার সম্ভাবনা, সকলই অবচ্ছিন্ন করিয়াছে; পদচিহ্নমাত্র মুছিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মাধবীনাথ বলিলেন, যদি আমি তাহাদের সন্ধান করিতে না পারি তবে বৃথাই আমার পৌরুষের শ্লাঘা করি।

এইরূপ স্থির সংকল্প করিয়া মাধবীনাথ একাকী রায়দিগের বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। হরিদ্রাগ্রামে একটি পোস্ট আপিস ছিল; মাধবীনাথ বেত্রহস্তে হেলিতে দুলিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, ধীরে ধীরে, নিরীহ ভালমানুষের মত, সেইখানে গিয়া দর্শন দিলেন।

ডাকঘরে, অন্ধকার চালাঘরের মধ্যে মাসিক পনর টাকা বেতনভোগী একটি ডিপুটি পোস্ট মাস্টার বিরাজ করিতেছিলেন। এমটি আম্রকাষ্ঠের ভগ্ন টেবিলের উপরে কতকগুলি চিঠি, চিঠির ফাইল, চিঠির থাম, একখানি খুরিতে কতকটা জিউলির আটা, একটি নিক্তি, ডাকঘরের মোহর ইত্যাদি লইয়া, পোস্ট মাস্টার ওরফে পোস্ট বাবু গম্ভীরভাবে, পিয়ন মহাশয়ের নিকট আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। ডিপুটি পোস্ট মাস্টার বাবু পান ১৫ টাকা, পিয়ন পায় ৭ টাকা। সুতরাং পিয়ন মনে করে, সাত আনা আর পনর আনায় যে তফাত, বাবুর সঙ্গে আমার সঙ্গে তাহার অধিক তফাত নহে। কিন্তু বাবু মনে মনে জানেন যে, আমি একটি ডিপুটি—ও বেটা পিয়াদা—আমি উহার হর্তা কর্তা বিধাতা পুরুষ

উহাতে আমাতে জমীন আশমান্ ফারাক। সেই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য, পোস্ট মাস্টার বাবু সর্বদা সে গরীবকে তর্জন গর্জন করিয়া থাকেন—সেও সাত আনার ওজনে উত্তর দিয়া থাকে। বাবু আপাততঃ চিঠি ওজন করিতেছিলেন, এবং পিয়াদাকে সঙ্গে সঙ্গে আশী আনার ওজনে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রশান্তমূর্তি সহাস্যবদন মাধবীনাথ বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক দেখিয়া, পোস্ট মাস্টার বাবু আপাততঃ পিয়াদার সঙ্গে কচকচি বন্ধ করিয়া, হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। ভদ্রলোককে সমাদর করিতে হয়, এমন কথাটা তাঁহার মনে উদয় হইল—কিন্তু সমাদর কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা তাঁহার শিক্ষার মধ্যে নহে—সুতরাং তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

মাধবীনাথ দেখিলেন, একটা বানর। সহাস্যবদনে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ?"

পোস্ট মাস্টার বলিলেন, "—তু—তুমি—আপনি?"

মাধবীনাথ ঈষৎ হাস্য সংবরণ করিয়া অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রাতঃপ্রণাম!"

তখন পোস্ট মাস্টার বাবু বলিলেন, "বসুন।"

মাধবীনাথ কিছু বিপদে পড়িলেন, পোস্টবাবু ত বলিলেন, "বসুন," কিন্তু বসেন কোথা—বাবু খোদ এক অতি প্রাচীন ত্রিপাদমাত্রাবশিষ্ট চৌকিতে বসিয়া আছেন—তাহা ভিন্ন আর আসন কোথাও নাই। তখন সেই পোস্ট মাস্টার বাবুর সাত আনা, হরিদাস পিয়াদা—একখানা ভাঙ্গা টুলের উপর হইতে রাশিখানি ছেঁড়া বহি নামাইয়া রাখিয়া মাধবীনাথকে বসিতে দিল। মাধবীনাথ বসিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "কি হে বাপু, কেমন আছ? তোমাকে দেখিয়াছি না?"

পিয়াদা। আজ্ঞা, আমি চিঠি বিলি করিয়া থাকি।

মাধবী। তাই চিনিতেছি। এক ছিলিম তামাক সাজ দেখি—

মাধবীনাথ গ্রামান্তরের লোক। তিনি কখনই হরিদাস বৈরাগী পিয়াদাকে দেখেন নাই এবং বৈরাগী বাবাজিও তাঁহাকে দেখেন নাই। বাবাজি মনে করিলেন—বাবুটা রকমসই বটে, চাহিলে কোন্ না চারি গণ্ডা বকশিষ দিবে। এই ভাবিয়া হরিদাস হুঁকার উল্লাসে ধাবিত হইলেন।

মাধবীনাথ আদৌ তামাকু খান না—কেবল হরিদাস বাবাজিকে বিদায় করিবার জন্য তামাকুর ফরমায়েস্ করিলেন।

পিয়াদা মহাশয় স্থানান্তরে গমন করিলে, মাধবীনাথ পোস্ট মাস্টার বাবুকে বলিলেন, "আপনার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসা হইয়াছে।"

পোস্ট মাস্টার বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয়—নিবাস বিক্রমপুর। অন্য দিকে যেমন নির্বোধ হউক না কেন—আপনার কাজ বুঝিতে সূচ্যগ্রবুদ্ধি। বুঝিলেন যে, বাবুটি কোন বিষয়ের সন্ধানে আসিয়াছেন। বলিলেন "কি কথা মহাশয়?"

মাধ। ব্রহ্মানন্দকে আপনি চিনেন?

পোস্ট। চিনি না—চিনি—ভাল চিনি না।

মাধবীনাথ বুঝিলেন, অবতার নিজমূর্তি ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে। বলিলেন, "আপনার ডাকঘরে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের নামে কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে?"

পোস্ট। আপনার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের আলাপ নাই?

মাধ। থাক বা না থাক, কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে আপনার কাছে আসিয়াছি।

পোস্ট মাস্টার বাবু তখন আপনার উচ্চ পদ এবং ডিপুটি অভিধান স্মরণপূর্বক অতিশয় গম্ভীর হইয়া বসিলেন, এবং অল্প রুষ্টভাবে বলিলেন, "ডাকঘরের খবর আমাদের বলিতে বারণ আছে।" ইহা বলিয়া পোস্ট মাস্টার নীরবে চিঠি ওজন করিতে লাগিল।

মাধবীনাথ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, "ওহে বাপু, তুমি অমনি কথা কবে না, তা জানি। সে জন্য কিছু সঙ্গেও আনিয়াছি—কিছু দিয়া যাইব—এখন যা যা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক বল দেখি—"

তখন, পোস্ট বাবু হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিলেন, "কি কন?"

মা। কই এই, ব্রহ্মানন্দের নামে কোন চিঠি পত্র ডাকঘরে আসিয়া থাকে?

পো। আসে।

মা। কত দিন অন্তর?

পো। যে কথাটি বলিয়া দিলাম, তাহার এখনও টাকা পাই নাই। আগে তার টাকা বাহির করুন; তবে নূতন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

মাধবীনাথের ইচ্ছা ছিল, পোস্ট মাস্টারকে কিছু দিয়া যান কিন্তু তাহার

চরিত্রে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—বলিলেন, "বাপু, তুমি ত বিদেশী মানুষ দেখছি—আমায় চেন কি ?"

পোস্ট মাস্টার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না। তা আপনি যেই হউন না কেন—আমরা কি পোস্ট অফিসের খবর যাকে তাকে বলি ? কে তুমি ?"

মা। আমার নাম মাধবীনাথ সরকার—বাড়ী রাজগ্রাম। আমার পাল্লায় কত লাঠিয়াল আছে খবর রাখ ?

পোস্ট বাবুর ভয় হইল—মাধবী বাবুর নাম ও দোর্দণ্ড প্রতাপ শুনিয়াছিলেন। পোস্ট বাবু একটু চুপ করিলেন।

মাধবীনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি যাহা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—সত্য সত্য জবাব দাও। কিছু তঞ্চক করিও না। করিলে তোমায় কিছু দিব না—এক পয়সাও নহে। কিন্তু যদি না বল, তবে তোমার ঘরে আগুন দিব, তোমার ডাকঘর লুঠ করিব ; আদালতে প্রমাণ করাইব যে, তুমি নিজে লোক দিয়া সরকারি টাকা অপহরণ করিয়াছ—কেমন, এখন বলিবে ?"

পোস্ট বাবু থরহরি কাঁপিতে লাগিলেন—বলিলেন, "আপনি রাগ করেন কেন ? আমি ত আপনাকে চিনিতাম না, বাজে লোক মনে করিয়াই ওরূপ করিয়াছিলাম—আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন তাহা বলিব।"

মা। কত দিন অন্তর ব্রহ্মানন্দের চিঠি আসে ?

পোস্ট। প্রায় মাসে মাসে—ঠিক ঠাওর নাই।

মা। তবে রেজিস্টারি হইয়াই চিঠি আসে ?

পোস্ট। হাঁ—প্রায় অনেক চিঠিই রেজিস্টরি করা।

মা। কোন্ আপিস্ হইতে রেজিস্টরি হইয়া আইসে ?

পোস্ট। মনে নাই।

মা। তোমার আপিসে একখানা করিয়া রসিদ থাকে না ?

পোস্ট মাস্টার রসিদ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। একখানি পড়িয়া বলিলেন, "প্রসাদপুর" "প্রসাদপুর কোন জেলা ? তোমদের লিস্টি দেখ।" পোস্টমাস্টার কাঁপিতে কাঁদিতে ছাপান লিস্টি দেখিয়া বলিলেন, "যশোহর।"

মা। দেখ তবে আর কোথা হইতে রেজিস্টরি চিঠি উহার নামে আসিয়াছে। সব রসিদ দেখ।

পোস্ট বাবু দেখিলেন, ইদানীন্তন যত পত্র আসিয়াছে, সকলই প্রসাদপুর হইতে। মাধবীনাথ, পোস্ট মাস্টার বাবুর কম্পমান হস্তে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখনও হরিদাস বাবাজির হুঁকা জুটিয়া উঠে নাই। মাধবীনাথ হরিদাসের জন্যও একটি টাকা রাখিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে, পোস্ট বাবু তাহা আত্মসাৎ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। মাধবীনাথ, গোবিন্দলাল ও রোহিণীর অধঃপতনকাহিনী সকলই লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, রোহিণী গোবিন্দলাল এক স্থানেই গোপনে বাস করিতেছে। ব্রহ্মানন্দের অবস্থাও তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন—জানিতেন যে, রোহিণী ভিন্ন তাঁহার আর কেহই নাই। অতএব যখন পোস্ট আপিসে জানিলেন যে, ব্রহ্মানন্দের নামে মাসে মাসে রেজিস্টরি হইয়া চিঠি আসিতেছে—তখন বুঝিলেন যে, হয় রোহিণী, নয় গোবিন্দলাল তাঁহাকে মাসে মাসে খরচ পাঠায়; প্রসাদপুর হইতে চিঠি আসে, অতএব উভয়েই প্রসাদপুর কিম্বা তাহার নিকটবর্তী কোন স্থানে অবশ্য বাস করিতেছে, কিন্তু নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য তিনি কন্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়াই থাঁড়িতে একটি লোক পাঠাইলেন। সাব্‌ইন্‌স্পেক্টরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "একটি কনস্টেবল পাঠাইবেন, বোধ হয় কতকগুলি চোরা মাল ধরাইয়া দিতে পারিব।"

সাব্‌ইনস্পেক্টর মাধবীনাথকে বিলক্ষণ জানিতেন—ভয়ও করিতেন—পত্র-প্রাপ্তি মাত্র নিদ্রাসিংহ কনস্টেবলকে পাঠাইয়া দিলেন।

মাধবীনাথ নিদ্রাসিংহের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, "বাপু হে—হিল্লি দিল্লি কইও না—যা বলি, তাই কর। ঐ গাছতলায় গিয়া লুকাইয়া থাক। কিন্তু এমনভাবে গাছতলায় দাঁড়াইবে যেন এখান হইতে তোমাকে দেখা যায়। আর কিছু করিতে হইবে না।" নিদ্রাসিংহ স্বীকৃত হইয়া বিদায় লইল। মাধবীনাথ তখন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্মানন্দ আসিয়া নিকটে বসিল। তখন আর কেহ সেখানে ছিল না।

পরস্পর স্বাগত জিজ্ঞাসার পর মাধবীনাথ বলিলেন, "মহাশয় আমার স্বর্গীয় বৈবাহিক মহাশয়ের বড় আত্মীয় ছিলেন। এখন তাঁহারা ত কেহই নাই—আমার জামাতাও বিদেশস্থ। আপনার কোন বিপদ্ আপদ্ পড়িলে আমাদিগকেই দেখিতে হয়, তাই আপনাকে ডাকাইয়াছি।"

ব্রহ্মানন্দের মুখ শুকাইল। বলিল, "বিপদ্ কি মহাশয়?" মাধবীনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি কিছু বিপদগ্রস্ত বটে।"

ব্র। কি বিপদ্ মহাশয়?

মা। বিপদ্ সমূহ। পুলিসে কি প্রকারে নিশ্চয় জানিয়াছে যে, আপনার কাছে একখানা চোরা নোট আছে।

ব্রহ্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল। "সে কি? আমার কাছে চোরা নোট!"

মা। তোমার জানা, চোরা না হইতে পারে। অন্যে তোমাকে চোরা নোট দিয়াছে, তুমি না জানিয়া তুলিয়া রাখিয়াছ।

ব্র। সে কি মহাশয়! আমাকে নোট কে দিবে?

মাধবীনাথ তখন আওয়াজ ছোট করিয়া বলিলেন, "আমি সকলই জানিয়াছি—পুলিসেও জানিয়াছে। বাস্তবিক পুলিসের কাছেই এ কথা শুনিয়াছি। চোরা নোট প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছে। ঐ দেখ পুলিসের কন্‌স্টেবল আসিয়া তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছে—আমি তাহাকে কিছু দিয়া আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছি।"

মাধবীনাথ তখন বৃক্ষতলবিহারী—রুলধারী গুম্ফশ্মশ্রু-শোভিত জলধর-গঞ্জিত কন্‌স্টেবলের কান্তমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন।

ব্রহ্মানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল। মাধবীনাথের পায়ে জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল, "আপনি রক্ষা করুন।"

মা। ভয় নাই। এবার প্রসাদপুর হইতে কোন্ কোন্ নম্বরের নোট পাইয়াছ, বল দেখি। পুলিসের লোক আমার কাছে নোটের নম্বর রাখিয়া গিয়াছে! যদি সে নম্বরের নোট না হয়, তবে ভয় কি? নম্বর বদলাইতে কতক্ষণ? এবারকার প্রসাদপুরের পত্রখানি লইয়া আইস দেখি—নোটের নম্বর দেখি।

ব্রহ্মানন্দ যায় কি প্রকারে? ভয় করে—কনস্টেবল যে গাছতলায়!

মাধবীনাথ বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি।" মাধবীনাথের আদেশমত একজন দ্বারবান ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে গেল। ব্রহ্মানন্দ রোহিণীর পত্র লইয়া আসিলেন। সেই পত্রে মাধবীনাথ যাহা যাহা খুঁজিতেছিলেন, সকলই পাইলেন।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এ নম্বরের নোট নহে। কোন ভয় নাই—তুমি ঘরে যাও। আমি কনস্টেবলকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

ব্রহ্মানন্দ মৃতদেহে প্রাণ পাইল। উর্ধ্বশ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিল।

মাধবীনাথ কন্যাকে চিকিৎসার্থ স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তাহার চিকিৎসার্থ উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, স্বয়ং কলিকাতায় চলিলেন। ভ্রমর অনেক আপত্তি করিল—মাধবীনাথ শুনিলেন না। শীঘ্রই আসিতেছি, এই বলিয়া কন্যাকে প্রবোধ দিয়া গেলেন।

কলিকাতায় নিশাকর দাস নামে মাধবীনাথের একজন বড় আত্মীয় ছিলেন। নিশাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা আট দশ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ। নিশাকর কিছু করেন না—পৈতৃক বিষয় আছে—কেবল একটু একটু গীতবাদ্যের অনুশীলন করেন। নিষ্কর্মা বলিয়া সর্বদা পর্যটনে গমন করিয়া থাকেন। মাধবীনাথ তাঁহার কাছে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। অন্যান্য কথার পর নিশাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে, বেড়াইতে যাইবে?"

নিশা। কোথায়?

মা। যশোর।

নি। সেখানে কেন?

মা। নীলকুঠি কিনব।

নি। চল।

তখন বিহিত উদ্যোগ করিয়া দুই বন্ধু দুই এক দিনের মধ্যে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে প্রসাদপুর যাইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেখ, ধীরে ধীরে শীর্ণশরীরা চিত্রানদী বহিতেছে—তীরে অশ্বত্থ কদম্ব আম্র খর্জুর প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষশোভিত উপবনে কোকিল দয়েল পাপিয়া ডাকিতেছে। নিকটে গ্রাম নাই; প্রসাদপুর নামে একটি ক্ষুদ্র বাজার প্রায় এক ক্রোশ পথ দূর। এখানে মনুষ্যসমাগম নাই দেখিয়া, নিঃশঙ্কে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া, পূর্বকালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক নীলকুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে নীলকর এবং তাহার ঐশ্বর্য ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে—তাহার আমীন তাগাদগীর নায়েব গোমস্তা সকলে উপযুক্ত স্থানে স্বকর্মার্জিত ফলভোগ করিতেছেন। একজন বাঙ্গালী সেই জনশূন্য প্রান্তরস্থিত রম্য অট্টালিকা ক্রয় করিয়া তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পুষ্পে, প্রস্তরপুত্তলে, আসনে, দর্পণে, চিত্রে, গৃহ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অভ্যন্তরে দ্বিতলস্থ বৃহৎ কক্ষমধ্যে আমরা প্রবেশ করি। কক্ষমধ্যে কতকগুলি রমণীয় চিত্র—কিন্তু কতকগুলি সুরুচিবিগর্হিত—অবর্ণনীয়। নির্মল সুকোমল আসনোপরি উপবেশন করিয়া একজন শ্মশ্রুধারী মুসলমান একটা তম্বুরার কান মুচড়াইতেছে—কাছে বসিয়া এক যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটি তবলায় ঘা দিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্বর্ণালঙ্কার ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিতেছে—পার্শ্বস্থ প্রাচীরবিলম্বী দুইখানি বৃহৎ দর্পণে উভয়ের ছায়াও ঐরূপ করিতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া, একজন যুবা পুরুষ নবেল পড়িতেছেন এবং মধ্যস্থ মুক্ত দ্বারপথে যুবতীর কার্য দেখিতেছেন।

তম্বুরার কান মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়ীধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার খ্যান্ খ্যান্ ওস্তাদজীর বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল—তখন তিনি সেই গুম্ফ শ্মশ্রুর অন্ধকারমধ্য হইতে কতকগুলি তুষারধবল দন্ত বিনির্গত করিয়া, বৃষভদুর্লভ কণ্ঠরব বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। রব নির্গত করিতে করিতে সে তুষারধবল দন্তগুলি বহুবিধ খিচুনিতে পরিণত হইতে লাগিল; এবং ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাশি তাহার অনুবর্তন করিয়া নানাপ্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল। তখন যুবতী খিচুনিসন্তাড়িত হইয়া সেই বৃষভদুর্লভ রবের সঙ্গে আপনার কোমল কণ্ঠ মিশাইয়া গীত আরম্ভ করিল—তাহাতে লরু মোটা আওয়াজে, সোনালি রূপালি রকম একপ্রকার গীত হইতে লাগিল।

এইখানে যবনিকা পতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব। কিন্তু

তথাপি সেই অশোক বকুল কুটজ কুরুবক কুঞ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকূজন, সেই ক্ষুদ্রনদীতরঙ্গচালিত রাজহংসের কলনাদ, সেই যূথী জাতি মল্লিকা মধু-মালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ, সেই গৃহমধ্যে নীলকাচপ্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব মাধুরী, সেই রজতস্ফটিকাদিনির্মিত পুষ্পাধারে সুবিন্যস্ত কুসুমগুচ্ছের শোভা, সেই গৃহশোভাকারী দ্রব্যজাতের বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণ আর সেই গায়কের বিশুদ্ধ-স্বরসপ্তকের ভূয়সী সৃষ্টি, এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম। কেন না, যে যুবক নিবিষ্টমনে যুবতীর প্রতি চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে, তাহার হৃদয়ে ঐ কটাক্ষের মাধুর্য্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

এই যুবা গোবিন্দলাল—ঐ যুবতী রোহিণী। এই গৃহ গোবিন্দলাল ক্রয় করিয়াছেন। এইখানেই ইহারা স্থায়ী।

অকস্মাৎ রোহিণীর তবলা বেসুরা বলিল। ওস্তাদজীর তম্বুরার তার ছিঁড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল—গীত বন্ধ হইল; গোবিন্দলালের হাতের নবেল পড়িয়া গেল। সেই সময় সেই প্রমোদগৃহের দ্বারে একজন অপরিচিত যুবা পুরুষ প্রবেশ করিল। আমরা তাহাকে চিনি—সে নিশাকর দাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বিতল অট্টালিকার উপর তলে রোহিণীর বাস—তিনি হাপ্ পরদানসীন। নিম্নতলে ভৃত্যগণ বাস করে। সে বিজনমধ্যে প্রায় কেহই কখনও গোবিন্দ-লালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত না—সুতরাং সেখানে বহির্বাটীর প্রয়োজন ছিল না। যদি কালে ভদ্রে কোন দোকানদার বা অপর কেহ আসিত, উপরে বাবুর কাছে সংবাদ যাইত; বাবু নীচে আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। অতএব বাবুর বসিবার জন্য নীচেও একটি ঘর ছিল।

নিম্নতলে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া নিশাকর দাস কহিলেন, "কে আছ গা এখানে?"

গোবিন্দলালের সোণা রূপো নামে দুই ভৃত্য ছিল। মনুষ্যের শব্দে দুই জনেই দ্বারের নিকট আসিয়া নিশাকরকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। নিশাকরকে দেখিবামাত্র বিশেষ ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হইল—নিশাকরও বেশভূষা সম্বন্ধে

একটু জাঁক করিয়া গিয়াছেন। সেরূপ লোক কখনও সে চৌকাঠ মাড়ায় নাই—দেখিয়া ভৃত্যেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। সোণা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাকে খুঁজেন?"

নিশা। তোমাদেরই। বাবুকে সংবাদ দাও যে, একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

সোণা। কি নাম বলিব?

নিশা। নামের প্রয়োজনই বা কি? একটি ভদ্রলোক বলিয়া বলিও।

এখন, চাকরেরা জানিত যে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবু সাক্ষাৎ করেন না—সেরূপ স্বভাবই নয়। সুতরাং চাকরেরা সংবাদ দিতে বড় ইচ্ছুক ছিল না। সোণা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রূপো বলিল, "আপনি অনর্থক আসিয়াছেন—বাবু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না।"

নিশা। তবে তোমরা থাক—আমি বিনা সংবাদেই যাইতেছি।

চাকরেরা ফাঁপরে প'ড়িল। বলিল, "না মহাশয়, আমাদের চাকরী যাবে।"

নিশাকর তখন একটি টাকা বাহির করিয়া বলিলেন, "যে সংবাদ করিবে, তাহার এই টাকা।"

সোণা ভাবিতে লাগিল—রূপো চিলের মত ছোঁ মারিয়া নিশাকরের হাত হইতে টাকা লইয়া উপরে সংবাদ দিতে গেল।

গৃহটি বেষ্টন করিয়া যে পুষ্পোদ্যান আছে, তাহা অতি মনোরম। নিশাকর সোণাকে বলিলেন, "আমি এ ফুলবাগানে বেড়াইতেছি—আপত্তি করিও না —যখন সংবাদ আসিবে, তখন আমাকে ঐখান হইতে ডাকিয়া আনিও।" এই বলিয়া নিশাকর সোণার হাতে আর একটি টাকা দিলেন।

রূপো যখন বাবুর কাছে গেল, তখন বাবু কোন কার্যবশতঃ অনবসর ছিলেন, ভৃত্য তাঁহাকে নিশাকরের সংবাদ কিছুই বলিতে পারিল না। এ দিকে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে নিশাকর একবার ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, এক পরমা সুন্দরী জানালায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছে।

রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া ভাবিতেছিল, "এ কে? দেখিয়াই বোধ হইতেছে যে, এ দেশের লোক নয়। বেশভূষা রকম সকম দেখিয়া বোঝা যাইতেছে, বড় মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ—গোবিন্দলালের চেয়ে? না, তা নয়। গোবিন্দলালের রঙ ফরশা—কিন্তু এর মুখ চোখ ভাল। বিশেষ

চোখ—আ মরি! কি চোখ! এ কোথা থেকে এলো? হলুদগাঁয়ের লোক ত নয়—সেখানকার সবাইকে চিনি! ওর সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাই না? ক্ষতি কি—আমি ত কখনও গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হইব না।”

রোহিণী এইরূপ ভাবিতেছিল, এমত সময়ে নিশাকর উন্নতমুখে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করাতে চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল। চক্ষে কোন কথাবার্তা হইল কি না, তাহা আমরা জানি না—জানিলেও বলিতে ইচ্ছা করি না—কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, এমত কথাবার্তা হইয়া থাকে।

এমত সময়ে রূপো বাবুর অবকাশ পাইয়া বাবুকে জানাইল যে, একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথা হইতে আসিয়াছে?”

রূপো। তাহা জানি না।

বাবু। তা না জিজ্ঞাসা করে খবর দিতে আসিয়াছিস কেন?

রূপো দেখিল, বোকা বনিয়া যাই। উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে বলিল, “তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, বাবুর কাছেই বলিব।”

বাবু বলিলেন, “তবে বল গিয়া, সাক্ষাৎ হইবে না।”

এদিকে নিশাকর বিলম্ব দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে, বুঝি গোবিন্দলাল সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু দুষ্কৃতকারীর সঙ্গে ভদ্রতা কেনই করি? আমি কেন আপনিই উপরে চলিয়া যাই না?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভৃত্যের পুনরাগমনের প্রতীক্ষা না করিয়াই নিশাকর গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সোনা রূপো কেহই নীচে নাই। তখন তিনি নিরুদ্বেগে সিঁড়িতে উঠিয়া, যেখানে গোবিন্দলাল, রোহিণী এবং দানেশ খাঁ গায়ক, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রূপো তাঁহাকে দেখিয়া দেখাইয়া দিল যে, এই বাবু সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন।

গোবিন্দলাল বড় রুষ্ট হইলেন। কিন্তু দেখিলেন, ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কে?”

নি। আমার নাম রাসবিহারী দে।

গো। নিবাস?

নি। বরাহনগর।

নিশাকর জাঁকিয়া বসিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে, গোবিন্দলাল বসিতে বলিবেন না।

গো। আপনি কাকে খুঁজেন?

নি। আপনাকে।

গো। আপনি আমার ঘরের ভিতর জোর করিয়া প্রবেশ না করিয়া যদি একটু অপেক্ষা করিতেন, তবে চাকরের মুখে শুনিতেন যে, আমার সাক্ষাতের অবকাশ নাই।

নি। বিলক্ষণ অবকাশ দেখিতেছি। ধমকে চমকে উঠিয়া যাইব, যদি আমি সে প্রকৃতির লোক হইতাম, তবে আপনার কাছে আসিতাম না। যখন আমি আসিয়াছি, তখন আমার কথা কয়টা শুনিলেই আপদ চুকিয়া যায়।

গো। না শুনি, ইহাই আমার ইচ্ছা। তবে যদি দুই কথায় বলিয়া শেষ করিতে পারেন, তবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করুন।

নি। দুই কথাতেই বলিব। আপনার ভার্যা ভ্রমর দাসী তাঁহার বিষয়-গুলি পত্তনী বিলি করিবেন।

দানেশ খাঁ গায়ক তখন তম্বুরায় নূতন তার চড়াইতেছিল। সে এক হাতে তার চড়াইতে লাগিল, এক হাতে আঙ্গুল ধরিয়া বলিল, "এক বাত হুয়া।"

নি। আমি তাহা পত্তনী লইব।

দানেশ আঙ্গুল গণিয়া বলিল, "দো বাত হুয়া।"

নি। আমি সে জন্য আপনাদিগের হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে গিয়াছিলাম।

দানেশ খাঁ বলিল, "দো বাত ছোড়কে তিন বাত হুয়া।"

নি। ওস্তাদজী শুয়ার শুণচো না কি?

ওস্তাদজী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন, "বাবুসাহাব, ইয়ে বেতমিজ আদমিকো বিদা দিজিয়ে।"

কিন্তু বাবুসাহেব তখন অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, কথা কহিলেন না।

নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "আপনার ভার্যা আমাকে বিষয়গুলি পত্তনী দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার অনুমতি সাপেক্ষ। তিনি আপনার ঠিকানাও জানেন না; পত্রাদি লিখিতেও ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং আপনার অভিপ্রায় জানিবার ভার আমার উপরেই পড়িল। আমি অনেক সন্ধানে অনুমতি লইতে আসিয়াছি।"

গোবিন্দলাল কোন উত্তর করিলেন না—বড় অন্যমনস্ক। অনেক দিনের পর ভ্রমরের কথা শুনিলেন—তাঁহার সেই ভ্রমর!! প্রায় দুই বৎসর হইল।

নিশাকর কতক কতক বুঝিলেন। পুনরপি বলিলেন, "আপনার যদি মত হয়, তবে একছত্র লিখিয়া দেন যে, আপনার কোন আপত্তি নাই। তাহা হইলেই উঠিয়া যাই।"

গোবিন্দলাল কিছুই উত্তর করিলেন না। নিশাকর বুঝিলেন, আবার বলিতে হইল। আবার সকল কথাগুলি বুঝাইয়া বলিলেন। গোবিন্দলাল এবার চিত্ত সংযত করিয়া সকল কথা শুনিলেন। নিশাকরের সকল কথাই যে মিথ্যা, তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা কিছুই বুঝেন নাই। পূর্ব্বেকার উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার অনুমতি লওয়া অনাবশ্যক। বিষয় আমার স্ত্রীর, আমার নহে, বোধ হয় তাহা জানেন। তাঁহার যাহাকে ইচ্ছা পত্তনী দিবেন, আমার বিধি নিষেধ নাই। আমিও কিছু লিখিব না। বোধহয় এখন আপনি আমাকে অব্যাহতি দিবেন।"

কাজে কাজেই নিশাকরকে উঠিতে হইল। তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। নিশাকর গেলে, গোবিন্দলাল দানেশ খাঁকে বলিলেন, "কিছু গাও।"

দানেশ খাঁ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া, আবার তম্বুরায় সুর বাঁধিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গাহিব?"

"যা খুশি।" বলিয়া গোবিন্দলাল তবলা লইলেন। গোবিন্দলাল পূর্ব্বেই কিছু কিছু বাজাইতে জানিতেন, এক্ষণে উত্তম বাজাইতে শিখিয়াছিলেন; কিন্তু আজি দানেশ খাঁর সঙ্গে তাঁহার সঙ্গত হইল না, সকল তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল। দানেশ খাঁ বিরক্ত হইয়া তম্বুরা ফেলিয়া গীত বন্ধ করিয়া বলিল, "আজ আমি ক্লান্ত হইয়াছি।" তখন গোবিন্দলাল সেতার লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গৎ সব ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেতার ফেলিয়া নভেল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাহা পড়িতেছিলেন তাহার অর্থবোধ হইল না। তখন বহি ফেলিয়া গোবিন্দলাল শয়নগৃহমধ্যে গেলেন। রোহিণীকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু সোণা চাকর নিকটে ছিল। দ্বার হইতে গোবিন্দলাল সোণাকে বলিলেন, "আমি একটু ঘুমাইব, আমি আপনি না উঠিলে আমাকে কেহ যেন উঠায় না।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল শয়নঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোবিন্দলাল ত ঘুমাইল না। খাটে বসিয়া, দুই হাত মুখে দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কেন যে কাঁদিল, তাহা জানি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিল কি নিজের জন্য কাঁদিল, তা বলিতে পারি না। বোধ হয় দুইই।

আমরা ত কান্না বৈ গোবিন্দলালের অন্য উপায় দেখি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিবার পথ আছে, কিন্তু ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় নাই। হরিদ্রাগ্রামে আর মুখ দেখাইবার কথা নাই। হরিদ্রাগ্রামের পথে কাঁটা পড়িয়াছে। কান্না বৈ আর উপায় নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যখন নিশাকর আসিয়া বড় হলে বসিল, রোহিণীকে সুতরাং পাশের কামরায় প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু নয়নের অন্তরাল হইল মাত্র—শ্রবণের নহে। কথোপকথন যাহা হইল—সকলই কাণ পাতিয়া শুনিল। বরং দ্বারের পরদাটি সরাইয়া, নিশাকরকে দেখিতে লাগিল নিশাকরও দেখিল যে, পরদার পাশ হইতে একটি পটলচেরা চোখ তাঁকে দেখিতেছে।

রোহিণী শুনিল যে নিশাকর অথবা রাসবিহারী হরিদ্রাগ্রাম হইতে আসিয়াছে। রূপো চাকরও রোহিণীর মত সকল কথা দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। নিশাকর উঠিয়া গেলেই রোহিণী পরদার পাশ হইতে মুখ বাহির করিয়া আঙ্গুলের ইশারায় রূপোকে ডাকিল। রূপো কাছে আসিলে তাহাকে কানে কানে বলিল, "যা বলি তা পারবি? বাবুকে সকল কথা লুকাইতে হইবে। যাহা করিবি, তাহা যদি বাবু কিছু জানিতে না পারেন, তবে তোকে পাঁচ টাকা বখ্‌শিশ দিব।"

রূপো মনে ভাবিল—আজ না জানি উঠিয়া কার মুখ দেখিয়াছিলাম—আজ দেখ্‌ছি টাকা রোজগারের দিন। গরীব মানুষের দুই পয়সা এলেই ভাল। প্রকাশ্যে বলিল, "যা বলিবেন, তাই পারিব। কি, আজ্ঞা করুন।"

রো। ঐ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া যা। উনি আমার বাপের বাড়ীর দেশ থেকে এসেছেন। সেখানকার কোন সংবাদ আমি কখনও পাই না—তার জন্ত কত কাঁদি। যদি দেশ থেকে একটি লোক এসেছে, তাকে একবার আপনার জনের দুটো খবর জিজ্ঞাসা করবো। বাবু ত রেগে ওকে উঠিয়ে দিলেন। তুই গিয়ে তাকে বসা। এমন জায়গায় বসা যেন বাবু নীচে গেলে না দেখতে পান। আর কেহ না দেখতে পায়। আমি একটু নিরিবিলি পেলেই যাব। যদি বসতে না চায়, তবে কাকুতি মিনতি করিস।

রূপো বখ্‌শিশের গন্ধ পাইয়াছে—'যে আজ্ঞা' বলিয়া ছুটিল।

নিশাকর কি অভিপ্রায়ে গোবিন্দলালকে ছলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি নীচেয় আসিয়া যেরূপ আচরণ করিতেছিলেন, তাহা বুদ্ধিমানে দেখিলে তাঁহাকে বড় অবিশ্বাস করিত। তিনি গৃহপ্রবেশ দ্বারের কপাট, খিল, কব্জা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। এমত সময়ে রূপো খানসামা আসিয়া উপস্থিত হইল।

রূপো বলিল, "তামাকু ইচ্ছা করিবেন কি?"

নিশা। বাবু ত দিলেন না, চাকরের কাছে খাব কি?

রূপো। আজ্ঞে তা নয়। একটা নিরিবিলি কথা আছে। একটু নিরি-বিলিতে আসুন।

রূপো নিশাকরকে সঙ্গে করিয়া আপনার নির্জন ঘরে গেল। নিশাকরও বিনা ওজর আপত্তিতে গেলেন। সেখানে নিশাকরকে বসিতে দিয়া, যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, রূপচাঁদ তাহা বলিল।

নিশাকর আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির অতি সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "বাপু, তোমার মনিব ত আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন; আমি তার বাড়ীতে লুকাইয়া থাকি কি প্রকারে?"

রূপো। আজ্ঞে তিনি কিছু জানিতে পারিবেন না। এ ঘরে তিনি কখনও আসেন না।

নিশা। না আসুন, কিন্তু যখন তোমার মা ঠাকুরাণী নীচে আসিবেন, তখন যদি তোমার বাবু ভাবেন, কোথায় গেল দেখি? যদি তাই ভাবিয়া পিছু পিছু আসেন, কি কোনরকমে যদি আমার কাছে তোমার মা ঠাকুরাণীকে দেখেন, তবে আমার দশাটা কি হবে বল দেখি?

রূপচাঁদ চুপ করিয়া রহিল। নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "এই মাঠের মাঝখানে, ঘরে পুরিয়া আমাকে খুন করিয়া এই বাগানে পুঁতিয়া রাখিলেও আমার মা বলতে নাই, বাপ বলতেও নাই। তখন তুমিই আমাকে দু ঘা লাঠি মারিবে—অতএব এমন কাজে আমি নাই। তোমার মাকে বুঝাইয়া বলিও যে, আমি ইহা পারিব না। আর একটি কথা বলিও। তাঁহার খুড়া আমাকে কতকগুলি অতি ভারি কথা বলিতে বলিয়া দিয়াছিল। আমি তোমার মা ঠাকুরাণীকে সে কথা বলিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু তোমার বাবু আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। আমার বলা হইল না, আমি চলিলাম।"

রূপো দেখিল, পাঁচ টাকা হাতছাড়া হয়। বলিল, "আচ্ছা, তা এখানে না বসেন, বাহিরে একটু তফাতে বসিতে পারেন না?"

নিশা। আমি সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। আসিবার সময় তোমাদের কুঠির নিকটেই নদীর ধারে, একটা বাঁধা ঘাট, তাহার কাছে দুইটা বকুল গাছ দেখিয়া আসিয়াছি। চেন সে জায়গা?

রূপো। চিনি।

নিশা। আমি গিয়া সেইখানে বসিয়া থাকি। সন্ধ্যা হইয়াছে—রাত্রি হইলে, সেখানে বসিয়া থাকিলে বড় একটা কেহ দেখিতে পাইবে না। তোমার মা ঠাকুরাণী যদি সেইখানে আসিতে পারেন, তবেই সকল সংবাদ পাইবেন। তেমন তেমন দেখিলে, আমি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিব। ঘরে পুরিয়া যে আমাকে কুকুর-মারা করিবে, আমি তাহাতে বড় রাজি নহি।

অগত্যা রূপো চাকর, রোহিণীর কাছে গিয়া নিশাকর যেমন যেমন বলিল, তাহা নিবেদন করিল। এখন রোহিণীর মনের ভাব কি, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন মানুষ নিজে নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারে না—আমরা কেমন করিয়া বলিব যে, রোহিণীর মনের ভাব এই? রোহিণী যে ব্রহ্মানন্দকে এত ভালবাসিত যে, তাহার সংবাদ লইবার জন্য দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্যা হইবে, এমন খবর আমরা রাখি না। বুঝি আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাকি, আঁচাআঁচি হইয়াছিল। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, মনুষ্যমধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্বে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না। কিন্তু বিশ্বাসহানি এক কথা—আর এ আর এক

কথা। বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, "অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে?" ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে? বাঘ গরু মারে—সকল গরু খায় না। স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে—কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য। অনেকে মাছ ধরে—কেবল মাছ ধরিবার জন্য, মাছ খায় না, বিলাইয়া দেয়—অনেকে পাখী মারে, কেবল মারিবার জন্য—মারিয়া ফেলিয়া দেয়। শিকার কেবল শিকারের জন্য—খাইবার জন্য নহে। জানি না, তাহাতে কি রস আছে। রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুর-কাননে আসিয়া পড়িয়াছে—তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই। জানি না, এই পাপীয়সীর পাপচিত্তে কি উদয় হইয়াছিল—কিন্তু রোহিণী স্বীকৃত হইল যে, প্রদোষকালে অবকাশ পাইলেই, গোপনে চিত্রার বাঁধাঘাটে একাকিনী সে নিশাকরের নিকট গিয়া খুল্লতাতের সংবাদ শুনিবে।

রূপচাঁদ আসিয়া সে কথা নিশাকরের কাছে বলিল। নিশাকর শুনিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে গাত্রোত্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রূপো সরিয়া গেলে নিশাকর সোণাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাবুর কাছে কতদিন আছ?"

সোণা। এই—যত দিন এখানে এসেছেন তত দিন আছি।

নিশা। তবে অল্পদিনই? পাও কি?

সোণা। তিন টাকা মাহিয়ানা, খোরাক পোশাক।

নিশা। এত অল্প বেতনে তোমাদের মত খানসামার পোষায় কি?

কথাটা শুনিয়া সোণা খানসামা গলিয়া গেল। বলিল, "কি করি, এখানে আর কোথায় চাকরী যোটে?"

নিশা। চাকরির ভাবনা কি? আমাদের দেশে গেলে তোমাদের লুপে নেয়, পাঁচ, সাত, দশ টাকা অনায়াসেই পাও।

সোণা। অনুগ্রহ করিয়া যদি সঙ্গে লইয়া যান।

নিশা। নিয়ে যাব কি, অমন মুনিবের চাকরি ছাড়্‌বে?

সোণা। মুনিব মন্দ নয়, কিন্তু মুনিবঠাকুরুণ বড় হারামজাদা।

নিশা। হাতে হাতে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমার সঙ্গে তোমার যাওয়াই স্থির ত?

সোণা। স্থির বৈ কি।

নিশা। তবে যাবার সময় তোমার মুনিবের একটি উপকার করিয়া যাও। কিন্তু বড় সাবধানের কাজ। পারবে কি?

সোণা। ভাল কাজ হয় ত পারব না কেন?

নিশা। তোমার মুনিবের পক্ষে ভাল, মুনিবনীর পক্ষে বড় মন্দ।

সোণা। তবে এখনই বলুন, বিলম্বে কাজ নাই। তাতে আমি বড় রাজি।

নিশা। ঠাকুরুণটি আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, চিত্রার বাঁধাঘাটে বসিয়া থাকিতে, রাত্রে আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করিবেন। বুঝেছ? আমিও স্বীকার হইয়াছি। আমার অভিপ্রায় যে, তোমার মুনিবের চোখ ফুটায়েদিই। তুমিআস্তেআস্তেকথাটিতোমার মুনিবকে জানিয়ে আসতে পার?

সোণা। এখনি—ও পাপ মলেই বাঁচি।

নিশা। এখন নয়, এখন আমি ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকি। তুমি সতর্ক থেকো। যখন দেখবে, ঠাকুরুণটি ঘাটের দিকে চলিলেন, তখন গিয়া তোমার মুনিবকে বলিয়া দিও। রূপো কিছু জানিতে না পারে। তারপর আমার সঙ্গে যুটো।

"যে আজ্ঞে" বলিয়া সোণা নিশাকরের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল। তখন নিশাকর হেলিতে দুলিতে গজেন্দ্রগমনে চিত্রাতীরশোভী সোপানাবলীর উপর গিয়া বসিলেন। অন্ধকারে নক্ষত্রছায়াপ্রদীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে। চারি দিকে শৃগালকুক্কুরাদি বহুবিধ রব করিতেছে। কোথাও দূরবর্তী নৌকার উপর বসিয়া ধীবর উচ্চৈঃস্বরে শ্যামাবিষয় গাহিতেছে। তদ্ভিন্ন সেই বিজন প্রান্তর মধ্যে কোন শব্দ শোনা যাইতেছে না। নিশাকর সেই গীত শুনিতেছেন এবং গোবিন্দলালের বাসগৃহের দ্বিতল কক্ষের বাতায়ননিঃসৃত উজ্জ্বল দীপালোক দর্শন করিতেছেন এবং মনে মনে ভাবিতেছেন, "আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি! অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্তব্য। যখন বন্ধুর কন্যার জীবনরক্ষার্থ এ কার্য

বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়। রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপস্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে। আর পাপ পুণ্যের যিনি দণ্ড পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্তা। বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই আমাকে এই কার্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি,

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রহরাতীত হইল। তখন নিশাকর দেখিলেন, নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে রোহিণী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য নিশাকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা?"

রোহিণীও নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য বলিল, "তুমি কে?"

নিশাকর বলিল, "আমি রাসবিহারী।"

রোহিণী বলিল, "আমি রোহিণী।"

নিশাকর। এত রাত্রি হলো কেন?

রোহিণী। একটু না দেখে শুনে ত আসতে পারি নে। কি জানি, কে কোথা দিয়ে দেখতে পাবে। তা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে।

নিশা। কষ্ট হোক না হোক, মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি ভুলিয়া গেলে।

রোহিণী। আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশা এমন হইবে কেন? এক জনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি, আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।

এই কথা বলিতেছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া পিছন দিক হইতে রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। রোহিণী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে?"

গম্ভীর স্বরে কে উত্তর করিল, "তোমার যম।"

রোহিণী চিনিল যে গোবিন্দলাল। তখন আসন্ন বিপদ বুঝিয়া চারি দিক অন্ধকার দেখিয়া রোহিণী ভীতকম্পিতস্বরে বলিল, "ছাড়! ছাড়! আমি মন্দ

অভিপ্রায়ে আসি নাই। আমি যে জন্য আসিয়াছি, এই বাবুকে না হয় জিজ্ঞাসা কর।”

এই বলিয়া রোহিণী যেখানে নিশাকর বসিয়াছিল, সেইস্থান অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিল, কেহ সেখানে নাই। নিশাকর গোবিন্দলালকে দেখিয়া পলকের মধ্যে কোথায় সরিয়া গিয়াছে। রোহিণী বিস্মিতা হইয়া বলিল, “কৈ কেহ কোথাও নাই যে!”

গোবিন্দলাল বলিল, “এখানে কেহ নাই। আমার সঙ্গে ঘরে এস।”

রোহিণী বিষণ্ণচিত্তে ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভৃত্যবর্গকে নিষেধ করিলেন, “কেহ উপরে আসিও না।”

ওস্তাদজী বাসায় গিয়াছিল।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। রোহিণী, সম্মুখে নদীস্রোতোবিকম্পিতা বেতসীর ন্যায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। গোবিন্দলাল মৃদুস্বরে বলিল, “রোহিণী!”

রোহিণী বলিল, “কেন!”

গো। তোমার সঙ্গে গোটাকত কথা আছে।

রো। কি?

গো। তুমি আমার কে?

রো। কেহ নহি, যতদিন পায়ে রাখেন ততদিন দাসী। নহিলে কেহ নই।

গো। পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রাখিয়াছিলাম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম, সব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি। তুমি কি রোহিণী, যে তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলাম? তুমি কি রোহিণী, যে তোমার জন্য ভ্রমর—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত যে ভ্রমর—তাহা পরিত্যাগ করিলাম?

এই বলিয়া গোবিন্দলাল আর দুঃখ ক্রোধের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া রোহিণীকে পদাঘাত করিলেন।

রোহিণী বসিয়া পড়িল। কিছু বলিল না, কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু চক্ষের জল গোবিন্দলাল দেখিতে পাইলেন না।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "রোহিণী, দাঁড়াও।"

রোহিণী দাঁড়াইল।

গো। তুমি একবার মরিতে গিয়াছিলে। আবার মরিতে সাহস আছে কি?

রোহিণী তখন মরিবার ইচ্ছা করিতেছিল। অতি কাতর স্বরে বলিল, "এখন আর না মরিতে চাহিব কেন? কপালে যা ছিল, তা হলো।"

গো। তবে দাঁড়াও। নড়িও না।

রোহিণী দাঁড়াইয়া রহিল।

গোবিন্দলাল পিস্তলের বাক্স খুলিলেন, পিস্তল বাহির করিলেন। পিস্তল ভরা ছিল। ভরাই থাকিত।

পিস্তল আনিয়া রোহিণীর সম্মুখে ধরিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "কেমন, মরিতে পারিবে?"

রোহিণী ভাবিতে লাগিল। যে দিন অনায়াসে, অক্লেশে, বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, আজি সে দিন রোহিণী ভুলিল। সে দুঃখ নাই, সুতরাং সে সাহসও নাই। ভাবিল, "মরিব কেন? না হয় ইনি ত্যাগ করেন, করুন। ইঁহাকে কখনও ভুলিব না, কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন? ইঁহাকে যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইঁহাকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের সুখরাশি যে মনে করিব, সেও ত এক সুখ, সেও ত এক আশা। মরিব কেন?"

রোহিণী বলিল, "মরিব না, মারিও না। চরণে না রাখ, বিদায় দেও।"

গো। দিই।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল পিস্তল উঠাইয়া রোহিণীর ললাটে লক্ষ্য করিলেন।

রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ! আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না!"

গোবিন্দলালের পিস্তলে খট্ করিয়া শব্দ হইল। তারপর বড় শব্দ, তারপর সব অন্ধকার। রোহিণী গতপ্রাণা হইয়া ভূপতিতা হইল।

গোবিন্দলাল পিস্তল ভূমে নিক্ষেপ করিয়া অতি দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

পিস্তলের শব্দ শুনিয়া রূপো প্রভৃতি ভৃত্যবর্গ দেখিতে আসিল। দেখিল, বালকনখরবিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে। গোবিন্দলাল কোথাও নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় বৎসর

সেই রাত্রেই চৌকিদার থানায় গিয়া সংবাদ দিল যে, প্রসাদপুরের কুঠিতে খুন হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ থানা সে স্থান হইতে ছয় ক্রোশ ব্যবধান। দারোগা আসিতে পরদিন বেলা প্রহরেক হইল। আসিয়া তিনি খুনের তদারকে প্রবৃত্ত হইলেন। রীতিমত সুরতহাল ও লাস তদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন। পরে রোহিণীর মৃতদেহ বাঁধিয়া ছাঁদিয়া গোরুর গাড়িতে বোঝাই দিয়া, চৌকিদারের সঙ্গে ডাক্তারখানায় পাঠাইলেন। পরে স্নান করিয়া আহারাদি করিলেন। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া অপরাধীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথায় অপরাধী? গোবিন্দলাল রোহিণীকে আহত করিয়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, আর প্রবেশ করেন নাই। একরাত্রি একদিন অবকাশ পাইয়া গোবিন্দলাল কোথায় কত দূর গিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। কোন্ দিকে পলাইয়াছেন, কেহ জানে না। তাঁহার নাম পর্যন্ত কেহ জানিত না। গোবিন্দলাল প্রসাদপুরে কখনও নিজ নাম ধাম প্রকাশ করেন নাই, সেখানে চুনিলাল দত্ত নাম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন্ দেশ থেকে আসিয়াছেন, তাহা ভৃত্যেরা পর্যন্তও জানিত না। দারোগা কিছুদিন ধরিয়া একে ওকে ধরিয়া জোবানবন্দী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে তিনি আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেমা রিপোর্ট দাখিল করিলেন।

তখন যশোহর হইতে ফিচেল খাঁ নামে একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিব ইন্‌স্পেক্টর প্রেরিত হইল। ফিচেল খাঁর অনুসন্ধান প্রণালী আমাদিগের সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। কতকগুলি চিঠিপত্র তিনি বাড়ী তল্লাসীতে পাইলেন। তদ্দ্বারা তিনি গোবিন্দলালের প্রকৃত নাম ধাম অবধারিত করিলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি কষ্ট স্বাকার করিয়া ছদ্মবেশে হরিদাগ্রাম পর্যন্ত গমন করিলেন। কিন্তু গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে যান নাই, সুতরাং ফিচেল খাঁ সেখানে গোবিন্দলালকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এ দিকে নিশাকর দাস সে করাল কালসমান রজনীতে বিপন্না রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদপুরের বাজারে আপনার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মাধবীনাথ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের নিকট সুপরিচিত বলিয়া তাহার নিকট গমন করেন নাই; এক্ষণে নিশাকর আসিয়া তাঁহাকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন। শুনিয়া মাধবীনাথ বলিলেন, "কাজ ভাল হয় নাই। একটা খুনাখুনি হইতে পারে।" ইহার পরিণাম কি ঘটে, জানিবার জন্য উভয়ে প্রসাদপুরেরবাজারেপ্রচ্ছন্নভাবে অতি সাবধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রভাতেই শুনিলেন যে, চুনিলাল দত্ত আপন স্ত্রীকে খুন করিয়া পলাইয়াছে। তাঁহারা বিশেষ ভীত ও শোকাকুল হইলেন; ভয় গোবিন্দলালের জন্য; কিন্তু পরিশেষে দেখিলেন, দারোগা কিছু করিতে পারিলেন না। গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান নাই। তখন তাঁহারা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া, তথাচ অত্যন্ত বিষণ্নভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় বৎসর

ভ্রমর মরে নাই। কেন মরিল না, তাহা জানি না। এ সংসারে বিশেষ দুঃখ এই যে, মরিবার উপযুক্ত সময়ে কেহ মরে না। অসময়ে সবাই মরে। ভ্রমর যে মরিল না, বুঝি ইহাই তাহার কারণ। যাহাই হউক, ভ্রমর উৎকট রোগ হইতে কিয়দংশে মুক্তি পাইয়াছে। ভ্রমর আবার পিত্রালয়ে। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের যে সংবাদ আনিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী অতি সংগোপনে তাহা জ্যেষ্ঠা কন্যা ভ্রমরের ভগিনীর নিকট বলিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি

গোপনে তাহা ভ্রমরের নিকট বলিয়াছিল। এক্ষণে ভ্রমরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনী বলিতেছিল, "এখন তিনি কেন হলুদগাঁয়ের বাড়ীতে আসিয়া বাস করুন না? তা হলে বোধ হয় কোন আপদ্ থাকিবে না।"

ভ্র। আপদ্ থাকিবে না কিসে?

যামিনী। তিনি প্রসাদপুরে নাম ভাঁড়াইয়া বাস করিতেন। তিনিই যে গোবিন্দলাল বাবু তাহা ত কেহ জানে না।

ভ্রমর। শুন নাই কি যে, হলুদগাঁয়ে পুলিশের লোক তাঁহার সন্ধানে আসিয়াছিল? তবে আর জানে না কি প্রকারে?

যামিনী। তা না হয় জানিল।—তবু এখানে আসিয়া আপনার বিষয় দখল করিয়া বসিলে টাকা হাতে হইবে। বাবা বলেন, পুলিশ টাকায় বশ।

ভ্রমর কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "সে পরামর্শ তাঁহাকে কে দেয়? কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব যে, সে পরামর্শ দিব। বাবা একবার তাঁর সন্ধান করিয়া ঠিকানা করিয়াছিলেন—আর একবার সন্ধান করিতে পারেন কি?"

যামিনী। পুলিশের লোক কত সন্ধানী—তাহারাই অহরহ সন্ধান করিয়া যখন ঠিকানা পাইতেছে না, তখন বাবা কি প্রকারে সন্ধান পাইবেন? কিন্তু আমার বোধ হয়, গোবিন্দলাল বাবু আপনিই হলুদগাঁয়ে আসিয়া বসিবেন। প্রসাদপুরের সেই ঘটনার পরেই তিনি যদি হলুদগাঁয়ে দেখা দিতেন, তাহা হইলে তিনিই যেসেই প্রসাদপুরের বাবু, এ কথায় লোকের বড় বিশ্বাস হইত। এই জন্য বোধ হয়, এতদিন তিনি আইসেন নাই। এখন আসিবেন, এমন ভরসা করা যায়।

ভ্র। আমার কোন ভরসা নাই।

যা। যদি আসেন?

ভ্র। যদি এখানে আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে দেবতার কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আসুন। আর যদি না আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজন্মে তাঁহার হরিদ্রাগ্রামে না আসা হয়। যাহাতে তিনি নিরাপদ থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই মতি দিন।

যা। আমার বিবেচনায়, ভগিনি! তোমার সেইখানেই থাকা কর্ত্তব্য। কে জানি, তিনি কোন্ দিন অর্থের অভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়েন? যদি

আমলাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন? তোমাকে না দেখিলে তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন।

ভ্র। আমার এই রোগ। কবে মরি, কবে বাঁচি—আমি সেখানে কার আশ্রয়ে থাকিব?

যা। বল যদি, না হয়, আমরা কেহ গিয়া থাকিব—তথাপি তোমার সেখানেই থাকা কর্তব্য।

ভ্রমর ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি হলুদগাঁয়ে যাইব। মাকে বলিও, কালই আমাকে পাঠাইয়া দেন। এখন তোমাদের কাহাকে যাইতে হইবে না। কিন্তু আমার বিপদের দিন তোমরা দেখা দিও।"

যা। কি বিপদ ভ্রমর?

ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যদি তিনি আসেন?"

যা। সে আবার বিপদ্ কি ভ্রমর? তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে, তাহার চেয়ে আহ্লাদের আর কি আছে?

ভ্র। আহ্লাদ দিদি! আহ্লাদের কথা আমার আর কি আছে!

ভ্রমর আর কথা কহিল না। তাহার মনের কথা যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমরের মর্মান্তিক রোদন, যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমর মানস চক্ষে ধূমময় চিত্রবৎ, এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে, তাহা দেখিতে পাইল। যামিনী কিছুই দেখিতে পাইল না। যামিনী বুঝিল না যে গোবিন্দলাল হত্যাকারী, ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম বৎসর

ভ্রমর আবার শ্বশুরালয়ে গেল। যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী ত আসিল না। দিন গেল, মাস গেল—স্বামী ত আসিল না। কোন সংবাদও আসিল না। তার পর চতুর্থ বৎসরও কাটিয়া গেল, গোবিন্দলাল আসিল না। এদিকে ভ্রমরের পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হাঁপানি

কাশি রোগ—নিত্য শরীর ক্ষয়—যম অগ্রসর—বুঝি আর ইহজন্মে দেখা হইল না।

তারপর পঞ্চম বৎসর প্রবৃত্ত হইল। পঞ্চম বৎসরে একটা ভারি গোল-যোগ উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রামে সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়াছে। সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিল—সেইখান হইতে পুলিশ ধরিয়া যশোহরে আনিয়াছে। যশোহরে তাঁহার বিচার হইবে।

জনরবে এই সংবাদ ভ্রমর শুনিলেন। জনরবের সূত্র এই। গোবিন্দলাল, ভ্রমরের দেওয়ানজীকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি জেলে চলিলাম—আমার পৈতৃক বিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা যদি তোমা-দিগের অভিপ্রায়সম্মত হয়, তবে এই সময়। আমি তাহার যোগ্য নহি। আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই, তবে ফাঁসি যাইতে না হয় এই ভিক্ষা। জনরবে এ কথা বাড়ীতে জানাইও, আমি পত্র লিখিয়াছি, এ কথা প্রকাশ করিও না।" দেওয়ানজী পত্রের কথা প্রকাশ করিলেন না—জনরব বলিয়া অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইলেন।

ভ্রমর শুনিয়াই পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। শুনিবামাত্র মাধবী-নাথ কন্যার নিকট আসিলেন। ভ্রমর, তাঁহাকে নোটে কাগজে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিয়া সজলনয়নে বলিলেন, "বাবা, এখন যা করিতে হয় কর।—দেখিও—আমি আত্মহত্যা না করি।"

মাধবীনাথও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা! নিশ্চিন্ত থাকিও—আমি আজই যশোহরে যাত্রা করিলাম। কোন চিন্তা করিও না। গোবিন্দলাল যে খুন করিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। আমিপ্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি যে তোমার আটচল্লিশ হাজার টাকা বাঁচাইয়া আনিব—আর আমার জামাইকে দেশে আনিব।"

মাধবীনাথ তখন যশোহর যাত্রা করিলেন। শুনিলেন যে প্রমাণের অবস্থা অতি ভয়ানক। ইনস্পেক্টর ফিচেল খাঁ মোকদ্দমা তদারক করিয়া সাক্ষী চালান দিয়াছিলেন। তিনি রূপো সোণা প্রভৃতি যে সকল সাক্ষীরা প্রকৃত অবস্থা জানিত তাহাদিগের কাহারও সন্ধান পান নাই। সোণা নিশাকরের কাছে ছিল—রূপো কোন্ দেশে গিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। প্রমাণের এইরূপ

দুরবস্থা দেখিয়া নগদ কিছু দিয়া ফিচেল খাঁ তিনটি সাক্ষী তৈয়ার করিয়াছিল। সাক্ষীরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে বলিল যে, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে গোবিন্দলাল ওরফে চুনিলাল স্বহস্তে পিস্তল মারিয়ারোহিণীকেখুন করিয়াছেন —আমরা তখন সেখানে গান শুনিতে গিয়াছিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আহেলা বিলাতী—সুশাসন জন্য সর্বদা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া থাকেন—তিনি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গোবিন্দলালকে সেশনের বিচারে অর্পণ করিলেন। যখন মাধবীনাথযশোহরেপৌছিলেন, তখন গোবিন্দ-লাল জেলে পচিতেছিলেন। মাধবীনাথ পৌছিয়া, সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বিষণ্ণ হইলেন।

তিনি সাক্ষীদের নাম ধাম সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বাড়ী গেলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, "বাপু! ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যা বলিয়াছ, তা বলিয়াছ। এখন জজ সাহেবের কাছে ভিন্ন প্রকার বলিতে হইবে। বলিতে হইবে যে, আমরা কিছু জানি না। এই পাঁচ পাঁচ শত টাকা নগদ লও। আসামী খালাস হইলে আর পাঁচ পাচ শত টাকা দিব।"

সাক্ষীরা বলিল, "খেলাপ হলফের দায়ে মারা যাইব যে।"

মাধবীনাথ বললেন, "ভয় নাই। আমি টাকা খরচ করিয়া সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করাইব যে, ফিচেল খাঁ তোমাদিগকে মারপিট করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছে।"

সাক্ষীরা চতুর্দশ পুরুষ মধ্যে কখনও হাজার টাকা একত্রে দেখে নাই। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

সেশনে বিচারের দিন উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল কাটগড়ার ভিতর। প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইয়া হলফ পড়িল। উকীল সরকার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোবিন্দলাল ওরফে চুনিলালকে চেন?"

সাক্ষী। কই—না—মনে ত হয় না।

উকীল। কখনও দেখিয়াছ?

সাক্ষী। না।

উকীল। রোহিণীকে চিনিতে?

সাক্ষী। কোন্ রোহিণী?

উকীল। প্রসাদপুরের কুঠিতে যে ছিল?

সাক্ষী। আমার বাপের পুরুষে কখনও প্রসাদপুরের কুঠিতে যাই নাই।

উকীল। রোহিণী কি প্রকারে মরিয়াছে?

সাক্ষী। শুনিতেছি আত্মহত্যা হইয়াছে।

উকীল। খুনের বিষয় কিছু জান?

সাক্ষী। কিছু না।

উকীল তখন, সাক্ষী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যে জোবানবন্দী দিয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া সাক্ষীকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে এই সকল কথা বলিয়াছিলে?"

সাক্ষী। হ্যাঁ, বলিয়াছিলাম।

উকীল। যদি কিছু জান না, তবে কেন বলিয়াছিলে?

সাক্ষী। মারের চোটে। ফিচেল খাঁ মারিয়া আমাদের শরীরে আর কিছু রাখে নাই।

এই বলিয়া সাক্ষী একটু কাঁদিল। দুই চারি দিন পূর্বে সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে জমি লইয়া কাজিয়া করিয়া মারামারি করিয়াছিল; তাহার দাগ ছিল। সাক্ষী অম্লানমুখে সেই দাগগুলি ফিচেল খাঁর মারপিটের দাগ বলিয়া জজ সাহেবকে দেখাইল।

উকীল সরকার অপ্রতিভ হইয়া দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষীও ঐরূপ বলিল। সে পিঠে রাঙ্গচিত্রের আটা দিয়া ঘা করিয়া আসিয়াছিল—হাজার টাকার জন্য সব পারা যায়—তাহা জজ সাহেবকে দেখাইল।

তৃতীয় সাক্ষীও ঐরূপ গুজরাইল। তখন জজসাহেব প্রমাণাভাব দেখিয়া আসামীকে খালাস দিলেন। এবং ফিচেল খাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার আচরণ সম্বন্ধে তদারক করিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে উপদেশ করিলেন।

বিচারকালে সাক্ষীদিগের এইরূপ সপক্ষতা দেখিয়া গোবিন্দলাল বিস্মিত হইতেছিলেন। পরে যখন ভিড়ের ভিতর মাধবীনাথকে দেখিলেন, তখন সকল বুঝিতে পারিলেন। খালাস হইয়াও তাঁহাকে আর একবার জেলে যাইতে হইল—সেখানে জেলর পরওয়ানা পাইলে তবে ছাড়িবে। তিনি যখন জেলে ফিরিয়া যান, তখন মাধবীনাথ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কানে কানে বলিলেন, "জেল হইতে খালাস পাইয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমার বাসা অমুক স্থানে।"

কিন্তু গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস পাইয়া,মাধবীনাথের কাছে গেলেন না। কোথায় গেলেন কেহ জানিল না। মাধবীনাথ চারি পাঁচ দিন তাঁহার সন্ধান করিলেন। কোন সন্ধান পাইলেন না।

অগত্যা শেষে একাই হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ বৎসর

মাধবীনাথ আসিয়া ভ্রমরকে সংবাদ দিলেন,গোবিন্দলাল খালাস হইয়াছে, কিন্তু বাড়ী আসিল না, কোথায় চলিয়া গেল, সন্ধান পাওয়া গেল না। মাধবীনাথ সরিয়া গেলে ভ্রমর অনেক কাঁদিল, কিন্তু কি জন্য কাঁদিল, তাহা বলিতে পারি না।

এ দিকে গোবিন্দলাল খালাস পাইয়াই প্রসাদপুরে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, প্রসাদপুরের গৃহে কিছু নাই, কেহ নাই। গিয়া শুনিলেন যে অট্টালিকায় তাঁহার যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ছিল, তাহা কতক পাঁচজনে লুঠিয়া লইয়া গিয়াছিল—অবশিষ্ট লাওয়ারেশ বলিয়া বিক্রয় হইয়াছিল। কেবল বাড়ীটি পড়িয়া আছে—তাহারও কবাট চৌকাট পর্যন্ত বার ভূতে লইয়া গিয়াছে। প্রসাদপুরের বাজারে দুই এক দিন বাস করিয়া গোবিন্দলাল বাড়ীর অবশিষ্ট ইট কাঠ জলের দামে এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইলেন, তাহা লইয়া কলিকাতায় গেলেন।

কলিকাতায় অতি গোপনে সামান্য অবস্থায়গোবিন্দলাল দিনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রসাদপুর হইতে অতি অল্প টাকাই আনিয়াছিলেন, তাহা এক বৎসরে ফুরাইয়া গেল। আর দিনপাতের সম্ভাবনা নাই। তখন ছয় বৎসরের পর গোবিন্দলাল মনে ভাবিলেন, ভ্রমরকে একখানি পত্র লিখিব।

গোবিন্দলাল কালি, কলম, কাগজ লইয়া, ভ্রমরকে পত্র লিখিব বলিয়া বসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব—গোবিন্দলাল পত্র লিখিতে আরম্ভ করিতে গিয়া কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, ভ্রমর যে আজিও

বাঁচিয়া আছে, তাহারই বা ঠিকানা কি? কাহাকে পত্র লিখিব? তারপর ভাবিলেন, একবার লিখিয়াই দেখি। না হয়, আমার পত্র ফিরিয়া আসিবে। তাহা হইলে জানিব যে ভ্রমর নাই।

কি লিখিব, এ কথা গোবিন্দলাল কতক্ষণ ভাবিলেন, তাহা বলা যায় না। তারপর, শেষ ভাবিলেন, যাহাকে বিনা দোষে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি, তাহাকে যা হয় তাই লিখিলেই বা অধিক কি ক্ষতি হইবে? গোবিন্দলাল লিখিলেন,

"ভ্রমর!

ছয় বৎসর পরে এ পামর আবার তোমায় পত্র লিখিতেছে। প্রবৃত্তি হয় পড়িও; না প্রবৃত্তি হয়, না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিও।

"আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, বোধ হয় তুমি শুনিয়াছ। যদি বলি, সে আমার কর্মফল, তুমি মনে করিতে পার, আমি তোমার মনরাখা কথা বলিতেছি। কেন না, আজি আমি তোমার কাছে ভিখারী।

"আমি এখন নিঃস্ব। তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিয়াছি। তীর্থস্থানে ছিলাম, তীর্থস্থানে ভিক্ষা মিলিত—এখানে ভিক্ষা মিলে না—সুতরাং আমি অন্নাভাবে মারা যাইতেছি।

"আমার যাইবার এক স্থান ছিল—কাশীতে মাতৃক্রোড়ে। মার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে—বোধ হয় তাহা তুমি জান। সুতরাং আমার আর স্থান নাই—অন্ন নাই।

"তাই, আমি মনে করিয়াছি, আবার হরিদ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাইব—নহিলে খাইতে পাই না। যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, পরদারনিরত হইল, স্ত্রীহত্যা পর্যন্ত করিল, তাহার আবার লজ্জা কি? যে অন্নহীন, তাহার আবার লজ্জা কি? আমি এ কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি বিষয়াধিকারিণী—বাড়ী তোমার—আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি—আমায় তুমি স্থান দিবে কি?

"পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি?"

পত্র লিখিয়া সাত পাঁচ আবার ভাবিয়া গোবিন্দলাল পত্র ডাকে দিলেন। যথাকালে পত্র ভ্রমরের হস্তে পৌঁছিল।

পত্র পাইয়াই ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিল। পত্র খুলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে

ভ্রমর শয়নগৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তখন ভ্রমর বিরলে বসিয়া, নয়নের সহস্র ধারা মুছিতে মুছিতে, সেই পত্র পড়িল। একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িল। সেদিন ভ্রমর আর দ্বার খুলিল না। যাহারা আহারের জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল, তাহাদিগকে বলিল, "আমার জ্বর হইয়াছে—আহার করিব না।" ভ্রমরের সর্বদা জ্বর হয়; সকলে বিশ্বাস করিল।

পরদিন নিদ্রাশূন্য শয্যা হইতে যখন ভ্রমর গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তাঁহার যথার্থই জ্বর হইয়াছে। কিন্তু তখন চিত্ত স্থির—বিকারশূন্য। পত্রের উত্তর যাহা লিখিবেন, তাহা পূর্বেই স্থির হইয়াছিল। ভ্রমর তাহা সহস্র সহস্র বার ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এখন আর ভাবিতে হইল না। পাঠ পর্যন্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

"সেবিকা" পাঠ লিখিলেন না। কিন্তু স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রণম্য অতএব লিখিলেন,

"প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ"

তারপর লিখিলেন, "আপনার পত্র পাইয়াছি। বিষয় আপনার। আমার হইলেও আমি উহা দান করিয়াছি। যাইবার সময় আপনি সে দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু রেজেষ্ট্রি অপিসে তাহার নকল আছে। আমি যে দান করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ। এখনও বলবৎ।

"অতএব আপনি নির্বিঘ্নে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া আপনার নিজসম্পত্তি দখল করিতে পারেন। বাড়ী আপনার।

"আর এই পাঁচ বৎসরে আমি অনেক টাকা জমাইয়াছি। তাহাও আপনার। আসিয়া গ্রহণ করিবেন।

"ঐ টাকার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আমি যাচ্ঞা করি। আট হাজার টাকা আমি উহা হইতে লইলাম। তিন হাজার টাকায় গঙ্গাতীরে আমার একটি বাড়ী প্রস্তুত করিব; পাঁচ হাজার টাকায় আমার জীবন নির্বাহ হইবে।

"আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যতদিন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট,—আপনিও যে সন্তুষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

"আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম।"

যথাকালে পত্র গোবিন্দলালের হস্তগত হইল—কি ভয়ানক পত্র। এতটুকু কোমলতাও নাই। গোবিন্দলালও লিখিয়াছিলেন, ছয় বৎসরের পর লিখিতেছি, কিন্তু ভ্রমরের পত্রে সে রকমের কথাও একটা নাই। সেই ভ্রমর।

গোবিন্দলাল পত্র পড়িয়া উত্তর লিখিলেন, "আমি হরিদ্রাগ্রামে যাইব না। যাহাতে আমার এখানে দিনাতিপাত হয়, এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এইখানে পাঠাইয়া দিও।"

ভ্রমর উত্তর করিলেন, "মাস মাস আপনাকে পাঁচশত টাকা পাঠাইব। আরও অধিক পাঠাইলে পারি, কিন্তু অধিক পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা। আর আমার একটি নিবেদন—বৎসর বৎসর যে উপস্বত্ব জমিতেছে—আপনি এখানে আসিয়া ভোগ করিলে ভাল হয়। আমার জন্য দেশত্যাগ করিবেন না—আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।"

গোবিন্দলাল কলিকাতাতেই রহিলেন। উভয়েই বুঝিলেন, সেই ভাল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সপ্তম বৎসর

বাস্তবিক ভ্রমরের দিন ফুরাইয়া আসিল। অনেক দিন হইতে ভ্রমরের সাংঘাতিক পীড়া চিকিৎসায় উপশমিত ছিল। কিন্তু রোগ আর বড় চিকিৎসা মানিল না। এখন ভ্রমর দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে ভ্রমর শয্যাশায়িনী হইলেন, আর শয্যাত্যাগ করিয়া উঠেন না। মাধবীনাথ স্বয়ং আসিয়া নিকটে থাকিয়া নিষ্ফল চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। যামিনী হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে আসিয়া ভগিনীর শেষ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রোগ চিকিৎসা মানিল না। পৌষ মাস এইরূপে গেল। মাঘ মাসে ভ্রমর ঔষধ ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। ঔষধ সেবন এখন বৃথা। যামিনীকে বলিলেন, "আর ঔষধ খাওয়া হইবে না দিদি—সম্মুখে ফাল্গুন মাস—ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমার রাত্রে যেন মরি। দেখিস্ দিদি—যেন ফাল্গুনের পূর্ণিমার রাত্রি পালাইয়া যায় না। যদি দেখিস যে, পূর্ণিমার রাত্রি পার হই—তবে আমার

একটা অন্তরটিপনি দিতে ভুলিস না। রোগে হউক, অন্তরটিপনিতে হউক—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাত্রে মরিতে হইবে। মনে থাকে যেন দিদি।"

যামিনী কাঁদিল, কিন্তু ভ্রমর আর ঔষধ খাইল না। ঔষধ খায় না, রোগের শান্তি নাই—কিন্তু ভ্রমর দিন দিন প্রফুল্লচিত্ত হইতে লাগিল।

এত দিনের পর ভ্রমর আবার হাসি তামাসা আরম্ভ করিল—ছয় বৎসরের পর এই প্রথম হাসি তামাসা। নিবিবার আগে প্রদীপ হাসিল।

যত দিন যাইতে লাগিল—অন্তিম কাল দিনে দিনে যত নিকট হইতে লাগিল—ভ্রমর তত স্থির, প্রফুল্ল, শান্তমূর্তি। শেষে সেই ভয়ঙ্কর শেষ দিন উপস্থিত হইল। ভ্রমর পৌরজনের চাঞ্চল্য এবং যামিনীর কান্না দেখিয়া বুঝিলেন, আজ বুঝি দিন ফুরাইল। শরীরের যন্ত্রণায়ও সেইরূপ অনুভূত করিলেন। তখন ভ্রমর যামিনীকে বলিলেন, "আজ শেষ দিন।"

যামিনী কাঁদিল। ভ্রমর বলিল, "দিদি—আজ শেষ দিন—আমার কিছু ভিক্ষা আছে—কথা রাখিও।"

যামিনী কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না।

ভ্রমর বলিল, "আমার এক ভিক্ষা, আজ কাঁদিও না—আমি মরিলে পর কাঁদিও—আমি বারণ করিতে আসিব না—কিন্তু আজ তোমাদের সঙ্গে যে কয়েকটা কথা কহিতে পারি, নির্বিঘ্নে কহিয়া মরিব, সাধ করিতেছে।"

যামিনী চক্ষের জল মুছিয়া কাছে বসিল—কিন্তু অবরুদ্ধ বাষ্পে আর কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর বলিতে লাগিল, "আর একটি ভিক্ষা—তুমি ছাড়া আর কেহ এখানে না আসে। সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব—কিন্তু এখন আর কেহ না আসে। তোমার সঙ্গে আর কথা কহিতে পাব না।"

যামিনী আর কতক্ষণ কান্না রাখিবে?

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল। ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, রাত্রি কি জ্যোৎস্না?" যামিনী জানেলা খুলিয়া দেখিয়া বলিল, "দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।"

ভ্র। তবে জানেলাগুলি সব খুলিয়া দাও—আমি জ্যোৎস্না দেখিয়া মরি। দেখ দেখি, ঐ জানেলার নীচে যে ফুলবাগান, উহাতে ফুল ফুটিয়াছে কিনা?

সেই জানেলায় দাঁড়াইয়া প্রভাতকালে ভ্রমর, গোবিন্দলালের সঙ্গে

কথোপকথন করিতেন। আজি সাত বৎসর জানেলার দিকে যান নাই—সে জানেলা খোলেন নাই।

যামিনী কষ্টে সেই জানেলা খুলিয়া বলিল, "কই, এখানে ত ফুলবাগান নাই—এখানে কেবল খড়বন—আর দুই-একটা মরা মরা গাছ আছে—তাতে ফুল পাতা কিছুই নাই।"

ভ্রমর বলিল, "সাত বৎসর হইল, ওখানে ফুলবাগান ছিল। বে-মেরামতে গিয়াছে। আমি সাতবৎসর দেখি নাই।"

অনেকক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর ভ্রমর বলিলেন, "যেখান হইতে পার দিদি, আজ আমায় ফুল আনাইয়া দিতে হইবে। দেখিতেছ না, আজ আমার ফুলশয্যা?"

যামিনীর আজ্ঞা পাইয়া দাস দাসী রাশীকৃত ফুল আনাইয়া দিল। ভ্রমর বলিল, "ফুল আমার বিছানায় ছড়াইয়া দাও—আজ আমার ফুলশয্যা।"

যামিনী তাহাই করিল। তখন ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। যামিনী বলিল, "কাঁদিতেছ কে · · ?"

ভ্রমর বলিল, "দিদি, একটি বড় দুঃখ রহিল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান, সেই দিন জোড় হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, এক দিন যেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম, আমি যদি সতী হই, তবে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে। কই, আর ত দেখা হইল না। আজিকার দিন—মরিবার দিনে, দিদি, যদি একবার দেখিতে পাইতাম! এক দিনে, দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম!"

যামিনী বলিল "দেখিবে?" ভ্রমর যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—বলিল, "কার কথা বলিতেছ?"

যামিনী স্থিরভাবে বলিল, "গোবিন্দলালের কথা। তিনি এখানে আছেন—বাবা তোমার পীড়ার সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। শুনিয়া তোমাকে একবার দেখিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। আজ পৌঁছিয়াছেন। তোমার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে পারি নাই—তিনিও সাহস করিয়া আসিতে পারেন নাই।"

ভ্রমর কাঁদিয়া বলিল, "একবার দেখা দিদি! ইহজন্মে আর একবার দেখি! এই সময়ে আর একবার দেখা।"

যামিনী উঠিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে, নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল—সাত বৎসর পর নিজ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দুজনেই কাঁদিতেছিল। একজনও কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর স্বামীকে কাছে আসিয়া বিছানায় বসিতে ইঙ্গিত করিল—গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় বসিল। ভ্রমর তাহাকে আরও কাছে আসিতে বলিল,—গোবিন্দলাল আরও কাছে গেল। তখন ভ্রমর আপন করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া, আশীর্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

গোবিন্দলাল কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ভ্রমরের হাত আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাত রহিল। অনেকক্ষণ রহিল। ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর মরিয়া গেল। যথারীতি তাহার সৎকার হইল। সৎকার করিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল গৃহে বসিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন অবধি তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন নাই।

আবার রজনী পোহাইল। ভ্রমরের মৃত্যুর পরদিন, যেমন সূর্য প্রত্যহ উঠিয়া থাকে, তেমনি উঠিল। গাছের পাতা ছায়ালোকে উজ্জ্বল হইল। সরোবরে কৃষ্ণবারি ক্ষুদ্র বীচি বিক্ষেপ করিয়া জ্বলিতে লাগিল; আকাশের কালো মেঘ সাদা হইল—ভ্রমর যেন মরে নাই। গোবিন্দলাল বাহির হইলেন।

গোবিন্দলাল দুইজন স্ত্রীলোককে ভাল বাসিয়াছিলেন—ভ্রমর আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল—ভ্রমর মরিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে

—এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি-ভাণ্ডারনিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়সাগর মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন, নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত সে বিষ কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্বপরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয়সুধা—স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্ত-পুষ্টিকর সর্বরোগের ঔষধস্বরূপ, দিবারাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনও ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, অত্যাজ্যা—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।

যদি তখন গোবিন্দলাল, রোহিণীর যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া স্নেহময়ী ভ্রমরের কাছে যুক্তকরে আসিয়া দাঁড়াইত, বলিত "আমার ক্ষমা কর—আমায় আবার হৃদয়প্রান্তে স্থান দাও।" যদি বলিত, "আমার এমন গুণ নাই যাহাতে আমায় ক্ষমা করিতে পার, কিন্তু তোমার ত অনেক গুণ আছে, তুমি নিজগুণে আমায় ক্ষমা কর," বুঝি তাহা হইলে, ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিত। কেন না রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী—রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক; পুরুষ ছায়া। আলো কি ছায়া ত্যাগ করিতে পারিত?

গোবিন্দলাল তাহা পারিল না। কতকটা অহঙ্কার—পুরুষ অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। কতকটা লজ্জা—দুষ্কৃতকারীর লজ্জাই দণ্ড। কতকটা ভয়—পাপ সহজে পুণ্যের সম্মুখীন হইতে পারে না। ভ্রমরের কাছে আর মুখ দেখাইবার পথ নাই। গোবিন্দলাল আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহার পর গোবিন্দলাল হত্যাকারী। তখন গোবিন্দলালের আশা ভরসা ফুরাইল। অন্ধকার আলোকের সম্মুখীন হইল না।

কিন্তু সেই তবু, পুনঃপ্রজ্বলিত, দুর্বার, দাহকারী ভ্রমরদর্শনের লালসা বর্ষে-বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে গোবিন্দলালকে দাহ করিতে লাগিল কে। এমন পাইয়াছিল? কে এমন হারাইয়াছে? ভ্রমরও দুঃখ

পাইয়াছিল, গোবিন্দলালও দুঃখ পাইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের তুলনায় ভ্রমর সুখী। গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য। ভ্রমরের সহায় ছিল—যম সহায়। গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই।

আবার রজনী পোহাইল—আবার সূর্য্যালোকে জগৎ হাসিল। গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।—রোহিণীকে গোবিন্দলাল স্বহস্তে বধ করিয়াছেন—ভ্রমরকেও প্রায় স্বহস্তে বধ করিয়াছেন। তাই ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইলেন।

আমরা জানি না যে, সে রাত্রি গোবিন্দলাল কি প্রকারে কাটাইয়াছিলেন। বোধ হয় রাত্রি বড় ভয়ানকই গিয়াছিল। দ্বার খুলিয়াই মাধবীনাথের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মাধবীনাথ তাঁহাকে দেখিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিলেন,—মুখে মনুষ্যের সাধ্যাতীত রোগের ছায়া।

মাধবীনাথ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলেন না—মাধবীনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহজন্মে আর গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা কহিবেন না। বিনা কথায় মাধবীনাথ চলিয়া গেলেন।

গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভ্রমরের শয্যাগৃহতলস্থ সেই পুষ্পোদ্যানে গেলেন। যামিনী যথার্থ ই বলিয়াছেন, সেখানে আর পুষ্পোদ্যান নাই। সকলই ঘাস খড় ও জঙ্গলে পূরিয়া গিয়াছে—দুই একটি অমর পুষ্পবৃক্ষ সেই জঙ্গলের মধ্যে অর্দ্ধমৃতবৎ আছে—কিন্তু তাহাতে আর ফুল ফুটে না। গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সেই খড় বনের মধ্যে বেড়াইলেন। অনেক বেলা হইল—রৌদ্রের অত্যন্ত তেজ হইল—গোবিন্দলাল বেড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া শেষে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তথা হইতে গোবিন্দলাল কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া, কাহারও মুখপানে না চাহিয়া বারুণী-পুষ্করিণী-তটে গেলেন। বেলা দেড় প্রহর হইয়াছে। তীব্র রৌদ্রের তেজে বারুণীর গভীর কৃষ্ণোজ্জ্বল বারিরাশি জ্বলিতেছিল—স্ত্রী পুরুষ বহুসংখ্যক লোক ঘাটে স্নান করিতেছিল—ছেলেরা কালো জলে স্ফটিক চূর্ণ করিতে করিতে সাঁতার দিতেছিল। গোবিন্দলালের তত লোক সমাগম ভাল লাগিল না। ঘাট হইতে যেখানে বারুণীতীরে, তাঁহার সেই নানাপুষ্পরঞ্জিত নন্দনতুল্য পুষ্পোদ্যান ছিল, গোবিন্দলাল সেই দিকে গেলেন। প্রথমেই দেখিলেন, রেলিং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—সেই লৌহনির্ম্মিত বিচিত্র দ্বারের

পরিবর্তে কঞ্চির বেড়া। ভ্রমর গোবিন্দলালের জন্য সকল সম্পত্তি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ উদ্যানের প্রতি কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই। একদিন যামিনী সে বাগানের কথা বলিয়াছিলেন—ভ্রমর বলিয়াছিল, "আমি যমের বাড়ী চলিলাম—আমার সে নন্দনকাননও ধ্বংস হউক। দিদি, পৃথিবীতে যা আমার স্বর্গ ছিল—তা আর কাহাকে দিয়া যাইব?"

গোবিন্দলাল দেখিলেন, ফটক নাই—রেলিং পড়িয়া গিয়াছে। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—ফুলগাছ নাই—কেবল উলুবন, আর কচুবন, ঘেঁটু ফুলের গাছ, কালকাসন্দা গাছে বাগান পরিপূর্ণ। লতামণ্ডপ সকল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে—প্রস্তরমূর্তি সকল দুই তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে—তাহার উপর লতা সকল ব্যাপিয়াছে, কোনটা বা ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। প্রমোদভবনের ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ঝিলমিল শার্সি কে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে—মর্মরপ্রস্তর সকল কে হর্ম্যতল হইতে খুলিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে—সে বাগানে আর ফুল ফুটে না—ফল ফলে না—বুঝি সুবাতাসও আর বয় না।

একটা ভগ্ন প্রস্তরমূর্তির পদতলে গোবিন্দলাল বসিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল, গোবিন্দলাল সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। প্রচণ্ড সূর্যতেজে তাঁহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুই অনুভব করিলেন না। তাঁহার প্রাণ যায়। রাত্রি অবধি কেবল ভ্রমর ও রোহিণী ভাবিতেছিলেন। একবার ভ্রমর, তারপর রোহিণী, আবার ভ্রমর, আবার রোহিণী। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে ভ্রমরকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে রোহিণীকে দেখিতে লাগিলেন। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইয়া উঠিল। সেই উদ্যানে বসিয়া প্রত্যেক বৃক্ষকে ভ্রমর বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল—প্রত্যেক বৃক্ষছায়ায় রোহিণী বসিয়া আছে দেখিতে লাগিলেন। এই ভ্রমর দাঁড়াইয়াছিল—আর নাই—এই রোহিণী আসিল, আবার কোথায় গেল? প্রতি শব্দে ভ্রমর বা রোহিণীর কণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। ঘাটে স্নানকারীরা কথা কহিতেছে, তাহাতে কখনও বোধ হইল ভ্রমর কথা কহিতেছে—কখনও বোধ হইতে লাগিল রোহিণী কথা কহিতেছে—কখনও বোধ হইল তাহারা দুজনে কথোপকথন করিতেছে। শুষ্ক পত্র নড়িতেছে—বোধ হইল ভ্রমর আসিতেছে—বনমধ্যে কীটপতঙ্গ নড়িতেছে—বোধ হইল রোহিণী পলাইতেছে। বাতাসে শাখা দুলিতেছে—

বোধ হইল ভ্রমর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে—দয়েল ডাকিলে বোধ হইল রোহিণী গান করিতেছে। জগৎ ভ্রমর রোহিণীময় হইল।

বেলা দুই প্রহর—আড়াই প্রহর হইল—গোবিন্দলাল সেইখানে—সেই ভগ্নপুত্তলপদতলে—সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে। বেলা তিন প্রহর, সার্ধ তিন প্রহর হইল—অস্নাত অনাহারী গোবিন্দলাল সেইখানে, সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে—ভ্রমর-রোহিণী অনঙ্গকুণ্ডে। সন্ধ্যা হইল, তথাপি গোবিন্দলালের উত্থান নাই—চৈতন্য নাই। তাঁহার পৌরজনে তাঁহাকে সমস্ত দিন না দেখিয়া মনে করিয়াছিল, তিনি কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অধিক সন্ধান করে নাই। সেইখানেই সন্ধ্যা হইল। কাননে অন্ধকার হইল। আকাশে নক্ষত্র ফুটিল। পৃথিবী নীরব হইল। গোবিন্দলাল সেইখানে।

অকস্মাৎ সেই অন্ধকার, স্তব্ধ বিজন মধ্যে গোবিন্দলালের উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিষম বিকার প্রাপ্ত হইল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে রোহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন। রোহিণী উচ্চৈঃস্বরে যেন বলিতেছে,

"এইখানে!"

গোবিন্দলালের তখন আর স্মরণ ছিল না যে, রোহিণী মরিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইখানে—কি ?"

যেন শুনিলেন রোহিণী বলিতেছে—

"এমনি সময়ে!"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "এইখানে, এমনি সময়ে কি রোহিণী ?"

মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলাল শুনিলেন, আবার রোহিণী উত্তর করিল, "এইখানে, এমনি সময়ে, ঐ জলে,

"আমি ডুবিয়াছিলাম!"

গোবিন্দলাল আপন মানসোদ্ভূত এই বাণী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ডুবিব ?"

আবার ব্যাধিজনিত উত্তর শুনিতে পাইলেন, "হাঁ, আইস। ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে, তাহার পুণ্যবলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।"

গোবিন্দলাল চক্ষু বুজিলেন। তাঁহার শরীর অবসন্ন, বেপমান হইল। তিনি মূর্ছিত হইয়া সোপানশিলার উপর পতিত হইলেন।

মুগ্ধাবস্থায় মানস চক্ষে দেখিলেন, সহসা রোহিণীমূর্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। তখন দিগন্ত ক্রমশঃ প্রভাসিত করিয়া জ্যোতির্ময়ী ভ্রমরমূর্তি সম্মুখে উদিত হইল।

ভ্রমরমূর্তি বলিল, "মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।"

গোবিন্দলাল সে রাত্রে মূর্ছিত অবস্থায় সেখানে পড়িয়া রহিলেন। প্রভাতে সন্ধান পাইয়া তাঁহার লোকজন তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া গেল। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল। সকলে মিলিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। দুই তিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন যে, তিনি এক্ষণে গৃহে বাস করিবেন। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা করিলেন না। এক রাত্রি তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কেহ আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না।

সাত বৎসর পর, তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল।

পরিশিষ্ট

গোবিন্দলালের সম্পত্তি তাঁহার ভাগিনেয় শচীকান্ত প্রাপ্ত হইল। শচীকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত।

শচীকান্ত প্রত্যহ সেই ভ্রষ্টশোভ কাননে—যেখানে আগে গোবিন্দলালের প্রমোদোদ্যান ছিল—এখন নিবিড় জঙ্গল—সেইখানে বেড়াইতে আসিত।

শচীকান্ত সেই দুঃখময়ী কাহিনী সবিস্তারে শুনিয়াছিল। প্রত্যহ সেইখানে বেড়াইতে আসিত, এবং সেইখানে বসিয়া সেই কথা ভাবিত। ভাবিয়া ভাবিয়া আবার সেইখানে সে উদ্যান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। আবার বিচিত্র রেলিং প্রস্তুত করিল—পুষ্করিণীতে নামিবার মনোহর কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত সোপানাবলী গঠিত করিল। আবার কেয়ারি করিয়া মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সকল পুঁতিল। কিন্তু রঙ্গীন ফুলের গাছ বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে বকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের মধ্যে সাইপ্রেস ও উইলো। প্রমোদভবনের পরিবর্তে একটি মন্দির প্রস্তুত করিল। মন্দির মধ্যে কোন দেব-দেবী স্থাপন করিল না। বহু অর্থব্যয় করিয়া ভ্রমরের একটি প্রতিমূর্তি সুবর্ণে গঠিত করিয়া, সেই মন্দিরের মধ্যে স্থাপন করিল। স্বর্ণ-প্রতিমার পদতলে অক্ষর খোদিত করিয়া লিখিল,

"যে, সুখে দুঃখে, দোষে গুণে, ভ্রমরের সমান
হইবে আমি তাহাকে এই স্বর্ণপ্রতিমা
দান করিব।"

ভ্রমরের মৃত্যুর বার বৎসর পরে সেই মন্দিরদ্বারে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। শচীকান্ত সেইখানেই ছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন, "এই মন্দিরে কি আছে দেখিব।"

শচীকান্ত দ্বার মোচন করিয়া সুবর্ণময়ী ভ্রমরমূর্তি দেখাইল। সন্ন্যাসী বলিল, "এই ভ্রমর আমার ছিল। আমি গোবিন্দলাল রায়।"

শচীকান্ত বিস্মিত, স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। কিন্তু পরে বিস্ময় দূর হইল, তিনি গোবিন্দলালের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য যত্ন করিলেন। গোবিন্দলাল অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "আজ আমার দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইল। অজ্ঞাতবাস সমাপনপূর্বক তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আশীর্বাদ করা হইল। এখন ফিরিয়া যাইব।"

শচীকান্ত যুক্ত করে বলিল, "বিষয় আপনার, আপনি উপভোগ করুন।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "বিষয় সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। বিষয়ে আমার কাজ নাই, তুমিই ইহা ভোগ করিতে থাক।"

শচীকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায়?"

গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, "কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার এ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহাকে হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পাইল না।

সমাপ্ত

কৃষ্ণকান্তের উইল

॥ আদি পর্ব ॥

[ক] ॥ বঙ্কিম-আবির্ভাবের পটভূমি : সমাজ ও সাহিত্য ॥

কোন শিল্পীই স্বয়ম্ভূ নহেন। কোন একটি নির্দিষ্ট দেশ ও কালের পট ভূমিতেই তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। এই দেশ ও কালের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, গতি-প্রকৃতিকে অস্বীকার করিয়া কোন শিল্পীই তাঁহার শিল্পসত্ত্বাকে গড়িয়া তুলিতে পারেন না। তাই, তিনি যে যুগ ও সমাজ-পরিবেশে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের অন্তরঙ্গ ও নিবিড় পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। শিল্পসৃষ্টি একটি নির্বিশেষ ও নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার হইলেও তাহার উপর দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য। কারণ, এই বিশিষ্ট পটভূমিতেই শিল্পী-ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও একথা সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ শিল্প-প্রতিভা ও অমর ব্যক্তিত্বকে বুঝিতে হইলে আমাদের তৎকালীন পরিবেশটিকে বুঝিতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর এক তাৎপর্যপূর্ণ সন্ধিক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। এই যুগসন্ধির স্বরূপটি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি রচনার মধ্যে অননুকরণীয় ভাষায় সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, "ইউরোপের চিত্তের জঙ্গম-শক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির পরে। তা নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়—সে চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।"

স্থবির প্রাচ্য গতিচঞ্চল পাশ্চাত্যের আঘাতে সচল হইয়া উঠিল। বাঙালীর চিন্তায়-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায়, আদর্শে ও সমাজ-জীবনে দেখা দিল অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য। গ্রাম-কেন্দ্রিক, গোষ্ঠী-নির্ভর, সামন্ততান্ত্রিক লোকাচারের অন্ধতায় মূঢ় বাঙালী সমাজে যখন বস্তুবাদী, ব্যক্তিনির্ভর, নগর-কেন্দ্রিক ও নবমানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতা আঘাত হানিল তখন সনাতন সংস্কার ও নবমানবতা এবং নবজীবনবোধের দ্বন্দ্ব দেখা দিল। দেখা দিল বাংলার নবজাগৃতি।

বহুদিনব্যাপী জড়ত্বের অভিশাপ যখন দূর হইতে শুরু করে, তখন যে আলোড়ন দেখা দেয়, তাহা যে প্রবল পরাক্রান্ত রূপ ধারণ করিয়া যাহাকিছু পুরাতন তাহাই সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিতে চাহিবে, তাহাতে আশ্চর্য কিছু নাই, বরং ইহাই স্বাভাবিক। বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর

সূচনাতেও এই একই ইতিহাস। বিদেশী ভাবধারার প্রথম উন্মাদনার পরিবেশে একদল ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও চিন্তাধারাকে বিচারে বিসর্জন দিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই হুবহু গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, আবার আর একদল রক্ষণশীল সনাতনপন্থী বাঙালী পাশ্চাত্য সভ্যতা নূতন বলিয়াই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া জাতীয় জীবনের সব-কিছুকেই বাঁচাইয়া রাখিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। জাতীয় জীবনের এই আলোড়ন-আন্দোলনের পরেই একে একে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি মনীষিগণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগৃতির প্রাণবন্যে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত বাঙালী জাতি ঠাকুর রামকৃষ্ণের অধ্যাত্মচিন্তায়, রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টায়, মধুসূদন ও বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনায় এবং বীর্যবান্ স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

ঊনিশ-শতকী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যালোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক, কারণ জাতীয় জীবনের রূপ ও স্বরূপ প্রতিফলিত হয় জাতীয় সাহিত্যের দর্পণে। সুতরাং এই সময়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপটিকেও এই অবসরে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

সব ভাষাতেই পদ্য-সাহিত্যের পরে গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। গদ্য দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা ছিল বলিয়াই হয়তো ভাব-কল্পনা বিকাশের উপাদানরূপে তাহার সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল; কারণ, ব্যবহারের ভাষাকে সজ্জিত করিয়াই তবে মনের মুক্তি দেওয়া সম্ভব। ভাষার এই ছন্দ-অলঙ্কারে অলঙ্কৃত রূপই পদ্যরূপ। বাংলা সাহিত্যের আদিরূপ তাহার পদ্যরূপেই প্রকাশিত।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এইসময়ে দেশী ও বিদেশীদের যুগ্মপ্রচেষ্টায় বাংলা ভাষার গদ্যরূপের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতি ঘটে—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। একদিকে কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড—অন্যদিকে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, চণ্ডীচরণ মুন্সী প্রমুখ ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টাতেই বাংলা সাহিত্যের গদ্যের গঠনযুগের সূত্রপাত। অবশ্য ইহাদের গদ্য ছিল অনুবাদ-নির্ভর।

মহাত্মা রামমোহনই এই শতকের প্রথম ব্যক্তি, যিনি একাধারে বাংলার সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ও চিন্তায় আপন প্রভাবটি স্পষ্ট চিহ্নিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল বলিয়াই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, সনাতন হিন্দুদর্শন, সংবাদপত্র পরিচালনা ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি এক নবাদর্শের সূচনা করেন। তাঁহার এই প্রদর্শিত পথেই পরবর্তীকালে বহু খ্যাত ও অখ্যাত ব্যক্তি অগ্রসর হইয়াছিলেন।

মহাত্মা রামমোহনের পর বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে শিল্পী আপন প্রতিভায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিলেন তিনি স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম সার্থক শিল্পী। ছেদ ও যতি চিহ্নের ব্যবহার এবং গদ্যেরও যে পদ্যের মতো একটি বিশেষ 'ছন্দ' আছে তাহা বিদ্যাসাগরেরই রচনায় প্রথম সার্থকভাবে দেখা দিয়াছিল। তবে এই প্রসঙ্গে এ-কথা বলা প্রয়োজন, তাঁহার রচনা দীর্ঘ-সন্ধি-সমাস-মিশ্রিত সংস্কৃতরীত্যনুসারী।

এই সময়েই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আর এক ব্যক্তিত্ব আবির্ভাব অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তিনি 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামধারী প্যারীচাঁদ মিত্র। ইনি সংস্কৃত রীতি পরিত্যাগ করিয়া বাংলা চলিত ভাষার শক্তিকে অবলম্বন করিয়া চলিত ভাষার মাধ্যমে সাহিত্যরচনা শুরু করেন। তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল'—এই রচনারীতিতেই সৃষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন, "বাংলা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী'র অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল'। ইহাদের কোনটি আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর পর হইতে বাঙালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাংলা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।" বঙ্কিমচন্দ্র নিজে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি এই দুই রীতির সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন।

প্রধানতঃ অনুবাদ-নির্ভর প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যে নবাদর্শ-সৃষ্টির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেও, সে সম্ভাবনা পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। পুরাতন সাহিত্যসংস্কার তখন সম্পূর্ণভাবে অবসিত হয় নাই; ভাষারীতি, বাক্‌বিন্যাস, বাচনভঙ্গিতে তখন পুরাতন-রীতি অনুসৃত হইতেছিল। ইহার

পরিচয় পাওয়া যায় 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনায়। ইনি নবীনকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেও তখন পর্যন্ত প্রাচীনকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

বিদ্রোহী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্য-প্রতিভায় নবযুগের প্রথম নব-বাণী-বিন্যাস লক্ষণায়। কিন্তু তিনি কবি, গদ্যশিল্পী নহেন। "বস্তুতঃ উনিশ শতকে পাশ্চাত্য প্রভাবে নবজাগরণ-দীপ্ত বাংলার প্রথম বাঙালী রামমোহন আর প্রথম কবি মধুসূদন দত্ত।"

গদ্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিম-পূর্ববর্তী গদ্যশিল্পীর দল তাঁহাদের নিজের নিজের শক্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়া কিছু কিছু সৃষ্টির পরিচয় রাখিলেও তেমন কোন মৌলিক রচনার পরিচয় দিতে পারেন নাই। মৌলিক রচনার অবদান লইয়া বঙ্কিমই প্রথম আবির্ভূত হইলেন। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপন্যাস-শিল্পী। যদিও বঙ্কিম-পূর্ববর্তী (১৮২১ সালের) 'সমাচারদর্পণ' পত্রিকায় 'বাবু' চরিত্র আলোচনায়, (১৮২৩ সালের) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নব বাবুবিলাস'-এ, (১৮৫৭ সালের) প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ, (১৮৬২ সালের) কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় মৌলিক সৃষ্টি-প্রচেষ্টার যুগলক্ষণটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কেননা এই রচনাগুলিতে উপন্যাস-রচনার সর্বাঙ্গসুন্দর গঠনকৌশল, চরিত্র রূপায়ণের মুন্সীয়ানা, হৃদয় রহস্যানুসন্ধান প্রভৃতি বিশেষ গুণগুলি না থাকিলেও তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে। সুতরাং এই রচনাগুলিকে বাংলা সাহিত্যের সার্থক উপন্যাসশিল্পের অগ্রদূত হিসাবেই আমরা গ্রহণ করিব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সামাজিক ও সাহিত্যিক পরিবেশেই সাহিত্য-স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। যে আবির্ভাবের পুণ্যস্পর্শেই বাংলা সাহিত্য তাহার শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবন লাভ করিয়াছে।

[খ] ॥ বঙ্কিম-আবির্ভাব : জীবন ॥

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতি বর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজ-নীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকল দিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল।" শুধু তাহাই নহে, এই সময়কালের মধ্যে যে সমস্ত মনীষী

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই নবযুগের সার্থক ধারক ও বাহক হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার সার্থক প্রমাণ।

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুন (১২৪৫ সনের ১৩ই আষাঢ়) রাত্রি ৯টায় চব্বিশ পরগণার কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যাদবচন্দ্র দীর্ঘকায় ও গৌরবর্ণ পুরুষ ছিলেন। তিনি তখন মেদিনীপুরের ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন। শুনা যায়, এক সন্ন্যাসীর দৈবশক্তি বলেই নাকি তিনি একবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষায় তেমন দক্ষতা না থাকিলেও তিনি ফার্সী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধিমত্তা, সত্যনিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা বলেই তিনি তৎকালে ডেপুটি কালেক্টরের দুর্লভ পদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরাধিকার সূত্রেই তাঁহার পিতার শারীরিক সৌন্দর্য, মানসিক শক্তি, স্বভাব ও কর্মদক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে বহুমানুষের ভীড়েও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বলিয়া চিনিয়া লওয়া যাইত।

যাদবচন্দ্রের চারি পুত্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয়। শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র এবং পূর্ণচন্দ্র সর্বকনিষ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নামেই তাঁহার 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস উৎসর্গ করেন। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্যামাচরণ বিশেষ পরিচিত না হইলেও পূর্ণচন্দ্র এবং বিশেষভাবে সঞ্জীবচন্দ্র সুপরিচিত। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' ভ্রমণ-কাহিনী তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ইহা ছাড়া 'জাল প্রতাপচাঁদ', 'কণ্ঠমালা,' 'মাধবীলতা' প্রভৃতি উপন্যাসের জন্মদাতাও তিনি।

যুগের রীতি অনুসরণেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয় মাত্র এগার বৎসর বয়সে, কিন্তু মাত্র দশ বৎসরের দাম্পত্যজীবনের অবসান ঘটে তাঁহার একুশ বৎসর বয়সে, ১৮৫৯ সালে। রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী। এই বিবাহ হইয়াছিল ১৮৬০সালে জুন মাসে। এই বিবাহ অত্যন্ত সুখের হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কোন পুত্রসন্তানের জনক না হইলেও, তিনটি কন্যা-সন্তানের জনক ছিলেন।

অসাধারণ মেধা ও প্রখর বুদ্ধি লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাঁটালপাড়ায় কিছুদিন ও মেদিনীপুরে চারি বৎসর কাল শিক্ষা লাভ করিবার পর ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময় হইতেই তিনি সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হন। তাঁহার প্রথম আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রটি

হইল 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকা। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে তিনি জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া মাসিক আট টাকা বৃত্তি এবং ১৮৫৬ সালে সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করিয়া মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৬ সালেই তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন শ্রেণীতে ভর্তি হন, কিন্তু ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবর্তিত এণ্ট্র্যান্স পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আইন পড়া বন্ধ রাখেন। এণ্ট্র্যান্সে তিনি প্রথম বিভাগে পাশ করেন। পরে ১৮৫৮ সালের এপ্রিলে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রবর্তিত প্রথম বি এ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতে থাকেন, কিন্তু পাঠ শেষ হইবার পূর্বেই তিনি ১৮৫৮ সালের ৭ই আগস্ট যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ গ্রহণ করেন। প্রায় বারো বৎসর পরে তিনি বি-এল পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ইহার পর হইতে ১৮৯১ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদে সম্মান ও মর্যাদা, কৃতিত্ব ও সুনাম লইয়া কাজ করেন এবং অবশেষে অবসর গ্রহণ করেন।

জীবিকার প্রয়োজনে যশোহর, মেদিনীপুর, খুলনা, বারুইপুর, আলিপুর, মুর্শিদাবাদ, বারাসত, হুগলী, হাওড়া, কলকাতা, জাজপুর, ভদ্রক প্রভৃতি নানা জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মস্থল ছিল। এই ব্যাপক দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা পরবর্তী কালে তাঁহার সাহিত্যের নানা উপাদান যোগাইয়াছে।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই বঙ্কিমচন্দ্র বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখে এই রোগেই মহাপুরুষ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। সাহিত্যস্রষ্টা বঙ্কিমের এই অকালমৃত্যুতে বঙ্গজননী তাঁহার এক সুসন্তানকে হারাইলেন। বাঙালীর অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় যুগসন্ধির পটভূমিতেই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব, একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এই সময়কার সাহিত্যক্ষেত্রে যিনি অসাধারণ প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন, তিনি গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে'ই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের 'হাতে-খড়ি'। এখানে তিনি 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' কাব্যের কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু নিজের শক্তিকে আবিষ্কার করিতে তাঁহার বেশী সময় লাগে নাই। তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলেন

তাঁহার আত্মপ্রকাশের মাধ্যম—পদ্য নহে, গদ্য। গদ্যকে আপন প্রতিভার প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিলেও, তাঁহার সংশয় তখনও কাটে নাই। কেননা সমকালীন বহু লেখকের মতোই তিনি ইংরেজী ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া ইংরেজী উপন্যাস 'Rajmohan's wife' রচনা করেন। মধুসূদনের ভুল ভাঙ্গিতে বেথুন সাহেবের উপদেশ কাজে লাগিয়াছিল—বাংলা দেশের সৌভাগ্য, বঙ্কিমের ভুল ভাঙ্গিতে তাঁহার আত্মসচেতনতাই সক্রিয় হইয়াছিল। দূরদৃষ্টির প্রভাবে ও অন্তরের প্রেরণায় তিনি মাতৃভাষাকেই বরণ করিয়া লইলেন। শুধু বরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাহাকে গঠনও করিলেন। আমরা বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম-রীতির পরিচয় পাইলাম। বিদ্যাসাগরী-রীতির শব্দসম্ভার ও ধ্বনিমাধুর্য এবং আলালী-রীতির গতিচাঞ্চল্য মিলিত হইয়া, গড়িয়া উঠিল বঙ্কিমী-রীতি। বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'নবীনা প্রতিভা'র সংস্পর্শে আসিয়াই বঙ্গভাষা জাগ্রত হইয়া উঠিল। বাঙালীর হৃৎপদ্মটি প্রস্ফুটিত হইবার অবকাশ পাইল। বাংলার 'নব ভগীরথ' বঙ্কিমচন্দ্র আপন সাধনায় বাংলা ভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া নবজীবন ও যৌবন-জোয়ারে দুকূল প্লাবিত করিয়া দিলেন। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইয়া বাঙালী পাঠক সমাজকে সচকিত করিয়া তুলিল। 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁহার প্রথম বাংলা উপন্যাস, রোমান্স ও ইতিহাসের সমন্বয়। উপন্যাসের প্রয়োজনেই তিনি ইতিহাসকে কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার মতে, "উপন্যাস উপন্যাসই—ইতিহাস নহে।"

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী চিত্তে যে আনন্দাবেগ সঞ্চারিত হইয়াছিল 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' প্রকাশে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইল। ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পাদক বঙ্কিমের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জাতি তাঁহার মধ্যে বাংলা দেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও সমালোচককে আবিষ্কার করিয়া আনন্দে প্রায় আত্মহারা হইয়া পড়িল। 'বঙ্গদর্শন'-এর মধ্য দিয়াই "মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদীনির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দাবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।" এই বঙ্কিমকে কেন্দ্র করিয়াই তখন একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি এই গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন।

[গ] ॥ উপন্যাস-শিল্প প্রসঙ্গ ॥

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে, উপন্যাস-শিল্পকে বোঝা প্রয়োজন এবং ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান নির্দেশ করিতে হইলে, বঙ্কিমযুগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত উপন্যাস রচনা-ধারার অনুধ্যান অত্যাবশ্যকীয়।

'উপন্যাস'— সাহিত্যক্ষেত্রের আধুনিকতম ফসল। "The novel seems today the only literary form which is really alive; it is in constant demand and in abundant production" ইংরেজী সাহিত্যে যাহা 'novel' বলিয়া পরিচিত, বাংলা সাহিত্যে তাহাই উপন্যাস বলিয়া চিহ্নিত। বলা যায়, ইংরেজী নভেলের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক উপন্যাসের জন্ম; এবং বঙ্কিমচন্দ্রই সার্থক আধুনিক উপন্যাসের জন্মদাতা। যুক্তি-বিচারসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও পরিবেশ-সচেতন বাস্তব জীবনবোধ না থাকিলে সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই গুণগুলি ছিল বলিয়াই তিনি উপন্যাস সৃষ্টিতে সক্ষম হইয়াছেন। উপন্যাস-শিল্প প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন, "গল্প বলা ও শোনার আকাঙ্ক্ষা মানুষের আদিম প্রবৃত্তিনিচয়ের অন্যতম। যাহা ঘটিতেছে তাহা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, সাধারণতঃ তাহার মধ্যে অসাধারণত্বের ছাপ থাকে না। তবু যাহা ভবিষ্যতের গর্ভে বিলীন রহিয়াছে, তাহার মধ্যে বিস্ময়কর কিছু আছে, এই প্রত্যাশাই মানুষের আটপৌরে জীবনে রোমান্সের স্পর্শ আনিয়া দেয়। এই কৌতূহলের পরিতৃপ্তি সে খোঁজে কল্পিত কাহিনীতে, যেখানে অসাধারণের প্রবেশ অপেক্ষাকৃত সহজ। এইজন্যই মানুষের প্রথম গল্প রূপকথা। রূপকথাকে বিস্ময়কর হইতে হইবে, সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন তাহার কাছে অবান্তর। ঈশপের গল্প, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ—এই সকল গ্রন্থে যে সকল গল্প বলা হইয়াছে, তাহাদের ভিত্তি বাস্তবজীবনে এবং তাহাদের উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা। কিন্তু তাহা হইলেও বিষ্ণুশর্মা ও ঈশপ পশুপক্ষীকে মানুষের মত করিয়া চিত্রিত করিয়া সাধারণ কাহিনীতে অসাধারণত্ব আরোপ করিয়াছেন।

রূপকথা, উপকথা, কিংবদন্তী, ভূতের কাহিনী প্রভৃতি প্রাচীন আখ্যায়িকায় আমরা যে গল্পের আস্বাদ পাই, তাহার সঙ্গে উপন্যাসের আস্বাদের সাদৃশ্য খুব কম। উপন্যাস বিশেষভাবে আধুনিক কালের সামগ্রী। প্রাচীনকালে সাহিত্য-স্রষ্টারা যখন জীবনের বিশালতা ও বিস্তৃতির পরিচয় দিতে চাহিতেন তখন তাঁহারা মহাকাব্যের আশ্রয় লইতেন। কিন্তু মহাকাব্যে জীবনের

মহত্তম অংশ চিত্রিত হইয়া থাকে; তাহা মহান্ বলিয়াই জীবনের সমগ্রতার ছবি আঁকিতে পারে না। নাটক জীবনের সচরাচরতার ছবি আঁকিতে পারে, কিন্তু নাটক রচিত হয় অল্প সময়ের মধ্যে অভিনীত হওয়ার জন্য। সুতরাং তাহার লক্ষ্য তীব্রতা—বিস্তৃতি নয়। সাহিত্য যতই গণজীবনের সংস্পর্শে আসিতে লাগিল ততই উপন্যাসের মত একটি প্রকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইল এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই উপন্যাস মহাকাব্যের স্থান গ্রহণ করিল। ইহার মধ্যে জীবনের বিস্তৃতি ও জটিলতা রূপায়িত হইল, অথচ তাহার সচরাচরতা নষ্ট হইল না। উপন্যাসের কবিত্বময় অংশ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার বাহন গদ্য।"

উপন্যাসের জন্মসূত্রটির আবিষ্কার প্রসঙ্গেই আমরা উপন্যাস-রচনার শ্রেণী বিভাগ করিয়া লইতে পারি। কাহিনীর উপর লক্ষ্য রাখিয়া আমরা গল্পে তিনটি ধারা বা স্তরের নির্দেশ করিতে পারি। এই শ্রেণীর গল্প আমাদের আটপৌরে জীবনের বিবরণ দেয়, এখানে চমৎকার উপাদানের স্থান কম। এই জাতীয় গল্প পাই সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসে। বাস্তবের নিগূঢ় সত্যকে প্রকাশ করা অথবা সামাজিক জীবনের উন্নতি সাধন করা এই সকল উপন্যাসের উদ্দেশ্য। আর এক শ্রেণীর গল্প আছে, যেখানে সম্ভাব্যতার দাবি কম, সেইখানে পরমাশ্চর্য কাহিনী অনুক্ষণ ঘটিতেছে। ইহার অভ্যন্তরে মানবজীবনের রহস্যের সন্ধান থাকিতে পারে, নাও পারে, কিন্তু ইহার প্রধান আবেদন এই যে, ইহা আমাদের বিস্মিত কৌতূহলকে জাগ্রত ও নিবৃত্ত করে। এই জাতীয় গল্প প্রাচীন রূপকথা বা উপকথা ও বর্তমান কালের ডিটেকটিভ ও রম্য উপন্যাস। ইহার মধ্যবর্তী আর এক শ্রেণীর গল্প আছে। সেই গল্পে বিস্ময়কর বস্তু অনেক থাকে, কিন্তু তবু সেইখানে আমাদের কল্পনা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবের বন্ধনমুক্ত হয় না। এই শ্রেণীর গল্পকে বলি রোমান্স। রোমান্সের মধ্যে বাস্তব জীবনের চিত্র আছে, আবার তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক জগতের মহিমাও আরোপিত হইয়া থাকে।

ইংরেজী সাহিত্যে এই বিভিন্ন দিকের কথা স্মরণে রাখিয়াই নভেলের সংজ্ঞা স্থিরীকৃত হইয়াছে "The novel is a fictitious narrative differing from the romance, because the events are accommodated to the ordinary train of human events and the modern state of society." কাজেই আধুনিকতার সহিত উপন্যাসের জন্মকালীন সম্পর্ক,

নাড়ীর যোগ। সুতরাং, আধুনিক উপন্যাস পূর্ণাবয়ব মানবজীবনকে কাহিনী-বদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই উদ্ভূত বিশেষ শিল্পস্বরূপ। এইজন্যই "The novel is not merely the fictional prose, it is the prose of man's life, the first are to take the whole man and give him expression."

উপন্যাস-শিল্পের এই সংজ্ঞার কথা স্মরণে রাখিয়াই আমরা পূর্বালোচনার 'নববাবুবিলাস' ও 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি রচনাকে নাটক উপন্যাসের অগ্রদূত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। কারণ, উপন্যাস শুধু কাহিনী মাত্র নহে, ইহাতে অংশের সহিত সময়ের, ঘটনার সহিত চরিত্রের সম্পর্ককে কেন্দ্র করিয়াই শিল্পী তাঁহার সামগ্রিক দৃষ্টির সাহায্যে একটি ঐক্যের ধারা সৃষ্টি করেন—একটি সুসমঞ্জস ও সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ গড়িয়া তোলেন। উপরোক্ত গ্রন্থ দুইটিতে, তৎকালীন বঙ্গসমাজের ও ব্যক্তি-জীবনের টুকরা টুকরা চিত্র অত্যন্ত জীবন্ত হইয়া উঠা সত্ত্বেও সামগ্রিক কোন চিত্র ফুটিয়া উঠে নাই বলিয়াই এই রচনাগুলিকে সার্থক উপন্যাস বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম শিল্পী, যিনি শুধু বাংলা উপন্যাস-শিল্পের জন্মই দেন নাই—তাহাকে পূর্ণতাও দিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে বাংলা উপন্যাসের যে ভ্রূণাবস্থা ছিল, তাহাই বিকশিত হইয়া উপন্যাস-শিল্প একটি প্রেক্ষণীয় রূপ লাভ করিল। বঙ্কিম-প্রবর্তিত বাংলা উপন্যাসের এই ধারাই যুগ অতিক্রম করিয়া যুগান্তরে পৌঁছিয়াছে। এই প্রবাহপথ বিভিন্ন দেশ-কালের মধ্য দিয়া চলিবার সময় বহু বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু মূল ধারায় বিশেষ কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় নাই।

[খ] ॥ বঙ্কিম-উপন্যাসের ধারা ॥

১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দ বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির ইতিহাসে এক নবদিগন্তের সূচনা করিয়াছিল। এই সনেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম রচনা 'দুর্গেশনন্দিনী' লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। রচনাটি রোমান্সধর্মী। প্রসঙ্গতঃ বলা হয়, রোমান্স-প্রবণতা বঙ্কিম-উপন্যাসের অন্যতম সাধারণ ধর্ম। এই রোমান্টিক মনোভঙ্গিই বঙ্কিম-মানসের বৈশিষ্ট্য।

বহু বিদেশী শব্দের মতো 'রোমান্স' শব্দটিও বিদেশী, যাহার সঠিক কোন বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া কঠিন। তাই এই বিদেশী শব্দটিকে আমরা হুবহু

গ্রহণ করি ; তবে এই প্রসঙ্গে রোমান্স বলিতে আমরা কি বুঝি তাহাও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

রোমান্সধর্মী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হইতেছে কল্পনার ঐশ্বর্য, বিস্ময়কর ঘটনার সমাবেশ, অসাধারণ অতিলৌকিক অভিজ্ঞতার অবতারণা, বিগত কাল ও সুদূরের প্রতি স্বপ্নমধুর আকর্ষণ. মানবহৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় ভাবানুভূতির বর্ণনা, বাস্তবকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কল্পনার অমরাবতীতে প্রবেশের বাসনা। বাস্তব জীবনের তুচ্ছতা-ক্ষুদ্রতা রোমান্সের যাদুস্পর্শে এক অপরূপ রূপলাবণ্য লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক, সামাজিক, পারিবারিক এবং স্বদেশপ্রীতিমূলক উপন্যাসগুলিতে এই কল্পনাতিশয্যই কিছুটা অবাস্তবতার স্পর্শ দিয়াছে, কিন্তু বাস্তববোধ পরিপূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয় নাই। তিনি বাস্তব ও অবাস্তবের সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারিয়াছেন। কল্পনা ও বাস্তব, ইতিহাস ও রোমান্সের এমন অভিনব সমন্বয়সাধন আজ পর্যন্ত কাহারও উপন্যাসে সংসাধিত হয় নাই। এইখানেই শিল্পী বঙ্কিমের কৃতিত্ব।

তাঁহার দ্বিতীয় রচনা 'কপালকুণ্ডলা'ও একটি মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার পটভূমিকায় রচিত রোমান্সধর্মী উপন্যাস। তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী'তে স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি। বাংলার কলঙ্কিত ইতিহাস (ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখিত) তাঁহাকে বেদনা দিয়াছিল, এই বেদনা হইতে জাত উপন্যাস মৃণালিনীতে তিনি বাঙালীর স্বদেশপ্রেম ও বীর্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যে স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল তাহারই প্রথম প্রকাশ 'মৃণালিনী'। এই উপন্যাসেও ইতিহাসের উপাদান থাকিলেও তাহা রোমান্সের রসে অভিসিঞ্চিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে। প্রথম পর্যায়ে এই তিনটি উপন্যাসই অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত হয় 'বিষবৃক্ষে'। এই শ্রেণীর উপন্যাসকে সামাজিক বা পারিবারিক উপন্যাস বলা চলে। প্রধানতঃ এই প্রকৃতির উপন্যাসই বঙ্কিম অধিকসংখ্যক রচনা করিয়াছেন। এইজাতীয় উপন্যাসে বাংলার সমাজ ও বাঙালীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের জীবন্ত চিত্র নিখুঁত রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'বিষবৃক্ষে'র পর 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়' প্রকাশিত হয়। 'চন্দ্রশেখর' বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সৃষ্টির তালিকায় সপ্তম স্থান অধিকার করে। ইহার পর 'রজনী,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ' রচিত হয়। বলা চলে, প্রধানতঃ 'বিষবৃক্ষ,' 'চন্দ্রশেখর' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লইয়াই

বঙ্কিম উপন্যাসের দ্বিতীয় স্তর সৃষ্ট হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, এই দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসের শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র বেশ খানিকটা পরিমাণে আদর্শবাদী ও শিক্ষক হইয়া উঠিয়াছেন। মনুষ্যচিত্তের উৎকর্ষসাধন যে সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য—এই বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। এই উপন্যাসগুলিতে তাঁহার সেই বিশ্বাস যে অনেকখানি প্রতিফলিত—ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এইসব রচনায় সৌন্দর্যরসিক শিল্পী বঙ্কিমকে আবিষ্কার করিতেও আমাদের অসুবিধা হয় না। কারণ, এগুলিই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত মনের সৃষ্টি। জীবনের বাস্তব সংঘাতে, তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে, আন্তররহস্যের উদ্ঘাটনে—এই পারিবারিক উপন্যাসগুলি আপন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। গভীরতম জীবন-জিজ্ঞাসার মহত্তম প্রয়াসে এই রচনাগুলি অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে। সত্যানুভূতির সূক্ষ্মতম উপলব্ধির আলোকসম্পাতে রচনাগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই ত্রয়ী উপন্যাস—দাম্পত্য আদর্শের পারিবারিক উপন্যাস। এই রচনাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় জীবনাদর্শকেই অনুসরণ করিয়াছেন। নরনারীর বিবাহসম্পর্ক প্রাচ্য রীতি অনুসারে শুধুমাত্র বাহিরের সম্পর্কই সূচিত করে না, তাহাকে ধর্মীয় সংস্কার বলিয়াও প্রতিষ্ঠিত করে। তাই দাম্পত্যধর্মে মানসিক ব্যভিচার অনুপ্রবেশ করিলে হিন্দুসমাজে তাহা বরণীয় হইতে পারে না। এই ব্যভিচারের মূল্য পরিশোধ করিতে হয়, শাস্তি বরণ করিয়া। পাশ্চাত্য দাম্পত্যজীবনের আদর্শে এমন কোন বিচার-ব্যবস্থা নাই। কিন্তু হিন্দুসমাজে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে একটি মহৎ উদ্দেশ্য, একটি বৃহৎ আদর্শ আছে। এই বিশ্বাসকে সম্মুখে রাখিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র এই ত্রয়ী উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শবাদী হইয়া উঠিয়াছেন এবং অনেকের নিন্দার পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকেই বলিয়াছেন যে, বঙ্কিম-উপন্যাস অবাস্তবতার দোষে দুষ্ট ও মনস্তত্ত্ববিরোধী। পরবর্তীকালের অন্যতম সাধক স্রষ্টা শরৎচন্দ্র নিজেও বঙ্কিম-রচনাকে এই দোষে অভিযুক্ত করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম-রচনার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে একটি বিশেষ মতবাদ লইয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এই সময়ে ইউরোপে 'Art for art's sake'—এইরূপ একটি মতবাদ প্রাধান্য পাইয়াছিল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'শিল্পের জন্যই শিল্প এমন মতবাদকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই; না করিবার কারণ হইল এই যে তিনি মনুষ্যজীবন

ও শিল্পকে কখনও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। মনুষ্যত্বের পূর্ণ সাধনাই তাঁহার সাহিত্যসাধনার স্বরূপ। তাঁহার মতে, সাহিত্য 'স্বভাবানুকৃতি' হইলে তাহা 'স্বভাবাতিরিক্ত'। যে সাহিত্য মনুষ্যসমাজের মঙ্গল সাধন করে না, সে সাহিত্য-সৃষ্টির কোন মূল্য নাই। এই বোধ লইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি একটি সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার পারিবারিক উপন্যাসগুলির মধ্যে এইরূপ একটি আদর্শবোধ অনুসৃত হইলেও সূক্ষ্ম বিচারে এই রচনাগুলির কোথাও রস ক্ষুণ্ণ হয় নাই —একথা বলা চলে। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে, সাহিত্য-নির্মাণের ক্ষেত্রে এই সাফল্য বঙ্কিম-প্রতিভার অসাধারণত্বেরই পরিচয় দেয়। কেহ কেহ মনে করেন, এই সত্য-সুন্দর বিভাসিত, মঙ্গলময় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টা থাকাতেই 'বিষবৃক্ষ' 'চন্দ্রশেখর' কিংবা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি রচনার মধ্যে পাশ্চাত্যাদর্শের যে ট্র্যাজেডি গড়িয়া উঠিতে পারিত, তাহা শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে।

রুচিবান সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের রুচির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পাপের প্রতি, যৌনজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের প্রতি বঙ্কিমের আগ্রহ তো ছিলই না, বরং একটা স্বাভাবিক বিমুখতা ছিল। রমণীপ্রেম ও স্বদেশপ্রীতি প্রায় সব উপন্যাসের মূল প্রেরণা হইলেও নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের মোহময় রূপ, স্বপ্নময় মাধুর্যের চিত্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদী মনের অভিপ্রকাশ লক্ষণীয়। বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের মতো সমস্ত কিছুরই হুবহু বিবরণ বা বর্ণনা তিনি দেন নাই। পাঠকের কল্পনাকে বিশ্বাস করিয়া, তিনি সহৃদয় পাঠকদের আপন কল্পনা-শক্তির দ্বারা বর্ণনার ফাঁকগুলি পূরণ করিয়া লইতে নিঃশব্দে আমন্ত্রণ করিয়াছেন, এবং প্রেমচিত্র চিত্রণে প্রচলিত হিন্দুসংস্কার অস্বীকার না করিয়া তিনি তাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষতঃ শরৎচন্দ্রকে অনেক বেশী সংস্কারমুক্ত বলিয়া চিহ্নিত করা চলে। প্রেমের শক্তি সমাজ-সীমার মধ্যেই সীমিত থাকে না, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায়। মানুষের রূপ-পিপাসা ও যৌন আকর্ষণ এমনি করিয়াই অনেক সময় সমাজ-বন্ধনকে অস্বীকার করিয়া প্রবল হইয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের এই প্রচণ্ড শক্তিকে অস্বীকার করেন নাই, কেবলমাত্র তাহাকে এক বৃহত্তর ও মহত্তম আদর্শের পথে পরিচালিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই প্রচেষ্টার মধ্যে তিনি ভারতীয় ধর্মাদর্শকেই বরণ করিয়া লইয়াছেন।

সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল—এই 'ideal'-এর সঙ্গে 'real'-এর দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে এবং শেষপর্যন্ত 'real' পরাজিত হইয়াছে, অর্থাৎ সৌন্দর্য-শিল্পী বঙ্কিম আদর্শবাদী শিক্ষক বঙ্কিমের নিকট পরাভূত হইয়াছেন। এই কারণেই আমরা সমাজ-বিরোধী প্রেমে আবিষ্ট বঙ্কিমের চিত্রিত নায়ক-নায়িকাকে প্রায় সবক্ষেত্রেই মোহমুক্ত, নয়তো অনুতাপের কশাঘাতে জর্জরিত অথবা অনুশোচনার অগ্নিতে দগ্ধ হইতে দেখি। ইহাতে শিল্পবোধ যে কিছুটা পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও এসম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার 'সীতারাম' উপন্যাসের ভূমিকা।

শিল্পীর দায়িত্ব সমস্যার উদ্‌ঘাটন—সমস্যার সমাধান নহে সমস্ত সাহিত্যিকই তাঁহার সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন সমস্যার চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র তাঁহাদের উপন্যাসে এই ভাবেই নানা সমস্যার ইঙ্গিত দিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাহার সমাধান দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন নাই; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসগুলিতে এই সমস্যার চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সমাধান-প্রচেষ্টাতেও রত হইয়াছেন। ফলে, তাঁহার উপন্যাসগুলিতে নানা ত্রুটি দেখা দিয়াছে; কারণ, শিল্পী-সাহিত্যিক তাঁহার নিজস্ব ভূমিকা পরিত্যাগ করিয়া সামাজিকের, সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ রূপায়ণের গৌরবও বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রাপ্য। 'রাজসিংহ'ই তাঁহার সার্থকতম ঐতিহাসিক উপন্যাস। পরবর্তীকালে রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহারই অনুসরণে তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি রচনা করেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র আগে ঐতিহাসিক, পরে শিল্পী আর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পরিচয় তিনি শিল্পী। ঐতিহাসিক বঙ্কিমের স্থান শিল্পীর পিছনে। পারিবারিক প্রসঙ্গের সহিত ইতিহাসের রোমান্সকে সুকৌশলে গ্রথিত করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র যে রূপ ও রস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অনবদ্য। আর কোন শিল্পীর পক্ষে তদ্রূপ করা প্রায় সম্ভব হয় নাই। 'রাজসিংহ'-এর পূর্বে 'মৃণালিনী' ও পরে 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' উপন্যাসের মাধ্যমেই বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনার পুষ্টি। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাস কেন সৃষ্ট হয় নাই—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গিয়া ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "বাস্তবিক, ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃত আদর্শ দুরধিগম্য; ইতিহাসের বিশাল

সংঘটনের ছায়া-তলে আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের চিত্র আঁকিতে হইবে; দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার যোগসূত্রগুলির মধ্যে সম্পর্কটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। একদিকে ইতিহাসের বিপুলতা, ঘটনাবৈচিত্র্য ও বর্ণ-সম্পদ ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে, অন্যদিকে আমাদের বাস্তব-জীবনের কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খল, সত্যের কঠোর বন্ধনের দ্বারা ইতিহাসের কল্পনা-প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে; এবং সর্বোপরি, উভয়ের মধ্যে মিলনটি সম্পূর্ণ ও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে, যেন সমস্ত উপন্যাসটির আকাশ-বাতাসের মধ্যে একটা নিগূঢ় ঐক্য আনিতে পারা যায়।"

এই প্রসঙ্গেই তিনি ইউরোপীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস-রীতির সহিত বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনার তুলনামূলক বিচার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, "ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকেরা ইতিহাসের যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, দৈনিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেভাবে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, বঙ্কিম তাহা পারেন নাই। তবে, বঙ্কিমের সপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ইউরোপীয় আদর্শ অনুসরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, এবং স্বাভাবিক বাধা সত্ত্বেও তিনি যতটা সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রতিভারই পরিচয়। স্থানে স্থানে তিনি কেবল প্রতিভাবলেই কোন অতীত যুগের ঠিক প্রাণস্পন্দনটি ধরিয়াছেন, বা কোন ইতিহাস-বিখ্যাত পুরুষের আসল ব্যক্তিত্বটুকু ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন, ইহা প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও অনুভব করা যায়।" "বস্তুতঃ ইউরোপীয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো একান্তভাবে সত্যনিষ্ঠ রচনা বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে মেলে না—উহার কারণ অন্তর্নিহিত আমাদের জাতীয় জীবন পরিবেশে"……"বিভিন্ন যুগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা এতই অজ্ঞ যে, আমাদের নিকট একযুগ হইতে অপরের ভেদরেখা অতি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট। সুদূর হিন্দু অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এমনকি মুসলমান অধিকারের পরেও কোন শতাব্দীরই বিশেষ রূপ সম্বন্ধে, সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে, আমাদের বেশ স্পষ্ট ধারণা নাই। চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ—সমস্ত শতাব্দীই আমাদের চক্ষে একাকার, বিস্মৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ধূসর বর্ণে পরিব্যাপ্ত; এই অন্ধকারের মধ্যে রাজাদের নাম ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাই যাহা-কিছু ক্ষীণ আলোক রেখাপাত করিতেছে। আমাদের অতীত

ইতিহাসের কোন অধ্যায়কে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত করিবার একমাত্র উপায় তৎকালীন রাজার নামের দিকে দৃষ্টিপাত করা ; উপন্যাস-বর্ণিত ঘটনা কোন্ যুগে ঘটিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে ধারণা করার একমাত্র উপায় সেই সময়ের শাসনকর্তার কাল-নির্ধারণ—সে সময়ে রাজা কে ছিলেন,—আকবর, জাহাঙ্গীর, আওরঙ্গজেব, সিরাজদ্দৌলা, কী মীরকাশিম এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, আভ্যন্তরীণ প্রমাণের দ্বারা কিছুই জানিবার উপায় নাই। এই জন্যই বঙ্গ-সাহিত্যে যাঁহারা প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই কার্যের কঠোর দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই রাজা ও সম্রাট জাতীয় পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের কল্পনার জাল বুনিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত সত্যনিষ্ঠ রমেশচন্দ্র দত্ত রাজপুত ও মহারাষ্ট্র ইতিহাসের রোমান্সের অপেক্ষা বিস্ময়কর, অথচ অবিসংবাদিত সত্যের উপর নিজ উপন্যাস-সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন। কল্পনাকুশল বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ উপন্যাসেই ঐতিহাসিক উপাদানের রূপান্তর সাধন করিয়া ইতিহাসের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। দুই-একটিতে ইতিহাসের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাবিন্যাসেই নিজ শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাসেই ইতিহাসের উপাদান গ্রহণ করিলেও সবগুলিই ঐতিহাসিক উপন্যাস হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মতানুযায়ী 'রাজসিংহ'ই প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'—এই ত্রয়ী উপন্যাসই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ পর্যায়ের রচনা। এই পর্যায়ে বঙ্কিম মানসের একটি বিশিষ্ট রূপ এই রচনাগুলির মাধ্যমে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মহত্তর ধর্মবোধ ও মানব-জীবনের বৃহত্তর কর্তব্যবোধ উপন্যাসগুলির উপজীব্য। জীবনের গভীরতম প্রত্যয় নহে—আদর্শ প্রচারই যেন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে আদর্শবাদী বঙ্কিমের আত্মঘোষণাই সেখানে সোচ্চার। দেশপ্রীতি, আদর্শবাদ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি গুণগুলি এই উপন্যাস তিনটিকে মহিমময় করিয়া তুলিয়াছে, ইহা সত্য হইলেও কল্পনার আতিশয্যে যে এই উপন্যাস তিনটিকে বিশেষতঃ 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'কে বেশ খানিকটা পরিমাণে অবিশ্বাস্য করিয়া তুলিয়াছে, ইহাও সত্য। অর্থাৎ, বাস্তবতাবোধের অভাবই ইহাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য করিয়া তুলিতে পারে নাই।

বাংলা সাহিত্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্র একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এই জ্যোতির্ময় জ্যোতিষ্কের আলোক বিচ্ছুরণে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রটি উদ্ভাসিত। এই প্রতিভার প্রদীপ্ত বিশালতায় বাংলা সাহিত্যের সমুন্নতি। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্কিম পাশ্চাত্য সাহিত্য-রীতির দ্বারা অনিবার্যভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহার উপন্যাসের রূপকল্প নির্মিতিতেই তাহা সুপ্রকাশিত ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কাহিনী-গঠনের অভিনবত্বায় ও ভাব প্রকাশের উপযুক্ত ভাষারীতি ও বাগ্‌বিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিশিষ্টতার পরিচয় রাখিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, জটিলতায় আবদ্ধ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে বিধ্বস্ত, আশা-নিরাশার দোলায় দোলায়িত, উত্থান-পতন-বন্ধুর জীবনের যে বিচিত্র রূপ তাঁহার উপন্যাসগুলিতে প্রকাশিত, সেই অপরূপ রূপ আমাদের সমাজ-জীবন হইতেই সংগৃহীত। এই উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশী সমাজ-সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। ইহা বঙ্কিম-মানসের স্বকীয়তারই পরিচায়ক। কিন্তু এই আলোচনার প্রসঙ্গানুসরণে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাহা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। উপন্যাসে মানবজীবনের বহু বিচিত্র জটিলতা ও মানবহৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিরুদ্ধধর্মী ভাব ও আকৃতির সমন্বয় ও সংঘাত রূপায়িত করাই আধুনিকতার লক্ষণ। আধুনিক উপন্যাস-রচয়িতাদের মধ্যে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের এক প্রবল প্রবণতা পরিদৃশ্যমান। এই নিরিখে বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্রকে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের সহিত একাসনে বসানো চলে না, কারণ বঙ্কিম-উপন্যাসে হৃদয়বৃত্তি ও ভাবাবেগের প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত থাকিলেও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পরিচয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ইহার প্রতি তেমন আকর্ষণও ছিল না। কারণ, চরিত্র-বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় ও ঘটনা-বর্ণনার গভীরতায় নহে—শিল্পদৃষ্টির সমুন্নত বিশালতায় বঙ্কিম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার উপন্যাস-বিচারকালে এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে না রাখিলে সম্ভবতঃ আমরা সব্যসাচী বঙ্কিমের অসাধারণ সৃষ্টির সার্থকতা বিচার করিতে পারিব না ও তাহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকেও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব না। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে সব শিল্পীরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে—বঙ্কিমচন্দ্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

॥ মধ্য পর্ব ॥

[ক] ॥ কৃষ্ণকান্তের উইল : রচনাকাল ॥

১৮৫৭ সাল। বঙ্কিমচন্দ্র মালদহ রোড সেসের কার্য হইতে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে ছুটি লইয়া জুন মাসে কাঁটালপাড়ায় (নৈহাটি) আসেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই অবকাশের রচনা বলিয়াই অনুমিত হয়। ১২৮২ সালের পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। চৈত্র সংখ্যায় ইহা ছাপা হয় নাই। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকা বন্ধ করিয়া দেন। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রকাশিত হয় এবং সেই সংখ্যা হইতে কৃষ্ণকান্তের উইলও পুনরায় ক্রমশঃ প্রকাশ লাভ করিয়া মাঘ সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। ১৮৭৮ সালে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রথমে পুস্তকাকারে প্রকাশ লাভ করে। ১৮৯২ সালে ইহার চতুর্থ সংস্করণ বাহির হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সেই উপন্যাসখানির বিশেষ সংস্কার সাধন করেন। অবশ্য ইহাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রতি সংস্করণে তাঁহার পুস্তকের যথোচিত সংস্কার সাধন করিতেন।

বঙ্গদর্শন হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশকালে রোহিণী এবং গোবিন্দলালের চরিত্র পরিবর্তিত হয়। বঙ্গদর্শনে প্রকাশকালে এবং প্রথম সংস্করণেও রোহিণীকে দুশ্চরিত্রা, লোভী, কামাতুর, হীনচেতারূপে চিত্রিত করা হইয়াছিল। "সে আড়ি পাতিয়া কথা শুনে, অর্থলোভে জাল উইল বদল করিতে নিজে উপযাচিকা হইয়া হরলালের সহিত সাক্ষাৎ করে, নির্লজ্জার মত শ্লোক আওড়ায়, চিরদিন দুষ্কর্মরতা দুর্বৃত্তার ন্যায় আগে টাকা লইতে চায়, হরলালকে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সাক্ষাৎ করিতে বলে।" কেবল তাহাই নহে। সে প্রচলিত হিন্দুসংস্কার কিছুই মানিয়া চলিত না, বরং তাহার বিরুদ্ধতা করিত। সে "নির্জলা একাদশী করিত না, পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে, সে মাছও খাইত। যখন পাড়ায় বিধবা-বিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি।" নৈতিক তত্ত্ব প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করাই বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এইরূপ চরিত্রকে ভিত্তি করিয়া তাহা করিলে হয়ত যুক্তিসঙ্গত বা রুচিসম্মত হইবে না, সেজন্য পরবর্তী সংস্করণে রোহিণী চরিত্র আশ্চর্য রকম বদলাইয়া গিয়াছে। "রোহিণী দুশ্চরিত্রা নয়; লোভী মোটেই নয়। গোবিন্দলালের চরিত্র বঙ্গদর্শন এবং প্রথম তিন সংস্করণের পুস্তকে প্রায় অনুরূপ

চতুর্থ সংস্করণের শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র যে সংস্কার সাধন করিয়াছেন তাহাতে গোবিন্দলালের চরিত্রও পূর্বাপর বদলাইয়া গিয়াছে। আগেকার গোবিন্দলাল আত্মহত্যা করিয়া মনের জ্বালা জুড়াইতে চাহিয়াছিল।" কিন্তু পরবর্তী কালে গোবিন্দলাল প্রায়শ্চিত্ত ও ভগবৎসাধনার দ্বারা শান্তিলাভ করে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্ব-ভাবনা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শিল্প-ধর্ম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। পূর্বে উৎপন্যাসের শেষে ছিল:

"গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ় জ্যোতির্ময়ী ভ্রমরের মূর্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন।

পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেখানে তাহাব মৃতদেহ পাওয়া গেল।"

গোবিন্দলালেব মৃত্যুতে সেখানে উপন্যাস শেষ হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত সংস্করণে গোবিন্দলাল ভ্রমর-রোহিণীর কথা চিন্তা করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। ভ্রমরের জ্যোতির্ময়া মূর্তি তাহাকে মরিতে নিষেধ করিয়াছে। ভ্রমর অপেক্ষাও যে প্রিয় কেহ আছে তাহার সন্ধান করিতে বলিয়াছে। সেজন্য ভ্রমরের মৃত্যুর দুই তিন মাস পর এক রাত্রে গোবিন্দলাল কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেল। কেহ আর তাহার সংবাদ পাইল না।

সাত বৎসর পর তাহার শ্রাদ্ধ হইল। কিন্তু দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর গোবিন্দলাল সন্ন্যাসীর বেশে একদিন হরিদ্রাগ্রামে দেখা দিল। ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃস্থাপন করিয়া সে যে শান্তিলাভ করিয়াছে তাহা ঘোষণা করিয়া আবার কোথায় চলিয়া গেল।

এখানে শিল্প অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য এবং নীতির জয়বার্তাই ঘোষিত হইয়াছে।

[খ] ।। কৃষ্ণকান্তের উইল: সৃষ্টিলগ্নের বঙ্কিম-মানস ।।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মূলে একটি পারিবারিক গোলযোগ রহিয়াছে। বঙ্কিম-মানসকে তাহা খুব প্রভাবিত করিয়াছে। "১৮৬৫ সালেই এই বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে,—যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উইল করিয়া কাঁটাল-পাড়ার ভদ্রাসন মধ্যম পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রকে বণ্টন করিয়া দেন।

শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হন। এই বাঁটোয়ারাকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রাতাদের মধ্যে অসদ্ভাবের আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল, এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রকাশের (১৮৭৫) এক বৎসরের মধ্যেই এই বিরোধ চরমে পৌছায়। ফলে, ১৮৭৬ সালের শেষের দিকে 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইয়া যায়, এবং বঙ্কিমচন্দ্র লেখাপড়া করিয়া সঞ্জীবচন্দ্রকে 'বঙ্গদর্শন' দান করেন এবং তাহারই দুই এক মাস পর তিনি কাঁটালপাড়া ত্যাগ করিয়া সপরিবারে চুঁচুড়ায় চলিয়া আসেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নীচের কথোপকথনেও তাহার আভাস পাওয়া যায়—

"এক বৎসরের পর হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) খুশী হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি ত চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন। ইহার ভিতরে কি কিছু কৃষ্ণকান্তী আছে?' তিনি বলিলেন, 'তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আমি বড় খুশী হইলাম, তোমার কাছে আমার বিশেষ কৈফিয়ৎ দিতে হইল না।"

(বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৬১)

পারিবারিক বিরোধের এই পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সত্য সুন্দরের আদর্শই গোবিন্দলাল-রোহিণীর গল্পের মধ্যে রূপায়িত করিয়াছেন। তিনি প্রকৃত জীবনের সমস্যা, পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ—জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, কর্ম—সর্ববৃত্তির সামঞ্জস্যমূলক একটি সত্যের সন্ধান করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে নিছক জ্ঞান বা ধ্যানের মধ্যে নয়, জীবনের সমগ্র বাস্তবতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সত্যের সন্ধানই তাঁহার ধর্মতত্ত্ব।" বিষবৃক্ষ উপন্যাস হইতে বঙ্কিমচন্দ্র সেই সত্যের সন্ধান করিয়াছেন। বিষবৃক্ষ-চন্দ্রশেখর-রজনী উপন্যাস-ত্রয়ীতে আছে তাহারই আবর্ত। কৃষ্ণকান্তের উইলে তাহার সার্থক পরিণতি। রূপজ মোহের পরিবর্তে দাম্পত্যজীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই এখানে কাম্য নয়। কুন্দ মরিয়াছে, সূর্যমুখী-নগেন্দ্রনাথের পুনর্মিলন হইয়াছে। প্রতাপের মৃত্যুতে শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের মিলনে কোন অন্তরায় রহিল না। কিন্তু রোহিণীর মৃত্যুতে ভ্রমরের সংসারে গোবিন্দলাল শান্তি পাইল না। তাহার চেয়েও বড় কিছুর সন্ধানে সে অজ্ঞাতবাসে গেল। যাহাকে পাইলে আর কোনও পাওয়ার অপেক্ষা থাকে না, গোবিন্দলাল তাহার সন্ধান করিল। উপন্যাস শেষে গোবিন্দলালের উক্তির মধ্যেই তাহা ঘোষিত হইল: "ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার

ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।” ‘Our best thoughts come from the heart.’ বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে সেই হৃদয়-শিখার আলোকেই মহৎ সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

[গ] ॥ বঙ্কিম উপন্যাসের ধারায় কৃষ্ণকান্তের উইল ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে কৃষ্ণকান্তের উইল-এর খ্যাতি ও আলোচনা সর্বাধিক। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন, “স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে বঙ্কিম বাবুর। নিজের মতে সর্বোৎকৃষ্ট ভ্রমর, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস।” (বঙ্কিম-প্রসঙ্গ) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “‘বিষবৃক্ষ’ ও ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ এই দুইখানিই প্রকৃত উপন্যাস-পদবাচ্য, উপন্যাসের অর্থগৌরব ও সমস্যা-বিশ্লেষণ ইহাদের মধ্যে বর্তমান।” কৃষ্ণকান্তের উইল-এর পূর্বেকার উপন্যাসগুলি—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী ও চন্দ্রশেখর রোমান্স-জাতীয়। ইতিহাসের আঁচল ধরিয়া বঙ্কিম-মানস রোমান্টিক ভাব সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়াছে। জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ সেখানে ব্যাহত। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যে বাস্তবতা তাহা সেখানে খণ্ডিত, অপূর্ণ এবং অপ্রধান। চন্দ্রশেখর উপন্যাস কিছুটা ব্যতিক্রম। অন্য তিনটি উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে এক রহস্যময় প্রকৃতি শক্তির উপলব্ধি সুতীক্ষ্ণভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ফলে চরিত্রগুলি বাস্তবচ্যুত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্রতাপ-শৈবলিনীর কাহিনী বিষবৃক্ষ-কৃষ্ণকান্তের উইল-এর সমধর্মী। কিন্তু ইতিহাস-চারণা, অলৌকিক শক্তির প্রভাব কাহিনীর স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ করিয়াছে, জীবন হইতে নীতি বড় হইয়াছে। তথাপি শৈবলিনী-চরিত্রের মধ্যে নারী-ব্যক্তিত্বের সোচ্চার প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম মনও পরিণতি লাভ করিয়াছে। উপন্যাসসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই পরিণত মনই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। তাই প্রথম পর্বের দুর্বলতাগুলি পরিত্যাগ করিতে তিনি যেমন সক্ষম হইয়াছেন তেমনি পরিণত শক্তির স্পর্শে দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাগুলিকে নবভাবে ও নবরূপে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু বিষবৃক্ষ উপন্যাসে। আর পরিণতি কৃষ্ণকান্তের উইল-এ। ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, রজনীও এই পর্যায়ের সৃষ্টি। যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী দুইখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস। অবশ্য “উপন্যাসের বিস্তৃতি ও প্রগাঢ়তা

ইহাদের নাই। বিশেষতঃ ইহাদের প্রধান আকর্ষণ ঘটনা-বৈচিত্র্যে—চরিত্র-চিত্রণে নহে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেমনে অনেক সময় অনেক অসাধারণ, অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবির্ভাব হয়, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অযাচিত অনুগ্রহ লাভ হয়, এই উপন্যাস দুইখানিও সেইরূপ আশাতীত শুভাদৃষ্টের বিস্ময়কর মিলের (coincidence) কাহিনী।"

বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস। "বঙ্কিম সামাজিক উপন্যাসেও রোমান্সের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই—তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলিও অনেকটা রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। 'রজনী'তে এই অতিপ্রাকৃত ও অসাধারণের স্পর্শ খুব সুস্পষ্ট। 'বিষবৃক্ষ'তেও একটা সাংকেতিক আভাস বর্তমান; 'ইন্দিরা' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই প্রভাব হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক মুক্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু এই দুইখানি উপন্যাসেও অনৈসর্গিকের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।" 'ইন্দিরা' ও 'রজনী' এই দুইখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নহে, ইহাদের মধ্যে চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত অপেক্ষা ঘটনা-বৈচিত্র্যেরই প্রাধান্য বেশী।

এই পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস-আশ্রিত অতীতের রোমান্স ত্যাগ করিয়া সমাজ-সচেতন মন লইয়া বর্তমান যুগ ও জীবন সমস্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। এই সচেতনতা তখনকার সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমি। কারণ ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, চিন্তা-চেতনার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালী-মন একদিকে মধ্যযুগীয় রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার, ধর্মবন্ধনকে অস্বীকার করিতে শুরু করিয়াছে, অন্যদিকে নব ভাবান্দোলনে, ইউরোপীয় জীবন-চর্চায় মোহমুগ্ধ হইয়া পড়িয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে। ছিন্ন বাঙালী সমাজের এই রূপ বঙ্কিম-মানসে আঘাত করায় তাহা সচেতন হইয়া উঠিল। সৌন্দর্য-রসিক, রোমান্স-পিপাসু কবি-মন সমাজসমস্যায় আকীর্ণ হইয়া উঠিল। শিল্পী বঙ্কিম সামাজিক উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-সচেতনতা এই পর্বে যতখানি তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে অন্য কোন পর্যায়ে ততখানি তীব্র রূপ ধারণ করে নাই।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বিষবৃক্ষের পাঁচ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। বিষয়-বিশ্লেষণে ও ঘটনা-বিন্যাসে ইহা বিষবৃক্ষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, আরও পরিপক; অনিন্দনীয় কলাকৌশলের নিদর্শন। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের যে গুরুতর অভাব রহিয়াছে; তাহা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

ধাপে ধাপে ঘটনার পর ঘটনার সংঘাতে কাহিনী বস্তুগতভাবে অগ্রসর হইয়াছে। কার্য-কারণ পরম্পরার কোন শৃঙ্খলই নাই। "সূর্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমর অধিকতর জ্বস্ত হইয়াছে, তাঁহার অনুচিত অভিমান ও সন্দেহপ্রবণতা ট্র্যাজেডিকে আসন্নতর করিয়াছে। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের অনুরাগ সঞ্চারের প্রথম অঙ্কুরটি সেরূপ বিশদভাবে প্রকট করিয়া দেখানো হয় নাই; সূর্যমুখীর প্রতি বিতৃষ্ণার কোন পর্যাপ্ত কারণ দেওয়া হয় নাই। সূর্যমুখীর নিজের কোন অপরাধ এই বিচ্ছেদ-সংঘটনে সহায়তা করে নাই। কিন্তু বর্তমান উপন্যাসে রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের ভাবের রূপান্তর, দয়া ও সমবেদনা হইতে প্রেমে পরিণতি যথেষ্ট পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।"..."তাছাড়া, ঘটনার বিবর্তনের প্রত্যক্ষ অংশীদার ছাড়াও পৃথক জগৎ রহিয়াছে, তাহাদের মনোজগৎ ছাড়া বহির্জাগতিক পরিবেশ রহিয়াছে, তাহার কথাও শিল্পী বিস্মৃত হন নাই। পাত্রপাত্রীর মানস সংগঠন-নিরপেক্ষ আন্দোলনও যে প্রত্যেকটি চরিত্রকে প্রতিনিয়ত বিক্ষুব্ধ করিতেছে, এবং কাহিনীও তাহাদের নিজ নিজ জীবনকে পরিণতির দিকে ক্রমশঃ ঠেলিয়া দিতেছে তাহাও চমৎকার-রূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।"

"পরিষৎ-সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি বর্ণনাবাহুল্যের অভাব এবং আড়ম্বরহীনতা। এমন অপরূপ লিপিচাতুর্য, এমন সংযত ভাবপ্রকাশ, বৈজ্ঞানিক ঘটনাবিন্যাস এবং সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবোধ বাংলা সাহিত্যের অন্য কোনও উপন্যাসে দৃষ্ট হয় না। মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের লিপিচাতুর্য 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ চরমে পৌঁছিয়াছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত জীবনধারার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

[ঘ] ॥ কৃষ্ণকান্তের উইল : কাহিনী-বিশ্লেষণ ॥

['বঙ্গদর্শনে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ষট্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়—পরে কেবল ক্ষুদ্র 'পরিশিষ্ট' ছিল। অবশ্য 'পরিশিষ্টের' কোন সার্থকতা ছিল না। কারণ তাহার পূর্বেই গোবিন্দলালের মৃত্যুতে উপন্যাস শেষ হইয়াছিল।

গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে গ্রন্থখানি দুইখণ্ডে বিভক্ত হয়:—প্রথম খণ্ড ঘটনাবহুল-একত্রিংশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত; দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ও পরিশিষ্ট। দ্বিতীয় খণ্ডে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ। কোন কোন পরিচ্ছেদে এক এক বৎসরের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। অবশ্য তাহাকে ঘটনা না বলিয়া মনোভাব

বলাই সঙ্গত। দ্বিতীয় খণ্ডের নয়টি পরিচ্ছেদ ঘটনাবহুল। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে পাদটীকা ছিল :

"অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—'রোহিণীকে মারিলেন কেন ?'...কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র। এ কথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।"]

কৃষ্ণকান্ত রায় হরিদ্রাগ্রামের বড় ধনী জমিদার। জমিদারীর বার্ষিক আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জিত। কিন্তু ষোল আনা সম্পত্তিই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকান্ত রায়ের নামে। রামকান্ত রায়ের একমাত্র পুত্র, নাম গোবিন্দলাল। কৃষ্ণকান্ত রায়ের দুই পুত্র, আর এক কন্যা—হরলাল, বিনোদলাল এবং শৈলবতী। নাবালক পুত্র রাখিয়া রামকান্ত রায়ের হঠাৎ মৃত্যু হইল।

কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক কিন্তু খাটি লোক ছিলেন। ইচ্ছা করিলে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ ভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তিনি গোবিন্দলালকে আপন সংসারে নিজ পুত্রদের সঙ্গে সমানভাবে প্রতিপালন করিয়া উইল করিবার সময় তাহাকে ন্যায্য আট আনা দান করিলেন। অবাধ্য হরলাল জানিতে পারিয়া কৃষ্ণকান্তের নিকট প্রতিবাদ করিল। ভয় দেখাইল, সমাজে অপ্রচলিত রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে ধর্ম-বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত বিধবা বিবাহ করিবে। ধর্মভীরু খাটি লোক কৃষ্ণকান্ত পুত্রকে ত্যাগ করিলেন কিন্তু ধর্মত্যাগ করিলেন না।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ কৃষ্ণকান্ত রায়ের প্রতিবেশী। নিরীহ ভালমানুষ। তাহাকে দিয়াই কৃষ্ণকান্ত উইল লিখাইতেন। হরলাল তাহাকে হাজার টাকা ঘুষ দিবার প্রলোভন দেখাইল। আগাম পাঁচশত টাকা দিয়া জাল উইল তৈরী করাইল কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্রহ্মানন্দ জাল উইল রাখিয়া আসল উইল আনিয়া দিতে পারিল না। ধর্ম নষ্ট করিল না। টাকা ফেরত দিল।

রোহিণী ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতৃকন্যা। বালবিধবা। অপরূপ সুন্দরী। রোহিণীর তখন পরিপূর্ণ যৌবন। হরলাল নিজ অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্য রোহিণীকে কাজে লাগাইতে চাহিল। একবার রোহিণী গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার সময় কয়েকজন বদমাস লোকের হাতে পড়িয়াছিল, হরলাল সেদিন তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। আজ সুযোগ বুঝিয়া হরলাল সেই ঋণ-পরিশোধ চাহিল। কিং

রোহিণী চুরি করিতে রাজী হইল না। এমনকি হাজার টাকা পুরস্কারের বিনিময়েও নয়। তখন হরলাল শেষ বাণ প্রয়োগ করিল। ইঙ্গিতে রোহিণীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব দিল। রোহিণী লোভে পড়িল।

কৃষ্ণকান্ত রাত্রিতে যখন আফিমের নেশায় বিভোর তখন রোহিণী সুকৌশলে কৃষ্ণকান্তের দেরাজে জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিল। কিন্তু হরলাল কথা রাখিল না। রোহিণীকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। হরলাল বলিতে লাগিল, "আমি যাই হই – কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।" ধূর্ত, দুষ্ট হরলাল স্বকার্য সাধন-প্রয়াসে রোহিণীর মনে যে বীজ বপন করিয়াছিল তাহাই উর্বর ক্ষেত্রে পতিত হইয়া বিষবৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বারুণী পুষ্করিণীতে রোহিণী কাঁদিতে বসিল। "বোধ হয় ভাবিতেছিল যে, কি অপরাধে এ বাল্যবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না। কোন দোষে আমাকে এ রূপ-যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ জীবনে সকল সুখে সুখী— মনে কর, ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী—কোন পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য? দূর হৌক, পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি?"

গোবিন্দলালের সম্বন্ধে কৃষ্ণকান্ত রায়ের দুর্বলতা ছিল। "গোবিন্দলাল আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র।" গোবিন্দলাল বহু অর্থব্যয় করিয়া উদ্যানবাটিকা সজ্জিত করিয়াছিল। কৃষ্ণকান্ত তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। বারুণী পুষ্করিণী এই উদ্যানবাটিকার মধ্যেই অবস্থিত। এই উদ্যান হইতেই গোবিন্দলাল রোহিণীকে কাঁদিতে দেখিয়াছিল। অনেকক্ষণ বসিয়া অবলা কাঁদিতেছে দেখিয়া তাহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। "তখন তাঁহার মনে হইল যে এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা, হউক, দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ— আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ। অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না?" গোবিন্দলাল রোহিণীর নিকট গিয়া সহানুভূতির সুরে কথা বলিল। তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। রোহিণী নিরুত্তর। গোবিন্দলাল আবার

বলিল, "তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক আমাকে জানাইও। নিজে না বলিতে পার, তবে আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের দ্বারায় জানাইও।" রোহিণীর তখন মনে হইল, উইল চুরি করা কাজটা উচিত হয় নাই। যে গোবিন্দলাল তাহার দুঃখের সময় উপকার করিতে অগ্রসর হইয়াছে, উইল চুরি করিয়া সেই গোবিন্দলালকে সম্পত্তি হইতে সে বঞ্চিত করিয়াছে। মনে মনে বলিল, "এমন লোকেরও সর্বনাশ করিতে আছে!" ঠিক করিল, আসল উইল ফিরাইয়া দিতে হইবে।

রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বাল্যকাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু "সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি। সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ এই সকল উপলক্ষে কিছুকাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল।"

"রোহিণী অতি যত্নে মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল। জীবনভার বহন করা রোহিণীর পক্ষে কষ্টদায়ক হইল। রোহিণী মনে মনে রাত্রিদিন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।" ঠিক করিল, জাল উইল চালানো হইবে না। কিন্তু জাল উইলের কথা প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। কারণ তাহাও তাহার খুল্লতাত ব্রহ্মানন্দের লেখা। "অতএব হরলালের লোভে রোহিণী গোবিন্দলালের যে গুরুতর অনিষ্ট সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তৎপ্রতিকারার্থ বিশেষ ব্যাকুল হইয়াও সে খুল্লতাতের রক্ষানুরোধে কিছুই করিতে পারিল না। শেষ সিদ্ধান্ত করিল, যে প্রকারে প্রকৃত উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উইল রাখিয়া তৎপরিবর্তে জাল উইল লইয়া আসিবে।"

এবার রোহিণী ধরা পড়িল। কিন্তু রোহিণী সত্য কথা প্রকাশ করিল না। কৃষ্ণকান্ত রায় প্রতাপশালী জমিদার। তাঁহার কাছে থানা ফৌজদারীর প্রয়োজন হয় না। তিনি বলেন, "আমিই থানা, আমিই মেজেষ্টর, আমিই জজ।" বস্তুত যাহাদের প্রতাপে বলা হইত 'বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়'—কৃষ্ণকান্ত সেই সম্প্রদায়ের লোক। তিনি সেই রাত্রে রোহিণীকে কয়েদ রাখিলেন। বলিলেন "তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য করিব। তোমাকে পুলিশে দিব না। কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বা'হর করিয়া দিব।"

পরদিন চাকরাণী সম্প্রদায়ের নিকট শুনিয়া ভ্রমর স্বামী গোবিন্দলালের নিকট

রোহিণীর চুরি করার সংবাদ দিল। গোবিন্দলাল বিশ্বাস করিল না। তাহাকে বাঁচাইতে কৃষ্ণকান্ত রয়ের সদর কাছারিতে উপস্থিত হইল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিষয়ী কৃষ্ণকান্ত কাছারিতে রোহিণীর উপস্থিতিতে গোবিন্দলালের ভাব দেখিয়া মনে ভাবিলেন; "হয়েছে! ছেলেটা বুঝি মাগীর চাঁদপানা মুখখানা দেখে ভুলে গেল।" গোবিন্দলাল জামিন হইয়া রোহিণীকে অন্দরমহলে লইয়া গেল।

রোহিণী গোবিন্দলালের কাছে উইল চুরির ইতিহাস বিবৃত করিল। জাল উইলে হরলালের ছিল বার আনা আর গোবিন্দলালের এক পাই। গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে? আমি ত কোন অনুরোধ করি নাই।"

রোহিণী কাঁদিতে লাগিল। বহু কষ্টে রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "না—অনুরোধ করেন নাই—কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই—যাহা ইহজন্মে আর কখনও পাইব না—আপনি আমাকে তাই দিয়াছিলেন।"

বারুণী-পুকুরের তীরে গোবিন্দলালের সহানুভূতি প্রদর্শনের পরিণাম যে এরূপ হইবে গোবিন্দলাল তাহা ভাবিতে পারে নাই। বুঝিল, "যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে।" গোবিন্দলাল রোহিণীকে দেশ ছাড়িয়া যাইতে বলিল। যেন "তোমায় আমায় আর দেখাশুনা না হয়।" রোহিণীর খুড়াকেও কলিকাতায় একটি চাকরি করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিল। রোহিণী রাজী হইল।

গোবিন্দলালের অনুরোধে কৃষ্ণকান্ত রায় রোহিণীকে ছাড়িয়া দিলেন। রোহিণী গৃহে ফিরিয়া গেল। কিন্তু কলিকাতায় যাইতে তাহার মন উঠিল না। কারণ কলিকাতায় গেলে গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইবে না। হরিদ্রাগ্রাম তাহার স্বর্গ, "এখানে গোবিন্দলালের মন্দির।"

রোহিণী গোবিন্দলালকে গিয়া তাহার সংকল্প জানাইল। গোবিন্দলাল সব বুঝিতে পারিল। স্ত্রী ভ্রমরের কাছে বলিল, "আমি রোহিণীকে ভালবাসি না। রোহিণী আমায় ভালবাসে।" ভ্রমর তাহার ঝি ক্ষীরোদার মারফত বারুণী পুকুরে সন্ধ্যাবেলা কলসী গলায় দিয়া রোহিণীকে ডুবিয়া মরিবার পরামর্শ দিল।

প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে গোবিন্দলাল দিনান্তে বারুণীর তীরবর্তী পুষ্পোদ্যান ভ্রমণে গেল। সন্ধ্যাকালে বসিয়া দর্পণানুরূপ বারুণীর জলশোভা দেখিতে লাগিল। অন্ধকার হইয়া আসিল। হঠাৎ গোবিন্দলাল দেখিতে পাইল জলোপরে একটি কলসী ভাসিতেছে। পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া দেখিল "হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে।" একজন মালীর সাহায্যে উদ্যানস্থ প্রমোদগৃহে

তাহাকে শুশ্রূষার জন্য লইয়া গেল। প্রাথমিক চিকিৎসার দ্বারা রোহিণীকে বাঁচাইয়া তুলিল। রোহিণী মরিতে পারিল না। গৃহে ফিরিল।

রোহিণীর জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা ও তাহার মৃত্যুকামনা গোবিন্দলালকে ভাবাইয়া তুলিল। ভ্রমরকে তাহার দেরীতে ফিরিবার কারণ বলিতে পারিল না। বিষয়ানুরাগে মন দিবার চেষ্টা করিল। স্থানান্তরে গিয়া রোহিণীকে ভুলিবার চেষ্টা করিল। কৃষ্ণকান্ত শুনিয়া সুখী হইলেন। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে রাখিয়া জমিদারী পরিদর্শনে গেল।

ভ্রমর আহারাদি বন্ধ করিল। সাধ-আহ্লাদ ত্যাগ করিল ; এদিকে তাহার ঝি ক্ষীরোদা রোহিণী-গোবিন্দলালের নামে মিথ্যা রটনা আরম্ভ করিল। ভ্রমর প্রথমে অবিশ্বাস করিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রটনা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল। পাড়ার মেয়েরা একে একে তাহাকে জানাইয়া গেল, তাহার স্বামী রোহিণীর প্রণয়াসক্ত। বালিকা ভ্রমরের বিচার-শক্তি ছিল না। সে এই ঘটনা ক্রমে বিশ্বাস করিতে লাগিল।

এদিকে "ভ্রমরেরও যে জ্বালা, রোহিণীরও সেই জ্বালা।" রোহিণীর কানেও রটনার সংবাদ পৌঁছিল। গ্রামে রাষ্ট্র হইল গোবিন্দলাল তাহাকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। রোহিণী ভাবিল ভ্রমরই এসব রটাইয়াছে, নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার? ঠিক করিল সে আর এদেশে থাকিবে না কিন্তু "যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইবে।" সে কোন প্রতিবাসিনীর নিকট একখানি বানারসী শাড়ী ও এক সুট গিলটির গহনা চাহিয়া আনিল। সন্ধ্যা হইলে সেগুলি পুটলি বাঁধিয়া ভ্রমরের নিকট লইয়া গেল। বলিল 'মেজবাবুর অনুগ্রহে, আমরা আর খাইবার পরিবার দুঃখ নাই। তবে লোকে যতটা বলে, ততটা নহে" এই বলিয়া গোবিন্দলালের প্রদত্ত বলিয়া শাড়ী এবং গহনাগুলি দেখাইল। "ভ্রমর লাথি মারিয়া অলঙ্কারগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া দিল।"

ভ্রমর গোবিন্দলালকে অভিযোগ করিয়া চিঠি লিখিল, "তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করে পারি, পিত্রালয়ে যাইব।" গোবিন্দলাল ব্রহ্মানন্দের কাছ হইতেও চিঠি পাইল। তাহাতে সে লিখিয়াছে ভ্রমর রটাইয়াছে, গোবিন্দলাল রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। গোবিন্দলাল বিস্মিত হইল এবং পরদিনই বিষণ্নমনে গৃহে যাত্রা করিল।

গোবিন্দলাল আসিয়া দেখিল ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। তাহার মনে বড় অভিমান হইল। ঠিক করিল সে আর ভ্রমরের মুখ দেখিবে না। সেজন্য ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে নিষেধ করিল।

গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। শেষে ঠিক করিল রোহিণীর চিন্তাই তাহাকে ভুলিবার প্রকৃষ্ট উপায়। সেদিন বারুণী-তটে রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের দেখা হইল। অনেক কথা হইল। রোহিণী বুঝিল, গোবিন্দলাল তাহার রূপে মুগ্ধ।

ক্রমে কৃষ্ণকান্তের কানে রোহিণী ও গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্ত দুঃখিত হইলেন। গোবিন্দলালকে অনুযোগ করিবার তাঁহার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাহাকে একা পাওয়া যায় না। সম্প্রতি তিনি পীড়িত। সর্বদা সেবকগণ পরিবেষ্টিত থাকিতেন। একদিন কৃষ্ণকান্তের অসুখের বাড়াবাড়ি দেখিয়া গোবিন্দলাল বৈদ্য লইয়া অনেক রাত্রে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণকান্ত ঔষধ খাইলেন না। হরিনাম করিতে বলিলেন। তিনি যেন বলিতে চাহিলেন—

> "I hope to see my Pilot face to face
> When I have crost the bar."

তখনও তিনি গোবিন্দলালের হিতচিন্তা করিতেছিলেন। তাহার হিতের জন্যই তিনি উইল পরিবর্তিত করিলেন। বলিলেন, "কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া দিয়া, তাহার স্থানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ভ্রমরের নাম লেখ। ভ্রমরের অবর্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্ধাংশ পাইবে।" সেই রাত্রেই কৃষ্ণকান্ত পরলোকগমন করিলেন।

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ভ্রমর আসিল। গোবিন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন উভয়েই শোকে মুহ্যমান। তারপরেও বেশী কথা হইল না। পূর্বের সেই মধুর সম্পর্ক আর নাই।

ঘটা করিয়া কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ হইল। পূর্বে ধনীদিগের পরিবার শ্রাদ্ধই সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল হইত। শ্রাদ্ধের গোলমাল থামিলে উইল পড়া হইল। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে উইলের কথা বলিল। গোবিন্দলাল ঠিক করিল পত্নীর দান গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিবে না বরং দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া

চাকরীর চেষ্টা করিবে। গোবিন্দলাল আরও স্থির করিল, সে ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিবে।

গোবিন্দলালের মাতা পুত্রবধূর বিষয় প্রাপ্তিতে বিরক্ত হইলেন। তিনি কাশী-বাসিনী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গোবিন্দলাল তাঁহাকে লইয়া কাশী রওনা হইল। ভ্রমরকে বলিয়া গেল তাহার আর ফিরিবার ইচ্ছা নাই। ভ্রমরের অনেক অনুরোধেও তাহার সংকল্প টলিল না। ভ্রমর অবশেষে বলিল, "যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে।" গোবিন্দলাল চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

হরিদ্রাগ্রামে গোবিন্দলালদের পৌঁছান-সংবাদ আসিল। ভ্রমরের কাছে কোন পত্র আসিল না। অভিমানে ভ্রমরও পত্র লিখিল না। মাস দুই পরে খবর আসিল গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাটী যাত্রা করিয়াছে। কিন্তু বাটী আসিল না। কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। এদিকে রোহিণী শূলরোগে অনেকদিন পীড়িত ছিল। অবশেষে তারকেশ্বরে হত্যা দিতে গিয়াছে। সেও আর ফিরিয়া আসে নাই। ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ পীড়িতা কন্যাকে দেখিতে আসিলেন। কন্যার কাতর অনুরোধে তিনি গোবিন্দলালের ঠিকানা সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন। ডাকঘরে ঘুষ দিয়া রোহিণীর ঠিকানা সংগ্রহ করিলেন, পরে পুলিশের ভয় দেখাইয়া ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে সকল সংবাদ অবগত হইলেন। গোবিন্দলাল এবং রোহিণী তখন যশোহর জেলায় প্রসাদপুরে থাকে। মাধবীনাথ পরে বন্ধু নিশাকরকে লইয়া প্রসাদপুর রওনা হইলেন।

গোবিন্দলাল এক নির্জন স্থানে নীলকুঠি ক্রয় করিয়া সেখানে বাস করিতেছিল। সে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিত না। নিশাকর দাস কৌশলে চাকরকে ঘুষ দিয়া গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। গোবিন্দলাল তাহাকে বেশী পাত্তা দিল না। কিন্তু রোহিণী হরিদ্রাগ্রাম হইতে লোক আসিয়াছে শুনিয়া সেখানকার খবর নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হইল। নিশাকর রাত্রে চিত্রার বাঁধাঘাটে তাহাকে দেখা করিতে বলিল এবং অন্যদিকে চাকরকে দিয়া গোপনে গোবিন্দ-লালকে এ খবর জানাইয়া দিল।

রাত্রে রোহিণী যখন নিশাকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল তখন গোবিন্দলাল পিছন হইতে আসিয়া রোহিণীকে ধরিল। উভয়ে গৃহে ফিরিল। গোবিন্দলাল পিস্তলের গুলিতে রোহিণীকে মারিল এবং নিজে নিরুদ্দেশ হইল। দ্বিতীয় বৎসর কাটিয়া গেল।

তৃতীয়-চতুর্থ বৎসরও কাটিয়া গেল। গোবিন্দলাল আসিল না। এদিকে ভ্রমরের পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পঞ্চম বৎসরে সংবাদ আসিল গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে ধরা পড়িয়াছে। মাধবীনাথ আবার ভ্রমরের অনুরোধে গোবিন্দলালকে বাঁচাইতে চলিলেন। ঘুষ দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য নিরস্ত করিলেন। গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস পাইল, কিন্তু কোথায় গেল কেহ বলিতে পারিল না।

গোবিন্দলাল প্রসাদপুরের নীলকুঠি বিক্রয় করিয়া অ ত অল্প টাকাই পাইল। তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিল। এক বৎসরেই সেই টাকা ফুরাইয়া গেল। ছয় বৎসরের পর গোবিন্দলাল অগত্যা ভ্রমরের নিকট আশ্রয় চাহিয়া পত্র দিল। ভ্রমর উত্তর দিল, সে দানপত্র করিয়া সমস্ত বিষয় গোবিন্দলালকে দিয়াছে। অতএব নির্বিঘ্নে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া সে বসবাস করিতে পারে। কিন্তু ভ্রমর তাহা হইলে আর হরিদ্রাগ্রামে বাস করিবে না। গঙ্গাতীরে একটি বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া বাস করিবে। আরও লিখিল, "আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট—আপনিও যে সন্তুষ্ট তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।" গোবিন্দলাল উত্তরে কিছু মাসিক ভিক্ষা চাহিল। ভ্রমর মাসিক পাঁচশত টাকা পাঠাইবার ঠিক করিল। গোবিন্দলাল কলিকাতাতেই রহিল।

সপ্তম বৎসরে ভ্রমরের দিন ফুরাইয়া আসিল। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার রাত্রে সে মরিবার সংকল্প করিল। ঔষধ খাওয়া বন্ধ করিল। অবশেষে সেই ভয়ঙ্কর শেষদিন উপস্থিত হইল। মাধবীনাথ গোবিন্দলালকে ভ্রমরের পীড়ার সংবাদ দিয়াছেন। গোবিন্দলাল আজ আসিয়াছে। ভ্রমর তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। গোবিন্দলাল কোন কথা কহিতে পারিল না,ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

পরদিন গোবিন্দলাল কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া বারুণী পুষ্করিণী-তটে গেল। সেই শ্রী নাই, শোভা নাই। ভ্রমর নাই, রোহিণী নাই। বসিয়া বসিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল। রাত্রি অন্ধকার হইল। হঠাৎ মূর্ছিত হইয়া সোপানশিলার উপরে পতিত হইল। দুই তিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইল। তারপর এক রাত্রি কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোবিন্দলাল কোথায় চলিয়া গেল। কেহ আর তাহার সংবাদ পাইল না।

সাত বৎসর পর তাহার শ্রাদ্ধ হইল।

গোবিন্দলালের সম্পত্তি তাহার ভাগিনের শচীকান্ত পাইল। বার বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর গোবিন্দলাল একদিন সন্ন্যাসীর বেশে আসিয়া হাজির হইল। শচীকান্ত তাহাকে হরিদ্রাগ্রামে বসবাস করিতে অনুরোধ করিলে গোবিন্দলাল বলিল, বিষয়-সম্পত্তি অপেক্ষাও যাহা ধন, ভ্রমর অপেক্ষাও যাহা মধুর সে তাহা পাইয়াছে। শান্তি পাইয়াছে। "ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেল। আর কেহ তাহাকে হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পায় নাই।

[৬] ॥ কৃষ্ণকান্তের উইল-এ কতকগুলি অসঙ্গতি ॥

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ কয়েকটি অসঙ্গতির উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা প্রথমে রোহিণীকে দেখিতে পাই। "সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।" কিন্তু ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তাহার "হাতে বালা" সপ্তম পরিচ্ছেদেও তাহাই।

(২) চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখা যায়,—কৃষ্ণকান্ত দেরাজে উইল রাখিয়াছিলেন; সেই দেরাজ হইতেই রোহিণী তাহা চুরি করিয়াছিল এবং তাহাতেই আবার আসল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর গোবিন্দ-লাল তাঁহার নির্দেশে দেরাজ খুলিয়া উইল বাহির করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু নবম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, রোহিণী মনে করিয়াছিল, "কৃষ্ণকান্তের মনে একবার সন্দেহ মাত্র জন্মলে তিনি সিন্দুক খুলিয়া উইল পড়িয়া দেখিবেন!" সিন্দুকে উইল কখনও রক্ষিত হয় নাই।

(৩) রোহিণী যে জাল উইল অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়াছিল তাহা কোথায় ছিল?

(৪) প্রথম পরিচ্ছেদে: "কৃষ্ণকান্ত রায়ের দুই পুত্র, আর এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরলাল, কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল, কন্যার নাম শৈলবতী। কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে, তাঁহার পরলোকান্তে গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা, আর শৈলবতী এক আনা সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবেন।" আর কৃষ্ণকান্তের ভ্রাতা "রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল—তাহার নাম গোবিন্দলাল।"

গোবিন্দলালের যে কোন ভগিনী ছিলেন এমন কোন উল্লেখ কোথাও নাই। উল্লেখের কোন প্রয়োজনও হয়ত প্রথমে ছিল না। কিন্তু কয়েক স্থানে তাঁহার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিবার বিষয়; যথা, যখন গোবিন্দলালের নাম রোহিণীর নামের সহিত রটনায় গুঞ্জরিত হইয়াছিল, যখন গোবিন্দলাল জমিদারী হইতে ফিরিয়া আসিল, অথচ ভ্রমরকে তাহার পিত্রালয় হইতে আনা হইল না। তাঁহার অনুপস্থিতি সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয়—জ্যেষ্ঠতাত কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ-কালে। বাড়ীর কন্যার সে সময়ে অনুপস্থিতি স্বাভাবিক বলা যায় না। গোবিন্দলালের মাতা যখন কাশীবাসে গমন করিবেন স্থির করিলেন, তখন ভ্রমর তাড়াতাড়ি পিত্রালয় হইতে আসিয়া "শাশুড়ীর চরণ ধরিয়া অনেক বিনয় করিল। শাশুড়ীর পদ-প্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, "মা, আমি বালিকা—আমায় একা রাখিয়া যাইও না। আমি সংসার ধর্মের কি বুঝি? মা, সংসার সমুদ্র, আমাকে এ সমুদ্রে একা ভাসাইয়া যাইও না।" শাশুড়ী বলিলেন, "তোমার বড় ননদ রহিল। সেই তোমাকে আমার মত যত্ন করিবে—আর তুমিও গৃহিণী হইয়াছ।" এই ননদ যে কৃষ্ণকান্তের একমাত্র কন্যা শৈলবতী, তাহাই মনে হয়। শৈলবতীকে কৃষ্ণকান্ত যখন এক আনা সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়া গিয়াছেন, তখন হয়ত তিনি পিত্রালয়েই থাকিতেন। কিন্তু গোবিন্দলালের সম্পত্তি তাহার ভাগিনেয় শচীকান্ত পাইয়াছিল—তাহাতে মনে হয়, রামকান্তেরও কন্যা ছিল। কাশীবাসে যাইবার সময় গোবিন্দলালের মাতা যে "বড় ননদের" কথা বলিয়াছিলেন, গ্রন্থমধ্যে তাঁহার কার্যের কোন পরিচয় আমরা পাই না।

আরও একজনের কার্যের অনুল্লেখ উল্লেখযোগ্য। তিনি কৃষ্ণকান্তের পত্নী। কৃষ্ণকান্ত বড় জমিদার ছিলেন—সহোদর রামকান্ত জ্যেষ্ঠভ্রাতার নামেই জমিদারী ক্রয়ে আপত্তি করেন নাই—এমনকি পুত্র গোবিন্দলালের জন্মাবধি সম্পত্তির অংশ সম্বন্ধে বিভাগ-বাসনা মনে মনে পোষণ করিয়াও মুখে সে কথা বলিতে পারেন নাই। কৃষ্ণকান্তের সংসারে বহু লোক—তাহার পরিচয় দাসীর সংখ্যাধিক্যেই সুপ্রকাশ। সে সময় একান্নবর্তী পরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকান্তের পত্নীর—"বড় গৃহিণীর" স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্থান থাকিবার কথা। আর এক কারণে সে স্থানের গুরুত্ব বর্ধিত হইয়াছিল, মনে করা যায়। * "গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা গৃহিণী নহেন"—এ কথা লেখক সুস্পষ্ট রূপেই দেখাইয়াছেন। সেইজন্য সংসারে কৃষ্ণকান্তের পত্নীর প্রভাব ও প্রতাপ আরও অধিক হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু তাহার কোন পরিচয় আমরা পাই না। এমন কি গোবিন্দলালের মাতা কাশীযাত্রা-কালে "বড় ননদের" উল্লেখ করিলেও তাঁহার যাত্রার সময়—"দিদির" কোন উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বর্তমানে ভ্রমরের পক্ষে একান্নবর্তী পরিবারে গৃহিণীর কাজ করিতে পারা সে সময়ে সম্ভব ছিল না।

[চ] ॥ উপন্যাসপাঠ : সংক্ষিপ্ত টীকা ॥

বঙ্কিমচন্দ্র একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সেজন্য কাহিনীর সহিত সুস্পষ্ট সম্বন্ধ আছে এমন ঘটনা এবং চরিত্রকেই তিনি অবলম্বন করিয়াছেন। এই কাহিনীর প্লট সুবিন্যস্ত। ঘটনার চক্রজালে মানব জীবনে যে অভাবিত রূপান্তর সাধিত হয় তাহারই এক অনবদ্য কাহিনী এই কৃষ্ণকান্তের উইল। রোহিণী বাল্যকাল হইতে গোবিন্দলালকে চেনে। কিন্তু কখনো তাহার প্রতি অনুরাগ উপলব্ধি করে নাই। হরলাল বাল-বিধবা রোহিণীর অতৃপ্ত কামনার যে বহ্নিমুখ খুলিয়া দিল তাহাতেই ভ্রমর-গোবিন্দলালের জীবন ছারখার হইয়া গেল।

উপন্যাসটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে কৃষ্ণকান্ত রায়ের উইলকে কেন্দ্র করিয়া স্বাভাবিক ভাবেই রোহিণী-গোবিন্দলালের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা এবং তারপর অস্বাভাবিকভাবে চোখের জল মুছিতে মুছিতে গোবিন্দলালের ভ্রমর-ত্যাগ পর্যন্ত বর্ণনা আছে। একটা মিথ্যা রটনার দ্বারা ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে একটি সুখের সংসারের স্বপ্ন চুরমার হইয়া গেল। কাহিনীর প্রারম্ভেই ঈশান কোণে রোহিণী-রূপ যে একখণ্ড কালো মেঘ দেখা দিয়াছিল তাহাই ক্রমে ক্রমে পরিব্যাপ্ত হইয়া ভ্রমর রূপ প্রচণ্ড-তেজ সূর্যকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিল। ঝড়ের সূচনা ঘোষিত হইল।

দ্বিতীয় খণ্ডে ঝড়। এই ঝড়ের ঝাপটায় গোবিন্দলাল ও ভ্রমর দুইজন দুইদিকে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। গোবিন্দলালের সঙ্গে তখন রোহিণী। মাঝপথে রোহিণীও শেষ হইল। গোবিন্দলাল তখনও আসিল না। ঝড় শেষে ভ্রমর মরিল আর তাহার পার্শ্বে ঝটিকা-বিধ্বস্ত গোবিন্দলাল। এইখানেই উপন্যাসের প্রকৃত শেষ।

শেষের পরেও শেষ আছে। রোহিণী ও ভ্রমর মরিল। যন্ত্রণা-কাতর উন্মাদ গোবিন্দলাল তখনও অবশিষ্ট রহিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার জন্য পরিশিষ্ট

সংযোজন করিয়া দ্বাদশ বর্ষ অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করিলেন এবং অজ্ঞাতবাসের শেষে ভগবৎপাদপদ্মে মন সমর্পণ করিয়া গোবিন্দলালের শান্তিলাভের ব্যবস্থা করিলেন। একটি বাস্তবঘন সমস্যা, জটিল সামাজিক প্রতিবেশ লইয়া যাহার আবর্ত হইয়াছিল, আধ্যাত্মিকতার অলৌকিক চিন্তায় তাহা শান্ত হইল।

॥ প্রথম খণ্ড ॥

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ হরিদ্রাগ্রামে কৃষ্ণকান্ত রায় বিরাট ধনী জমিদার। তিনি প্রতাপশালী, একরোখা। নিজে যাহা ভাল বুঝতেন তাহাই করিতেন, কাহারও কথায় ক্ষোভে বা প্রতিবাদে তাহা হইতে নড়িতেন না। তিনি বিবেচনা-মত তাঁহার সম্পত্তির উইল করিলেন। কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে, তাঁহার পরলোকান্তে গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা, আর শৈলবতী এক আনা সম্পত্তিতে অধিকারী হইবেন। তাহা লইয়া পিতা-পুত্রে বিবাদ দেখা দিল। জ্যেষ্ঠপুত্র হরলাল "বড় দুর্দান্ত, পিতার অবাধ্য এবং দুর্মুখ"। হরলাল এই উইলের তীব্র প্রতিবাদ করিল। বলিল, "আমি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের গোঁফ পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে এই উইলও সেইরূপ পুড়াইব।"

কৃষ্ণকান্ত রায় তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে উইল ছিঁড়িয়া নূতন উইল লিখিলেন। তাহাতে গোবিন্দলাল আট আনা, বিনোদলাল পাঁচ আনা, কর্ত্রী এক আনা, শৈলবতী এক আনা, আর হরলাল এক আনা মাত্র পাইল।

হরলাল কলিকাতা হইতে পিতাকে চরম পত্র লিখিল। হয় তিনি তাহাকে আট আনা লিখিয়া দিবেন নচেৎ সে বিধবা-বিবাহ করিবে।

কৃষ্ণকান্ত রায় জেদী পুরুষ। তিনি পুত্র ত্যাগ করিলেন তথাপি ধর্ম ত্যাগ করিলেন না। আবার উইল ছিঁড়িয়া নূতন উইল লিখিতে আদেশ দিলেন। তাহাতে হরলালের ভাগে শূন্য পড়িল; তবে হরলালের এক শিশুপুত্র ছিল, সে এক পাই পাইল। কনিষ্ঠ পুত্র বিনোদলাল পিতাকে অনেক অনুরোধ করিয়াও সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না। কৃষ্ণকান্ত রায় বলিলেন, "আমার আয় দুই লক্ষ টাকা। তাহার এক পাই বখরায় তিন হাজার টাকার উপর হয়। তাহাতে একজন গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে চলিতে পারে।"

বার বার এই উইল পরিবর্তনের ফলেই কাহিনী জটিল হইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণকান্ত রায়ের পরিবারে যে বিষাদঘন পরিণতি দেখা দিয়াছে তাহার মূলেও এই উইল। সেইজন্যই ভ্রমর-গোবিন্দলাল-রোহিণীর কাহিনীর নামকরণও হইয়াছে কৃষ্ণকান্তের উইল।

কৃষ্ণকান্ত রায় অবাধ্য পুত্রকে শায়েস্তা করবার জন্য সম্পত্তির অংশ হইতে বঞ্চিত করিলেন। পরবর্তী কালে তাঁহার আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রকেও সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে বিষয় না দিয়া তাহার পত্নী ভ্রমরকে দিয়া গেলেন। ইহাই সাধারণত বাংলাদেশের রীতি। কিন্তু তাহাতে পৌরুষ আহত হয়। ইষ্টের পরিবর্তে অনিষ্ট সাধিত হয় বেশী। হরলাল সুপথে আসিল না। গোবিন্দলাল ধ্বংসের পথে পা বাড়াইল।

বাঙ্গালীর উইল প্রায় গোপন থাকে না—বাঙালীর চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত। সাধারণত উইলের লেখক এবং সাক্ষীদিগের দ্বারাই উইলের গোপনীয়তা ফাঁস হইয়া যায় এবং পরিণামে কলহ ও বিরোধের সৃষ্টি হয়।

হরলাল সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি বিধবা-বিবাহ করিয়াছেন। কৃষ্ণকান্ত রায় আবার উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—হিন্দু বালবিধবাদের অশেষ দুঃখ দেখিয়া দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিদেশী শাসকদিগের আইনের দ্বারা বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করাইলেন এবং নিজ পুত্রের সঙ্গে বিধবার বিবাহ দিলেন। কিন্তু ইহাতে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা এই ব্যাপারকে কখনও ভাল চোখে দেখিতে পারে নাই। প্রচলিত সংস্কারের উর্ধ্বে উঠা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কৃষ্ণকান্ত রায়ও বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ছিলেন না। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও ছিলেন তাহার কড়া সমালোচক।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ পিতার নিকট ব্যর্থ হইয়া হরলাল কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। হরলাল খবর পাইল আবার উইল সংশোধন হইবে। এবার তাহার ভাগে শূন্য। হরলাল এবার বাঁকা উপায় ধরিল। কলিকাতা হইতে আসিয়া সে বাড়ী উঠিল না। অবশ্য উঠিবার মুখও ছিল না। দিন দুই আত্মগোপন করিয়া কৃষ্ণকান্তের উইল লেখক প্রতিবেশী ব্রহ্মানন্দের নিকট হাজির হইল। উদ্দেশ্য জাল উইল তৈয়ারী করাইবে। গরীব ব্রহ্মানন্দ রাজী হইল না। তখন হরলাল তাহাকে হাজার টাকা ঘুষ দিবার প্রস্তাব করিল এবং পাঁচশত টাকা আগাম দিল। হরলাল ওস্তাদ

লোক। জাল উইল লিখিবার কায়দা কানুন ব্রহ্মানন্দকে শিখাইয়া দিল। জাল উইলে নিজে পিতার এবং চারিজন সাক্ষীর দস্তখত করিয়া দিল। জাল উইলে লেখা হইল বিনোদলাল তিন আনা, গোবিন্দলাল এক পাই, গৃহিণী এক পাই, শৈলবতী এক পাই, হরলালের পুত্র এক পাই, হরলাল জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া অবশিষ্ট বারো আনা। তার পর জাল উইল বদল করিয়া কি করিয়া আসল উইল লইয়া আসিবে তাহাও ব্রহ্মানন্দকে শিখাইয়া দিল।

বিধবা বিয়ে করে নাকি—এখানেও বিধবা-বিবাহের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে বিধবা-বিবাহ অচল তবে যদি কেহ লোভে পড়িয়া করে। হরলালও বোধ হয় টাকার লোভে বিধবা-বিবাহ করিয়াছে। ব্রহ্মানন্দের প্রশ্নের ইহাই তাৎপর্য।

দশ টাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও—ইহার দুই অর্থ হইতে পারে। এক, মতি গোয়ালিনী ব্রহ্মানন্দকে দুধ যোগান দেয়। সেজন্য তাহাকে দশ টাকা দিতে বলিল। দুই, মতি গোয়ালিনী হয়তো ব্রহ্মানন্দের কোন প্রণয়িনী। হরলালের যে চরিত্র, তাহার পক্ষে এই কুৎসিত ইঙ্গিত করাই স্বাভাবিক।

হস্তকৌশল বিদ্যা—হাত সাফাই। চুরি বিদ্যা।

হায়! কলাহার! কত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুমি মর্মান্তিক পীড়া দিয়াছ!—একদিকে লোভ, অন্যদিকে ভয়। একদিকে নিদারুণ জ্বর, প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, অন্যদিকে কদলীপত্রে সুশোভিত লুচি, সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ। দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা সত্যই মর্মান্তিক পীড়া। ব্রহ্মানন্দের নিকটে একদিকে জাল উইল ধরা পড়িলে জেলের ভয়, অন্যদিকে হরলাল প্রদত্ত প্রচুর অর্থ। ইহা পীড়াদায়ক সন্দেহ নাই। লোভ বড় কিন্তু বদহজমের ভয়ও বড়। দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে সেই লোভ সংবরণ করা শক্ত।

॥ **তৃতীয় পরিচ্ছেদ** ॥ শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মানন্দ ব্যর্থ হইল। জাল উইল বদল করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। সেইজন্য হরলালের টাকা ও উইল সে ফিরাইয়া দিল।

হরলাল তারপর ব্রহ্মানন্দের পাকশালায় গিয়া ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতৃকন্যাকে ধরিল। তাহার নাম রোহিণী। তাহার যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে বালবিধবা। তবে সে "কালো পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।" আবার রান্নায়, হাতের কাজে, চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে তাহার তুলনা

নাই। ব্রহ্মানন্দের দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় হরলাল রোহিণীর শরণাপন্ন হইল।

একবার রোহিণী গঙ্গায় স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় জনকয়েক বদমাইসের হাতে পড়িয়াছিল। হরলাল সেদিন তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। আজ সেই ঋণ পরিশোধ করিতে বলিল। রোহিণী হরলালের উপকার করতে রাজী কিন্তু চুরি করিতে রাজী হইল না। তখন হরলাল শেষ অস্ত্র ছাড়িল। বালবিধবা রোহিণীর দুর্বল স্থানে আঘাত করিল। বিধবা যুবতীর সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও লালসাকে জাগ্রত করিয়া তুলিল। তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিল। বলিল, "দেখ, তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাম সুবাদ মাত্র—সম্পর্কে বাধে না।"

রোহিণী লজ্জিতা হইল। কিন্তু লোভ সংবরণ করতে পারিল না। উইল চুরি করিতে সে রাজী হইল তবে টাকার বিনিময়ে নয়, হরলালের প্রস্তাব অনুমোদনে।

কথার বাষ্প—কথার আভাস মাত্র। ব্রহ্মানন্দ হরলালের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিল না, কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের বিন্দুমাত্রও যেন সে প্রকাশ না করে সেজন্য হরলাল তাহাকে শাসাইয়া গেল।

এই রোহিণীতে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে—রোহিণী এই উপন্যাসের প্রতি-নায়িকা। হরলাল রোহিণীর দুর্বলতম স্থানে আঘাত করিয়া সুপ্ত কামনার উদ্রেক করিয়াছিল। গোবিন্দলাল সেই কামনার বলি হইল। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী চরিত্র প্রথম উপস্থাপিত করিবার সময় এই কথা বলিয়াছেন।

হাতে চুড়ি পরিত—কিন্তু ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তাহার "হাতে বালা", সপ্তম পরিচ্ছেদেও তাই।

রন্ধনে সে দ্রৌপদী বিশেষ—রন্ধনে রোহিণী বিশেষ পারদর্শী। দ্রৌপদীর সম্বন্ধে পুরাণে আছে, পাণ্ডবদের দ্বাদশ বৎসর বনবাসে যাইবার আগে সূর্যদেব দ্রৌপদীকে এক তাম্রস্থালী দান করিয়া বলেন, প্রতিদিন এই পাত্রে যে কোন খাদ্য রন্ধন করিয়া দ্রৌপদী যতক্ষণ অভুক্ত থাকিবেন, ততক্ষণ এই পাত্র পূর্ণ থাকিবে; তাই তাঁহার ভোজনের পূর্বে যত লোকই আসুক না কেন, কেহই অভুক্ত থাকিত না। পাণ্ডবদের কাম্যকবনে বাসকালে দুর্যোধনের পরিচর্যায় তুষ্ট হইয়া দুর্বাসা দুর্যোধনকে বর দিতে চাহিলে দুর্যোধন এই বর চান যে, দুর্বাসা যেন দ্রৌপদীর আহারের পর দশ হাজার শিষ্য লইয়া পাণ্ডবদের

আতিথ্য গ্রহণ করেন। তারপর দুর্বাসা কাম্যকবনে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তখন দ্রৌপদীর আহার শেষ হইয়াছে। সেজন্য আহার যোগাইতে না পারিলে সকলেই দুর্বাসার শাপে ভস্মীভূত হইবেন—এই ভাবিয়া পাণ্ডবেরা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তখন দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনায় কৃষ্ণ উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীকে তাঁহার তাম্রস্থালী আনিতে বলেন। সেই স্থালীর কানায় একটু শাকান্ন ছিল। কৃষ্ণ তাহাই খাইয়া বলিলেন, বিশ্ব যেন ইহাতেই তৃপ্ত হয়েন। তখন স্নানরত দশহাজার শিষ্যসহ দুর্বাসার আকণ্ঠ উদরপূর্তি হইয়া গেল এবং লজ্জিত হইয়া সশিষ্য দুর্বাসা পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়াই পলায়ন করিলেন।

রোহিণী শিহরিল—হরলালকে হঠাৎ দেখিয়া রোহিণী অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। তার উপর হরলাল যখন বলিল, "তোমার সঙ্গে একটি কথা আছে" তখন রোহিণী আরও ভয় পাইল। কারণ, হরলালের চরিত্র কাহারও অবিদিত ছিল না। সে পারে না এমন কোন দুষ্কর্ম নাই।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ রাত্রে কৃষ্ণকান্ত যখন আফিমের নেশায় বিভোর ছিলেন তখন রোহিণী উইল চুরি করিতে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। কৌশলে জানিয়া লইল উইল কোথায় থাকে এবং তাহার চাবিই বা কৃষ্ণকান্ত কোথায় রাখেন। তারপর গভীর রাত্রে রোহিণী আবার কৃষ্ণকান্তের গৃহে প্রবেশ করিয়া উইল চুরি করিয়া আনিল এবং তৎপরিবর্তে জাল উইল রাখিয়া আসিল।

"বালাই, বুড়ো হবে কেন? আমাদের কেবল জোর করিয়া নাতনী বল বই ত না"—"সমগ্র গ্রাম তখন যেন এক পরিবার, আর যাঁহারা ধনে মানে বড় তাঁহারা পরিবারের কর্তা—পরিচালক। সে অবস্থা আর নাই। এখন গ্রামের যাঁহারা শিক্ষিত, যাঁহারা ধনী, যাঁহারা সম্ভ্রান্ত—তাঁহারা গ্রামত্যাগী। গ্রাম এখন যাহাদিগের গ্রাম ত্যাগ করিয়া নগরে যাইবার উপায় নাই, তাহাদিগের—গ্রামের সমাজ এখন সঙ্কীর্ণতার পঙ্কে কলুষিত—ঈর্ষা-দ্বেষ-মিথ্যা-হীনতার লীলাক্ষেত্র।"

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ পরদিন হরলাল আবার ব্রহ্মানন্দের পাকশালায় রোহিণীর কাছে গেল। চুরি-করা আসল উইলখানিও দেখিল কিন্তু রোহিণীর কাছ হইতে তাহা নিতে পারিল না। যে প্রলোভনে পড়িয়া রোহিণী উইল চুরি করিল তাহার বাস্তব রূপায়ণ ছাড়া সে উইল দিতে

অস্বীকৃত হইল। হরলালের মুখোস তখন খসিয়া পড়িল। সে যে অভিনয় করিয়াছিল তাহা ধরা পড়িল। সে বলিল, "আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।" রোহিণীর নিকট ইহা নির্মম আঘাত। হরলালকে সে যাবপরনাই তিরস্কাব করিল। রাগে দুঃখে রোহিণীর চোখে জল আসিল।

ভাগ্যবশতঃ ব্রহ্মানন্দ বাড়ী ছিল না—হরলালেব গতিবিধি লোকচক্ষে ভাল ঠেকিত না। হরলাল যেভাবে ব্রহ্মানন্দের পাকশালায় যাতায়াত করিত তাহাতে রোহিণীর সঙ্গে তাহার একটা অবৈধ প্রণয় সম্পর্ক কল্পনা করা ব্রহ্মানন্দের পক্ষে কিছুই বিচিত্র হইত না।

"চাহিয়া দেখ—হাঁড়ি ফাটিবে না"—হরলালেব দিকে রোহিণী ফিরিয়া তাকাইল না। তাহার উইল চুরির কাজ সিদ্ধ হইয়াছে। এখন হবলালেবই গরজ। তাহাকে খোশামোদ করিবে। হরলালও পূর্বদিনের মতই অভিনয় আরম্ভ করিল। রোহিণীকে ফুসলাইয়া উইল হস্তগত কবাই তাহার মতলব।

"তোমার কাছে থাকাও যে আমার কাছে থাকাও সে"—পূর্বদিন হরলাল রোহিণীকে বিবাহ করিবে বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিল। সেই কথার জের ধরিয়াই রোহিণী এই কথা বলিল। অর্থাৎ হবলাল তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করুক। তারপর সে উইল দিবে। পরিষ্কাব বলিল, "যাহা দিবে বলিয়াছিলে, তাই চাই।"

"আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।" —হরলাল যখন দেখিল টাকার বিনিময়ে রোহিণী উইল দিবে না তখন সে নিজমূর্তি ধারণ করিল। "রোহিণীর স্বপ্ন টুটিয়া গেল—সে আশার উচ্চ শৃঙ্গ হইতে হতাশায় পঙ্কিল পম্বলে পতিত হইল। তখন সে-ও নিজমূর্তি ধরিল। মেকলে বলিয়াছেন—"No creature is so revengeful as a proud man who has humbled himself in vain"—যে গর্বিত ব্যক্তি (কোন কারণে) নমিত হইয়াও বিফল মনোরথ হয়, তাহার মত প্রতিহিংসাপরায়ণ আর কেহই থাকে না। রোহিণী যে মোহে তাহার ইহকালের সর্বস্ব হরলালকে দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, হরলাল যখন ঘৃণাতিক্ত উক্তিতে তাহা দূর করিয়া দিল, তখন রোহিণীর মনের ভাব সহজে কল্পনা করা যায়। কিন্তু প্রতিহিংসা লইবার কোন উপায় তাহার ছিল না; তাই সে হরলালের

দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি চোর! তুমি সাধু! কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল? কে আমাকে বড় লোভ দেখাইল? সরলা স্ত্রীলোক দেখিয়া কে প্রবঞ্চনা করিল? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নাই, মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা নাই, যা ইতরে বর্বরে মুখেও আনিতে পারে না—তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র হইয়া তাই করিলে! হায়! হায়! আমি তোমার অযোগ্য? তোমার মত নীচ, শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই। তুমি যদি মেয়ে মানুষ হইতে, তোমাকে আজ যা দিয়া ঘর ঝাঁট দিই তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ, মানে মানে দূর হও। বলিতে বলিতে রোহিণীর চক্ষু অশ্রুতে আবিল হইয়া উঠিল।"

॥ **ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ** ॥ হরলাল চলিয়া গেল। কিন্তু একটি ফুৎকারে যে স্তিমিত অগ্নিকে সে জ্বালাইয়া গেল তাহা নির্বাপিত হইল না। রোহিণীর অন্তরে তাহা ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল। উপযুক্ত দাহ্য পদার্থের স্পর্শে তাহা একদিন একটি সুখী দাম্পত্যজীবনকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিল।

রোহিণী ব্রহ্মানন্দের গৃহে একাই ছিল। কোন ঝি-চাকরের বালাই ছিল না। এ আপদ না থাকায় সংসারে ধূর্তামি, প্রবঞ্চনা, কোন্দল প্রভৃতিও ছিল না। ব্রহ্মানন্দের শান্ত পরিবারে রোহিণী একাই জল আনা, বাসন মাজা প্রভৃতি সকল কাজ করিত। এমনকি পাড়ার হালকা মেয়েদের সঙ্গে হাসি তামাসা করিয়া দল বাঁধিয়া জল আনিতে যাওয়াও সে পছন্দ করিত না। "রোহিণীর কলসী ভারি, চালচলনও ভারি।"

রোহিণীর এই নিরুপদ্রব জীবনে হরলাল-শনি আসিয়া সব গণ্ডগোল করিয়া দিল। বসন্তের কোকিল তাহার জীবনের এই চঞ্চলতাকে আরও বৃদ্ধি করিল। জীবনে শূন্যতাবোধ সে বেশী করিয়া উপলব্ধি করিল। তাহার মনে হইল, "কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাহা হারাইয়া যাওয়ায় জীবন সর্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা পাইব না। যেন কি নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পুরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য কিছুই ভোগ করা হইল না।"

বাবুদের বারুণী-পুকুরে সন্ধ্যাবেলায় রোহিণী জল আনিতে গেল। সোপান অবতীর্ণ হইয়া কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া সে কাঁদিতে বসিল।

বসন্তের কোকিল—মানবজীবনে কোকিলের কুহুরবের প্রভাব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে আলোচনা করিয়াছেন। সর্বস্তরের মানুষই এই ডাক

শুনিয়া কেমন যেন আনমনা হইয়া যায়। তাহার মধুর অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর মানুষকে উদাস করিয়া তোলে। মনে হয় যেন কী পাই নাই, কী মহামূল্য জিনিস হারাইয়াছি। জীবন যেন অসার হইয়া পড়িয়াছে। একটা অতৃপ্তি, একটা তৃষ্ণা যেন কিছুতেই মিটিতেছে না। রোহিণীর জীবনেও এই ব্যর্থতা বোধ দেখা দিয়াছে।

"পূর্বদিনের ঘটনাও রোহিণীর প্রকৃতিতে পরিবর্তন প্রবর্তিত করিতে পারে নাই, তাহার প্রমাণ সে যখন জল আনিতে যাইতেছিল, তখন যে পুষ্করিণী-পথে—বিজন-বকুল-শাখায় বসিয়া কোকিল ডাকিতেছিল, তাহাও তাহার মনোযোগ অতিক্রম করে নাই এবং সে তাহার উদ্দেশ্যে "দূর হ! কালামুখো!" বলিয়া পুষ্করিণীর দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়—তাহার মনে তখন শান্তি ছিল না। যতক্ষণ আগ্নেয়গিরির গৈরিক স্রাব বহির্গমনের পথ না পায়, ততক্ষণ তাহার বহিরাবরণ দেখিয়া তাহার অন্তরস্থিত বহ্নিজ্বালা অনুমান করা যায় না। মনের চাঞ্চল্যের জন্যই—"রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল। সে অভ্যাসবসে সংসারের সব কাজ করিয়া আসিয়াছে—এখন বারুণী পুষ্করিণীতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাঁদিতে বসিল।

॥ **সপ্তম পরিচ্ছেদ** ॥ কৃষ্ণকান্ত রায়ের আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলাল বহু অর্থব্যয় করিয়া বারুণী পুষ্করিণীর তটস্থ উদ্যান নিজ মনোমত সজ্জিত করিয়াছিলেন, রোহিণী সেই পুষ্করিণীর তটে বসিয়া কাঁদিতেছিল আর গোবিন্দলাল কুসুমিতা লতার অন্তরাল হইতে তাহা দেখিতেছিল। প্রথমে ভাবিয়াছিল রোহিণী বোধ হয় পাড়ার কোন মেয়েছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া আসিয়াছে।

এদিকে রোহিণী একাকী সেই ঘাটে বসিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিতেছিল, "কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না? কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী—মনে কর ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন গুণে গুণবতী—কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য? দূর হৌক—পরের সুখ

দেখিয়া আমি কাতর নই—কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি ?"

অন্ধকার হইয়া আসিল। রোহিণী তখনও কাঁদিতেছে দেখিয়া গোবিন্দলালের মনে করুণার সঞ্চার হইল। সে ভাবিল, "এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা, হউক, এও জগতপিতার প্রেরিত সংসার পতঙ্গ—আমিও সেই তাঁর প্রেরিত সংসার পতঙ্গ, অতএব এও আমায় ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না ?" .

গোবিন্দলাল রোহিণীর কাছে গিয়া তাহার কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। রোহিণী কিছু বলিল না। গোবিন্দলাল রোহিণীকে তাহার দুঃখ জানাইতে বলিল। যদি সম্ভব হয় গোবিন্দলাল নিশ্চয়ই তাহার উপকার করিবে। রোহিণী এবার বলিল, "একদিন বলিব। আজ নহে। একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।" একদিন গোবিন্দলাল এই রোহিণীর জন্যই উদগ্রীব হইবে। তাহার নামের সহিত রোহিণীর নাম যুক্ত হইয়া এমন কলঙ্ক রটিবে যাহাতে গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা শুনিবে। ভ্রমরের স্থানে রোহিণীকে বসাইবে। বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত রোহিণীর এই কথার মধ্যে তাহাই সঙ্কেতিত করিলেন।

গোবিন্দলালের সমবেদনায় রোহিণীর দুঃখ মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। আনন্দে গা ধুইয়া জল লইয়া সে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

বারুণী পুষ্করিণী লইয়া আমি বড় গোলে পাড়িলাম—যাহা একান্তই অনুভবের বস্তু তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। গেবিন্দলালের মনের মত সাজানো বাগান—বারুণী পুকুর এতই মনোরম যে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বর্ণনা করিয়া সঠিক প্রকাশ করিতে পারিবেন না বলিয়া শঙ্কিত হইতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, একদিকে বারুণীর তটের সবুজ সৌন্দর্য, অন্যদিকে তাহার স্বচ্ছ নীল জল। তাহার উপর কোকিলের ডাকে রোহিণীর জীবনে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করিল। রোহিণী কাঁদিতে বসিল। এই ক্রন্দনের কারণ গোবিন্দলাল বুঝিতে পারিতেছে না। লেখক বঙ্কিমচন্দ্রও বিপন্ন। ইহার পর হইতে রোহিণীর জীবনের ধারা পরিবর্তিত হইল। যে গোবিন্দলালকে বাল্যকাল হইতে দেখিয়াও রোহিণী তাহার প্রতি কোনরূপ আকর্ষণ অনুভব করে নাই সেই গোবিন্দলাল আজ হইতে রোহিণীর মন জুড়িয়া বসিল। গোবিন্দলালও বিপন্ন হইবেন তাহার আভাসও লেখক এইখানে দিতেছেন। তৃতীয়তঃ, ভাগ্যবিড়ম্বিতা রোহিণীর প্রতি লেখক এবং গোবিন্দলালের

স্বাভাবিক মানসিক সহানুভূতি আছে। যে কখনও সুখের মুখ দেখে নাই, যাহার জীবনে ফুল ফুটিতে না ফুটিতেই শুকাইয়া গেল, তাহার জন্য দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। সামান্য সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় গলিয়া যাইবে। কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া উঠিবে। সমস্ত চিন্তা তাহাকে জড়াইয়া থাকিবে ইহাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ইহার ফল ভাল হইবে না। রোহিণীকে মরিতে হইবে। সমাজে তাহাকে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। সেই গোলের বোধ হয় এই সূচনা। লেখকের নীতিবোধ এবং গোবিন্দলালের মধুর দাম্পত্যজীবন মাঝখানে থাকিয়া বাধা সৃষ্টি করিতেছে ; আর ইহার উৎপত্তিস্থল এই বারুণী পুষ্করিণী। তাই বারুণী পুষ্করিণী লইয়া লেখক বড়ই গোলে পড়িয়াছেন।

রোহিণী লোক ভাল নয়—কারণ রোহিণী সাধারণ বালবিধবাদের মত থাকে না। সে হাতে চুড়ি পরে, কালো-পেড়ে ধুতি পরে। রোহিণীর ভাগ্যে আছে মৃত্যু। সেইজন্য রোহিণী যে খারাপ, লেখক পাঠকের মনে প্রথম হইতেই তাহা বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন—সৃষ্টি করুণাময়ী, কারণ সৃষ্টি সুন্দর। আমাদের চারিদিকে জল স্থলের যে শোভা সবই সুন্দর। কেবল নির্দয়তা অসুন্দর। মানুষও এই প্রকৃতির সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ মানুষের প্রতি অনেক নির্দয় ব্যবহার করে, সেইজন্য মানুষ অকরুণ। গোবিন্দলাল পরদুঃখ-কাতর। সে বুঝিল, দয়াই মানুষের ধর্ম। দয়ার পাত্রের চরিত্র বিচার করা অনুচিত। সেইজন্য সে রোহিণীর উপকার করিতে অগ্রসর হইল।

কাজটা ভাল হয় নাই—রোহিণীর এই বোধ নৈতিক বুদ্ধিসঞ্জাত। হরলালের প্রলোভনে পড়িয়া সে উইল চুরি করিয়াছে। কিন্তু হরলাল তাহার কথা রাখে নাই। রোহিণীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। হরলালের জাল উইলের দ্বারা গোবিন্দলাল মাত্র এক পাই পাইবে। রোহিণী চুরি করিয়া যাহাকে ন্যায্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, সেই গোবিন্দলালই তাহাকে সহানুভূতি জানাইয়াছে। সেইজন্য রোহিণীর মনে অনুশোচনা দেখা দিয়াছে।

উপায় আমি, দড়ি সহযোগে—গোবিন্দলাল যে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে সে কথা চিন্তা করিয়াই রোহিণীর মরিবার ইচ্ছা হইতেছে।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ রোহিণী সেই রাত্রি বিনিদ্র কাটাইল। তাহার মধ্যে সুমতি কুমতির দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। উইল লইয়া রোহিণী ভীষণ সমস্যায় পড়িল। এই উইল তাহার কাছে রাখিলে গোবিন্দলালের

সর্বনাশ। কারণ, যে উইল কৃষ্ণকান্তের নিকটে আছে তাহাই তাঁহার মৃত্যুর পর সত্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং গোবিন্দলাল তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে। আর উইল ফেরত দিতে গেলেও রোহিণী আর ব্রহ্মানন্দ উভয়ের জেল হইবে। রোহিণী আর ভাবিতে পারে না। রোহিণী বিনিদ্র অবস্থায় কেবল গোবিন্দলালের কথা ভাবিতে লাগিল।

নিদ্রার জন্য নহে—চিন্তার জন্য—কোন তত্ত্বকথার মধ্যে না গিয়াও সাধারণভাবে বলা যায়, মনুষ্য হৃদয়ে সু ও কু দুই ভাবই রহিয়াছে। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। বারুণী পুষ্করিণী হইতে আসিবার পব হইতে রোহিণীর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব দেখা গিয়াছে। এ অবস্থায় তাহার নিদ্রা সম্ভব নহে।

রোহিণী দেখিতে লাগিল—দেখিতে, দেখিতে, কাঁদিল—গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণী একটি আসক্তি অনুভব করিতেছিল। প্রথম আকর্ষণের তীব্রতায় সে গোবিন্দলালের মূর্তি চিন্তা করিতেছিল। অনুরাগ এবং আশঙ্কায় সে কাঁদিতে লাগিল।

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥ সেই অবধি বোহিণী নিত্য পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায় এবং নিত্য গোবিন্দলালকে দেখিতে পায় এবং নিত্যই রোহিণীর মনে সুমতি কুমতির দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয় জুড়িয়া বসিল। রোহিণী মনে মনে অতি গোপনে গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইল। বোহিণী বুদ্ধিমতী। সে বুঝিল, ইহা মরিবার কথা। কারণ এই প্রণয়ের সফলতার কোন উপায় সে দেখিতে পাইল না। এমন কি গোবিন্দলালও যদি জানিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। অতএব মৃত্যু ছাড়া তাহার এই যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতির আর কোন উপায় নাই।

কিন্তু এক বিষয়ে রোহিণী কৃতসঙ্কল্প হইল—জাল উইল চালান হইবে না। ঠিক করিল, হরলালের লোভে সে যে প্রকারে উইল চুরি করিয়াছে সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উইল রাখিয়া জাল উইল লইয়া আসিবে।

রাত্রে কৃষ্ণকান্তের গৃহে রোহিণী উইল চুরি করিতে গেল। এবার কিন্তু রোহিণী ধরা পড়িল। আশ্চর্য রোহিণীর সাহস। সে পলাইল না। সে মনে মনে ভাবিল, "দুষ্কর্মের জন্যে সেদিন যে সাহস করিয়াছিলাম, আজ সৎকর্মের জন্য তাহা করিতে পারি না কেন? ধরা পড়ি পড়িব।" সে কৃষ্ণকান্তের সম্মুখেই দেরাজের ভিতর আসল উইল রাখিয়া জাল উইল বাহির করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন। অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াও রোহিণীর নিকট হইতে প্রকৃত তথ্য বাহির করিতে পারিলেন না। রোহিণীকে সেই রাত্রে তিনি কয়েদ রাখিলেন। বলিলেন, "তোমার উচিত দণ্ড অবশ্যই করিব। তোমাকে পুলিশে দিব না, কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব।

কেন যে এতকালের পর, তাহার এ দুর্দশা হইল, তাহা বুঝিতে পারি না, বুঝাইতেও পারি না—অগম্য মানব-মনের কথা স্পষ্ট করিয়া বলা কখনোই সম্ভব নয়। অনুমান করা যায় মাত্র। "এই রোহিণী এই গোবিন্দ-লালকে বাল্যকাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজ হঠাৎ কেন?" বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সদুত্তর করিতে পারেন নাই। তিনি স্বাভাবিক ঘটনাস্রোতেই, এ পর্যন্ত কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপীতীরে রোদন, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ—এই সকল উপলক্ষে কিছুকাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল।" তাহাতে কি হয় বঙ্কিমচন্দ্র জানেন না। আসলে নৈয়ায়িক বঙ্কিম তাহা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। বস্তুতঃ এই ভাবেই রোহিণী গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল।

কিন্তু কার কাছে মৃত্যু আসে—বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, সমাজে যাহার মৃত্যু কাম্য নহে তাহার কাছেই মৃত্যু আসে। আর যাহারা মরিলে তাহাদের নিজের এবং সমাজেরও মঙ্গল তাহাদের সহজে মৃত্যু হয় না। লেখকের মতে রোহিণী পাপী, অতএব সে মৃত্যুকামনা করিলেও অত সহজে তাহার মৃত্যু হইবার নয়।

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্দলাল এবং ভ্রমরের ছিল মধুর দাম্পত্য-জীবন। বঙ্কিমচন্দ্র দুই একটি কথায় সেই স্বচ্ছ অনাবিল জীবনধারার পরিচয় দিয়াছেন। সকালবেলায় মুক্ত বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া তাহারা দাম্পত্য আলাপ করিতেছিল।

এমন সময় চাকরাণীমহলে গোলযোগ উঠিল। একটা মুখরোচক সংবাদে সকলেই গোলযোগ করিতেছিল। সেই হট্টগোলের মধ্যে ভ্রমর অতি কষ্টে গত রাত্রে কৃষ্ণকান্তের গৃহে রোহিণীর চুরির সংবাদ সংগ্রহ করিয়া গোবিন্দলালকে বলিল। গোবিন্দলাল-ভ্রমর তাহা বিশ্বাস করিল না। গোবিন্দলাল প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে চলিল।

রোহিণীর চুরির সংবাদে চাকরাণী মহলে যে আলোড়ন পড়িয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্র দু-এক কথায় তাহার মধ্য দিয়া কোন্দল-পরায়ণা চাকরাণী সম্প্রদায়ের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস—ভ্রমর ছিল গোবিন্দলালের আদর্শ হিন্দুপত্নী। পতির ধ্যান-ধারণাই স্ত্রীর ধ্যান-ধারণা। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী একাত্ম অনুভব করিত। তাহাদের পৃথক কোন অস্তিত্ব ছিল না। ভ্রমরও তাহার চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস সবই গোবিন্দলালের নিকট বিলাইয়া দিয়াছিল। স্বামীর চোখ দিয়া সে দেখিত। স্বামীর মন দিয়া সে বুঝিত। গোবিন্দলালও সেজন্য ভ্রমরের কালোরূপে মুগ্ধ ছিল।

॥ **একাদশ পরিচ্ছেদ** ॥ গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্ত রায়ের সদর কাছারিতে উপস্থিত হইল। রোহিণীও সেখানে ছিল। গোবিন্দলালের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে তাহাব প্রতি কটাক্ষ করিল। গোবিন্দলাল সেই কটাক্ষের ব্যাখ্যায় ব্যস্ত ছিল। তাহার আনমনা ভাব দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত মনে মনে ভাবিলেন, "হয়েছে! ছেলেটা বুঝি মাগীর চাঁদপানা মুখখানা দেখে ভুলে গেল!" কৃষ্ণকান্তের ধারণা, বোহিণীর এ কার্যের পিছনে আছে "হরা পাজির কারসাজি।" রোহিণী কিন্তু তাহা স্বীকার করিল না। কৃষ্ণকান্ত রায় ঠিক করিলেন, রোহিণীর মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, কুলার বাতাস দিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিবেন। গোবিন্দলালেব সন্দেহ হইল, রোহিণীর এ কার্যের পিছনে নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে। সেজন্য প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার জন্য নিজের জামিনে রোহিণীকে অন্দরমহলের পাঠাইবার জন্য কৃষ্ণকান্তের নিকটে অনুরোধ করিল। কৃষ্ণকান্ত রোহিণীকে একজন চাকরাণী দিয়া ভ্রমরের কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

"দেখিলে বদ্‌জাতি"—কৃষ্ণকান্ত রোহিণীর সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ধরা পড়িয়া সে পলাইবার চেষ্টা করিল না। শত জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার নিকট হইতে প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিলেন না। আসলে রোহিণীর প্রকৃত বিবরণ কৃষ্ণকান্তের নিকট বলিবার নহে। গোবিন্দলালের প্রতি কৃতজ্ঞতার বশেই সে তাহার পূর্বকৃত অপরাধ সংশোধন করিতে আসিয়াছিল।

"আমিই থানা, আমিই মেজেষ্টর, আমিই জজ"—কৃষ্ণকান্ত ছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদার। তাঁহার ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। জমিদারীর শান্তি ও শৃঙ্খলার ভার জমিদার তখন নিজেই লইতেন।

কৃষ্ণকান্তের মত জমিদারের থানা, ম্যাজিস্ট্রেট, জজের কোন প্রয়োজন হইত না। নিজেরাই অপরাধীর যোগ্য শাস্তিবিধান করিতেন।

আমিও তোর উপর এক চাল চালিব—প্রথম হইতেই রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের পক্ষপাতিত্ব কৃষ্ণকান্ত লক্ষ্য করিয়াছেন। গোবিন্দলাল তাঁহার আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাহাকে মুখে কিছু বলিলেন না। গোবিন্দলাল যখন রোহিণীর জন্য জামিন হইল তখন তিনি রোহিণীকে গোবিন্দলালের সঙ্গে একা ছাড়িলেন না। চাকরাণী দিয়া রোহিণীকে ভ্রমরের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। রোহিণী ও গোবিন্দলাল নির্জনে আলাপ করিতে না পারে। তাঁহার ধারণা গোবিন্দলাল চালাকি করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার কৌশলে রোহিণীকে একা নির্জনে পাইতে চাহে। সেইজন্য তিনিও তাহার উপর টেক্কা মারিয়া রোহিণীকে ভ্রমরের কাছে পাঠাইলেন।

॥ **দ্বাদশ পরিচ্ছেদ** ॥ রোহিণী ভ্রমরের কাছে আনীত হইল। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিল, সে গোপনে রোহিণীর মনের কথা জানিতে চায়। "আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয়, আড়াল হইতে শুনিও।" ভ্রমর লজ্জায় চলিয়া গেল।

রোহিণী অত্যন্ত মুখরা। সহজে সব কথা গোবিন্দলালকে বলিতে চাহিল না। রোহিণী গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়াসক্ত ছিল। এক্ষণে তাহার প্রতি গোবিন্দলালের মনোভাব পরীক্ষা করিয়া লইতে চাহিল। তারপর গোবিন্দলালকে উইল চুরির কারণ বলিল। গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে? আমি ত কোন অনুরোধ করি নাই!"

রোহিণী কাঁদিতে লাগিল। বহু কষ্টে রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "না—অনুরোধ করেন নাই—কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই—যাহা আর কখনও পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন" গোবিন্দলাল প্রথমে বুঝিতে পারিল না। রোহিণী তখন বারুণী পুষ্করিণীতে গোবিন্দলালের সহানুভূতির কথা উল্লেখ করিল। সে ভাগ্য বিড়ম্বিতা। এতটুকু মানবিক সহানুভূতি সে কাহারও কাছে পায় নাই। পাইয়াছে কেবল প্রবঞ্চনা, অপমান। গোবিন্দলাল বুঝিল, "যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ

হইয়াছে।” বলিল, “রোহিণী, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার শ্রেয়ঃ।” কিন্তু গোবিন্দলাল তাহাকে আত্মহত্যা করিবার পরামর্শ দিল না; দেশ ত্যাগ করিতে বলিল। যাহাতে তাহার সঙ্গে রোহিণীর আর দেখাশুনা না হয়।

রোহিণী তাহার মনের ভাব বুঝাইতে পারিয়া বড় সুখী হইল। গোবিন্দলাল রোহিণীর দেশান্তরে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করিয়া দিবে বলিল। তাহার এক বন্ধু রোহিণীকে বাড়ী কিনিয়া দিবে। রোহিণীর খুড়াকে চাকরি দিবে। রোহিণী রাজী হইল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য ভ্রমরকে দিয়া অনুরোধ করাইবে বলিল।

এইরূপে চোর, কয়েদী রোহিণী গোবিন্দলালের নিকট তাহার প্রণয়-কথা ব্যক্ত করিল।

রাঁধুনি ঠাকুরঝি! রাঁধতে রাঁধতে একটি রূপকথা বল না—গোবিন্দলাল যখন ভ্রমরকে বলিল, “আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয় আড়াল হইতে শুনিও”, তখন ভ্রমর নিজেই লজ্জা পাইল। কারণ সে তো স্বামীকে অবিশ্বাস করে না। সেইজন্য সে ছুটিয়া পাকশালায় পাচিকার নিকটে গিয়া রূপকথা শুনিতে চাহিল। এই উক্তির মধ্যে ভ্রমরের ছেলেমানুষীর পরিচয় পাওয়া যায়। ভ্রমর সত্যই তখন সরলা বালিকা ছিল।

আমি অবিশ্বাসযোগ্য কথাতে কখনও কখনও বিশ্বাস করি—গোবিন্দলাল একেবারে সাধারণ মানুষ ছিল না। সে সব কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিত। সেজন্য সাধারণের কাছে যাহা সহজেই বিশ্বাসযোগ্য তাহাতে সে কখনও কখনও অবিশ্বাস করিত।

তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব—রোহিণী গোবিন্দলালকে গোপনে ভালবাসিয়া মরিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতি গোবিন্দলালের কোন দুর্বলতা আছে কি-না তাহা সে জানে না। আজ যখন একান্তে দুইজনের দেখা হইয়াছে তখন রোহিণী গোবিন্দলালের মনের ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চায়।

আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই—যাহা ইহজন্মে আর কখনও পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন—রোহিণী বালবিধবা; পুরুষের নিকট হইতে স্নেহ, সহানুভূতি, একটুকু হৃদয়ের স্পর্শ যে-কোন নারীরই কাম্য। রোহিণী তাহা হইতে বঞ্চিতা। স্বামী অকালে মৃত। হৃদয়ের

প্রলোভন দেখাইয়া তাহার সুপ্ত কামনাকে জাগ্রত করিল। কিন্তু সেও প্রত্যাখ্যান করিল। বসন্তের কোকিল তাহার মধুর কণ্ঠস্বরে রোহিণীর জীবনের অসারতা বুঝাইয়া দিল। ঠিক সেই সময় দিব্যকান্তি গোবিন্দলালের সহানুভূতি রোহিণীর জীবনের ধারা বদলাইয়া দিল। কোন পুরুষমানুষের কাছে সে ইহা পায় নাই, পাইবে এমন ভরসাও নাই। বারুণী পুষ্করিণীর সেই স্মৃতি তাহার কাছে অমূল্য।

এ রোগের চিকিৎসা নাই—আমার মুক্তি নাই—রোহিণী নিজেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিতেছে। সমাজে যাহা শ্রেয় নহে তাহাই তাহার কাছে পরম প্রেয় বোধ হইল। কারণ ইহা প্রণয়রোগ। তাহা তো সমাজের বাঁধা পথ দিয়া চলে না। তাহার পথ কুটিল। যাহা অবৈধ, যাহা সমাজ বিগর্হিত, সেইদিকেই তাহার প্রবণতা। রোহিণী তাহা জানে। আরও জানে মৃত্যু ছাড়া এই রোগের কোন চিকিৎসা নাই। গোবিন্দলাল কিন্তু নিছক দয়া পরবশ হইয়াই রোহিণীর দুঃখের কারণ জানিতে চাহিয়াছিল। সহানুভূতি ব্যতীত গোবিন্দলালের দিক হইতে আর কিছুই ছিল না।

বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে—গোবিন্দলাল বিস্মিত হইল। বুঝিল রোহিণীও তাহাকে ভালোবাসিয়াছে। ইভ স্বর্গোদ্যানে সর্পের কুপরামর্শে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়াছিল। রোহিণীও নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়াছে, সেজন্য সে ভুজঙ্গী।

রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের কোন দুর্বলতা ছিল না। সেজন্য রোহিণীর হৃদয়ের কথা জানিতে পারিয়া তাহার আহ্লাদ হইল না। কিন্তু রাগও হইল না। রোহিণীর অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে রাগ হওয়া স্বাভাবিক নয়। রোহিণীর অসহায় অবস্থা, তাহার জীবনের দুঃখ এবং অতৃপ্তির কথা ভাবিলে তাহার প্রতি দয়া হওয়াই স্বাভাবিক। গোবিন্দলালের হৃদয় সমুদ্রের মতো উদার। তাহার চরিত্র এখনও নিষ্পাপ এবং অনিন্দ্য। সে হৃদয় দিয়াই রোহিণীর হৃদয়ের কথা অনুভব করিল। কিন্তু সমাজ-নীতি অলঙ্ঘ্য। রোহিণীর এই ভালোবাসা অনুচিত, সেজন্য গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিল, "মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভালো।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা দার্শনিক ভাব গোবিন্দলালের মধ্যে দেখা দিল। সে বলিল, "মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি। আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন?"

কিন্তু রোহিণীর এই অবৈধ আকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না; সেইজন্য

গোবিন্দলাল রোহিণীকে দেশ ছাড়িয়া যাইতে বলিল। যাহাতে "তোমায় আমায় আর দেখাশুনা না হয়।" গোবিন্দলাল বুঝিল, রোহিণীকে দূরে পাঠাইতে পারিলে রোহিণীর প্রণয়ও তাহার অদর্শনে দূরীভূত হইবে।

মানুষ বড়ই পরাধীন—মানুষ সাধারণতঃ কামনা-বাসনার দাস। রোহিণী পূর্বে বলিয়াছিল, "আমি বিষ পাইলে খাইতাম।" কিন্তু গোবিন্দলাল যখন তাহার প্রণয়ের কথা বুঝিতে পারিল তখন তাহার আনন্দ হইল। এতদিন গোপনে রোহিণী তাহা লালন করিয়াছিল। উপযুক্ত সময়ে গোবিন্দলালের কাছে তাহা ব্যক্ত করিল। গোবিন্দলাল রাগ করিল না। দয়ার্দ্রচিত্তে সহানুভূতির সঙ্গে এখনও রোহিণীর হৃদয় বিচার করিল। সেজন্য রোহিণীর নিজেকে সুখী মনে হইল। তাহার সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হইল। তাহার বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িল। যে প্রবৃত্তির তাড়নায় রোহিণী মরিতে চাহিয়াছিল সেই প্রবৃত্তির তাগিদেই সে এখন বাঁচিতে চাহিল। সেজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, মানুষ বড় পরাধীন। কিছু না কিছুর অধীনতা তাহাকে সর্বদা স্বীকার করিয়া চলিতে হয়।

এই পরিচ্ছেদে রোহিণীর একদিকে চরম কলঙ্ক আবার এই পরিচ্ছেদেই রোহিণীর চরম আনন্দ। রোহিণী চুরি করিতে আসিয়া কৃষ্ণকান্তের ঘরে ধরা পড়িয়াছে এবং সকলে তাহা জানিয়াছে। ইহাতে তাহার কলঙ্কের সীমা রহিল না। আবার এই পরিচ্ছেদেই রোহিণী গোবিন্দলালের কাছে আপন হৃদয় উন্মুক্ত করিতে পারিল। গোবিন্দলালের হৃদয়ে তাহার জন্য সহানুভূতির একটুকু ঠাঁই আছে তাহাও বুঝিতে পারিল। ভাগ্যবিড়ম্বিতা রোহিণীর কাছে এই আনন্দের শেষ নাই।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥ ভ্রমর শ্বশুরকে রোহিণীর জন্য অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হয় নাই। সে বালিকা; বিষয়বুদ্ধির মধ্যে সে কখনও যায় নাই। শ্বশুর যাহাকে শাস্তির যোগ্য মনে করেন, সে কি করিয়া তাহাকে মুক্তি দিতে বলিবে!

তখন গোবিন্দলাল স্বয়ং কৃষ্ণকান্তের কাছে গিয়া রোহিণীর ওকালতি করিতে লাগিল। রোহিণী যাহা বলিয়াছিল সংক্ষেপে তাহা বলিল। তবে গোবিন্দলাল ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিল। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমি উহার কথায় বিশ্বাস করি না। উহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, দেশের বাহির করিয়া দাও—আর তোমরা যদি এমনই বিবেচনা কর যে, উহার দোষ নাই—তবে ছাড়িয়া দাও।"

কৃষ্ণকান্ত প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন গোবিন্দলাল যখন ওকালতি করিতে

আসিয়াছে তখন ইহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। তথাপি তিনি রাশ টানিয়া ধরিয়া গোবিন্দলালের মনের ভাব বুঝিতে চাহিলেন।

রোহিণী নিষ্কৃতি পাইল। গোবিন্দলালও কৃষ্ণকান্তের হাত হইতে ছাড়া পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

গোবিন্দলাল একটু গোলে পড়িলেন—সকাল বেলা কৃষ্ণকান্তের কাছে রোহিণীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার লজ্জা করে নাই। কিন্তু তারপর রোহিণীর মুখে তাহার প্রণয়াসক্তির কথা শুনিয়া গোবিন্দলালের নিজেরই লজ্জা করিতে লাগিল। প্রথমে কেবলমাত্র দয়ার বশবর্তী হইয়াই রোহিণীকে বাঁচাইতে আসিয়াছিল, এখন তাহার মনে একটা দুর্বলতা দেখা দিয়াছে। সেজন্য কৃষ্ণকান্তকে অনুরোধ করিতে তাহার সঙ্কোচ হইতেছে।

বুড়া রঙ্গ দেখিতে লাগিল—কৃষ্ণকান্ত বুদ্ধিমান রসিক পুরুষ। তিনি গোবিন্দলালের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তাহার ধার দিয়াও গেলেন না। রোহিণীর প্রসঙ্গ চাপা রাখিয়া তিনি জমিদারির কথা বলিতে লাগিলেন। গোবিন্দলাল যে রোহিণীর কথা বলিতে আসিয়াও বলিতে ইতস্ততঃ বোধ করিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণকান্ত মনে মনে কৌতুক বোধ করিতেছেন।

॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥ রোহিণী গোবিন্দলালের অনুমতি লইয়া খুড়ার সঙ্গে বিদেশ যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে আসিল। কিন্তু বাড়ী আসিয়া সে বুঝিতে পারিল, তাহার পক্ষে গোবিন্দলালকে ছাড়িয়া যাওয়া কত কঠিন। হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িতে তাহার আপত্তি নাই কিন্তু সেখানে যে গোবিন্দলাল বাস করে। আজ রোহিণী তাহার প্রতি তীব্র প্রণয়াকর্ষণ অনুভব করিতেছে। সে খুড়াকে কিছু না বলিয়া কেবল কাঁদিতে বসিল। সে ঠিক করিল কলিকাতায় যাইবে না। এ হরিদ্রাগ্রাম তাহার স্বর্গ; "এখানে গোবিন্দলালের মন্দির।" কৃষ্ণকান্ত রায় তাহাকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দিলেও সে আবার আসিবে। আবার গোবিন্দলালকে দেখিবে। গোবিন্দলাল রাগ করিবে, করুক। তথাপি সে গোবিন্দলালকে দেখিতে পাইবে। তাহার দেখিয়াই সুখ।

রোহিণীর মনস্তত্ত্বের দিক হইতে এই পরিচ্ছেদটি খুবই উল্লেখযোগ্য একদিকে রোহিণীর গোবিন্দলালের জন্য তীব্র প্রণয়াকর্ষণ, অন্যদিকে বিবেকের দংশন। সে আবার গোবিন্দলালের কাছে চলিল। রোহিণী কিন্তু তাহার

এই মানসিক দুর্বলতার প্রশ্রয় দিতে চাহে না। সে ভগবানের কাছে, নানা দেবদেবীর কাছে কাতর আকুতি জানাইতেছে, "আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের অসহ্য প্রেমবহ্নি নিভাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না।" তথাপি তাহার "অপরিমিত প্রেম পরিপূর্ণ' হৃদয় থামিল না। তাহার হৃদয়ে ভীষণ দ্বন্দ্ব দেখা দিল। সে একবার ভাবিল আত্মহত্যা করিয়া এই জ্বালা জুড়াইবে, আবার ভাবিল পলাইয়া যাইবে, কখনও ভাবিল, ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইবে।

এইরূপে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে রোহিণী গোবিন্দলালকে গিয়া বলিল, সে কলিকাতায় যাইবে না। গোবিন্দলাল চিন্তিত হইল। রোহিণীকে বলিল, "জোর করিবার আমার কোনই অধিকার নাই—কিন্তু গেলে ভাল হইত।" রোহিণী গৃহে ফিরিয়া গেল।

গোবিন্দলাল স্ত্রী ভ্রমরকে বলিল, "আমি রোহিণীকে ভালবাসি না। রোহিণী আমায় ভালবাসে।" গোবিন্দলাল ভ্রমরকে সব কথাই বলিল। ভ্রমর তাহার ঝি ক্ষীরোদাকে দিয়া রোহিণীকে বারুণী পুকুরে সন্ধ্যাবেলা কলসী গলায় বাঁধিয়া মরিতে বলিয়া পাঠাইল। গোবিন্দলালকে বলিল, "ভাবিও না। সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে—সে কি মরিতে পারে?" ভ্রমর গোবিন্দলালকে কত বড় মনে করে এই উক্তিতে তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। রোহিণীও এই গোবিন্দলালকে ভালোবাসিয়াছে। অতএব তাহার পক্ষে আত্মহত্যা করা সহজ নহে। গোবিন্দলালকে হারাইবার কষ্ট ভ্রমর পরবর্তী কালে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিয়াছে।

আমার অসহ্য যন্ত্রণা - অনন্ত সুখ—গোবিন্দলাল রোহিণীকে কলিকাতায় যাইতে বলিয়াছিল, কিন্তু রোহিণীর পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। হরিদ্রাগ্রামে থাকিলে সে গোবিন্দলালকে দেখিতে পাইবে—এই আশা সে বিসর্জন দিতে পারে না। যদিও সে জানে যতবার গোবিন্দলালকে দেখিবে ততবার তাহার প্রেমযন্ত্রণা বাড়িবে, আবার ততবারই তাহার প্রেমহীন দুঃখীজীবনে সুখ অনুভব হইবে। এই আশায় নির্ভর করিয়াই সে কলিকাতায় গেল না।

আশা চোরাবালুর ভিত্তির উপরেও সৌধ গঠিত করে—আকাশ কুসুম দেখিতে পায়। মহাভারতকার দেখাইয়াছেন, যখন ধর্মক্ষেত্রে পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিলেন, আচার্য দ্রোণ দেহরক্ষা করিলেন এবং কর্ণ পতিত

হইলেন, তখনও দুর্যোধন শল্যকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধজয়ের আশায় কার্য করিতে লাগিলেন। কবি গোল্ডস্মিথ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, সেও আশায় নির্ভর করে—

"The wretch condemn'd with life to part
Still, still on hope relies ;
And every pang that rends the heart
Bids expectation rise."

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥ প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে গোবিন্দলাল দিনান্তে বারুণীর তীরবর্তী পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতে গেল। রোহিণীও জল লইতে আসিল। রোহিণীর জলে নামিয়া গাত্রমার্জনা করিবার সম্ভাবনা—দৃষ্টিপথে তাহার থাকা অকর্তব্য বলিয়া গোবিন্দলাল সে স্থান হইতে সরিয়া গেল। এখানে গোবিন্দলালের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ পর গোবিন্দলাল আবার পুষ্করিণীর দিকে গিয়া দেখিল, সেখানে কেহ কোথাও নাই। কেবল একটি কলসী জলে ভাসিতেছে। গোবিন্দলাল তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিল, রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে।

রোহিণীর এই আত্মহত্যার চেষ্টার কারণ সম্পর্কে অনেকে বহু জল্পনা কল্পনা করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, রোহিণী গোবিন্দলালের কল্যাণে গোবিন্দলালের প্রেমে আত্মবির্জন করিতে গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, রোহিণী নীচবৃত্তির কারণে কামনার অপরিসীম জ্বালায় আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল।

আমরা এইসব আলোচনার মধ্যে না গিয়াও বলিতে পারি, পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা রোহিণীর মনের দ্বন্দ্ব দেখিয়াছি। বারুণী পুষ্করিণীর সোপানে ক্রন্দনরতা রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের সহানুভূতির স্পর্শে রোহিণীর জীবনে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। জীবনে সে যাহা পায় নাই, যাহা কখনও পাইবে না, গোবিন্দলালের কাছে সে তাহা পাইয়াছে। আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। অতএব গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর প্রণয়ভাব অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু রোহিণী জানে ইহা অসামাজিক। তাহার এই প্রেম কখনো সফল হইতে পারে না। দারুণ প্রেমজ্বালায় সে ভুগিতেছিল। সে জানিত, মৃত্যু ছাড়া তাহার গতি নাই। তাহার এই আত্মহত্যার চেষ্টাকে আমরা রোহিণীর দ্বন্দ্বময় জীবনেরই স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

তাহার মতো এক সহায়সম্বলহীনা পরিপূর্ণা যুবতী বালবিধবা আর কি করিতে পারিত!

ভ্রমর পাষাণময়ী স্ত্রীমূর্তি অর্ধাবৃতা দেখিয়া কালামুখী বলিয়া গালি দিত—ভ্রমরের কাছে এই মূর্তি অমার্জিত রুচির পরিচয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাহার নারীসুলভ স্বাভাবিক লজ্জাই এই কথায় প্রকাশ পাইয়াছে।

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্দলাল একজন মালীর সাহায্যে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়া রোহিণীকে বাঁচাইল।

রোহিণীর অচেতন রূপের দিকে তাকাইয়া গোবিন্দলালের চোখের জল পড়িল। সে ভাবতেছিল কেন বিধাতা রোহিণীকে এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন তো সুখী করিলেন না কেন? এই সুন্দরীর আত্মহত্যার সে নিজেই যে মূল একথা মনে করিয়া গোবিন্দলালের বুক ফাটিতে লাগিল।

লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরের কপালে লাগিল—জলমগ্ন রোগীর কৃত্রিম নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত করিবার জন্য রোগীর মুখে ফুৎকার দিতে হয়। রোহিণীর সেই "পক্কবিম্ববিনিন্দিত, এখনও সুধাপরিপূর্ণ, মদনমদোন্মাদ-হলাহল-কলসাতুল্য রাঙ্গা রাঙ্গা মধুর অধরে অধর দিয়া" কে ফুৎকার দিবে? গোবিন্দলাল সমস্যায় পড়িল। সে তাহার উৎকলবাসী মালীকে ফুৎকার দিতে বলিল। কিন্তু সে রাজী হইল না। অগত্যা গোবিন্দলাল রোহিণীর ফুল্লরক্ত-কুসুমকান্তি অধরযুগলে নিজের অধর স্থাপিত করিয়া ফুৎকার দিতে লাগিল। সেই সময় হইতেই ভ্রমরের কপাল ভাঙ্গিল। ঠিক সেই সময় ভ্রমরের লাঠি ও বিড়ালের গায়ে না লাগিয়া, নিজের কপালে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুন্দরভাবে ভ্রমরের অকল্যাণের সূত্রপাত দেখাইলেন।

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্দলাল রোহিণীকে বাঁচাইয়া তুলিল। রোহিণীর কাছে এই জীবন অবাঞ্ছিত। সেইজন্য সে গোবিন্দলালকে অনুযোগ করিল, "আমাকে কেন বাঁচাইলেন?" গোবিন্দলাল কি তাহাকে মরিতেও দিবে না! গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়াসক্তির পর হইতে রোহিণীর বাঁচিয়া সুখ ছিল না। এখন মরণেও গোবিন্দলাল বাধ সাধিতে আসিল। রোহিণী তো জীবন্মৃতা ছিল। অতএব "চিরকাল ধরিয়া দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা একেবারে মরা ভাল।" রোহিণী বলিল, "রাত্রিদিন দারুণ তৃষ্ণা,

হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল। কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।" বলা বাহুল্য এই জল গোবিন্দলাল। এই কারণেই সে আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছে।

গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা চাপা দিল। রোহিণীর হৃদয় যন্ত্রণায় আর অগ্নি সংযোগ করিল না। রোহিণী চলিয়া গেল। কিন্তু গোবিন্দলালের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়া গেল। রোহিণীর কথা শুনিতে শুনিতে সে নিজের হৃদয়েও যেন দুর্বলতা অনুভব করিল। এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না তাহা হইলে তাহার এবং ভ্রমরের জীবন পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে। এই পতন হইতে রক্ষার জন্য সে ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাইল।

আমি পাপপুণ্য মানি না—রোহিণী আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল। গোবিন্দলাল বলিল, আত্মহত্যা মহাপাপ। তাহার উত্তরে রোহিণী এই কথা বলিয়াছে। রোহিণীর জিজ্ঞাসা—সে কি পাপ করিয়াছে? কোন্ পাপে সে জীবনে সুখী হইতে পারিল না? এই প্রশ্নের উত্তর নাই। শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রও তাহা দিতে পারেন নাই। কোন পাপ না করিয়াও রোহিণী জীবনের সমস্ত সুখসম্পদ হইতে বঞ্চিতা। সে ভাগ্যহতা, লাঞ্ছিতা, জীবন্মৃতা। পাপ না করিয়াও যখন তাহার এই অবস্থা তখন পাপ করিলে ইহার অধিক কি হইবে? পাপপুণ্য তাহার কাছে সমান অর্থদ্যোতক।

হা নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর—রোহিণী বলিয়াছিল, "আমি মরিব।" রোহিণী বাঁচিয়া গেল। কিন্তু "গোবিন্দলাল সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া...রোদন করিতে লাগিলেন।" গোবিন্দলালের মনে হইল, সে মরিবে,—ভ্রমর মরিবে। কথায় আছে—"Coming events cast their shadows before."

গোবিন্দলাল তখনও মানুষের স্বভাবজাত ভাব বর্জন করিতে পারে নাই। সে জানিত পাপের ফল মৃত্যু। সে কেবল মনে করে নাই—দয়া হইতে মোহ উৎপন্ন হইতে পারে—"Pity melts the mind to love"

গোবিন্দলাল নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছে। পূর্বেও রোহিণী তাহার নিবট প্রণয়াসক্তির কথা বলিয়াছিল। গোবিন্দলাল তখন বলিয়াছিল রোহিণী কলিকাতায় গেলে ভাল করিত। কিন্তু এখন সে যেন এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করিতেছে। সে আকর্ষণ তাহাকে এবং ভ্রমরকে দুইদিকে ছিটকাইয়া ফেলিবে এবং তাহার পরিণাম সুখের হইবে না।

বঙ্কিম সুকৌশলে এখানে ঘটনার পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করিতেছেন। এই-ভাবে তিনি পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিলেন। উৎসুক চিত্তে পাঠক পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করিবে।

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিল। কিন্তু ভ্রমরের কাছে তাহার কারণ বলিল না। বলিলে হয়তো অনেক জটিলতা হ্রাস পাইত। "অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইত। কারণ, অনেক স্থানে দেখা যায়, পুরুষের কুটিল বুদ্ধি যেক্ষেত্রে ব্যাহত হয়, স্ত্রীলোকের সরল বুদ্ধি তথায় উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারে।"

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "রোহিণীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া সেই কথা ভ্রমরের নিকট গোপন রাখা—গোবিন্দলালের এই সতর্কতা উপন্যাসের গতি নির্ধারণে সবাপেক্ষা বেশী সহায়তা করিয়াছে। গোবিন্দলাল-ভ্রমরের জীবনে কোন ট্র্যাজেডি ঘটিত না যদি গোবিন্দলাল বাগানে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত কথা ভ্রমবকে তখনই জানাইতেন।"

ভ্রমর কিন্তু কিছু অঘটন আন্দাজ করিয়াছে। তাহার চেয়ে বেশী গোবিন্দ-লালকে কে জানে? সে বলিল, "আজি তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার কথার আওয়াজে বোধ হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে।" ভ্রমরের অন্তরে যেন অকল্যাণের পূবাভাস দেখা দিয়াছে। তাই সে প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য কাতর হইয়াছে। গোবিন্দলাল তথাপি তাহাকে বলিল না। শুধু বলিল, "তুমি এখন বালিকা, শুনিয়া কাজ নাই।" ভ্রমরকে দুই বৎসর পরে বলিবে কথা দিল।

এখানেই গোবিন্দলালের হিসাবে ভুল হইল। ভ্রমর গোবিন্দলালের সংসারে যতই চঞ্চলা বালিকার ন্যায় দিনাতিপাত করুক না কেন, সে নারী। বয়সে তাহার সহজাত বুদ্ধির পরিমাপ হয় না।

ভ্রমর কিন্তু তাহাকে লঘু বলিয়া ভাবিতে পারিল না। কোন নারীই পারে না। তাহার চোখে জল আসিল। গোবিন্দলাল রাগ করিবে বলিয়া কান্না বন্ধ করিল; কিন্তু তাহার বুকে হঠাৎ যে একখণ্ড কালো মেঘ চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছিল তাহা কিছুতেই দূর হইল না।

॥ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা ভুলিতে পারে নাই। রোহিণীর রূপ তাহার মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তথাপি সে স্থির করিল, "মরিতে হয় মরিব,...তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না"।

তাহার মনে হইল বিষয়কার্যে মনোনিবেশ করিয়া স্থানান্তরে গেলে রোহিণীকে নিশ্চয়ই ভুলিতে পারিবে। সেজন্য পরদিন সকালেই কৃষ্ণকান্তের কাছে গিয়া বিষয়ালোচনা করিতে লাগিল। ঠিক হইল, গোবিন্দলাল মহালে জমিদারি তদারক করিতে যাইবে।

ভ্রমরও যাইবার জন্য আবদার ধরিল কিন্তু গোবিন্দলালের মাতা তাহাকে কিছুতেই যাইতে দিলেন না। অবশ্য গোবিন্দলালও চাপ দেয় নাই। দিলে ঐ পরিবারে কেহ হয়তো নিষেধ করিত না। পরবর্তী কালে ভ্রমরকে পিত্রালয় হইতে আনিবার যখন তোড়জোড় হইতেছে তখন গোবিন্দলালের কথায় সব বন্ধ হইয়া গেল। ইহাতে বুঝা যায় কৃষ্ণকান্তের পরিবারে গোবিন্দলালের মতের বেশ গুরুত্ব ছিল। শেষ পর্যন্ত গোবিন্দলাল একাকী দশ দিনের পথ বন্দরখালি যাত্রা করিল।

গোবিন্দলালের হিসাবে দ্বিতীয়বার ভুল হইল। দূরে গিয়া রোহিণীকে বিস্মরণের চেষ্টা অহেতুক কল্পনা। ভ্রমর সঙ্গে থাকিলে বরং কতকটা সম্ভব হইত। ভ্রমরকে সঙ্গে না লইয়া আরও অনর্থ বাধাইল। ভ্রমর এবং গোবিন্দলালের মধ্যে একটা বিচ্ছেদের প্রাচীর গড়িয়া উঠিবার পথ প্রশস্ত হইল।

॥ বিংশতিতম পরিচ্ছেদ ॥ একা ভ্রমরের কিছুই ভাল লাগে না। সে শয্যা তুলিয়া ফেলিল। পাখা খুলিয়া ফেলিল। আমোদ-আহ্লাদ বন্ধ করিল। খাওয়া বন্ধ করিয়া বলিত, জ্বর হইয়াছে। শাশুড়ী কবিরাজ দেখাইলেন। ভ্রমর কিন্তু ঔষধ খাইল না। জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল।

এতটা বাড়াবাড়ি ক্ষীরি চাকরানীরও অসহ্য ঠেকিল। সে ভ্রমরকে বলিল, "তুমি যাহার জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ তিনি হয়ত হুঁকার নল মুখে দিয়া, চক্ষু বুজিয়া রোহিণীর ধ্যানে মগ্ন।" ভ্রমর গোবিন্দলালকে অবিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার পক্ষে ক্ষীরির কথা অসহ্য বোধ হইল। সে ক্ষীরিকে খুব মারিল। ক্ষীরি তখনও বলিল, সেদিন অনেক রাত্রে রোহিণীকে বাবুর বাগান হইতে আসিতে অনেকেই দেখিয়াছে।

ক্ষীরোদা মার খাইয়া রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ভ্রমর ভাবিতে লাগিল, গোবিন্দলাল কি সেই দিন এই কথাই তাহার কাছে গোপন করিয়াছিল? তথাপি ভ্রমরের মনে গোবিন্দলালের প্রতি কোন অবিশ্বাস নাই।

একবার মাত্র মনে হইল, "তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এমন দুঃখ কি? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে।"

কিছু ভালো লাগে না—ভ্রমর একা—

চিন্তামণি প্রোষিতভর্তৃকার কথায় লিখিয়াছেন—

"হাস্যং পরগৃহে যানং সমাজোৎসবদর্শনম্।
ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্তৃকা॥'

—যাহার পতি বিদেশে গিয়াছে তাহার হাস্য, অন্যগৃহে গমন, সমাজোৎসব দর্শন, ক্রীড়া ও শরীর-সংস্কার বর্জনীয়।

ভ্রমর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' পড়িত। উহার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী' থাকে। তাহাতে প্রোষিতভর্তৃকার লক্ষণ—

"অনল চন্দন চুয়া গরল তাম্বুল গুয়া
কোকিল বিকল করে অতি
বিধবার মত বেশ অস্থিচর্ম অবশেষ..."।
—ইত্যাদি।

আর 'মেঘদূতে' বিরহবিধুরা যক্ষপত্নীর বর্ণনা—শিশিরমথিতা পদ্মিনীর মত প্রবল রুদিতোচ্ছলনেত্রা—

"তৈল বিনা রুক্ষ অলক-কুন্তল
পড়ে আলুথালু কপোল-দেশে
উড়িছে কাঁপিয়ে, পল্লব-কোমল
অধর শুকানো গভীর শ্বাসে॥"

ইহাই বিরহিণী নারীর লক্ষণ। ভ্রমরে এই সকল লক্ষণই প্রকাশ পাইল।

কিন্তু ক্ষীরি প্রভৃতি যাহারা কখনও ভ্রমরের প্রেম দেখে নাই, কখনও তাহা অনুভব করিবার সৌভাগ্যলাভ করে নাই, তাহারা ভ্রমরের বেদনাভিব্যক্তি বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে করিল।

॥ একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ ॥ ভ্রমর ক্ষীরি চাকরানীর রটনা বিশ্বাস করিল না, ইহা ক্ষীরির কাছে অসহ্য বোধ হইল। তখন ক্ষীরোদা বারুণী পুকুরে স্নান করিতে যাওয়া-আসার পথে যাহাকে দেখিল তাহার কাছেই ঐ রটনার কথা বলিল। সে আবার অন্যের কাছে বলিল। এইরূপে একে শূন্য দশ হইল, দশে শূন্য শত হইল, শতে শূন্য সহস্র হইল। "যে সূর্যের নবীন কিরণ তেজস্বী

না হইতে হইতেই, ক্ষীরি প্রথম ভ্রমরের সাক্ষাতে রোহিণীর কথা পড়িয়াছিল, তাঁহার অস্তগমনের পূর্বেই গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল যে, রোহিণী গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা।"

ক্রমে সেই রটনার কথা নানা পল্লবিত হইয়া ভ্রমরের কাছে সংবাদ আসিতে লাগিল। বিনোদিনী, সুরধুনী, রাণী-বাণী কতজন আসিয়া ভ্রমরকে জানাইল যে, ভ্রমর তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিল। কালো কুৎসিতের এত সুখ—অনন্ত ঐশ্বর্য, দেবদুর্লভ স্বামী—গ্রামের লোক হিংসায় মরিয়া যাইতেছিল। সেজন্য সকলেই ভ্রমরের সুখের পরিসমাপ্তি জানাইয়া দিতে আসিল।

ভ্রমরের বিশ্বাসেও ফাটল ধরিল। গোবিন্দলালকে সে সহজে অবিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। "কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে, সকলে বলিবে কেন?" ভ্রমরের মরিবার ইচ্ছা হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদে রটনা-ওস্তাদ চাকরানী সম্প্রদায় এবং হিংসাজর্জর গ্রাম্য সমাজের এক সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

বলি মেজবৌ, বলি বলেছিলুম, মেজবাবুকে অষুধ কর—সহানুভূতি অপেক্ষা সুরধুনার উক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপই বেশী। সে ভ্রমরের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে আসিল। সে ভ্রমরকে বলিল, "পোড়া কপাল! এত লোক শুনিয়াছে—কেবল তুই শুনিস নাই? মেজবাবু যে রোহিণীকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়াছে।"

"ফিরিয়া আসিয়া প্রাণেশ্বর, আমায় গালি দিও না যে, ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে"—গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরের অটল বিশ্বাস টলিয়া যাইতেছে। তথাপি স্বামীর প্রতি তাহার প্রেম পূর্বের মতোই রহিয়াছে। স্বামী তাহাকে আদর করিয়া ভোমরা বলিয়া ডাকিত। সেই ভোমরা এখন মৃত্যুপথাশ্রয়ী। ভ্রমরের এই উক্তির মধ্যে স্নেহশীল অভিমানী চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ ॥ "এখন ভ্রমরেরও যে জ্বালা, রোহিণীরও সেই জ্বালা।" রোহিণীও শুনিল, গ্রামে রাষ্ট্র হইয়াছে, গোবিন্দলাল তাহাকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। রোহিণী ভাবিল ভ্রমরই নিশ্চয় এই রটনার মূলে। "নইলে এত গায়ের জ্বালা কার?" কিন্তু রোহিণী একবারও ভাবিয়া

দেখিল না, ইহাতে রোহিণীর চেয়ে ভ্রমরের দুঃখই বেশী। রোহিণী যে অপরিণামদর্শী তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। যে হরলালকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠে, সে-ই হরলালের এককথায় প্রলুব্ধ হইয়াছিল। সেজন্য মুহূর্তে ভাবিল, "সেদিন চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ। এদেশে আমি থাকিব না। কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব।"

রোহিণীর যে কথা সেই কাজ। সে কোন প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে একখানি বানারসী শাড়ী ও এক স্যুট গিলটির গহনা চাহিয়া লইয়া ভ্রমরকে জ্বালাইতে আসিল। সে অনায়াসে ভ্রমরকে বলিল, লোকে কেন তাহার নামে মিথ্যা কথা বলে। সে তো গোবিন্দলালের নিকট মাত্র তিন হাজার টাকার গহনা আর এই শাড়ীখানি পাইয়াছে। এই বলিয়া ভ্রমরকে অলঙ্কার ও শাড়ী দেখাইল। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়া ভ্রমর সত্যই জ্বলিয়া উঠিল। সে লাথি মারিয়া অলঙ্কারগুলি ফেলিয়া দিল। অলঙ্কারগুলি যে নকল তাহা দেখিবার মতো মনের অবস্থা তাহার ছিল না।

এই পরিচ্ছেদে রোহিণীর অভিনয় লক্ষ্য করিবার মতো। কত সহজে সে মিথ্যা রটনাকে সত্য বলিয়া ভ্রমরকে দেখাইয়া গেল। এমন কি ভ্রমর যখন অলঙ্কারগুলি লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল, তখনও "সোনায় পা দিতে নাই" এই উপদেশ-সুলভ বাক্য দ্বারা তাহাকে অধিক দংশন করিয়া গেল। সাধারণের ধারণা, সোনায় পা দিলে অমঙ্গল হয়। ভ্রমর এক অমঙ্গলের উপর আরেক অমঙ্গলের সূচনা করিতেছে, ইহাই রোহিণীর বক্তব্য।

"আমাদের বড় দুঃখ রহিল"—পরিচ্ছেদশেষে লেখকের মন্তব্য কতখানি যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রণিধানযোগ্য। রোহিণী যে কাজ করিয়াছে, তাহাতে রোহিণীকে না মারার জন্য লেখক দুঃখিত। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব দৃষ্ট হয়।

॥ ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট হইতে অভিযোগের পত্র পাইল। রোহিণী গোবিন্দলালের দেওয়া বস্ত্রালঙ্কার ভ্রমরকে দেখাইয়াছে। রোহিণী যে গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা এই সম্বন্ধে ভ্রমরের কোন সন্দেহ নাই। তাহার ধারণা, এই কারণেই গোবিন্দলাল সেদিন রাত্রে বাগানে কেন দেরী হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারে নাই।

ভ্রমর লিখিয়াছে, "তুমি মনে জান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা--তোমার উপর আমাব বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি, যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমার বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমাব দর্শনে আমাব আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব।"

গোবিন্দলাল কিছুই জানিত না। পত্র পড়িয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সেই ডাকে ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতেও আরেক পত্র পাইয়াছিল। সে লিখিয়াছে, ভ্রমর রাষ্ট্র করিয়াছে, গোবিন্দলাল রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। আরও কত কদর্য কথা রটিয়াছে গোবিন্দলালকে তাহা লিখিতে ব্রহ্মানন্দেব লজ্জা করে। গোবিন্দলাল আরও বিস্মিত হইল। সে কোন অর্থই বুঝিতে না পাবিয়া পরদিনই হরিদ্রাগ্রামে রওনা হইল।

এই চিঠি লেখায় ঘটনার গ্রন্থি জটিল হইল। ভ্রমব এবং গোবিন্দলালের মধ্যে একটা ব্যবধান গড়িয়া উঠিল।

যতদিন তুমি বিশ্বাসী ততদিন আমার বিশ্বাস—ভ্রমরের নিকট হইতে এইরূপ চরম পত্র আসিতে পারে গোবিন্দলাল তাহা কখনো কল্পনা করিতে পারে নাই। আমরাও পারি নাই। সমাজে তখন নারীর ব্যক্তিত্ববোধ দেখা দিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও নারীর ব্যক্তিত্বেব পরিচয় দিয়াছেন। শৈবলিনীর মধ্যে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ আজিকার দিনের মতো নিশ্চয়ই এত প্রখর ছিল না। বর্তমানেও অত্যাধুনিকা ব্যতীত এরূপ পত্র কোন গৃহস্থবধুর নিকট হইতে আশা করা যায় না। ভ্রমরের আট বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছে। নয় বৎসর গোবিন্দলালের সঙ্গে তাহার জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বে দেখিয়াছি, গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল ব্যতীত সে পৃথকভাবে চিন্তাও করিতে পারে না। রোহিণীব প্রতি গোবিন্দলালের অনুরাগের রটনায় সে প্রথম বিশ্বাস করে নাই। পরে রটনার ব্যাপকতায় এবং রোহিণীর চাতুরীতে সে বিশ্বাস করিল। গোবিন্দলালের প্রতি তাহার অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পত্রের এই ভাষা অভিমানের ভাষা নহে। অভিমানে কোন স্ত্রী স্বামীকে লিখিতে পারে—"তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই", একথা বিশ্বাস করা যায় না। বস্তুতঃ ইহা ভ্রমরের চিঠি নহে,

আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের। তাঁহার পক্ষেই লেখা সম্ভব "এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই।" ভ্রমরের পক্ষে নহে।

॥ চতুর্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ ॥ চারদিনের পর গোবিন্দলাল বাড়ী আসিয়া পৌছিল। দেখিল, ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে। তাহার "মনে বড় অভিমান হইল।" মনে মনে ভাবিল, "এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না।" এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে আনাইবার জন্য লোক পাঠাইতে নিষেধ করিল।

মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ?—প্রিয়জন দূরে গেলে তাহার ভালবাসা প্রিয়পাত্রীর প্রতি স্তিমিত হয়। নদীর সম্মিলিত জলধারা যদি শাখা-বিভক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে, সেই বিভিন্নধারা পুনরায় একত্রিত হইতে দেখা যায় না। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ, "যাহাকে ভালবাস, তাহাকে নয়নের আড় করিও না।" এই কথা লিখিবার সময় অবশ্যই বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রয়াগ বা ত্রিবেণীর কথা মনে ছিল না। থাকিলে বুঝিতে পারিতেন, বিচ্ছিন্ন জলধারাও স্থানকালের ব্যবধানে আবার একত্রিত হয়।

ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশে যাইতে দিয়া ভাল করে নাই। গোবিন্দলাল যদি হরিদ্রাগ্রামে থাকিত তাহা হইলে ভ্রমরের এত ভুল হইত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত এবং উভয়ের মধ্যে এই বিচ্ছেদের সুত্রপাত হইত না।

গোবিন্দলালও রোহিণীকে ভুলিবার জন্য এবং বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিবার জন্য বন্দরখালি গিয়াছিল। কিন্তু ঘটনার এমন চক্র পরিণাম যে, ভ্রমরই গোবিন্দলালের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল। ভ্রমর গোবিন্দলালের আসিবার কথা কৃষ্ণকান্তের নিকট হইতে শুনিল; এবং তাহার পত্রানুযায়ী মাতাকে লিখিয়া তাড়াতাড়ি পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। এখানে ভ্রমর দ্বিতীয়বার ভুল করিল। প্রথম ভুল করিয়াছিল গোবিন্দলালকে চরম পত্র লিখিয়া।

এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল!—গোবিন্দলালের নিকট ভ্রমরের পত্র ছিল অবিশ্বাস্য। কিন্তু তাহার পিত্রালয়ে যাওয়া আরও অবিশ্বাস্য। পত্রে যাহাই লিখুক না কেন গোবিন্দলাল ভাবিতে পারে নাই ভ্রমর সত্যসত্যই পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে। সেজন্য বাড়ী ফিরিয়া ভ্রমরকে না দেখিতে পাইয়া গোবিন্দলালের দুর্জয় অভিমান

হইল। তাহার পৌরুষে আঘাত লাগিল। সে যে কাজ করে নাই এবং রোহিণীর আসক্তির প্রশ্রয় না দেওয়ার জন্য সে দূরে সরিয়া গিয়াছিল, তাহাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাহার আগমন সংবাদে পিত্রালয়ে যাওয়া প্রকারান্তরে গোবিন্দলালকে অপমান করারই সামিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে খুবই ভালবাসিত। সেজন্য রোহিণীর প্রণয়াসক্তির কথা শুনিয়া তাহার আনন্দ হয় নাই; তাহার কাছে বিপদ বলিয়াই প্রতীত হইয়াছিল। তাহার মনে হইল, "আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে।" যে ভ্রমরের জন্য তাহার এত চিন্তা সেই ভ্রমর তাহার মুখ দেখিতে চায় না! ইহা গোবিন্দলালের নিকট অসহ্য বোধ হইল। বস্তুত যেখানে প্রেম প্রবল, সেখানে অভিমানও দুর্জয়। তাহার মনে হইল— "যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণ-ধারণ করিতে পারে না?"

কাহিনীর এখনেই চরম ভ্রান্তি। গোবিন্দলালের প্রতি অবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ভ্রমরের নিজ চেষ্টায় পিত্রালয়ে চলিয়া যাওয়ার পর হইতে গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের ভাগ্য পৃথকভাবে নির্ণীত হইয়াছে। ভ্রমর গোবিন্দলালকে পরিত্যাগ করিয়াছে আর গোবিন্দলালের দোলাচল চিত্ত ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য রোহিণীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। এখানে অ্যারিস্টটলের ভাষায় Reversal of situation বা ঘটনার বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়।

একজন সমালোচক বলিয়াছেন, "ইহা শীর্ষস্থানীয় ভ্রান্তি" হইলেও উপন্যাসের 'আদি ভ্রান্তি' হইল রোহিণীকে উদ্ধার করিয়া রোহিণীর অঙ্গস্পর্শ করার কথা ভ্রমরের নিকট গোপন রাখা। আমাদের তাহা মনে হয় না। কারণ মানুষ সবসময় সব কথা বলিতে পারে না। কোন আকস্মিক আঘাতে বা গুরুতর কোন আঘাতে বা গুরুতর কোন ভাব-পরিবর্তনে হৃদয় যখন গুরুভার হইয়া পড়ে, তখন মানুষ নিজেকে লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে চায়। তখন তাহার কথা বলিবার সময় নহে। গোবিন্দলালের তখন সেই অবস্থা। প্রাথমিক চিকিৎসা দ্বারা রোহিণীকে বাঁচাইয়া যখন রোহিণীর নিকট তাহার প্রণয়াসক্তির কথা শুনিল, তখন গোবিন্দলাল নিজেই হতচকিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে যে কি করিবে, কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। কেবল ভগবানকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কাতর আকুতি জানাইল। বাড়ী ফিরিয়াও চিত্তের সেই গুরুভার নামিল না। ভ্রমরের প্রশ্নের উত্তরে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, ভ্রমর সরলা বালিকা। জীবনের সহজ পথেই তাহার গমন। কোন সমস্যা বা সংঘাতের আবর্তের মধ্যে তাহাকে কখনো পড়িতে হয় নাই।

সেই সরলা ভ্রমর তাহার স্বামীর প্রতি রোহিণীর এই আসক্তির কথা কিরূপে গ্রহণ করিবে গোবিন্দলাল তাহা স্থির করিতে পারে নাই। গোবিন্দলাল কেবল বলিল, সে বালিকা, সে এসব কথা বুঝিতে পারিবে না। সেজন্য সে দুই বৎসর পরে বলিবে বলিল। ইহার উদ্দেশ্য কিন্তু ভ্রমরের নিকট রোহিণীর কথা গোপন করা নহে। রোহিণী যে তাহাকে ভালবাসে একথা গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পূর্বেই বলিয়াছিল এবং ইহাও বলিয়াছিল, রোহিণীকে সে ভালবাসে না। অতএব ভ্রমরের কাছে রোহিণী-গোবিন্দলাল প্রসঙ্গ যে অজানা ছিল তাহাও নহে। বস্তুত গোবিন্দলালের সেদিন রাত্রে বোধ হয় ইহাই মনে হইয়াছিল, 'দয়া করিয়া আমায় একটু একা থাকিতে দাও।' সত্য গোপন করিবার জন্য নহে, সত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্যই গোবিন্দলাল সেই রাত্রে অধিক বাক্যালাপে অগ্রসর হয় নাই।

॥ **পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদ** ॥ দুই-চারিদিন গেল। ভ্রমরকে কেহ আনিল না, ভ্রমরও আসিল না। গোবিন্দলাল মনে ভাবিল, ভ্রমর তাহার উপর অবিচার করিয়াছে অতএব তাহাকে একটু কাঁদানো দরকার। এই ভাবিয়া নিজেই কাঁদিল। এখানেই গোবিন্দলালের চরিত্রের রহস্য এবং মাধুর্য। ভ্রমরের সঙ্গে তাহার কলহ গোবিন্দলালের নিকট দুঃসহ। অথচ ঘটনার এমনই পরিস্থিতি যে, ভ্রমর নিজে না আসিলে সে তাহার কাছে হেঁট হইতে পারে না।

সে ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নয় বৎসরের মধুর দাম্পত্য জীবনের পরে তাহা সহজে সম্ভব হইল না। অবশেষে মনে করিল, ভ্রমরকে ভুলিবার প্রকৃষ্ট উপায় রোহিণীর চিন্তা। ঘটনার কি চক্র-পরিণাম! গোবিন্দলাল একদিন রোহিণীকে ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আজ ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য রোহিণীকেই ধ্যান করিতে লাগিল। কিন্তু এ ভুলের জন্য দায়ী গোবিন্দলালের চেয়েও ভ্রমর বেশী। এখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র যে পরিবারের কাহিনী বিবৃত করিতেছেন তাহা একটি জমিদার বংশীয়। সামন্ত চিন্তাধারায় নারীর স্থান পুরুষের সমান নহে। অনেক নীচে। সেজন্য গোবিন্দলাল ভ্রমরের পিত্রালয় যাওয়াকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই ভ্রমরকে ভুলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া সে রোহিণীকে আশ্রয় করিল। সুখকে বিসর্জন দিয়া আপন অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইল।

রোহিণীর জন্য গোবিন্দলালের এই বাসনাও তাহার কাম্য ছিল না। সেজন্য সেদিন বৈকালে বারুণীতটে বসিয়া গোবিন্দলাল এই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিল। বৃষ্টিতে ঘাট পিছল হইয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কে একজন নামিতেছিল, গোবিন্দলাল তাহাকে বারণ করিল। রোহিণী ভিজিতে ভিজিতে উদ্যানে আসিয়া গোবিন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমাকে ডাকিলেন?" গোবিন্দলাল তাহাকে ডাকে নাই। ঘাটে নামিতে বারণ করিয়াছিল।

তারপর রোহিণী গোবিন্দলালের কথোপকথন। গোবিন্দলাল রোহিণীকে ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিল। ভ্রমরের নামে তাহারা কেন দোষ দিতেছে তাহারও কারণ জানিতে চাহিল।

রোহিণী কি উত্তর দিল বঙ্কিমচন্দ্র তাহার বিবরণ দেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন "তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। কেবল এইমাত্র বলিব যে, সে রাত্রে রোহিণী গৃহে যাইবার পূর্বে বুঝিয়া গেল যে, গোবিন্দলাল রোহিণীব রূপে মুগ্ধ।"

নৈয়ায়িক বঙ্কিম শিল্পী বঙ্কিমের হাত টানিয়া ধরিয়াছেন। না হইলে যে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর অধরে অধর রাখিয়া গোবিন্দলালের ফুৎকারের বিবরণ দিয়াছেন তিনি এই কথোপকথনেব বিবরণ দিতে পারিতেন। তাহাতে পাঠকের অন্তত গোবিন্দলাল এবং রোহিণীর চরিত্র বিশ্লেষণের সুবিধা হইত।

॥ ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইল। প্রথম প্রথম তাহার বিবেক এই মোহে বাধা দিয়াছিল। পরে সে ভাবিল মোহের জন্যই রূপ হইয়াছে। ইহাতে দোষ কি? মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে। পৃথিবীর উপরিস্থিত বস্তুর নিম্নগতি যেরূপ ত্বরান্বিত হয় সেইরূপ রোহিণীর রূপের আকর্ষণে গোবিন্দলালের পাপের গতি দ্রুত হইল। গোবিন্দলাল ও রোহিণী ক্রমশঃ একে অপরের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

ভ্রমরের রূপ ছিল না, গুণ ছিল। গোবিন্দলাল সেই গুণে এতদিন তন্ময় ছিল, কিন্তু স্বভাবজ রূপতৃষ্ণা ভ্রমরের অভাবে তীব্রভাবে বাড়িয়া গেল। রোহিণীর অসাধারণ রূপ ছিল। গোবিন্দলাল সে রূপের আবর্তে মুগ্ধ হইল।

কৃষ্ণকান্তের বিষয়বুদ্ধি ছিল সজাগ। রোহিণী ও গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হইয়া ক্রমে কৃষ্ণকান্তের কানে উঠিল। তিনি দুঃখিত হইলেন।

গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক ঘটিলে তাঁহার বড় কষ্ট। স্থির করিলেন, গোবিন্দলালকে তিনি সাবধান করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহার পীড়ার জন্য তিনি বাহিরে যাইতে পারিতেন না। গোবিন্দলাল তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিত, কিন্তু তাঁহার ঘরে এত লোক থাকিত যে তিনি তাহাকে কিছু বলিবার সুযোগ পাইতেন না।

একদিন অনেক রাত্রে বাগান হইতে ফিরিয়া গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্তকে দেখিতে গেল। কৃষ্ণকান্ত বুঝিতে পারিলেন তাঁহার মৃত্যুর আর বেশী দেরী নাই। সেজন্য তিনি ইঙ্গিতে ঘরের অন্যান্যদের সরিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্তের পীড়ার বাড়াবাড়ি দেখিয়া বৈদ্য আনিতে গেল। বৈদ্য আসিয়া কৃষ্ণকান্তকে ঔষধ খাইতে দিল। কৃষ্ণকান্ত ঔষধ ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, ঔষধ অপেক্ষা হরিনামই তাঁহার বেশী শ্রেয়। কৃষ্ণকান্তের দূরদৃষ্টি ছিল। তাঁহার বিচার-বোধ তীক্ষ্ণ। নিজের মৃত্যুও আসন্ন বোধ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতক্ষণ মিয়াদ ?"

কৃষ্ণকান্ত বুঝিলেন তাঁহার সময় হইয়াছে। অথচ গোবিন্দলালকে তাহার চরিত্র সংশোধনের জন্য উপদেশ দেওয়ারও সময় এবং সুযোগ পাইলেন না। তখন তিনি গোবিন্দলালকে উইল বাহির করিতে বলিলেন এবং তাহার সম্মুে উইল সংশোধন করাইলেন। তাঁহার সম্পত্তির যে অর্ধাংশ গোবিন্দলাল পাইবে তাহাতে গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া ভ্রমরের নাম লিখিলেন—"ভ্রমরের অবর্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্ধাংশ পাইবে।"

তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন, গোবিন্দলালের অধঃপতনের কথা জানিয়াও তিনি কিছু করিতে পারেন নাই। উইল সংশোধনের দ্বারা গোবিন্দলালকে নিজের অভিপ্রায় জানাইবেন। গোবিন্দলাল এবং ভ্রমর অভিন্ন। ভ্রমরের হাতে সম্পত্তি দিয়া গোবিন্দলালকে সংশোধন করাইবেন।

সকলে বিস্মিত হইল। মুহুরী গোবিন্দলালের ইচ্ছা জানিতে চাহিল। গোবিন্দলালের কর্তব্যবুদ্ধি—স্নেহশীল পিতৃব্যের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা সেই মৃত্যুর ছায়া-গম্ভীর কক্ষে আত্মপ্রকাশ করিল। সে পিতৃব্যের স্বাক্ষরান্তে আপনি "উপযাজক হইয়া উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিল।" কৃষ্ণকান্ত বোধ হয় গোবিন্দলালের আচরণে :জীবনের শেষ সময়ে আশায় সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

ঔষধের অপেক্ষা হরিনামে আমার উপকার—কৃষ্ণকান্ত সকলকে হরিনাম করিতে বলিয়া মহাযাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন। যেন বলিতেছিলেন—

"Twilight and evening bell,
And after that the dark !
And may there be no sadness of farewell,
When I embark !"

সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে তুলসীতলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোক গমন করিলেন : যেন,

"Nothing in his life,
Became him like the leaving it ; he died
As one that had been studied in his death
To throw away the dearest thing he owed
As 'twere a careless trifle."

যিনি জীবনে কখনও অধর্ম করেন নাই, মৃত্যুতে তাঁহার ভয় কি ? রামপ্রসাদ কালীকে বলিয়াছিলেন—"প্রাণ যাবার বেলা এই করো, মা, যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে।" তিনি মা'র দুরন্ত ছেলে—কিন্তু "আমি শান্ত হব যখন আমায় শান্ত ক'রে লবে কোলে।"

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুতে সত্যই একজন দিকপালের কার্য শেষ হইয়াছিল।

॥ **সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ** ॥ কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুতে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগিল। ভ্রমরকেও অগত্যা আসিতে হইল। গোবিন্দলাল এবং ভ্রমরের প্রথম সাক্ষাৎ শোক-ক্রন্দনের মধ্যেই কাটিয়া গেল। তাহার পরও দুজনেই ভাবিল, এসময়ে গোলযোগ করিয়া কাজ নাই। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিল, "ভ্রমর, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে। কথাগুলি বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে।" গোবিন্দলাল শ্রাদ্ধের পর তাহা বলিবে বলিল। ভ্রমরও পরে তাহার যাহা বলিবার আছে বলিবে বলিল।

আর কোন কথা হইল না। গোবিন্দলাল এবং ভ্রমরের মধ্যে সে সম্পর্ক আর নাই। আগে দুইজনকে পৃথক দেখা যাইত না। এখন দুইজন একসঙ্গে থাকিতে চাহে না। উভয়ের হৃদয় এখন অন্ধকারময়। গোবিন্দলাল সে

অন্ধকারে আলো করিবার জন্য ভাবিত রোহিণী, আর ভ্রমর সে ঘোর অন্ধকারে আলো করিবার জন্য ভাবিত—যম!

এই পরিচ্ছেদেও ভ্রমরের চরিত্র স্বাভাবিক নহে। সে না-হয় অভিমান বশে পিত্রালয়ে গিয়াছিল। সেখানে স্থান কালের ব্যবধানে মাতা এবং দিদি প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তাহার সেই ভ্রম দূর হওয়া উচিত ছিল। সে গোবিন্দলালকে দেখিয়া কেবল কাঁদিল। কেন? সে তো বলিতে পারিত, 'আমি না-হয় অল্পবুদ্ধিবশত রাগের মাথায় পিত্রালয়ে গিয়াছি, সেজন্য কি তুমি আমায় ত্যাগ করিবে?' পিত্রালয়ে যাওয়ায় যে তাহার ঘাট হইয়াছে এ-কথা সে পরে স্বীকার করিয়াছে। গোবিন্দলালকে কাশী হইতে ফিরিয়া আসিবার জন্য কাকুতি মিনতি করিয়াছে। প্রথম দর্শনে করিল না কেন? তাহাই তো স্বাভাবিক ছিল। তাহা হইলে গোবিন্দলালের মনও নিশ্চয়ই নরম হইত। আমাদের সংসারে নারীই তো হাল ধরে। তাহাকে নানা মানুষের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে হয়। ভ্রমরের মধ্যে সেই মানাইয়া চলার ইচ্ছা কোথায়? সে যদি তাহার জেদের বশবর্তী হইয়া থাকে তবে সামন্ত রক্ত প্রবাহিত জমিদারবংশের ছেলের জেদ হইবে না কেন?

সর্বাপেক্ষা ভ্রমর : কৃষ্ণকান্তের পরিবারে ভ্রমরের বিশিষ্ট স্থান ছিল। কৃষ্ণকান্ত পিতৃহীন গোবিন্দলাল এবং ভ্রমরকে নিজের পুত্র-কন্যা হইতে বেশী ভালবাসিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরলাল তো অবাধ্য। বিনোদলাল এবং শৈলবতীরও উপন্যাসে কোন বিশেষ স্থান নাই। সেজন্য কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুতে ভ্রমরের কথাই সর্বাগ্রে সকলের মনে পড়িল।

বঙ্কিমের বর্ণনাকৌশল এখানে অনবদ্য। সামান্য একটি কথায় গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মধ্যে যে ব্যবধান গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার স্পষ্ট চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন।

॥ অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভারি শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। উইল পড়ার যন্ত্রণাও শেষ হইল। গোবিন্দলাল আসিয়া ভ্রমরের কাছে উইলের কথা বলিল। ভ্রমর অবশ্য তাহার নামে সম্পত্তির মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করিল না, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা সহজভাবে লইতে পারিল না। স্ত্রীর বিষয় সে ভোগ করিবে না। কারণ, পূর্বে হইলে হয়ত গোবিন্দলাল কিছু মনে করিত না; বর্তমানে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ হইয়াছে।

ভ্রমর গোবিন্দলালের আগমনের সংবাদ শুনিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল। সে তাহার ঐ ত্রুটির জন্য গোবিন্দলালের কাছে ক্ষমা চাহিল। কিন্তু তখন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দলালের জীবনে হতাশা এবং ব্যর্থতাবোধ দেখা দিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের ভালোর জন্য উইল সংশোধন করিয়াছিলেন, কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। গোবিন্দলাল জ্যেষ্ঠতাতের সম্মুখে কিছু না বলিলেও তাহাকে ভালো মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার আদরের ভ্রমর, "খেলিবার পুতুল" ভ্রমর তাহার কোন কথা না শুনিয়া তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছে। তাহার মুখদর্শন করিবে না বলিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। এখন সেই ভ্রমরেরই দানের প্রত্যাশায় জীবন ধারণ করিতে হইবে। ইহা তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইল। তাহা ছাড়া, এতদিন সে ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য রোহিণীর রূপের ধ্যান করিয়াছে। ভ্রমরকে ভুলিতে কষ্ট হইয়াছে। এখন রোহিণীব রূপই তাহার কাছে শ্রেয়। গোবিন্দলালের কাছে তাহার জীবনের মূল্য-বোধ কমিয়া গিয়াছে। সে ভ্রমরকে বলিল, "আমার এ অসার, এ আশাশূন্য প্রয়োজনশূন্য জীবন, ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা সেই দিনই ভাঙ্গিয়া কেলিব।"

ভ্রমর তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল। কিন্তু অনেক দুঃখ, অনেক গ্লানি, এবং অনেক চোখের জলে গোবিন্দলালের জীবনের প্রতি ধিক্কার জাগিয়া উঠিল। সে ভ্রমরকে বলিল, "আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।" ভ্রমর বাহিরে যাইবার সময় মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভারি শ্রাদ্ধ হইয়া গেল : বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, —"শত্রুপক্ষ যে রটাইয়াছিল, পাঁচ, সাত বা দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা সত্য নহে, মিত্রপক্ষ যে বলিয়াছিল লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহাও অসত্য। প্রকৃত ব্যয় ৩২ হাজার ৩ শত ৫৬ টাকা ও কয় আনা। তখনকার ৩২ হাজার টাকা আজিকার দিনে অনেক অধিক সন্দেহ নাই। পূর্বে ধনীদিগের পরিবারে শ্রাদ্ধই সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল হইত। তাহার অনেক কারণ ছিল। প্রথম কারণ, মৃতের পারলৌকিক সুখ-শান্তি বিধানের ধারণা। ইহকালের আদর্শে মানুষ পরকালের কল্পনা করে। মিশরে বহুকাল পূর্বে রচিত সমাধি-মন্দিরে ঐশ্বর্যের যে পরিচয় আজ লোককে স্তম্ভিত করিতেছে, তাহা মৃতের পরলোকে কাজে লাগিবে, এইরূপ বিশ্বাসেই সে সকল সমাধিতে শবের সঙ্গে

প্রদত্ত হইত। এই বাংলায় পাঞ্জাব হইতে আগত ব্যবসায়ী—বর্ধমানের জমিদার পরিবারের 'সমাধি' গঙ্গার তীরে কালনায় অবস্থিত ; এক-একজনের এক-একটি সমাধি—প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে ভোগের সব ব্যবস্থা। আবার বিবাহে যে বাঁধা রোশনী অর্থাৎ আলোক-সজ্জা, বাদ্য, শোভাযাত্রা নগরে সম্ভব, গ্রামে তাহা সম্ভব ছিল না—এখনও নাই, কিন্তু গ্রামে শ্রাদ্ধে ঘটা হইত। আবার শ্রাদ্ধের একটি বড় অঙ্গ ছিল ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত 'বিদায়'। ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই 'বিদায়' পাইতেন ; সেজন্য বিশেষ পত্রের প্রয়োজন হইত না—উপস্থিত হইলেই হইত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "মদের দোকান বন্ধ হইল, সব মাতাল টিকি রাখিয়া নামাবলী কিনিয়া, উপস্থিত পত্রে বিদায় লইতে গিয়াছে।" ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের তখন বিশেষ সম্মান ছিল। গল্প আছে, নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের পত্নী দারিদ্র্য হেতু অলঙ্কারের অভাবে প্রকোষ্ঠে লাল সূতা সধবার চিহ্ন ('আয়তি') রূপে ব্যবহার করিতেন। নবদ্বীপে গঙ্গাস্নানে যাইয়া তাহা দেখিয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নীকে হাসিতে দেখিয়া পণ্ডিত-গৃহিণী বলিয়াছিলেন—"জানিও, যেদিন এই সূত্র ছিন্ন হইবে, সেইদিন তোমার স্বামীর নবদ্বীপ অন্ধকার হইবে।" নবদ্বীপ তখন "ভারতীয় রাজধানী—ক্ষিতির প্রদীপ।" সমারোহ সহকারে যে সকল শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইত, সে সকল শ্রাদ্ধে কাশী প্রভৃতি বিদ্যাকেন্দ্র হইতেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। যে 'বিদায়' পাইতেন, তাহাতেই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া কেবল বিদ্যালোচনা করিতেন না, অকাতরে ছাত্রদিগকে বাস ও আহার্য পর্যন্ত দিয়া বিদ্যাদান করিতেন। ইহা হিন্দুর বিদ্যার আদরের পরিচায়ক। তদ্ভিন্ন দরিদ্রদিগকে আহার্য ও অর্থপ্রদান প্রভৃতি ছিল। আর আপনার গর্ব প্রকাশও যে ছিল না, তাহাও বলা যায় না। কথিত আছে কলিকাতা শোভাবাজারের দেব পরিবারের রাজা নবকৃষ্ণ ইংরেজের শাসন প্রবর্তন-কালে "অল্পদিন চাকরী করিয়া নয় লক্ষ টাকা মাতৃশ্রাদ্ধে খরচ করিয়াছিলেন।" ১২৮৯ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গদর্শনে' তৎকালে প্রচলিত জনরব অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছিল। কথিত আছে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ চারি বৎসর বোর্ডের দেওয়ানী করিয়া আড়াই কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'কবি গানে' শোনা যাইত :

> "মহিষের সিং, হরিণের সিং, তারে কি বলি সিং।"
> সিং-এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ—দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং।"

তাঁহার মাতৃ-শ্রাদ্ধে তৈলের পুষ্করিণী করিয়া তাহাতে তৈল রাখা হইয়াছিল

—জনরব আছে। ইহা—যাহা আজ আর নাই—তাহারই চিত্র-স্মারক—"দিনকতক মাছির ভন্‌ভনানিতে, তৈজসের ঝন্‌ঝনানিতে, কাঙ্গালীর কোলাহলে, নৈয়ায়িকের বিচারে, গ্রামে কান পাতা গেল না।" সে গ্রামও আর নাই, সে মনোভাবও আর নাই। এ যেন সেই

"দেখে এলাম শ্যাম
তোমার বৃন্দাবনধাম—
কেবল নাম আছে।"

উইলের কথা শুনিয়াছ: গোবিন্দলাল এবং ভ্রমর পরস্পর পরস্পরকে বলিয়াছিল, উভয়েরই কিছু কথা বলিবার আছে; শ্রাদ্ধের পর তাহা বলিবে। তাহা বলা হইয়াছে কিনা বঙ্কিমচন্দ্র তাহার বিবরণ দেন নাই। শ্রাদ্ধের পর উভয়ের মধ্যে এই প্রথম আলাপ আমরা দেখিতে পাই। শ্রাদ্ধের পর উইল পড়ার যন্ত্রণা শেষ করিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল এই কথা বলিল। কথা বলিবার ভঙ্গী লক্ষণীয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কতখানি ফাটল ধরিয়াছে ইহার মধ্যে তাহা স্পষ্ট। গোবিন্দলালের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে।

তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না: গোবিন্দলালের নিকট কৃষ্ণকান্তের উইল অজানা ছিল না। উইল সে লিখিবার সময়েই পড়িয়াছিল, তাহাতে স্বাক্ষরও দিয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে উইল পঠিত হইবার পরে আসিয়া ভ্রমরকে বলিল,—"তোমার অর্ধাংশ।" "তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।" বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন কৃষ্ণকান্ত উইলে ভ্রমরকে সম্পত্তির অর্ধাংশ দিয়া ভুল করেন নাই—ভুল সংশোধন করিয়াছিলেন। তিনি দুইটি ভুল করিয়াছিলেন; —প্রথম, গোবিন্দলালের কথার অপেক্ষা না রাখিয়া গোবিন্দলালের জমিদারী হইতে ফিরিবার দিনই ভ্রমরকে আনিতে পাঠান নাই; তিনি পরিবারের কর্তা, গোবিন্দলাল তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না—সে প্রতিবাদের ফল হরলাল ভোগ করিয়াছিল। দ্বিতীয়—যখন রোহিণীর নামের সঙ্গে গোবিন্দলালের নাম জড়িত হইয়া জনরব রটিত হইতেছিল, তখন তিনি গোবিন্দলালকে ডাকিয়া সতর্ক করিয়া দেন নাই—ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া তিরস্কার করেন নাই। তিনি সেই ভুল সংশোধন করিবার অভিপ্রায়েই উইলের পরিবর্তন করিয়া—গোবিন্দলাল ও ভ্রমর অভিন্ন জানিয়া ভ্রমরকে সম্পত্তিতে জীবন-স্বত্ব দিয়াছিলেন। "মক্ষিকাঃ ব্রণমিচ্ছন্তি"—সেইজন্য রোহিণীর রূপে মুগ্ধ গোবিন্দলাল যেমন ভ্রমরের পিত্রালয়ে গমনে তাহার অপরাধ সন্ধান

করিয়াছিল, তেমনি কৃষ্ণকান্তের উইলের ব্যবস্থায় ত্রুটির সন্ধান পাইল। সে মনকে বুঝাইল, যে পিতৃব্য তাহার পিতার অধিক ছিলেন, তিনি তাহাকে অপমান করিয়া গিয়াছেন—স্ত্রীর অন্নদাস করিয়া গিয়াছেন।

আমার এ অসার, আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব: গোবিন্দলালের যে কী পরিবর্তন হইয়াছে তাহা এই উক্তির মধ্যে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। তাহার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখা দিয়াছে। তাহার জীবনের মধ্যমণি ভ্রমর তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার একান্ত ভরসা পিতার অধিক পিতৃব্যও তাহাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া অপমানিত করিয়াছেন। কৃষ্ণকান্ত রায়ের পরিবারে কৃষ্ণকান্তের অবর্তমানে যে গোবিন্দলালেরই আসন ছিল, সেই গোবিন্দলালের এই সংসারে কোন স্থান নাই। স্ত্রীর অন্নদাস হইয়া, ভ্রমর পরিত্যক্ত হইয়া এবং রোহিণীর কলঙ্ক মাথায় লইয়া গোবিন্দলাল নায়েব গোমস্তা এবং প্রজাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। ইহা হইতে তাহার অধিক ব্যর্থতা কী হইতে পারে? বর্তমানে সে তাহার জীবনের কোন মূল্য, কোন আশা এবং কোন প্রয়োজন দেখিতে পাইল না। নিজেকে সে তুলনা করিল মাটির ভাণ্ডের সহিত। মাটির ভাণ্ডের কী মূল্য আছে! তাহা ভঙ্গুর। প্রয়োজনশেষে তাহা ভাঙিয়া ফেলা হয়। জীবনের এই হতাশা এবং বিতৃষ্ণা হইতে গোবিন্দলাল পাপের পথে দ্রুত পা বাড়াইল। শরৎচন্দ্রের দেবদাস হতাশায় মদ ধরিয়াছিল জীবন শেষ করিতে আর গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপ-মদে নিজেকে নিঃশেষ করিতে স্থির সংকল্প করিল। এইখানেই গোবিন্দলালের ট্র্যাজেডি।

॥ **ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ** ॥ ভ্রমর ভাবিল, সে কি অপরাধ করিয়াছে যে, গোবিন্দলাল তাহাকে ত্যাগ করিবে। কিন্তু গোবিন্দলালকে সে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

গোবিন্দলালের মনে স্থির ধারণা ভ্রমর অপরাধ করিয়াছে। কিন্তু তাহা কি সে ততটা ভাবিয়া দেখে নাই। "ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হইত, ভ্রমর যে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছিল, অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে এত কঠিন পত্র লিখিয়াছিল—একবার তাঁহাকে মুখে সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিল না এই তাহার অপরাধ। যার জন্য এত করি, সে এত সহজে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, এই তাহার অপরাধ।"

গোবিন্দলালের হৃদয়ে সুমতি কুমতির দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তবে ভ্রমরের দানে বাস করিবে না ইহা নিশ্চিন্ত জানিল।

।। **ত্রিংশ পরিচ্ছেদ** ।। গোবিন্দলালের মাতা পাকা গৃহিণী ছিলেন না। "তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বধুর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে।" কিন্তু সেই বিচ্ছেদ দূর করিবার তিনি বিশেষ চেষ্টা করিলেন না, বরং পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের উপরে একটু বিদ্বেষাপন্নও হইয়াছিলেন। পুত্রবধূর সংসারে গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী হইয়া থাকিবেন না স্থির করিলেন। গোবিন্দলালকে বলিলেন তাঁহাকে কাশী পাঠাইয়া দিতে। গোবিন্দলালও রাজী হইল। সে নিজেই তাঁহাকে কাশী রাখিয়া আসিবে।

এই সময় ভ্রমর আবার পিত্রালয়ে গেল। গোবিন্দলাল নিজের যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল সব বিক্রয় করিয়া প্রায় চার লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিল। কাশীযাত্রার দিন স্থির করিয়া গোবিন্দলালের মাতা ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইলেন। ভ্রমর আসিয়া শাশুড়ীকে যাইতে নিষেধ করিয়া কান্নাকাটি করিল। শাশুড়ী বলিলেন, "তোমার বড় ননদ রহিল। সেই তোমাকে আমার মত যত্ন করিবে—আর তুমিও গৃহিণী হইয়াছে।"

ভ্রমর দেখিল বড় বিপদ। শাশুড়ী চলিলেন। স্বামী তাঁহাকে রাখিতে চলিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিল, তাহার আর ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই, কারণ এখানে ভ্রমরের অন্নদাস হইয়া সে থাকিতে চাহে না। ভ্রমর অবশ্য বলিল, সে তাহার দাসানুদাসী। গোবিন্দলাল তাহা মনে করে না। কারণ, "আমার দাসানুদাসী—ভ্রমর আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানালায় বসিয়া থাকিবে। তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না।" এখানে উল্লেখযোগ্য ভ্রমর একবারও রোহিণীর কথা উল্লেখ করিল না। কেবল বলিল, তাহার অপরাধ হইয়াছে। গোবিন্দলাল বলিল, ভ্রমর এখন বিষয়ের অধিকারিণী। এখন এইরূপ শত অপরাধ হইবে।

তখন ভ্রমর এবার পিত্রালয়ে গিয়া গোবিন্দলালের নামে যে দানপত্র রেজেষ্ট্রি করিয়া আনিয়াছিল তাহা দেখাইল। গোবিন্দলাল পড়িয়া বলিল, "তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ। কিন্তু তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে। তুমি বিষয় দান করিবে, আমি ভোগ করিব—এ

সম্বন্ধ নহে।" গোবিন্দলাল দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল। গোবিন্দলালের এই উক্তি লক্ষ্য করিবার মত। তাহার বক্তব্য হইল, স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক কেবলমাত্র সাংসারিক দেওয়া-নেওয়ার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সেই সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য অন্যত্র।

গোবিন্দলাল যেন আরও বিতৃষ্ণ হইল। তাহার মনোভাব তখন বেপরোয়া। সে তাহার ধর্ম বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। ভ্রমর তখন বলিল, "যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব।"

গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, ইত্যাদি : কৃষ্ণকান্তের যৌথ পরিবার। এই বিরাট পরিবারে রোহিণী-গোবিন্দলালকে লইয়া বিরাট ঝড় বহিয়া গেল—গোবিন্দলাল-ভ্রমরের আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে—গোবিন্দলাল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, অথচ ঐ পরিবারের কেহ কোন চেষ্টা করিল না, ইহা অস্বাভাবিক। সকলেই যেন নীরব সাক্ষী। বঙ্কিমচন্দ্র সকলকে পর্দার অন্তরালে রাখিয়াছেন। গোবিন্দলালের মাতাকে আনিলেন সেই বিচ্ছেদকে দূর করিবার জন্য নহে, তাহাকে আরও দৃঢ় করিবার জন্য। তিনি ভ্রমরের উপর রাগ করিয়া কাশীবাসিনী হইলেন। অবশ্য পুত্র থাকিতে পুত্রবধূকে সম্পত্তি দিয়া গেলে যে-কোন মাতারই বীতরাগ হওয়া স্বাভাবিক।

তুমি পুত্রের কাজ কর : মাতার কাশীবাসের এই ইচ্ছায় গোবিন্দলালও সংসার এবং ভ্রমরকে ত্যাগ করিবার সুযোগ পাইল।

তোমার বড় ননদ রহিল : এই বড় ননদ কে? গোবিন্দলালের আপন ভগ্নী না শৈলবতী? এই অসঙ্গতির কথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে বক্তব্য, বড় ননদ সংসারে বর্তমানে থাকিতেও ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গেল, ভ্রমর-গোবিন্দলালের বিচ্ছেদ ঘনীভূত হইল। রোহিণী-গোবিন্দলালের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইল। ইহা স্বাভাবিক বলিয়া ধরা যায় না। বড় ননদের নিশ্চয়ই তাহার প্রভাব বিস্তার করা উচিত ছিল।

আমি তোমার আশ্রিত বালিকা : এই কথা ভ্রমর পূর্বে বলে নাই কেন? রাগের বশে পিত্রালয়ে গিয়াছিল; কিন্তু রাগ পড়িয়া গেলে ফিরিয়া আসিতে পারিত। আসিয়া রোহিণীর প্রসঙ্গ গোবিন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত। আশ্চর্য যে এই ভ্রমরই গোবিন্দলালকে কঠোর পত্র লিখিয়াছিল।

অথচ সাক্ষাতে সে গোবিন্দলালের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই করিল না। গোবিন্দলাল কিন্তু বার বার ভ্রমরের বিরুদ্ধে তাহার বক্তব্য বলিয়াছে। ভ্রমর একবারও বলে নাই। কেবল পরিচ্ছেদ শেষে বলিয়াছে "তুমি আমারই—রোহিণীর নও।" ইহার মধ্যে নাটকীয়তা থাকিতে পারে, স্বাভাবিকতা নাই। সমালোচকেরা গোবিন্দলালের দুষ্কৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের পরিবারে ভ্রমর, কৃষ্ণকান্ত বা গোবিন্দলালের মাতা কেহই তাহা বলে নাই। গোবিন্দলাল জানিবার কোন সুযোগই পায় নাই, কি তাহার অপরাধ।

॥ **একত্রিংশতম পরিচ্ছেদ** ॥ এই ঘটনাংশ আরম্ভ হওয়ার কিছু পূর্বে ভ্রমরের সাতদিনের ছেলে সূতিকাগারেই মারা গিয়াছিল। স্বামী পরিত্যক্তা ভ্রমর আজ সেই মৃত পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস পুত্র বাঁচিয়া থাকিলে গোবিন্দলাল এমন করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত না। ভ্রমরের মায়া ত্যাগ করিতে পারিলেও গোবিন্দলাল নিশ্চই পুত্রের মায়া ত্যাগ করিতে পারিত না।

এদিকে গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ীর বাহির হইয়া আসিল। তাহার মধ্যে তখন অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। ভ্রমরের সঙ্গে তাহার মধুর জীবনের কথা মনে পড়িল। কিন্তু ফিরিয়া যাইতেও তাহার পৌরুষে বাধিল। ভাবিল, "যাহা করিয়াছি, তাহা এখন আর ফিরে না—এখন ত যাই।"

ঘোড়ায় চড়িয়া সে বাহির হইয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হৃদয়মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।

এখন যাই, বুঝি আর ফেরা হইবে না : গোবিন্দলাল ভ্রমরকে অপরাধী জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু বাড়ীর বাহিরে পা দিয়াই তাহার মনে দ্বিধা দেখা দিয়াছে। ভ্রমরের অমূল্য প্রীতির কথা তাহার মনে পড়িয়াছে। মনে হইল ফিরিয়া যাই। এখানেই গোবিন্দলালের চরিত্রের মহত্ত্ব। তাহার শাসনের মধ্যে সোহাগ আছে। কৃতকার্যের জন্য অনুশোচনা আছে। তথাপি এক দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি যেন তাহাকে চালিত করিতেছে। শুভ হইতে অশুভের দিকে তাহাকে ঠেলিয়া দিতেছে। সেই গতি রোধ করিবার সে চেষ্টা করিয়াছে। রোহিণীর চিন্তাকে সে প্রশ্রয় দেয় নাই।

রোহিণীর আসক্তির প্রশ্রয় দিলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য গোবিন্দলাল তাহা জানে। সেজন্য রোহিণীর কথা সে ভাবে নাই। কিন্তু ঘটনার এমনই চক্রপরিণাম—প্রাক্তনের এমনই গতি—গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপেই আকৃষ্ট হইল। রোহিণীকে ধ্যান করিল। এখানেই গোবিন্দলাল চরিত্রের ট্র্যাজেডি।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্দলাল নির্বিঘ্নে মাতাকে লইয়া কাশী পৌঁছিল। দুই এক মাস পরে গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাড়ীর দিকে রওনা হইল। ভ্রমর বুঝিল, গোবিন্দলাল মাকে ভুলাইয়া অন্যত্র গিয়াছে।

এদিকে রোহিণী ক্রমে পীড়িতা হইল। একটু সারিল, কিন্তু শূলরোগের মূল যায় নাই। রোহিণী আরোগ্যের জন্য তারকেশ্বরে হত্যা দিতে গিয়াছে। সে-ও ফিরিল না।

ভ্রমর শাশুড়ীকে পত্র লিখিয়া প্রথমে জানিল, গোবিন্দলাল প্রয়াগ, মথুরা, জয়পুর, দিল্লী প্রভৃতি জায়গায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। কোথায়ও স্থায়ী হইতেছে না। পরে শাশুড়ীও আর গোবিন্দলালের সংবাদ পান না।

এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল। শেষদিকে ভ্রমর রোগে পড়িল।

আমার মনের সন্দেহ আমি পাপমুখে ব্যক্ত করিব না: গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর ভ্রমর গোপনে রোহিণীর সংবাদ লইত। তাহার সন্দেহ হইয়াছিল, গোবিন্দলাল এবং রোহিণী একত্র বাস করিবে। প্রথমে রোহিণী হরিদ্রাগ্রামেই ছিল। পরে তারকেশ্বরে হত্যা দিবার জন্য একাই গিয়াছে আর ফিরে নাই। এদিকে গোবিন্দলালও নিরুদ্দেশ। ভ্রমরের নিশ্চিত ধারণা হইল, নিরুদ্দিষ্ট গোবিন্দলাল এবং রোহিণী একই উদ্দেশ্যে গোপনে কোথাও বাস করিতেছে। ভ্রমরের সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়াছে। একথা সে প্রকাশ করে কি করিয়া? তাহার স্বামী অন্য রমণীতে আসক্ত এবং তাহাকে লইয়া কোন গোপন স্থানে একত্র বাস করে এই কথা স্ত্রী হইয়া সে কিরূপে বলিবে? ভ্রমরের এই আশঙ্কা প্রথম হইতেই ছিল। সেজন্যই সে উভয়ের সংবাদ রাখিবার জন্য নানা চেষ্টা করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র অতি সংক্ষেপে এক বৎসরের ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে

নিশ্চয়ই গোবিন্দলাল এবং রোহিণীর মধ্যে পত্রালাপ হইয়াছিল, গোপনে সংবাদ আদান-প্রদান হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সব খুঁটিনাটি বর্ণনার মধ্যে যান নাই। পাপ-চরিত্রের বর্ণনায় তাঁহার একটি স্বাভাবিক বিরূপতা আছে। সেজন্য অতি প্রয়োজনীয় ঘটনার উল্লেখের মধ্য দিয়া কাহিনীর দ্রুতগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

॥ **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ**॥ ভ্রমরের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তাহার পিতা মাধবীনাথ ভ্রমরকে দেখিতে আসিলেন। মেয়ের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার চোখে জল আসিল। মাধবীনাথ যেমন সুপুরুষ তেমনই চতুর ছিলেন। সাধারণত দুষ্ট লোক বলিয়াই তিনি পরিচিত ছিলেন।

ভ্রমর তাহার পিতাকে বলিল, তাহার দিন বোধ হয় আর বেশী নাই। তাহার প্রচুর অর্থ। অতএব মাধবীনাথ ছাড়া কে তাহাকে ধর্মকর্ম করাইবে? মাধবীনাথের কাতরতা ক্রমে ক্রোধে রূপান্তরিত হইল। তিনি স্থির করিলেন তাঁহার কন্যার যে সর্বনাশ করিয়াছে তিনি তাহার সর্বনাশ করিবেন। তিনি ভ্রমরকে সান্ত্বনা দিলেন। একটু শরীর সারিলেই ব্রত নিয়ম করাইবেন বলিলেন।

মাধবীনাথ গোবিন্দলালের সংবাদ লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দেওয়ানজীরাও তাহার কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। দেওয়ানজী বলিল, "বাবুর এখন অজ্ঞাতবাস।"

সেই মর্মভেদী দুঃখ মাধবীনাথের হৃদয়ে ঘোরতর ক্রোধে পরিণত হইল: বিষয়ী লোকের এমনই হইয়া থাকে। প্রতিহিংসা অনেক সময় কার্যের উৎস হয়। যে স্নেহের বা ভালবাসার বা শ্রদ্ধার পাত্র তাহার লাঞ্ছনাকারীর উপর প্রতিশোধ লইবার বাসনা অবশ্যম্ভাবী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "অহিংসা ভাল, নির্বৈর বড় কথা, কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে নহে—কেহ গণ্ডে একবার চপেটাঘাত করিলে তাহাকে দশবার চপেটাঘাত করা গৃহস্থের ধর্ম।" "প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প তখন মাধবীনাথকে দুঃখে ত্যাগ করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত করিল।"

॥ **তৃতীয় পরিচ্ছেদ** ॥ মাধবীনাথ বুঝিলেন, গোবিন্দলাল ও রোহিণীই ভ্রমরের দুঃখের মূল। অতএব তিনি প্রথমেই গোবিন্দলাল ও রোহিণীর সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন। তিনি গ্রামের ডাকঘরে গেলেন। অতি কৌশলে

এবং একটি দশ টাকার নোটের বিনিময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন, যশোহর জেলার প্রসাদপুর হইতে ব্রহ্মানন্দের নামে মাসে মাসে রেজেষ্ট্রি চিঠি আসে।

কি হে বাপু, কেমন আছ? তোমাকে দেখিয়াছি না?: মাধবীনাথের অপরিচিত ডাক পিয়নের সঙ্গে কথা বলার সূচনাতেই বুঝা যায় মাধবীনাথ কত বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন চতুর ব্যক্তি ছিলেন।

কি কন?: পোস্টমাস্টার বাবু মাধবীনাথকে ডাকঘরের খবর বলিতে প্রথম অস্বীকার করিল। কিন্তু তারপর মাধবীনাথের ঘুষ দিবার প্রস্তাবে তাহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্র অতি অল্প-কথায় এই ডাকঘরের কর্মচারীদের চরিত্র জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বহু সরকারী কর্মচারীরা দুর্নীতি-পরায়ণ। সামান্য ঘুষের লোভে তাহারা সরকারী গোপনীয়তা নষ্ট করিতে দ্বিধা বোধ করে না।

যে কথাটি বলিয়াছি, তাহার এখনও টাকা পাই নাই: দুই একটি কথায় পোস্টমাস্টারের চরিত্র চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। কথায় কথায় ঘুষ লওয়া এই শ্রেণীর কর্মচারীর স্বভাব এবং তাহা চাহিতেও লজ্জা হয় না।

আপনি রাগ করেন কেন?: ঘুষখোর কর্মচারীরা কাপুরুষ। মাধবীনাথ যে দুর্দান্ত লোক, তাঁহার মাথায় যে অনেক ফন্দী আছে, তাঁহার হাতে অনেক লাঠিয়াল আছে তাহা শুনিয়া পোস্টমাস্টার বাবু একেবারে ঘাবড়াইয়া গেল। সেজন্য একটু আগে যে পোস্টমাস্টার মাধবীনাথকে রাগ দেখাইয়াছিল এখন সেই পোস্টমাস্টার বিনয়ের অবতার হইল। সে বুঝিতে পারিল, এ রকম লোককে চটাইলে তাহারই ক্ষতির আশঙ্কা।

পোস্ট বাবু তাহা আত্মসাৎ করিলেন: মাধবীনাথ পোস্টমাস্টারের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে দশ টাকা দিয়াছিলেন এবং পিয়নের জন্য একটি টাকা রাখিয়া গেলেন। কিন্তু লোভী পোস্টমাস্টার গরীব পিয়নের একটা টাকার লোভও ছাড়িতে পারিল না।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ মাধবীনাথ রোহিণী-গোবিন্দলালের অধঃপতন-কাহিনী শুনিয়াছিলেন। তিনি স্থির জানিলেন তাহারা প্রসাদপুরেই আছে। তিনি তাঁহার বিশ্বাসকে নিশ্চিততর করিবার জন্য কৌশলে রোহিণীর চিঠি দেখিতে চাহিলেন। পুলিসের সাহায্যে ব্রহ্মানন্দকে ভয় দেখাইয়া রোহিণীর পত্র দেখিলেন। "সেই পত্রে মাধবীনাথ যাহা খুঁজিতেছিলেন, সকলই পাইলেন।"

জীবনের অবসান হইল। রোহিণীর মৃত্যু হইল। হঠাৎ তব্‌লার বেসুরা বোলে যেন সেই অমঙ্গলেরই সূচনা হইল।

॥ **ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ** ॥ গোবিন্দলাল প্রসাদপুরের কুঠিতে বাহিরের কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিত না। নিশাকর দাস নাম বদলাইয়া গোবিন্দলালের সঙ্গে জোর করিয়া সাক্ষাৎ করিল। সে একটি মিথ্যা কাহিনীর অবতারণা করিল। ভ্রমর তাহার বিষয়গুলি গোবিন্দলালের অনুমতি সাপেক্ষে পত্তনী বিলি করিবে। নিশাকর দাস ওরফে রাসবিহারী দে সেই পত্তনী লইবে। নিশাকর গোবিন্দলালের অনুমতি লইতে আসিয়াছে।

প্রায় দুই বৎসর পরে ভ্রমরের কথা শুনিয়া গোবিন্দলাল একটু অন্যমনস্ক হইল। তারপর নিশাকরকে বলিল, "আমার অনুমতি লওয়া অনাবশ্যক। বিষয় আমার স্ত্রীর, আমার নহে, বোধ হয় তাহা জানেন। তাঁহাব যাহাকে ইচ্ছা পত্তনী দিবেন, আমার বিধি-নিষেধ নাই। আমিও কিছু লিখিব না।" নিশাকর চলিয়া গেল।

ভ্রমর তাহার বিষয়-সম্পত্তি গোবিন্দলালকে দানপত্র রেজিষ্ট্রি করিয়া দিয়াছিল। আইনত এখন বিষয় গোবিন্দলালের। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার উল্লেখ করেন নাই। গোবিন্দলালও সেই দানপত্রের মূল্য দেয় নাই। দুই বৎসর পরে ভ্রমরের স্মৃতি তাহার মনে পড়িলেও গোবিন্দলাল দানপত্র স্বীকার করিল না। পূর্বের ন্যায় ভ্রমরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিল না।

নিশাকরের কাছে ভ্রমরের কথা শুনিবার পর হইতে গোবিন্দলালের যেন সবকিছু গোলমাল হইয়া গেল। তব্‌লা বা সেতার বাজাইতে, নভেল পড়িতে তাহার কিছুই ভাল লাগিল না। যেন সব তাল কাটিয়া গেল। তারপর রুদ্ধ-কক্ষে ঘুমাইতে গেল। কিন্তু ঘুমাইল না। কাঁদিতে লাগিল।

ওর সঙ্গে দুটি কথা কহিতেও পাই না? ক্ষতি কি: বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর দোলাচল চিত্তের পরিচয় দিয়া গোবিন্দলালের প্রতি তাহার নিষ্ঠার অভাব বলিতে চাহিয়াছেন। এখানে তিনি রোহিণীর চরিত্রকে অত্যন্ত লঘু করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বালবিধবা দুঃখিনী রোহিণীর জীবনে অতৃপ্তি ছিল। তাহার চরিত্র কখনো লঘু ছিল না। সে হাল্‌কা তামাসা করিতে ভালবাসিত না। লঘু চপল বালিকাদের সঙ্গে জল আনিতে যাওয়া পছন্দ করিত না। বাল্যকাল হইতে সে গোবিন্দলালকে জানিত কিন্তু কখনো তাহার প্রতি প্রেমাকর্ষণ অনুভব করে নাই। কিন্তু এখানে সে নীচে নিশাকরকে দেখিয়াই

গোবিন্দলালের সঙ্গে তুলনা করিতে বসিল। অবচেতন মনে নিশাকরের জন্য আকর্ষণ অনুভব করিল। তাহার সঙ্গে তাহার কথা বলিবার ইচ্ছা হইল। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী-গোবিন্দলালের একত্র জীবন যাপনের বিবরণ দেন নাই। দিলে রোহিণী চিত্তের এই লঘুতা বিচারের সুবিধা হইত। না দেওয়ায় রোহিণীর এই মনোভাবের স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত বলিতে চাহিয়াছেন, সমাজবন্ধনের বাহিরে সকল কর্তব্য বিসর্জন দিয়া আত্মকেন্দ্রিক ভোগাসক্তি ক্রমশঃ পুরাতনের প্রতি উদগ্র আকর্ষণ হারাইয়া ফেলে। কেবল সম্ভোগের মধ্য দিয়া আকাঙ্ক্ষাকে বেশীদিন স্থায়ী করা যায় না। নূতন লোকের প্রতি এই আকর্ষণ ধাবিত হইয়া আকাঙ্ক্ষাকে নবায়মান করিয়া তুলিবার ইচ্ছা জাগে।

আমরা শুনিয়াছি, এমত কথাবার্তা হইয়া থাকে: প্রসাদপুরের কুঠিতে রোহিণী এবং নিশাকরের চারিচক্ষুর মিলন হইল। নরনারীর দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে তাহাদের হৃদয়ের আদান-প্রদান হইতে পারে, পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা। রবীন্দ্রনাথও 'আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব' করিতে চাহিয়াছিলেন।

কান্না বৈ আর উপায় নাই: বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলাল এবং ভ্রমরকে কথায় কথায় কাঁদাইয়াছেন। ভ্রমরের পক্ষে সেটা কিছুটা সঙ্গত হইলেও গোবিন্দলালের পক্ষে তাহা সঙ্গত নয়। গোবিন্দলাল ভাবপ্রবণ ব্যক্তি নয়। তাহার বিচার-বিবেচনা আছে। পৌরুষ আছে। হঠাৎ খেয়ালে নহে—ভ্রমরকে সে নিশ্চিত অপরাধী জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। সেজন্য তাহার দুঃখ হইয়াছে কিন্তু গত্যন্তর ছিল না। স্ত্রীর অন্নদাস হইয়া থাকার চেয়ে ভিক্ষা করিয়া জীবিকার্জনের পথ শ্রেয় বলিয়া সে মনে করিয়াছে। তাহার পক্ষে এরূপ ছিঁচকাঁদুনি অস্বাভাবিক।

বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালের এই কান্না কাহার জন্য বলিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পরই বলিয়াছেন, প্রায় দুই বৎসর ভোগপঙ্কিল জীবন যাপনের পর ভ্রমরের স্মৃতি মনে পড়ায় এবং নিজের অধঃপতনের পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া তাহার চোখে জল আসিল। ভ্রমরের জন্য কাঁদিলেও ভ্রমরের কাছে তাহার ফিরিবার পথ নাই। হরিদ্রাগ্রামে গোবিন্দলালের আর মুখ দেখাইবার উপায় নাই। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, গোবিন্দলালের "কান্না বৈ আর উপায় নাই।"

।। সপ্তম পরিচ্ছেদ ।। গোবিন্দলালের সঙ্গে নিশাকরের কথাবার্তা রোহিণী পাশের কামরা হইতে শুনিয়াছে। নিশাকর হরিদ্রাগ্রাম হইতে আসিয়াছে শুনিয়া তাহার সঙ্গে রোহিণীর আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। কিন্তু গোপনে কেন? গোবিন্দলাল কি পর-পুরুষের সঙ্গে কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছিল? বহুদিন পরে নিজের গাঁয়ের লোক শুনিয়া তাহার সঙ্গে রোহিণীর আলাপ করিবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু গোবিন্দলালের কাছে তাহা গোপন করিবার আবশ্যকতা কি ছিল? আসলে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী-চরিত্রের প্রতি গোবিন্দলালের অবিশ্বাস সৃষ্টি করিবার জন্যই এই কৃত্রিম ঘটনার সংযোজন করিয়াছেন।

নিশাকর রোহিণীর এই কৌতূহলকে কাজে লাগাইল। রোহিণীকে বলিয়া পাঠাইল—ব্রহ্মানন্দ রোহিণীকে কয়েকটা কথা বলার জন্য নিশাকরকে বলিয়া দিয়াছে। নিশাকর রাত্রিতে নদীর ধারে নির্জনে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে রোহিণীকে চাকরের মারফত সংবাদ দিল। কিন্তু আশ্চর্য, রোহিণী সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন পুরুষ মানুষ নিশাকরের সঙ্গে অন্ধকার নদীর ধারে একা দেখা করিতে রাজী হইল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, রোহিণী খুল্লতাতের সংবাদের জন্য তত ব্যগ্র ছিল না। আসলে নিশাকরের রূপবান পুরুষ দেখিয়া রোহিণীর তাহাকে জয় করিবার ইচ্ছা হইল। গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইবার জন্য নহে। গোবিন্দলাল ত আছেই, নিশাকরকেও একটু বাজাইয়া দেখিবে। বায়রণ লিখিয়াছেন—

"In her first passion woman loves her lover
In all the others all she loves is love,
Which grows a habit she can ne'er get over,
And fits her loosely—like an easy glove,
As you may find, when'er you like to prove her;
One man alone at first her heart can move:
She then prefers him in the plural number,
Not finding that the additions much encumber."

"প্রথম আবেগে নারী ভালবাসে প্রণয়ীকে তা'র;
তা'রপরে ভালবাসে আপনার প্রণয়ে কেবল;
তাই সে বহুরে চাহে—একে তা'র তুষ্টি নাহি আর—
বহুতে হৃদয় তা'র নাহি হয় বিব্রত—চঞ্চল।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রোহিণীর চরিত্র আলোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সে যেরূপ হীনস্বভাবা, তাহাতে গোবিন্দলাল তাহাকে হত্যা না করিলে সে আর কাহাকেও না পাইলে, তাহার সঙ্গীত-শিক্ষক দানেশ খাঁর সঙ্গেই চলিয়া যাইত। নিশাকরের সহিত তাহার কথোপকথন শেষ হইলে সে কি করিত বলা যায় না, কারণ, সে যে মনকে বুঝাইয়াছিল—"আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না"—তাহার কোন মূল্য নাই; সে সঙ্কল্প নিশাকরের আহ্বানে ফুৎকারে উড়িয়া যাইতে পারিত। কারণ, সে হরলালকে পাইবার জন্য চুরি করিতে যাইতেও ইতস্তত: করে নাই। তাহার মনে যদি সেই সঙ্কল্পই থাকিত, তবে সে সোহাগ পাইবার জন্যও নিশাকরকে ভুলাইবার জন্য বলিত না—"আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা'হলে আমার দশা এমন হইবে কেন? একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এ দেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।"

আমাদের মতে রোহিণী যে এরূপ হীনস্বভাবা ছিল তাহার পরিচয় আমরা পূর্বে পাই নাই। গুপ্ত একটি পরিপূর্ণ যুবতী হৃদয় হরলালের প্রলোভনে ভুল পথে পা বাড়াইয়াছিল। গোবিন্দলালের সহানুভূতিতে হরলালের দ্বারা হঠাৎ জাগ্রত তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। কিন্তু নিশাকরের প্রতি আকর্ষণ কেন? কেবল রূপ দেখিয়া? গোবিন্দলালের রূপ ছিল। কিন্তু রোহিণী কখনও তাহার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে নাই। এক্ষণে করিতে পারে। কিন্তু তাহার জন্য রোহিণীর চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা করেন নাই। না করিয়াই বায়রণের সংজ্ঞায় রোহিণীকে হীনস্বভাব করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, তখনো পশ্চিমের হাওয়া আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে নাই।

শিকার কেবল শিকারের জন্য—খাইবার জন্য নহে: রোহিণী নিশাকরের প্রতি প্রণয়াবদ্ধ না হইয়াও তাহার সহিত প্রণয়-খেলা খেলিতে চাহিয়াছিল। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর মনোভাব অনুমান করিয়া লইতেছেন। মনোভাব সম্বন্ধে সঠিক জানিয়া তাহার পর কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করা একটি রীতি; অপরটি হইল, কার্যকলাপ দেখিয়া, মনোভাব সম্বন্ধে অনুমান করিয়া একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। বঙ্কিম দ্বিতীয় রীতিটি গ্রহণ করিয়াছেন।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্দলালের অপর চাকর সোনাকে চাকরির লোভ

দেখাইয়া নিশাকর হাত করিল। রোহিণী যখন রাত্রে গোপনে তাহার সঙ্গে চিত্রার বাঁধাঘাটে সাক্ষাৎ করিবে তখন তাহাকে দিয়া গোবিন্দলালকে সংবাদ দিবার ব্যবস্থা করিল। নিশাকর সত্যই villain। সে এইরূপে রোহিণীকে মারিবার পথ করিল। কিন্তু দুর্বৃত্তেরও বোধ হয় হৃদয় আছে। সেজন্য সে মনে মনে ভাবিল, সে কী নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছে! পরক্ষণেই ভাবিল রোহিণী পাপীয়সী, সে পাপের দণ্ডবিধান করিবে। ইহা বোধহয় ভগবানের ইচ্ছা। হয়ত তিনি নিশাকরকে এই কার্যে নিয়োজিত করিয়াছেন।

রাত্রির অন্ধকারে রোহিণী একা নিশাকরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। গোবিন্দলালও পিছন পিছন আসিয়া রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। তারপর সঙ্গে লইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব : রোহিণী পাপীয়সী ; সে একটি সুখের সংসার ছারখার করিয়া দিল। তাহার দণ্ডবিধান অবশ্যই কর্তব্য। শৈবলিনীও পাপীয়সী ছিল। সেজন্য তাহার নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর দণ্ডের ব্যবস্থা নিশাকরের এক নৃশংস কৌশলের দ্বারা করাইলেন। এখানে একটি প্রশ্ন—ভ্রমর-গোবিন্দলালের সুখের সংসার ভাঙ্গিবার জন্য রোহিণীই কী একমাত্র দায়ী? রোহিণীর অতৃপ্ত-হৃদয়ের সহজাত কামনাই তাহাকে গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়াসক্ত করিয়াছিল। তারপর ভ্রমরের স্বামীর মুখদর্শনে অনিচ্ছা, পিত্রালয়ে গমন এবং কৃষ্ণকান্ত কর্তৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চনা গোবিন্দলালকে ভ্রমরের প্রতি বীতরাগ করিয়া তুলিল। ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য সে রোহিণীর প্রেমে ডুব দিল। এজন্য কেবল রোহিণীকেই দায়ী করা উচিত নয়।

তা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে : নিশাকরের সঙ্গে রোহিণীর প্রথম আলাপ লক্ষ্য করিবার মত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে একেবারে স্বৈরিণী নারীর মত চিত্রিত করিয়াছেন। রোহিণী এবং নিশাকরের সংলাপ লক্ষ্য করিবার মত।

নিশাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রি হইল কেন?"

রোহিণী। একটু না দেখে শুনে ত আসতে পারিনে। কি জানি কে কোথা দিয়ে দেখতে পাবে। তা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে।

নিশা। কষ্ট হোক্ না হোক্ মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি ভুলিয়া গেলে।

রোহিণী। আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা' হলে আমার দশা এমন হবে কেন? একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।

প্রসাদপুরের ঐ নির্জন কুঠিতে বাস করে গোবিন্দলাল, রোহিণী এবং দুইজন চাকর। 'অভিসারিকা' রোহিণীর এত লোকভয় কোথা হইতে আসিল? চাকরেরা তো রোহিণী যে এখানে আসিবে তাহা জানে। তাহা হইলে কেবলমাত্র গোবিন্দলালকে লুকাইয়া আসিবার জন্যই রোহিণীকে এক প্রহর রাত কাটাইতে হইয়াছিল।

রোহিণীর কথা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় রোহিণী তাহার খুড়ার সংবাদ লইতে নিশাকরের নিকটে আসে নাই। বাগানে নিশাকরকে দেখিয়া পর্যন্ত রোহিণী তাহার নিকট আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। রোহিণী মুহূর্তের দেখা নিশাকরকে ভুলিতে পারে নাই বলিয়া রাত্রির অন্ধকারে নিশাকরের নিকটে আসিয়াছে। ইহা হইতে মন্দ অভিপ্রায় আর কী হইতে পারে? অথচ গোবিন্দলাল যখন রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিল তখন রোহিণী বলিয়াছে, "আমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই।"

বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে এখানে যে রকম 'সস্তা' করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা 'কষ্ট-কল্পনা' ছাড়া আর কিছুই নহে। আমরা এই রোহিণীকে পূর্বে দেখি নাই। কার্য-কারণ পরম্পরায় বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী চরিত্রের এই অধঃপতন বর্ণনা করেন নাই।

॥ **নবম পরিচ্ছেদ** ॥ গোবিন্দলাল একেবারে ক্ষেপিয়া গেল। এই রোহিণীর জন্য সে "জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর" তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার মরিবার সাহস আছে কিনা? রোহিণী তখন মরিবার ইচ্ছা করিতেছিল। গোবিন্দলালকে পাইয়া তাহার জীবনের সাধ মিটিয়াছে। অপরিমেয় সেই সুখের শেষে তাহার মরিতে আপত্তি রহিল না। গোবিন্দলাল ভরা-পিস্তল বাহির করিল। মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়া হয়ত রোহিণীর ভাবান্তর হইল। একদিন সে অনায়াসে, অক্লেশে, বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল। এখন সে দুঃখ নাই, সাহসও নাই। প্রসাদপুরের কুঠিতে গোবিন্দলালের সঙ্গে তাহার যে সুখের জীবন, তাহার স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়াই সে এখন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সেজন্য তাহার মরিতে ভয় হইল। গোবিন্দলালের কাছে জীবনের জন্য সে কাতর-ভিক্ষা করিল।

গোবিন্দলাল পিস্তলের গুলিতে রোহিণীকে নিহত করিয়া নিরুদ্দেশ হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদে গোবিন্দলালের হিংস্রতার কারণ বিশ্লেষণ করেন নাই। হয়ত নিশাকরের সঙ্গে রোহিণীর কথা শুনিয়াই গোবিন্দলাল ক্ষেপিয়া গেল। রোহিণীকে ঘরে আনিয়া তাহাকে পদাঘাত করিল। কিন্তু আশ্চর্য রোহিণীকে একবারও বিশ্বাসঘাতকতার কারণ জিজ্ঞাসা করিল না। রোহিণীর উক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রসাদপুরের কুঠিতে রোহিণী-গোবিন্দলাল বেশ সুখেই ছিল। সেখানে মুহূর্তের এক ঘটনায় গোবিন্দলালকে নারী-ঘাতিনী করিয়া তুলিল, ইহা অস্বাভাবিক। মনে রাখিতে হইবে, গোবিন্দলাল মদ্যপ নহে, হঠকারী—উচ্ছৃঙ্খল নহে। তাহার পক্ষে এই ক্ষিপ্ততা কল্পনা করা যায় না। রোহিণীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, গোবিন্দলাল গান-বাজনা ভালবাসে, উপন্যাস পড়ে। পর মুহূর্তে সে একেবারে হত্যাকারী হইয়া উঠিল কেন? বঙ্কিমচন্দ্র তাহার উপযুক্ত কারণ বিশ্লেষণ করেন নাই।

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥ প্রসাদপুরের কুঠি হইতে থানা ছিল ছয় ক্রোশ দূরে। সেখানে সংবাদ গিয়া দারোগা আসিতে পরদিন বেলা প্রহরেক হইল। ইত্যবসরে গোবিন্দলাল অনেক দূর পলাইয়া গিয়াছে। দারোগা তাহার কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া আসামী ফেরার বলিয়া রিপোর্ট দিল।

এদিকে ধূর্ত নিশাকর বিপন্ন রোহিণীকে গোবিন্দলালের হাতে ফেলিয়া মাধবীনাথ যে বাসায় অপেক্ষা করিতেছিল সেখানে গেল। মাধবীনাথ নিশাকরের নিকট হইতে সকল বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "কাজ ভাল হয় নাই। একটা খুনোখুনি হইতে পারে।" প্রভাতেই তাঁহারা খুনের সংবাদ শুনিয়া গোবিন্দলালের জন্য চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। পরে দারোগা যখন গোবিন্দলালের কোন সন্ধান পাইল না, তখন তাঁহারা আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ তৃতীয় বৎসর। ভ্রমর উৎকট রোগ হইতে কিছু মুক্তি পাইয়া পিত্রালয়ে গিয়াছে। সেখানে ভ্রমর শুনিল গোবিন্দলাল খুন করিয়া আত্মগোপন করিয়াছে। ভ্রমর তাহার দিদি যামিনীর সঙ্গে গোবিন্দলালের মঙ্গলামঙ্গল আলোচনা করিতে লাগিল। স্বামী-সাক্ষাতের জন্য ভ্রমরের ব্যাকুলতা অধিক। কিন্তু বর্তমানে ভ্রমর তাহা হইতেও গোবিন্দলালের

নিরাপত্তা বেশী কামনা করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল যদি হরিদ্রাগ্রামে আসে সেই প্রতীক্ষায় ভ্রমর আবার শ্বশুরালয়ে গেল।

আহ্লাদের কথা আমার আর কি আছে!: ভ্রমর-গোবিন্দলালের সুখের জীবন আর নাই। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া পরদারনিরত হইয়াছিল। এখন আবার সে হত্যাকারী। ভ্রমরের দুশ্চিন্তার উপর দুশ্চিন্তা। গোবিন্দলাল যদি এখন ফিরিয়াও আসে, তাহা হইলেও দুশ্চিন্তা। মাথার উপরে নারীঘাতকের শাস্তি। এতদিন পর ফিরিয়া আসিলেও গোবিন্দলালের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কিরূপ হইবে কে জানে!

॥ **দ্বাদশ পরিচ্ছেদ** ॥ গোবিন্দলাল কিন্তু আসিল না। তৃতীয় বৎসর কাটিয়া গেল, চতুর্থ বৎসর কাটিয়া গেল। গোবিন্দলালের কোন সংবাদ নাই। এদিকে ভ্রমরের পীড়া বাড়িতে লাগিল। তাহার দিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল।

পঞ্চম বৎসরে হঠাৎ সংবাদ আসিল গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে ধরা পড়িয়াছে। গোবিন্দলাল দেওয়ানজীকে এই সংবাদ জানাইল। জীবনের প্রতি তাহার মায়া নাই। তথাপ যাহাতে ফাঁসি যাইতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিল। সে লিখিয়াছিল, "আমি জেলে চাললাম, আমার পৈতৃক বিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্য অথব্যয় করা যদি তোমাদিগের অভিপ্রায়-সম্মত হয়, তবে এই সময়।" এই চিঠিতে সে ভ্রমরের কথা উল্লেখ করিল না। এমন কি তাহার পত্রের কথাও কাহাকেও জানাইতে নিষেধ করিল। জনরবের কথা জানাইতে বলিল।

ভ্রমর জনরবের এই সংবাদ শুনিয়া পিতা মাধবীনাথকে নোটে-কাগজে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া গোবিন্দলালের রক্ষার জন্য পাঠাইল। পিতাকে বলিল, "দেখিও—আমি আত্মহত্যা না করি।" অর্থাৎ গোবিন্দলালের যাহাতে ফাঁসি না হয় তাহার সকল ব্যবস্থা করিতে বলিল। গোবিন্দলালের ফাঁসির কথা শুনিলে তাহার আত্মহত্যা ভিন্ন গতি থাকিবে না।

মাধবীনাথ ভ্রমরকে আশ্বস্ত করিয়া, গোবিন্দলালকে দেশে আনিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া যশোহরে রওনা হইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন, পুলিস কোন সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করিতে পারে নাই। নগদ কিছু দিয়া ইন্সপেক্টর ফিচেল খাঁ তিনটি মিথ্যা সাক্ষী তৈয়ার করিয়াছিল। মাধবীনাথ সাক্ষীদিগের নামধাম সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বাড়ী গেলেন। অর্থ দিয়া তাহাদের বশ

করিলেন। তিনি তাহাদিগকে হাজার টাকা দিলেন। সাক্ষীরা টাকার লোভে জজ সাহেবের কাছে সত্য কথা বলিল। তাহারা কিছু জানে না। ফিচেল খাঁর মারের চোটে তাহারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল।

জজ সাহেব প্রমাণাভাবে আসামীকে খালাস দিলেন। গোবিন্দলাল ভীড়ের মধ্যে মাধবীনাথকে দেখিতে পাইয়া সব বুঝিতে পারিল। গোবিন্দলাল জেলে ফিরিয়া যাইবার সময় মাধবীনাথ তাহাকে বাসার ঠিকানা দিয়া খালাস পাইয়া গোবিন্দলালকে সেখানে দেখা করিতে বলিলেন। গোবিন্দলাল কিন্তু জেল হইতে খালাস পাইয়া আবার আত্মগোপন করিল। মাধবীনাথ তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা তিনি একাই হরিদ্রাগ্রামে ফিরিয়া গেলেন।

॥ **ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ** ॥ মাধবীনাথ আসিয়া ভ্রমরকে গোবিন্দলালের খালাসের সংবাদ দিলেন, কিন্তু সে কোথায় চলিয়া গেল তাহা বলিতে পারিলেন না।

এদিকে গোবিন্দলাল খালাস পাইয়াই তাহার প্রসাদপুরের বিলাসপুরীতে গেল। দেখিল, সেখানে কিছু নাই, কেহ নাই। তাহার মনে হইল—

"I feel like one
Who treads alone
Some banquet hall deserted,
Whose lights are fade,
Whos garlands dead
And all but he departed."

ইটকাঠ বিক্রয় করিয়া সে কলিকাতায় চলিয়া গেল। অতি গোপনে সামান্য অবস্থায় সেখানে দিনযাপন করিতে লাগিল। তথাপি এক বৎসরেই সেই টাকা ফুরাইয়া গেল। তখন ছয় বৎসরের পর গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পত্র লিখিতে বসিল, "আজি আমি তোমার কাছে ভিখারী।" সে ভ্রমরের কাছে পেটের দায়ে আশ্রয় চাহিয়া পত্র দিল। যে গোবিন্দলাল ভ্রমরের অন্নদাস হইয়া থাকিতে চাহিল না, যে গোবিন্দলাল মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা ভাঙিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, যে গোবিন্দলাল ফাঁসির মুখে জেলে গিয়াও ভ্রমরের কাছে দান প্রার্থনা করে নাই, যে গোবিন্দলাল খালাস হইবার পর মাধবীনাথের আশ্রয়ে গেল না, সেই গোবিন্দলাল ছয় বৎসর পর ভ্রমরের কাছে ভিক্ষুকের মত হাত পাতিল, ইহা স্বীকার করিতে মন

সায় দেয় না। গোবিন্দলাল ইচ্ছা করিলেই কলিকাতায় না থাকিয়া তীর্থস্থানে গিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিত।

ভ্রমর সেই পত্রের উত্তর দিল, কিন্তু তাহাতে 'সেবিকা' পাঠ পর্যন্ত লিখিল না। গোবিন্দলালকে হরিদ্রাগ্রামে গিয়া নিজের বিষয় ভোগ করিতে লিখিল। কিন্তু ভ্রমর তাহা হইলে হরিদ্রাগ্রামে বাস করিবে না। সে লিখিল, "আপনার সঙ্গে আমার এই জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট —আপনিও যে সন্তুষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।" এই পত্র ভ্রমরের উপযুক্ত। যে ভ্রমর গোবিন্দলালকে লিখিয়াছিল, 'যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস"—ইহা সেই ভ্রমরের পত্র। কিন্তু যে ভ্রমর গোবিন্দলালের কাশীযাত্রার প্রাকালে বলিয়াছিল, "যদি আমি সতী হই, কায়মনেবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে"—সেই ভ্রমরের নহে। যে ভ্রমর গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে আসিবে এই আশায় তৃতীয় বৎসরের শেষে অসুস্থ অবস্থায় শ্বশুরালয়ে আসিয়া নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল—এই পত্র সেই ভ্রমরের নহে।

ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত বলিয়াছেন, "যে ভ্রমর কলঙ্কের জনরব শুনিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল, সে যে পরদারনিরত হত্যাকারী স্বামীকে গ্রহণ করবে না, ইহার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। গোবিন্দলাল যে খালাস পাইয়া ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না যাইয়া উধাও হইয়াছিলেন তাহাও পূর্ববর্তী ঘটনার সহিত সুসঙ্গতির পরিচয় দেয়।"

ভ্রমর চরিত্রের বহু সমালোচনা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায়—তাঁহারই নিয়ন্ত্রিত 'প্রচার' পত্রে তাহার বন্ধুস্থানীয় চন্দ্রনাথ বাবু লিখিয়াছিলেন—(১২৯৫ খৃষ্টাব্দে) :

"একই বিড়ম্বনায় পড়িয়া সূর্যমুখী ও ভ্রমর দুইজনের আচরণ ভিন্নরকম এবং আচরণের ফলও বিভিন্ন রকম হইয়াছিল। সূর্যমুখীর আচরণে সূর্যমুখী, নগেন্দ্র, নগেন্দ্রের যে বংশে জন্ম সকলেই রক্ষা পাইল। সে আচরণের ফলে যে-যেখানে ছিল সকলেই শেষে সুখী হইল, নগেন্দ্র ও সূর্যমুখী সন্তানাদি লাভ করিয়া পরম সুখে পবিত্র-ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া গেল, দুঃখিনী কুন্দনন্দিনী থাকিলে সেও নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর সঙ্গে তেমনি করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া যাইত।

কিন্তু ভ্রমরের আচরণের ফলে ভ্রমর গেল, গোবিন্দলাল গেল, হরিদ্রাগ্রামের রায়বংশ লোপ হইল। কৃষ্ণকান্ত রায়ের নাম ডুবিল। একটা সংসার, একটা সম্পত্তি, একটা ঐশ্বর্য ছারখার হইয়া গেল।"

গোবিন্দলাল ভ্রমরের সেই ভয়ানক পত্র পাইয়া বিস্মিত হইল। তাহাতে এতটুকু কোমলতা নাই। ঠিক করিল, সে হরিদ্রাগ্রামে যাইবে না। ভ্রমরের কাছে মাসিক ভিক্ষা চাহিয়া পাঠাইল। গোবিন্দলালের চরিত্রের পক্ষে ইহাও অসঙ্গত। ভ্রমর তাহার উত্তরে লিখিল, "মাস মাস আপনাকে পাঁচশত টাকা পাঠাইব। আরও অধিক পাঠাইতে পারি, কিন্তু অধিক টাকা পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা।" শুধু ভিক্ষা নহে, তাহার সঙ্গে অপমানও আসিল।

গোবিন্দলাল শেষ পর্যন্ত ভ্রমরের দানেই জীবন-ধারণ করিয়া কলিকাতায় রহিল। এখানে একটি প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, গোবিন্দলাল যদি ভ্রমরের দানেই জীবন-ধারণ করিবে, তাহা হইলে সে হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিল কেন? সে ছয় বৎসর ভ্রমরের দান উপেক্ষা করিয়াছিল। তাহাকে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভিক্ষুক করিলেন কেন? আসলে বঙ্কিমচন্দ্র, ভ্রমরের চরিত্রকে উজ্জ্বল করিবার জন্যই গোবিন্দলাল-চরিত্রের এই পরিণতি ঘটাইয়াছেন।

॥ **চতুর্দশ পরিচ্ছেদ** ॥ ভ্রমরের রোগ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। চিকিৎসা ব্যর্থ হইল। মাঘ মাসে ভ্রমর ঔষধ ব্যবহার পরিত্যাগ করিল। সম্মুখে ফাল্গুন মাস। ফাল্গুনের পূর্ণিমার রাতে ভ্রমরের মরিবার ইচ্ছা হইল।

সেই পূর্ণিমার রাত্রি আসিল। ভ্রমর স্থির, প্রফুল্ল হাস্যমূর্তি। ভ্রমর তাহার দিদি যামিনীকে দিয়া ফুল আনাইল। আজ তাহার ফুলশয্যা। ভ্রমর গোবিন্দলালকে দেখিতে চাহিল। তাহা হইলে সে একদিনে সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতে পারে।

মাধবীনাথ গোবিন্দলালকে ভ্রমরের পীড়ার সংবাদ দিয়াছিলেন। গোবিন্দলাল আজই তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে। কিন্তু সাহস করিয়া ভ্রমরের কাছে যাইতে পারে নাই। ভ্রমরের ইচ্ছামত যামিনী গোবিন্দলালকে ডাকিয়া আনিল। ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বলিল "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া, আশীর্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই!"

গোবিন্দলাল কোন কথা না কহিয়া ভ্রমরের হাত আপন হাতে তুলিয়া লইল। ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল। গোবিন্দলালের হয়ত তখন মনে হইয়াছিল—

"O, that 't were possible
After long grief and pain
To find the arms of my true love
Round me once again."

সমস্ত ঘটনা কী রকম সাজানো? ভ্রমর ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত্রে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করিল। আর গোবিন্দলাল যে ভ্রমর তাহার মুখদর্শন করিতে চাহে নাই, তাহার পীড়ার সংবাদে সেই দিন সন্ধ্যায় হরিদ্রাগ্রামে উপস্থিত হইল। তারপর মহাপুরুষদের মৃত্যুর মত ভ্রমর একে একে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। রোহিণীর শোচনীয় মৃত্যুর জন্য দুঃখ হয়, কিন্তু ভ্রমরের মৃত্যুর জন্য বিস্ময় জাগে।

।।পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।। ভ্রমরের মৃত্যুর পর তাহার যথারীতি সৎকার করিয়া ফিরিয়া গোবিন্দলাল কাহারও সহিত কথা বলিল না।

গোবিন্দলাল দুইজন স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়াছিল, ভ্রমর আর রোহিণীকে। রোহিণীর রূপতৃষ্ণায় ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই বুঝিয়াছিল, "এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি ভাণ্ড-নিঃসৃত সুধা নহে।" সেই বিষ তাহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। কিন্তু তখনও সর্বরোগের ঔষধস্বরূপ ভ্রমরের মধুর স্মৃতি দিবারাত্র তাহার স্মৃতিপথে জাগ্রত ছিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে কখনো দূরে সরাইতে পারে নাই। সে সর্বদা তাহার অন্তরে ছিল। আর রোহিণীকে সে কখনও হৃদয়ে স্থান দিতে পারে নাই। তাহার স্থান ছিল বাহিরে। রোহিণী যখন অত্যাজ্য তখনও ভ্রমর অন্তরে রোহিণী বাহিরে। সেইজন্য রোহিণী এত শীঘ্র মরিল।

গোবিন্দলাল যদি রোহিণীকে খুন করিয়া ভ্রমরের কাছে আসিয়া ক্ষমা চাহিত, তাহা হইলে "ক্ষমাময়ী; দয়াময়ী স্নেহময়ী ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিত। অহঙ্কার পরিপূর্ণ পুরুষ গোবিন্দলাল তাহা পারে নাই। গোবিন্দলালের মধ্যে ভ্রমর-দর্শনের লালসা তাহাকে দাহ করিতে লাগিল। তাহার দুঃখ অসহ্য। ভ্রমর সুখী। মরিয়া বাঁচিল। কিন্তু গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই।

পরদিন সকালবেলা গোবিন্দলাল বারুণী পুষ্করিণী তটে গেল। বাগানের সেই সৌন্দর্য নাই। উদ্যানে বসিয়ে গোবিন্দলাল কেবল ভ্রমর ও রোহিণীর কথা

ভাবিতেছিল। কখনো ভ্রমর, কখনো রোহিণী। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইল। গোবিন্দলাল উন্মাদগ্রস্ত হইয়া উঠিল। রোহিণী যেন সূক্ষ্মকণ্ঠে বলিতেছে—"এইখানে, এমনি সময়ে, ঐ জলে আমি ডুবিয়াছিলাম।" তুমিও "প্রায়শ্চিত্ত কর, মর।" গোবিন্দলাল ভয়ে চক্ষু মুদিল। রোহিণীর মূর্তি মিলাইয়া গেল। দিগন্ত প্রকাশিত করিয়া জ্যোতির্ময়ী ভ্রমরের দিব্যমূর্তি দেখা দিল। সে বলল, "মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন, বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।" গোবিন্দলাল সে রাত্রে মূর্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিল। প্রভাতে লোকজন তাহার সন্ধান পাইয়া গৃহে লইয়া গেল। দুই তিন মাসের চিকিৎসায় গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইল। তথাপি সে গৃহে বাস করিল না। এক রাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় আবার চলিয়া গেল। কেহ তাহার সংবাদ পাইল না।

সাত বৎসর পরে তাহার শ্রাদ্ধ হইল।

তাহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল—ভ্রমরের মৃত্যুর পর মাধবীনাথ ঠিক করিয়াছিলেন, ইহজন্মে আর গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা বলিবেন না। কিন্তু মূর্ছিত গোবিন্দলালকে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। "The quality of mercy is not strain'd."

॥ পরিশিষ্ট ॥ উপন্যাস শেষ হইয়াছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য শেষ হয় নাই। পরিশিষ্টে তিনি গোবিন্দলালের শান্তিলাভ দেখাইলেন।

গোবিন্দলালের সম্পত্তি তাঁহার ভাগিনেয় শচীকান্ত পাইল। এই শচীকান্তের কথা কিন্তু আমরা উপন্যাসে কোথাও পাই নাই। এই শচীকান্ত বা তাহার মাতা কোথায় ছিল, ভ্রমরের মৃত্যুর সময়ে বা গোবিন্দলালের মূর্ছিত অবস্থায়ও আমরা তাহাদের দেখা পাই নাই।

যাহা হউক, এই শচীকান্ত গোবিন্দলালের দুঃখময় কাহিনীর কথা সবিস্তারে শুনিয়াছিল। সে তখন বারুণীতটের ভ্রষ্টশোভা কাননের সংস্কার সাধন করিল। সেখানে প্রমোদ ভবনের পরিবর্তে একটি মন্দির প্রস্তুত করিল। মন্দির মধ্যে বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত ভ্রমরের স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত করিল।

ভ্রমরের মৃত্যুর বার বৎসর পরে শচীকান্ত একদিন সেই মন্দির-দ্বারে বসিয়া ছিল। সেখানে সন্ন্যাসী বেশে গোবিন্দলাল উপস্থিত হইল। শচীকান্ত তাহার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইল। তাহাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন

করিল। বিষয়-উপভোগ করিতে বলিল। কিন্তু গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইল না। সে এই বার বৎসর অজ্ঞাতবাসের জন্য সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ লইয়াছিল। আজ তাহার দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস পূর্ণ হইল। বিষয়-সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেও অপ্রাপ্য গোবিন্দলাল তাহা পাইয়াছে। ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, সে তাহা পাইয়াছে। গোবিন্দলাল বলিল, 'ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি —তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।…আমি শান্তি পাইয়াছি। বিষয়ে আমার কাজ নাই, তুমিই ইহা ভোগ করিতে থাক।" শচীকান্তকে আশীর্বাদ করিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেল। আর কেহ তাহাকে হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পাইল না।

বিদেশী গাছের মধ্যে সাইপ্রেস ও উইলো—"সাইপ্রেস প্রতীচীতে সেকালে শবের জন্য ও সমাধি সজ্জিত করিতে ব্যবহৃত হইত—উহা শোকের বা বিষাদের প্রতীক বলিয়া বিবেচিত। আর উইলো—বিষাদের, প্রেমিকের, দ্বারা পবিত্যাগের প্রতীক। কবি ক্যাম্পবেল লিখিয়াছেন:—

'I must wear the willow garland
For him that's dead or false to me."

ভারতবর্ষের সাহিত্যের বিদেশী ঐতিহাসিক (ফ্রেজার) 'বিষবৃক্ষ'-এর পরে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর বিষয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"Here the true workings of the novelist's mind are apparent a deeper vein is touched. The love of the erring husband for his wife, and the rival love by which he is infatuated, typifies a struggle between the Divine love and the ever recurring phantasmal attraction of the soul to the objects of sense, from which freedom can only be reached by centring the mind on ideal perfections."

"গোবিন্দলালের ভ্রমর-প্রেমের সহিত তাহার মোহমুগ্ধ মনের রোহিণীপ্রেমের দ্বন্দ্ব দিব্য-প্রেমের সহিত মনের পার্থিব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণের দ্বন্দ্ব। প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব হিন্দুর বহু পুস্তকে রূপকরূপে বিবৃত হইয়াছে।"

॥ অন্ত্যপর্ব ॥

[ক] কৃষ্ণকান্তের উইল ঃ নামকরণের যুক্তিযুক্ততা ॥

কোন গল্পগ্রন্থ বা কবিতার নামের মধ্যেই তাহার মূল বক্তব্যের আভাষ বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সে জন্য নাম শুনিয়া বা দেখিয়া মূল বক্তব্যের অবতারণা সম্বন্ধে পাঠক সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারে। এই নামকরণের মধ্যেই লেখকের সজ্ঞান অভিপ্রায় নিহিত থাকে। সেজন্য সাহিত্য সমালোচনায় নামকরণের বিচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিচার প্রসঙ্গে স্রষ্টার সৃজনশীল মনোলোক ও মানস-ধর্মের সহিত সম্যক্ পরিচিত হইবার অবকাশ পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, অনেক ক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিক সমগ্র উপন্যাসের বিচিত্র ঘটনার মধ্যে অনুস্যূত মূল সূত্রটিকেও এই ভাবে নামকরণের মধ্যে ইঙ্গিতময় ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এই নামকরণের বিভিন্ন রীতি আছে। সাধারণত নায়ক বা নায়িকার নামে নামকরণ হইয়া থাকে। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে এই রীতির প্রচলন বেশী দেখা যায় না। পাশ্চাত্যে অতি-সাম্প্রতিককালেও পাত্র-পাত্রীর নামে অনেক উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নামকরণ করা হইয়াছে। যেমন রুশ ঔপন্যাসিক পাস্তেরনাকের 'ডঃ জিভাগো'। নামকরণের এই রীতি অতি প্রাচীন। পৃথিবীর অধিকাংশ বিখ্যাত উপন্যাসের এই রীতিতে নামকরণ করা হইয়াছে। যেমন ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট,' রোমা রোঁলার 'জঁ্যা ক্রিস্তফ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর', 'দেবী চৌধুরাণী,' রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র এই রীতিই বেশী অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য অন্য রীতিও আছে। ঘটনার মূল সমস্যা, জীবন-ব্যাখ্যার একটু সঙ্কেত, কাহিনীর মূল সুর, ঘটনার গ্রন্থিনির্দেশ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কাহিনী বা উপন্যাসের নামকরণ করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বিষবৃক্ষে আদর্শবাদ, আনন্দমঠে প্রতিষ্ঠান এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে জটিল ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

হরিদ্রাগ্রামের ধনাঢ্য জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায় তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তির বণ্টন করিয়া যে উইল করিয়া গিয়াছিলেন তাহার নামেই উপন্যাসের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামকরণ করা হইয়াছে। মানুষ যতই নিজেকে লইয়া ব্যাপৃত থাকুক না কেন, যতই সে বাহ্যশক্তিগুলিকে পরিহার করিয়া নিজেকে

লইয়া আত্মসীমা-নিবদ্ধ (Self-contained) থাকিবার চেষ্টা করুক না কেন শতবন্ধনজাল-জটিল আমাদের সামাজিক জীবন নানা কার্য-কারণ পরম্পরায় গঠিত। বাহ্যিক শক্তি তাহার জীবনের উপর সূক্ষ্ম, দুরতিক্রম্য, জটিল, এমনকি অদৃশ্য প্রভাব বিস্তার করিবেই। তাহার প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া মানুষ আরো আপনার জালে জড়াইয়া পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাহাকে ঘটনার চক্র-ক্রমের মধ্যে অসহায় ক্রীড়নক হইতে হয়।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে বাহ্যশক্তির দুরতিক্রম্য প্রভাবের সঙ্গে আমাদের অন্তর্জীবনের ভাব-ভাবনার দ্বন্দ্ব দেখানো হইয়াছে। "এই বাহ্যশক্তিগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। প্রত্যেকবার উইল পরিবর্তন কেবল যে সম্পত্তির বিভাগ বণ্টনের অংশ বদলাইয়াছে তাহা নহে, ইহা অলঙ্ঘ্য বিধিলিপির ন্যায় উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ভাগ্য পরিবর্তনও করিয়াছে।"

এই উপন্যাসের আরম্ভ উইল তৈয়ারির মধ্য দিয়া। কৃষ্ণকান্ত রায় তাঁহার বিবেক বুদ্ধিমত তাঁহার ওয়ারিশগণের মধ্যে বিষয়-সম্পত্তির উপযুক্ত বণ্টন করিয়া প্রথম উইল করিলেন। পিতার অবাধ্য, এবং লোভী শঠ হরলাল তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র। বিষয়সম্পত্তি সবই ছিল কৃষ্ণকান্তের নামে। কিন্তু এই সম্পত্তি অর্জিত হইয়াছিল কৃষ্ণকান্ত ও তাঁহার ভ্রাতা রামকান্তের দ্বারা। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালকে ফাঁকি দিতে চাহেন নাই। তাহাকে ন্যায্য সম্পত্তির অর্ধেক অংশ দিয়াছিলেন। সেখানেই পিতার সঙ্গে হরলালের বিবাদ। সে গোবিন্দলালকে ফাঁকি দিতে চায়। জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে সম্পত্তির বারো আনার প্রতিই তাহার লোভ। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তাঁহার বিচারে অটল রহিলেন। হরলাল বিধবা-বিবাহের ভয় দেখাইয়া চরম পত্র লিখিল।

কৃষ্ণকান্ত পুত্র ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করিলেন না। দ্বিতীয়বার উইল পরিবর্তন করিলেন। এবার হরলালের ভাগে শূন্য পড়িল। হরলাল উইল জালের চেষ্টায় আবার হরিদ্রাগ্রামে আসিল। উইল-লেখক ব্রহ্মানন্দের কাছে ব্যর্থ হইয়া হরলাল শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মানন্দের আশ্রিতা ও ভ্রাতৃকন্যা বালবিধবা যুবতী অপরূপ সুন্দরী রোহিণীর সাহায্যপ্রার্থী হইল। যে রোহিণী নিজের দুর্ভাগ্যকে স্বীকার করিয়া পল্লীর এক কোণে শান্তমনে খুড়ার সংসার চালাইতেছিল, তাহাকে দুর্লভ লোভ দেখাইয়া তাহার সুপ্ত নারীত্বকে, তাহার স্বপ্ন-কামনাকে জাগাইয়া তুলিল। রোহিণীর যে তীব্র মনোবৃত্তি তাহার হৃদয়বিবরে শীতাগমনিস্তেজ, কুণ্ডলীকৃত সর্পের ন্যায় সুপ্ত ছিল ইহা তাহাকে তীক্ষ্ণ আঘাত

দিয়া জাগাইয়া তুলিল, দংশনলোলুপা বিষধরবৎ সে ফণা উন্নত করিয়া উঠিল। রোহিণী হরলালের প্রলোভনে উইল চুরি করিল। কিন্তু হরলাল শেষ পর্যন্ত রোহিণীকে প্রত্যাখ্যান করিল। ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে রোহিণী ভাঙিয়া পড়িল।

গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্ত রায়ের আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাহার স্ত্রী ভ্রমর। অচুম্বেল, নিস্তরঙ্গ বিবাহিত প্রেম-জীবনের আবর্তে গোবিন্দলাল ও ভ্রমর সুখে দিনাতিপাত করিতেছিল। তাহাদের ভালবাসায় কোন ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। গোবিন্দলাল কোন বিষয়-বুদ্ধির ধার ধারে না। উইল সম্পর্কে তাহার কোন দুশ্চিন্তা নাই। প্রেম এবং সুন্দরের চর্চায় তাহার জীবন অনাবিল। রোহিণীকে সে বাল্যকাল হইতে জানে। কিন্তু পরস্পর সম্বন্ধে তাহারা বাল্যাবধি উদাসীন। হরলাল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা ক্রন্দনরতা রোহিণীকে এক সন্ধ্যায় তাহার সাজানো বাগানের সন্নিহিত বারুণীর ঘাটে দেখিয়া গোবিন্দলালের স্নেহপ্রবণ স্পর্শকাতর চিত্তে স্বভাবতই সহানুভূতির সঞ্চার হইল। গোবিন্দলালের সাধারণ সমবেদনা ও তাহার দুঃখ-দূরীকরণের আশ্বাসে "নব জাগ্রত-প্রেম-ক্লিষ্ট" রোহিণীর হৃদয়ে গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়ের সঞ্চার হইল। তাহার এই দুঃখময় প্রেমহীন জীবনে একমাত্র সহানুভূতিশীল গোবিন্দলালকে যে উইল চুরি করিয়া সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। হরলালের প্রলোভনে সে হরলালের তৈরী জাল উইল কৃষ্ণকান্তের সিন্দুকে রাখিয়া আসল উইল লইয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর ঐ জাল উইল আসল উইল বলিয়া গণ্য হইবে আর গোবিন্দলালের ভাগে শূন্য পড়িবে। রোহিণীর মনে অনুতাপের সৃষ্টি হইল। পূর্বের অপরাধ সংশোধন করিতে গিয়া সে ধরা পড়িল। "এই বন্দী অবস্থাতেই গোবিন্দলালের সহানুভূতির নিবিড়তর সম্পর্কে আসিয়া সে ভাগ্য পরিবর্তনের এক নূতন সোপানে পা দিল; গোবিন্দলালের নিকট নিজ অনিবার্য প্রণয়াবেগের কথা স্বীকার করিয়া ফেলিল। গোবিন্দলাল আবার এই কথা ভ্রমরের নিকট প্রকাশ করিল; ভ্রমর রোহিণীকে বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে উপদেশ দিল; প্রেমজর্জরা নৈরাশ্য-দগ্ধ-হৃদয়া সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। তারপর গোবিন্দলাল কর্তৃক জলমগ্না রোহিণীর উদ্ধার ও পুনর্জীবন দান; এবং তাহার রোহিণী কর্তৃক আকর্ষণের প্রথম অনুভব—এই সমস্তই এক অলঙ্ঘ্য নিয়তি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উইল চুরির স্বাভাবিক পরিণতিরূপে আসিয়া পড়িল।"

রোহিণীকে বিদেশে পাঠাইতে ব্যর্থ হইয়া গোবিন্দলাল নিজেই বিদেশে [illegible] রোহিণীকে ভুলিতে। ফল হইল আরও বিষময়। ভ্রমর এবং গোবিন্দলালের

সুখময় জীবনের ইতি হইল। ভ্রমর গোবিন্দলালকে অবিশ্বাস করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। গোবিন্দলালের ব্যক্তিত্বে চরম আঘাত লাগিল। সে-ও ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিল। তাহার দোলাচল-চিত্ত রোহিণীর দিকে আকৃষ্ট হইল।

কৃষ্ণকান্ত মৃত্যুশয্যায় পড়িলেন। রোহিণী-গোবিন্দলালের সম্পর্কে কানাঘুষা তাঁহার কানেও পৌঁছাইল। তিনি গোবিন্দলালকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই হয়ত সব গোল মিটিয়া যাইত। ভ্রমর এবং গোবিন্দলালকে তাহাদের ভুল বুঝাবুঝির জন্য সতর্ক করিয়া দিলেই হয়ত ভ্রমর-গোবিন্দলালের জীবন-বিপর্যয় রোধ হইত। কিন্তু তিনি সেই সময় বা সুযোগ পাইলেন না। একেবারে শেষ সময় তিনি উইলের শেষ পরিবর্তন করিলেন। ভাবিলেন, গোবিন্দলালের সম্পত্তি তাহাকে না দিয়া ভ্রমরের নামে লিখিয়া দিলে গোবিন্দলাল নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সংশোধিত হইবে। আবার উইলের পরিবর্তন হইল। "ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের বিরাগের মাত্রা পূর্ণ করিয়া নিয়তি-হস্ত প্রেরিত ছুরিকার ন্যায় দম্পতির মধ্যে ছিন্নপ্রায় বন্ধনসূত্রের শেষ গ্রন্থিটি ছেদন করিল।" হিতে বিপরীত হইল। পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাতের নিকট এই ব্যবহার গোবিন্দলালের নিকট আশাতীত। তাহার অপমানবোধ তীব্র হইল। সে স্ত্রীর সম্পত্তি ভোগ করিতে রাজী হইল না। এই উইলই তাহাকে প্রকারান্তরে হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিল। এই উইলই ভ্রমরের নিকট হইতে তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রোহিণীর রূপমোহে আবদ্ধ করিয়াছে। যাহা হইতে পারিত তাহা হইল না। যাহা হইবার নহে তাহাই হইল। ইহার জন্য উইলই দায়ী। "নিয়তি যেখানে দুর্ভাগা মানবের জন্য জাল পাতিয়া রাখিয়াছে, সেখানে বাহ্য জগতের ঈর্ষা-ক্রূর শক্তি তাহাকে অনিবার্য বেগে সেই আসন্ন বিপদের দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। বাহিরের প্রতিবন্ধক আসিয়া অন্তরের বিরোধটিকে জটিলতর ও অধিকতর দুরতিক্রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে।"

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উইল পরিবর্তনের ইতিহাস শেষ হইয়াছে, কিন্তু কাহিনী শেষ হয় নাই। নায়ক-নায়িকার জীবনেতিবৃত্তের এখনো বাকী আছে। কিন্তু বারবার উইল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ঘটনার যে সংঘাত ও চরিত্রের যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছে তাহাই পরিণতি পর্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে উপনীত হইয়াছে। উইল-সৃষ্টির প্রথম হইতে যে পারিবারিক বিরোধ দেখা দিয়াছে, পারিবারিক বিপর্যয়ের মূলেও সেই উইলই কার্যকরী হইয়াছে, সেজন্য উপন্যাসের নামকরণ হিসাবে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' যুক্তিসংগত হইয়াছে।

[খ] ॥ কৃষ্ণকান্তের উইল : গঠন-কৌশল ॥

"উপন্যাস পূর্ণাবয়ব মানব-জীবনকে কাহিনীবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে স্বতঃ-উদ্ভূত বিশেষ শিল্পরূপ।" উদ্ভবের কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়া এই শিল্পরূপের রূপান্তর ঘটিয়াছে। আধুনিক-কালে বিশেষ ভাবে এই শিল্পরূপের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাতে কোন একটি বিশেষ কাঠামোর মধ্যে এই রূপকে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া চলে না। বিশেষতঃ আধুনিক কালের উপন্যাস-শিল্পীরা চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রতি বেশী ঝুঁকিয়া পড়ায়, আধুনিক কালের উপন্যাসের ঘটনাগত প্রাধান্য অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। বর্তমান কালের যে-কোন লেখকের রচনা দেখিলেই একথা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপন্যাস-শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস-শিল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী। যে-কালে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আমরা সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার বিচার করিতে বসিলে তাঁহার সিদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হই। বঙ্কিমচন্দ্র শুধুমাত্র ভাষারীতি সৃষ্টিতেই দক্ষতা দেখান নাই, উপন্যাসের আঙ্গিক গঠনেও অসাধারণ সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কথা স্মরণে রাখিয়াই রমেশচন্দ্র দত্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন : "Bankim Chandra is in prose what Madhu Sudan was in verse—the founder of a new style, the exponent of a new idea. In creative imagination, in gorgeous description, in power to conceive and in skill to describe, Madhu Sudan and Bankim Chandra stand apart from the other writers of the country......" এই গঠন রীতিতেও বঙ্কিমচন্দ্রের যে স্বকীয়তা ছিল, সে স্বকীয়তা আপন মানস-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। রোমান্স-প্রবণতা বঙ্কিম মানসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়ায় তাঁহার গঠন-রীতিতেও সেই প্রবণতা প্রতিফলিত। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের গঠন-কৌশল সম্পর্কেও একথা সত্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কোন ঘটনা বা কোন সমস্যার একটি মূল অঙ্কুর থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে এই অঙ্কুরটি পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। এক কথায়

ইহাকে বৃত্তাকার উপন্যাস আখ্যা দেওয়া চলে, কেন না যে বিন্দুতে কাহিনীর সূত্রপাত—কাহিনীর পরিসমাপ্তিও সাধারণতঃ সেই বিন্দুতে। ঘটনার অনিবার্য গতি সেই সমস্যা সমাধানের পথে কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত সমাপ্তি-বিন্দুতে টানিয়া আনে।

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত কৌশলে সমগ্র কাহিনীর ঐক্য বজায় রাখিয়াই তাঁহার উপন্যাসটিকে গড়িয়া তোলেন। ইহাই বঙ্কিম রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র এই সাফল্য অর্জন করিয়াছেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল-এ একটিমাত্র কাহিনী আছে। ভ্রমর-গোবিন্দলাল-রোহিণীর কাহিনী। এই উপন্যাসে বালবিধবা রোহিণীর অতৃপ্ত প্রাণের পিপাসা ও দাম্পত্য প্রেম বা সমাজনীতির দ্বন্দ্বই হইল কেন্দ্রীয় সমস্যা। ঘটনার দিক হইতে কেন্দ্রীয় সমস্যা হইল জলমগ্না রোহিণীর পুনর্জীবন দান। হরলাল রোহিণীকে বিধবা-বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া রোহিণীর সুপ্ত অতৃপ্ত বাসনাকে জাগ্রত করিয়াছে। বসন্তের কোকিল তাহাকে তীব্রতর করিয়াছে। গোবিন্দলালের সাধারণ সমবেদনায় রোহিণীর উন্মুখ চিত্তের প্রণয় গোবিন্দলালের দিকে ধাবিত হইয়াছে। ভ্রমর তাহাকে জলে ডুবিয়া মরিতে উপদেশ দিয়াছে। রোহিণী জলে ডুবিয়া অতৃপ্ত প্রণয়জ্বালা শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু গোবিন্দলাল প্রাথমিক চিকিৎসার দ্বারা তাহার পক্ক বিম্বের মত অধরে অধর রাখিয়া ফুৎকার দিয়া রোহিণীকে বাঁচাইয়াছে। আর সেইদিন হইতেই ভ্রমরের কপাল ভাঙ্গিয়াছে। বিড়াল মারিবার লাঠি ভ্রমর নিজের কপালে মারিয়াছে। এই সমস্যাটি কেবল ঘটনার দিক হইতে নহে, হৃদয়ের দিক হইতেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোহিণী-গোবিন্দলাল বাল্যাবধি পরস্পরের পরিচিত কিন্তু এতকাল তাহারা পরস্পরের প্রতি উদাসীন ছিল। রোহিণী গোবিন্দলালের সহানুভূতির পরিচয় পাইয়া পূর্ব হইতেই প্রণয়াবদ্ধ হইলেও গোবিন্দলাল তাহার প্রতি কোনরূপ আকর্ষণ অনুভব করে নাই। কিন্তু এই ঘটনার পর গোবিন্দলালের চিত্ত-দৌর্বল্য আরম্ভ হইয়াছে। রোহিণীর অপরূপ রূপের ছটা তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। গোবিন্দলাল অবশ্য রোহিণীকে ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ঘটনার চক্র-পরিণামে বিস্মরণের পরিবর্তে সে রোহিণীর সহিত ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। ভ্রমর দূরে সরিয়া গিয়াছে। অবশ্য শেষপর্যন্ত গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে রোহিণীর মৃত্যু হইল।

গোবিন্দলাল নানা দেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার ভ্রমরের কাছে উপস্থিত হইল। ভ্রমরের তখন অন্তিম সময়। ভ্রমরেরও মৃত্যু হইল। গোবিন্দলাল দেশত্যাগী হইল।

ইহাই ঘটনার বাহ্যিক বৃত্ত। ইহার সহিত পাকে পাকে জড়িত হইয়াছে রোহিণী-গোবিন্দলাল-ভ্রমরের হৃদয়-সংঘাত। রোহিণী তাহার বৈধব্য জীবনের নিষ্প্রাণ শূন্যতা হইতে প্রেমের মধ্যে মুক্তি চাহিয়াছিল। অপঘাত-মৃত্যুর মধ্যে তাহার সাময়িক উদ্দামতার অবসান হইল। ভ্রমর অভিমানে যে স্বামীকে ত্যাগ করিয়াছিল তাহাই তাহার জীবনে রূঢ় সত্যে পরিণত হইল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল গভীর অনুশোচনার পর পুনর্বার ভ্রমরের মৃত্যুশয্যায় ভ্রমরের সহিত মিলিত হইল। ঘটনার সংগে মানব হৃদয়ের সংযোগে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসের প্লটকে সংযত, সংহত এবং আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছেন। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত পাঠককে বিস্মিত করে, সর্বোপরি ট্র্যাজেডির একটা গুরুগম্ভীর সুর, একটি পরিবারের ধ্বংস ও বিলোপ পাঠককে অভিভূত করে। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় সংশয়-সন্দেহের মেঘ বুঝি এবার কাটিয়া যাইবে—কিন্তু নিয়তি নানাভাবে নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রতিনিয়ত জটিল গ্রন্থিবন্ধন করিয়া গিয়াছে—শেষ পর্যন্ত চারিদিক হইতে প্রতিকূল-শক্তিগুলি জাগিয়া উঠিয়া নায়ক-নায়িকার জীবনের শোচনীয় পরিণতি ঘটাইয়া তুলিয়াছে।

উপন্যাসটি দুইটি খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে-উইল তৈয়ারীর আরম্ভ হইতে শেষ উইল পরিবর্তন পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। রোহিণী ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের মন জুড়িয়া বসিল। আর গোবিন্দলালের হৃদয়ের রাণী ভ্রমর ধীরে ধীরে গোবিন্দলাল হইতে দূরে সরিয়া গেল। গোবিন্দলালের ভ্রমর পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইল। এই খণ্ডে রোহিণীর মনস্তত্ত্বের বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে। এই খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি নাটকীয়। প্রাথমিক পরিস্থিতির পর হইতে গল্প নাটকীয় ভাবে সঙ্কটক্ষণে (climax) পৌঁছিয়াছে দ্বিতীয় খণ্ডে ভ্রমরের দৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে। ভ্রমরের সাত বৎসরের বিরহ ব্যথা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর অপঘাত-মৃত্যু, মাধবীনাথ, পোস্ট মাস্টার, কিচেল খাঁ, নিশাকর প্রভৃতি চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন দ্বিতীয় খণ্ডে কাহিনী সমাপ্তির দিকে ছুটিয়াছে। ভ্রমরকে পরিত্যাগের প

সপ্তম বৎসরে মৃত্যুশয্যায় ভ্রমর গোবিন্দলালের পুনর্মিলন এবং ভ্রমরের মৃত্যুর পর গোবিন্দলালের দেশত্যাগে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটিয়াছে।

ঘটনাসজ্জার দিক হইতে উপন্যাসের কাহিনীটিকে একটি বৃত্তের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যে বিন্দুতে উহার সূচনা, দূর পথ-পরিক্রমার পর সেই বিন্দুতেই উহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। জলমগ্ন রোহিণীর অপরূপ রূপ-লাবণ্যে এবং রোহিণীর জীবনের অশেষ দুঃখের কথা শুনিয়া গোবিন্দলালের চিত্ত-বৈকল্য হইয়াছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়-চিত্তে সে ভ্রমরকে সেই কথা খুলিয়া বলিতে পারিল না। রোহিণীকে ভুলিবার জন্য এই প্রথম গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই যাত্রাই তাহার কাল হইল। চাকরাণী সম্প্রদায় এবং পাড়া প্রতিবাসীদের মুখরোচক রটনা-কৌশলে ভ্রমর গোবিন্দলালকে অবিশ্বাস করিল। তাই গোবিন্দলাল বাড়ী ফিরিতেছে শুনিয়া অভিমানে সে পূর্বেই কৌশলে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। উপন্যাসের এইখানেই শীর্ষ ভ্রান্তি। ভ্রমর যদি চলিয়া না যাইত তাহা হইলে গোবিন্দ-লালের সঙ্গে বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত। কিন্তু ভ্রমরের আচরণে তাহা হইল না। তাহার এই অযথা অবিশ্বাস গোবিন্দলালের কাছে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। উপরন্তু কৃষ্ণকান্ত কর্তৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ায় এখন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা লাগিল। স্ত্রীর দয়ার পাত্র হইয়া থাকিতে সে চাহিল না। তাহার নিকট জীবন অসার, আশাশূন্য, প্রয়োজন-হীন মনে হইল। মাটির ভাণ্ডের মত যেদিন ইচ্ছা সেদিন তাহা ভাঙিয়া ফেলিতে সংকল্প করিল। ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া সে দূরে চলিয়া গেল। নানা দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া শেষে রোহিণীকে লইয়া প্রসাদপুরে বিলাস মোহে দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু নিশাকরের চক্রান্তে সেই সাময়িক সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। রোহিণীকে সে গুলি করিয়া মারিল। পুলিশের চোখে ধুলা দিয়া সাধুর বেশে বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিল। পুলিশ চার বৎসর পর তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথের চেষ্টায় সে ছাড়া পাইল। তথাপি ভ্রমরের কাছে আসিল না। ছয় বৎসর পরে নিঃস্ব অবস্থায় গোবিন্দলাল ভ্রমরের সাহায্য এবং আশ্রয় ভিক্ষা করিল। কিন্তু ভ্রমর জানাইল গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে ফিরিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে ভ্রমর সেখানে থাকিবে না। ভ্রমর এখনো গোবিন্দলালের মুখদর্শন করিতে চাহে নাই। পরে ভ্রমরের মাসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া গোবিন্দলাল

কলিকাতায় বাস করিতে লাগিল। সপ্তম বৎসরে ভ্রমরের মৃত্যুশয্যায় গোবিন্দলাল দেখা দিল। বিচ্ছেদের বৃত্ত মিলনে পূর্ণ হইল। গোবিন্দলালের এই মর্মান্তিক প্রত্যাগমন বঙ্কিমচন্দ্র সহজে ঘটিতে দেন নাই। যে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ভুলিবার জন্ত রোহিণীর রূপ ধ্যান করিল সেই গোবিন্দলালকে দিয়াই রোহিণীকে মারিলেন, যে গোবিন্দলাল ভ্রমরের দান গ্রহণ করিবে না বলিয়া দেশত্যাগ করিয়াছিল সেই গোবিন্দলাল নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় ভ্রমরের কৃপাপ্রার্থী হইল। ভ্রমর তখনো তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। তথাপি গোবিন্দলাল ভ্রমরের সাহায্যেই জীবনধারণ করিতে লাগিল এবং মৃত্যু-শয্যায় গিয়া ভ্রমরের পার্শ্বে উপনীত হইল।

গোবিন্দলালের এই পতন শোচনীয়। তাহার অন্তিম পরিণতি আরো মর্মান্তিক ; ভ্রমরের মৃত্যুর পরদিন গোবিন্দলালের উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিষম বিকার প্রাপ্ত হইল। সে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। "তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল। দুই মাস ধরিয়া তাহার চিকিৎসা হইল।" গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইয়া একরাত্রে নিরুদ্দেশ হইল।

সাত বৎসরের পর তাহার শ্রাদ্ধ হইল।

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় যখন এই উপন্যাস প্রকাশ লাভ করিয়াছিল তখন এই কাহিনীর পরিণতি ছিল অন্যরূপ। সেখানে গোবিন্দলালের আত্মহত্যায় গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল। কিন্তু গ্রন্থাকারে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত গোবিন্দলালের চিত্ত-বিকার ঘটিলেও সে মরে নাই। চিকিৎসায় প্রকৃতিস্থ হইয়া সে পরম শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে অজ্ঞাতবাস করিল। সেজন্য তাহার শ্রাদ্ধের মধ্যে কাহিনী শেষ হইলেও উপন্যাস শেষ হয় নাই। উপন্যাস শেষে বঙ্কিমচন্দ্র 'পরিশিষ্ট' অংশ জুড়িয়া দিয়া গোবিন্দলালের অন্তিম পরিণতি দেখাইয়াছেন। বার বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়া সে ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছে। "গোবিন্দলালের শেষ বয়সে সন্ন্যাসে শান্তিলাভ—প্রকৃত পক্ষে উপন্যাসের সীমা বহির্ভূত ; ইহা আর্ট অপেক্ষা রুচি ও বিশ্বাসেরই কথা।"

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর গঠন কৌশল সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "কৃষ্ণকান্তের উইল-এ বিশেষ বর্ণনা-বাহুল্য নাই, লেখক নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাগুলিতেই আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, যেন

গ্রন্থের বিষাদময় পরিণতি তাঁহার কল্পনাবিলাসের পক্ষচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থের সর্বত্রই একটা সংযত ভাব-প্রকাশ, একটা পরিমিত সামঞ্জস্যবোধ, একটা নির্দোষ ঘটনা-বিন্যাসশক্তি ও একটা বিদ্যুৎ-রেখার ন্যায় ক্ষিপ্রগতি ও উজ্জ্বল বুদ্ধির নিদর্শন দেদীপ্যমান। গ্রন্থের প্রত্যেক পরিচ্ছেদ নিয়তির অদৃশ্য রজ্জুর যেন এক-একটি পাক ; উপন্যাসটি যেমন সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তেমনই এই বন্ধন যেন কাটিয়া কাটিয়া আমাদের হৃদয়ে গভীরতর ভাবে বসিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রহস্যময় সাংকেতিকতার দিকে যে প্রবণতা তাহা এই কঠোর বাস্তব উপন্যাসেও দুই-একটি ক্ষুদ্র ইঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গোবিন্দলাল যে মুহূর্তে রোহিণীর অধরে অধর স্থাপন করিয়া ফুৎকার দিলেন, ভ্রমর ঠিক সেই মুহূর্তে বিড়ালকে লাঠি মারিতে গিয়া নিজের কপালে লাঠি মারিয়া বসিল। জগতের এই রহস্যময় ইঙ্গিতগুলির প্রতি সূক্ষ্মদর্শিতা আমাদিগকে ক্ষণেকের জন্য E. A. Poe বা Nathaniel Hawthorne-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও উচ্ছ্বসিত কল্পনা লীলা প্রথম খণ্ডের সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদে ভ্রমর-গোবিন্দলালের পরস্পরের প্রতি পরিবর্তিত ব্যবহারের বর্ণনায় একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। অতি অল্প স্থানের মধ্যে এরূপ গভীর ভাবপ্রকাশ, বিশ্লেষণ ও কবিত্ব শক্তির এরূপ অসাধারণ সম্মিলন আর কোন উপন্যাসে পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্গ-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস, ইহা বঙ্কিম-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।"

"কৃষ্ণকান্তের উইল-এর ঘটনা বিষবৃক্ষের অনুরূপ। সেখানেও বালবিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রনাথের মোহ এবং সূর্যমুখী-নগেন্দ্রনাথের দাম্পত্যজীবনের দ্বন্দ্ব দেখান হইয়াছে। সেখানে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর পর নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর পুনর্মিলন সুখের হইয়াছিল। এই পরিণাম সংগঠনে অবশ্য দুইটি উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। সেখানে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বিষবৃক্ষের অপেক্ষা বাস্তবতার অধিকতর অনুগামী। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পুনর্মিলন অনেকটা রোমান্সসুলভ আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিপদ-ঝটিকার পূর্ণবেগ কুন্দনন্দিনীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, সূর্যমুখী নগেন্দ্র যেন একটা স্বল্পকালব্যাপী দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া আবার তাহাদের চিরাভ্যস্ত প্রেমের জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ নায়ক-নায়িকা এত সহজে অব্যাহতি পায় নাই। লেখক

পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া. বাধার উপর বাধা স্তূপীকৃত করিয়া, ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধ্যে যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে ; তাহাদের গভীর মনোব্যথার কোন সুলভ সমাধান সম্ভব হয় নাই। ভ্রমর, গোবিন্দলাল, রোহিণী, ইহাদের প্রত্যেকের উপর দিয়াই নিয়তি তাহার নিষ্করুণ রথচক্র চালাইয়া গিয়াছে ; কোন সদয় হস্ত তাহাদের চক্রগতির সীমার বাহিরে পথপার্শ্বে সরাইয়া রাখে নাই। লেখক এখানে রোমান্সের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের মায়ায় ভুলেন নাই, নিয়তির অমোঘ পথ-রেখারই অনুবর্তন করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের অপেক্ষা গোবিন্দলালের নিষ্ঠুরতা আরও হৃদয়হীন ও প্রায়শ্চিত্ত আরও কঠোর, সূর্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমরের দুঃখ আরও মর্মস্পর্শী ; সূর্যমুখীর একান্ত ক্ষমা অপেক্ষা ভ্রমরের অনির্বাণ অভিমান ও হত্যাকারী স্বামীর বিরুদ্ধে নিবৃত্তিহীন বিরাগ অধিকতর বাস্তবানুগামী।...'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব-প্রণালীর অনুসরণ করিয়াও তাঁহার চিরপ্রিয় রোমান্সের প্রভাব হইতে নিজেকে একেবারে মুক্ত করেন নাই, তাঁহার দৃষ্টি ও নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে রোমান্সের একটি অতি সূক্ষ্ম রঙীন যবনিকার ব্যবধান রাখিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ এই সূক্ষ্ম যবনিকাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। বঙ্কিম সমস্ত বাধা ব্যবধান সরাইয়া ফেলিয়া, অকম্পিত চক্ষুতে অবিমিশ্র বাস্তবতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন এবং আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের মধ্যে একটি অসাধারণ রসপূর্ণ ও দুঃখ-গৌরব-মণ্ডিত সংঘাতের চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।"

(গ) ॥ চরিত্র-বিশ্লেষণ ॥

॥ **কৃষ্ণকান্ত** ॥ কৃষ্ণকান্তের উইলে "যে সকল চরিত্র চিত্র-রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে কৃষ্ণকান্তের চিত্র সর্বপ্রধান। তিনি 'সেকালের' একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ কর্তা ও প্রভাবশালী আদর্শ ধনী জমিদার। সেইজন্যই যখন পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল তখন—

"কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর সংবাদে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে, কেহ বলিল, দিকপাল মরিয়াছে, আবার কেহ বলিল, পর্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে যথেষ্ট দান করিতেন। সুতরাং অনেকেই তাঁহার জন্য কাতর হইল।"

তিনি যে খাঁটি লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার উইলেই সপ্রকাশ। বিপুল সম্পত্তি তাঁহার নামেই ছিল। যখন নাবালক পুত্রমাত্র রাখিয়া তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু হইল, তখন—

"যদি কৃষ্ণকান্ত এমত অভিলাষ করিতেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহা হইলে তৎসাধনপক্ষে এখন আর কোন বিঘ্ন ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তিনি গোবিন্দলালকে আপন সংসারে পুত্রদিগের সহিত সমানভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং উইল করিয়া আপনাদিগের উপার্জ্জিত সম্পত্তির যে অর্ধাংশ ন্যায়মত রামকান্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্দলালকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন।"

তিনি ধর্মভীরু—পুত্র হরলাল তাঁহাকে সেবিষয়ে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না। হরলাল পিতার প্রকৃতি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইল, সমাজে অপ্রচলিত রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত বিধবা-বিবাহ করিবে। খাঁটি লোক কৃষ্ণকান্ত তাহাকে ত্যাগ করিলেন—ধর্ম ত্যাগ করিলেন না।

এদিকে তিনি পাকা বিষয়ী লোক। অহিফেনের নেশায়ও তাই, 'বিক্রয় কোবালা,' 'ফোরক্লোজ' প্রভৃতি দেখিতেছিলেন। বিষয়কর্ম তিনি নখ-দর্পণে রাখিতেন। তিনি স্বয়ং সদর কাছারিতে বসিয়া কাজ দেখিতেন ও করিতেন। তাঁহার বিষয়কর্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন :

"গদির উপর মসনদ করিয়া বসিয়া সোনার আলবোলায় অম্বুরি তামাক চড়াইয়া মর্ত্যলোকে স্বর্গের অনুকরণ করিতেছিলেন। একপাশে রাশি রাশি দপ্তরে বাঁধা চিঠা, খতিয়ান, দাখিলা, জমা-ওয়াশীল, থোকা, করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়—আর একপাশে নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, মুহুরি, তহশীলদার, আমিন, পাইক, প্রজা।"

তিনি অনায়াসে বলিতে পারিতেন, "আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারী কি? আমিই থানা,' আমিই মেজেস্টর, আমিই জজ।" যে সকল লোকের কথায় বলা হইত, প্রতাপে 'বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়'—তিনি সেই সম্প্রদায়ের লোক।

কিন্তু কৃষ্ণকান্তের হৃদয়ে কোমল ও কঠোরের সম্মিলন হইয়াছিল। তিনি

পুত্র হরলালের অসঙ্গত কথা শুনেন নাই—তাহার বিধবা-বিবাহ করার ভয় দেখানোয় বিচলিত হন নাই ; অপর পুত্রের বিনীত নিবেদন তাঁহাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু গোবিন্দলালের সম্বন্ধে তাঁহার দৌর্বল্য ছিল। সে তাঁহার মৃত ভ্রাতার একমাত্র পুত্র—ভ্রাতার স্মৃতি। সেইজন্য "গোবিন্দলাল আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র"। উদ্যানবাটিকায় গোবিন্দলাল যে বহু অর্থ ব্যয় করিত, তাহাও তিনি জানিতেন—একান্নবর্তী পরিবারে অর্থ একই তহবিলে থাকে। কিন্তু তিনি তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই গোবিন্দলালের অনুরোধে তিনি রোহিণীকে ছাড়িয়া দিলেন।

গোবিন্দলাল মহালে যাইবার প্রস্তাব করিলে কৃষ্ণকান্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দলাল মহাল হইতে ফিরিতেছে সংবাদ পাইয়া ভ্রমর পিত্রালয়ে যাইবার জন্য মাতাকে আপনার পীড়ার সংবাদ দিয়া পিত্রালয়ে যাইবার কথা লিখিলে—বৈবাহিকের পত্র পাইয়া শিষ্টাচার রক্ষার্থে কৃষ্ণকান্ত ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সে কেবল "চারিদিনের কড়ারে", অর্থাৎ গোবিন্দলালের আগমনের পূর্বেই তাহার প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করিয়া। গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিয়া যখন তাহার মাতার নিকট বলিল, ভ্রমরকে আনয়নের জন্য লোক পাঠান হইবে না, তখন যে কৃষ্ণকান্ত সেই মতেই কার্য করিয়াছিলেন, সে-ও গোবিন্দলালের প্রতি স্নেহের আতিশয্যে। নহিলে তিনি গৃহকর্তা, তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের মত অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া বধূকে আনিতে পাঠাইতে পারিতেন, এবং ভ্রমর তখন আসিলে হয়ত ঘটনার গতি অন্যরূপ হইত।

রোহিণীর সহিত গোবিন্দলালের নাম সম্মিলিত হইয়া যে জনরবের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার গুঞ্জন কৃষ্ণকান্তের কর্ণগোচর হইয়াছিল। "কৃষ্ণকান্ত দুঃখিত হইলেন। গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক ঘটিলে তাঁহার বড় কষ্ট।" সে তাঁহার পুত্রাধিক—অত্যন্ত স্নেহের। তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন—হয়ত গোবিন্দলালের জন্য দুঃখ ও চিন্তা তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের অন্যতম কারণ। তিনি "গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ করিবেন" মনে করিলেন। কিন্তু পীড়া বৃদ্ধি পাইল, তিনি মনে করিলেন—"বুঝি চিত্রগুপ্তের হিসাব নিকাশ হইয়া আসিল—এ জীবনের সাগর-সঙ্গম বুঝি সম্মুখে।" শেষ দিন সমাগত তাহা বুঝিয়া তিনি রোগশয্যা-পার্শ্বে গোবিন্দলালকে পাইয়া তাহাকে তাঁহার বক্তব্য বলিতে চাহিলেন—সেজন্য আর সকলকে স্থানান্তরে যাইতে বলিলেন, কিন্তু

সেদিন আর বলা হইল না। গোবিন্দলাল জ্যেঠতাতকে শ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিত, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সে স্বয়ং ব্যস্ত হইয়া বৈদ্যকে আনিতে গেল। বৈদ্য আসিলে তিনি ঔষধ ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "বিষণ্ণ হইবেন না। ঔষধ খাইয়া বাঁচিবার বয়স আমার নহে। ঔষধের অপেক্ষা হরিনামে আমার উপকার। তোমরা হরিনাম কর, আমি শুনি।" এ যেন স্থির নির্দেশ:

"Sun-set and evening star,
And one clear call for me;
And may there be no morning of the bar;
When I put out to sea."

কিন্তু তখনও তিনি গোবিন্দলালের হিতচিন্তা করিতেছিলেন। তিনি "মুমূর্ষ অবস্থায় কতকটা লুপ্তবুদ্ধি হইয়া, কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়া গোবিন্দলালের হিতের জন্যই উইল পরিবর্তিত করিলেন—বলিলেন, গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া তাহার স্থানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ভ্রমরের নাম লেখ। ভ্রমরের অবর্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্ধাংশ পাইবে লেখ।" যে ভার তাঁহার মনে থাকিয়া তাঁহকে পীড়িত করিতেছিল, তিনি তাহা দূর করিয়া শান্তিতে মরিতে চাহিয়াছিলেন—"সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে তুলসীতলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোক গমন করিলেন।"

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুতে সত্যই একজন দিক্‌পালের কার্য শেষ হইয়াছিল।

॥ **গোবিন্দলাল** ॥ গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামের জমিদার বংশের সন্তান, পিতার একমাত্র পুত্র—পিতৃহীন বলিয়া জ্যেঠতাত কৃষ্ণকান্ত রায়ের বড় আদরের। তাহার সহিত পাঠকের প্রথম পরিচয় বারুণী পুষ্করিণীর কূলে পুষ্পোদ্যানে। সে বিলাসী, নিষ্কলুষ, হৃদয়বান ও রূপবান যুবক। তাহার বহু অর্থব্যয়ে তৈয়ারী পুষ্পোদ্যানে সে প্রত্যহ বিকালে বেড়াইতে যাইত। একদিন সে দেখিল, "পুষ্করিণী হইতে জল লইতে আসিয়া গ্রামের ব্রহ্মানন্দ ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্রী বিধবা রোহিণী ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে। সূর্য অস্ত গেল—চন্দ্রোদয় হইল। গোবিন্দলাল উদ্যান হইতে গৃহে ফিরিবার সময় দেখিল, রোহিণী তখনও ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে, দেখিয়া তাহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তাহার মনে হইল—এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, বা দুশ্চরিত্রা হউক,

এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ—আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি, কেন করিব না?" এই নিষ্পাপ দার্শনিকোচিত মনোভাব লইয়াই গোবিন্দলাল রোহিণীকে করুণা দেখাইতে গেল। সে বুঝিতে পারে নাই তাহার অহেতুকী করুণাই একদিন তাহার 'কাল' হইবে।

গোবিন্দলালের হৃদয় তখন ভ্রমরময় ছিল। পত্নী ভ্রমরও তাহার রূপে মুগ্ধ। রোহিণী ছিল অপরূপ সুন্দরী। বাল্যকাল হইতেই গোবিন্দলাল রোহিণীকে জানিত, কিন্তু কখনও তাহার প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করে নাই। ভ্রমর রূপসী ছিল না। তথাপি ভ্রমরকে লইয়াই গোবিন্দলালের সুখে দিন কাটিতেছিল। এমনি একদিন যখন গোবিন্দলাল ও ভ্রমর পরস্পরের প্রেমে পরিতৃপ্তির পূর্ণ আনন্দসম্ভোগ করিতেছিল তখন গৃহে দাসীদের মধ্যে রোহিণীর ধরা পড়ার কথা লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। ভ্রমর তাহাদের আলোচনা শুনিয়া গোবিন্দলালকে সংবাদ দিল। পরদুঃখকাতর গোবিন্দলাল রোহিণীকে বাঁচাইতে চলিল। এবং সেইদিনই রোহিণীর মুখে তাহার প্রতি রোহিণীর প্রণয়ের কথা জানিতে পারিল। কিন্তু তখন তাহার প্রাণে লালসার উচ্ছ্বাস জাগে নাই। গোবিন্দলাল বুঝিল, ইহা ভাল কথা নহে। রোহিণী কাছে থাকিলে এই প্রণয়ের দাহ বাড়িবে বই. কমিবে না। সেজন্য গোবিন্দলাল নিজের অর্থ দিয়া রোহিণীকে কলিকাতায় পাঠাইতে চাহিল। গোবিন্দলাল রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইল। তাহার "সমুদ্রবৎ হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।" মুখে বলিল, "রোহিণী, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভাল"—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মৃত্যু হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিল। রোহিণী ও রোহিণীর খুড়াকে কলিকাতায় যাইতে বলিল, কারণ স্বরূপ সে রোহিণীকে বলিল, "তোমার আমার আর দেখাশুনা না হয়।"

গোবিন্দলালের সহিত এই স্থানেই 'চন্দ্রশেখর'-এর প্রতাপের প্রভেদ সুস্পষ্ট হইয়াছে। প্রতাপ শৈবলিনীর রূপজ মোহে মুগ্ধ হন নাই—তাহাকে ভালোবাসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন,—"তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম।" সেইজন্যেই রামানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মাণ্ড জয় তোমার এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না।"

—আর "ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্ত-সংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান নহেন।" আর গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন—"যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ের কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও।"

রোহিণী দেশত্যাগে প্রথমে স্বীকৃত হইয়াও পরে দেশত্যাগ করিল না। কারণ দেশত্যাগ করিলে সে গোবিন্দলালকে আর দেখিতে পাইবে না। গোবিন্দলালের 'করুণাই' রোহিণীকে হরিদ্রাগ্রামে বাস করিতে কৃতসংকল্প করিয়াছিল—তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল সে তাহার রূপের রজ্জুতে গোবিন্দলালকে বদ্ধ করিয়া আপনার কাছে আনিতে পারিবে।

"পাপকে ঘৃণা করিও কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না।" গোবিন্দলালের মনে রোহিণীর প্রতি দয়া দেখা গেল, কিন্তু রোহিণীর প্রণয়কে সে পাপ বলিয়া ঘৃণা করিল না। সেজন্য রোহিণী যখন স্বেচ্ছায় মরিবার জন্য ডুবিল তখন গোবিন্দলাল রোহিণীকে মালীর সাহায্যে বাঁচাইয়া তুলিল। সেদিন রোহিণীর রূপ দেখিয়া গোবিন্দলাল বিস্মিত হইল। তাহার চক্ষুতে জল আসিল। বলিল,—"মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন।" রোহিণীকে পাইবার জন্য তখনো তাহার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগে নাই। তারপর রোহিণী বাঁচিল। চৈতন্যলাভ করিয়াই অভিমানের সুরে বলিল, "আমাকে কেন বাঁচাইলেন?" গোবিন্দলাল বলিল, "আত্মহত্যা মহাপাপ।" রোহিণীর সেই বিচারে আগ্রহ ছিল না। সে বলিল, গোবিন্দলালকে লাভ করিতে না পাবায় তাহায় "দিন রাত্রি দারুণ তৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই সুশীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে স্পর্শ করিতে পারিব না।" রোহিণী চলিয়া গেল, আর—গোবিন্দলাল সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন—'হা নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর। তুমি বল না দিলে কাহার বলে এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে; তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।" গোবিন্দলাল তখনও মানুষের স্বভাবজ সংস্কারগত ভাব জয় করিতে পারে নাই। সে জানিত পাপের ফল মৃত্যু। সে কেবল মনে করে নাই—দয়া হইতে মোহ উৎপন্ন হইতে পারে—"Pity melts the

mind to love." গোবিন্দলাল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ী ফিরিল। তাহার বিলম্বের কারণ ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। কিন্তু সে তাহাকে কিছু বলিতে পারে নাই। কেবল বলিল, "তুমি এখন বালিকা, সে কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।" তথাপি ভ্রমর যখন জেদ করিতে লাগিল তখন তাহাকে দুই বৎসর পরে বলিবে বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। আসলে গোবিন্দলাল রোহিণীর অকপট প্রণয়দাহের কথা শুনিয়া হতবাক্ হইয়া গিয়াছে। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহার সরলা বালিকা পত্নী ভ্রমর এই ব্যাপারে কোন সাহায্য করিতে পারিবে গোবিন্দলাল তাহা ভাবে নাই। এখানে গোবিন্দলাল ভুল করিল। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি বয়সে পরিমাপ হয় না। পূর্বেও একবার গোবিন্দলালের বড় ভাবনা হইয়াছিল। ধরা পড়ায় পর রোহিণী গোবিন্দলালকে বলিয়াছিল, "যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই—যাহা ইহজন্মে আর পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।" গোবিন্দলাল সেদিন ভ্রমরকে বলিয়াছিল, "আমি রোহিণীকে ভালোবাসি না। রোহিণী আমায় ভালোবাসে।" গোবিন্দলাল যদি সরল ভাবে সেই সন্ধ্যার কথাও ভ্রমরকে বলিত, তবে হয়তো সে অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইত। রোহিণীর অতুলনীয় রূপরাশি যে গোবিন্দলালের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটায় নাই তাহা নহে। কিন্তু গোবিন্দলাল মনে মনে শপথ করিয়া স্থির করিয়াছিল—"মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না।" সে মনে মনে স্থির করিল যে "বিষয়কার্যে মনোনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিব—স্থানান্তরে গেলে নিশ্চিত ভুলিতে পারিব।" তাহার মনে পড়িল 'Out of sight out of mind."

তালুক তদারকের অছিলায় গোবিন্দলাল জমিদারি পরিদর্শনে গেল, কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। রোহিণীর পরিবর্তে ভ্রমর গোবিন্দলালের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল। ক্ষিরোদা-চাকরাণী যখন দেখিল, "একরত্তি মেয়েটা ভ্রমর তাহার কথা বিশ্বাস করে না, তখন সে পথেঘাটে যাহাকে পাইল তাহার কাছেই গোবিন্দলাল-রোহিণীর কুৎসিত কাহিনী রটনা করিল। গোবিন্দলাল প্রথম ভ্রমরের পত্রে তাহার পর ব্রহ্মানন্দের পত্রে তাহার সংবাদ পাইল। যে "গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস ছিল" সেই ভ্রমর তাহাকে অভিযোগ করিয়া পত্র দিয়াছে। লিখিয়াছে, "তোমার দর্শনে

আমার আর সুখ নাই।" অপরদিকে ব্রহ্মানন্দ লিখিয়াছেন, ভ্রমরই তাহার এবং রোহিণীর বিষয়ে নানা কুৎসা প্রচার করিতেছে। বিস্মিত গোবিন্দলাল তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ভ্রমর সেই কথা শুনিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল না। তাহার পৌরুষে আঘাত লাগিল। মনে করিল—"এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না?"

গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পিত্রালয় হইতে আনিতে নিষেধ করিয়াই নিরস্ত হইল না— ভ্রমরের সম্বন্ধে যে দৌর্বল্য মনে ছিল তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য মনে করিল- -"ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, রোহিণীর চিন্তা।" অনেক কুচিকিৎসক ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করে। গোবিন্দলালও রোহিণীর রূপ ধ্যান করিতে লাগিল। "রোহিণীর কথা প্রথমে স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল; দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল বারুণীতটে, পুষ্পবৃক্ষ-পরিবেষ্টিত মণ্ডপমধ্যে উপবেশন করিয়া সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন।" সেখানে রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের দেখা হইল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে এ কথা রটাইল? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন?" রোহিণী বাগানের বৈঠকখানায় গিয়া গোবিন্দলালকে সকলই বলিল। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের তাহার বিবরণ দেন নাই। কেবল বলিয়াছেন, "সে রাত্রে রোহিণী গৃহে যাইবার পূর্বে বুঝিয়া গেল যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।" আলোচনার কোন বিবরণ না পাওয়ায় আমরা এটুকু অনুমান করিতে পারি যে, ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের রাগ এতটুকু কমে নাই।

কৃষ্ণকান্ত তখন পীড়িত। রোহিণী ও গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হইয়া তাঁহার কানে উঠিল। তিনি দুঃখিত হইলেন। "গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক ঘটিলে তাঁহার বড় কষ্ট। গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ করিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সময়াভাবে তিনি তাহা পারিলেন না। অন্তিম সময়ে তাঁহার উইলে কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া দিয়া তাহার স্থানে ভ্রমরের নাম লিখাইলেন। "ভ্রমরের অবর্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্ধাংশ পাইবে।" গোবিন্দলালের কর্তব্যবুদ্ধি, স্নেহশীল পিতৃব্যের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা সেই

মৃত্যুর ছায়াগম্ভীর কক্ষে আত্মপ্রকাশ করিল, সে পিতৃব্যের স্বাক্ষরান্তে আপনি "উপযাচক হইয়া উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষীস্বরূপ স্বাক্ষর করিল।"

কিন্তু গোবিন্দলালের পক্ষে কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুকালীন নির্দেশ তাঁহার মৃত্যুর পরেই যেন "ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার"—হইল। সে মনকে বুঝাইল, যে পিতৃব্য তাহার পিতার অধিক ছিলেন, তিনি তাহাকে অপমান করিয়া গিয়াছেন—স্ত্রীর অন্নদাস করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বংশের মর্যাদা রক্ষার্থে সে শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিল।

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর ভ্রমর আসিল। গোবিন্দলালের সঙ্গে তাহার প্রথম সাক্ষাৎ কৃষ্ণকান্তের জন্ত শোক-ক্রন্দনে কাটিল। তাহার পরেও রোহিণীর কথা কেহই বলিল না। তবে ভ্রমর-গোবিন্দলালের সেই মধুর সম্পর্ক আর নাই। উভয়ে উভয়ের সম্পর্কে নীরবতা পালন করিয়া চলিল। শ্রাদ্ধের পর উইল পড়ার যন্ত্রণা শেষ করিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল সেই নীরবতা ভঙ্গ করিল। ভ্রমরকে উইলের কথা জানাইয়া বলিল, "তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।" ভ্রমর তখন তাহার পিত্রালয়ে যাইবার জন্ত অপরাধ স্বীকার করিল। কিন্তু তখন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দলালকে আমরা দেখিয়াছি, সে স্থিরসংকল্প, স্বল্পভাষী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। ভ্রমর অভিমান করিয়া চারদিনের জন্ত পিত্রালয়ে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর এতদিন তাহার অভিমান থাকিবার কথা নহে। সে পূর্বেই নিজেই আসিতে পারিত। গোবিন্দলালের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তাহার অপরাধ স্বীকার করা উচিত ছিল। ভ্রমর যখন গোবিন্দলালের কাছে দোষ স্বীকার করিল তখন সে ভ্রমরকে অপরাধী স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। "ভ্রমর যে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছিল, অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে এত কঠিন পত্র লিখিয়াছিল—একবার তাঁহাকে মুখে সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিল না, এই তাহার অপরাধ যার জন্ত এত করি, সে এত সহজে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, এই তাহার অপরাধ। গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিল, এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী। এর গুণ আছে, তার রূপ আছে, এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব—আমার এ আশাশূন্ত, প্রয়োজনশূন্ত জীবন ইচ্ছামত চালাইব। মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।" গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিল। মাতৃসঙ্গে কাশীযাত্রার সুযোগ তাহাকে আরও দৃঢ় করিল।

তবুও অনুভূতিপ্রবণ গোবিন্দলালের মনে একবার অনুশোচনার ভাব দেখা দিল। যে পরিচিত স্থল ছাড়িয়া অপরিচিত সমুদ্রে তরী ভাসাইতে যায়, বোধ হয়, তাহার মনে এক একবার পরিচিত পুরাতনের প্রতি আকর্ষণ অনুভূত হয়। "বালিকার অতি সরল যে প্রীতি, অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিনরাত্রি ছুটিতেছে—ভ্রমরের কাছে সেই অমূল্য প্রীতি পাইয়া গোবিন্দলাল সুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা পৃথিবীতে পাইবেন না।" কিন্তু "যাহা করিয়াছি, তাহা আর এখন ফিরে না—এখন যাই।" সে ফিরিল না, কারণ, সে মনকে বুঝাইল, যাত্রা করিয়া ফিরিলে লজ্জা পাইতে হইবে।

গোবিন্দলাল মাতাকে কাশীতে রাখিয়া আসিবার সুযোগ লইয়াছিল—সে কাশীতে থাকিবার জন্যও যায় নাই, আবার হরিদ্রাগ্রামে ফিরিবার জন্যও যায় নাই। মাতাকে কাশীতে রাখিয়া গৃহে ফিরিবার কথা বলিয়া—মাতাকে মিথ্যায় ভুলাইয়া কাশী ত্যাগ করিল। অধঃপতনের পথে গেল। সে পথে রোহিণী তাহার সঙ্গী। লক্ষ টাকা ও রোহিণীকে সঙ্গে লইয়া গোবিন্দলাল অভিশপ্ত নীলকুঠি ক্রয় করিয়া বিলাসময় জীবন যাপন করিতে লাগিল। রোহিণী দূরে ছিল—নিকটে আসিল; আর ভ্রমর নিকটে ছিল,—দূরে গেল। তাহার গুণ গোবিন্দলালের মনে পড়িতে লাগিল। গোবিন্দলাল "রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে এ ভোগ, এ সুখ নহে—মন্দার ঘর্ষণ-পীড়িত বাসুকিনিঃশ্বাস-নির্গত হলাহল, ধন্বন্তরি-ভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে।" রোহিণী তাহার অধঃপতনের কারণ, কি সে রোহিণীর অধঃপতনের কারণ, সে বিচার গোবিন্দলাল করিয়াছিল কিনা, বলিতে পারি না। কিন্তু সে মনে মনে অনুভব করিতেছিল—

"পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।"

নিশাকরের চক্রান্তে গোবিন্দলালের রোহিণী মোহ দূর হইল। রোহিণী চরিত্রের কাপট্য সে সহ্য করিতে পারিল না। হত্যা করিবার পূর্বে রোহিণীকে সে তাই বলিল,—"তুমি কি রোহিণী, যে তোমার জন্য ভ্রমর,—জগতে অতুল,

চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর—তাহা পরিত্যাগ করিলাম ?" সে রোহিণীকে হত্যা করিল।

স্ত্রীলোকের জীবননাশ যে পুরুষের জীবননাশ অপেক্ষা ঘৃণ্য, ইহা হিন্দুর সংস্কার বৈশিষ্ট্য, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বেদ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তাহা বলিয়াছেন। গোবিন্দলাল সেই স্ত্রীলোকের জীবননাশ করিল ইহা একটু অস্বাভাবিক। গোবিন্দলাল কখনো হঠকারী ছিল না, রোহিণী চরিত্রের কাপট্যের প্রথম পরিচয় সে নিশাকরের ঘটনায় পাইয়াছিল। তাহার পূর্বে রোহিণীর কারণে গোবিন্দলাল কখনো দুঃখ পায় নাই। রোহিণীর প্রথম অপরাধেই গোবিন্দলাল তাহাকে গুলি করিয়া বসিল, ইহা ভাবিতে কষ্ট হয়।

রোহিণীকে হত্যা করিয়া গোবিন্দলাল পলাইয়া গেল। গৃহত্যাগের পর পঞ্চম বৎসর সে পুলিশের হাতে ধরা পড়িল। তাহার পৈতৃক সম্পত্তি কৃষ্ণকান্ত ভ্রমরকে দিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া যে গোবিন্দলাল একদিন ভোগ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল, বিপদে পড়িয়া সেই সম্পত্তির আয় হইতে তাহার রক্ষার জন্য দেওয়ানজীকে অর্থব্যয় করিতে অনুরোধ করিল। বিচারে সে মাধবীনাথের চেষ্টায় খালাস পাইল, কিন্তু তথাপি হরিদ্রাগ্রামে ফিরিয়া গেল না। প্রসাদপুরের নীলকুঠির ইট কাঠ বিক্রয় করিয়া সে কলিকাতায় চলিয়া গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালকে ভ্রমরের নিকট ভিক্ষুক করিয়া ছাড়িলেন। যে গোবিন্দলাল স্ত্রীর অন্নদাস হইবে না বলিয়া হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিল, যে গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করিয়া বৃন্দাবনে ভিক্ষা করিয়া দিন চালাইয়াছে তথাপি ভ্রমরের কাছে হাত পাতে নাই, সেই গোবিন্দলাল শেষ পর্যন্ত তাহারই স্ত্রী ভ্রমরের কাছে মাথা নত করিল। ইহাও গোবিন্দলাল চরিত্রের পক্ষে অস্বাভাবিক। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরের চরিত্রকে মহৎ করিতে যাইয়া হৃদয়বান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অনুভূতিসম্পন্ন, জমিদার বংশের ছেলে গোবিন্দলালকে তাঁহার উদ্দেশ্যের ক্রীড়নক করিয়াছেন। ভ্রমরের মৃত্যুর পরও গোবিন্দলাল সন্ন্যাসীর বেশে দিন কাটাইয়াছিল। তাহা হইলেও অল্প কয়েকটা দিনের জন্য তিনি গোবিন্দলাল-চরিত্রের এত শোচনীয় পরিণতি ঘটাইলেন, গোবিন্দলালকে ভ্রমরের মাসিক বৃত্তিতে বাস করাইলেন।

গোবিন্দলালের ছিল ট্র্যাজিক চরিত্র। উন্নত বংশে তাহার জন্ম। ব্যক্তিত্বে, পরদুঃখে, অনুভূতিতেও সে মহৎ। পাপচক্র তাহার ইচ্ছায়

বিরুদ্ধেও তাহাকে জড়াইয়া ফেলিল। অজ্ঞাতসারে নিয়তি-তাড়িত হইয়া সে অধঃপতনের পথেই পা দিল। তাহার এই অযাচিত এবং অভাবিত শোচনীয় পরিণতির জন্য পাঠকমাত্রই দুঃখ অনুভব করিবেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শেষ দিকে গোবিন্দলালের সেই ট্র্যাজিক চরিত্রকে নষ্ট করিয়াছেন। ভ্রমরের নিকট ভিক্ষুক হিসাবে তাহাকে হেয় করিয়াছেন। যে ভ্রমর বার বার তাহার মুখ দর্শন করিতে চাহে নাই, গোবিন্দলালকে সেই ভ্রমরের মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত করিয়া ভ্রমরের মৃত্যুকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন; কিন্তু গোবিন্দলালের ব্যক্তিত্বকে চুরমার করিয়াছেন। তাহাতেও শেষ হয় নাই। গোবিন্দলালকে সন্ন্যাসী সাজাইয়া অজ্ঞাতবাস করাইয়াছেন। শান্তিলাভের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। বস্তুকে বাদ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ঐশ্বরিক চিন্তায় মনোনিবেশ করাইয়াছেন। কিন্তু পাঠক উপন্যাসে ঈশ্বর চাহে না, শান্তি চাহে না, জীবনবোধকে উপলব্ধি করিতে চাহে। রোমান্টিক বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব উপন্যাস সৃষ্টি করিতে যাইয়া শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই।

॥ রোহিণী ॥ অপরূপ সুন্দরী বালবিধবা রোহিণী ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতৃকন্যা ও তাহার আশ্রিতা। সে রূপসী, কিন্তু সে রূপ কাহারও চিত্তবিনোদন করে নাই। কালিদাস লিখিয়াছেন—"প্রিয়েষু সৌভাগ্য-ফলা হি চারুতা"—অর্থাৎ "প্রিয়জনের অনুগ্রহেই রূপের সার্থকতা"। তাহার রূপের সার্থকতা হয় নাই। আপনার রূপ সম্বন্ধে সে বিশেষ সচেতন ছিল। অবশ্য প্রত্যেক স্ত্রীলোকই থাকে। তাহার "অধরে পানের রাগ * * আর কাঁধের উপর চারুবিনির্মিতা কালভুজঙ্গিনীতুল্যা কুণ্ডলীকৃতা দোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী।" অর্থাৎ রোহিণী তাহার বৈধব্যাবস্থাকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। জীবন উপভোগ করিবার বাসনা তাহার অন্য নারীর মতোই ছিল। সেজন্য সে অন্যের সঙ্গে মিলাইয়া নিজের ভাগ্যকে বিচার করে। সে ভাবে, "কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না! কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ-যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মতো ইহজীবন কাটাইতে হইল?"—সম্ভোগের বাসনা তাহার মনে প্রবল। কিন্তু রোহিণীর এই সম্ভোগের বাসনা ব্যভিচারের বাসনা নয়। বিবাহের সুযোগ পাইলে সে কুলটা হইত না। রোহিণীর এক বিষয়েই দুর্বলতা ছিল, অন্য বিষয়ে নয়। সেজন্য

হরলাল যখন তাহার কাছে প্রতি-উপকার দাবি করিয়া উইল চুরি করিতে বলিল, তখন সে শিহরিয়া বলিল, "চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না"—"আর যা বলুন সব পারি। মরিতে বলেন মরিব। কিন্তু এ বিশ্বাসঘাতকের কাজ পারিব না।"

হরলাল তখন রোহিণীকে বিধবা-বিবাহের প্রলোভন দেখাইল। যে পিপাসাতুর সে যেমন মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকায় জলভ্রমে আকৃষ্ট হয়, রোহিণী তেমনিই আকৃষ্ট হইল—বিচার-বিবেচনার অবসরও গ্রহণ করিল না। অর্থের জন্য নহে, অতৃপ্ত পিপাসা-তৃপ্তির প্রলোভনে। মত্তাবস্থায় মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে—রোহিণীও তাহাই করিল। রোহিণীর বুদ্ধি তখন বিকৃত-দৃষ্টি; কেবল আপনার কল্পিত সুখে নিবদ্ধ। সেইজন্যই সে উইল বদল করিতে পারিল। কিন্তু যে আশায় সে এই কাজ করিল তাহা হইল না। হরলাল বলিল, "আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।' রোহিণীর স্বপ্ন টুটিয়া গেল—সে আশার উচ্চ-শৃঙ্গ হইতে হতাশার পঙ্কিল পল্বলে পতিত হইল। তখন সেও নিজ মূর্তি ধরিল। মেকলে বলিয়াছেন—"No creature is so revengeful as a proud man who humbled himself in vain"—যে গর্বিত ব্যক্তি (কোন কারণে) পতিত হইয়াও বিফলমনোরথ হয়, তাহার মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ কেহই থাকে না। কিন্তু প্রতিহিংসা লইবার কোন উপায় তাহার ছিল না; তাই সে হরলালের দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি চোর! তুমি সাধু! কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল? কে আমাকে বড় লোভ দেখাইল? সরলা স্ত্রীলোক দেখিয়া কে প্রবঞ্চনা করিল? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নাই, মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা নাই, যা ইতরে বর্বরে মুখেও আনিতে পারে না, তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র হইয়া তাই করিলে—তুমি যদি মেয়ে হইতে, তোমাকে আজ যা দিয়া ঘর ঝাঁট দিই, তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ, মানে মানে দূর হও।"

রোহিণী ক্ষোভে-দুঃখে অপমানে একবারে ভাঙিয়া পড়িল। তাহার উপর বসন্তের কোকিল তাহার জীবনের শূন্যতাবোধকে আরো তীব্র করিল। সে বারুণীর ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছিল। বাড়ী ফিরিবার কথা ভুলিয়া গেল। পরদুঃখকাতর হৃদয়বান পুরুষ গোবিন্দলাল তাহাকে সহানুভূতি জানাইতে আসিল। জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কিসের দুঃখ আমাকে কি বলিবে

না? যদি আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারি?" এই সহানুভূতি, পুরুষের এই সমবেদনা রোহিণী জীবনে কখনো পায় নাই। আর কখনো পাইবে না। কৃষ্ণকান্তের গৃহে উইল বদল করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গোবিন্দলালের নিকট তাহা স্বীকার করিল, "যাহা আমি ইহজন্মে কখনো পাই নাই - যাহা ইহজন্মে আর কখনো পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।" কৃতজ্ঞতায় গোবিন্দলালের প্রতি তাহার মন ভরিয়া গেল। এই কৃতজ্ঞতাই একদিন প্রণয়ে পরিণত হইল। অথচ "এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই।"

হরলালের প্রলোভনে রোহিণী যে জাল উইল কৃষ্ণকান্তের সিন্দুকে রাখিয়া আসিয়াছিল তাহাতে গোবিন্দলালের অংশে এক পাই ছিল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুতে এই জাল উইলই সত্যে পরিণত হইবে, তখন গোবিন্দলাল সম্পত্তির ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হইবে। আর পাপিষ্ঠ হরলাল পাইবে বারো আনা। ইহা ভাবিয়া রোহিণীর অনুতাপ হইতে লাগিল। সংশোধনের আর কোন উপায় বাহির করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত ঠিক করিল, "যে প্রকারে প্রকৃত উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উইল রাখিয়া তৎপরিবর্তে জাল উইল লইয়া আসিবে।" যে কথা সেই কাজ। রোহিণী কিন্তু এবার ধরা পড়িল। ইচ্ছা করিলে সে পলাইতে পারিত। কিন্তু সে পলাইল না। সে বলিল, "আমি যাহা করিতে আসিয়াছি তাহা আপনার সম্মুখে করি, দেখুন। পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয়, করিবেন। আমি ধরা পড়িয়াছি পলাইতে পারিব না। পলাইব না।" কৃষ্ণকান্তকে সে তাহার অধিক কিছু বলিল না। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য করিব। তোমাকে পুলিশে দিব না। কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব।" রোহিণী ভয় পাইল না। সেই রাত সে কৃষ্ণকান্তের গৃহে কয়েদ রহিল।

পরদিন সকালে গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট সংবাদ জানিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইতে আসিল। রোহিণী-গোবিন্দলালের একান্তে কথাবার্তা হইল। রোহিণী অকপট চিত্তে গোবিন্দলালকে সবই বলিল। গোবিন্দলালের প্রতি তাহার দুর্বলতার কথাও গোপন করিল না। সে বলিল, "আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই—আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে

খাইতাম। কিন্তু সে আপনার বাড়ীতে নহে। * * * একবার ছাড়িয়া দিন, কাঁদিয়া আসি। তারপর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি তবে না হয়, আমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, দেশ ছাড়া করিয়া দিবেন।" গোবিন্দলাল কিন্তু তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল না। বলিল, "রোহিণী, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নাই।" গোবিন্দলাল রোহিণীকে দেশত্যাগ করিতে বলিল। সে রোহিণীর খুড়াকে চাকরী করিয়া দিবে বলিল। তাহা ছাড়া নিজ অর্থব্যয়ে তাহাদের জন্য কলিকাতায় একটি বাড়ী কিনিয়া দিবে। কারণ তাহার ইচ্ছা—"তোমায় আমায় আর দেখাশুনা না হয়।" রোহিণী তাহার প্রস্তাবে রাজী হইলে গোবিন্দলাল বড় সুখী হইল।

রোহিণী ছাড়া পাইয়া গৃহে খুড়ার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিল। কিন্তু সে খুড়াকে কিছু বলিল না। নিজের মনে বলিল, "এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না—না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আমি কলিকাতায় গেলে, গোবিন্দলালকে তো দেখিতে পাইব না। আমি যাইব না। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির। এই হরিদ্রাগ্রামই আমার শ্মশান, এখানে আমি পুড়িয়া মরিব।" সে গোবিন্দলালকে দেখার বিনিময়ে কৃষ্ণকান্ত এবং গোবিন্দলালের তিরস্কার সহ্য করিবার জন্যও প্রস্তুত হইল। এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে আবার গোবিন্দলালের কাছে চলিল। যাইতে যাইতে ভগবানকে ডাকিল "হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়! আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি—তাহাকে যতবার দেখিব ততবার—আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত সুখ। আমি বিধবা—আমার বিধবা ধর্ম গেল—সুখ গেল—রহিল কি প্রভু?—রাখিব কি প্রভু?—হে দেবতা—হে দুর্গা—হে কালী—হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও—আমার প্রাণ স্থির কর—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।"—এইখানে রোহিণীর অস্থি-মজ্জাগত একটা মানবীয় বিবেকের পরিচয় পাওয়া যায়।

একদিকে রোহিণীর অসহ্য প্রেমবহ্নি, অন্যদিকে তাহার বিবেক। একদিকে এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব, অপরদিকে ভ্রমর কর্তৃক বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিবার উপদেশ। রোহিণী কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে সে বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে গেল।

গোবিন্দলাল স্বাভাবিক অনুকম্পাবশতঃ রোহিণীকে বাঁচাইয়া তুলিল। চৈতন্য লাভ করিয়াই সে গোবিন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কেন বাঁচাইলেন?" আত্মহত্যায় সে কোন পাপ দেখিতে পাইল না, কারণ সে বলিল, "আমি পাপ পুণ্য মানি না—কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে?"—"চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে রাত্রি দিন মরার অপেক্ষা একেবারে মরা ভাল।"—"রাত্রি-দিন দারুণ তৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।" অসহ্য প্রণয়-যন্ত্রণা হইতেই তাহার জীবন-বিতৃষ্ণা আসিয়াছে।

রোহিণী যখন কলিকাতায় গেল না তখন গোবিন্দলাল নিজেই তাহাকে ভুলিবার জন্য জমিদারি পরিদর্শনে গেল। "রটনা-কৌশলময়ী কলঙ্ক কলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণ" গ্রামে রাষ্ট্র করিল যে, রোহিণী গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা। গোবিন্দলাল তাহাকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। রোহিণীর ধারণা হইল ভ্রমরই ইহা রটাইয়াছে, "নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার? রোহিণী ভাবিল ভ্রমর আমাকে বড় জ্বালাইল। সেদিন চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ, এদেশে আমি থাকিব না। কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব।" রোহিণী কোনদিনই কোন বিষয়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া দেখিত না। তাহার সেই শিক্ষাও ছিল না। সেইজন্য "সে কোন প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে একখানি বেনারসী শাড়ী ও এক সুট গিলটির গহনা চাহিয়া" আনিয়া ভ্রমরকে দেখাইয়া গেল। তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ভ্রমর জ্বলিতে লাগিল।

ভ্রমর পিত্রালয়ে গেল—গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে আনিতে পাঠাইতে নিষেধ করিল। আবার উদ্যান মধ্যে গোবিন্দলালের সহিত রোহিণীর সাক্ষাৎ হইল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "সেখানে উভয়ের যে কথোপকথন হইল, তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। কেবল এইমাত্র বলিব যে, সে রাত্রে রোহিণী গৃহে যাইবার পূর্বে বুঝিয়া গেল যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।"

তারপর রোহিণী পীড়িতা হইল। আরোগ্যের জন্য তারকেশ্বরে হত্যা দিতে গেল। কিন্তু বস্তুতঃ সে তখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের সহিত মিলিত হইতে গেল। প্রসাদপুরে সে তাহার বাঞ্ছিত সুখ লাভ করিল।

নিশাকরের আবির্ভাবে তাহার সেই সুখের ইতি হইল। নিশাকর হরিদ্রা-গ্রামের লোক বলিয়া পরিচয় দিল। রোহিণী কিন্তু তাহাকে কখনো হরিদ্রাগ্রামে দেখে নাই। তথাপি বাপের বাড়ির দেশের লোক শুনিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পরক্ষণেই লিখিয়াছেন, "রোহিণী যে ব্রহ্মানন্দকে এত ভালোবাসিত যে তাহার সংবাদ লইবার জন্য দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্যা হইবে, এমন খবর আমরা রাখি না। বুঝি আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাকি, আচাঁআঁচি হইয়াছিল। রোহিণী দেখিয়াছিল যে নিশাকর রূপবান্ – পটলচেরা চোখ। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, মনুষ্য-মধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্বে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল যে, আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না।" তথাপি "ভাবিয়াছিল নারী হইয়া জের পুরুষ দেখিলে কোন নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে?" এবং সেজন্য রোহিণী রাত্রে গোপনে নদীর ধারে নিশাকরের সঙ্গে "একটু প্রেমালাপ" করিয়া আসিতে গেল। রোহিণীকে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে একেবারে বারবনিতা করিয়া ছাড়িয়াছেন। হঠাৎ রোহিণী-চরিত্রের এত লঘুতা তিনি সৃষ্টি করিলেন কেন? ইহা কি স্বাভাবিক? আসলে বঙ্কিমচন্দ্র তাড়াহুড়া করিয়া রোহিণী চরিত্রকে শেষ করিতে চাহিয়াছিলেন। নিশাকরের প্রতি কোনরূপে রোহিণীকে আকৃষ্ট করিতে না পারিলে গোবিন্দ-লালের বীতরাগ সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। গোবিন্দলালের কাছে রোহিণীকে বিশ্বাসঘাতিনী করিতে পারিলে গোবিন্দলালকে দিয়া তাহাকে হত্যা করা সহজ হইবে এই ভাবিয়া বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর চরিত্রের এই অস্বাভাবিক শোচনীয় পরিণতি ঘটাইয়াছেন।

॥ ভ্রমর ॥ "বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসসমূহে নারীচরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। দুর্গেশনন্দিনীতে প্রতিহিংসা প্রদীপ্তা বিমলা ও ত্যাগপূত প্রেমপূর্ণা আয়েষা হইতে রাজসিংহের চঞ্চলকুমারী পর্যন্ত নানা নারীচরিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন—ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের প্রভাব নারীচরিত্রে কিরূপ লক্ষিত হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন।" তাঁহার সৃষ্ট নারীচরিত্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন।

"যে বৎসর (১২৮২ বঙ্গাব্দ) পৌষমাসে 'বঙ্গদর্শনে' কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশ আরম্ভ হয়, সেই বৎসর ভাদ্রমাসে ঐ পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র দ্রৌপদীর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া একটি প্রবন্ধের প্রথমাংশ প্রকাশ করেন। ভ্রমরের বৈশিষ্ট্য

বুঝিতে হইলে সেই প্রবন্ধে তাহার উৎস সন্ধান করা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "কি প্রাচীন, কি আধুনিক, হিন্দু কাব্যসকলের নায়িকাগণের চরিত্র একছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমলপ্রকৃতি-সম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অধিকারিণী—ইনিই আর্য সাহিত্যের আদর্শ স্থলাভিষিক্তা। এই গঠনে বাল্মীকি বিশ্বমনোমোহিনী জনকদুহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অবধি আর্যনায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্নাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ সীতার অনুসরণ মাত্র—কিন্তু দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে মহাভারতকার অপূর্ব নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন।"

তিনি বলিয়াছেন—"দ্রৌপদীর চরিত্রের দুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট—এক ধর্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প ধর্মের কিছু বিরোধী। কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রাকৃত নহে। * * দর্প শব্দে এখানে আত্মশ্লাঘা-প্রিয়তা নির্দেশ করিতেছি না, মানসিক তেজস্বিতাই আমাদের নির্দেশ্য। এই তেজস্বিতা দ্রৌপদীতে পূর্ণমাত্রায় ছিল। * * * দ্রৌপদীতেই ইহা ধর্মানুরক্ষা অপেক্ষা প্রবল।"

এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনুশীলনতীক্ষ্ণ ক্ষমতা লইয় বাঙলা সাহিত্যে "অপূর্ব নূতন সৃষ্টির" কল্পনা করিতেছিলেন। সেই কল্পনা ভ্রমর-চরিত্রে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল—সার্থক হইয়াছিল। ভ্রমর-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধর্মাচরণের সহিত দর্পের পতির প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে পতির সম্বন্ধে কর্তব্যবোধের সম্মিলন।

আট বৎসর বয়সে গোবিন্দলালের সহিত ভ্রমরের বিবাহ হইয়াছিল। তাহার পর গোবিন্দলালের সম্বন্ধে তাহার সন্দেহের কারণ না ঘটা পর্যন্ত সে কি ছিল, তাহা তাহারই কথায় জানা যায়—"আমি এ নয় বৎসর, আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুতুল।"

একথা কত সত্য, তাহা আমরা গ্রন্থে, ভ্রমরের সহিত প্রথম পরিচয়কালে বুঝিতে পারি। যেদিন জাল উইল লইয়া প্রকৃত উইল রাখিতে আসিয়া রোহিণী কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে ধরা পড়ে, তাহার পরদিন উষাকালে গোবিন্দলাল যখন শয়নকক্ষের বাতায়নপথ মুক্ত করিয়া তথায় দাঁড়াইলেন, তখন "তাঁহার পাশে আসিয়া একটি ক্ষুদ্রশরীরা বালিকা দাঁড়াইল"—সে ভ্রমর। যে বয়সে বাল্যকাল

আসিয়া যৌবনে মিশিয়া যায়—একে অপরকে স্থান দিতে চাহে না—ভ্রমরের তখন সেই বয়স। তবে তাহার বালিকার চাপল্য তখনও গাম্ভীর্যে পরিণতি লাভ করে নাই। তাহা দাসীদিগের সহিত তাহার ব্যবহারে সপ্রকাশ। সে "নিজে হাসিতে যত পটু শাসনে তত পটু ছিল না।" "গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিল। তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় মরিত, কালো কুৎসিতের এত সুখ—অনন্ত ঐশ্বর্য—দেবদুর্লভ স্বামী।"

"গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস।" রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল গোবিন্দলাল তাহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তাই ভ্রমরও বিশ্বাস করে নাই। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বাঁচাইতে চলিয়া গেল—ভ্রমর আপত্তি করিল না। গোবিন্দলাল সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সেজন্য গোবিন্দলালকে রোহিণীর সহিত একান্তে কথা বলিতেও দিয়াছিল। সে কখনও ভাবিতে পারে নাই যে কোন পুরুষ পরস্ত্রীতে বা কোন নারী পরপুরুষে আকৃষ্ট হইতে পারে। সে গোবিন্দলালকে বলিল, 'তুমি আমাকে ভালোবাস—আর কাকেও তোমার ভালবাসতে নাই।'

রোহিণী গোবিন্দলালকে প্রেম নিবেদন করিল। গোবিন্দলাল সেই কথা ভ্রমরকে বলিল। "আমি রোহিণীকে ভালোবাসি না। রোহিণী আমায় ভালোবাসে।" ভ্রমর রোহিণীকে অভিশাপ দিতে লাগিল "অভাগী—পোড়ার মুখী—বাঁদরী মরুক! মরুক। মরুক। মরুক।" ভ্রমর গোবিন্দলালের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রোহিণীকে বারুণীর জলে সন্ধ্যাবেলা ডুবিয়া মরিতে উপদেশ পাঠাইল।

সেদিন অনেক রাত্রে গোবিন্দলাল বাড়ী ফিরিল। ভ্রমর তাহার মুখ দেখিয়া তাহার কথার আওয়াজে স্পষ্ট বুঝিল, "আজি কিছু হইয়াছে।" ভালোবাসার এমনই গুণ। কিন্তু গোবিন্দলাল দুই বৎসর পরে বলিবে বলিয়া চুপ করিয়া গেল। ভ্রমর সেদিন যদি সব জানিতে পারিত তাহা হইলে হয়ত ঘটনার জট অত পাকাইত না। গোবিন্দলাল জমিদারী পরিদর্শনে গেল, ভ্রমর তাহার সঠিক কারণ জানিত না। তথাপি সে তাহাকে একা যাইতে দিতে চাহিল না। সঙ্গে যাইবার জন্য অনেক কান্নাকাটি করিল। "কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না।" দিলে ভ্রমর-গোবিন্দলালের বিচ্ছেদ অত শীঘ্র হইত না।

"কিছু ভালো লাগে না—ভ্রমর একা।" 'মেঘদূতে' বিরহবিধুরা যক্ষপত্নীর বর্ণনা—

"তৈল বিনা রুক্ষ অলক-কুন্তল
পড়ে আলুথালু কপোল-দেশে
উড়িছে কাঁপিয়ে, পল্লব-কোমল
অধর শুকানো গভীর শ্বাসে।"

ভ্রমরের মধ্যে বিরহিণী নারীর সব লক্ষণই প্রকাশ হইল। কিন্তু ক্ষীরি প্রভৃতি যাহারা কখনও ভ্রমরের প্রেম পায় নাই, তাহাদের কাছে ভ্রমরের এই বেদনাভিব্যক্তি বাড়াবাড়ি মনে হইল। ক্ষীরি বলিল, "তুমি মরিতেছ কেঁদে কেটে, আর তিনি (তোমার স্বামী) হয়তো হুঁকার নল মুখে দিয়া, চক্ষু বুজিয়া রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধ্যান করিতেছেন।" ভ্রমর বিশ্বাস করিল না, ক্ষীরিকে মারিল। "একরত্তি মেয়েটা" ভ্রমর তাহার কথার বিশ্বাস করিল না দেখিয়া ক্ষীরি পথে ঘাটে যাহাকে পাইল তাহাকে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর কলঙ্কের কথা রটাইল। একে একে রটনা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে তাহা রোহিণীর কানে উঠিল। রোহিণী ভাবিল, ভ্রমরই ইহা রটাইয়াছে। সে ভাবিল সেদিন চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ। এই দেশে সে থাকিবে না। কিন্তু যাইবার আগে ভ্রমরকে জ্বালাইয়া যাইবে; এই ভাবিয়া সে প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে একখানি বেনারসী শাড়ী ও এক স্যুট গিলটির গহনা চাহিয়া আনিয়া ভ্রমরের নিকট উপস্থিত হইল। ভ্রমরকে সেগুলিকে দেখাইয়া বলিল, সে সব গোবিন্দলালের উপহার। কেহ যে এমন মিথ্যা বলিতে পারে ভ্রমরের সেই ধারণা ছিল না। সে বিশ্বাস করিল গোবিন্দলাল অবিশ্বাসী হইয়াছে। ভ্রমর ভাবিল—

"অদৃষ্টে কি এই ছিল, সেই ভালোবাসা
এইরূপে হলো শেষ, শেষে এই দশা!"

ভ্রমর নির্মম আঘাত পাইল। গোবিন্দলালকে আরো নির্মম আঘাত করিয়া পত্র লিখিল, "সেদিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরী হইয়াছিল, তাহা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিলে না। দুই বৎসর পরে বলিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই তাহা শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছ, তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে।

তুমি মনে জান বোধ হয় যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা— তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম, যে, তাহা নহে ; যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমার এ ভক্তি। যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব।"

গোবিন্দলাল গৃহে ফিরিতেছে শুনিয়া সত্যসত্যই ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। এখানে একটা কথা স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ের এবং সে সমাজের কথা লিখিতেছেন সেখানে পুরুষের পরস্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ খুব দুর্লভ ছিল না। কিন্তু পত্নী 'তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই' বলিয়া একেবারে পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে ইহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ভ্রমরের মধ্যে দ্রৌপদীর দর্প সৃষ্টি করিতে গিয়া তাহাকে আমাদের সমাজের বাহিরের করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ভ্রমর মাত্র চারদিনের জন্য পিত্রালয়ে গিয়াছিল। চারদিন পরেও কিন্তু সে আসিল না। এখানে কি সে শ্বশুর কৃষ্ণকান্তকেও অপমান করে নাই ? রাগের মাথায় সে পিত্রালয়ে যাইতে পারে। সেখানে ভ্রমরের মাতা এবং দিদি আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় নিশ্চয়ই তাহার একতরফা বিচারের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বর্ণনা করেন নাই।

গোবিন্দলাল ভ্রমরের পত্র পাইয়া আরও বিস্মিত হইল। জমিদারি হইতে ফিরিয়া ভ্রমরকে না দেখিতে পাইয়া আরও বিস্মিত হইল। তাহার মনে হইল ইহা কেবলমাত্র ভ্রমরের অবিশ্বাস নহে, তাহার অপমান। ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইতে নিষেধ করিল।

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর ভ্রমর আসিল। ইতিমধ্যে ভ্রমর এবং গোবিন্দলালের সম্পর্কের গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। গোবিন্দলাল ন্যায্য সম্পত্তির অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ভ্রমর সেই সম্পত্তির মালিক। ভ্রমরকে ভুলিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া গোবিন্দলালের দোলাচল হৃদয় রোহিণীর দিকে ঝুঁকিয়াছে। ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। আশ্চর্য, বহুদিন পরে গোবিন্দলালকে দেখিয়া ভ্রমর সেই ব্যবধান দূর করিবার কোন চেষ্টা করিল না। রোহিণীর সম্পর্কে কোন অভিযোগ করিল না। ভ্রমর এখন দূরে দূরে থাকে।

তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের উন্মেষ কিন্তু আমরা দেখি নাই, একেবারে পরিণতি দেখিলাম। যে ভ্রমর পূর্বে গোবিন্দলাল ছাড়া কিছু পৃথক চিন্তা করিতে পারিত না, এখন আর সেই ভ্রমর নাই।

গোবিন্দলালই প্রথম উভয়ের মধ্যে এই নীরবতা ভঙ্গ করিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে উইলের কথা জানাইয়া বলিল, "তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।" তখন ভ্রমর তাহার পিত্রালয়ে গমনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। বলিল—"এক অপরাধ কি মার্জনা হয় না?" এখানে বক্তব্য, ভ্রমর যখন নিজের ভুলই বুঝিতে পারিল তখন সে কেন আরও আগে ক্ষমা চাহিল না। তাহা হইলে হয়তো উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রচিত হইত না। গোবিন্দলালও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত না। এখন তাহার অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দলাল বলিল, "এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিণী।" গোবিন্দলাল স্থির করিল ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিবে।

ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়া গোবিন্দলালের নামে দলিলপত্র রেজেষ্ট্রি করিয়া আসিল। এদিকে গোবিন্দলাল মাকে লইয়া কাশী যাত্রার দিন ঠিক করিল। সে ভ্রমরের দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল। ভ্রমরকে বলিল, আর হরিদ্রাগ্রামে সে ফিরিবে না। তখন ভ্রমর যুক্তকরে অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিল—

"তবে যাও—আর আসিও না। বিনা অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কর।—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও—একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। যদি একথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই, রোহিণীর নও।" গোবিন্দলাল চলিয়া গেল। ভ্রমর মেঝের উপর পড়িয়া ধুলায় লুটাইয়া অশমিত নিশ্বাসে মৃতপুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল।

ভ্রমর পত্রে যাহাই লিখুক না কেন গোবিন্দলালের জন্য তাহার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। অপরদিকে রোহিণীরও গোপনে সংবাদ লইতে লাগিল। একদিন ভ্রমর সংবাদ পাইল, গোবিন্দলালের আর কোন সংবাদ কেহ জানে না। এদিকে রোহিণীও তারকেশ্বরে হত্যা দিতে গেল, আর ফিরিল না।

এক বৎসর অতিবাহিত হইল। ভ্রমরের দুঃখের অন্ত নাই; সে রোগে আক্রান্ত। পরকালের চিন্তায় পিতাকে ব্রত নিয়ম করাইতে বলিল। মাধবীনাথের চেষ্টায় গোবিন্দলালের সংবাদ পাইল। গোবিন্দলাল খুনী। রোহিণীকে হত্যা করিয়া পলাতক। গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে আসিতে পারে এই আশায় সে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু গোবিন্দলাল আসিল না। কোন সংবাদও আসিল না। এদিকে ভ্রমরের "নিত্য শরীরক্ষয়—যম অগ্রসর। পঞ্চম বৎসরে গোবিন্দলালের ধরা পড়িবার সংবাদ আসিল। ভ্রমর পিতাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া গোবিন্দলালকে উদ্ধার করিতে বলিল—"দেখিও,—আমি আত্মহত্যা না করি।" গোবিন্দলাল মুক্তি পাইল কিন্তু এবারও হরিদ্রাগ্রামে ফিরিল না। এক বৎসর পর গোবিন্দলাল হঠাৎ পেটের দায়ে ভ্রমরের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিল।

যে ভ্রমর বছরের পর বছর গোবিন্দলালের জন্য নিত্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই ভ্রমর গোবিন্দলালকে লিখিল, "আপনি নির্বিঘ্নে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া আপনার নিজসম্পত্তি দখল করিতে পারেন। বাড়ী আপনার।

"আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যতদিন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই " গোবিন্দলালের এই পত্র পাইয়া মনে হইল—"কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু কোমলতাও নাই।" কিন্তু যে ভ্রমর গোবিন্দলালকে অবিশ্বাস করিয়া তাহার আগমন সংবাদে পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল, ইহা সেই ভ্রমরের উপযুক্ত। কিন্তু রোগশয্যায় শায়িতা গোবিন্দলালের জন্য নিত্য প্রতীক্ষমানা ভ্রমরের নহে।

ক্রমে ভ্রমরের রোগশয্যা মৃত্যুশয্যায় পরিণতি লাভ করিল। ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত্রে সে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করিল। শেষসময় তাহার গোবিন্দলালকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। এই ইচ্ছাও তাহার লৌকিক ইচ্ছা। অথচ কয়েকদিন আগেই লিখিয়াছিল "আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই।" এই উক্তির সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরের মৃত্যুদৃশ্যকে এক অলৌকিক দৃশ্যে রূপায়িত করিয়াছেন। ভ্রমর সারাদিন হাসিয়া কথা বলিয়া স্বামীর চরণরেণু মাথায় লইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ভ্রমর গ্রন্থকারের আদর্শ চরিত্র। তাহার মৃত্যুও সেজন্য আদর্শমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায়—তাঁহারই নিয়ন্ত্রিত 'প্রচারপত্রে' তাঁহার বন্ধুস্থানীয় চন্দ্রনাথবাবু লিখিয়াছিলেন—

"একই বিড়ম্বনায় পড়িয়া সূর্যমুখী ও ভ্রমর দুইজনের আচরণ ভিন্নরকম এবং আচরণের ফলও বিভিন্ন রকম হইয়াছিল। সূর্যমুখীর আচরণে সূর্যমুখী, নগেন্দ্র, নগেন্দ্রের যে বংশে জন্ম সকলেই রক্ষা পাইল। সে আচরণের ফলে যে সেখানে ছিল সকলেই শেষে সুখী হইল। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখী সন্তানাদি লাভ করিয়া পরম সুখে পবিত্রভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া গেল—দুঃখিনী কুন্দনন্দিনী থাকিলে সেও নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর সঙ্গে তেমনি করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া যাইত। কিন্তু ভ্রমরের আচরণের ফলে ভ্রমর গেল, গোবিন্দলাল গেল, হরিদ্রাগ্রামের রাজবংশ লোপ হইল। কৃষ্ণকান্ত রায়ের নাম ডুবিল। সংসার, একটা সম্পত্তি, একটা ঐশ্বর্য ছারখার হইয়া গেল।"

॥ **হরলাল** ॥ হরলাল পিতার কুপুত্র। 'সে বড় দুর্দান্ত, পিতার অবাধ্য ও দুর্মুখ।' কেবল তাহাই নহে সে নীচাশয়, পরস্বলোভী এবং আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য সকল প্রকার হীন কার্য করিতে প্রস্তুত। কেবল কৃষ্ণকান্তের দৃঢ়তা ও সাধুতা তাহাকে ইচ্ছানুরূপ কার্যে বিরত রাখিত। সে গোবিন্দলালকে সম্পত্তিতে তাহার প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত করিতে আগ্রহশীল। সে বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের গোঁফ পোড়াইয়া দিয়াছিল এবং পিতার উইলও পোড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল—অসমর্থ হইয়া সে ভয় দেখাইয়া কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করিয়া যখন ব্যর্থকাম হইল, তখন প্রথমে ব্রহ্মানন্দকে ও পরে রোহিণীকে যথা-ক্রমে অর্থলোভ ও অন্য লোভ দেখাইয়া উইল পরিবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ ভয়ে লোভ সম্বরণ করিয়াছিল—রোহিণী তাহা পারে নাই। তবে রোহিণীর সহিত সে ছলনায় পারিয়া উঠে নাই। কৃষ্ণকান্তের দৃঢ়তার নিকট যেমন, রোহিণীর বুদ্ধির নিকটও তেমনই তাহাকে পরাভূত হইতে হইয়াছিল। সে রোহিণীকে বিবাহ করিবে, আশা দিয়া তাহার দ্বারা উইল চুরি করাইয়াছিল, কিন্তু বিবাহ করিতে অস্বীকার করায় রোহিণী তাহা তাহাকে দেয় নাই। উইল না পাইয়া সে বলিয়াছিল, "আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।" রোহিণীও উপযুক্ত উত্তর দিয়াছিল, "তোমার মতো নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই। তুমি যদি মেয়েমানুষ হইতে, তোমাকে আজ, যা দিয়া ঘর ঝাঁট দিই, তাই দেখাইতাম; তুমি পুরুষমানুষ, মানে মানে দূর হও।" তবুও হরলাল

"টিপি টিপি হাসিয়া গেল।" যে স্বার্থকেই পরমার্থ জ্ঞান করে, তাহার মান কোথায় ?

চাণক্য বলিয়াছেন :

"একেনাপি কুবৃক্ষেন, কোটরস্থেন বহ্নিনা।
সংদহ্যতে বনং সর্বং কুপুত্রেন কুলং যথা।"
"একটি কুবৃক্ষ, বহ্নি কোটরে যাহার
দহিয়া সমগ্র বন করে ছারখার।
তেমন একটি পুত্র হ'লে কুলাঙ্গার
নিজ দোষে করে নিজ কুলের সংহার।"

হরলাল রায়-পরিবারের কুলাঙ্গার। তাহার জন্য বংশের সর্বনাশ হইয়াছিল। সে ই গোবিন্দলালের পতনের পরোক্ষ কারণ। সে গোবিন্দলালকে সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিতে চাহিয়াছিল—পারে নাই ; কিন্তু সম্পত্তি অপেক্ষাও যাহা মূল্যবান তাহাতে বঞ্চিত করিবার কারণ হইয়াছিল। সুনামের তুলনায় অর্থ তুচ্ছ। শেক্সপীয়রের সেই কথা—

' Good name, in man and woman···
Is the immediate-jewel of their souls,
Who steals my purse, steals trash ;
'Tis something, nothing ;
'T was mine. it is his, and her been
Slave to thousands ;
But he that filches from me my good name,
Robs me of that which not enriches him,
But makes me poor indeed."

"রোহিণী গোবিন্দলালকে বাল্যকাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই," কিন্তু একদিন সহসা সে গোবিন্দলালের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার কারণ—হরলাল। সে রোহিণীর মনে পাপ বাসনার উদ্ভবে সহায় হইয়াছিল। আরব্য উপন্যাসের ধীবর বদ্ধমুখ কুম্ভ পাইয়া যখন তাহার আবরণ সরাইয়া দিয়াছিল, তখনই তাহার মধ্য হইতে বন্দী দৈত্য বাহির হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। সে আবরণ উন্মোচিত না হইলে দৈত্য চিরকাল তাহাতে বন্দীদশায় থাকিত। বালবিধবা রোহিণী যদিও পরিপূর্ণ

যৌবনে "বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষের" অনুশীলন করিয়াছিল, তথাপি মনে করা অসঙ্গত নহে যে, হরলাল তাহাকে প্রবঞ্চনার দ্বারা বশীভূত করিয়া—আপনার কার্যসিদ্ধির চেষ্টা না করিলে বোধ হয় রোহিণীর মনে সুপ্ত বাসনা জাগিয়া উঠিবার সুযোগ পাইত না—বহ্নি ভস্মাচ্ছাদিত থাকিলে সে ও দগ্ধ হইত না, অন্য কাহাকেও দগ্ধ করিতে পারিত না, অন্তত গোবিন্দলাল-ভ্রমরের সর্বনাশ করিত না। সেইজন্যই বলিতে হয়—হরলাল রায়-কুলের কুলাঙ্গার।"

॥ মাধবীনাথ ॥ মাধবীনাথ এবং নিশাকরের মধ্যে আমরা "পাটোয়ারী বুদ্ধির" পরিচয় পাই। "উভয়েই বিষয়ী, উভয়েই সাহসী, উভয়েই কার্যসিদ্ধিতে নিপুণ, কিন্তু উভয়ের সামান্য প্রভেদ ছিল। মাধবীনাথ বিষয়ী ও চতুর হইলেও কন্যার প্রতি স্নেহে তাঁহার দৌর্বল্য ছিল। সেই দৌর্বল্যের জন্যই গোবিন্দলাল মহাল হইতে গৃহে ফিরিতেছে জানিতে পারিয়া অভিমানিনী কন্যা যখন লিখিল, "আমার বড় পীড়া হইয়াছে। তোমরা যদি একবার আমাকে লইয়া যাও, তবে আরাম হইয়া আসিতে পারি। বিলম্ব করিও না, পীড়া বৃদ্ধি হইলে আর আরাম হইবে না। পার যদি, কালই লোক পাঠাইও।" তখন ভ্রমরের মাতার অশ্রুতে ও গালিতে বিচলিত হইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না—পত্রের "ভিতর কিছু জুয়াচুরি আছে।' তিনি স্নেহাধিক্য হেতু পত্রের শেষাংশ "এখানে পীড়ার কথা বলিও না'—পাঠ করিয়াও সেরূপ সন্দেহ করিলেন না; ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইলেন। তাঁহার বিষয়বুদ্ধি যদি স্নেহে রঞ্জিত না হইত, তবে তিনি সহসা কন্যার 'বড পীড়ার' সংবাদ পাইয়া অবস্থা দেখিবার জন্য অন্তত স্বয়ং হরিদ্রাগ্রামে যাইতেন। তথায় যাইলেই তিনি প্রকৃত অবস্থা জানিতে ও বুঝিতে পারিতেন—আবশ্যক প্রতিকার-পর হইতেন। তাহা হইলে ঘটনার স্রোতও ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইত। গোবিন্দলাল চলিয়া যাইবার পরে যখন দুশ্চিন্তায় ও বেদনায় ভারে ভ্রমর রোগ-শয্যায় শয়ন করিল—"অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল" তখন কন্যার নিকটে আসিয়া "মাধবীনাথ কন্যার দশা দেখিয়া, অনেক রোদন করিলেন"— "যন্ত্রণা অসহ্য হইলে তিনি বহির্বাটীতে আসিলেন"—বহির্বাটীতে অনেকক্ষণ বসিয়া রোদন করিলেন।" ক্রমে সেই মর্মভেদী দুঃখ মাধবীনাথের হৃদয়ে ঘোরতর ক্রোধে পরিণত হইল। "ভাবিতে ভাবিতে মাধবীনাথের হৃদয়ে কাতরতার পরিবর্তে প্রদীপ্ত ক্রোধ পরিব্যাপ্ত হইল।" বিষয়ী লোকের

এমনই হইয়া থাকে। প্রতিহিংসা অনেক সময় কার্যের উৎস হয়। যে স্নেহের বা ভালোবাসার বা শ্রদ্ধার পাত্র তাহার লাঞ্ছনাকারীর উপর প্রতিশোধ লইবার বাসনা অবশ্যম্ভাবী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "অহিংসা ভাল, নির্বৈর বড় কথা, কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে নহে—কেহ গণ্ডে একবার চপেটাঘাত করিলে তাহাকে দশবার চপেটাঘাত করা গৃহস্থের ধর্ম।" প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প তখন মাধবীনাথকে দুঃখ ত্যাগ করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত করিল— তিনি প্রথমেই ছলে, বলে বা কৌশলে গোবিন্দলালের সন্ধান লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া—সে কার্যে সফলকাম হইলেন এবং তাহার পরে বন্ধু নিশাকরের সাহায্যে প্রাপ্তসংবাদের যাথার্থ্য নির্ধারণ করিলেন। কিন্তু তিনি কি করিতেন, তাহা বলা যায় না। কারণ, অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল এবং রোহিণীকে হত্যা করিয়া গোবিন্দলাল নিরুদ্দেশ হইল। যখন গোবিন্দলাল ধরা পড়িল তখন কিন্তু মাধবীনাথকে কন্যার প্রতি স্নেহবশে প্রতিহিংসাবৃত্তি দমিত করিতে হইল। হিন্দু নারীর চিরাগত সংস্কার-বশে ভ্রমর বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া গোবিন্দলালকে—পাপিষ্ঠ গোবিন্দলালকে বাঁচাইতে ব্যাকুল হইল, এবং সজল নয়নে পিতাকে বলিল, "দেখিও আমি আত্মহত্যা না করি ;" "রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী।" ভ্রমরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার কথা ব্যর্থ হইবে না- সে, স্বামী যখন তাহাকে ত্যাগ করিতে চায় তখন শেষে বলিয়াছিল—'বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কর।** দেবতা সাক্ষী যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। *** যদি এ কথা নিষ্ফল হয় তবে জানিও দেবতা মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। **" নির্মল অন্তঃকরণের বিশ্বাস এইরূপই প্রবল হয়।

আমরা আগেই বলিয়াছি মাধবীনাথের 'পাটোয়ারী বুদ্ধি" ছিল। তিনি পারেন না এমন কাজ নাই। তিনি ডিটেকটিভের মতো পোস্টমাস্টার এবং পিয়নকে প্রথমে মিষ্ট কথা, তারপর ঘুষ এবং লাঠিয়ালের ভয় দেখাইয়া গোবিন্দলাল-রোহিণীর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে তাঁহার সম্যক্ ধারণা ছিল। সেজন্য ঘুষখোর পুলিস পর্যন্ত তাঁহাকে সমীহ করিত। তিনি গোবিন্দলালের মামলার তদারক খাঁটি বিষয়ী লোকের মতো নিপুণভাবে করিয়াছেন। ফিচেল খাঁ ঘুষ দিয়া মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে গোবিন্দলালের অপরাধ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে প্রমাণ

করিয়াছিল। মাধবীনাথ তাহার উপরও একহাত লইলেন। তিনি মিথ্যা সাক্ষী-গুলিকে আরও বেশী ঘুষ দিয়া আরো মিথ্যা কথা বলাইলেন। আদালতে সাক্ষ্য অভাবে গোবিন্দলাল মুক্তি পাইল।

মাধবীনাথ কিন্তু গোবিন্দলালকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। সেজন্য ভ্রমরের মৃত্যুর পরে "মাধবীনাথ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলেন না—মাধবীনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহজন্মে আর গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা কহিবেন না।" তাঁহার প্রতিহিংসা পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু অনাহারে, চিত্ত-বিকারে উন্মাদরোগগ্রস্ত গোবিন্দলালকে যখন অচৈতন্য অবস্থায় উদ্যানবাটিকা হইতে তুলিয়া গৃহে লইয়া আসিল তখন "উহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল।"—

"The quality of mercy is not strain'd"

॥ **নিশাকর** ॥ নিশাকর "নিষ্কর্মা"—গীতবাদ্যের অনুশীলন করেন—সর্বদা পর্যটনে গমন করেন। এই শ্রেণীর লোক হয় অত্যন্ত স্বার্থপর, নয় তো উদার প্রকৃতির হয়। নিশাকর উদার-প্রকৃতি—বন্ধুবৎসল এবং কতকটা "খাতির নাদারাত"—ইংরেজীতে যাহাকে Adventure বলে তাহারই প্রিয়। 'কৃষ্ণ-কান্তের উইল'-এ নিশাকর কিন্তু villain। মাত্র তিনটি পরিচ্ছেদে তাহাকে সক্রিয় দেখা যায়। কিন্তু এই স্বল্প-পরিসরে সে একটি জীবনের ইতি ঘটাইয়াছে, আরেক জনকে পলাতক এবং ভিক্ষুকে পরিণত করিয়াছে। এই উপন্যাসে তাহার একটিমাত্র কাজ শয়তানী। ইয়াগো ওথেলোর মনে সন্দেহ জাগাইয়া ডেসডিমনার মৃত্যুর কারণ ঘটাইয়াছিল, নিশাকরও গোবিন্দলালের মনে রোহিণীর বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে প্রত্যয় সৃষ্টি করিয়া রোহিণীর মৃত্যু ঘটাইয়াছিল।

নিশাকর বন্ধু মাধবীনাথের এককথায় প্রসাদপুরের নীলকুঠিতে যাইয়া উপস্থিত হইল। মাধবীনাথের ন্যায় নিশাকরও ধূর্ত, "পাটোয়ারী বুদ্ধি"-সম্পন্ন। প্রসাদপুরের কুঠিতে গোবিন্দলাল কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিত না। রূপো চাকরকে ঘুষ দিয়া সে গোবিন্দলালের কাছে সংবাদ পাঠাইল। রোহিণী তখন গোবিন্দলালের সঙ্গে ঐ স্থানে সুখে বাস করিতেছিল। নিশাকর উদ্যানে বেড়াইবার সময় ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া রোহিণীকে দেখিতে পাইল। রোহিণীর সঙ্গে চোখে চোখে কথা বলিল। জোর করিয়া গোবিন্দলালের সঙ্গে দেখা করিল। গোবিন্দলালের "ভদ্র অপমান" গায়ে

রাখিল না। গোবিন্দলালকে যাহা বলিল তাহাও সব মিথ্যা। এই মিথ্যার আশ্রয়েই সে হয়তো গোবিন্দলালের প্রকৃত মনের অবস্থা বুঝিতে চাহিল। তাহার লজ্জা, ঘৃণা, ভয় কোনটাই ছিল না। ওস্তাদজী তাহাকে 'বেতমিজ আদমি' বলিল। তথাপি সে বিদায় লইল না। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য রোহিণী যে প্রস্তাব করিল তাহাতেই নিশাকর সম্মত হইল। যদিও সে জানিত, "এই মাঠের মাঝখানে ঘরে পুরিয়া আমাকে খুন করিয়া এই বাগানে পুতিয়া রাখিলেও আমার মা বলতে নাই, বাপ বলতেও নাই।" তথাপি সে দুঃসাহসিক। রোহিণীর কৌতূহলের আভাস পাইয়া সে তখনই ষড়যন্ত্রের জাল বুনিয়া ফেলিল। রূপো চাকরকে দিয়া রোহিণীকে রাত্রে নদীর ধারে গোপনে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া পাঠাইল; আর সোনা চাকরকে চাকুরীর লোভ দেখাইয়া গোবিন্দলালকে সেই সংবাদ দিবার বন্দোবস্ত করিল। সে সোনাকে বলিল, "আমার অভিপ্রায় যে তোমার মুনিবের চোখ ফুটাইয়া দিই।...যখন দেখবে ঠাকুরুণটি ঘাটের দিকে চলিলেন, তখন গিয়া তোমার মুনিবকে বলিয়া দাও।" এই সুযোগ না পাইলে নিশাকর যে কি করিতে তাহা বলা যায় না, কারণ "তিনি গৃহপ্রবেশদ্বারের কপাট, খিল, কব্জা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন।"

পাপীও সময়ে সময়ে নিজের পাপকে ভয় করে। নিশাকরও চিত্রাতীরে বাঁধাঘাটে বসিয়া ভাবিতেছিল, "আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি। অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্তব্য। যখন বন্ধুর কন্যার জীবনরক্ষার্থে এ কার্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়, রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব, পাপস্রোতের রোধ করিব, ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে।"

দোলাচল চিত্তের এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া মানুষটির প্রকৃতি সপ্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে। পাপের দণ্ড দিবার জন্য পাপপথ অবলম্বন করা সঙ্গত কিনা, নিশাকর তাহাই ভাবিতেছিল। কিন্তু তখন তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। রোহিণী আসিয়া উপস্থিত হইল। নিশাকরের নির্দেশমত সোনা চাকরের নিকট সংবাদ পাওয়া মাত্র গোবিন্দলালও পিছন হইতে আসিয়া রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। নিশাকর কিন্তু পলকের মধ্যে সরিয়া গিয়াছে।

এইরূপে নিশাকর দাস "করাল কালসমান রজনীতে বিপন্না রোহিণীকে" মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিল। প্রতিহিংসা-পরায়ণ মাধবীনাথ পর্যন্ত নিশাকরের নিকট হইতে সবিশেষ জানিতে পারিয়া বলিলেন, "কাজ ভাল হয় নাই। একটা খুনোখুনি হইতে পারে।" হইলও তাই। গোবিন্দলাল রোহিণীকে খুন করিল কিন্তু এই পাপীর মনে এতটুকুও অনুশোচনা হইল না। শয়তানের শয়তানী সার্থক হইল।

[ঘ] ॥ কৃষ্ণকান্তের উইল ঃ উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস ॥

কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র "উত্তর চরিতে" আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ-সাধন, চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা .... সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতে চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।" (বিবিধ প্রসঙ্গ) উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এই উভয় উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছেন। বাংলার নব্য লেখকদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াও বঙ্কিম এই কথাই বলিয়াছিলেন, "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্যই লিখিবেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির মধ্যে এই সুন্দর ও মঙ্গলের হরগৌরী মিলন সম্ভব হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার সৃষ্টি সার্থক। তাঁহার উপন্যাস বিচারের ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ রাখিয়াই অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপন্যাসে থাকে বাস্তব সমাজ-জীবনের প্রতিফলন। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর এই প্রতিফলনের সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করে। বস্তুগত দৃষ্টির ফলে তাহা উপন্যাসে পরিণত হয় আর আত্মগত দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তাহা রোমান্স হইয়া উঠে ; বাস্তব জগতে আমাদের জীবন নানা সমস্যাসংকুল। উপন্যাস-রূপায়ণে সেই সমস্যা মূর্ত হইয়া উঠিবে। ঔপন্যাসিক অনেক সময় কেবলমাত্র সমস্যাই রূপায়িত করেন না, তাহার সমাধানের পথও চিত্রিত করেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার উপন্যাসে আমরা কেবলমাত্র মানবজীবনের নানা সমস্যাই দেখিতে পাই না, সমাধানের পথও দেখিতে পাই। কিন্তু শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। তাঁহার মতে ঔপন্যাসিক কেবলমাত্র সমস্যাই উপন্যাসে ফুটাইয়া

তুলিবেন। পাঠক তাহা হইতে আপন অভিরুচি অনুসারে সমাধানের পথ চিন্তা করিয়া লইবে।

এই সমাজ-চিত্রণের মধ্যে নানা নীতি ও আদর্শের অভিব্যক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু মূল সমস্যা বা বক্তব্যের সঙ্গে তাহা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিবে। পৃথকভাবে তাহা প্রাধান্য লাভ করিলেই উপন্যাসের ধর্ম নষ্ট হয়। অতএব ঔপন্যাসিকের নিকট হইতে কেবল এইটুকু দাবি করা যাইতে পারে—তিনি যেন কোন মত বা নীতি কাহিনী চরিত্রের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া না দেন, মত বা নীতি-প্রভাবে সে চরিত্র যেন প্রাণহীন কঙ্কালে পরিণত না হয়। প্রত্যেক শিল্পেরই একটা রুচি বা নিজস্ব মতবাদ আছে। তিনি শিল্প-রূপায়ণে সেই রুচি বা মতবাদের দ্বারা চালিত হইবেন তাহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। কিন্তু তাহা যেন বক্তব্য বা চরিত্রকে ছাপাইয়া না যায় তাহাই বিচার্য।

বঙ্কিমচন্দ্র সত্য-সুন্দরের আদর্শ লইয়াই সাহিত্য সৃজনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। দেশের বা মনুষ্যজাতির মঙ্গল সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। পাঠকের চিত্তোৎকর্ষসাধন বা চিত্তশুদ্ধিজননই তাঁহার লক্ষ্য। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি সমস্ত উপন্যাসই বঙ্কিমচন্দ্রের এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেম বনাম দাম্পত্য-জীবন বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে রূপজ মোহ ও দাম্পত্যপ্রেমের দ্বন্দ্ব আলোচনা করিয়াছেন। এই অবৈধ প্রণয়ের অভিশপ্ত কাহিনী বর্ণনা করিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সমাজ-কল্যাণ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' শীর্ষক প্রবন্ধে এই আদর্শের এক অপূর্ব বর্ণনা দিয়াছেন, "যে প্রেমের কোন বন্ধন নাই, কোন নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযম-দুর্গের ভগ্ন প্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন: কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি দেখিয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকার-প্রমত্ত করে তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। শকুন্তলার কাছে যখন আতিথ্য-ধর্ম কিছুই নহে, দুষ্মন্তই সমস্ত, তখন শকুন্তলার সে প্রেমে আর কল্যাণ রহিল

না। যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয় তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে। সেইজন্যই সে প্রেম অল্প দিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না। যে আত্মসংযত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল, যাহা আপনার চারিদিকের ছোট এবং বড়, আত্মীয় এবং পর কাহাকেও ভোলে না, যাহা প্রিয়জনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া বিশ্ব-পরিধির মধ্যে নিজের মঙ্গল মাধুর্য বিকীর্ণ করে, তাহার ধ্রুবত্বে দেবে-মানবে কেহ আঘাত করে না; আঘাত করিলেও সে তাহাতে বিচলিত হয় না। কিন্তু যাহা যতির তপোবনে তপোভঙ্গরূপে, গৃহীর গৃহপ্রাঙ্গণে সংসার-ধর্মের অকস্মাৎ পরাভব স্বরূপে আবির্ভূত হয় তাহা ঝঞ্ঝার মত অন্যকে নষ্ট করে বটে, কিন্তু নিজের বিনাশকেও নিজেই বহন করিয়া আনে।" এই প্রেমোপলব্ধির স্বরূপ সমগ্র বঙ্কিম-উপন্যাসে সুস্পষ্ট। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসেও এই উপলব্ধিই রূপ লাভ করিয়াছে। এই নিরিখে বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর্শবাদী ও নীতিবাদী বলিতে হয়, কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসকে উদ্দেশ্যমূলক বলিতে হয়। কারণ "গল্পরসের অতিরিক্ত কোনও শিক্ষা বা নীতি যিনি গ্রহণ করিতে চান তিনি বুঝিবেন ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য আর জয় নাই, একজনের পতনেই দাম্পত্যবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় না, নিজের দুর্ভাগ্যকে মানিয়া লইয়া যে সংসারের কর্তব্যের মধ্যে আত্মনিয়োগ না করিয়া নিজের বাসনা-কামনাকে একমাত্র বড় করিয়া দেখে, সে কেবল নিজের দুর্গতিই বৃদ্ধি করে না, চারিদিকে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া সমস্ত দগ্ধ করিয়া দেয়।"

'কৃষ্ণকান্তের উইল' রোহিণী-গোবিন্দলাল-ভ্রমরের কাহিনী। রোহিণী বালবিধবা। কিন্তু সে তাহার বৈধব্যকে সহজভাবে গ্রহণ করে নাই। "সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।" বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। সুযোগ পাইলে সে আবার বিবাহ করে। পুরুষের আসঙ্গলিপ্সাই তাহার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। হরলালের প্রলোভনে রোহিণীর সুপ্ত কামনা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু হরলালের প্রত্যাখ্যানে তাহা সার্থক হইতে পারিল না। ক্ষোভে দুঃখে সে ভাঙিয়া পড়িল। তার উপর বসন্তের কোকিলের ডাক। তাহার জীবনের

শূন্যতাবোধ প্রবল হইল। সে ভাবিয়া পাইল না কেন তাহার জীবনে এত দুঃখ। তাহার অপরূপ রূপ-যৌবন থাকিতে তাহাকে কেন শুষ্ক কাষ্ঠের মত জীবন কাটাইতে হইল। সেই সময়ে গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা এবং গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ এই সকল উপলক্ষ্যে কিছুকাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল। সামাজিক বিধিমতে ইহা পাপ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসের মত রোহিণীকে পাপীয়সী বলিয়া মন্তব্য করেন নাই। এক বালবিধবার অতৃপ্ত কামনা কিরূপে বাহ্য ঘটনার সংস্পর্শে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিল, তাহারই অপূর্ব শিল্পরূপ বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কন করিয়াছেন। তিনি অপূর্ব সংযমের সঙ্গে এই বালবিধবা রোহিণীর অসহ্য প্রণয়জ্বালা বস্তুগত দৃষ্টির মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। কোথাও তিনি তাহাকে লেখক হিসাবে ভৎর্সিত করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোন উপন্যাসে এত সংযম দেখা যায় নাই। কিন্তু এই উপন্যাসেও তিনি বেশীদূর তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

রোহিণী প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে একখানা বানারসী শাড়ী ও একস্যুট গিলটির গহনা চাহিয়া আনিয়া তাহা গোবিন্দলালের প্রদত্ত বলিয়া ভ্রমরকে দেখাইয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন লিখিলেন—

"আমাদের বড় দুঃখ রহিল, ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়া দিয়াছিল, কিন্তু রোহিণীকে একটি কিলও মারিল না, এই আমাদের আন্তরিক দুঃখ। আমাদের পাঠিকারা উপস্থিত থাকিলে রোহিণীকে যে স্বহস্তে প্রহার করিতেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয় নাই। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, একথা মানি। কিন্তু রাক্ষসী বা পিশাচীর গায়ে যে হাত তুলিতে নাই, একথা তত মানি না।"

অন্যত্রও বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে পাপীয়সী, মহাপাপিষ্ঠা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নিশাকর দাসকে প্রসাদপুরের কুঠিতে দেখিয়া "বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, অনবধান মৃগ পাইলে কোন ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে?" আবার, "জানি না এই পাপীয়সীর পাপচিত্তে কি উদয় হইয়াছিল—" বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বস্তুগত দৃষ্টি অব্যাহত রাখিতে পারেন নাই। লেখক হিসাবে পাঠক-মনে কোন চরিত্র সম্বন্ধে বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি করিবার এই রীতি বর্তমানে অচল।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হইতেই বলিয়াছেন, "রোহিণী লোক ভাল নয়।" কারণ

সে বালবিধবা, কিন্তু বিধবার চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী সে চলে না। সে কালা-পেড়ে ধুতি পরে, হাতে চুড়ি পরে, ইত্যাদি। তাহা ছাড়া তাহার আসক্ত-লিপ্সা প্রবল। উপযুক্ত পাত্র পাইলে তাহার পুনরায় বিবাহ করিতে বাধা নাই। তথাপি দুঃখী অসহায় রোহিণীর ক্রন্দন দেখিয়া পাঠককে একটু চোখের জল ফেলিতে বলিয়াছেন—"পরের কান্না দেখিলে কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ কণ্টক-ক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করে না।" এখানেই অন্যান্য উপন্যাস হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য। শৈবলিনীর চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া তাঁহার লেখনী কলুষিত হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

রোহিণীর সর্বনাশের নৃশংস ষড়যন্ত্র করিয়া নিশাকর দাসের মনেও একটু অনুতাপ হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণে মনে হইল, "রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপস্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে। আর পাপ-পুণ্যের দণ্ড বা পুরস্কার দিবার আমি কে? আমার পাপ-পুণ্যের যিনি দণ্ড-পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্তা। বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই আমাকে এই কার্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি;

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

রোহিণী নিহত হইল। গোবিন্দলাল তখনো বাকী আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে অনেক পরিভ্রমণ করাইয়া, জেলে পাঠাইয়া শেষ পর্যন্ত ভিক্ষুকের মত ভ্রমরের কাছে নতি স্বীকার করাইলেন। তাহাতেও শেষ হইল না। সন্ন্যাসী বেশে দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস করাইয়া ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃস্থাপন করাইয়া শান্তিলাভ করাইলেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের মূল বক্তব্য হইল,—"গোবিন্দলালের ভ্রমর-প্রেমের সহিত তাহার মোহমুগ্ধ মনের রোহিণী-প্রেমের দ্বন্দ্ব—দিব্য প্রেমের সহিত মানুষের মনের পার্থিব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের সহিত আকর্ষণের দ্বন্দ্ব। প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব হিন্দুর বহু পুস্তকে রূপকরূপে বিবৃত হইয়াছে। এই দেশেই গৌতমবুদ্ধ ব্যাধি, জরা, মৃত্যু দেখিয়া নির্বাণের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া মোক্ষমার্গের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন।"—গোবিন্দলালও সংসার ত্যাগ করিয়া শেষ পর্যন্ত শান্তিলাভ করিল।

দুর্গেশনন্দিনীর চরিত্র হইতে অনেক বেশী বাস্তব কিন্তু সেখানেও তাহাদের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ নাই। বাক্‌পটুতা এবং রসিকতার গুণেই বাস্তব প্রতীতি লাভ করে। এই উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনার বাষ্পস্ফীতি দ্বারা তথ্য ও বিশ্লেষণকে ঢাকিতে চাহিয়াছেন। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে কাব্য এবং অতি-কল্পনা বাস্তবকে অনেক ক্ষেত্রে লঙ্ঘন করিয়াছে। 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস। মনস্তত্বের বিশ্লেষণ হইতে ঘটনার অপরূপ গ্রন্থনই সেখানে মুখ্য। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, তত্ত্ব-কণ্টকিত। বাস্তব হইতে অতি উচ্চ আদর্শলোকের দিকে ইহাদের গতি।"

মনস্তত্ব এবং বাস্তব সমাজ চিত্রণের দিক হইতে 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' তাহার ব্যতিক্রম। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুইখানিকে প্রকৃত উপন্যাস পদবাচ্য বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসেও অতিপ্রাকৃত এবং রোমান্সের স্থান রহিয়াছে। অল্প কয়েকটি রেখায়, আভাসে ইঙ্গিতে আখ্যায়িকার চিত্ত-বিক্ষোভের চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার জন্য উপযুক্ত বিশ্লেষণ করেন নাই। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কার্য-কারণ পরম্পরায় ঘটিত একটি বিশ্লেষণাত্মক উপন্যাস। এখানে প্রতিটি চরিত্র বাস্তব। আত্মিক এবং বাহ্যিক ঘটনার স্পর্শে ও প্রভাবে আন্দোলিত। আপন মনের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগে, ঘটনার সত্যাসত্যতা বিশ্লেষণে এই আখ্যায়িকার গল্পরস বাস্তবমণ্ডিত হইয়াছে। সংযমনিষ্ঠার অভাবে এবং পুরুষের আসঙ্গলিপ্সা প্রবল থাকায় দুষ্টবুদ্ধি হরলালের প্রলোভনে বালবিধবা রোহিণীর সুপ্ত অতৃপ্ত কামনাবহ্নি উর্ধ্বগামী হইল। পরদুঃখকাতর গোবিন্দলালের স্বাভাবিক করুণা প্রকাশে তাহা গোবিন্দলাল-মুখী হইল। গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রণয়াসক্তির কথা জানিতে পারিয়াও 'সে মরিবে, ভ্রমর মারবে,' তাহার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে বলিয়া রোহিণীর এই প্রণয়কে প্রশ্রয় দেয় নাই, বরং ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু স্ত্রী ভ্রমরের অকারণ অবিশ্বাসে এবং পিত্রালয়ে গমনে সে রোহিণীর ধ্যান করিতে লাগিল। এইভাবে প্রথম খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুন্দর মনস্তত্ব-বিশ্লেষণের দ্বারা গোবিন্দলাল-রোহিণীর প্রণয়বৃত্তির উন্মেষ ও তাহার বিকাশ বর্ণনা করিয়াছেন। অনন্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে অতি সরলা বালিকা ভ্রমর এবং গোবিন্দলালের

মধুর দাম্পত্য জীবন লেখকের বাস্তব বর্ণনা কৌশলে পাঠককে আকর্ষণ করে। কিরূপে সেই অনাবিল মধুর প্রেমে ভাঁটা পড়িল এবং একে অন্তের বিপরীত গতিতে ধাবিত হইল তাহারও সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের অনুরাগের কথা সরলা বালিকা পাড়া-প্রতিবাসীর মুখে শুনিয়াই বিশ্বাস করিল না। রোহিণীর চতুরতায় তাহার বিশ্বাসের প্রাচীর ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। যত জোরালো বিশ্বাস ছিল তত জোরালো অবিশ্বাস হইল। এই ঘটনাটি উপন্যাসের কেন্দ্রস্থল। ভ্রমরের প্রেম ও অবিশ্বাসের সুন্দর বিশ্লেষণ বঙ্কিম করিয়াছেন। তারপর গোবিন্দলাল কর্তৃক ভ্রমর-পরিত্যাগ। তাহা এক কথায় তিনি সারিয়া দেন নাই। ভ্রমরের অপরাধ সম্বন্ধে গোবিন্দলালের মনে নানা চিন্তার সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে। তাহার অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়াই গোবিন্দলাল তাহাকে পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছে। কিন্তু তাহার পরও গোবিন্দলালের মনে ভ্রমরের অনাবিল ভালোবাসার মধুর স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। কাশী যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াও তাহার মনে হইয়াছে ফিরিয়া যাই। অনেকক্ষণ ধরিয়া ফিরিবে কিনা চিন্তা করিয়াছে। যে দর্পের সঙ্গে সে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহাতে এখন আর ফেরা উচিত হইবে না মনে করিয়াই সে চলিয়া গেল। তবু ভাবিল, এত তাড়া কিসের। ইচ্ছা করিলেই ফিরিয়া আসিব। বস্তুত গোবিন্দলাল চরিত্রের এই দোলাচল দিকটি পাঠককে মুগ্ধ না করিয়া পারে না। তাহার মধ্যে সুমতি কুমতির দ্বন্দ্ব পরিষ্কার দেখা যায়; আর দেখা যায় রোহিণীর মধ্যে। অন্য কোন চরিত্রে এই স্পষ্ট বিশ্লেষণ এবং দ্বন্দ্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি ভ্রমরের মধ্যেও নহে। সে স্বামীর উপর অবিশ্বাস এবং অভিমান করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেখানে গিয়াও তাহার কাজের ভাল-মন্দের বিচার তাহার মনে হয় নাই। হরিদ্রাগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দলালের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ কৃষ্ণকান্তের জন্য শোক-ক্রন্দনেই কাটিয়া গিয়াছে। গোবিন্দলালকে সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা করিবার কথা একবারও তাহার মনকে আলোড়িত করে নাই। কিন্তু গোবিন্দলালের কাছে তাহাকে পরিত্যাগের কথা শুনিয়া হঠাৎ সে তাহার পিত্রালয়ে গমনের জন্য অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। এই অপরাধ-বোধ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কোন বিশ্লেষণ করেন নাই। তার পরেই গোবিন্দলাল যখন ভিক্ষুকের মত তাহার নিকট আশ্রয় চাহিল, তখন যে ভ্রমর

গোবিন্দলালের জন্য আদর্শ হিন্দু নারীর মত বৎসরের পর বৎসর রুগ্নশয্যায় অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। স্পষ্ট লিখিল, "আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই।" কেন—তাহার বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্দ্র করেন নাই।—পাঠককে তাহা অনুমান করিয়া লইতে হয়। তাহা ছাড়া রোহিণী-গোবিন্দলালের মধ্যে কথোপকথন বা প্রসাদপুরে তাহাদের একত্র বসবাসের কোন বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র দেন নাই। পাপের প্রতি একটি স্বাভাবিক বিতৃষ্ণার জন্যই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পূর্ণাঙ্গ চিত্র-অঙ্কনে বিরত থাকিয়াছেন। ঐ বর্ণনা না থাকায় রোহিণী, গোবিন্দলাল এবং ভ্রমরের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। রোহিণীকে হত্যার কারণ লেখকের প্রত্যয়ে বিশ্বাস করিতে হয়। "কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে এইগুলি কয়েকটি ত্রুটি। ইহা ছাড়া প্রধান অপ্রধান, পারিপার্শ্বিক চরিত্র ও ঘটনার বিশ্লেষণ তাৎপর্যপূর্ণ।

"বিষয়ী বিচক্ষণ দৃঢ়চিত্ত দানশীল জমিদার কৃষ্ণকান্ত, দুষ্কৃতকারী শয়তানি মনোভাব সম্পন্ন, জালজুয়াচুরিতে অতি পক্কমস্তিষ্ক হরলাল সাধারণ রকমের সহানুভূতিশীল বিনোদলাল, পুত্রবধূর প্রতি সহানুভূতিশূন্য গোবিন্দলাল-জননী, বিভিন্ন প্রকৃতির প্রতিবেশিনী, ক্ষিরি-ঝি ইত্যাদি মিলিয়া প্রত্যেকেই জীবন্ত। প্রত্যেককেই বাস্তব সমাজে আমরা অনেক সময় পাইয়া থাকি।" "আমাদের অন্তরে যে গুরুতর বিপ্লববহ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে, তাহা আমাদের পরিজন ও প্রতিবেশীদের ফুৎকারেই শিখা বিস্তার করে। শত বন্ধনজালজটিল সামাজিক জীবন আমাদের অন্তরের সমস্যাকে আত্মসীমায় (self-contained) থাকিতে দেয় না। তাহারা সূক্ষ্ম, দুরতিক্রম্য প্রভাব বিস্তার করিয়া আমাদের ভাগ্য-সূত্রকে আরও গ্রন্থিসংকুল করিয়া তোলে। আমাদের বাস্তব জীবনযাত্রার উপর এই প্রতিবেশীশ্রেণীর প্রভাব বড অল্প নহে। রোহিণী, গোবিন্দলাল এবং ভ্রমরের জীবনের পরিণতির মূলে এই প্রতিবেশী-শ্রেণীর প্রভাব প্রধান। অল্পকথায় বঙ্কিমচন্দ্র চাকরাণী সম্প্রদায় এবং ঈর্ষাকাতর পাড়া-প্রতিবেশীর জীবন্ত চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। দাসী-চাকরাণী সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"যাহার চাকরাণী নাই, তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা-সংবাদ, কোন্দল এবং ময়লা এই চারিটি বস্তু নাই। চাকরাণী নামে দেবতা এই চারিটির সৃষ্টিকর্তা।" দ্বিতীয় খণ্ডে ভ্রমরের

বিরহ-কাতর মনের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্দলাল তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও ভ্রমর নিয়ত স্বামী-চিন্তায় ব্যাকুল। গোবিন্দলালের কল্যাণচিন্তা ছাড়া তাহার কোন চিন্তা নাই। নিজের প্রতি তাহার চরম অবহেলা তাহাকে রোগশয্যায় শায়িত করিল। এই খণ্ডেই আমরা কন্যা-চিন্তায় কাতর, বিচক্ষণ, চতুর ও ধুরন্ধর মাধবীনাথের সাক্ষাৎ পাই। তাঁহার অসাধারণ কূটবুদ্ধি। কাজ হাসিল করিতে তাঁহার জোড়া নাই। "তাঁহার কন্যা-স্নেহের গভীরতা, আপন বুদ্ধিতে দৃঢ় বিশ্বাস—অভিনয় নৈপুণ্যপূর্ণ আলাপ ও মানব-চরিত্র বিশ্লেষণ-শক্তি আমাদিগকে মুগ্ধ করে।" তাহা ছাড়াও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী পোস্টবাবু, পুলিশ, ফিচেল খাঁ—প্রত্যেকটি চরিত্র সজীব। এমন কি গোবিন্দলালের প্রসাদপুরের কুঠির চাকর সোনা-রূপোর চরিত্রের বাস্তবতা আমাদের মুগ্ধ করে। ভ্রমরকে পরিত্যাগের দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে ফিরিতে চাহিলে ভ্রমর তাহাকে লিখিয়াছিল, গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে আসিতে পারে কিন্তু তাহা হইলে ভ্রমর সেখানে বাস করিবে না। ইহা একটু অস্বাভাবিক হইলেও তাহার মৃত্যুকালীন গোবিন্দলালকে দেখিবার যে ইচ্ছা তাহা সাধারণ হিন্দু-নারীর মৃত্যুকালীন অবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভ্রমরের ভগিনী যামিনীর কোমল সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহারও সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে। এইরূপে কৃষ্ণকান্তের উইলের সমস্ত চরিত্রগুলি অল্পবিস্তর ত্রুটি সত্ত্বেও বাস্তব এবং জীবন্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল ছাড়া অন্য কোন উপন্যাসে এত বিশ্লেষণ এবং বাস্তবতা দেখা যায় না। সেইখানেই কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সঙ্গে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য আছে। "চিত্রের পূর্ণতায় ও বিশ্লেষণের গভীরতায় ইহা বিষবৃক্ষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, আরও পরিপক, অনিন্দনীয় কলাকৌশলের নিদর্শন।" কিন্তু বিষবৃক্ষ উপন্যাসে অতিপ্রাকৃতের প্রভাব আছে। কৃষ্ণকান্তের উইলে তাহা নাই। লেখকের বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রনাথ, ভ্রমর ও সূর্যমুখী এবং রোহিণী ও কুন্দনন্দিনী বিভিন্ন প্রকারের চিত্ররূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। গোবিন্দলালের অধঃপতনের আমরা যেরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পাইয়াছি, নগেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাহা পাই না। কুন্দনন্দিনী মৌন আর রোহিণী মুখরা। সূর্যমুখী স্বামীর সুখ ভিন্ন অন্য চিন্তা করে না। সেজন্য

স্বামীকে সুখী করিবার জন্য কুন্দের সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দিয়াছিল। কিন্তু ভ্রমর স্বামীর কল্যাণ চিন্তা করিলেও অবিশ্বাসী স্বামীকে ক্ষমা করিতে পারে নাই। কুন্দনন্দিনী-সূর্যমুখী অপেক্ষা রোহিণী-ভ্রমরের মানসিক অবস্থা অধিকতর জটিলতাপূর্ণ। "সূর্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমর অধিকতর জীবন্ত হইয়াছে, তাহার অসুচিত অভিমান ও সন্দেহ-প্রবণতা ট্র্যাজেডিকে আসন্নতর করিয়াছে। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের অনুরাগ সঞ্চারের প্রথম অঙ্কুরটি সেরূপ বিশদভাবে প্রকট করিয়া দেখান হয় নাই; সূর্যমুখীর প্রতিও বিতৃষ্ণার কোন পর্যাপ্ত কারণ দেখান হয় নাই, সূর্যমুখীর নিজের কোন অপরাধ এই বিচ্ছেদ সংঘটনে সহায়তা করে নাই। কিন্তু বর্তমান উপন্যাসে রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের ভাবের রূপান্তর, দয়া ও সমবেদনা হইতে প্রেমে পরিণতি যথেষ্ট পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।" তাহা ছাড়া পরিণাম সংঘটনেও উভয় উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে রোমান্স-সুলভ আদর্শবাদের দ্বারা নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর মিলনে উপন্যাস শেষ হইয়াছে। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে অত সুলভ পরিণতি সম্ভব হয় নাই। যে নানা ঘটনার মধ্য দিয়া গোবিন্দলাল-ভ্রমরের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে সহজে দূর করা সম্ভব হয় নাই এইরূপে দেখা যায়, বিষবৃক্ষ উপন্যাস হইতেও কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে বঙ্কিমের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ক্ষমতা অধিক সার্থক এবং সুন্দর হইয়াছে।

[চ] ॥ ট্র্যাজেডি পরিকল্পনা ॥

গ্রীক "Tragos" শব্দ হইতে ইংরেজী "Tragedy" শব্দটির উৎপত্তি। ট্র্যাজেডি—এই ইংরেজী শব্দটির বাংলা-প্রতিশব্দ 'বিয়োগান্ত' বা 'বিষাদান্ত'; অর্থাৎ যাহার সমাপ্তি বিয়োগমূলক বা বিষাদমূলক। ইহা একটি কাহিনী কিংবা একটি চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইতে পারে। বাংলা সাহিত্যে এই ট্র্যাজিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে য়ুরোপাগত। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আমরা ট্র্যাজেডি রচনা হইতে দেখি নাই, কেননা ভারতবর্ষীয় জীবন-দৃষ্টিতে এই পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য ছিল না। য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডি-ভাবনার সহিত কালিদাসের দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনা করিয়া শকুন্তলার জীবন পরিণামের ব্যাখ্যা-সূত্রে প্রাচীন ভারতীয় জীবনবোধের পরিচয় দিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়া কল্যাণ বিভাসিত আনন্দলোকে শকুন্তলা উপনীত হইয়াছে—ইহাই ভারতীয় কবির চিত্তের মূল

বিশ্বাস। দুঃখের সাধনা মানুষকে সুন্দর ও মঙ্গলময় আনন্দলোকে পৌঁছাইয়া দেয়। ভারতীয় জীবন-দৃষ্টিতে সমগ্র জীবনকে অখণ্ডরূপে দেখা হয় বলিয়াই জীবনের দুঃখময় খণ্ড রূপকে শেষ পরিণতি বলিয়া কল্পনা করা হয় না। তাই য়ুরোপীয় চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডি বলিয়া কিছুই ছিল না।

ট্র্যাজেডির জন্মস্থান য়ুরোপ। গ্রীক্ মনীষী অ্যারিস্টটল এই ট্র্যাজেডির একটি সুন্দর সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন: "Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kind being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative; through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions." অর্থাৎ এই সংজ্ঞার মূল বক্তব্য হইল, ট্র্যাজেডি এমন একটি গুরুতর, সমগ্র ও বিশেষ আয়তনের ঘটনার অনুকরণ—যাহার উদ্দেশ্য হইল করুণ রস এবং ভয়ানক রস উদ্রিক্ত করিয়া মানব মনের উক্ত ভাবগুলির মোক্ষণ করা। অ্যারিস্টটল এই সংজ্ঞাটি গ্রীক নাটক সম্পর্কেই প্রয়োগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার স্বরূপ লক্ষণ সাহিত্য-রূপের অন্যান্য বিভাগেও সমভাবে দৃশ্যমান।

গ্রীক মহাকাব্য ও নাটক বহুদিন ধরিয়া এই 'ট্র্যাজিক রস' পরিবেশন করিয়া আসিয়াছে। গ্রীক ট্র্যাজেডির অন্যতম প্রধান লক্ষণ 'নিয়তিবাদ'; ইংরেজীতে ইহাকে বলা হয় "Tragedy of fate" অর্থাৎ এক অনির্দেশ্য, অনির্ণেয়, রহস্যময় শক্তি ব্যক্তির জীবনের উপর কোন সূত্রে নামিয়া আসিয়া উহাকে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। এই সূত্রটি কখনও মানবের ইচ্ছাকৃত অপরাধ, কখনও বা অজ্ঞানকৃত নীতিহীন কর্ম। এই দুর্জ্ঞেয় নিয়তি, তাই কখনও ব্যক্তির চরিত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যদিয়া, কখনও সামাজিক ন্যায়নীতির রূপ লইয়া, কখনও বা দেবতার অলৌকিক শক্তির রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে বঙ্কিম রোহিণীর জীবনের যে বিষাদঘন চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা গ্রীক নাটকের এই নিয়তিবাদকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রোহিণীর জীবনে যে বিপর্যয় অনিবার্যভাবে দেখা দিয়াছে তাহা অন্তরের পথ

অপেক্ষা বাহির হইতেই বেশী আসিয়াছে। অবশ্য রোহিণীর চরিত্রের মূলে এই ট্র্যাজেডির বীজ উপ্ত ছিল। রোহিণী ছিল বালবিধবা; কিন্তু তাহার বেশভূষা বিধবার উপযোগী ছিল না। অপরূপ সুন্দরী যুবতী রোহিণী তাহার জীবন আরম্ভের পূর্বেকার এই দুর্ভাগ্যকে সহজভাবে স্বীকার করিতে পারে নাই। সে ভাবিত, "কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না? কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল?" পুরুষের আসঙ্গলিপ্সা তাহার মধ্যে প্রবল ছিল। তখন বিধবা-বিবাহ বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধিবদ্ধ, কিন্তু সমাজে তাহা প্রচলন লাভ করে নাই। তথাপি উপযুক্ত পাত্র পাইলে রোহিণীর পুনরায় বিবাহ করিতে কোন আপত্তি নাই। সুযোগের অভাবে সে তাহার খুল্লতাতের সংসারে মুখ বুজিয়া দিনপাত করিতেছিল।

দুষ্টমতি প্রবঞ্চক হরলালের প্রলোভনে রোহিণীর সেই সুপ্ত কামনা ঊর্ধ্বশিখা লাভ করিল। সে প্রলুব্ধ হইল। সেজন্য যে রোহিণী বলিয়াছিল, "চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না," সেই রোহিণী অবলীলায় সেই উইল চুরি করিয়া আনিল। কিন্তু হরলাল তাহার কথা রাখিল না। উইল-চোরকে সে কৃষ্ণকান্তের পুত্র হইয়া স্ত্রী করিতে পারিল না। হরলালকে না পাইবার নৈরাশ্যে, ক্ষোভে এবং অপমানে সে যখন নিজের পরিণাম চিন্তা করিতেছিল তখন পুষ্করিণী-তীরের কোকিলকূজন তাহাকে আরও উতলা করিয়া দিল। সে কাঁদিতে বসিল। পরদুঃখকাতর সহৃদয় গোবিন্দলাল ক্রন্দনরতা রোহিণীকে স্বাভাবিক সহানুভূতি জানাইল; এবং তাহাই আপন অজ্ঞাতসারে গোবিন্দলালের ট্র্যাজেডির ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিল।

রোহিণী সমাজে প্রচলিত বৈধব্য-জীবনকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিল. তাহার জীবনে সমাজের প্রতিশোধই ট্র্যাজেডি হইয়া দেখা দিয়াছে। শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু রোহিণীর প্রণয়-পিপাসাকে অন্যায় বলিতে পারেন নাই। কারণ রোহিণী প্রকৃতির স্বভাবধর্মকে লঙ্ঘন করে নাই। বিপত্নীক হরলাল বা গোবিন্দলাল ছাড়া অন্য কাহাকেও ভালবাসিলে রোহিণীর জীবনে হয়ত এই ট্র্যাজেডি দেখা দিত না। রোহিণী তাহার স্বভাব সত্যকে স্বীকার করিয়া সমাজের ন্যায়নীতিবোধকে আঘাত করিয়াছে বলিয়াই প্রত্যাঘাতে

তাহার জীবন বিসর্জন দিতে হইল। রোহিণী দুঃখিনী। পুরুষের সহানুভূতি লাভে সে বঞ্চিতা। ক্রন্দনরতা তাহার প্রতি সহানুভূতি জানাইয়াছে বলিয়া গোবিন্দলালের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ তাহার স্বাভাবিক। উইল চুরি করিয়া রোহিণী এই গোবিন্দলালের প্রতিই অন্যায়াচরণ করিয়াছে বলিয়া তাহার মনে অনুতাপ দেখা দিল। এই কৃতজ্ঞতা এবং অনুতাপবোধ হইতে প্রণয়ের সঞ্চার হইল। রোহিণী জানিত ইহা সামাজিক অপরাধ। কিন্তু "মনুষ্য মাত্রই পরাধীন।" সে তাহার এই প্রেমকে অস্বীকার করিতে পারিল না। এমন কি গোবিন্দলালকে দেখিতে পাইবে না বলিয়া সে হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িতেও রাজী হইল না। সে মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল, "হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়! আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি, আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আম য় পোড়াইও না।" কিন্তু তাহা নির্বাপিত হইল না। নিয়তি তাহাকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলিয়া দিয়াছে। না হইলে যে গোবিন্দলাল তাহাকে ভুলিবার জন্য জমিদারি পরিদর্শনে গিয়াছিল সেই গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য রোহিণীকে আশ্রয় করিল। প্রসাদপুরের বিলাসকুঠিতে রোহিণীর অতৃপ্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইল। সে সুখী হইল। কিন্তু সেই সুখ জীবনের সুখ নহে, মরণের সুখ। যে গোবিন্দলাল তাহাকে সুখী করিয়াছিল সেই গোবিন্দলালই তাহাকে গুলি করিয়া মারিল। এই ঘটনা অবশ্য আকস্মিক। কোন যুক্তিসঙ্গত কার্য-কারণ দ্বারা সমর্থিত নহে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতে রোহিণী নিশাকর-ষড়যন্ত্রের বলি হইল। রোহিণীর নিশাকর-মোহ যুক্ত হওয়ায় রোহিণীর ট্র্যাজেডিতে অধিক কারুণ্য দেখা দিয়াছে। তাহা হইলেও সামগ্রিক বিচারে আমরা দেখিতে পাই, যে রোহিণী তাহার প্রকৃতি-ধর্মকে সমাজনীতির অনুশাসনে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই, পুরুষমানুষের সান্নিধ্যে তাহা বিকাশ লাভ করিয়াছে, গোবিন্দলাল যাহাকে প্রশ্রয় দিয়া স্বীকৃতি দান করিল, সেই রোহিণীর ইচ্ছাবিরুদ্ধ অকালমৃত্যু সত্যই ট্র্যাজিক।

গোবিন্দলালের ট্র্যাজেডি পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাহার ট্র্যাজেডি কল্পনা শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি পরিকল্পনার সমগোত্রীয়। শেক্সপীয়র তাঁহার ট্র্যাজিক নাটকগুলিতে জীবনের যে মূল রহস্যের ইঙ্গিত

দিয়াছেন তাহা গ্রীক নিয়তিবাদের সহিত সম্পর্কিত নহে। কারণ শেক্স-পীয়রের নাটকগুলিতে—চরিত্রই নিয়তি। ইংরেজীতে ইহাই হইল Tragedy of character—চরিত্রের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি ও দুর্বলতা প্রবণতাই সেখানে ট্র্যাজিক রস ব্যঞ্জনার মূল উৎস। য়ুরোপীয় সাহিত্য-রীতির অনুসৃতির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সার্থকভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যরীতির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি ফুটাইয়া তোলেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দলালের চরিত্রে ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং বলা চলে গোবিন্দলালের চরিত্রই তাহার নিয়তি। অবশ্য নিয়তিও গোবিন্দলালের ভাগ্যকে লইয়া কম ছিনিমিনি খেলে নাই। বস্তুতঃ ট্র্যাজেডি পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র কোন এক অবিমিশ্র মতবাদের অনুসরণ করেন নাই। সেখানে গ্রীক নিয়তিবাদ সক্রিয় ভূমিকা-গ্রহণ করিলেও, শেক্সপীয়রীয় রীতির অনুসৃতিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নহে। কারণ, গ্রীকরীতির ট্র্যাজেডি পরিকল্পনায় যাহা বহিরঙ্গ ঘটনা-সম্পর্কিত, শেক্সপীয়রীয় রীতিতেই তাহা অন্তরঙ্গ ঘটনা-শ্রিত, শেষোক্ত রীতিতে—চরিত্রই নিয়তি। বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসে এই দুই রীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। চরিত্রের মধ্যে যে ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত ছিল নিয়তি তাহাকে ঝড়ের মত তীব্র বেদনাত্মক পরিণতি দান করিয়াছে। রোহিণীর ট্র্যাজেডির মূলেও তাহা ছিল। গোবিন্দলালের চরিত্রেও এই দুই রীতি বর্তমান। তবে এখানে নিয়তি হইতে তাহার চরিত্রই তাহাকে বিষাদঘন পরিণতির দিকে চালিত করিয়াছে বেশী।

গোবিন্দলাল সহৃদয়, স্বল্পভাষী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, হরিদ্রাগ্রামের জমিদার-বংশের ছেলে। জমিদারির অর্ধেকাংশের সে মালিক। তাহাদের জমিদারির মোট আয় বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা। রোহিণীকে সে বাল্যকাল হইতে চিনিত। কিন্তু কোনদিন তাহার প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করে নাই। সে তাহার স্ত্রী কা'লো ভ্রমরকে লইয়াই সুখে বাস করিতেছিল। একদিন বারুণী পুষ্করিণীতে রোহিণীকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার মনে হইল, "এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ—আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসার পতঙ্গ, অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না?" রোহিণীকে সে সহানুভূতি জানাইল। চুরির দায় হইতে কৃষ্ণকান্তকে অনুরোধ করিয়া তাহাকে মুক্ত

করিয়া দিল। রোহিণীর মুখে তাহার প্রতি আসক্তি জানিল। কিন্তু সে কোন উৎসাহ বোধ করে নাই। ভ্রমরকে রোহিণীর ভালবাসার কথা বলিয়া দিল। কিন্তু জলমগ্না রোহিণীর রূপ দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। আসলে তাহার মনেই এই রূপতৃষ্ণার বীজ নিহিত ছিল। এই রূপজ মোহ অবশ্য স্বাভাবিক। "তাতে দোষ কি? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছিল।" গোবিন্দলাল জলমগ্না রোহিণীর অঙ্গস্পর্শ করিল। তথাপি রোহিণীর চিন্তাকে সে প্রশ্রয় দিল না। সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। মাটিতে মুখ লুকাইয়া দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিল, "হা নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর! তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব?- আমি মরিব— ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।" রোহিণীকে ভুলিবার জন্য সে জমিদারি পরিদর্শনে গেল। ইতিমধ্যে পাড়াপ্রতিবেশীরা গোবিন্দলাল-রোহিণীর নাম একত্রিত করিয়া কলঙ্ক রটাইতে লাগিল। ভ্রমর গোবিন্দলালকে অবিশ্বাস করিল। লিখিল, "তোমার দর্শনে আমার সুখ নাই।" গোবিন্দলাল আসিতেছে শুনিয়া ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। এদিকে ব্রহ্মানন্দও লিখিয়াছিল, গোবিন্দলাল-রোহিণীর নামে ভ্রমরই কলঙ্ক রটাইয়াছে। এ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই নিয়তি-তাড়িত। গোবিন্দলালের কিছুই করিবার ছিল না। কিন্তু তাহার আদরের ভ্রমরের অবিশ্বাস এবং পিত্রালয় গমন তাহার ব্যক্তিত্বে আঘাত করিল। অবশেষে ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য রোহিণীর চিন্তা আশ্রয় করিল। গোবিন্দলাল নিজেই এই সমস্ত জটিলতার জন্য দায়ী। নিয়তি তাহাকে আরও জটিলতর করিল। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের চরিত্র সংশোধনের জন্য তাহার বিষয় ভ্রমরের নামে উইল করিয়া দিলেন। গোবিন্দলালের কাছে ইহা আরও অপমানকর বোধ হইল। সে স্ত্রীর অন্নদাস হইয়া থাকিবে না। ভ্রমরকে সে পরিত্যাগ করিল। নিজের জীবনে নৈরাশ্য ঘনাইয়া আসিল। তাহার এই 'অসার প্রয়োজনশূন্য' জীবনকে মাটির পাত্রের মত প্রয়োজন-শেষে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য যদৃচ্ছ জীবন যাপন করিতে বাহির হইয়া গেল। শেষ পর্যন্ত রোহিণী তাহার অধঃপতনের সঙ্গী হইল। কিন্তু তাহাও বেশীদিন সহ্য হইল না। রোহিণীকে সে হত্যা করিল। দেশ-দেশান্তরে

ভ্রমণ করিল। অবশেষে খুনের দায়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়িল। গোবিন্দলাল অর্থাভাবে নায়েবের কাছে পত্র লিখিল তথাপি ভ্রমরের নিকট নতি স্বীকার করিল না। খুনের দায় হইতে মুক্ত হইয়াও সে ভ্রমরের কাছে ফিরিল না। তাহার এই ট্র্যাজিক ব্যক্তিত্বের জন্য পাঠকমনে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঞ্চার হয়। কিন্তু তার পরই গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছে ভিক্ষুকের মত আশ্রয় চাহিল এবং ভ্রমরের প্রত্যাখ্যানেও শেষ পর্যন্ত ভ্রমরের মাসিক বৃত্তির উপর বাঁচিয়া রহিল। গোবিন্দলালের ব্যক্তিত্বের ইহা শোচনীয় পতন। কিন্তু এই পতন আকস্মিক। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার জন্য উপযুক্ত বিশ্লেষণ দেন নাই। যে চরিত্র ভাঙে তবু মচকায় না, গোবিন্দলালের চরিত্র ছিল সেইরূপ। ভ্রমরের অন্নদাস হওয়ার চেয়ে নিজেকে ধ্বংস করাই যাহার শ্রেয় বোধ হইয়াছিল, সে ভিক্ষুকের মত স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করিল এবং শেষ পর্যন্ত ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃস্থাপন করিয়া শান্তি লাভ করিবার কামনায় সন্ন্যাস লইল; এবং এই পরিণতির ফলেই "Tragedy of character" শেষ পর্যন্ত হইতে পারিল না।

ভ্রমরের দর্পই তাহার জীবনকে ট্র্যাজিক করিয়া তুলিয়াছিল। সে ছিল সরলা বালিকা। গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই তাহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের অনুপস্থিতিতে পাড়াপ্রতিবেশীর কলঙ্ক রটনায় এবং রোহিণী যখন মিথ্যা শাড়ী এবং গহনা দেখাইয়া গেল তখন গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরের অচলা বিশ্বাসে ফাটল ধরিল, তাহার অবিশ্বাস হইল; এবং সেই অবিশ্বাসের জন্য সে কেবল কান্নাকাটি করিল না, গোবিন্দলালকেও আঘাত করিল। লিখিল, "তুমি মনে জান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহাই জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমার বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই।" এখানেই শেষ নহে। গোবিন্দলাল বাড়ী আসিতেছে শুনিয়া মাতাকে মিথ্যা পীড়ার সংবাদ দিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। সে হয়ত ভাবিয়াছিল, গোবিন্দলাল তাহার পিত্রালয়ে গিয়া তাহার অভিমান দূর করিবে। কিন্তু কার্যত তাহা হইল না। পিত্রালয়ে গমন হইতেই তাহার ট্র্যাজেডির বজ্রপাত হইল। নিষ্ঠুর নিয়তি তাহার ভাগ্যকে বিপরীত মুখেই

প্রবাহিত করিল। গোবিন্দলালের সঙ্গে তাহার জীবন আর জোড়া লাগিল না। গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রেমে আকৃষ্ট হইল। সে স্বামী-পরিত্যক্তা হইল। গোবিন্দলালের পায়ে কান্নাকাটি করিয়াও সে গোবিন্দলালকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিল না। গোবিন্দলাল তাহাকে ছাড়িয়া অধঃপতনের পথে চলিয়া গেল। আর ভ্রমর রুগ্নশয্যায় পড়িয়া বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল ছয় বৎসর পর ভিক্ষুকের ন্যায় যখন তাহার নিকট আশ্রয় চাহিল, তখনও ধর্মশিক্ষা-নিয়ন্ত্রিত ভ্রমরের হৃদয় পরদারনিরত নারীহন্তা গোবিন্দলালকে পূর্বের শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে গ্রহণ করিতে না পারায় ট্র্যাজেডি পূর্ণ হইল।

সামগ্রিক বিচারে কাহিনীর দিক হইতেও কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসকে ট্র্যাজেডি বলা যায়। গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মধুর দাম্পত্য জীবনে নানা ঘটনার জটিলতায় একের পর এক বিপদের আবির্ভাবে এই ট্র্যাজেডি সংঘটিত হইয়াছে। নিয়তিই এই সমস্ত ঘটনার নির্ণায়ক। কৃষ্ণকান্ত রায়ের উইল তৈয়ারি হইতে তাহার সূত্রপাত। এই উইল সৃষ্টি না হইলে দুর্বিনীত হরলালের রোহিণীর কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন হইত না এবং রোহিণীর অভ্যস্ত জীবন হইতে তাহার সুপ্ত লালসা-বহ্নিও জাগ্রত হইত না। এই অগ্নি-দাহেই ভ্রমর-গোবিন্দলালের সুখের জীবন পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল। সদ্য জাগ্রত রোহিণীর কামনাময় জীবনে গোবিন্দলাল সহানুভূতি জানাইয়া দিয়া সেই দাহকে নিজের শয়নগৃহে লইয়া আসিল। ভ্রমরের আত্মহারা প্রেমও তাহাকে ঠেকাইতে পারিল না। সে-ও শেষ পর্যন্ত গোবিন্দলালকে অন্যায় সন্দেহ করিল। অনিবার্য ঘটনার চক্রগতিতে ভ্রমর গোবিন্দলালকে ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। এখানেই ভ্রমর-গোবিন্দলালের জীবনের climax বা চরম সন্ধিক্ষণ। ভ্রমরকে গোবিন্দলাল পরিত্যাগ করিল। বিচ্ছেদের দীর্ঘ ছয় বৎসর পর গোবিন্দলাল যখন অন্তরের দীনতায় ভিখারীর মতো ভ্রমরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল তখন বিরহখিন্ন, ধর্মনিষ্ঠ ভ্রমর পরদারনিরত নারীহন্তা গোবিন্দলালকে পূর্বের আসনে বসাইতে পারিল না। ট্র্যাজেডিবৃত্তের এইখানেই পূর্ণতা। ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরের বিশ্বাসকে সত্যরূপ দিবার জন্যই মৃত্যুশয্যায় ভ্রমর-গোবিন্দলালের মিলন ঘটাইলেন এবং পরিশেষে ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃস্থাপন করাইয়া গোবিন্দলালকে শান্তিলাভ করাইলেন। ইহা উপন্যাসের বাহিরের ঘটনা।

॥ প্রশ্নোত্তর ॥

১। প্রশ্ন : 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে "নারীত্বের দিক দিয়া রোহিণীর জীবন ও সাংসারিক দিক দিয়া ভ্রমরের জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল কোন্ অপরাধে ও কাহার অপরাধে ?"

উত্তর : রোহিণী বালবিধবা। নারীর স্বাভাবিক সুখভোগ হইতে সে সামাজিক দিক দিয়া বঞ্চিত। তাহার নারীত্ব বিকাশের পূর্বেই প্রতিহত। রোহিণী কিন্তু তাহার এই অবস্থাকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে যে ঘটনার জন্য দায়ী নহে, তাহার পরিণাম নির্বিবাদে সহ্য করিতেও সে নারাজ। হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ বৈধ হইলেও বিধবার প্রেমকে সহানুভূতির চোখে দেখা হয় না। ব্রহ্মচর্যের কঠোর ব্যবস্থার মধ্যে বালবিধবাকে নিগৃহীত হইতে হয়। কিন্তু প্রকৃতিগত জৈব-প্রয়োজনকে অস্বীকার করা অনেক সময় তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তখন জীবনের রাজপথ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা চোরাগলির পথ অনুসরণ করে। রোহিণীর মধ্যেও পুরুষের আসঙ্গলিপ্সা ছিল প্রবল। কিন্তু সমাজের প্রতিকূলতায় সে তাহার কামনার পথ রুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মানন্দের সংসারে মুখ বুজিয়া দিনপাত করিতেছিল।

দুর্মতি হরলাল তাহাতে বাদ সাধিল। সে তাহার স্বার্থে রোহিণীকে প্রলুব্ধ করিল। বিধবা-বিবাহের লোভ দেখাইল। বিপত্নীক হরলাল রোহিণীকে বিবাহ করিলে সেও হয়ত আপন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তাহার সংসারকে সুন্দর করিয়া গড়িতে পারিত। কিন্তু সামাজিক দিক দিয়া তাহা সম্ভবপর হয় নাই। অতৃপ্ত বুভুক্ষার এই নবজাগৃতিকে রোহিণী অস্বীকার করিতে পারিল না। বারুণীর পুষ্করিণীতীরে কোকিল-কূজন তাহাকে আরও উদাস করিয়া তুলিল। গোবিন্দলালের সহানুভূতিকে অবলম্বন করিয়া আবার রোহিণীর প্রেম প্রকাশ লাভ করিল। আর সেখানেই দেখা দিল বিপর্যয়। আমাদের সমাজ-সংসারে একজন পুরুষের ভাগ্যে একাধিক নারীর ভালবাসার সঞ্চার নূতন কথা নহে। কোন বিবাহিত পুরুষের ক্ষেত্রে তাহা দেখা দিলে সংসারে সাধারণত বিপর্যয় দেখা দেয়। ভ্রমর-গোবিন্দলাল ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি হইলে অনুকূল পরিবেশে বিবাহসূত্রে যদি রোহিণী নীড় বাঁধিতে পারিত তাহা হইলে হয়ত সে-ও একনিষ্ঠ প্রেমে সেই পুরুষকে তৃপ্তি দান করিতে পারিত।

গোবিন্দলালকে লাভ করিয়া রোহিণী সুখী হইয়াছিল কিন্তু গোবিন্দলাল

দুখী হইয়াছিল কিনা বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বলেন নাই। বরং বলিয়াছেন, রোহিণীকে লইয়া যখন গোবিন্দলাল বিলাস সম্ভোগে মত্ত তখনও ভ্রমর অন্তরে আর রোহিণী বাহিরে। গোবিন্দলাল কেবল ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য এবং প্রবৃত্তির মোহবশতঃ রোহিণীকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছিল। তাহার প্রতি কখনও অন্তরের আকর্ষণ অনুভব করে নাই। সেজন্য যেদিন বুঝিতে পারিল, রোহিণী তাহার আশ্রয়ে থাকিলেও সে আসলে বিশ্বাসঘাতিনী, সেদিনই তাহাকে গুলি করিয়া মারিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, রোহিণী তাহার জিগীষা বৃত্তির বশেই নিশাকরের কাছে গিয়াছিল আর গোবিন্দলালের কাছে তাহা ছিল বিশ্বাসঘাতকতা। রোহিণীর নিষ্ঠার অভাব তাহার জীবনে ব্যর্থতার জন্য দায়ী।

কিন্তু আসল কারণ অন্যত্র। হিন্দুসমাজের কঠোর আদর্শের নিকটে গোবিন্দ-লালের প্রতি রোহিণীর প্রেম অশ্রদ্ধেয় এবং পাপ। সমাজ তাহাকে স্বীকৃতি দিলে সামাজিক শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হইতে বাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার আসল উদ্দেশ্য হইল হইল সমাজের মঙ্গলসাধন। তাঁহার পক্ষে বিধবার প্রেমের স্বীকৃতি দান অসম্ভব।

ভ্রমরের সাংসারিক জীবন সেরূপ জটিল নহে। ভ্রমরও দুঃখী নারী। তাহার স্বামী অন্য রমণীর প্রেমে মুগ্ধ। ইহা হইতে স্ত্রীলোকের অধিক দুঃখ কী হইতে পারে? কিন্তু এমন পূর্বে ছিল না। মাত্র আট বৎসর বয়সে ভ্রমরের বিবাহ হয়। নয় বৎসর সে গোবিন্দলালের সঙ্গে জীবন যাপন করে। সেই জীবন ছিল মধুময়। ভ্রমর গোবিন্দলাল ছাড়া এই সংসারে অন্য কিছু জানিত না। রোহিণীর প্রেম সেই অনাবিল দাম্পত্য জীবনে বাধ সাধিল। রোহিণী যে গোবিন্দলালকে ভালবাসে গোবিন্দলাল তাহা ভ্রমরকে বলিয়া দিয়াছিল। ভ্রমর সেই কথা শুনিয়া রোহিণীকে বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে উপদেশ দিয়াছিল। কিন্তু ভ্রমর জানিত না, একদিন তাহাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে। জলমগ্না রোহিণীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া এবং রোহিণীর অসহ্য প্রেমযন্ত্রণার কথা শুনিয়া গোবিন্দলাল বিচলিত হইল। রোহিণীকে ভুলিবার জন্য সে পরদিন জমিদারি পরিদর্শনে চলিয়া গেল। ভ্রমর একা বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গে যুক্ত হইল ঘটনার চক্রজাল—প্রতিবেশিনীদের গোবিন্দলাল-রোহিণীর কুৎসা রটনা—রোহিণীর মিথ্যা শাড়ী ও নকল গহনা দেখাইয়া যাওয়া। ভ্রমর গোবিন্দলালকে অবিশ্বাস করিয়া অভিমানে পিত্রালয়ে

চলিয়া গেল। গোবিন্দলাল ভ্রমরের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া ভ্রমরে পিত্রালয়ে গমনকে অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করিল। ভ্রমরের উপ গোবিন্দলালের এই বীতরাগকে আরও তীব্র করিলেন কৃষ্ণকান্ত। তি গোবিন্দলালের বিষয় ভ্রমরের নামে উইলে লিখিয়া গেলেন। গোবিন্দলালে জননীও পুত্র থাকিতে পুত্রবধূর সম্পত্তিপ্রাপ্তি ভাল চোখে দেখিলেন না তিনিও কাশী চলিয়া গেলেন। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া চলি গেল। চারিদিক হইতে নিয়তির চক্রজাল ভ্রমর-গোবিন্দলালের সুখের সংসারে ভাঙ্গিয়া তচনচ করিয়া দিল। একদিকে ভ্রমরের দর্প আর অন্য দিবে গোবিন্দলালের অসাধারণ পৌরুষের দম্ভ তাহাদের পুনর্মিলনের পথও বন্ধ করিল

ভ্রমর-গোবিন্দলালের সুখের সংসার ব্যর্থ হওয়ার জন্য যদি প্রথমে কাহাকেও দায়ী করিতে হয় তবে তাহা নিয়তি। নিয়তির অনিবার্য ঘটনা চক্রেই ভ্রমরের সংসার ভাঙ্গিয়াছে। ভ্রমর তাহাকে রোধ করিতে পারে নাই অবশ্য রোধ করিবার সে যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা কেবলমাত্র ব্যর্থ হয় নাই হিতে বিপরীত হইয়াছে। ভ্রমর অভিমানে পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল হয়ত ভাবিয়াছিল, তাহাতে গোবিন্দলালের ভ্রান্তি দূর হইবে। নগেন্দ্রনা যেমন সূর্যমুখীকে হারাইয়া কুন্দর প্রেমেও হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, ভ্রমর হয় ভাবিয়াছিল গোবিন্দলালও তাহাকে হারাইয়া রোহিণীর প্রেমেও হতা হইয়া পড়িবে। এখানেই ভ্রমরের চরম ভ্রান্তি হইল। অবশ্য পরে গোবিন্দ লালের কাছে তাহার পিত্রালয়ে গমনের জন্য 'ঘাট' স্বীকার করিয়াছিল কি তখন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছিল। সেজন্য ভ্রমরের সাংসারিক জ্ঞানের ব্যর্থতা জন্য তাহার এই অবিবেচনাকেও দায়ী করা যায়। ভ্রমরকে পরিত্যাগের ছ বৎসর পর গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট ক্ষমা চাহিয়া ফিরিতে চাহিল। কি পরদারনিরত নারীহন্তা গোবিন্দলালকে ব্রতনিষ্ঠ ভ্রমর তাহার পূর্বের আসনে বসাইতে পারিল না। যে নিয়তি গোবিন্দলালকে ভ্রমরের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া নিয়া গেল, সেই নিয়তিই শেষ পর্যন্ত ভ্রমর-গোবিন্দলালের পুনর্মিলন ঘটাইতেও বাদ সাধিল। দ্বিতীয়ত, দায়ী করা যায় কৃষ্ণকান্তের উইল পরিবর্তন ঘটনাকে। গোবিন্দলালকে সংশোধন করিবার ইচ্ছায় কৃষ্ণকান্ত যে উইলে পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহাও হিতে বিপরীত হইল। ইহা গোবিন্দলালে ভ্রমর পরিত্যাগের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করিল।

অবশ্য পরোক্ষভাবে ভ্রমরের মাতা এবং গোবিন্দলালের জননীকেও ভ্রমরের সাংসারিক ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা যায়। ভ্রমর মিথ্যা পীড়ার সংবাদ দিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিল। তাহা নিশ্চয়ই পিত্রালয়ে যাওয়ার পর অন্তত তাহার মাতার নিকট ধরা পড়িয়াছিল। কারণ, ভ্রমর নিশ্চয়ই মাতার নিকট কোন কথা গোপন করে নাই। কিন্তু ভ্রমরের মাতা কিছু করিলেন না। অর্থাৎ পরোক্ষে কন্যা-জামাতার বিচ্ছেদের পথ প্রশস্ত করিলেন। গোবিন্দলালের জননীর বিরুদ্ধেও উক্ত অভিযোগ করা যায়। তিনি সংসারের কর্ত্রী। রোহিণী-গোবিন্দলালের কথা নিশ্চয়ই তাঁহার কানেও উঠিয়াছিল, কিন্তু তিনিও চুপ করিয়া ছিলেন। বরং পুত্রবধূ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হওয়ায় তিনি তাড়াতাড়ি কাশীবাসিনী হইয়াছিলেন। এইরূপে আত্মীয়-পরিজন কেহই ভ্রমরের সাংসারিক ব্যর্থতা রোধ করিতে কোন চেষ্টা করে নাই। তাহাদের নিষ্ক্রিয়তা বরং এই ব্যর্থতায় পরোক্ষ সাহায্য করিয়াছে।

২। প্রশ্ন: ভ্রমর-গোবিন্দলালের মিলন কেন সম্ভব হয় নাই? এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের দাম্পত্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে যে আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আলোচনা কর।

উত্তর: নরনারীর স্বাভাবিক প্রণয়াকাঙ্ক্ষাই দাম্পত্য-সম্পর্কের মূল ভিত্তি। নর-নারী যদি উভয়ের প্রতি পারস্পরিক প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট না হয় তাহা হইলে কোন ধর্ম, নীতি বা সমাজ তাহাদের বন্ধনকে সুদৃঢ় করিতে পারে না। অতএব দাম্পত্য প্রেমের শক্ত বুনিয়াদই হইল পারস্পরিক প্রেমের নিবিড়তা। ভ্রমর ও গোবিন্দলাল নিবিড় দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। মাত্র আট বৎসর বয়সে ভ্রমরের বিবাহ হইয়াছিল, তারপর নয় বৎসর তাহাদের একত্রে বিবাহিত জীবন পরমানন্দেই কাটিয়াছিল। নির্বাধ সেই প্রেমময় দিনগুলির একটি আলেখ্য আমরা কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে পাই। কিন্তু রোহিণী-প্রেমের প্রবল ধাক্কায় তাহারা দুইজন দুইদিকে ছিটকাইয়া পড়িল। ভ্রমরের মৃত্যুলগ্নে উভয়ের আবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিন্তু মিলন আর হয় নাই।

এই মিলনের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের নীতি ও সামাজিক বোধে। গোবিন্দলাল প্রবৃত্তির তাড়নায় রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার বিবাহিত ধর্মনিষ্ঠ পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। পরস্ত্রীর সঙ্গে বিলাসময় জীবন যাপন করিয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রে নারীহত্যা মহাপাপ। সেই

পাপেও গোবিন্দলাল পাপী। ব্রতনিষ্ঠ আদর্শ স্ত্রী ভ্রমরের পার্শ্বে গোবিন্দলালকে আর পূর্বের আসনে বসান সম্ভব নহে। প্রায়শ্চিত্তই তাহার উপযুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর প্রেমকে কখনো স্বীকৃতি দিতে পারেন না। সে সমাজের বিদ্রোহী, অমঙ্গলকারী। তাহার প্রেমকে প্রশ্রয় দিলে সমাজের সকল প্রকার অনুশাসন, ধ্বসিয়া পড়িবে। তাঁহার মতে বিবাহ বন্ধনের মধ্য দিয়া যে প্রেম প্রতিষ্ঠিত নহে, হিন্দুশাস্ত্রের যজ্ঞানলে যাহা স্বীকৃত নহে, তাহাকে কখনো স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। তাহা মুহূর্তের মাদকতার সৃষ্টি, তাহার ঔজ্জ্বল্য থাকিতে পারে, কিন্তু মাধুর্য নাই, তাহাতে মত্ততা থাকিতে পারে কিন্তু তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। তাহা অবৈধ, অসংযত চিত্ত-চাঞ্চল্যের ফল। অতএব বিবাহ ই এই প্রেম প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশের একমাত্র মাধ্যম। হিন্দুর বিবাহিত আদর্শ জীবনই লেখকের মতে শ্রেষ্ঠ প্রেমাদর্শ। ধর্মনৈতিক কোন ভিত্তি না থাকিলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকে না। গোবিন্দলাল-রোহিণীর প্রেমে এই গভীরতা এবং আদর্শ ছিল না। তাহা নীতি-বিগর্হিত, সমাজ বহির্ভূত। তাহা পাপ। অন্যদিকে ভ্রমর আদর্শ স্ত্রী। একদিকে তাহার স্বামীর প্রতি ভালবাসা অন্যদিকে তাহার কর্তব্যবোধ। তাহার স্বামীকেও সে সমাজের নিষ্টাবান ও আদর্শ স্বামীরূপে পাইতে চাহিয়াছিল। সে "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসের সূর্যমুখীর মত ক্ষমাশীলা নহে। স্বামীর পদস্খলনকে সে ক্ষমা করিতে পারে না। সেইজন্য সে যে মুহূর্তে বিশ্বাস করিল, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ, সেই মুহূর্তে গোবিন্দলালকে লিখিল, "যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি, যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমার বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার সুখ নাই।" ভ্রমর "সীতানুবর্তিনী নায়িকা" নহে। তাহার সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অভাব। ভ্রমরের চরিত্র দ্রৌপদীর ন্যায়। 'ধর্ম' হইতেও তাহার 'দর্প' প্রবল। এই দর্পের জন্যই সে গোবিন্দলালকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। এই দর্পের জন্যই গোবিন্দলাল যখন নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় ভিক্ষুকের ন্যায় ভ্রমরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইল তখনও ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিতে পারিল না। পরদারনিরত নারীহন্তা স্বামীকে গ্রহণ না করাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরের চরিত্রের মাধ্যমে "সংযমের, ধর্মপরায়ণতার, কর্তব্যনিষ্ঠার ও মানসিক তেজের আদর্শ" প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দাম্পত্য জীবনের বাহিরে যৌন সম্পর্ককে অবৈধ ও অমঙ্গল বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন।

গোবিন্দলাল এবং ভ্রমর চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বও তাহাদের মিলনের পক্ষে কম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নাই। তাহারা আদর্শ স্বামী-স্ত্রীরূপে নয় বৎসর একত্রে বাস করিয়াছিল। আদর্শ স্বামীরূপে সৎ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ ভাবে জীবন যাপন করিবার ক্ষমতা গোবিন্দলালের যথেষ্ট ছিল। ভ্রমরের প্রতি তাহার আকর্ষণ এবং ভালবাসাও প্রচুর ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, গোবিন্দলাল যখন রোহিণীকে লইয়া প্রসাদপুরের কুঠিতে বাস করিতেছিল, তখনও "ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে।" গোবিন্দলাল যখন ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা করিল তখন তাহার চক্ষের জল পড়িতেছিল। "বালিকার অতি সরল যে প্রীতি,—অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিন-রাত্রি ছুটিতেছে—ভ্রমরের কাছে সেই অমূল্য প্রীতি পাইয়া গোবিন্দলাল সুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহা মনে পড়িল।" তথাপি তাহার পক্ষে ভ্রমরকে পিত্রালয়ে গমনের পর সহজভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। তাহার কেবলই মনে হইয়াছে "যার জন্য এত করি, সে এত সহজে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে।" ইহা সে সহ্য করিতে পারিল না। সেইজন্য সে ভ্রমরকে কিছু শাস্তি দিতে চাহিয়াছিল। এই দ্বন্দ্বময় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার জীবনে ট্র্যাজেডি ঘনাইয়া আসিয়াছে। ভ্রমরের মধ্যেও আদর্শ স্ত্রী হইবার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা ছিল। গোবিন্দলালের প্রতি তাহার ভালবাসা ছিল নির্বিচার এবং অগাধ। গোবিন্দলালকে আকর্ষণ করিবার, তৃপ্ত করিবার, সুখী করিবার মাধুর্য শক্তিও তাহার কম ছিল না। গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ছিল তাহার বিশ্বাস। কিন্তু সে কখনও ভাবিতে পারে নাই তাহার স্বামী কখনও পরস্ত্রীতে আকৃষ্ট হইবে। কোন নারীর পরপুরুষ বা কোন পুরুষের পরস্ত্রীতে আকর্ষণ যে সম্ভব তাহা ভ্রমর ভাবিতে পারে না। সে গোবিন্দলালকে বলিয়াছিল, "তুমি আমাকে ভালবাস—আর কাহাকেও তোমার ভালবাসিতে নাই।" সেজন্য যদিন ভ্রমর রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের প্রণয়ের প্রমাণ পাইল সদিন তাহার সরল বিশ্বাসে চরম আঘাত লাগিল। তাহা যে মিথ্যাও হইতে পারে ইহা তাহার মনে উদয় হওয়া সম্ভব ছিল না। তাহার স্বামী ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছে, এই স্থির প্রত্যয়েই ভ্রমর গোবিন্দলালকে নির্মম পত্র লিখিল এবং অভিমানে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। প্রতিকূল ঘটনাচক্রে ভ্রমর এবং গোবিন্দলালের বিচ্ছেদ আর মিলনে পূর্ণ হইল না। ভ্রমর এবং

গোবিন্দলালের মানসিক তেজ তাহাদের ইচ্ছা এবং কার্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছিল। গোবিন্দলাল জানিত রোহিণীর প্রণয়ে সাড়া দেওয়া পাপ। তাহাতে তাহার সাংসারিক বিপর্যয় অনিবার্য। তথাপি জেদী এবং অহংকারী গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়াছিল। তেমনই ভ্রমরের মধ্যে সতীত্বে বিশ্বাস ছিল তীব্র। আদর্শ ধর্ম-জীবন ছিল তাহার কাম্য। তাহার কাছে জীবন হইতে নীতিই ছিল বড। উগ্র নীতি-বোধই তাহার দাম্পত্য জীবনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে দেয় নাই।

এই প্রসঙ্গে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের উক্তি উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, "যে ভ্রমর কলঙ্কের জনরব শুনিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল, সে যে পরদারনিরত হত্যাকারী স্বামীকে গ্রহণ করিবে না ইহাই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। গোবিন্দলাল যে খালাস পাইয়া ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না যাইয়া উবাও হইয়াছিলেন তাহাও পূর্ববর্তী ঘটনার সহিত সুসঙ্গতির পরিচয় দেয়।

গোবিন্দলাল ভ্রমরের একটি ক্ষুদ্র অপরাধ মার্জনা করেন নাই এবং বিনা দোষে ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই পরিত্যাগের পরের ইতিহাস আরও ভয়াবহ। সুতরাং গোবিন্দলাল যে ভ্রমরের নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিবেন এবং ইহারা যে দাম্পত্য-জীবনের ছিন্নসূত্র আর যোজনা করিতে চেষ্টা করিবেন না ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই।"

৩। প্রশ্ন: "রোহিণীকে অকস্মাৎ মারিয়া ফেলিয়া বঙ্কিম সামাজিক ধর্মনীতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কলাবিদের কর্তব্য বিসর্জন দিয়াছেন; রোহিণীকে বলি দিয়া সমাজধর্মের ক্ষেত্র নিষ্কণ্টক করিয়াছেন।"—এই উক্তি কতখানি সঙ্গত আলোচনা কর।

উত্তর: আলোচ্য অভিযোগটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের। অবশ্য অনেকেই শরৎচন্দ্রের ন্যায় রোহিণীর অপঘাত-মৃত্যু অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গত বলিয়া মনে করেন। কাহারও মতে, "রোহিণীর অকস্মাৎ মৃত্যু যেন একটা খুব জটিল সমস্যার অন্যায়রূপ সুলভ সমাধান।" "কেন না এই পরিণতির জন্য লেখক পাঠকের মনকে যথেষ্ট ভাবে প্রস্তুত করেন নাই। রোহিণীর চতুর্দিকে যে জটিল সমস্যা গড়িয়া উঠিতেছিল লেখক তাহার আকস্মিক মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়া, সেই সমস্যার সুলভ সমাধান

করিয়াছেন।" ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্থে এই অভিযোগগুলির বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের কার্যকে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও অভিযোগের নিরসন হয় নাই।

রোহিণীর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়েই আমরা দেখি, "রোহিণীর পরিপূর্ণ যৌবন – রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।" তাহার অনেক গুণও ছিল। জানে না এমন কাজ নাই। কিন্তু সে নিঃসহায়। যেহেতু তাহার বৈধব্যাবস্থাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, সেজন্য তাহার পুনরায় বিবাহ করিতে বাধা নাই। হরলালের প্রস্তাবে সে সলজ্জ মৌন সম্মতি জানাইল এবং তাহার জন্য উইল চুরি করিতেও রাজী হইল। হরলাল কিন্তু তাহার কথা রাখিল না, বরং উইল-চোর বলিয়া রোহিণীকে অপমান করিল। রোহিণী প্রত্যাখ্যানে এবং অপমানে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। রাগে সে তাহার মাথার কাপড় ফেলিয়া দিল এবং হরলালকে তাহার উপযুক্ত অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। রোহিণী রোজ বারুণী পুকুরে একাই জল আনিতে যাইত। "দল বাঁধিয়া যত হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি হাসিতে হাসিতে হালকা কলসীতে হালকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারি, চালচলনও ভারি।" সেদিন বারুণীর তীরে বসন্তের কোকিলের ডাকাডাকি তাহার জীবনকে আরও উদাস করিয়া তুলিল। চারিদিকে অনন্ত সৌন্দর্য, তাহার মধ্যে কোকিলের ডাক। রোহিণীর চারিদিকে সুখময় সংসার। কিন্তু সে একা, অসহায়, দুঃখী। কোকিলের ডাক এই শূন্যতাবোধকে আরও তীব্র করিল। সে কাঁদিতে লাগিল। "বোধ হয় ভাবিতেছিল যে, কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না। কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ-যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল?" রোহিণী লোক ভাল না হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কান্নার জন্য পাঠককে সহানুভূতি জানাইতে

বলিয়াছেন। "দেবতার মেঘ কণ্টক-ক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করে না।" পরদুঃখকাতর গোবিন্দলালও তাহাকে সহানুভূতি জানাইয়াছে। ইহা অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু রোহিণীর নিকট আশাতীত। পুরুষ মানুষের সহানুভূতি যে-কোন নারীরই কাম্য। রোহিণী তাহা কখনও পায় নাই। কখনও পাইবার আশাও ছিল না। অভাবিতরূপে গোবিন্দলালের কাছে সে তাহা পাইয়াছিল। এই কৃতজ্ঞতাবোধই পরে প্রণয়রূপ ধারণ করিল। হিন্দুসমাজে তাহা অসঙ্গত মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা নারীর প্রকৃতি বিরুদ্ধ নহে। বঙ্কিমচন্দ্রও তাহাকে অস্বীকার করেন নাই। রোহিণীও তাই কামনা তাড়িত হইয়াই অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াছে, সুরক্ষিত কৃষ্ণকান্তের গৃহে দুই-দুইবার উইল চুরি করিতে গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম খণ্ডে রোহিণীর চরিত্র অতি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। উইল চুরির অপরাধে ধৃত হওয়ার পর গোবিন্দলাল তাহাকে এই দুঃসাহসের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তখন রোহিণী কাঁদিতে লাগিল। বহু কষ্টে রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "না—অনুরোধ করেন নাই—কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই, যাহা ইহজন্মে আর কখনও পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।" রোহিণীর এই উক্তিকে "নিতান্ত লজ্জাহীনা'র উক্তি বলা যায় না। রোহিণী বারুণীর জলে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল। কারণ সে জানিত, "এ রোগের চিকিৎসা নাই।" সে তাহার অসহ্য প্রেমযন্ত্রণা-হইতে মুক্তির জন্য ভগবানকে ডাকিয়াছে। সে জানে গোবিন্দলালের প্রতি তাহার এ প্রেম বর্তমান সমাজে কখনও সার্থক হইতে পারে না। তাহার আত্মহত্যা করিবার কারণ সম্পর্কে সে গোবিন্দলালকে স্পষ্ট বলিয়াছে, "রাত্রিদিন দারুণ তৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।" এইরূপে প্রতি পদে বঙ্কিম রোহিণীর যে নিপুণ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে লেখকের সহানুভূতির অভাব মনে হয় না। দুঃখিনী রোহিণীর এই প্রেমাকাঙ্ক্ষা সহৃদয় সংস্কার বর্জিত পাঠকের সহানুভূতি নিশ্চয়ই লাভ করে। গোবিন্দলালও তাহাকে ভৎর্সিত করিতে পারে নাই। রোহিণীর অশেষ দুঃখের কথা শুনিয়া তাহার দয়া হইল। রোহিণীর রূপ দেখিয়া তাহার মন যে বিচলিত হয় নাই তাহা নহে। অপরূপ রূপসী নারীর সৌন্দর্য দেখিয়া পুরুষ মাত্রেরই হৃদয় বিচলিত হয়। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহাকে

প্রশ্রয় দিল না। "মনে মনে শপথ করিয়া স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না।" গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভুলিতে জমিদারী পরিদর্শনে গেল। আর তখনই যত অঘটন ঘটিল। গোবিন্দলাল এবং রোহিণীর নাম একত্রিত করিয়া গ্রামে কুৎসা রটিল। ভ্রমর এবং রোহিণী দুই জনের কানেই কথা উঠিল। ভ্রমর বলিল, "রোহিণীর আবার আক্কেল কি?" আর রোহিণী ভাবিল, এই কুৎসা "ভ্রমরই রটাইয়াছে, নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার?" রোহিণী ভাবিল, "ভ্রমর আমাকে বড় জ্বালাইল। সেদিন চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ। এদেশে আমি থাকিব না। কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব।" হরিদ্রাগ্রামে কালো ভ্রমরের অনন্ত ঐশ্বর্য, দেব-দুর্লভ স্বামী, অপরিমেয় সুখ দেখিয়া পাড়া-প্রতিবাসীরা হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত। ভ্রমরের সুখ রোহিণীরও ঈর্ষার বস্তু ছিল। ঈর্ষার বশে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে। রোহিণীও মিথ্যা শাড়ী গহনা আনিয়া ভ্রমরকে জ্বালাইয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে রোহিণীকে "রাক্ষসী বা পিশাচী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, "রোহিণী না পারে এমন কাজ নাই," ইহা তাহার পূর্ব পরিচয়ে জানা গিয়াছে। ইতিমধ্যে ঘটনার চক্রজালে ভ্রমর-গোবিন্দলাল একে অন্যের হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ভুলিবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় রোহিণীকে আশ্রয় করিয়াছে। একদিন বর্ষার মধ্যে রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের প্রমোদ উদ্যানে আলাপ হইয়াছে। তাহাদের কথোপকথনের কোন বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র দেন নাই। কেবল লিখিয়াছেন, "সে রাত্রে রোহিণী গৃহে যাইবার পূর্বে বুঝিয়া গেল যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।" তারপর আর রোহিণী সম্বন্ধে কোন বর্ণনা নাই। তাহার মনস্তত্ত্বের কোন বিশ্লেষণ নাই। আমরা আবার রোহিণীকে সক্রিয় হইতে দেখি মৃত্যুর পূর্ব লগ্নে। রোহিণীর সেই ক্রিয়া অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য। নিশাকরকে দেখিয়া রোহিণীর জিগীষাবৃত্তি চঞ্চল হইয়া উঠিল। গোবিন্দলালের প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী না হইবার ইচ্ছা লইয়া সে গভীর রাত্রে-অন্ধকারে নদীর ঘাটে সম্পূর্ণ অপরিচিত নিশাকরের সঙ্গে নিছক প্রেমালাপ করিবার জন্য গিয়াছিল। আর তাহাতেই গোবিন্দলাল রোহিণীকে বিশ্বাসঘাতিনী মনে করিয়া গুলি করিয়া বসিল। রোহিণীর জবানীতে আমরা জানি, প্রসাদপুরের কুঠিতে

রোহিণী-গোবিন্দলালের জীবন সুখেই কাটিতেছিল। আর বঙ্কিমচন্দ্রের জবানীতে জানি তখন গোবিন্দলালের "অন্তরে ভ্রমর আর বাহিরে রোহিণী"। কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীকে মারিবার পূর্বেও কোন স্পষ্ট অভিযোগ রোহিণীর বিরুদ্ধে করে নাই। আর করিলেও "অবিশ্বাসিতার প্রথম চেষ্টাতেই যে গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করিবে, ইহা একটু অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। গোবিন্দলাল একটা বর্ধমান বিতৃষ্ণার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই অন্তরের মধ্যে যুদ্ধ করিতেছিল, এবং এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্বই তাহাকে তাহার অজ্ঞাতসারে এরূপ একটা সাংঘাতিক পরিণতির জন্য প্রস্তুত করিতেছিল। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'-তে অচলার সহিত একটা দীর্ঘ অন্তর্বিরোধ, অতৃপ্ত প্রেমের একটা রুদ্ধ ক্ষোভই সুরেশকে প্লেগের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িবার শক্তি ও বেগ দিয়াছিল, এই পূর্বগামী বিষাদের বিস্তৃত বর্ণনা ব্যতীত তাহার আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক করিয়া তোলা সম্ভব হইত না। বঙ্কিম এই শেষ মুহূর্তের ঝম্পপ্রদানটি বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে বিপুল শক্তি ঠেলা দিতেছিল, সুরুচি ও সংযমের খাতিরে তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই।" এই আকস্মিকতা আর্টের দিক হইতে যে ত্রুটি তাহা অনস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য রোহিণীর মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে উপন্যাসের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—

"গোবিন্দলাল দুই জন স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়াছিল—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল—ভ্রমর মরিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়া জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দার-ঘর্ষণ-পীড়িত বাসুকিনিঃশ্বাসনির্গত হলাহল, ধন্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, হৃদয়-সাগর, মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্বপরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমর-প্রণয়সুধা—স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর,

সর্বরোগের ঔষধ স্বরূপ, দিবারাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান তখনও ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবল প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা, তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।" এই বিবৃতিও আর্টের দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ। চরিত্র বিশ্লেষণ এবং কাহিনী সংঘটনে যাহাকে স্পষ্ট করিতে পারেন নাই, গ্রন্থশেষে তাহাকে বিবৃতির মধ্য দিয়া স্পষ্টীকরণের চেষ্টা নিশ্চয়ই সুসঙ্গত আর্ট নহে। দ্বিতীয়ত, অত্যাজ্যা রোহিণীকে ত্যাগ করিবার জন্য পিস্তলের গুলি মারিতে হইল ইহাও বিশ্বাস্য নহে। কার্য-কারণ পরম্পরায় তাহা সঙ্গত হয় নাই। ভ্রমরকে যখন গোবিন্দলালের ত্যাজ্য মনে হইয়াছিল তখন স্বল্পভাষী হৃদয়বান গোবিন্দলালকে পিস্তল বাহির করিতে হয় নাই। তৃতীয়ত, রোহিণীর অপঘাত-মৃত্যু যে তাহার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নাই। তাড়াহুড়া করিয়া নিশাকরের মত এক ভিলেন সৃষ্টি করিয়া তাহাকে আরও অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। ইয়াগো যে ভাবে ওথেলোর মনে ডেসডিমনার সম্পর্কে সন্দেহের বীজ রোপিত করিয়াছিল, তাহাকে অস্বাভাবিক মনে হয় না। আর নিশাকরের চক্রান্তকে বিশ্বাস্য বলা শক্ত।

আসলে নৈয়ায়িক বঙ্কিমচন্দ্র তখন শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের হাত টানিয়া ধরিয়াছেন। বালবিধবা রোহিণীর সহজাত কামনার রূপকে নিন্দিত করিতে যাইয়া তিনি তাহাকে এমন অস্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাঠক তাহাকে সঙ্গত মনে করিতে পারে না। অথচ রোহিণীকে সমাজে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য রোহিণীর অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের দৃষ্টিকে তাঁহার আদর্শ ধর্মনিষ্ঠ ভ্রমরের দিকে নিবদ্ধ করিয়াছেন। সেখানে সামাজিক ধর্মনীতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে কলাবিদের কর্তব্য ক্ষুণ্ণ করিতে হইয়াছে।

৪। প্রশ্ন: "চরিত্রসৃষ্টি ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক দিয়া 'কৃষ্ণকান্তের উইল' একটি পরিপূর্ণাঙ্গ উপন্যাস।"—আলোচনা কর।

রোহিণী-গোবিন্দলালের জীবন সুখেই কাটিতেছিল। আর বঙ্কিমচন্দ্রের জবানীতে জানি তখন গোবিন্দলালের "অন্তরে ভ্রমর আর বাহিরে রোহিণী"। কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীকে মারিবার পূর্বেও কোন স্পষ্ট অভিযোগ রোহিণীর বিরুদ্ধে করে নাই। আর করিলেও "অবিশ্বাসিতার প্রথম চেষ্টাতেই যে গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করিবে, ইহা একটু অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। গোবিন্দলাল একটা বর্ধমান বিতৃষ্ণার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই অন্তরের মধ্যে যুদ্ধ করিতেছিল, এবং এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্বই তাহাকে তাহার অজ্ঞাতসারে এরূপ একটা সাংঘাতিক পরিণতির জন্য প্রস্তুত করিতেছিল। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'-তে অচলার সহিত একটা দীর্ঘ অন্তর্বিরোধ, অতৃপ্ত প্রেমের একটা রুদ্ধ ক্ষোভই সুরেশকে প্লেগের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িবার শক্তি ও বেগ দিয়াছিল, এই পূর্বগামী বিবাদের বিস্তৃত বর্ণনা ব্যতীত তাহার আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক করিয়া তোলা সম্ভব হইত না। বঙ্কিম এই শেষ মুহূর্তের ঝম্পপ্রদানটি বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে বিপুল শক্তি ঠেলা দিতেছিল, সুরুচি ও সংযমের খাতিরে তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই।" এই আকস্মিকতা আর্টের দিক হইতে যে ত্রুটি তাহা অনস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য রোহিণীর মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে উপন্যাসের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—

"গোবিন্দলাল দুই জন স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়াছিল—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল—ভ্রমর মরিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়া জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দার-ঘর্ষণ-পীড়িত বাসুকিনিঃশ্বাসনির্গত হলাহল, ধন্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, হৃদয়-সাগর, মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদগীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্বপরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমর-প্রণয়সুধা—স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর,

সর্বরোগের ঔষধ স্বরূপ, দিবারাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান তখনও ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবল প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা, তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।" এই বিবৃতিও আর্টের দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ। চরিত্র বিশ্লেষণ এবং কাহিনী সংঘটনে যাহাকে স্পষ্ট করিতে পারেন নাই, গ্রন্থশেষে তাহাকে বিবৃতির মধ্য দিয়া স্পষ্টীকরণের চেষ্টা নিশ্চয়ই সুসঙ্গত আর্ট নহে। দ্বিতীয়ত, অত্যাজ্যা রোহিণীকে ত্যাগ করিবার জন্য পিস্তলের গুলি মারিতে হইল ইহাও বিশ্বাস্য নহে। কার্য-কারণ পরম্পরায় তাহা সঙ্গত হয় নাই। ভ্রমরকে যখন গোবিন্দলালের ত্যাজ্য মনে হইয়াছিল তখন স্বল্পভাষী হৃদয়বান গোবিন্দলালকে পিস্তল বাহির করিতে হয় নাই। তৃতীয়ত, রোহিণীর অপঘাত-মৃত্যু যে তাহার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নাই। তাড়াহুড়া করিয়া নিশাকরের মত এক ভিলেন সৃষ্টি করিয়া তাহাকে আরও অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। ইয়াগো যে ভাবে ওথেলোর মনে ডেসডিমনার সম্পর্কে সন্দেহের বীজ রোপিত করিয়াছিল, তাহাকে অস্বাভাবিক মনে হয় না। আর নিশাকরের চক্রান্তকে বিশ্বাস্য বলা শক্ত।

আসলে নৈয়ায়িক বঙ্কিমচন্দ্র তখন শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের হাত টানিয়া ধরিয়াছেন। বালবিধবা রোহিণীর সহজাত কামনার রূপকে নিন্দিত করিতে যাইয়া তিনি তাহাকে এমন অস্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাঠক তাহাকে সঙ্গত মনে করিতে পারে না। অথচ রোহিণীকে সমাজে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য রোহিণীর অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের দৃষ্টিকে তাঁহার আদর্শ ধর্মনিষ্ঠ ভ্রমরের দিকে নিবদ্ধ করিয়াছেন। সেখানে সামাজিক ধর্মনীতির মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে কলাবিদের কর্তব্য ক্ষুণ্ণ করিতে হইয়াছে।

৪। প্রশ্ন: "চরিত্রসৃষ্টি ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক দিয়া 'কৃষ্ণকান্তের উইল' একটি পরিপূর্ণাঙ্গ উপন্যাস।"—আলোচনা কর।

উত্তর : 'কৃষ্ণকান্তের উইল' একটি পারিবারিক উপন্যাস। জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায় তাঁহার অবর্তমানে সম্পত্তির অংশ বণ্টন করিয়া উইল করিয়া যাইবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি উইল করিলেন। উপন্যাসের এখানেই আরম্ভ। তারপর নানা প্রয়োজনে তিনি বারবার তাঁহার উইল সংশোধন করিলেন। ঘটনার জট আরও পাকিল। তাহার চক্রজালে কৃষ্ণকান্ত রায়ের আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলাল এবং তাহার পত্নী ভ্রমরের জীবন বিপর্যস্ত হইয়া গেল। এই উপন্যাসের কাহিনীর আবর্ত মনস্তাত্ত্বিক। চরিত্রগুলি জীবন্ত। সমাজচিত্র বাস্তব। নিয়তির অদৃশ্য তাড়নায় একটি পরিবারের ট্র্যাজেডি ঘনীভূত হইয়াছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হইয়াছে এবার মেঘ কাটিয়া যাইবে—নায়ক-নায়িকার ভুল বুঝাবুঝির অবসানে একটি পারিবারিক শান্তি সংস্থাপিত হইবে; কিন্তু কাহিনী যতই অগ্রসর হইযাছে ততই প্রতিকূল শক্তিগুলি আরো তীব্র হইয়া নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদকে দৃঢ়তর করিয়াছে।

গোবিন্দলাল, ভ্রমর এবং রোহিণী এই উপন্যাসের প্রধান কয়টি চরিত্র। গোবিন্দলাল পরদুঃখকাতর, হৃদয়বান এবং জেদী পুরুষ। তাহার একদিকে নয় বৎসরের বিবাহিত জীবনের অনাবিল প্রেম, অন্যদিকে অপরূপ রূপসী রোহিণীর প্রণয়। রোহিণীর অশেষ দুঃখের কথা শুনিয়া তাহার দয়া হইল। তাহার অসাধারণ রূপ দেখিয়া গোবিন্দলালের মন বিচলিত হইল। কিন্তু সে তাহাকে প্রশ্রয় দিল না। তাহার অন্তরে সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব আমরা যেন শুনিতে পাই। তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রত্যেক ঘাত-প্রতিঘাত এবং মনস্তত্ত্বের সুন্দর বিশ্লেষণ বাস্তব। ক্রন্দনরতা রোহিণীর প্রতি তাহার সহানুভূতির মধ্যে গোবিন্দলালের সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসে এবং অভিমানে ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গেল, গোবিন্দলাল তাহাকে আনিবার বন্দোবস্ত করিতে মাতাকে নিষেধ করিল। জমিদার বংশের আদরের পুত্র জেদী গোবিন্দলালের ঐ কার্যও সঙ্গত। ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের স্থির সংকল্প, অনমনীয় মনোভাব তাহার চরিত্রকে আরও ট্র্যাজিক করিয়া তুলিয়াছে। তারপর প্রসাদপুরের কুঠিতে অপরাহ্নে নভেল পাঠরত গোবিন্দ-লালকে যখন আমরা ভ্রমরের চিন্তায় অন্যমনস্ক দেখি, তখনও তাহাকে বাস্তব জীবন্ত পুরুষ মনে হয়। যে ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য সে রোহিণীকে আশ্রয় করিয়াছে সেই রোহিণীর বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয়ে গোবিন্দলালের মোহভঙ্গ

হইবে ইহাতেও অস্বাভাবিকতা নাই। কিন্তু রোহিণীর অবিশ্বাসের প্রথম প্রমাণেই তাহাকে হত্যা করা এবং শেষ পর্যন্ত অনমনীয় গোবিন্দলালের ভিক্ষুকের ন্যায় ভ্রমরের নিকট নতি স্বীকার করার মধ্যে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। তথাপি প্রথম খণ্ডে গোবিন্দলালের বিস্তারিত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, ঘটনাচক্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলালের চারিত্রিক পরিবর্তন নাটকীয়, বাস্তব এবং সুন্দর।

ভ্রমর আমাদের বাঙালী ঘরের একটি বালিকা বধূ। যৌথ ধনাঢ্য পরিবারে তাহার করণীয় বিশেষ কিছু নাই। স্বামীপ্রেমই তাহার একমাত্র অবলম্বন। গোবিন্দলালের প্রেমে নয় বৎসর সে সুখেই বাস করিয়াছিল। গোবিন্দলাল ছাড়া সে কিছু চিন্তা করিতে পারিত না। গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ছিল তাহার বিশ্বাস। তাহার এই স্বামীভক্তি এবং সকল অবস্থায় স্বামীর কল্যাণ-কামনা আমাদের সমাজের পতিপরায়ণতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই বালিকা বধূর সরল আত্মহারা প্রেম, অকপট বিশ্বাস, তাহার ছেলেমানুষী পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করে। কিন্তু পারিবারিক প্রতিবেশ তাহার এই ব্যক্তি-জীবনকে বিরূপে তিলে তিলে ধ্বংস করিয়া ফেলিল, এই উপন্যাসে আছে তাহারই এক অনবদ্য কাহিনী। রোহিণী-গোবিন্দলালের মত ভ্রমরের চরিত্রে কোন জটিলতা নাই। তাহার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অবকাশও তেমনি নাই। অক্ষুণ্ণ সতীত্ববোধ এবং সতীত্বের সহিত ধর্মানুভূতিই তাহার চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। যতদিন এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গোবিন্দলালের কোন বৈপরীত্য দেখা দেয় নাই, ততদিন তাহাদের জীবন ছিল মধুর। যে মুহূর্তে সংঘাত দেখা দিল সেই মুহূর্তেই তাহাদের বিচ্ছেদ ঘনীভূত হইল। এই দুই প্রান্তের মধ্যে কোন আপস ভ্রমর চিন্তা করিতে পারে নাই এবং সেখানেই তাহার জীবনের ট্র্যাজেডি। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দলালের কাশীগমনের দৃশ্যটি মর্মান্তিক। সেখানে ভ্রমরের আত্মনিবেদন ও ক্ষমাভিক্ষা পাঠকের চিত্তকে আর্দ্র করিয়া তোলে। তাহার চরম পরাজয়ের মুহূর্তে তাহার অপরাজেয় প্রেম যখন দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিল, "একদিন তুমি আসিবে"—তাহা আমাদিগকে চমৎকৃত করে। তারপর বিরহক্লিষ্টা ভ্রমরের ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসরণ সত্যই করুণ। ভ্রমরের বিরহ-ক্লেশ সহ্য করিবার

ক্ষমতা বাঙালী হিন্দু নারীর ঐতিহ্যপূর্ণ। ভ্রমরের অন্তিম মুহূর্তে গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাটকীয় এবং হৃদয়বিদারক।

এই উপন্যাসের অন্যতম বিদ্রোহী চরিত্র রোহিণীর। অন্যতম, কারণ, হরলালের চরিত্রও বিদ্রোহী। হরলাল বিদ্রোহ করিয়াছিল পিতার কর্তব্যবোধের বিরুদ্ধে, আর রোহিণী বিদ্রোহ করিয়াছে প্রচলিত হিন্দু সমাজের সংস্কারের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহে দুই জনই পরাজিত। একজন ত্যাজ্যপুত্র, আর অন্যজন অপঘাতে মৃত। নিয়তির নির্মম বিধান এবং হিন্দু সমাজের সংস্কার অনুযায়ী রোহিণী তাহার বালবৈধব্যকে সহজে স্বীকৃতি দিতে পারে নাই। বেশভূষার মধ্যেই তাহার অস্বীকৃতির স্বাক্ষর রহিয়াছে। তারপর শান্তভাবেই নিঃসহায় রোহিণী খুল্লতাতের সংসারের ভার বহন করিয়া দিনপাত করিতেছিল। তাহাতে প্রথম বাদ সাধিল দুষ্টমতি হরলাল। নিজের স্বার্থে সে রোহিণীর সুপ্ত অতৃপ্ত কামনার আগুনকে জ্বালাইয়া গেল। গোবিন্দলাল-ভ্রমরের দাম্পত্য জীবন সেই আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। একটা পরিবার ধ্বংস হইয়া গেল। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে রোহিণীর মনস্তত্ত্বের সুন্দর বিশ্লেষণ আছে। একদিকে প্রবৃত্তি, অন্যদিকে সামাজিক বাধা রোহিণীর হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে। অবশেষে গোবিন্দলালের ভ্রমরকে ভুলিবার উগ্র-ইচ্ছায় রোহিণীর অতৃপ্ত কামনা প্রসাদপুরের কুঠিতে সাময়িক পরিতৃপ্তি লাভ করিল। গোবিন্দলালের হস্তে মৃত্যুর পূর্বে তাহার বাঁচিবার তীব্র ইচ্ছা, সকাতর প্রাণভিক্ষা ও করুণ ক্রন্দন মুহূর্তের জন্য পাঠকের চিত্তে করুণ রস সঞ্চার করে। রোহিণীর সেই ভয়ার্ত-কম্পিত আর্তনাদ পাঠকের হৃদয়ে যেন তাহার মৃত্যুর পরও অনুরণিত হইতে থাকে। রোহিণীর সমস্ত দোষ, ভ্রমরের হাড় জ্বালাইবার ইচ্ছা, গোবিন্দলালের সহিত কলুষিত ভোগবিলাসের জীবনযাপন, তাহার মাধুকরী বৃত্তি সমস্তকেই অতিক্রম করিয়া তাহার অন্তিম আর্তনাদ ফুটিয়া উঠে। প্রথম কুহরবে রোহিণীর নবজাগ্রত লালসা যেদিন বেদনায় রোহিণীকে জর্জরিত করিয়াছিল, সেদিন রোহিণী সকলের সহানুভূতি পাইয়াছিল। আবার তাহার মৃতদেহ যেদিন ডাক্তারের পরীক্ষার জন্য গোরুর গাড়ীতে চালান হইল, সেদিনও পাঠকচিত্ত তাহার সমস্ত দোষ ভুলিয়া করুণায় ভরিয়া

রহিয়াছে। নিষ্ঠা নাই অথচ নারী-হৃদয়ের প্রবল আবেগ আছে—পুরুষের সহানুভূতির স্পর্শে নারী হৃদয়ের নৃত্যচপলতার এই মূর্তি বাংলা সাহিত্যে তুলনাহীন।

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলি গৌণ। প্রধান চরিত্রগুলি বিকাশের জন্যই এইগুলির সহিত পাঠকের পরিচয়। কৃষ্ণকান্তের কর্তব্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মানন্দের অর্থ-লোভ ও বিবেকের দ্বন্দ্ব, মাধবীনাথের আত্মবিশ্বাস ও চাতুর্য, পোস্ট মাস্টারের নীচাশয়তা, সোনা রূপোর ভৃত্য-জীবন, ইনসপেক্টর ফিচেল খাঁর সাক্ষী-সংগ্রহ ব্যবস্থা—সমস্তই বাস্তব সমাজের জীবন্ত মানুষের চিত্র।"

৫। প্রশ্ন : 'বিষয় বিশ্লেষণে ও ঘটনা বিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসখানিই শ্রেষ্ঠ।" আলোচনা কর।

উত্তর : "বঙ্কিম উপন্যাসের ধারায় কৃষ্ণকান্তের উইল" আলোচনাটি দ্রষ্টব্য।

৬। প্রশ্ন : কোন কোন সমালোচক 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে কতকগু'ল অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছেন। সেইগুলি কতটা সঙ্গত বিচার কর।

উত্তর : "কৃষ্ণকান্তের উইল-এ কতকগুলি অসঙ্গতি"—আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৭। প্রশ্ন : 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামকরণটি কতটা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে আলোচনা কর।

উত্তর : অন্ত্যপর্বের (ক) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামকরণের যুক্তিযুক্ততা আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৮। প্রশ্ন : 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর কাহিনী-নির্মাণকৌশল সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর : অন্ত্যপর্বের (খ) 'কৃষ্ণকান্তের উইল : গঠন কৌশল' আলোচনাটি দ্রষ্টব্য।

৯। প্রশ্ন : 'রোহিণীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে নীতি রক্ষা পাইয়াছে কিন্তু আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।' বঙ্কিমযুগের সমাজের স্বাভাবিক ঔচিত্য-বোধের পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ মন্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার কর।

[ক. বি. (ত্রৈবার্ষিক সাম্মানিক) ১৯৬৬]

অথবা, রোহিণীর হত্যার ব্যাপার লইয়া পরবর্তীকালে কোনো কোনো সমালোচক বলিয়াছেন এক্ষেত্রে শিল্প অপেক্ষা নীতিবেত্তা বঙ্কিমচন্দ্রই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছেন। তুমি কি এই মত সমর্থন কর?

[ক বি ১৯৬৯]

উত্তর : তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

১০। **প্রশ্ন : বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণে (১৮৯২) উপন্যাসের সমাপ্তি ও গোবিন্দলালের চরিত্রকে যেভাবে পরিবর্তিত করেন, আর্টের সার্থকতার দিক হইতে তাহার প্রয়োজন ছিল কিনা বিচার কর।**

[ক. বি. (ত্রৈবার্ষিক সাম্মানিক ১৯৬৩]

উত্তর : মধ্যপর্বের (ক) 'কৃষ্ণকান্তের উইল : রচনাকাল এবং অন্ত্যপর্বের (খ) 'কৃষ্ণকান্তের উইল : গঠনকৌশল'—আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১১। **প্রশ্ন : চরিত্র বিশ্লেষণ কর**—(ক) রোহিণী, (খ) গোবিন্দলাল, (গ) ভ্রমর, (ঘ) কৃষ্ণকান্ত, (ঙ) হরলাল (চ) মাধবীনাথ, (ছ) নিশাকর।

উত্তর : 'চরিত্র-বিশ্লেষণ' অংশ দ্রষ্টব্য।

১২। **'কৃষ্ণকান্তের উইল'** উপন্যাসের **নায়িকা ভ্রমরের চরিত্রটি সম্যক্ পর্যালোচনা কর।**

উত্তর : 'চরিত্র বিশ্লেষণ অংশ' দেখ।

১৩। **প্রশ্ন : বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসকে উদ্দেশ্য-মূলক উপন্যাস বলা সঙ্গত কিনা? আলোচনা কর।**

উত্তর : 'কৃষ্ণকান্তের উইল : উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস'—আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৪। **প্রশ্ন : "কৃষ্ণকান্তের উইল কার্য-কারণ পরম্পরায় ঘটিত একটি বিশ্লেষণাত্মক উপন্যাস।"—এই উক্তিটির যাথার্থ্য বিচার কর।**

উত্তর : অন্ত্যপর্বের (ঙ) কৃষ্ণকান্তের উইল-এর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আলোচনা দেখ।

১৫। **প্রশ্ন : 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস একটি পারিবারিক জীবনের ট্র্যাজেডি।—আলোচনা কর।**

অথবা, "কৃষ্ণকান্তের উইল একখানি পারিবারিক গার্হস্থ্য উপন্যাস মাত্র নয়, নরনারীর হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতের করুণ ট্র্যাজেডি।"—উপযুক্ত তথ্যবিন্যাস ও বিশ্লেষণ সহ মন্তব্যটি আলোচনা কর। [ক. বি. (ত্রৈবার্ষিক সাম্মানিক) ১৯৬৪]

উত্তর : 'ট্র্যাজেডি পরিকল্পনা' শীর্ষক আলোচনাটি দেখ।

১৬। প্রশ্ন : 'বিষবৃক্ষ' ও কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ জীবন ট্র্যাজেডির স্বরূপ প্রায় একই প্রকারের হইলেও রূপায়ণে নৈপুণ্য ও অনিবার্যতার তারতম্য ও পরিণতিতে সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।—এই সমস্ত দিক হইতে উভয় উপন্যাসের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা কর। [ক. বি. (ত্রৈবার্ষিক) ১৯৬৬]

উত্তর : 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এই দুই উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে দুইটি ট্র্যাজেডির চিত্র আছে তাহারা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর জীবনে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহা বাহিরের কোন ঘটনার দ্বারা জটিল হয় নাই। গোবিন্দলালের অধঃপতন প্রতিপদে নির্ভর করিয়াছে বাহিরের ঘটনার উপর। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' শুধু যে ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেডির চিত্র আঁকিয়াছে তাহা নহে। বাঙালী হিন্দু পরিবারের বিস্তৃত বিবরণও এখানে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং পারিবারিক প্রতিবেশ কেমন করিয়া ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবিত করিতে পারে এখানে তাহার প্রকৃষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে ট্র্যাজেডির যে তীব্র অনিবার্যতার চিত্র পাওয়া যায় তাহার তুলনা এইখানে নাই। মানবহৃদয়ের নিগূঢ় রহস্যের উদ্ঘাটন আর্টের উদ্দেশ্য। বাহিরের ঘটনার বর্ণনা সেই রহস্যের অভিব্যক্তিকে সাহায্য করে, ইহাই তাহার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা। কিন্তু উপলক্ষ্যকে প্রাধান্য দিলে আসল বস্তু অনেকটা চাপা পড়িয়া যায়। নরনারীর হৃদয়ের আদান-প্রদান যদি প্রত্যেক ধাপেই বাহিরের আকস্মিক ব্যাপারের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে যে সকল আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি হৃদয়ের গভীরতম তলদেশে লুক্কায়িত থাকে তাহা পরিপূর্ণ বেগে প্রকাশিত হইতে পারে না : 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বাহিরের ঘটনা বাদ দেওয়া

হয় নাই, কিন্তু ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর হৃদয়ে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল বাহিরের কোন ব্যবস্থাই তাহাকে প্রশমিত করিতে পারিত না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণীর ট্র্যাজেডির মধ্যে এই অনিবার্যতা নাই। প্রত্যেক মুহূর্তেই মনে হয় যে একটু এদিক ওদিক হইলেই গোবিন্দলালের অধঃপতন নিবারিত হইতে পারিত; এ কারণে ট্র্যাজেডি অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া গিয়াছে।

"বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্পর্কে আলোচনায় আর একটি পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হইবে। এই দুই উপন্যাসের পরিণতি বিভিন্ন প্রকারের। নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর মধ্যে পুনর্মিলন হইয়াছিল, কিন্তু ভ্রমর ও গোবিন্দলাল আর একত্র হইল না। পরিণতিতে এই যে পার্থক্য ইহা সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস। সূর্যমুখী ক্ষমাশীলা। সুতরাং নগেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া গেলেও তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। যদি ঘটনাচক্রে সে ইচ্ছা বাধা পাইত, সূর্যমুখীর মৃত্যু হইত, তাহা হইলে বাহিরের দুর্দৈব ইঁহাদের জীবনে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে এইরূপ মনে হইত এবং আমাদের রসোপলব্ধি পীড়িত হইত। যে ভ্রমর কলঙ্কের জনরব শুনিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল, সে যে পরদারনিরত, হত্যাকারী স্বামীকে গ্রহণ করিবে না, ইহাই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। গোবিন্দলাল যে খাপাস পাইয়া ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না যাইয়া উধাও হইয়াছিলেন তাহাও পূর্ববর্তী ঘটনার সঙ্গে সুসঙ্গতির পরিচয় দেয়। গোবিন্দলাল যেভাবে পতিগতপ্রাণা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথ সেইরূপ করেন নাই। বরং সূর্যমুখীই উপযাচিকা হইয়া তাঁহার বিবাহ দেওয়াইয়াছিলেন এবং কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে বিবাহের পরই তিনি সূর্যমুখীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। সুতরাং নগেন্দ্রনাথের অপরাধ যত গুরুতরই হউক সূর্যমুখীর সঙ্গে মিলন অসম্ভব হয় নাই। গোবিন্দলাল ভ্রমরের একটি ক্ষুদ্র অপরাধ মার্জনা করেন নাই, ব্রহ্মানন্দ যে জনরবের কথা তাঁহাকে বলিয়াছিল তাহার অনুসন্ধান করেন নাই এবং বিনাদোষে ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই পরিত্যাগের পরের ইতিহাস আরও ভয়াবহ। সুতরাং গোবিন্দলাল যে ভ্রমরের নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিবেন এবং ইহারা যে দাম্পত্য জীবনের ছিন্ন সূত্র আর যোজনা করিতে চেষ্টা করিবে না

ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। বঙ্কিমচন্দ্র দুই উপন্যাসে একই কাহিনী রচনা করিয়াছেন। কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্যের জন্য সেই এক কাহিনী দুই উপন্যাসে বিচিত্র বর্ণে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।"

(ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

১৭। প্রশ্ন: "বিষবৃক্ষের তুলনায় কৃষ্ণকান্তের উইল উন্নততর সৃষ্টি।" উভয় গ্রন্থের আখ্যান গ্রন্থন, চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনা সংস্থাপন বিশ্লেষণ করিয়া মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার কর।

[ক. বি. (ত্রৈবার্ষিক সাম্মানিক) ১৯৬৩]

উত্তর: "কৃষ্ণকান্তের উইল' 'বিষবৃক্ষ'র পাঁচবৎসর পরে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। চিত্রের পূর্ণতায় ও বিশ্লেষণের গভীরতায় ইহা 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আরও পরিপক্ব, অনিন্দনীয় কলাকৌশলের নিদর্শন। উভয় উপন্যাসের বিপৎপাতের মূল কারণ অনিবার্য রূপতৃষ্ণা, রমণীরূপ মুগ্ধ পুরুষের প্রকৃতিদমনে অক্ষমতা। উভয়ত্রই লেখক এই অন্তর্বিরোধের চিত্র খুব সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত, গভীর অথচ সংযত ভাব প্রাবল্যের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন।

"কিন্তু বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় উপন্যাসের বলিবার ভঙ্গীতে পার্থক্য খুব বেশী। নগেন্দ্রনাথের কাহিনী যেন পূর্ব হইতেই পরিণতি লাভ করিয়া সম্পূর্ণ হইয়াছিল, আমাদের সম্মুখে তাহার আবরণ অপসারিত হইল মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র নিয়মিত প্রসারিত দৃষ্টির দ্বারা সকল ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। রোহিণী ও ভ্রমরের কাহিনী বর্ণনায় তিনি অন্য রীতির অবতারণা করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রথম অংশে আখ্যায়িকাকে নাটকোচিত স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ রোহিণীর চরিত্রকে কোন একটি ছাঁচে ফেলিবার বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। রোহিণী দুঃসাহসিক, কামার্তা, পাপপুণ্যজ্ঞানহীনা। আবার তাহার মধ্যে আত্মসুখ-বিসর্জনেচ্ছু গভীর প্রণয়েরও উন্মেষ দেখা যায়। প্রথম অংশে এই ভাবে রোহিণীর হৃদয়ে বিচিত্র ভাব্যতার আভাস দেওয়া হইয়াছে। রোহিণীর অন্তরস্থ কোন্ প্রবৃত্তি অধিক বিকাশ লাভ করিবে তাহার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সুনিশ্চিত নির্দেশ

নাই। মনে হয় অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের উপর এই পরিণতি নির্ভর করিবে।' নাটকের ইহাই বিশিষ্ট রীতি।

"বঙ্কিমচন্দ্র যে রীতিতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আরম্ভ করিয়াছিলেন দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা বজায় রাখেন নাই। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি ভ্রমরের দৃষ্টিতে সমস্ত কাহিনীটি দেখিতে চাহিয়াছেন। ইহাতে উপন্যাসের স্বরূপ বদলাইয়া গিয়াছে।"

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দুইটি কাহিনী আছে। এক নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখী-কুন্দের কাহিনী আর দুই, হীরা দেবেন্দ্রের কাহিনী।' উপকাহিনীর সাহায্যে তিনি ঘটনার জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই উপন্যাসের দুইটি প্রধান চরিত্র নগেন্দ্রনাথ ও হীরা। হীরা নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর দাসী, দেবেন্দ্র দত্ত নগেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার। তবু শুধু এই সম্পর্ককে অবলম্বন করিয়াই যদি বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের বিষবৃক্ষের সঙ্গে হীরার বিষবৃক্ষকে সংযুক্ত করিয়া দিতেন তাহা হইলে এই উপন্যাস 'মৃণালিনী'র পর্যায়ভুক্ত হইত। কিন্তু দেবেন্দ্র দত্ত কুন্দ-নন্দিনীর জন্য উন্মত্ত; হীরা দেবেন্দ্রের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী এবং হীরার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া দেবেন্দ্র তাহার সাহায্যে কুন্দনন্দিনীকে হস্তগত করিতে চাহে। হীরা ক্ষণিক আবেগে মোহবিবশা হইলেও প্রখর বুদ্ধিশালিনী। সুতরাং এই কপটতা বুঝিতে পারিয়া সে কুন্দ ও দেবেন্দ্রের সর্বনাশ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইভাবে কুন্দনন্দিনী দুইটি বিষবৃক্ষকে একত্র করিল কৃষ্ণকান্তের উইল-এ কোন উপকাহিনী নাই। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বারবার উইল পরিবর্তনের বহির্ঘটনাই কাহিনীর ঘটনাকে জটিলতর করিয়াছে। ইহাকেই আধুনিক উপন্যাসের পথিকৃৎ বলা যায়।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের যে গুরুতর অভাব রহিয়াছে তাহা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ পূর্ণ হইয়াছে। "কার্য কারণ পরম্পরার কোন শৃঙ্খলই বাদ যায় নাই। সূর্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমর অধিকতর জীবন্ত হইয়াছে, তাহার অনুচিত অভিমান ও সন্দেহপ্রবণতা ট্র্যাজেডিকে আসন্নতর করিয়াছে। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের অনুরাগ সঞ্চারের প্রথম অঙ্কুরটি সেরূপ বিশদভাবে প্রকট করিয়া দেখান হয় নাই; সূর্যমুখীর প্রতি বিতৃষ্ণার কোন পর্যাপ্ত কারণ দেওয়া হয় নাই; সূর্যমুখীর নিজের কেনে অপরাধ এই বিচ্ছেদ সংঘটনে সহায়তা করে নাই। কিন্তু বর্তমান উপন্যাসে রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের ভাবের

রূপান্তর, দয়া ও সমবেদনা হইতে প্রেমে পরিণতি যথেষ্ট পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তারপর 'বিষবৃক্ষ'-এ নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর জীবন প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বাহ্যসম্পর্কশূন্য—বাহিরের জগৎ হইতে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক আসিয়া আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তোলে, সেগুলিকে যেন সযত্নে বর্জন করিয়াই উহার বিরোধের ক্ষেত্র রচিত হইয়াছে—বাহিরের শক্তির মধ্যে এক হীরাই নায়ক-নায়িকার দুর্ভেদ্য অন্তঃপুর দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে। অন্তরের যে গভীর স্তরে এই সমস্যার জাল পাকাইয়া আসিতেছিল, নিয়তির সেই গোপন কক্ষে কমলমণিও প্রবেশ-লাভে অধিকারিণী হয় নাই, কেবল বাহির হইতে সান্ত্বনা ও সমবেদনার কার্যেই নিযুক্ত ছিল। কিন্তু একান্নবর্তী বাঙালী গৃহস্থ পরিবারে বাহিরের সঙ্গে এরূপ সম্পর্কলোপ প্রায়ই সম্ভব হয় না; আমাদের অন্তরে যে গুরুতর বিপ্লববহ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে, তাহা আমাদের পরিজন ও প্রতিবাসীদের ফুৎকারেই শিখা বিস্তার করে। শতবন্ধনজাল-জটিল সামাজিক জীবন আমাদের অন্তরের সমস্যাকে আত্মসীমা-নিবদ্ধ (Self-contained) থাকিতে দেয় না, তাহার উপর সূক্ষ্ম দুরতিক্রম্য প্রভাব বিস্তার করিয়া আমাদের ভাগ্য-সূত্রকে আরও গ্রন্থি-সংকুল করিয়া তোলে। আমাদের বাস্তব জীবনযাত্রার উপর এই প্রতিবাসী-শ্রেণীর জীবের প্রভাব বড় অল্প নহে অবশ্য অনেক সময় উপন্যাসকার আমাদের অন্তরের ভাবনাগুলির ঘাত-প্রতিঘাত স্পষ্টতররূপে দেখাইবার জন্য আমাদের অন্তর্জীবনকে প্রতিবেশ-প্রভাব হইতে পৃথক করিয়া লইয়া ইহাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলে সমর্পণ করেন—কিন্তু বাঙালী জীবনের উপন্যাসে এইরূপ প্রক্রিয়া যেন একটু অস্বাভাবিক বলিয়াই ঠেকে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ এই বাহ্য জগতের শক্তিকে অযথা ক্ষীণ করিয়া দেখান হয় নাই; ইহা অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর সমুচিত ও ন্যায্য প্রভাবই বিস্তার করিয়াছে।

এ বাহ্যশক্তিগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান কৃষ্ণকান্তের উইল। প্রত্যেকবার উইল পরিবর্তন কেবল যে সম্পত্তির বিভাগ-বণ্টনের অংশ বদলাইয়াছে তাহা নহে, ইহা অলঙ্ঘ্য বিধিলিপির ন্যায় উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের ভাগ্য পরিবর্তনও করিয়াছে।......বাহ্য জগতের ঈর্ষা ক্রূর প্রতিকূলতা, তাহার মুখে এই বক্র উপহাসপূর্ণ হাসি আমাদিগকে বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির

ironic treatment of nature-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এই বিষয়ে বিষবৃক্ষ অপেক্ষা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিত।

আরও একটি বিষয়ে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষা বাস্তবতার অধিকতর অনুগামী—উপন্যাসের পরিণাম সংঘটনে। 'বিষবৃক্ষ'-এ নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর পুনর্মিলন অনেকটা রোমান্স সুলভ আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিপদ-ঝটিকার পূর্ণবেগ কুন্দনন্দিনীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; সূর্যমুখী নগেন্দ্র যেন একটা স্বল্পকালব্যাপী দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া আবার তাহাদের চিরাভ্যস্ত প্রেমের জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ নায়ক-নায়িকা এত সহজে অব্যাহতি পায় নাই। লেখক পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া, বাধার উপর বাধা স্তূপীকৃত করিয়া, ভ্রমর-গোবিন্দলালের মধ্যে যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে; তাহাদের গভীর মনো'ব্যথার কোন সুলভ সমাধান সম্ভব হয় নাই। ভ্রমর, গোবিন্দলাল, রোহিণী ইহাদের প্রত্যেকের উপর দিয়াই নিয়তি নিষ্করুণ রথচক্র চালাইয়া গিয়াছে, কোন সদয় হস্ত তাহাদিগকে চক্রগতির সীমার বাহিরে পথিপার্শ্বে সরাইয়া রাখে নাই। লেখক এখানে রোমান্সের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের মায়ায় ভুলেন নাই, নিয়তির অমোঘ পথ রেখারই অনুবর্তন করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ অপেক্ষা গোবিন্দলালের নিষ্ঠুরতা আরও হৃদয়হীন ও প্রায়শ্চিত্ত আরও কঠোর; সূর্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমরের দুঃখ আরও মর্মস্পর্শী; সূর্যমুখীর একান্ত ক্ষমা অপেক্ষা ভ্রমরের অনির্বাণ অভিমান ও হত্যাকারী স্বামীর বিরুদ্ধে নিবৃত্তিহীন বিরাগ অধিকতর বাস্তবানুগামী। 'বিষবৃক্ষ'-এ বঙ্কিম বাস্তব-প্রণালীর অনুসরণ করিয়াও তাঁহার চিরপ্রিয় রোমান্সের প্রভাব হইতে নিজেকে একেবারে মুক্ত করেন নাই, তাঁহার দৃষ্টি ও নগ্ন-বাস্তবতার মধ্যে রোমান্সের একটি অতি সূক্ষ্ম রঙিন যবনিকার ব্যবধান রাখিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ এই সূক্ষ্ম যবনিকাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। বঙ্কিম সমস্ত বাধা-ব্যবধান সরাইয়া ফেলিয়া অকম্পিত চক্ষুতে অবিমিশ্র বাস্তবতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এবং আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের মধ্যে একটি অসাধারণ রসপূর্ণ ও দুঃখ গৌরবমণ্ডিত সংঘাতের চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।"

(ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ

(১) কলিকাতায় পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন……বিধবা বিবাহ করিব। [প্রথম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ]

আলোচ্য অংশটি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "কৃষ্ণকান্তের উইল" নামক উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে লওয়া হইয়াছে। দুর্বৃত্ত হরলাল পিতা কৃষ্ণকান্তের সম্পত্তির অর্ধেক অংশ গ্রাস করিবার জন্য কলিকাতা হইতে প্রাচীনপন্থী পিতাকে ভয় দেখাইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য যে পত্র লেখে, আলোচ্য অংশটি তাহারই অন্তর্গত।

প্রাচীনপন্থী এবং সৎ কৃষ্ণকান্ত পরলোকগত অনুজ রামকান্তের পুত্র গোবিন্দলালকে সম্পত্তির আট আনা এবং স্বীয় পুত্রদ্বয়, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেককে তিন আনা, পত্নীকে এবং কন্যাকে যথাক্রমে এক আনা করিয়া অংশ দিবার জন্য যে উইল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন তাহা দুর্দান্ত প্রকৃতির হরলালের কর্ণগোচর হইল। অসৎ প্রকৃতির হরলাল এইরূপ উইলে আদৌ সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ছলে বলে কৌশলে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রথমে পিতার উপর বলপ্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে কৃষ্ণকান্ত ভীত না হইলে হরলাল অতঃপর কৌশলে কার্যসিদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। সে কলিকাতায় গিয়া সেখান হইতে পিতাকে পত্র লিখিয়া সতর্ক করিবার চেষ্টা করিল যে, তাহাকে যদি সম্পত্তির আট আনা অংশ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সে বিধবা বিবাহ করিবে। হরলাল জানিত তাহার পিতা কৃষ্ণকান্ত প্রাচীনপন্থী মানুষ, সুতরাং পুত্রকে বিধবা বিবাহ করা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি অবশ্যই উইলের পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহার উদ্দেশ্য সফল করিবেন। কিন্তু হরলাল তাহার পিতাকে চিনিতে পারে নাই, তিনি বৃদ্ধ হইলেও ছলে-বলে-কৌশলে যে তাঁহাকে তাঁহার নির্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত করা যায় না। ইহা পরে সে বুঝিতে পারিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস হিসাবে 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃত পরিমাণে আলোচিত। উপন্যাস দুইটির মধ্য দিয়া ভারতীয় হিন্দুসমাজ সম্পর্কে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব কি ছিল তাহা বুঝা যায়। হিন্দু বিধবাদের

দুর্বিষহ অবস্থায় বিচলিত মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ করেন। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে তাহা তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রও প্রচলিত সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখী কমলমণির নিকট লিখিত পত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা-বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?' বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধতা সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম খণ্ড) পুস্তকের এই অংশে রহিয়াছে, 'বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃত-ভার্য পুরুষদের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন?' তবে পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের মন অপেক্ষাকৃত উদার হইয়াছিল, পূর্বের ন্যায় প্রবল বিরূপতা আর ছিল না। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, 'সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নয়, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।' কিন্তু ইহা অনেক পরের কথা। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথ বিধবা কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াও পরিণামে সুখী হইতে পারে নাই, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলাল বিধবা রোহিণীকে বিবাহ না করিয়া রক্ষিতার ন্যায় রাখিয়াছিল, কিন্তু জীবনে সেও পরিতাপে জর্জরিত হইয়াছে। বস্তুত বিষবৃক্ষে যাহার সূচনা, কৃষ্ণকান্তের উইলে তাহারই সমাপ্তি ঘটিয়াছে।

(২) হায়! ফলাহার! শত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুমি মর্মান্তিক পীড়া দিয়াছ। [প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

আকৃতিতে যাহাই হউন, প্রকৃতিতে 'নিরীহ ভালো মানুষ' হইয়াও প্রলোভনের শিকার হইয়া রোহিণীর খুল্লতাত ব্রহ্মানন্দ ঘোষের যে সুতীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গেই ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এই উক্তি করিয়াছেন।

দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিকট ফলাহারের আমন্ত্রণ এক দুর্বার প্রলোভনের বস্তু। যদি দেহ রোগ জর্জরিতও হয়, হজমশক্তি যদি সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হইয়াও গিয়া থাকে, তবু সেই ব্রাহ্মণ নিজব্যয়ে সুখাদ্য সংস্থান করিবার ক্ষমতা না থাকায়,

সম্মুখে সুখাদ্য ফলাহারের আয়োজন দেখিলে আর স্থির থাকিতে পারে না। নিজের দৈহিক অসুস্থতা ও পৈত্তিক অক্ষমতার কথা ভুলিয়া গিয়াই সেই গুরু-পাক ফলাহার সম্পূর্ণভাবে উদরসাৎ করিয়া বসে। হরলালের প্রলোভনে প্রলুব্ধ ব্রহ্মানন্দের অবস্থাও হইয়াছিল ফলাহারে প্রলুব্ধ ব্রাহ্মণেরই মত। যাহা সে আত্মসাৎ করিতে পারিবে না অর্থাৎ যে জালিয়াতি করিবার মত সাহস তাহার নাই, তাহারই পুরস্কার রূপে প্রদত্ত অগ্রিম পাঁচশত টাকা ঘুষ সে নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছে। বিবেক তাহাকে দংশন করিয়াছে, কিন্তু হাজার টাকা তাহার নিকট কুবেরের ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডার আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াও চলিয়া যাইবে? ধরা পড়িলে কপালে জুটিবে শাস্তি ও লাঞ্ছনা, ইহা সে জানে এবং এই জন্যই প্রথমে সে টাকা লইতে সাহসী হয় নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোভই প্রবল হইয়া উঠিল। ভুলাইয়া দিল ন্যায় নীতির কথা, শাস্তি-লাঞ্ছনার কথা। যখন সে লক্ষ্য করিল হরলাল ফিরিয়া যায়, তখন আর থাকিতে না পারিয়া ডাকিয়া বলিল, 'বলি, ভায়া কি গেলে?' অতঃপর বহু দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিক্ষত হইয়াও, ইতঃস্তত করিয়াই সে টাকাটি হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল। সহস্র মুদ্রা হাত ছাড়া হইবে? প্রাণ থাকিতে সে তাহা হইতে দিবে না। ফলাহার-লোভী দরিদ্র ব্রাহ্মণ অসুস্থ শরীর লইয়া যেমন প্রাণ থাকিতে ফলাহার ত্যাগ করিয়া আসে না, অর্থলোভী দরিদ্র ব্রহ্মানন্দও সেইরূপ আচরণ করিল।

উভয় ক্ষেত্রেই দুর্দান্ত লোভের নিকট বিবেকবুদ্ধি হইয়াছে পরাজিত। বলাবাহুল্য, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যে ব্যঙ্গগর্ভ কৌতুক সৃষ্টির প্রয়াস রহিয়াছে।

(৩) লোভ বড়, কিন্তু বদহজমের ভয়ও বড়; ব্রহ্মানন্দ মীমাংসা করিতে পারিল না। মীমাংসা করিতে না পারিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের মত উদরসাৎ করিবার দিকেই মন রাখিল।"

[প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

কৃষ্ণকান্তের উইলে-এ উইল লেখক দরিদ্র ব্রহ্মানন্দ ঘোষের অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি সুন্দর চিত্র এখানে বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করিয়াছেন। হরলাল পিতার উইল পরিবর্তনের কথা শুনিয়া হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহার পিতাকে বিধবা-বিবাহের সংবাদ দিলে কৃষ্ণকান্ত আবার নূতন উইল করিতে মনস্থ

করিলেন। এবার হরলালের ভাগ্যে শূন্য পড়িবে। হরলাল ব্রহ্মানন্দকে পাঁচশত টাকা ঘুষ দিয়া জাল উইল তৈয়ারী করাইল। জাল উইল রাখিয়া আসল উইল লইয়া আসিতে পারিলে আরও পাঁচশত টাকা দিবার প্রতিশ্রুতিও হরলাল ব্রহ্মানন্দকে দিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ নিরীহ ভীত মানুষ। জাল করিতে তাহার ভীষণ ভয়। অন্যদিকে অনেক টাকা, লোভ ছাড়া যায় না। ব্রহ্মানন্দের মনে ভীষণ ভয়, যদি জাল করিতে গিয়া ধরা পড়ে, তাহা হইলে হয়ত তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইবে। আর জাল না করিলেও হাতে পাওয়া হাজার টাকার লোভ ছাড়িতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, ব্রহ্মানন্দের এই অবস্থা দরিদ্র অসুস্থ ব্রাহ্মণের সম্মুখে ফলাহারের মত। একদিকে তাহার সংক্রামক জ্বর, প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, অপর দিকে ফলাহার উপস্থিত। কলার পাতা বা কাঁসার বাসনে সুশোভিত লুচি, সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ। গরীব ব্রাহ্মণ মহা সমস্যায় পতিত। অসুস্থ অবস্থায় এই ফলাহার ভক্ষণে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। অন্যদিকে অভাবিত এই ফলাহার সম্মুখে। তাহার লোভ সংবরণ করা খুবই কঠিন। হাজার বছর ধরিয়া কূট তর্ক করিলেও সেই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। এবং শেষ পর্যন্ত কোন মীমাংসায় আসিতে না পারিয়া অন্যমনে ফলাহার ভক্ষণের দিকে তাহার মন সায় দিবে। তেমনি ব্রহ্মানন্দও মহা সমস্যায় পড়িল। সে কী করিবে কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত গরীব ব্রাহ্মণের মত নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণের দিকেই মন দিল। অর্থাৎ টাকার লোভে উইল জাল করিবে বলিয়া ব্রহ্মানন্দ শেষ পর্যন্ত স্থির করিল।

(৪) পশুজাতি রমণীদিগের বিদ্যুদ্দামকটাক্ষে…… ……কটাক্ষ করিতেছিল। [প্রথম খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদ]

বিধবা পূর্ণযৌবনা রোহিণী, যাহার 'রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের ষোল কলায় পরিপূর্ণ' তাহার একটি বিশেষ ব্যবহারের মধ্য দিয়া লেখক এখানে কৌশলে তাহার চরিত্র সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী 'রোহিণী বালবিধবা, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।' এই চরিত্র সম্পর্কে নীতিবাগীশ ও কিছু পরিমাণে রক্ষণশীল প্রকৃতির বঙ্কিচন্দ্রের আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না। 'কৃষ্ণকান্তের উইলের'

প্রথম সংস্করণে রোহিণী 'লোভী,' 'চোর', 'ব্যাপিকা,' 'হরলালের সহিত ইতরের ন্যায় কথাবার্তা' বলিত, সে 'মুখরা,' 'সুতরাং কোন ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে কথা কহিত না। গোবিন্দলাল কুষ্ঠগ্রস্তবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন' রোহিণী এইভাবে চিত্রিত হইয়াছিল। কিন্তু 'চোর, মুখরা, অর্থগৃধ্নু রোহিণী গোবিন্দলালের মতো রূপ-গুণ-শিক্ষা সহবত সম্পন্ন নায়ককে আকর্ষণ করলে ট্র্যাজেডির গুরুত্ব হ্রাস পায়' বলিয়া উপন্যাসটির চতুর্থ সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে গোবিন্দলালের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য যথেষ্ট মার্জিত করিয়া এবং কিয়দংশে ভ্রমরের প্রতিযোগিনী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বিধবার প্রণয় প্রবৃত্তি বা পুরুষের আসঙ্গলিপ্সাকে বঙ্কিমচন্দ্র কখনও সহানুভূতির চোখে দেখিতে পারেন নাই। পূর্ববর্তী 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বিধবা কুন্দনন্দিনীর মধ্যে কামবাসনা প্রবলভাবে বিদ্যমান না থাকায় পরন্তু তাহার ভীরু প্রেম কেবল মধুর লজ্জার মধ্যদিয়া প্রকাশিত হওয়ায় কুন্দর প্রতি লেখকের সহানুভূতি প্রভূত পরিমাণে ছিল দেখা যায়। পরবর্তী 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে রোহিণীর অন্তরে যে প্রচণ্ড ভোগস্পৃহা বর্তমান ছিল তাহা হরলালের বিধবা বিবাহ প্রস্তাবে উইল চুরির ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুতঃ অনন্ত রূপ-যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে রোহিণীর অন্তর সায় দেয় নাই। নিজের রূপ যৌবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন বলিয়াই বোধ হয় রান্নাঘরে বিড়ালের উপর সে তাহার মধুর ও তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিল। প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বারুণী পুষ্করীণীতে গমনরতা রোহিণীর কটাক্ষ সম্পর্কে লেখক পুনরায় লিখিয়াছেন—'কুহুঃ কুহুঃ কুহুঃ! রোহিণী চারি দিক চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রোহিণীর এই ঊর্ধ্ববিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই —ক্ষুদ্র পাখি জাতি—তখনই সে, শরে বিদ্ধ হইয়া, উলটি-পালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া, ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত।' রোহিণীর অন্তরের এই প্রবল ভোগস্পৃহা প্রসাদপুরের কুঠিবাড়িতে নিশাকরকে দেখিয়া কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিয়াছে, তাহার একটি সম্ভাব্য রূপ বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে অঙ্কন করিয়াছেন: বুঝি এই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, 'অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে? ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে?

বাঘ গরু মারে,—সকল গরু খায় না। স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে—কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য। অনেকে মাছ ধরে—কেবল মাছ ধরিবার জন্য, মাছ খায় না, বিলাইয়া দেয়, অনেকে পাখি মারে কেবল মারিবার জন্য—মারিয়া ফেলিয়া দেয়। শিকার কেবল শিকারের জন্য—খাইবার জন্য নহে জানি না, তাহাতে কি রস আছে। রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়ত লোচন মৃগ এই প্রসাদপুর কাননে আসিয়া পড়িয়াছে—তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই।' সুতরাং বিড়ালের উপর রোহিণীর কটাক্ষ লইয়া লেখক যে পরিহাস করিয়াছেন তাহা কিভাবে এই চরিত্রটির পরিণতির নিয়ামক হইয়া উঠিবে লেখক কৌশলে তাহাই এখানে বলিয়া লইয়াছেন। মনে রাখা উচিত যে ইন্দিরা, শৈবলিনী ও কুন্দনন্দিনীর পর বঙ্কিমচন্দ্র এই রোহিণী চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়াছেন। 'সেইজন্য অপরিস্ফুট কুন্দের বৈধব্যবেদনা ও ভীরু প্রণয়ের পরিবর্তে এখানে রোহিণীর বেদনাহীন বৈধব্য ও নির্ভীক প্রণয়চাঞ্চল্য অপরূপ নূতনত্বে আমাদের সামনে এসেছে। রোহিণীর শরসন্ধান কোন বিশেষ লক্ষ্যের অভিমুখে নয়। বিড়াল, পাখী, হরলাল, গোবিন্দলাল, নিশাকর—নানাজাতীয় প্রাণীর প্রতি কটাক্ষ।'

(৫) "তুমি যদি মেয়েমানুষ হইতে, তোমাকে আজ যা দিয়া ঘর ঝাঁট দিই, তাহা দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ, মানে মানে দূর হও।"

[প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ]

হরলালের প্রলোভনে রোহিণী অসাধ্য-সাধন করিল। ব্রহ্মানন্দ হাজার টাকার বিনিময়ে যাহা পারিল না, রোহিণী পুনর্বিবাহের লোভে সেই কাজ করিল। উইল চুরি করিল। সেই সাফল্যে রোহিণীর আশা বাড়িয়া গেল। সে সুখের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—অতীত ভুলিয়া গেল, বর্তমান অবজ্ঞা করিল, কেবল বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত ভবিষ্যতের—সুখের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সেই স্বপ্ন যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সে দেখিতে লাগিল সে-ও আসিল, কিন্তু আশা ফলবতী করিতে নহে—উইল লইতে। হরলাল তখন লক্ষ টাকার বিনিময়ে সেই উইল লইতে প্রস্তুত, কিন্তু যখন সে দেখিল, রোহিণী অর্থের জন্য তাহাকে উইল দিবে না তখন সে নিজমূর্তি ধারণ করিল; বলিল—"আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।"

রোহিণীর স্বপ্ন টুটিয়া গেল—সে আশার উচ্চ-শৃঙ্গ হইতে হতাশার পঙ্কিল পল্বলে পতিত হইল। তখন সেও নিজমূর্তি ধরিল। মেকলে বলিয়াছেন, "No creature is so revengeful as a proud man who has humbled himself in vain."—যে গর্বিত ব্যক্তি (কোন কারণে) নমিত হইয়াও বিফল মনোরথ হয়, তাহার মত প্রতিহিংসা-পরায়ণ আর কেহই থাকে না। রোহিণী যে মোহে তাহার ইহকালের সর্বস্ব হরলালকে দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, হরলাল যখন ঘৃণাতিক্ত উক্তিতে তাহা দূর করিয়া দিল, তখন রোহিণীর মনের ভাব সহজে কল্পনা করা যায়। তখন সে হরলালকে এই কথা বলিয়াছিল। হরলাল যেমন নরাধম তেমনি যোগ্য প্রতিদানই রোহিণী তাহাকে দিয়াছিল। যারপরনাই অপমান করিয়া হরলালকে তাড়াইয়া দিল।

(৬) কিন্তু পাখীর অদৃষ্টে তাহা ছিল না—কার্যকারণের শ্রেণী পরম্পরায় এটি গ্রন্থিবদ্ধ হয় নাই—অথবা পাখীর তত পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতি ছিল না। [প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

রোহিণী বালবিধবা। তাহার জীবনে বসন্তের প্রতিক্রিয়া সামাজিক বিধি-বিধানে নিষিদ্ধ। কিন্তু সামাজিক বিধি-নিষেধ যে স্থানে পৌঁছাইতে পারে না সেই বারুণীর নির্জন পরিবেশে যদি কোকিলের ডাকে বসন্ত জাগানো প্রভাব থাকিয়া যায় তবে হতভাগিনী রোহিণী যৌবন ধর্মের স্বভাবানুযায়ী কিছুটা বিচলিত হইয়া একবার চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিবে, ইহাতে আশ্চর্য কি! যৌবনের তাড়নায় ঐ দৃষ্টিতে ফলিয়াছে বিলোল কটাক্ষ। কবি-বঙ্কিম তাঁহার শিল্পী-দৃষ্টিতে সেই কটাক্ষটি প্রত্যক্ষ করিয়াই এই কৌতুকোজ্জ্বল মন্তব্য করিয়াছেন।

রোহিণী যুবতী। তাহার কটাক্ষশর ব্যর্থ হইবার নহে। যদি কোকিলের প্রতি উহা সরাসরি নিক্ষিপ্ত হইত, তবে পাখীটি উলটি পালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া, ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত। অর্থাৎ পাখীর পক্ষে ঐ আঘাত সহ্য করা সম্ভব হইত না। কিন্তু কবি-বঙ্কিমের কল্পনা এখানেই থামে নাই। সে কল্পনা আরও উদ্দাম। কোকিলের কুহু কুহু রবে স্তব্ধ হইবার হেতু থাকিত যদি ঐ কটাক্ষশর কোকিলকে বিদ্ধ করিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। রোহিণীর ন্যায় রসবতী যুবতীর কটাক্ষ লাভ পরম ভাগ্যের কথা। পাখীর

অদৃষ্টে তাহা ছিল না। এই ঘটনাটি সম্পর্কে কবি বঙ্কিমের মন্তব্য হইল, কারণ অনুযায়ী কার্য হইয়া থাকে, অথবা যে কার্য যে কারণে হয়, ঠিক কারণ ঘটিলে সেই কার্যটি ঘটা উচিত। উপযুক্ত শর নিক্ষিপ্ত হইলে পাখী বিদ্ধ হইবে ইহাই প্রত্যাশিত। কিন্তু এখানে কার্যকারণ সূত্র অনুযায়ী কার্য সংঘটিত হয় নাই; অর্থাৎ কটাক্ষ-শরে কোকিল ভূলুণ্ঠিত হয় নাই। বলাবাহুল্য, এখানে কবি বঙ্কিম কার্যকারণ পরম্পরা বলিয়া যে কারণ ও যে কার্যকে পরস্পরের সম্বন্ধযুক্ত করিতে চাহিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য একটু হাস্যরসের স্পর্শ দেওয়া; এবং রোহিণীর কটাক্ষপাতের উপর কটাক্ষপাত করাও আর একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য। কৌতুক করিয়াই তাই লেখক বলিয়াছেন, রসবতী যুবতী রোহিণীর কটাক্ষ লাভ করা পূর্বজন্মের পুণ্যফলেই সম্ভব, কিন্তু কোকিলের তাহা ছিল না বলিয়াই কটাক্ষবিদ্ধ হইবার সৌভাগ্য তাহার হইল না।

[এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঔপন্যাসিক বঙ্কিম রোহিণীর যে চরিত্রটি গড়িয়া তুলিয়াছেন, এই অংশটি সেই চরিত্র সৃষ্টির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া উঠে নাই। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পসৃষ্টির ত্রুটি।]

(৭) দেবতার মেঘ কণ্টক-ক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করে না।

[প্রথম খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ]

রোহিণী লোক ভাল নয়। সে বালবিধবা। কিন্তু বিধবার মত বেশ-ভূষা সে করে না। সে তাহার বৈধব্যকে সহজে স্বীকার করিতে পারে নাই। তাহার অতৃপ্ত কামনা নিয়তির নির্মম বিধানের কাছে নতি স্বীকার করে নাই। সুযোগ পাইলে সে পুনরায় বিবাহ করে। হরলালের প্রলোভনে সেজন্য সে সহজেই প্রলুব্ধ হইল। কিন্তু হরলাল তাহার রুদ্ধ কামনা-বহ্নিকে জ্বালাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। বারুণী পুকুরের তীরে কোকিলের ডাক তাহাকে আরো তীব্র করিল। চোখের জল ছাড়া সেই আগুন নিভাইবার তাহার আর কোন উপায় ছিল না। রোহিণী বারুণী পুকুরের ঘাটে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে তাহার জীবনের ব্যর্থতার কথাই চিন্তা করিতেছিল। তাহার মনে প্রশ্ন জাগিতেছিল, তাহার অদৃষ্টে কেন এই বৈধব্য ঘটিল? তাহার অপরূপ রূপ-যৌবন থাকিতেও সে কেন জীবনে কোন সুখভোগ করিতে পারিল না? এ

জীবনে যাহারা সকল সুখে সুখী তাহাদের সঙ্গে নিজের তুলনা করিয়া তাহার মনে হিংসা হইতেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র তাহার এই হিংসা বোধকে নিন্দা করিতেছেন। তাহা ছাড়া রোহিণী সমাজের চিরাচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে। সে ভাল লোক নয়। খারাপ লোকের কান্নায় স্বভাবতই মানুষের সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যে করুণা বা দয়ার পাত্র তাহাকে বিচার করিতে নাই। মেঘ দেবতার সৃষ্টি। সেই মেঘ হইতে জল হয়; ধরিত্রী স্নাত হয়, স্নিগ্ধ হয়; সবুজে-শ্যামলে তাহার বক্ষ আবৃত হয়, কিন্তু সেই যে জলধারা তাহা হইতে কাঁটা-বনও বঞ্চিত হয় না। এই কাঁটা বনের দ্বারা অপকার ছাড়া কোন উপকার সাধিত হয় না, তথাপি দেবতা তাহার উপর জলধারা বর্ষণ করেন। শেকস্‌পীয়র বলিয়াছেন, "The quality of mercy is not strain'd"। বিদ্যাসাগরের দয়াও কখন 'utility' বা উপযোগিতা বিচার করিয়া ধাবিত হয় নাই। তেমনি রোহিণী ভাল হউক, মন্দ হউক, সে দুঃখিনী। তাহার দুঃখে সহানুভূতি জানানোই কর্তব্য। সহানুভূতি দেখাইবার পূর্বে দয়ার পাত্রের ভালমন্দ বিচার করা উচিত নহে—'পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল।"

(৮) সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ।

[প্রথম খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ]

রোহিণী বারুণী পুকুরের ঘাটে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিতেছিল। তাহার দুঃখের শেষ নাই। জীবনে সুখী হইবার জন্য তাহার রূপ-যৌবনের কোন অভাব ছিল না। তথাপি ভাগ্যদোষে আজ সমাজ সংসারে তাহার মত দুঃখী আর কেহ নাই। হরলাল তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াও প্রত্যাখ্যান করিল, কোকিলের ডাকাডাকি তাহার জীবনের শূন্যতাবোধকে আরো তীব্র করিল। কান্না ছাড়া তাহার আর উপায় ছিল না।

গোবিন্দলাল ছিল পরদুঃখকাতর। রোহিণীর জন্য তাহার সহানুভূতি দেখা দিল। সে রোহিণীর ভালমন্দ বিচার করিল না। দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করা তাহার কর্তব্য মনে হইল। সে দেখিল, চতুর্দিকে প্রকৃতির অপরিমেয় সৌন্দর্য। বারুণীর স্বচ্ছ জল, সেই জলে পূর্ণচন্দ্রের ছায়া, কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া,

সবই সুন্দর। এই সবই প্রকৃতির সৃষ্টি। ভাস্কর-কীর্তিকয় রোহিণীর মূর্তিও সুন্দর। যেখানে দয়া, যেখানে করুণা সেখানেই সৌন্দর্য। সেখানেই তো মহত্বের পরিচয়। নির্দয়তার মধ্যে আছে সংকীর্ণতা, নীচতা। তাহা অসুন্দর। প্রকৃতির মধ্যে গোবিন্দলাল এই নির্দয়তা দেখিতে পায় নাই; কারুণ্য ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব নয়। সেজন্যই সৃষ্টি করুণাময়ী। কিন্তু মানুষ নিজ স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত। সেখানে সে নির্দয়, অসুন্দর। এই মহৎভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই গোবিন্দলাল রোহিণীকে করুণা প্রদর্শন করিল।

(৯) সুমতি নামে দেবকন্যা · যুদ্ধ করে।

[প্রথম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিধবা বিবাহে প্রলুব্ধ করিয়া বিধবা রোহিণীর দ্বারা উইল হস্তগত করিবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইলে হরলালের প্রত্যাখ্যানে রোহিণীর মানসিক বেদনা সহানুভূতি সম্পন্ন গোবিন্দলালের সান্নিধ্যলাভ করায় যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিল, এখানে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

রোহিণী বালবিধবা হইলেও 'বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।' এই অপরূপ লাবণ্যবতী যৌবনমত্তা নারীটির নিকট সংযমের কোন মূল্য ছিল না এবং শাস্ত্রশাসিত শুষ্ক বৈধব্য-জীবন যাপন মিথ্যা বলিয়া মনে হইয়াছিল। বিশেষতঃ হরলাল তাহার অন্তরের নিরুদ্ধ কামনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে সে নিজের অবস্থায় আদৌ সন্তুষ্ট না থাকিয়া চিন্তা করিতে সুরু করিল যে, সে এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যাহার জন্য এই পৃথিবীতে কোন সুখভোগ করিতে পারিতেছে না:—"কোন দোষে আমাকে এ· রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল?…ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী…আমার অপেক্ষা কোনগুণে গুণবতী—কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য?" একদিকে সদ্য জাগ্রত কামনা অন্য দিকে অভাববোধ লইয়া বারুণী পুষ্করিণীর ঘাটে বিষাদখিন্ন অবস্থায় রোহিণী যখন রোদন করিতেছিল, ঠিক এই সময়ে প্রীতিস্নিগ্ধ অন্তরে গোবিন্দলাল তাহাকে সমবেদনা জানাইতে আসিল। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল—সম্মুখে সুধাপূর্ণ বারি দেখিয়া তৃষ্ণার্ত রোহিণীর প্রেমবহ্নি হাউ হাউ করিয়া জ্বলিয়া

উঠিল। তাহার অন্তরে তীব্র আন্দোলন সুরু হইল—একদিকে তাহার বিবেক, অন্যদিকে তাহার অতৃপ্ত বুভুক্ষা, একদিকে নিবৃত্তি, অপরদিকে প্রবৃত্তি—দুইয়ের দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। এই চরিত্রটিকে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রথম সংস্করণে যেরূপ চোর, লোভী, ব্যাপিকা করিয়া আঁকিয়াছিলেন, সেইরূপ চোর, মুখরা, অর্থগৃধ্নু রোহিণী গোবিন্দলালের মতো রূপ-গুণ-শিক্ষা সহবত সম্পন্ন নায়ককে আকর্ষণ করলে ট্র্যাজেডির গুরুত্ব হ্রাস পায় বিবেচনা করিয়া উপন্যাসটির চতুর্থ সংস্করণে গোবিন্দলালের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য রোহিণীকে যথেষ্ট পরিমাণে মার্জিত এবং কিয়দংশ ভ্রমরের প্রতিযোগিনী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইস্থানে সেই মার্জিত রোহিণীর চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। পুরুষের আসক্তলিপ্সা রোহিণীর মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিলেও সে এখনও পাপ পুণ্য বোধকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই, তাহার চিত্তে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, ভাল ও মন্দ বোধ এখনও সংগ্রামশীল। তাই উইল চুরির ব্যাপারে ধরা পড়িয়া বিদেশ যাইবার প্রাক্কালে সে তখনও মনে মনে নিজেকে সংযত করিবার শক্তি চাহিয়াছে ভগবানের নিকট—সে বলিয়াছে 'হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায় ··· আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিভাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না। ···· আমি বিধবা—আমার ধর্ম গেল, সুখ গেল, প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু?—রাখিব কি প্রভু?—হে দেবতা। হে দুর্গা—হে কালি—হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও—আমার প্রাণ স্থির কর—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না'। কিন্তু গোবিন্দলালের সহিত পাপিষ্ঠ ভোগ জীবন যাপন করিবার পর রোহিণীর ধর্মবোধ সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে, দেখা যায় যে অপরিচিত নিশাকরকে দেখিয়া রোহিণী তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছে।' সুমতি-কুমতির এই দ্বন্দ্ব রোহিণী চরিত্রটিকে বাস্তব ও ট্র্যাজিক করিয়া তুলিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(১০) অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র। দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল।

[প্রথম খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ]

বারুণী পুষ্করিণীর তটে ক্রন্দনরতা রোহিণীকে গোবিন্দলাল সহানুভূতি জানানোর পরে রোহিণীর মনে গোবিন্দলালের চিন্তা জুড়িয়া বসিল। যে

গোবিন্দলাল তাহাকে করুণা জানাইল, রোহিণী হরলালের প্রলোভনে পড়িয়া সেই গোবিন্দলালের ক্ষতি করিয়াছে। সে কৃষ্ণকান্তের সিন্দুকে জাল উইল রাখিয়া আসল উইল লইয়া আসিয়াছে। জাল উইলে গোবিন্দলালের ভাগে ছিল এক পাই। রোহিণীর হৃদয়ে সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। যত দিন যায় তত তাহা বাড়িতে লাগিল। রোহিণী কেবল গোবিন্দলালের কথা ভাবিতে লাগিল।

শিল্পী কালো চিত্রপটে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করেন। রঙের তুলির স্পর্শে যতই তাহা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে ততই চিত্রপট গাঢ়তর হয়। রোহিণীর হৃদয়রূপ চিত্রপট ছিল অন্ধকার। সেখানে পূর্বে কোন পুরুষ-মানুষের চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। তাহার সেই শূন্য হৃদয়ে গোবিন্দলালের চিত্র অঙ্কিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে গোবিন্দলাল তাহার মন জুড়িয়া বসিল। রোহিণীর হৃদয়পটে গোবিন্দলালের চিত্র উজ্জ্বলতর এবং জীবন্ত হইয়া উঠিল।

(১১) কিন্তু যে জাতি জীয়ন্তে জলন্ত চিতায় আরোহণ করিত, রোহিণীও সেই জাতীয়—আর্যকন্যা। [১ম খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ]

গোবিন্দলালের প্রতি আসক্ত রোহিণী গোবিন্দলালের উপকারার্থে জাল উইল বদল করিয়া আসল উইল রাখিতে গিয়া ধরা পড়ায় সত্য ঘটনা জানিবার জন্য গোবিন্দলাল তাহাকে অন্দর মহলে আনিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবার সময়ে লেখক রোহিণীকে লক্ষ্য করিয়া ভারতীয় হিন্দুনারী সম্পর্কে এই মন্তব্যটি করিয়াছেন।

কৃষ্ণকান্তকে অনুরোধ করিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীকে অন্দর মহলে ভ্রমরের নিকট আনাইয়াছে। স্বামীগতপ্রাণা ভ্রমর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রোহিণীর নিকট গোবিন্দলালকে রাখিয়া পাকশালায় চলিয়া গিয়াছে। এই অবসরে গোবিন্দলাল উইল চুরির প্রকৃত সংবাদটি জানিবার জন্য রোহিণীকে প্রশ্ন করিল। রোহিণী গোবিন্দলালের প্রতি প্রবল আসক্তি বশতঃই এই কর্মটি করিয়াছে—সে তাহার অন্তর্বেদনা আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। ইতিপূর্বে সে তাহার বুদ্ধিবিবেচনা দ্বারা নিজের মনোভাবকে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া উপলব্ধি করিয়াছে যে গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়াসক্তি ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। ইহা যে অন্যায়, ধর্মবিগর্হিত তাহা বুঝিলেও বিধবা যুবতী আপনার সত্তাগ্রত

কামনাকে জয় করিতে পারে নাই। ধরা পড়িয়া গোবিন্দলালের নিকট অকপটে সকল কিছু স্বীকার করিলে ফল যে খারাপ হইবে না ইহা সে যে মনে না করিতেছে এমন নহে। কিন্তু বলি বলি করিয়াও বলা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। বাঞ্ছিত প্রেমপাত্রকে সম্মুখে পাইয়াও তাহার নিকট সত্য কথা বলায় রোহিণীর অসুবিধা কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিয়াছেন এই বলিয়া যে, রোহিণী যদি হিন্দু বিধবা না হইত, তাহা হইলে তাহার কোনো অসুবিধা বা আপত্তি হইত না। কারণ স্বামীর প্রতি একানুরক্তিই যেখানে হিন্দু নারীর আদর্শ সেখানে হিন্দু ভিন্ন অন্যধর্মে স্বামী বর্তমানে অথবা অবর্তমানে অপর পুরুষের প্রতি প্রেমাকর্ষণ আদৌ দোষাবহ নহে। বালবিধবা রোহিণী ভ্রমরের স্বামী গোবিন্দলালের প্রতি আসক্ত হইয়া ভারতীয় সতী নারীর আদর্শ বিরোধী কাজ করিতেছে। তাই গোবিন্দলালের প্রশ্নের উত্তরে গোবিন্দলালেরই নিকট নিজের এই পাপবাসনার কথা প্রকাশ করিয়া ফেলা সম্ভব হইতেছে না। এই প্রকার নিদারুণ প্রেমজ্বালা সহ্য করা অপেক্ষা প্রকাশ করিয়া ফেলাই ভালো কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলিয়াছেন, যে নারীজাতি জীবন্ত অবস্থায় সদ্যমৃত স্বামীর সহিত চিতায় পুড়িয়া সহমরণ বরণ করিয়াছে অথবা আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জহরব্রত পালন করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে তীব্র যে কোন দহন সহ্য করা কিছুই অসম্ভব নহে। রোহিণীও যেহেতু সেই হিন্দু নারীরই সগোত্রা, অতএব বাসনার সুতীব্র দহনজ্বালা সহ্য করা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না।

সনাতন হিন্দু সমাজের দাম্পত্য জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বঙ্কিম এখানে ভারতীয় হিন্দুনারীর অপরিসীম সহনশীলতার প্রশংসা করিয়াছেন।

(১২) দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় ......দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।

[১ম খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ]

উইল চুরির ব্যাপারে সত্য ঘটনা জানিবার জন্য নির্জনে রোহিণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে যাইয়া রোহিণীর অন্তরের প্রকৃত সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িলে গোবিন্দলালের কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইল আলোচ্য অংশে লেখক তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

আসল উইল রাখিয়া জাল উইল চুরি করিবার সময়ে রোহিণী ধরা পড়িয়াছে, গোবিন্দলালের নিকট নির্জনে এই স্বীকারোক্তিতে গোবিন্দলাল বিস্মিত হইল। গোবিন্দলাল উদার, সচ্চরিত্র ও পরোপকারী; সে নিছক উপকার করিবার জন্যই এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। নির্জন বারুণী পুষ্করিণীর ঘাটে রোরুদ্যমানা রোহিণীকে "এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি, তবে কেন করিব না,' ইহা স্থির করিয়াই সে সান্ত্বনা দিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু বালবিধবা রোহিণীর অন্তরের সুপ্ত কামনা-বাসনাকে ইতিমধ্যেই হরলাল জাগাইয়া তুলিয়াছে, সুতরাং গোবিন্দলালের এই অযাচিত সহানুভূতি যে বুভুক্ষু নারীহৃদয়কে বশ করিয়া ফেলিবে ইহা গোবিন্দলালও আদৌ জানিত না। সুতরাং নিজের ভাল করিবার অনুরোধে না করিলেও বিধবা যুবতী যে কোন অলক্ষ্য কামনায় গোবিন্দলালের মঙ্গল করিবার জন্য উইল বদল করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে এবং সে কামনা যে গোবিন্দলালের সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ দ্বারাই উদ্রিক্ত হইয়াছে, ইহা রোহিণী গোবিন্দলালকে না বলিয়া থাকিতে পারিল না। কারণ ইতিমধ্যে রোহিণী মনে মনে ঠিক করিয়াছে 'আমি ত মরিতে বসিয়াছি কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব।' সুতরাং রোহিণী যখন বারুণী পুষ্করিণীর ঘাটে গোবিন্দলালের ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া বলিল, 'যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই, যাহা ইহজন্মে আর কখনও পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন,' এবং সে বস্তু যে কি তাহা গোবিন্দলালের প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট না জানাইয়া বলিল —'ইহজন্মে আমি বলিতে পারিব না কি। আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই, আমার মুক্তি নাই' ইত্যাদি, তখন গোবিন্দলাল বিস্মিত না হইয়া পারিল না। এতক্ষণে সে স্থিরপ্রত্যয় হইল যে রোহিণী তাহার প্রেমে পড়িয়াছে। তাহার প্রতি যে প্রেমে ভ্রমর আকণ্ঠ নিমজ্জিত, সেই প্রণয়ে কোন প্রকার পাপ নাই, যেহেতু তাহা সমাজানুশাসনে স্বীকৃত। কিন্তু বিধবার পক্ষে পরপুরুষের চিন্তাও যেখানে নিষিদ্ধ, সেখানে রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালবাসিয়া যে কতদূর গর্হিত কাজ করিয়াছে সে বিষয়ে গোবিন্দলালের সন্দেহমাত্র রহিল না। নারীচরিত্র সত্যই দুজ্ঞেয়। রোহিণীর নারী প্রকৃতিও দুর্জ্ঞেয়, সেও প্রবৃত্তির বশে চালিত হইয়া গোবিন্দলালের প্রতি আসক্ত হইয়াছে। তাহার এই রহস্যময় নারী প্রকৃতিকেই এখানে 'ভুজঙ্গী' বলা হইয়াছে।

এই আবিষ্কারের পর গোবিন্দলালের অন্তরে যে কোন আনন্দ হইল তাহা

নহে। লেখক তাহাকে এক নিষ্কলুষ চরিত্রবান যুবকরূপে অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন পরবর্তীকালে তাহার চরিত্রস্খলনের ভয়াবহ পরিণতি দেখাইবার জন্য। রোহিণীর স্পষ্ট স্বীকারোক্তির সময়ও তাই লেখক বলিয়াছেন যে, গোবিন্দলালের হৃদয় নিষ্পাপ ও অনিন্দ্য, সুন্দরী রমণীর প্রণয়জ্ঞাপন সত্ত্বেও রোহিণীর প্রতি তাহার কোন দুর্বলতা জন্মে নাই। তাহার হৃদয় সমুদ্রের মতো গভীর ও উদার। সে নিছক দয়া ও সহানুভূতির বশেই রোহিণীর উপকারার্থে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। রোহিণীর বাক্য প্রথমে তাহার সামাজিক সত্তাটিকে সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছে, সমাজনীতিকে লঙ্ঘন করিয়া রোহিণী যে অন্যায় কার্য করিয়াছে তাহার প্রতিবিধান করা কর্তব্য বিবেচনায় সে প্রথমে রোহিণীকে বলিয়াছে, 'মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভালো।' কিন্তু পরক্ষণেই একটি দার্শনিক ভাব তাহার চিত্তে স্থান পাইয়াছে, সে রোহিণীকে বলিয়াছে, 'মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি। আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন?' এই পরস্পর বিরোধী মনোভাব যে তাহার চরিত্রের দৃঢ়তার সূচনা করে না তাহা ইহার পরে রোহিণীকে দেশ ছাড়িয়া যাইবার পরামর্শের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। গোবিন্দলালের ধারণা হইয়াছিল যে রোহিণীকে তাহার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিলে গোবিন্দলালের অদর্শনে রোহিণীর তাহার প্রতি প্রেমও প্রশমিত হইবে। এই যে চমৎকার দাওয়াই-এর ব্যবস্থা গোবিন্দলাল করিল, ইহার পশ্চাতে নিছক দয়া, পরোপকার ও সহানুভূতি ছাড়া গোবিন্দলালের রোহিণীর প্রতি অন্য কোন দুর্বলতার আভাস পাওয়া যাইতেছে না। তাহার সম্মতি ব্যতিরেকেই রোহিণীর অন্তরে তাহার প্রতি যে প্রেমাকর্ষণ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা গোবিন্দলালের অদর্শনে প্রশমিত হইবে গোবিন্দলালের এরূপ মনে করিবার কারণ কি?

(১৩) "আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত সুখ।"

[প্রথম খণ্ড, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ]

এই উক্তিটি রোহিণীর। রোহিণী গোবিন্দলালকে কথা দিয়াছিল, সে হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া গোবিন্দলালের সাহায্যে কলিকাতায় চলিয়া যাইবে। খুড়ার সঙ্গে পরামর্শ করিতে সে বাড়ী আসিল। কিন্তু খুড়াকে কিছু বলিল না। ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দলালকে ছাড়িয়া তাহার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নহে। গোবিন্দলালকে আবার সেই সিদ্ধান্ত জানাইতে চলিল। যাওয়ার পথে ইহা তাহার স্বগতোক্তি।

রোহিণী বিধবা। হিন্দুসমাজের প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী বিধবার প্রণয় পাপ। গোবিন্দলালকে ভালবাসিয়া তাহার ধর্ম গেল, সুখ গেল। এতদিন ব্রহ্মানন্দের সংসারে সে শান্তভাবে নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন করিতেছিল। কিন্তু গোবিন্দলালকে ভালবাসা অবধি সে সর্বদাই উদ্বিগ্ন। সে জানে এ রোগের চিকিৎসা নাই—মুক্তি নাই। তাহার হৃদয়ের অসহ্য প্রেমজ্বালায় সে অহরহ পুড়িয়া মরিতেছে। সেজন্য তাহার অসহ্য যন্ত্রণা। আবার এই যন্ত্রণা আছে বলিয়াই তাহার সুখ। রোহিণী পুরুষের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত। গোবিন্দলালের সহানুভূতি তাহাকে সেই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারিণী করিল। গোবিন্দলালকে সে ভালবাসিল। সে জানে তাহাকে পাওয়া সম্ভব নয়। তথাপি গোবিন্দলালকে দেখিয়াই তাহার সুখ। হরিদ্রাগ্রামে গোবিন্দলাল বাস করে। সেজন্য এই হরিদ্রাগ্রাম তাহার স্বর্গ। এই গ্রাম ছাড়িয়া গেলে সে গোবিন্দলালকে দেখিতে পাইবে না। অতএব গোবিন্দলালের মন্দির যে গ্রামে তাহা ছাড়িয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। পুরুষকে ভালবাসিতে না পারিয়া রোহিণীর জীবন অপূর্ণ ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহা পূর্ণ হইল। এই পূর্ণতাই সুখ। যন্ত্রণা ব্যতীত সামাজিক উপায়ে এই সুখ লাভ করা সম্ভব নয়। অবৈধ প্রণয়ের যন্ত্রণাও তাহার যেমন অসহ্য, তেমনই ইহাতে তাহার সুখও অনন্ত।

(১৪) সেই সময় ভ্রমর একটা লাঠি······ ···· ভ্রমরেরই কপালে লাগিল। [১ম খণ্ড, ষোড়শ পরিচ্ছেদ]

নিছক সহানুভূতি ও অনুকম্পার বশবর্তী হইয়া বারুণী পুষ্করিণীর জল হইতে নিমজ্জিতা রোহিণীকে বাঁচাইতে গিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর অধরের সহিত আপন অধর যুক্ত করায় প্রকারান্তরে রোহিণীর প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল এবং অনতিবিলম্বে তাহা যে তাহার দাম্পত্য জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিবে ইহা বঙ্কিমচন্দ্র একটি তুচ্ছ প্রাকৃতিক ঘটনার দ্বারা ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন।

গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ভ্রমরকে বলিয়াছিল, 'রোহিণী আমায় ভালবাসে।' ইহাতে ভ্রমর নিতান্ত কৌতুক পরবশ হইয়াই ঝি ক্ষীরিকে দিয়া বারুণী পুকুরে সন্ধ্যাবেলা গলায় কলসী বাঁধিয়া রোহিণীকে ডুবিয়া মরিবার পরামর্শ দিয়াছিল। রোহিণী সেই নির্দেশক্রমে সত্য সত্যই বারুণী পুকুরে

ডুবিয়া মরিতেছিল। গোবিন্দলাল নিছক মানবতার খাতিরেই রোহিণীকে বাঁচাইবার জন্য জল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজের বাগানবাড়ীতে আনিল এবং কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করিবার জন্য উড়ে মালীর বদলে নিজেই রোহিণীর 'পকবিম্বনিন্দিত, এখনও সুধা পরিপূর্ণ, মদনমদোন্মাদহলাহলকলসীতুল্য রাঙ্গা রাঙ্গা মধুর অধরে' আপন অধর সংযোগ করিয়া ফুঁ দিল। রোহিণীর সহিত ঘনিষ্ঠ দৈহিক সংযোগ এই প্রথম হইলেও ইহা হইতেই যে রোহিণীর দেহ-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা গোবিন্দলালের চিত্তে স্থান করিয়া লইয়া তাহার ও ভ্রমরের দাম্পত্য জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিবে তাহা স্থির হইয়া গেল। রোহিণীকে মরিবার পরামর্শ দিয়া দুর্ভাগ্যক্রমে ভ্রমরই তাহার দুর্ভাগ্যকে ডাকিয়া আনিল, ভ্রমরের কপাল ভাঙ্গিল।

ভ্রমরের এই দুরদৃষ্টের সূচনা শিল্পী বঙ্কিম একটি সামান্য প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্য দিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। মানুষের জীবনের বিপর্যয় বা বিপদ অনেক সময় বাহিরের ঘটনার মধ্যে পূর্বাহ্নেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে—ইংরেজীতে এইজন্য একটি প্রবাদ আছে 'Coming events cast their shadows ahead.'; মনস্তত্ত্বে ইহাকে "Prognostic' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই Prognostic-এ বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার প্রায় সকল উপন্যাসেই নায়ক বা নায়িকার দুর্ভাগ্যসূচক এই প্রকার অশুভচিহ্ন বা দুর্নিমিত্তের বিষয় অঙ্কন করিয়াছেন। ঠিক যে সময় গোবিন্দলাল সচেতনভাবে রোহিণীর অধরে অধর মিলাইল (যদিও তাহা রোহিণীর প্রাণ রক্ষারই জন্য) সেই মুহূর্ত হইতে গোবিন্দলালের চিত্তে রোহিণী-সম্ভোগ তৃষ্ণা জাগরিত হইল, যাহা ভ্রমরের দাম্পত্যজীবনকে অনতিবিলম্বে বিষময় করিয়া তুলিবে। বারুণী-পুষ্করিণীর তীরে যখন রোহিণীকে বাঁচাইয়া তোলা হইল, ঠিক সেই সময়ে কৃষ্ণকান্তের অন্দরমহলে ভ্রমরের হস্ত-নিক্ষিপ্ত লাঠি বিড়ালের গায়ে না লাগিয়া ভ্রমরের কপালে আঘাত করিল অর্থাৎ ভ্রমরের কপাল ভাঙ্গিল। রোহিণী যেন বিড়ালের মতো ভ্রমরের গোবিন্দলালরূপী প্রেমদুগ্ধকে অলক্ষ্যে উদরসাৎ করিবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু ভ্রমররূপী গৃহিণী সাবধান হইয়া সেই বিড়ালরূপী রোহিণীকে তাড়া করিল অর্থাৎ রোহিণীকে বারুণী পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিবার নির্দেশ দিয়াছিল। রোহিণী জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াও বাঁচিয়া উঠিল; তাহাতে তাহার প্রতি গোবিন্দলালের আসক্তি ষোল কলায় পূর্ণ হইল, যাহার ফলে ভ্রমরেরই সর্বনাশ হইল। এই উপন্যাসের অন্যত্রও

এরূপ একটি ঘটনা আছে। প্রসাদপুরের বাড়ীতে রোহিণীর মৃত্যুর পূর্বে যখন ওস্তাদের কাছে রোহিণী তবলা শিখিতেছিল তখন 'অকস্মাৎ রোহিণীর তবলা বেসুরা বলিল'—এই ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাহার আসন্ন ভয়াবহ পরিণতির প্রতিই লেখক পাঠককে সচেতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

(১৫) "পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে?" [প্রথম খণ্ড, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ]

জলমগ্ন রোহিণী যখন চৈতন্যলাভ করিল তখন গোবিন্দলাল তাহাকে বলিয়াছিল, আত্মহত্যা মহাপাপ। রোহিণী তাহার উত্তরে এই কথা বলিয়াছিল।

রোহিণী ছিল অপরূপ সুন্দরী। তাহার পরিপূর্ণ যৌবন। কিন্তু নিয়তির নির্মম বিধানে এবং সামাজিক সংস্কারে তাহাকে শুষ্ক কাঠের মত জীবন কাটাইতে হইবে; কারণ, সে বিধবা। কিন্তু রোহিণী তাহার এই অদৃষ্টকে সহজে স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। সে বুঝিতে পারে নাই—কোন্ পাপে তাহার এই নিয়তি। কোন্ পাপে সমাজে অন্য নারী হইতে তাহার এই দুর্ভোগ? তাহার পরিপূর্ণ যৌবন থাকিতেও তাহাকে কেন শুকাইয়া জীবন কাটাইতে হইবে? সে জানত কোন পাপ করে নাই। অথচ তাহার কপালে এই বৈধব্যের দুঃখ কেন? এই দুঃখকে অস্বীকার করিবার জন্য সে গোবিন্দলালকে ভালবাসিল। কিন্তু তাহাতেও অসহ্য যন্ত্রণা, অসহনীয় অপবাদ। মৃত্যু ছাড়া তাহার গতি নাই। সেজন্য সে বারুণীর জলে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল। গোবিন্দলাল তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিল। রোহিণীকে বলিল, আত্মহত্যা মহাপাপ। আত্মহত্যা করিলে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। রোহিণী গোবিন্দলালের এই কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠে। কারণ সে কোন পাপ না করিয়াই জীবনে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। পাপ করিলে তাহার অধিক আর কি হইবে? বেপরোয়া মনোবৃত্তির ফলেই রোহিণীর নিকট জীবন-মৃত্যু সমান বোধ হইয়াছিল এবং সে আত্মহত্যা করিয়া শান্তিলাভ করিতে চাহিল।

(১৬) যাহাকে ভালবাস তাহাকে............সূতা ছোট করিও।

[প্রথম খণ্ড, চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ]

রোহিণীকে ভুলিবার উদ্দেশ্যে মহাল পরিদর্শনের ছলে ভ্রমরের নিকট হইতে

গোবিন্দলালের দূরে সরিয়া যাওয়ায় যে কেবলমাত্র ভ্রমরের ক্ষতিই হইল তা নহে, পক্ষান্তরে তাহার এবং গোবিন্দলালের মধ্যে যে মানসিক ব্যবধান সৃষ্টি করিল তাহাই বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বলিতে চাহিয়াছেন।

অনিন্দ্যসুন্দরী বিধবা যুবতীকে বাঁচাইতে গিয়া তাহার দেহের অতি নিবিড় সান্নিধ্যে আসার পর হইতে গোবিন্দলালের চিত্তে রোহিণী আপন প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। গোবিন্দলাল রোহিণীর চিন্তা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত গ্রাম ছাড়িয়া দূরবর্তী মহাল পরিদর্শনে গমন করিলে বিরহখিন্না বালিকা বধূ ভ্রমরের মানসিক বেদনায় ক্ষীরি ঝি অহেতুক আঘাত করিয়া বসে। তাহাতে ভ্রমরের হস্তে যথেষ্ট নিগৃহীতা হইয়া ক্ষীরি অতঃপর গ্রামময় গোবিন্দলাল-রোহিণীর অবৈধ সম্পর্কের বিষয় রাষ্ট্র করিয়া দিল। কলঙ্ককাহিনী রোহিণীর কর্ণগোচর হইলে সেও ভ্রমরকে 'হাড়ে হাড়ে জ্বালাইবার' জন্ত একপ্রস্থ গিল্টিকরা গহনা ও কাপড় চোপড় দেখাইয়া অনুপস্থিত গোবিন্দলাল সম্পর্কে ভ্রমরের মনে বিরুদ্ধ ধারণা জন্মাইয়া দিল। সত্য মিথ্যা যাচাই না করিয়াই বালিকা ভ্রমর মনের আবেগে গোবিন্দলালকে পত্রে জানাইল, 'তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই' ইত্যাদি। এই পত্রের সঙ্গে গোবিন্দলাল ব্রহ্মানন্দলিখিত আরও একখানি পত্রে জানিল যে, গ্রামময় এই কলঙ্ককাহিনী রটনার মূলে স্বয়ং ভ্রমর। বস্তুতঃ গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মধ্যে স্থানিক দূরত্বই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এইপ্রকার ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ সৃষ্টি করিল। যদি গোবিন্দলালকে ভ্রমর ছাড়িয়া না দিত অথবা সে নিজেও গোবিন্দলালের সঙ্গে মহালে যাইত, তাহা হইলে এই সকল অনর্থ বা অমূলক অপবাদ সৃষ্টি হইবার কোনপ্রকার সম্ভাবনাই থাকিত না। প্রেমের ক্ষেত্রে দূরত্ব ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ সৃষ্টি করে এবং ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত একবার হইলে প্রেমের বন্ধন শিথিল হইতে থাকে। বাঁধন শক্ত করিতে হইলে যেমন অল্প সূতা দিয়া খুব শক্ত করিয়া বাঁধিতে হয়, তেমনি প্রেমের বন্ধন দৃঢ়তর করিতে হইলে প্রেমের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে স্থানগত দূরত্বের ব্যবধান কমাইতে হয়। বস্তুতঃ মন এমনই বস্তু যাহা একবার ভাঙিলে আর জোড়া লাগে না। গোবিন্দলাল দূরে থাকার জন্তই রোহিণীর সহিত তাহার কল্পিত সম্পর্কটি এত বিস্তৃত হইতে পারিল। ভ্রমরকেও প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইবার মতো কেহ ছিল না বা গোবিন্দলাল সম্পর্কে ভ্রমরের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনেরও কোন উপায় হইল না। উভয়েই পরস্পর হইতে দূরে থাকার জন্ত

গোবিন্দলালকে ভ্রমর যেরূপ ভুল বুঝিল, গোবিন্দলালও ভ্রমরকে ভুল বুঝিল এবং এই ভুলবোঝাবুঝি তাহাদের জীবনে আর কোনদিন দূর হইল না। দম্পতির এই মানসিক ব্যবধান যে দূর হইবার নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একটি উপমার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। প্রয়াগতীর্থে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। অতঃপর দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইবার সময়ে তিনটি নদীই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। গঙ্গা যুক্তবেণী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে আসিয়া মুক্তবেণী হইয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, আর যুক্তবেণী হয় নাই। এই উপমার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মধ্যে যে মানসিক বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহা তাহাদের জীবনে কোনদিন দূর হয় নাই—পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝিয়াই জীবন কাটাইয়াছে। ভ্রমর স্বামীর প্রতি নিদারুণ অভিমান লইয়া অকালে মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে এবং গোবিন্দলালও ভ্রমরের প্রতি অভিমান-বশতঃ শেষ পর্যন্ত সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া শান্তি পাইয়াছে।

(১৭) যা যায়, তা আর আসে না…………যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ? [প্রথম খণ্ড, চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ]

১৬নং ব্যাখ্যাটি লিখিলেই চলিবে।

(১৮) সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে। [প্রথম খণ্ড, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ]

গোবিন্দলাল যখন ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল তখন তাহার মনের অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে বঙ্কিমচন্দ্র এই উক্তি করিয়াছেন। পাড়া-প্রতিবাসীদের গোবিন্দলাল-রোহিণীর কুৎসা রটনায় গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরের বিশ্বাস টলিতেছিল। রোহিণীর কাছে গোবিন্দলালের প্রদত্ত শাড়ী ও গহনা দেখিয়া তাহা পূর্ণ হইল। ভ্রমর গোবিন্দলালকে অবিশ্বাস করিল। গোবিন্দলাল মহাল হইতে ফিরিতেছে শুনিয়া ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। গোবিন্দলাল এতটা আশা করে নাই। সে মনে মনে ভাবিল, "এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না।" সে ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিল। এইরূপে কয়েক দিন কাটিল। তথাপি ভ্রমর আসিল না। গোবিন্দলাল

মনে করিল, 'ভ্রমরের বড স্পর্ধা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাঁদাইব।" কিন্তু তাহা সহজে সম্ভব হইল না। এক-একবার শূন্য গৃহ দেখিয়া সে নিজেই কাঁদিতে লাগিল। তথাপি তাহার রাগ কমিল না। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাও সহজে সম্ভব নহে।

বর্তমান অতীত হয়। বর্তমানের সুখ চলিয়া যায় কিন্তু সহজে ভোলা যায় না। সুখ-দুঃখ স্থায়ী হয় না। কিন্তু সুখ-দুঃখ মেশানো যে জীবন তাহার স্মৃতি মানুষের মন হইতে দূর হয় না। একটা দুষ্ট ক্ষত চিকিৎসায় নিরাময় হয কিন্তু কখনও তাহা নিশ্চিহ্ন হয় না। তাহার দাগ থাকিয়া যায়। ভ্রমর চলিয়া গিয়াছে। গোবিন্দলালও তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ভ্রমরের সঙ্গে গোবিন্দলালের নয় বৎসরের বিবাহিত জীবনের যে মধুর স্মৃতি তাহাকে সহজে ভোলা সম্ভব নহে। মানুষ কালের আবর্তনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার নশ্বর দেহ শেষ হয়। কিন্তু তাহার যে কীর্তি তাহা ত নষ্ট হয় না। মানুষের মনেই তাহা বিরাজ করে। ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেও তাহার ফেলিয়া যাওয়া অনেক স্মৃতি গোবিন্দলালের চতুর্দিকে বিরাজ করিতেছে। ভ্রমরকে ভোলা সম্ভব হইলেও তাহার এই স্মৃতিকে ভোলা গোবিন্দলালের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না।

(১৯) সে সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে। কার্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছে। কে খাঁটি সোনায় দস্তায় খাদ মিশাইয়াছে—কে সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে। [প্রথম খণ্ড, সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ]

লাবণ্যময়ী ভ্রমর ও গোবিন্দলালের দাম্পত্য জীবনে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ আসন্ন। অথচ এই দুইটি জীবন ছিল প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ; ছিল মধুময়। রসবতী, যৌবনবতী বালবিধবা রোহিণীকে কেন্দ্র করিয়া অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ভিত্তিহীন গ্রাম্য কুৎসা রটনার প্রতিক্রিয়ায় এই প্রথম স্বামী স্ত্রীর মনে দেখা দিয়াছে ফাটল। মন চিড় খাইয়াছে। তাহার পর ভ্রমরের চরম অভিমানে পিত্রালয় গমন, গোবিন্দলালের অধিকতর আগ্রহে রোহিণীর সহিত মেলামেশা করার প্রচেষ্টা ও রোহিণী-চর্চা ও কৃষ্ণকান্তের শেষ উইলে গোবিন্দলালের পরিবর্তে ভ্রমরের নাম পত্তন, একটির পর একটি ঘটনা অপ্রতি-রোধ্য গতিতে সংঘটিত হইয়া দুইটি জীবনের মধ্যে এক বাধার প্রাচীর

গড়িয়া তুলিয়াছে। রচনা করিয়াছে এমন এক অনতিক্রম্য ব্যবধান যে, কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধোপলক্ষে আবার যদিও ভ্রমর-গোবিন্দলালকে একই বাড়ীতে একত্রে দেখা গিয়াছে, তথাপি তাহাদের সংক্ষিপ্ত আলাপ, চকিত গতিবিধি ও অনুযোগের পরিবর্তে বিরাগপূর্ণ আচরণ দেখিয়া উহাদের সেই পূর্বজীবন যে পুনায় ফিরিয়া আসিবে না, সেই ধারণাই দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছে।

ভ্রমর ও গোবিন্দলালের দাম্পত্য জীবনের এই বিকৃতিকেই এখানে পর পর চারটি উপমায় কবি বঙ্কিম ব্যক্ত করিয়াছেন। উহাদের পবিত্র দাম্পত্য জীবনটি যে কত মমতামাখা, প্রযুক্ত উপমাচতুষ্টয়ে তাহার সুন্দর পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই মধুময় দাম্পত্য জীবনকে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের কখনও শুধু পূর্ণিমা কখনও-বা রাস পূর্ণিমা, কখনও খাঁটি সোনা, কখনও-বা সুর-বাঁধা বীণাযন্ত্রের মতই মনে হইয়াছে।

পূর্ণিমার শোভা যদি ঢাকিয়া যায় তামসী মেঘে, কার্তিক মাসের রাকায় অর্থাৎ রাস পূর্ণিমার চাঁদে লাগিয়া যায় গ্রহণ এবং তাহাতে যদি সব সৌন্দর্য হয় বিনষ্ট, অথবা খাঁটি সোনায় যদি দস্তার খাদ মিশ্রিত হয় বা যে বীণার তারগুলি সুমধুর সঙ্গীতের সুরোপযোগী করিয়া বাঁধা তাহার তার হঠাৎ যদি কাটিয়া যায়, তবে যে বিকৃতি ও ব্যর্থতা ঘটে, যে নৈরাশ্যের অন্ধকার সঞ্চারিত হয়, যে বিষাদের কারণ দেখা দেয়, ভ্রমর-গোবিন্দলালের মধুর দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরায় সেইরূপ বিপর্যয় ও নৈরাশ্য এবং বিষাদের কারণ দেখা দিয়াছে।

(২০) সাধুকে চোর বলিতে বলিতে চোর হয়।

[প্রথম খণ্ড, উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ]।

গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিবার সংকল্প জানাইল। তাহার পর গোবিন্দলালের হৃদয়ে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তাহারই পরিচয় দিতেছেন। মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ে সুমতি এবং কুমতি বাস করে। সুমতি হইল দেবকন্যা আর কুমতি রাক্ষসী। সুমতি মানুষকে সুপথে চালিত করে আর কুমতি কুপথে। কোন কাজের পূর্বেই মনুষ্য হৃদয়ে এই সুমতি এবং কুমতির দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। গোবিন্দলালের হৃদয়েও সেই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। গোবিন্দলাল মনে মনে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, ভ্রমরের কি অপরাধ? ভ্রমর তাহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে কঠিন পত্র লিখিয়াছিল—

একবার তাহাকে সত্য-মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিল না, এই তাহার অপরাধ। কুমতি-সুমতি এই অপরাধের কথাই বলিয়াছে। ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া যাওয়ায় গোবিন্দলালও তাহার প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়াছে। ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যাহার সঙ্গে নয় বৎসর একত্রে বসবাস করিয়াছে, যাহার সঙ্গে সুখ-দুঃখের অনেক স্মৃতি বিজড়িত, তাহাকে ভুলিব বলিলেই ভোলা যায় না। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ভুলিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারে নাই। অবশেষে ঠিক করিল ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায় হইল রোহিণীর চিন্তা। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ছাড়িয়া রোহিণীকে ধ্যান করিতে লাগিল। সুমতি বলিল, গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করিতেছে, ভ্রমর তাহাই সন্দেহ করিয়াছিল। এই কি তাহার দোষ? কুমতি বলিল, এখন গোবিন্দলাল দোষী বটে, কারণ এখন রোহিণীই তাহার আশ্রয়; কিন্তু ভ্রমর যখন সন্দেহ করিয়াছিল তখন গোবিন্দলাল ছিল নির্দোষ। ভ্রমর তাহাকে সন্দেহ করিয়া দোষী মনে করিতে করিতে গোবিন্দলাল দোষী হইয়াছে। কোন সাধু লোককে সর্বদা চোর বলিলে সেও তাহার ধর্ম-পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং চোর হয়। তেমনি গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রণয়াসক্তির কথা জানিয়াও তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিল। রোহিণীর প্রণয়কে কখনও প্রশ্রয় দেয় নাই, বরং তাহাকে ভুলিবার জন্য জমিদারি পরিদর্শনের অছিলায় দূরে চলিয়া গেল। নিয়তির চক্রজালে তাহার বিপরীত ফল ফলিল। ভ্রমরই তাহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেল, আর গোবিন্দলাল শেষ পর্যন্ত রোহিণীকে আশ্রয় করিল।

(২১) অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল।

[দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ]

আলোচ্য অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণকান্ত রায়ের শ্রাদ্ধশান্তি অন্তে বিনা অপরাধে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর এক বৎসর কাটিয়া গেলে ভ্রমরের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইল, আলোচ্য অংশে লেখক তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

পূর্ণ এক বৎসর কাল স্বামীর অদর্শনে বিরহবিধুরা ভ্রমরের মানসিক বেদনা অবশেষে শারীরিক পীড়ায় প্রকাশ পাইল এবং শেষ পর্যন্ত ভ্রমরকে রোগশয্যা গ্রহণ করিতে হইল। বিশেষ কোন রূপ বা সুন্দর গন্ধ না থাকিলেও

ফুলের মধ্যে অপরাজিতাকে গণ্য না করিয়া পারা যায় না। সেই ফুল মানুষের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতে পারে না বটে, কিন্তু দেব-পূজার বিশেষ উপকরণ হিসাবে তাহার কৌলীন্যকে স্বীকার করিতে হয়। এই ফুলের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা ক্ষণস্থায়ী নহে, রৌদ্রবৃষ্টি সহ্য করিয়া দীর্ঘদিন টিকিয়া থাকিয়া অবশেষে শুকাইতে সুরু করে। ভ্রমরও যেন গোবিন্দলালের পূজার্থেই দীর্ঘদিন সতেজ ছিল। অদৃষ্টের নির্যাতন, সদ্যপ্রসূত পুত্রের মৃত্যু, স্বামীর অবহেলা—কোন কিছুই তাহাকে শুকাইয়া ফেলিতে পারে নাই। গোবিন্দলাল কর্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থাতে পূর্ণ একবৎসর সে সত্যই 'অপরাজিতা' ছিল, কোন কিছুই তাহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই। কিন্তু সকল কিছুরই সীমা আছে—কালের চক্র এক বৎসরের পথ পরিক্রমা শেষ করিয়া যখন দ্বিতীয় বর্ষে পড়িল, তখন সত্য সত্যই ভ্রমর ভাঙ্গিয়া পড়িল—মানসিক ও শারীরিক বিপর্যয় তাহাকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিল। দীর্ঘদিন প্রতিকূল অবস্থায় শরীর ও মনের দিবারাত্র সংগ্রামের শেষে যখন ভ্রমর শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল তখন তাহার পুনরায় বাঁচিয়া সুস্থ হইয়া উঠিবার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না, এই শয্যাই তাহার শেষ শয্যা হইল, ইহাই লেখক এখানে ইঙ্গিত করিতে চাহিয়াছেন।

ভ্রমরকে 'অপরাজিতা ফুলে'র সহিত তুলনা করিবার বিশেষ কারণ আছে। অপরাজিতা ফুলের এমন চটকদার রং নাই যাহা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। ভ্রমর লাবণ্যবতী হইলেও তাহার গাত্রবর্ণ কালো, সুতরাং পুরুষের মোহ বা চাঞ্চল্য জাগ্রত করিবার মতো সৌন্দর্য তাহার ছিল না। অপরাজিতা ফুলের গুণ অর্থাৎ গন্ধ নাই কিন্তু ভ্রমরের গুণ ছিল, তাহার চরিত্রে মাধুর্যের সহিত দৃঢ়তা ও অকপট বিশ্বাস সম্মিলিত ভাবে বিরাজমান ছিল। সুতরাং তাহাকে অপরাজিতা ফুলের সহিত সম্পূর্ণরূপে তুলনা করা যায় না।

(২২) যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়……না বলিলে নয়, তাহাই বলিব।

[দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ]।

আলোচ্য অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে লওয়া হইয়াছে। সাহিত্য সৃষ্টিতে কোন্ আদর্শ

বঙ্কিমচন্দ্র অনুসরণ করিতেন লেখকের এই মন্তব্যের মধ্য দিয়া প্রকারান্তরে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া এবং চুনীলাল দত্ত নাম লইয়া গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া প্রসাদপুর কুঠিবাড়ীতে দুই বৎসর ধরিয়া যে জীবন কাটাইতেছে তাহার মধ্যে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ কিছু নাই, তাহা ব্যভিচার ভিন্ন আর কিছু নহে। নীতিবিদ্ বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলাল-রোহিণীর এই পাপপূর্ণ ব্যভিচারী জীবনের সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করিতে চাহেন নাই। পাপের চিত্র, অসামাজিক উদ্দাম পঙ্কিল ভোগ জীবনের চিত্র লোভনীয় বা সুরস করিয়া বর্ণনা করিবার আদৌ কোন ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তবে যেটুকু বর্ণনা না করিলে রোহিণী-গোবিন্দলালের কলুষিত পঙ্কিল জীবনের কিছুমাত্র জানা যাইবে না অথবা উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের পরিণতির বিষয় বুঝিতে পাঠকদের অসুবিধা হইবে, ততটুকুই মাত্র তিনি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ গোবিন্দলাল দুই বৎসর ধরিয়া রোহিণীকে লইয়া যে উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী জীবন-যাপন করিতেছে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই, তবে দুই বৎসর পরে প্রসাদপুরের বাড়ির যবনিকা উত্তোলন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এক ঘরে রোহিণী ওস্তাদের কাছে গানবাজনা শিক্ষা করিতেছে এবং অন্য ঘরে চেয়ারে বসিয়া গোবিন্দলাল বই পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। এই সামান্য চিত্রটির মধ্যে যে অসামান্য ব্যঞ্জনা, বহু অকথিত ইতিহাস রহিয়াছে তাহা কল্পনাপ্রবণ পাঠকদের বুঝিয়া লইতে অসুবিধা হয় না। পাঠকদের বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, উদ্দাম পঙ্কিল জীবনযাপনের পর অবসাদ আসিয়াছে, রোহিণী-সম্পর্কে গোবিন্দলালের কণজ মোহে ভাঁটা পড়িয়াছে—সেইজন্য তাহারা দুইজনে দুইঘরে বিভিন্নভাবে সময় কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

প্রত্যেক শিল্পী বা সাহিত্যিকেরই নিজস্ব রুচি, মতবাদ বা আদর্শ থাকে, এবং শিল্প রূপায়ণে তিনি সেই রুচি বা আদর্শ দ্বারা চালিত হইয়া থাকেন। তবে লক্ষ্য করিতে হয় যে, আদর্শ উপস্থাপনার প্রচেষ্টা যেন বক্তব্য বা চরিত্র, এককথায় শিল্পবস্তুর রস-পরিণতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করে। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রেরও বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বলিয়াছেন, "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্যই লিখিবেন।" অপরস্থানে

ফুলের মধ্যে অপরাজিতাকে গণ্য না করিয়া পারা যায় না। সেই ফুল মানুষের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতে পারে না বটে, কিন্তু দেব-পূজার বিশেষ উপকরণ হিসাবে তাহার কৌলীন্যকে স্বীকার করিতে হয়। এই ফুলের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা ক্ষণস্থায়ী নহে, রৌদ্রবৃষ্টি সহ্য করিয়া দীর্ঘদিন টিকিয়া থাকিয়া অবশেষে শুকাইতে সুরু করে। ভ্রমরও যেন গোবিন্দলা'লের পূজার্থেই দীর্ঘদিন সতেজ ছিল। অদৃষ্টের নির্যাতন, সদ্যপ্রসূত পুত্রের মৃত্যু, স্বামীর অবহেলা—কোন কিছুই তাহাকে শুকাইয়া ফেলিতে পারে নাই। গোবিন্দলাল কর্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থাতে পূর্ণ একবৎসর সে সত্যই 'অপরাজিতা' ছিল, কোন কিছুই তাহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই। কিন্তু সকল কিছুরই সীমা আছে—কালের চক্র এক বৎসরের পথ পরিক্রমা শেষ করিয়া যখন দ্বিতীয় বর্ষে পড়িল, তখন সত্য সত্যই ভ্রমর ভাঙিয়া পড়িল—মানসিক ও শারীরিক বিপর্যয় তাহাকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিল। দীর্ঘদিন প্রতিকূল অবস্থায় শরীর ও মনের দিবারাত্র সংগ্রামের শেষে যখন ভ্রমর শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল তখন তাহার পুনরায় বাঁচিয়া সুস্থ হইয়া উঠিবার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না; এই শয্যাই তাহার শেষ শয্যা হইল, ইহাই লেখক এখানে ইঙ্গিত করিতে চাহিয়াছেন।

ভ্রমরকে 'অপরাজিতা ফুলে'র সহিত তুলনা করিবার বিশেষ কারণ আছে। অপরাজিতা ফুলের এমন চটকদার রং নাই যাহা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। ভ্রমর লাবণ্যবতী হইলেও তাহার গাত্রবর্ণ কালো, সুতরাং পুরুষের মোহ বা চাঞ্চল্য জাগ্রত করিবার মতো সৌন্দর্য তাহার ছিল না। অপরাজিতা ফুলের গুণ অর্থাৎ গন্ধ নাই কিন্তু ভ্রমরের গুণ ছিল, তাহার চরিত্রে মাধুর্যের সহিত দৃঢ়তা ও অকপট বিশ্বাস সম্মিলিত ভাবে বিরাজমান ছিল। সুতরাং তাহাকে অপরাজিতা ফুলের সহিত সম্পূর্ণরূপে তুলনা করা যায় না।

(২২) যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়……না বলিলে নয়, তাহাই বলিব।
[দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ]।

আলোচ্য অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে লওয়া হইয়াছে। সাহিত্য সৃষ্টিতে কোন্ আদর্শ

বঙ্কিমচন্দ্র অনুসরণ করিতেন লেখকের এই মন্তব্যের মধ্য দিয়া প্রকারান্তরে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া এবং চুনীলাল দত্ত নাম লইয়া গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া প্রসাদপুর কুঠিবাড়ীতে দুই বৎসর ধরিয়া যে জীবন কাটাইতেছে তাহার মধ্যে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ কিছু নাই, তাহা ব্যভিচার ভিন্ন আর কিছু নহে। নীতিবিদ্ বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলাল রোহিণীর এই পাপপূর্ণ ব্যভিচারী জীবনের সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করিতে চাহেন নাই। পাপের চিত্র, অসামাজিক উদ্দাম পঙ্কিল ভোগ জীবনের চিত্র লোভনীয় বা সুরস করিয়া বর্ণনা করিবার আদৌ কোন ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তবে যেটুকু বর্ণনা না করিলে রোহিণী-গোবিন্দলালের কলুষিত পঙ্কিল জীবনের কিছুমাত্র জানা যাইবে না অথবা উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের পরিণতির বিষয় বুঝিতে পাঠকদের অসুবিধা হইবে, ততটুকুই মাত্র তিনি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ গোবিন্দলাল দুই বৎসর ধরিয়া রোহিণীকে লইয়া যে উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী জীবন-যাপন করিতেছে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই, তবে দুই বৎসর পরে প্রসাদপুরের বাড়ির যবনিকা উত্তোলন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এক ঘরে রোহিণী ওস্তাদের কাছে গানবাজনা শিক্ষা করিতেছে এবং অন্য ঘরে চেয়ারে বসিয়া গোবিন্দলাল বই পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। এই সামান্য চিত্রটির মধ্যে যে অসামান্য ব্যঞ্জনা, বহু অকথিত ইতিহাস রহিয়াছে তাহা কল্পনাপ্রবণ পাঠকদের বুঝিয়া লইতে অসুবিধা হয় না। পাঠকদের বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, উদ্দাম পঙ্কিল জীবনযাপনের পর অবসাদ আসিয়াছে, রোহিণী-সম্পর্কে গোবিন্দলালের রূপজ মোহে ভাঁটা পড়িয়াছে—সেইজন্য তাহারা দুইজনে দুইঘরে বিভিন্নভাবে সময় কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

প্রত্যেক শিল্পী বা সাহিত্যিকেরই নিজস্ব রুচি, মতবাদ বা আদর্শ থাকে, এবং শিল্প রূপায়ণে তিনি সেই রুচি বা আদর্শ দ্বারা চালিত হইয়া থাকেন। তবে লক্ষ্য করিতে হয় যে, আদর্শ উপস্থাপনার প্রচেষ্টা যেন বক্তব্য বা চরিত্র, এককথায় শিল্পবস্তুর রস-পরিণতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করে। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রেরও বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বলিয়াছেন, "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্যই লিখিবেন।" অপরস্থানে

তিনি আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ-সাধন, চিত্তশুদ্ধি-জনন। কবিরা···সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতে চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।" সন্দেহ নাই যে বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র সাহিত্যের জন্য সাহিত্য অর্থাৎ art for art's sake, আধুনিককালের এই মতবাদে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না; সাহিত্যের মধ্য দিয়া জনমানসের চিত্তশুদ্ধির জন্যই তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। উপন্যাসের প্রথম অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত শিল্পীর পরিচয় রহিয়াছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও বিচিত্র পরিবেষ্টনের মধ্যে দিয়া একদিকে তিনি যেমন বালবিধবা রোহিণীর চিত্তে পুরুষের আসঙ্গলিপ্সা জাগাইয়া তুলিয়াছেন, অপরদিকে গোবিন্দলালের মনেও রোহিণীর প্রতি কামনাকে উদ্রিক্ত করিয়া দিয়াছেন। এবং উপন্যাসের এই অংশে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যাহা মানুষের কর্ম, অর্থাৎ শরীর বাক্য ও মনের আবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়া সংঘটিত হইয়া উঠে নাই। বিশেষ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিণী প্রভৃতি বৃত্তি-প্রবৃত্তির ঘূর্ণিপাকে যে-কাহিনী সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র যেন দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করিয়া তাহা কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশে কেন যে গোবিন্দলাল রোহিণীর উপরে বিরক্ত হইয়া উঠিল, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করিল, কেন যে রোহিণী গোবিন্দলালকে নিবিড়ভাবে পাইয়াও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া নিশাকরের জন্য অভিসারে বাহির হইল, তাহার ঘটনামুখী বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্দ্র দেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যদি গোবিন্দ-লাল-রোহিণী সম্পর্কের চিত্র ধীরে ধীরে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে— পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপযুক্ত রূপায়ণের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিতেন এবং তাহার মধ্যে দিয়া গোবিন্দলালের রূপজ মোহ কাটিয়া যাইতেছে দেখাইতেন তাহা হইলে পাঠকমন প্রস্তুত হইতে পারিত যে, গোবিন্দলালের জীবনে রোহিণীর প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। অপরদিকে যদি দেখিতে পাওয়া যাইত যে, রোহিণী গোবিন্দলালকে সমস্ত সত্তা দিয়া ভালবাসিয়াও তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছে না, ফলে সে তাহার অতৃপ্ত কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য অপর পুরুষের সঙ্গ কামনা করিতেছে, তাহা হইলে রোহিণীর নিশাকরের প্রতি আকর্ষণকে স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইত। কিন্তু

গোবিন্দলাল-রোহিণীর কলুষিত সম্পর্ককে নীতিবিদ্ বঙ্কিম আদৌ পছন্দ করেন নাই, তাই এই ক্লেদাক্ত জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তিনি করেন নাই। রোহিণীর অধঃপতন ও পুরুষ-সঙ্গলিপ্সার অতৃপ্তির চিত্র আরও প্রত্যক্ষভাবে অঙ্কন করিয়া পাঠককে রোহিণীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পর্কে প্রস্তুত করিয়া রাখেন নাই, পরন্তু নীতিকে বজায় রাখিতে গিয়া তিনি রোহিণীকে গুলি করিয়া হত্যা করাইয়াছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের এই অংশ সম্পর্কে পরবর্তীকালে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তীব্র সমালোচনা উপস্থিত করেন। শরৎচন্দ্রের মতে বঙ্কিমচন্দ্র নীতি বা আদর্শকে রক্ষা করিতে গিয়া আর্টের গলা টিপিয়া মারিয়াছেন।

(২৩) **কেন যে কাঁদিল............বোধ হয় দুইই।**

[দ্বিতীয় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

আলোচ্য অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে লওয়া হইয়াছে। ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া দুই বৎসরের উপর গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া প্রসাদপুরে যে ক্লেদাক্ত জীবন যাপন করিতেছিল, তখন একদা নিশাকর মারফত ভ্রমরের সংবাদ শুনিয়া গোবিন্দলাল কেন ক্রন্দন করিল, আলোচ্য অংশে লেখক তাহা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ভ্রমরের পিতা কূটবুদ্ধি মাধবীনাথ যে বিশেষ উদ্দেশ্যে নিশাকরকে গোবিন্দলালের নিকট পাঠাইয়াছেন, ইহা বুঝিবার মতো মানসিক অবস্থা গোবিন্দলালের ছিল না। দুই বৎসরের উপর রোহিণীর সহিত নির্জন প্রসাদপুরের কুঠিতে গোবিন্দলাল যে ক্লেদাক্ত জীবন যাপন করিতেছিল তাহার প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে। লেখক সেই পাপপঙ্কিল জীবনের যে সামান্য চিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, রোহিণী একটি ঘরে ওস্তাদ দানেশ খাঁর নিকট গীতবাদ্য শিখিবার চেষ্টা করিতেছে এবং পার্শ্ববর্তী ঘরে গোবিন্দলাল চেয়ারে বসিয়া নভেল পড়িবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু উভয়ের কেহই স্ব স্ব কার্যে নিবিষ্ট মনোযোগ দিতে পারিতেছে না। ইহা যে উভয়ের মানসিক অস্থিরতার সূচক তাহা বলাই বাহুল্য। ঠিক এইরূপ সময়ে নিশাকর আসিয়া গোবিন্দলালকে ভ্রমরের কথা জানাইয়া বলিল যে, ভ্রমর নিশাকরকে তাহার সম্পত্তি পত্তনি দিতে চায়, সেক্ষেত্রে ভ্রমর গোবিন্দলালের অনুমতি ভিক্ষা করিয়াছে। রোহিণী সম্পর্কে গোবিন্দলালের অবচেতন মনে

প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়া গিয়াছিল। গোবিন্দলাল বুঝিয়াছিল যে, রোহিণীর রূপ অমৃত নহে, তাহাতে তৃপ্তি নাই; তাহা গরলের মতো তাহার সমস্ত দেহমনকে জর্জরিত করিয়া দিতেছে। গোবিন্দলাল নিছক ভাবপ্রবণ ছিল না, তাহার বিচার বিবেচনা বা পৌরুষও ছিল। রোহিণীর প্রতি তাহার রূপজ মোহ সম্বন্ধে সচেতন হইতে থাকিলেও সেই মোহবন্ধন সহজে ছিন্ন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ভ্রমরের প্রেম যে চিরতৃপ্তিদায়িনী ও অমৃত-তুল্য, ইহাও সে বুঝিতে পারিতেছিল, কিন্তু ইহাও সে বুঝিত, যে জীবন সে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে বাছিয়া লইয়াছে, তাহা হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই। সেই-জন্যই সে যেন জোর করিয়া ভ্রমরের কথা ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিত এবং সেইজন্যই সে যেন দিবারাত্র রোহিণীকে লইয়া পাপপঙ্কিল জীবনে ডুবিয়া থাকিবার চেষ্টা করিত। গোবিন্দলালের এই প্রকার মানসিক অবস্থাতেই নিশাকর মারফত ভ্রমরের নাম গোবিন্দলালের স্মৃতিতে আগুন জ্বালিয়া দিল। জোর করিয়া যাহাকে সে ভুলিয়া থাকিতে চাহিয়াছিল, সে যে তাহার চিত্তের কতবড় অংশ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, গোবিন্দলালের তাহা জানা ছিল না। এতদিনের সকল প্রচেষ্টা মুহূর্তে ধ্বসিয়া পড়িয়া তাহার সত্যকার অবস্থাটিকে নগ্নভাবে তাহার সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিল। শয়নকক্ষে গিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া খাটে বসিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দলালের এই কান্না কিসের জন্য? লেখক বলিতে চাহিয়াছেন যে, নিজের জন্যও হইতে পারে, আবার ভ্রমরের জন্যও হইতে পারে। নিজের জন্য এই কারণে যে, যে অমৃত ফেলিয়া সে বিষ লইয়া তাহাতেই ডুবিয়া থাকিবার চেষ্টা গত দুই বৎসর যাবৎ করিয়া আসিতেছে তাহা যে কতবড় আত্মপ্রবঞ্চনা তাহা নিশাকরের আগমন ও ভ্রমরের উল্লেখে হঠাৎ সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। নিজেকে নিজে প্রবঞ্চনার এই মূঢ়তায় তাহার চিত্ত বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাই নিজের জন্য সে হয়ত কাঁদিয়াছে। আবার সতী ভ্রমরকে যে অহেতুক বেদনা দিয়াছে তাহার সেই পবিত্র ভালবাসার কথা মনে করিয়া আজ তাহার চোখে জল আসিল।

(২৪) বাঘ গরু মারে,—সকল গরু খায় না। স্ত্রীলোকে পুরুষকে জয় করে কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য।

[দ্বিতীয় খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ]

প্রসাদপুরের বিলাস-কুঠিতে রোহিণী গোবিন্দলালের সঙ্গে সুখেই বসবাস

করিতেছিল। সেখানে একদিন ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথের বন্ধু নিশাকর দাসের আবির্ভাব হইল। নিশাকর গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়া পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতেছিল। সেখানে নিশাকর উর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া পরমাসুন্দরী রোহিণীকে দেখিতে পাইল। রোহিণীও নিশাকরকে দেখিল। তারপর রোহিণীর মানসিক অবস্থাই বঙ্কিমচন্দ্র এই উক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন।

নিশাকরের বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে রোহিণীর বড়লোক বলিয়া মনে হইল। দেখিতেও নিশাকর সুপুরুষ। গোবিন্দলালের সঙ্গে রোহিণী তাহার তুলনা করিতে লাগিল। গোবিন্দলালের রঙ ফরসা—কিন্তু এর মুখ-চোখ ভাল। নিশাকরের সঙ্গে তাহার চোখাচোখি হইল। নিশাকরকে মনুষ্যমধ্যে একজন প্রধান বিবেচনা করিয়া রোহিণীর মন তাহার দিকে ধাবিত হইল। সে মনে মনে সংকল্প করিল, গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না। গোবিন্দলালের প্রতি তাহার বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই নিশাকরের সঙ্গে একটু প্রেমালাপ করিতে দোষ কি? আসলে সুপুরুষ এবং বড়লোক দেখিয়া রোহিণীর জিগীষা-বৃত্তির উদয় হইয়াছিল। জেয় পুরুষ দেখিয়া তাহাকে জয় করিবার কামনা রোহিণীর মনে প্রবল হইল। শিকারী যেমন শিকার দেখিলেই চঞ্চল হয়, তেমনি রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইহা যেন রোহিণীর শিকার-বিলাস। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, নিশাকরের প্রতি রোহিণীর এই আকর্ষণ কামনা-বাসনা-সঞ্জাত ছিল না। নিশাকরকে নিছক জয় করিবার ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া রোহিণীর মন নিশাকরের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। নারীর এই শিকার বৃত্তি সম্বন্ধে Byron লিখিয়াছেন—

> "In her first passion woman loves her lover,
> In all the others all she loves is love.
> * * *
> One man alone at first her heart can move,
> She then prefers him in the plural number,
> Not finding that the additions much encumber."
> "প্রথম আবেগে নারী ভালবাসে প্রণয়ীরে তার;
> তা'র পরে ভালবাসে আপনার প্রণয়ে কেবল;
> তাই সে বহুরে চাহে—একে তার তুষ্টি নাহি আর—
> বহুতে হৃদয় তা'র নাহি হয় বিব্রত-চঞ্চল।"

বঙ্কিমচন্দ্রও এই মতের অনুবর্তী হইয়াই রোহিণী-চিত্তের দোদুল্যমান অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৫) এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিশ্বাসনির্গত হলাহল, ধন্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে।

[দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ]

রূপবতী রোহিণীর মৃত্যুর বহু পরে ভ্রমরের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। এখন লেখক তাঁহার নায়কের কৃতকর্মের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নায়ক গোবিন্দলাল যে দুই নারীতে মন সমর্পণ করিয়াছিল তাহারা উভয়েই মৃত্যুবরণ করিয়াছে। তাহার নিকট সেই দুইয়ের মধ্যে যে কত পার্থক্য ছিল, এই অংশে তাহাই বিশ্লেষণ করিবার প্রবণতা স্পষ্ট।

প্রবল রূপতৃষ্ণার তাড়নায় গোবিন্দলাল আসক্ত হইল বিধবা রোহিণীতে। কিন্তু তাহার নিকট সে পাইয়াছে লালসাতৃপ্তি ও ইন্দ্রিয়সম্ভোগ। ভ্রমরের সাহচর্যে যে মনের সুখ তাহা পায় নাই। ভ্রমরের প্রেম সুধাবর্ষণ করিয়াছে। রোহিণীর প্রেমে আছে বিষক্রিয়া। দুরন্ত পিপাসায় ও কামনার তাড়নায় নীতিধর্ম-আদর্শের বিরুদ্ধতা করিয়াই রোহিণীর সঙ্গসুখ ভোগ করিতে হইয়াছে। ইহাতে ভোগের প্রমত্ততাই দেখা দিয়াছে, উঠিয়াছে হলাহল। বঙ্কিম এই হলাহলকে সমুদ্রমন্থনজাত হলাহলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সমুদ্রমন্থনের সময় দেখা দেয় সংঘর্ষ—মন্থনদণ্ড মন্দার-পর্বতে ও মন্থনরজ্জু বাসুকী নাগে, এবং উত্তেজিত লাঞ্ছিত বাসুকির ক্রুদ্ধতপ্ত নিঃশ্বাস হইতে ঐ সংঘর্ষ-জাত বিষ উত্থিত হয়। নীতি, আদর্শ, ধর্ম অগ্রাহ্য করিয়া পাপের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া গোবিন্দলাল সুখলাভ করিতে গিয়া অন্তরবিনাশী গরলই লাভ করিয়াছে। অপরপক্ষে, না চাহিতেই ভ্রমর যে তাহার অকলঙ্ক কুসুম কোমল অন্তরের সমস্ত প্রেম-প্রীতি উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে, তাহাতে যেন স্বর্গের সর্বব্যাধি নিবারক ধন্বন্তরির ভাণ্ড হইতে স্বতঃই ঝরিয়া পড়িয়াছে সঞ্জীবনীসুধা। রোহিণীর প্রেমে গরল ও ভ্রমরের প্রেমে অমৃত।

[বিশেষ বক্তব্য : ঔপন্যাসিক বঙ্কিম রোহিণী ও ভ্রমরের প্রেম লইয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন, বলা বাহুল্য, তাহা আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের বৈধ প্রেম ও অবৈধ প্রেমের বিচারমূলক অভিমত।]

CLASS NOTE

GLASS NOTE

সংকলন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ সাধারণ ভূমিকা : গদ্যের রূপ ও স্বরূপ ॥

বিশ্বের ভাষাগুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা—ইংরেজী। ইংরেজী ভাষা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সাহিত্যের বিচিত্রসুন্দর রূপগঠনে সফল হইয়াছে। এই সফল-সাহিত্যের রূপ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমালোচক বনামি ডব্রে গদ্যকে স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ;প্রথম —Descriptive Prose বা বর্ণনামূলক গদ্য—বিষয়বস্তুর প্রাঞ্জল, পরিচ্ছন্ন বর্ণনা, বিবৃতি বা উপস্থাপনাই এই শ্রেণীর রচনার প্রধান লক্ষ্য ; দ্বিতীয় Explanatory Prose বা ব্যাখ্যামূলক গদ্য। ইহাতে কোনও কিছুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইত্যাদিই দেখা যায় ; তৃতীয়—Emotive Prose বা আবেগধর্মী গদ্য। বিষয়বস্তুর বর্ণনা অথবা বিশ্লেষণ নয়, লেখকের আবেগ-অনুভূতির রূপায়ণে এই জাতীয় সৃজনমূলক রচনা পাঠকের হৃদয়ের আনন্দের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। গদ্য রচনাভঙ্গি সম্বন্ধে মিড্‌লটন মারে যাহা বলিয়াছেন তাহাও এই প্রসংগে স্মরণীয় : কোথাও কোথাও গদ্য-রচনা-ভঙ্গি লেখকের ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অভিজ্ঞান ; তাহাদের রচনায় তাঁহাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এমন এক অনন্য ছাপ থাকে যে, তাহাকে সহজেই অন্যান্য রচনা হইতে পৃথক ভাবে চিনিতে পারা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাভঙ্গি হইল নিছক technique of expression বা প্রকাশ-কৌশল মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের মত সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী লেখকের সর্ববিধ গদ্য-রচনায়ই কোনও না কোনও ভাবে সৃষ্টির লাবণ্য ফুটিয়া ওঠে ; অত্যন্ত নীরস শুষ্ক বিষয়বস্তুও তাঁহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া পাঠকের চিন্তাকে আলোড়িত করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুভূতিকেও স্পর্শ করে। সার্থক গদ্য রচনাভঙ্গি সম্বন্ধে বনামি ডব্রে বলিয়াছেন, আমরা ইহাতে

লেখকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই : 'Whenever we read a book, we are aware of a voice. It is as though someone had been speaking to us, telling us something or working upon our feelings. It is the voice which we roughly call style, and however much a writer may ignore his personality, even seek to conceal it, he cannot disguise his voice, his style.' গদ্যরচনার এই বৈশিষ্ট্যের পটভূমিকায় আমরা এইবার রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার আলোচনায় অগ্রসর হইতে পারি।

সংকলনের নির্বাচিত প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা,' 'লোকসাহিত্য,' 'পঞ্চভূত' এবং 'বিচিত্র প্রবন্ধ' হইতে সংগৃহীত। সুতরাং এই প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটিভাবে উদাহৃত হইয়াছে বলা যায়।

॥ বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের ধারা : রবীন্দ্রনাথ ॥

রামমোহন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় আমরা বুঝিতে পারি, বিষয়বস্তুর প্রাধান্য হইতে প্রবন্ধ ক্রমশঃ সাহিত্য সৃষ্টির লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। রচনাশৈলীতে লেখকের ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম যুগে বিষয়বস্তুর প্রকাশ ও বক্তব্যের প্রতিষ্ঠাই প্রাবন্ধিকদের মুখ্য লক্ষ্য ছিল। প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিয়া নিজের চিন্তাকে যুক্তির শৃংখলায় উপস্থাপিত করিবার জন্যই রামমোহন প্রবন্ধ রচনায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মসৃণ তীক্ষ্ণ রচনাভঙ্গিতে যে তাঁহার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব আভাসিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই অনুভব করা যায়। পরবর্তীকালের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের শুষ্ক তত্ত্ব ও তথ্যসমূহকেও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিবার প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রায় সমস্ত রচনাই যুক্তি ও জ্ঞাননির্ভর প্রবন্ধ জাতীয় হইলেও তাঁহার 'চারুপাঠ'-এর অন্তর্গত তিনটি স্বপ্নদর্শন-বিষয়ক নিবন্ধে রূপকল্পনায় এবং লেখকের অনুভূতির স্পর্শে অনেকটা পরিমাণেই সাহিত্যরস সিঞ্চিত হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে কেবল ছন্দপ্রবাহই সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার বিধবাবিবাহ-বিষয়ক রচনাগুলির কোনও কোনও অংশে, বন্ধুকন্যার অকালমৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'-এ এবং অসম্পূর্ণ আত্মচরিত-এ মননশীলতার

সঙ্গে তাঁহার আবেগস্পন্দিত হৃদয়টিকেও আমরা অনুভব করিতে পারি। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ক্রমবিকাশে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দানের একটি বিশেষ মূল্য আছে। তাঁহার রচনায় পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর অপেক্ষা গভীর সর্বত্রচারী সৌন্দর্যবোধ এবং ঐকান্তিক অধ্যাত্মভাবব্যাকুলতা লক্ষণীয়। তাঁহার আত্মজীবনীতে ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসুর প্রবন্ধগুলিতে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ঔদার্য এবং প্রসন্নতা অনুভব করা যায়। অপূর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপে প্রাণময়তায় তাঁহার প্রতিটি রচনা হৃদয়গ্রাহী।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধেই বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ প্রথম সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়। কমলাকান্তের দপ্তরের মত সম্পূর্ণরূপেই সাহিত্যিক সৃষ্টিজাতীয় রচনাকে যেমন, তেমনি বিজ্ঞান রহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিত্র ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতির মত বস্তুপ্রধান ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধেও বঙ্কিমের তীক্ষ্ণ মননশীলতা, গভীর সৌন্দর্যসৃষ্টি, জীবনপ্রত্যয়ের আবেগ, অর্থাৎ তাঁহার ব্যক্তিত্বই রচনাশৈলীর অপরূপ ঐশ্বর্যে প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয়বস্তু অনুসারে কখনও কৌতুক-হাস্যের প্রসন্নতায় কখনও ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীক্ষ্ণতায়, মননশীলতার গাম্ভীর্যে ও তৎসঞ্জাত যুক্তির শৃঙ্খলায়, কখনও বা অন্তরের গভীর আবেগে তিনি ভাব-প্রকাশের এক বিচিত্র, নমনীয় শিল্পরূপ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর যেমন বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রথম শিল্পী।

রামমোহন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধের ক্রম বিকাশের এই পরিচিতিতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ক্ষেত্রটি যে কি ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল আমরা তাহা কিছুটা পরিমাণে বুঝিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মপরিচয়দান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্য-সূত্রটি ধরা পড়তে চায় না।...নানা থানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে...আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে যখন সমগ্ররূপে দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।"

ইহা সত্য যে কবির প্রধানতম পরিচয় তিনি কবি, কিন্তু ইহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয় নহে। কবি-ধর্মা প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধগুলি বাংলা তথা বিশ্ব-সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন।

"বঙ্কিম-পর্বে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যদিয়া বাঙালীর যে চিন্তাধারা বা ভাবধর্মের আত্মপ্রকাশ সূচিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথেব আবির্ভাবের পর হইতে তাহাই নূতন ভঙ্গীতে, আকারে ও রূপে প্রকাশিত হইয়া অধিকতর পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার অসামান্য শক্তির সহায়তায় পাশ্চাত্য জীবন-রসবোধ ও বাঙালীর জাতিগত ভাবচিন্তা একত্র সমাবিষ্ট হইয়া আকাঙ্ক্ষিত পথে অগ্রসর হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ হইতে ভাব ও বিষয় চিন্তার বৈচিত্র্যে, ব্যক্তিমানসের সুস্পষ্ট প্রতিফলনে এবং রূপকল্প ও বাণীভঙ্গির অভিনবত্বে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ** রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা-দীপ্তিতে দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক জীবন ও সাহিত্য অভিনব রসরূপ লাভ করিয়া সর্বাংশে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহা দ্বারা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি নূতন পর্বের সূচনা হইয়াছে। অতএব এই নূতন পর্বটিকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'রবীন্দ্র-পর্ব' নামে চিহ্নিত করাই সম্পূর্ণ সংগত ও সার্থক। ** রবীনাথের মধ্যেই প্রথম সার্থকভাবে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য নৈর্ব্যক্তিক বাতাবরণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্যক্তিচৈতন্য-লোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে। পূর্ববর্তী পর্বসমূহের প্রবন্ধ হইতে রবীন্দ্র-পর্বের প্রবন্ধ সাহিত্যের চরিত্রগত প্রধান পার্থক্য এই যে, এই পর্বে প্রবন্ধ মুখ্যতঃ বিষয়নিষ্ঠ না হইয়া অধিক পরিমাণে ভাব-নির্ভর হইয়াছে, এবং বক্তব্য বিষয় বা ভাব ম্লান করিয়া প্রবন্ধের রচনা-কৌশল অর্থাৎ প্রকাশরীতিই বহুলাংশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং সর্বোপরি বাংলা প্রবন্ধ সর্বপ্রথম একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পকর্মের মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা বা প্রবাহে এবংবিধ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন রবীন্দ্র-পর্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।"

রবীন্দ্র-সাহিত্য যেমন বিপুল, তেমনই বিচিত্র। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই ধ্যানী ঋষির অন্তর্দৃষ্টির আলোকে এক পরম সত্যানুভূতিকেই যেন তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং অভিব্যক্তি দিয়াছেন; একটি অখণ্ড ভাবধারাকে

ব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি তাঁহার সাহিত্য সাধনায় একটি মাত্র আঙ্গিক অবলম্বন করেন নাই : গ্রহণ করিয়াছেন নব নব আঙ্গিক। এই সব আঙ্গিকের মধ্যে 'প্রবন্ধ' অন্যতম। যুক্তি ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের পরিবর্তে গভীর অন্তর্দৃষ্টির উপলব্ধিনির্ভর বিশ্লেষণে, মননের দীপ্তিতে, কল্পনার বিচিত্র গৌরবে, আবেগের গভীরতায় এবং প্রকাশভঙ্গির অতুলনীয় ঐশ্বর্যে তাঁহার প্রতিটি প্রবন্ধ অনন্য। তাঁহার বর্ণনা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ,—সমস্ত কিছুই Emotive Prose এবং সৌন্দর্যে, সৃষ্টি-লাবণ্যে আমাদের হৃদয়ের নিকট আকর্ষণীয় করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কর্মসাধনায় যেমন, তেমনি সাহিত্যসৃষ্টিতেও যে শ্রেয়োবোধের, জীবনের পূর্ণতার আদর্শের আরাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ধ্রুবতারকার মত কবির প্রতিটি প্রবন্ধকে মহিমাদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

॥ সংকলনের প্রবন্ধ-পরিচিতি ॥

সংকলনের নির্বাচিত অংশগুলির মধ্যে 'শিক্ষার বাহন,' 'শিক্ষার মিলন', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' এবং 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' এই চারিটি প্রবন্ধ চিন্তামূলক এবং বিশ্লেষণধর্মী। অপেক্ষাকৃত বিষয়প্রধান এই প্রবন্ধগুলিতেও রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলীর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। যুক্তিতর্কের শৃংখলাশ্রয়ী বিশ্লেষণে নয়, নিজস্ব প্রত্যয়ের গভীর আবেগজাত বিশ্লেষণেই কবি ভারতবর্ষের প্রকৃত শিক্ষাদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ('শিক্ষার বাহন' ও 'শিক্ষার মিলন'), প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার প্রাণধর্মের পার্থক্য ('প্রাচ্য ও পাশ্চত্য সভ্যতা') এবং ভারতবর্ষের জীবনাদর্শের মহিমা ('ভারতবর্ষের ইতিহাস') পাঠকবৃন্দের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধগুলিতে একদিকে যেমন নিছক বুদ্ধির শুষ্ক বিচারবিতর্ক নাই, অপরদিকে তেমনি চিন্তাহীন আবেগ উচ্ছ্বাসও ইহাদের তরল করিয়া ফেলে নাই। নদীর তটবন্ধনেই যেমন তাহার জলধারা গভীরতা ও গতি পায়, তেমনি মননের আধারে আবেগ বিধৃত হইয়া এই রচনাগুলির সংযতশ্রীতে, হৃদয়াবেগের কোমলতাপূর্ণ গাম্ভীর্যের স্থির আলোকোজ্জ্বল রচনাশৈলীতে উহাদের বক্তব্যের গুরুত্ব পাঠকের নিকট উদ্ভাসিত হইয়াছে। বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে, তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া

পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে' ('শিক্ষার বাহন') ; 'লক্ষীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ' সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে ; কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে' ('শিক্ষার মিলন')--এই দুইটি কবিত্বপূর্ণ সুভাষিতে মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার কল্যাণকে এবং কল্যাণকর্মে নিযুক্ত ঐশ্বর্য আর লোভের ফলে সঞ্চিত ধনের পার্থক্যটিকে অপূর্ব চিত্রময়তায় মূর্ত করিয়া তোলা হইয়াছে। কবির সৃজনশীল প্রতিভা চিন্তামূলক নিবন্ধেও প্রতীকধর্মিতায় যে আমাদের নিকট রসোজ্জ্বল করিয়া তোলে, 'শিক্ষার মিলন'-এর এই অংশটিতেও তাহার উদাহরণ পাই : 'অথচ, মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার আশ্চর্য সফলতা আছে ; তাতে পণ্যদ্রব্য রাশীকৃত হয়, বিশ্ব জুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ করে কোঠাবাড়ী ওঠে'—এখানে সুশৃংখল, নিয়মপাশবদ্ধ যান্ত্রিক সভ্যতার কর্মকাণ্ড আমাদের নিকট রেখাচিত্রের মতই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। কখনও বা শ্লোকের গাম্ভীর্যে ও সংহতিতে দৃঢ়পিনদ্ধ, ঋজু প্রকাশভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিন্তা ও উপলব্ধিকে আমাদের মর্মের ভাবসত্য করিয়া তোলেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' এবং 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধ দুইটি ইহার দৃষ্টান্ত। এই ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার মত : 'পনেরো-ষোল শতাব্দী খুব দীর্ঘকাল নহে। নেশনই যে সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি সে-কথার চরম পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি, তাহার চরিত্র-আদর্শ উচ্চতম নহে। তাহা অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটি ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে,' কিংবা 'এই ন্যাশন্যাল আদর্শকেই আমাদের আদর্শরূপে বরণ করাতে আমাদের মধ্যেও কি মিথ্যার প্রভাব স্থান পায় নাই ? আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাগুলির মধ্যে কি নানা প্রকার মিথ্যা, চাতুরী ও আত্মগোপনের প্রাদুর্ভাব নাই ? আমরা কি যথার্থ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে শিখিতেছি ?'—'শিক্ষার মিলন'-এর এই অংশেও আমরা দেখি, কবি একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে মূল ভাবকে এমনভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন যাহার ফলে উহা মনে দাগ কাটিয়া বসিয়া যায়। দীর্ঘ জটিল বাক্যে প্রকাশ করিলে উহা কিছুতেই সম্ভব হইত না। আবার 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধটিতে এই অংশে : 'এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-

সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে'—দীর্ঘ বাক্যের ছন্দের প্রবাহমানতায় জ্ঞানে প্রেমে কর্মে, সমগ্র জীবনেই পরিব্যাপ্ত ভারতবর্ষের ঐক্যের আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ একটি অখণ্ড সত্যরূপে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন।

'উৎসবের দিন' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মদৃষ্টি অতুলনীয় ভাবে প্রকাশলাভ করিয়াছে। সমাজ ও ধর্মবিশ্বাসগত সংকীর্ণতার উপর তিনি তীব্র আঘাত হানিয়াছেন। উৎসবের যথার্থ তাৎপর্য বুঝাইতে গিয়া কবি ভারতীয় ধর্মের উদারতা বিশ্লেষণ করিয়া মানুষকে ধর্মের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির ভাষার সহিত মানুষের ভাষার পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। সংসার জীবনের প্রাত্যহিকতাকে অতিক্রম করিয়া সত্যস্বরূপকে উপলব্ধি করিয়াছেন। নিছক প্রয়োজনের গণ্ডীর মধ্যে মানুষের পরিচয় কতখানি অসম্পূর্ণ, সংকীর্ণ—প্রাত্যহিকতার বন্ধনের বাহিরেই যে মানুষের মুক্তি—শ্রাবণ-সন্ধ্যায় সেই দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

'নববর্ষ' প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির পূজারী রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি উপলব্ধি করি। য়ুরোপীয় সভ্যতা ভারতবর্ষকে একটা অশান্ত কর্মোন্মাদনার পথে ঠেলিয়া দিতেছে, ভারতের শাশ্বত জীবন-সাধনা ও মনুষ্যত্ব-বোধ এই সংঘাতে পীড়িত হইতেছে—ইহা কবিকে ব্যথিত করিয়াছে। প্রবন্ধটিতে কবিচিত্তের এই অনুভূতিই পরিস্ফুট হইয়াছে।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক, মানব সভ্যতা-বিষয়ক, সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধে, আত্মভাবনিষ্ঠ রচনায়—তাঁহার প্রতিটি গদ্যরচনাই প্রকাশভঙ্গির এই ঐশ্বর্যে আমাদের মুগ্ধ বিস্মিত করে।

প্রখ্যাত সমালোচক অতুলচন্দ্র গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীর রসবৈচিত্র্য সম্পর্কে যে সুচিন্তিত মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।—"রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ। সাহিত্যের সমালোচনায়, কি রাষ্ট্র ও সামাজিক সমস্যার আলোচনায়, বাংলা কবিতার ছন্দবিচারে, কি বাংলা ব্যাকরণের রীতি ও বাংলা শব্দতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সর্বত্র পড়েছে মহাকবির মনের ছাপ, সর্বত্র মহাকবির বাগ্‌বৈভব। * * ভাষা ও প্রকাশকে অনুদ্বেজিত রেখে শ্রোতার মনে আবেগ সঞ্চারের যে কৌশল মহাকবির আয়ত্ত তার দোলা এসব প্রবন্ধে লেগেছে * * এরকম প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।" ডঃ সুকুমার

সেন রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথের যে কোন গদ্যরচনার একটি মাত্র ছত্র পড়িলেই বোঝা যায়, তাঁহার বলিবার অসাধারণ রসোজ্জ্বল ভঙ্গিটি। প্রাচীন আলংকারিকেরা কাব্যের যে মৌলিক সংজ্ঞা দিয়াছিলেন, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং' তাহা রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্ধতির প্রধান বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিবার তাহা সম্পূর্ণ বলিয়াছেন, সবচেয়ে ভালো করিয়া বলিয়াছেন, নূতন করিয়া বলিয়াছেন এবং বক্তব্যের উপরেও কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার প্রকাশক্ষমতা এতদূর বাড়াইয়াছেন যাহা কোন ভাষার কোন লেখক একাকী কখনো করতে পারেন নাই। শুধু বুদ্ধির উদ্বোধে ক্ষান্ত না হইয়া মনের গহন অন্তঃপুরে পৌছিয়া চিত্তের গভীরতর অনুভূতিকে জাগাইয়া দেওয়া রবীন্দ্র গদ্যরীতির মৌলিক গুণ।" ভাষা ও ভঙ্গি সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে, বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক শিল্পী বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের ছন্দোময়তা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার পর আবির্ভূত হইয়াছেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি এই ভাষার রসদ্যোতানকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। প্রাবন্ধিক অক্ষয়চন্দ্র ও ভূদেব-এর হাতে এই ভাষায় সংযোজিত হয় প্রসাদগুণ। রবীন্দ্রনাথের হাতে ভাষার এই ত্রয়ী গুণই শুধু সমৃদ্ধি লাভ করে নাই, তিনি ইহার সহিত সাংকেতিকতা, সূক্ষ্ম আবেদন, ধ্বনিসঙ্কার ও পরিহাস-রসিকতা এবং ব্যঙ্গধর্মিতার যোগসাধন ঘটাইয়া ভাষাকে করিয়াছেন প্রাণবন্ত, সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাপূর্ণ। তাই বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম আকর্ষণ হইল রবীন্দ্রনাথের ভাষাশৈলী।

রবীন্দ্রনাথ গদ্যের শিল্পরূপকে যেমন সমৃদ্ধ করিয়াছেন তেমনি বিষয়বস্তুর দিক দিয়াও আপন হৃদয়ের অপরিমেয় ঐশ্বর্য গদ্যের ক্ষেত্রে প্রবাহিত করিয়া, তাহার বহনক্ষমতাকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন। স্বদেশ, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি, রসতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রভৃতি বহু বিচিত্র বিষয় তাঁহার রচনায় স্থান লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ মানব জীবনের এবং মানব সভ্যতার যাবতীয় ভাব ভাবনা, সমস্যা ও সিদ্ধান্তকে তিনি আপন প্রবন্ধ সাহিত্যে রূপায়িত করিয়াছেন।

শিক্ষার বাহন

॥ সার-সংক্ষেপ ॥

জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ বিশ্বের সকল কিছুর সহিত মিলিত হয়; সেই মিলনের আনন্দ হইতে মানুষকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। আমাদের দেশে বিদ্যাবিস্তারের বাধাস্বরূপ বিদেশী শিক্ষাকে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বিদেশী হইলেই তাহা আপনার হইবে না একথা যুক্তিযুক্ত নয়। বিদ্যা কোনও বিশেষ ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নয়। আসল কথা, এদেশে আধুনিক শিক্ষা তাহার উপযুক্ত বাহন পায় নাই, সর্বজনীন শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সর্বজনীন শিক্ষা হইতেই উচ্চশিক্ষাকে তাহার প্রাণরস সংগ্রহ করিতে হয়, কিন্তু সেই দিকে কোনও দৃষ্টি না দিয়া তাহাকে আরও সংকীর্ণ এবং উপকরণবহুল করিয়া তোলা হইতেছে। আমাদের শিক্ষার বাহন ইংরেজি বলিয়া তাহা দেশের মধ্যে বিস্তৃত হইতে পারিতেছে না। মাতৃভাষা যে শিক্ষার যথার্থ বাহন হইয়া উঠিতে পারে সে সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ সহজে দূর হইতে চায় না। অথচ সকলের চক্ষের সম্মুখেই জাপান য়ুরোপীয় শিক্ষাকে তাহার দেশীয় ভাষার আধারে গ্রহণ করিয়াই উহাকে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিতে পারিয়াছে। জাপানী ভাষার ধারণ এবং গ্রহণশক্তি আমাদের ভাষার তুলনায় বেশী নয়। ইংরেজি কেন, আরও অনেক বিদেশী ভাষা আমাদের অবশ্যই শিক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ বাঙালী বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিবে না, তাহাদের শিক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়কে উদাসীন হইলে চলিবে না। যাহারা ইংরেজি জানে না, তাহাদের প্রতি নির্মমতা থাকিবে কেন?

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপাশের বিদ্যাচর্চার গণ্ডিটুকুর বাহিরেও বিদ্যার একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র তৈয়ারী হইয়াছে; সেইখানেই মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বজনীন শিক্ষা প্রচারের ভার গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা গঙ্গাযমুনার মতো মিলিত হইলে বাঙালী শিক্ষার্থীদের

নিকট উহা তীর্থস্থানে পরিণত হইবে। বিদেশী ভাষা শিক্ষার দক্ষতা এবং সুযোগ সকলের থাকিতে পারে না, সেইজন্য মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করিতে না পারিলে আমরা দেশের শক্তির অপচয়ই ঘটাইব। ইংরেজি এবং বাংলা দুইরকম শিক্ষার পথই খুলিয়া দেওয়া প্রয়োজন। বাংলাভাষায় উচ্চাঙ্গের শিক্ষাপুস্তক নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যদি বাংলায় উচ্চাঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করেন, তবে এই অসুবিধা দূর হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মতো প্রতিষ্ঠান সোৎসাহে পরিভাষা প্রস্তুতির কাজে আগাইয়া আসিবে। বাংলাভাষার অন্নেই বৃহত্তর জনসাধারণের ক্ষুধা মিটিবে। জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশে মানুষের চিন্তাশক্তির উদ্বোধনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। বিদেশী ভাষায় দেশের মানুষকে বিকশিত করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমরা যে উচ্চশিক্ষা পাই, তাহা আমাদের উচ্চ চিন্তার ক্ষমতা আনিয়া দেয় না, কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন মাতৃভাষা। ডিগ্রীর ছাপমারা, জীবিকার ছাড়পত্র প্রাপ্তির শিক্ষার বাহিরে বিশ্ববিদ্যালয় মাতৃভাষার যে বৃহত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে, সেইখানেই সে স্বাধীন ও স্বাভাবিকভাবে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। বাংলাভাষা একদিন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালীর কাছে অবজ্ঞার বিষয় ছিল; সেই অবজ্ঞা ও অবহেলার মধ্যেই নব বাংলা সাহিত্যের অংকুরোদ্‌গম হইয়াছে এবং নিজের প্রাণের সৃষ্টির আনন্দটুকুকে সম্বল করিয়াই প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। বাঙালী সাহিত্যিকেরা ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে নিরত থাকিলে এই বিকাশ সম্ভবপর হইত না। বৈদিক যুগে যেমন তপোবন, বৌদ্ধযুগে নালন্দা, তক্ষশিলা, ভারতের দুর্গতির দিনে টোল চতুষ্পাঠি প্রভৃতি যেমন দেশের প্রাণশক্তি হইতে প্রাণরস সংগ্রহ করিয়া সমস্ত দেশকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়কেও তেমনি ভাবে দেশের জীবনে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়া সৃষ্টির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

॥ বক্তব্য সংকেত ॥

[১] জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকে চিত্তকে উদ্ভাসিত করা, চিত্তবৃত্তির সার্থক বিকাশ ঘটাইয়া মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলাই যদি শিক্ষার প্রকৃত

উদ্দেশ্য হয়, তবে শিক্ষার যথার্থ বাহন পরের ভাষা নহে—মাতৃভাষা। তাই বাঙালীর শিক্ষার বাহন হইবে বাংলা।

[২] বিদেশী ভাষার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেন নাই। মুষ্টিমেয় জনসংখ্যা—যাহারা উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবে, তাহাদের জন্য বিদেশী ভাষা প্রয়োজন।

[৩] এই প্রবন্ধের লক্ষ্য—মুষ্টিমেয় জনসংখ্যার শিক্ষা নহে, সাধারণ বাঙালী মাত্রেরই শিক্ষা ব্যবস্থা। তাই প্রবন্ধকারের বক্তব্য—আপামর বাঙালীর জন্য বাংলা ভাষাতেই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

[৪] ইংরেজি শিক্ষা-ব্যবস্থাতে আড়ম্বর ও সাজ সরঞ্জামের বাহুল্য। অনাবশ্যক সমারোহ ও অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপে ঐ ছাঁচে প্রচলিত শিক্ষার প্রসার সম্ভব নহে। শিক্ষা হওয়া উচিত অনায়াসলভ্য। দেশের প্রকৃতির সহিত সংগতি রাখিয়া শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া উচিত যথাসম্ভব অনাড়ম্বর।

[৫] দুইটি উপায়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ধারার পাশাপাশি বাংলা ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন, (২) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে একেবারে দেশের পল্লী অঞ্চলে প্রাচীনকালের গুরু-শিষ্যের আদর্শে নূতন করিয়া শিক্ষাকেন্দ্র খোলা।

[৬] প্রথম প্রস্তাবটি রূপায়ণের পথে প্রধান বাধা ভাল পাঠ্যপুস্তকের অভাব। এ সম্পর্কে প্রবন্ধকারের মত হল—বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেই ভাল পাঠ্যপুস্তক রচিত হইবে।

[৭] আসলে, প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার ঘটাইবার মত মন ও সঙ্কল্প এবং দেশের লোকের নিকট হইতে উহার জন্য বলিষ্ঠ দাবি উঠিলে বাংলা ভাষায় বাঙালীর শিক্ষার প্রসারের পথে কোন বাধা থাকিবে না।

॥ রচনা-পরিচিতি ও রসগ্রাহী সমালোচনা ॥

'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন: "কবি শিলাইদহ থাকিতে একদিন খবরের কাগজে দেখেন যে, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করিতে গিয়া ছোটলাট নাকি সুবৃহৎ অট্টালিকাদি বিদ্যাদানের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এদেশে শিক্ষাকে দুর্মূল্য দুর্লভ করিয়া তুলিবার যে

আয়োজন চলিতেছে, রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই তাহার বিরোধী। যে দেশ দুর্গতিগ্রস্ত সেখানে বিদ্যার বল কমাইয়া, বিদ্যার কায়দাটাকে বড় করিলে দেশের কী দশা হইবে, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। এইসব কথা মনে উঠাতেই তিনি 'শিক্ষার বাহন' নামক প্রবন্ধটি লিখিলেন। শিলাইদহ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া ২৪শে অগ্রহায়ণ (১০ই ডিসেম্বর) রামমোহন লাইব্রেরীতে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে যে নূতন ভাব বেশি ছিল, তাহা নহে, চল্লিশ বৎসর পূর্বে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচলিত হইবার জন্য যে যুক্তি দিয়াছিলেন, এ প্রবন্ধে তাহা আরও যুক্তিযুক্ত পটভূমে ব্যাখ্যাত হইল। কবি স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন যে, বাংলাভাষার মধ্য দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আশু প্রয়োজনীয় হইয়াছে।…" বিদ্যালয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব এই যে, জ্ঞান বিতরণ ব্যাপারে সনাতনী প্রথার সঙ্গে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞানরাজিও পরিবেশন করা হউক।… কবির মতে ইস্কুল বিভাগে মেট্রিকের প্রেপারেটরী ক্লাস হইতে ইংরেজি ও বাংলার দুইটি পথ খোলা রাখা দরকার, ইংরেজি রাস্তার দিকেই বেশী ছাত্র ঝুঁকিবে সত্য, তবু অন্য পথ থাকিলে ভিড় কমিবে। তিনি আরও বলেন যে, সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশ হইতে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের জন্য পণ্ডিত আনিতেছেন, তাহার "এক কোণে বাংলার একটা আসন পাতিলে" ভালো হয়। কবির বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম শিক্ষাও বাংলার মধ্য দিয়া দিতে আরম্ভ করিলেই বাংলায় গ্রন্থ লিখিত ও প্রকাশিত হইবে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্য রবীন্দ্রনাথকে চিরদিন পীড়িত করিয়াছে। বিদেশী ভাষায় শিক্ষাদানের কৃপণ ব্যবস্থা যে দেশের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করিতে পারে না, একমাত্র মাতৃভাষায়ই তাহা সম্ভব, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসমস্যামূলক প্রতিটি রচনার মূল প্রত্যয় ইহাই। একজন সমালোচক, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন: শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে লেখকের উদার মানসমুক্তি ও আদর্শনিষ্ঠা এবং বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির যান্ত্রিকতা ও অন্যান্য প্রকারের অপূর্ণতা যতটা ধরা পড়িয়াছে, গঠনমূলক পরিকল্পনার ততটা পরিচয় নাই।—মনে হয় যে, লেখক এই জাতীয় প্রবন্ধে জাতীয় মনের সাধারণ অসন্তোষকেই তাঁহার নিজস্ব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় পূর্ণতাকামী কবি মনের গূঢ় অতৃপ্তিবোধের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন; সমস্যার রূপ যতটা পরিস্ফুট

করিয়াছেন সে পরিমাণে সমাধানের ইঙ্গিত দেন নাই।' কিন্তু এই সমালোচনা যুক্তি-যুক্ত নয় বলিয়াই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ দেশের পরাধীনতার সময়ে বিদেশীভাষানির্ভর মুষ্টিমেয় শ্রেণীতে আবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার অপূর্ণতার প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে এবং মাতৃভাষাশ্রিত সর্বজনীন প্রকৃত শিক্ষার মূল নীতিটিকে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন। এই সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তোলাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটিতে আমরা দেখি, তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের জন্য একটি ভাবগত আন্দোলন সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট, যাহাতে দেশবাসী এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত শিক্ষার দৈন্যমোচনে অগ্রসর হইতে পারে। তিনি সমস্যা এবং তাহার সমাধানের মূল নীতিটি নির্দেশ করিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষা-সংস্কারকরূপে নয়, কবি ও সত্যদ্রষ্টারূপেই রবীন্দ্রনাথ আমাদেব শিক্ষাসমস্যা পর্যালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটি তাঁহার প্রজ্ঞাদৃষ্টির আলোকে, অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণে, আবেগ-গভীরতায়, কল্যাণচেতনায় এবং প্রকাশভঙ্গীর অনুপম সৌন্দর্যে আমাদের মন ও বুদ্ধি গভীরভাবে আলোকিত করে।

।। শব্দার্থ ও টীকা ।।

অনু. ১-২৫ঃ প্রয়োজনের দিক হইতে……বলা বাহুল্য—বিদ্যার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। মানুষের অধীত বিদ্যাকে অন্তত দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে ; এক, জ্ঞানমূলক শিক্ষা ; দুই, বৃত্তিমূলক শিক্ষা। এই বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রবন্ধকার 'প্রয়োজনের দিক হইতে' বলিয়াছেন। বিদ্যা—বিদ্ (জানা) +য+আ (স্ত্রীং)—যাহার মাধ্যমে ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত যাবতীয় পদার্থের সত্যজ্ঞান লাভ হইয়া যথাযোগ্য উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধারণ অর্থে, অধ্যয়নাদি-জনিত জ্ঞান।

চাষীকে বিদ্যা……পাওয়া যায়—আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই শিক্ষাকে সর্বজনীন করিতে চাহেন না। তাঁহাদের যুক্তি—চাষী লেখাপড়া শিখিলে চাষবাস করিবে না, গোটা সমাজ জীবনের আহারের পথ বন্ধ হইবে। 'ভদ্রসন্তান'-এর চাকুরীর বাজারে তাহারা ভিড় করিবে, সেও আর এক সমস্যা। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কেও তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণের সীমা নাই। স্ত্রীলোক

সম্পর্কে এই সম্প্রদায়ের ভারতীয় সনাতন ধর্মে অচলা ভক্তি। স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম—পতি-সেবাপরায়ণা হইয়া দেব দ্বিজে ভক্তিমতী থাকিয়া পতির সংসার পরিচালনা করা। লেখাপড়া শিখিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিলে পাছে তাহারা এতকালের ধ্যান-ধর্ম ভুলিয়া যায়—এই স্বার্থবুদ্ধি-প্রসূত নীতিই এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়—শুধুমাত্র কার্য সম্পাদনের জন্যই নহে, জাগরণের জন্য প্রয়োজন আলোকের। মানুষের নিদ্রিত চিত্ত জাগিয়া উঠে শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হইয়া। সে এই সত্য উপলব্ধি করে যে, মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই, সুতরাং দেশের মানুষের সহিত মানুষের আবার বিদেশের সহিত দেশের মানুষের মধ্যে সংযোগ সাধনের সেতু হইল—প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষকে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে। অপর পক্ষে, অজ্ঞানতার অন্ধকার মানুষে মানুষে আনে বিভেদ। **বাংলাদেশের এক কোণে প্রতিবেশীর চেয়ে**—জ্ঞান মানুষকে উদার প্রশস্ত চিন্তার অধিকারী করে। প্রকৃত শিক্ষা চিন্তাশীলতা ও ধ্যান ধারণার ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তাধারায় সাদৃশ্য আনে। তাই সাত সমুদ্র তের নদীর পারের এক শিক্ষিত তরুণের চিন্তা-ভাবনার সহিত একটি বাঙালী তরুণের চিন্তা-ভাবনার বিশেষ পার্থক্য নাই, কিন্তু একেবারে কাছাকাছি বাস করে এমন একজন অশিক্ষিত বাঙালীর সহিত এই শিক্ষিত তরুণ বাঙালীর চিন্তাধারায় মিল দেখা যায় না। প্রকৃত শিক্ষা দূরের শিক্ষিত মানুষকে নিকট করে। শিক্ষিত অশিক্ষিতের নৈকট্য দৈহিক নৈকট্য মাত্র—সেখানে মানসিক নৈকট্য নাই। **য়ুরোপ**– Europe, বিভিন্ন, ইউরোপীয় জাতি-অধ্যুষিত ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশসংবলিত মহাদেশ। **সেই মিলনের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক ; কিন্তু সেই মিলের পরম আনন্দ**—মানুষের অর্জিত জ্ঞানের দুইটি দিক—প্রয়োজনের দিক, আর আনন্দের দিক। প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা আনন্দের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই কথা বলেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত, তাঁহার দৃষ্টি বিশ্বব্যাপ্ত। সেই ব্যাপ্ত দৃষ্টির সাহায্যেই তিনি জ্ঞানের মহামিলনী শক্তিটুকু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ এই জ্ঞানের বলেই সমস্ত বিভেদ ভুলিয়া মিলিত হইতে পারে। এই জাতীয় সার্বদেশিক ও সার্বজাতিক মিলনের প্রয়োজন অসীম।

কিন্তু এই প্রয়োজনের দিকটুকুই সব নহে, ইহার মিলনের দিকটিও তাৎপর্যমণ্ডিত। মিলনের মধ্যেও যে পরম আনন্দ, সকলকে আপন জন ভাবিবার যে পরমতম অনুভূতি জ্ঞানের বলে লাভ করা যায়, উহার মূল্যও অপরিসীম। বিভিন্ন দেশের মানুষই শুধু নহে, এই জ্ঞানের বলে বিভিন্ন কালের মানুষও এক অচ্ছেদ্য ঐক্যবন্ধনে মিলিত হইতে পারে। **যোগের পথ**—মিলন, ঐক্যের পথ। **আমাদের বিলাতি বিদ্যাটা···সামগ্রী হইয়া যায় না**—স্কুলের সাইনবোর্ডে ছাত্রদের জন্য যাহা লিখিত হয়, সেই বিলাতি বিদ্যা অর্থাৎ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে যে বিদ্যা আমরা শিক্ষা করি, তাহা বিদ্যালয়ের সীমায়ই গণ্ডিবদ্ধ থাকে; উহা আমাদের জীবনের ভিতরকার শক্তি ও সম্পদ হইয়া উঠে না। বিদেশী ভাষাশ্রিত শিক্ষা আমাদের জীবনের কোনও পাথেয়ই বহন করিয়া আনে না, তাহা আমাদের চিন্তায় ও কর্মে ফলপ্রদ হইয়া উঠে না। বিদেশী শিক্ষার ভালো ভালো জিনিসগুলি কেবল বিদ্যালয়ে পুস্তকের পৃষ্ঠায়ই আবদ্ধ থাকে, আমাদের বাস্তব জীবনের শক্তিতে পরিণত হয় না। **জিনিসটা বিদেশী**—বহুদিন হইতেই ইংরেজি ভাষার উপর আমাদের দেশের একশ্রেণীর বিদ্বেষ। ইহা লইয়া পণ্ডিত মহলে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হইয়াছে। এক কালে হিন্দু পণ্ডিতের দল সংস্কৃত এবং মুসলমান পণ্ডিতের দল আরবী বিদ্যার সম্প্রসারণেও উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। অবশ্য রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় এই উদ্যম ফলপ্রসূ হয় নাই, ইংরেজি বিদ্যা বিস্তারের পথই অনুসৃত হয়। দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি এক শ্রেণীর অদূরদর্শী লোকের ইংরেজি-বিরাগ সমভাবেই প্রকট। **যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই**—জিয়োগ্রাফির (Geography) অর্থ, স্থানের গঠন-বৈশিষ্ট্য। সত্য কোনও বিশেষ স্থানে বা দেশে আবদ্ধ নয়, তাহা সর্বজনীন, দেশকালাতীত, শাশ্বত। **ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে**—শঙ্করাচার্য, বুদ্ধদেব, অশোক, কবীর, নানক, অতীশ দীপঙ্কর, চৈতন্যদেব প্রভৃতি সত্যসাধক এবং মনীষীরা ভারতবর্ষে সত্যের সাধনার মহত্তম আদর্শই উজ্জ্বলভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। **খোলসা**—পরিষ্কার। **ভূতের পা পিছন দিকে বাংলাদেশে সামাজিক সকল···ফিরিয়াছে**—ভূত-প্রেতে বিশ্বাস—লৌকিক অন্ধ ধারণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই লৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী ভূতের পা থাকে পিছন দিকে। মানুষ আর ভূত সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন জীবিত, অন্যজন মৃত। একজন কায়া, অন্যজন ছায়া। সুতরাং

তাহাদের সব কিছুর মধ্যেই সম্পূর্ণ বৈপরীত্য থাকা প্রয়োজন, তাই সম্ভবতঃ এই ধারণার উদ্ভব ঘটিয়াছে। মানুষের আচরণে তাই যখন অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করা যায়, তখনই তাহাকে বলা হয় ভূত। আলোচ্য অংশে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় মন্তব্যের কারণ হইল—মহামতি গোখেল সর্বজনীন শিক্ষার যে আন্দোলন শুরু করেন, বাংলাদেশ তাহাতে বাধা দিয়াছিল। সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নে যেখানে সর্বাগ্রে প্রয়োজন লোকশিক্ষা, সেখানে যদি সর্বজনীন শিক্ষা সম্প্রসারণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়, তবে সে আচরণকে স্বাভাবিক না বলিয়া ভূতের আচরণ বলিয়া অভিহিত করাই সঙ্গত। এই প্রসঙ্গেই প্রবন্ধকার বাংলাদেশের সমস্ত সামাজিক প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত অদ্ভুতত্বের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন।

সর্বজনীন শিক্ষা—সর্বজনীন—সর্বজন+ঈন্ (হিতার্থে), সকলের হিতকারী; যে শিক্ষা সকলের জন্য এবং যাহাতে সকলের কল্যাণ হয়। **মহাত্মা গোখেল**—গোপালকৃষ্ণ গোখেল (বা গোখলে)—ইঁহার জন্ম ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কোলাপুরে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি ডেকান এডুকেশন সোসাইটি নামক আদর্শবাদী প্রতিষ্ঠানের অধীনে শিক্ষকতার কার্যে নিরত হন। গোখেল রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে সম্পাদক এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে উহার বারাণসী অধিবেশনে সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁহার উদ্যোগে 'সারভ্যান্টস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের কাজে গোখেল প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার চারিত্রিক মহত্ত্ব, দেশহিতৈষণা এবং নির্ভীকতার জন্য তিনি সঙ্গত কারণেই 'মহাত্মা'রূপে বিখ্যাত হইয়াছেন। **মহামারী**—মড়ক, যে সংক্রামক ব্যাধিতে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আমরা ঠিক করিয়াছি⋯উল্টা দিকে গজাইবে—মহাত্মা গোখেল সর্বজনীন শিক্ষার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং শোনা যায়, বাংলা দেশেই

তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি বাধা পাইয়াছিলেন। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—ভূতের পা পিছনের দিকে থাকে, উলটা চলাই তাহার অভ্যাস। বাংলাদেশের সকল সামাজিক প্রচেষ্টা যেন মানুষের মতো সম্মুখভাগে অগ্রসর না হইয়া পিছনের দিকে চলিয়াছে; অর্থাৎ সামাজিক অগ্রগতির শুভবুদ্ধিকে ব্যাহত করার দুর্বুদ্ধি দেশকে পাইয়া বসিয়াছে। আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাধনা করি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য উন্মুখ হই, অথচ সামাজিক ক্ষেত্রে, আমাদের সংসার অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষেত্রে উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টাকে বাধা দিবার চেষ্টা করি। সামাজিক ক্ষেত্রে সম্মুখদিকে চলিবার শক্তি অর্জন না করিলে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রেও যে আমাদের পশ্চাৎপদ হইতে হইবে, এ বোধ আমাদের নাই। আমাদের এই বিকৃতবুদ্ধিকে ব্যঙ্গ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, আমরা স্থির করিয়াছি, সমাজে সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছনমুখে চলিব, অথচ রাষ্ট্রীয় সাধনার ক্ষেত্রে সামনের দিকে উড়িয়া চলিব, অর্থাৎ দ্রুত অগ্রসর হইব। **উপসর্গ**—রোগের বিকার, এক রোগের সহিত তাহার আনুষঙ্গিক রোগ। **আসবাব**—গৃহসজ্জা, জিনিসপত্র। **অন্নেরও দরকার, থালারও দরকার**—এখানে অন্ন বলিতে শিক্ষাকে এবং থালা বলিতে শিক্ষার উপকরণ বা সাজসরঞ্জামকে বুঝানো হইয়াছে। **অন্নসত্র**—অন্নদানার্থ সদাব্রত, নিরন্তর অন্নদান; সত্রের এক অর্থ গৃহ, সুতরাং অন্নসত্র—যে গৃহে নিরন্তর অন্ন পাওয়া যায়, অন্নশালা। **অন্নপূর্ণা**—জগন্মাতার জগৎপালিকা মূর্তি। ব্রহ্মরূপ অন্ন ধাতুর উৎপত্তির মূল আদ্যাশক্তি বা মূল প্রকৃতির নাম অন্ন, এই অন্ন দ্বারা যিনি চতুর্দশ ভুবন পূর্ণ করেন তিনিই অন্নপূর্ণা। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অন্নই তাঁহার আছে। আদ্যাশক্তি ভগবতীর অন্নদামূর্তি দ্বিভুজ; বামহস্তে সুবর্ণময় অন্নপাত্র, দক্ষিণহস্তে দেবী হাতা লইয়া মহাদেবকে অন্ন পরিবেশনে নিরত। **যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া…দাবি করিবার দিন আসিবে**—আমাদের দেশে সর্বজনীন শিক্ষার বনিয়াদ গড়িয়া তুলিবার জন্য কোনও উৎসাহ দেখা যায় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনসাধারণকে উপবাসী করিয়া রাখা হইয়াছে, অন্যদিকে বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ ও আসবাবপত্রে ভরিয়া উচ্চ শিক্ষায়তনকে আরও আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া তোলা হইয়াছে। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটি লিখিবার পূর্বে কবি সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলেন, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া ছোটলাট বিশাল অট্টালিকাদি বিদ্যাদানের

পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার পটভূমিতে জনসাধারণকে সর্বজনীন শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিয়া উচ্চশিক্ষাকে আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া তোলার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিটি করিয়াছেন। যেখানে দরিদ্রের অদৃষ্টে যথেষ্ট অন্ন জোটে না, সেখানে তাহার ক্ষুধা মিটাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিবার পূর্বে থালার দিকেই সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করা অর্থহীন। যখন সমগ্র ভারতবর্ষে অন্নসত্রের ন্যায় সর্বজনীন শিক্ষা- ব্যবস্থা সকলের নিকট সহজলভ্য হইবে, তখন অন্নপূর্ণা অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের নিকট সোনার থালা, অর্থাৎ শিক্ষায়তনের জন্য বিশাল অট্টালিকা, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি দাবি করিবার দিন আসিবে। যখন দেশে ক্ষুধার অন্ন অর্থাৎ সর্বজনীন শিক্ষারই কোনও ব্যবস্থা নাই, তখন শিক্ষায়তনগুলি সাজসরঞ্জামে আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া তোলার কোনও যৌক্তিকতাই থাকিতে পারে না। আমাদের জীবনযাত্রা দারিদ্র্যের, অতএব শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা আমরা ধনীর চালে করিতে পারি না। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই অসংগতির প্র'ত রবীন্দ্রনাথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। **লক্ষ্মী**—ঐশ্বর্য-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ঋগ্বেদে শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবী অর্থে ইঁহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় লক্ষ্মী ও শ্রী আদিত্যের দুই স্ত্রী। পুরাণ অনুসারে মহর্ষি ভৃগু তাঁহার স্ত্রী দক্ষ-কন্যা খ্যাতির সন্তান লক্ষ্মী বিষ্ণুর স্ত্রী হন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি দুর্বাসার অভিশাপবশতঃ ত্রিলোক শ্রীহীন হইলে সর্বসৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, পরে সমুদ্রমন্থনকালে পুনরুত্থিত হন। রামায়ণেও আছে, দেবতা এবং অসুরদের সমুদ্রমন্থনকালে লক্ষ্মী পদ্ম হস্তে (তাঁহার এক নাম কমলা) সমুদ্র হইতে উত্থিত হন। **সরস্বতী** -নিখিল বিদ্যার অধিশ্বরী বাগ্দেবী বীণাপাণি, বিষ্ণুর অন্যতমা স্ত্রী। **এদেশে লক্ষ্মীর কাছে…আমাদের কাছে চলিবে না**—বিশাল অট্টালিকায়, সাজসরঞ্জামে, উপকরণবাহুল্যে আমাদের শিক্ষায়তন-গুলিকে আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া তুলিবার প্রবণতা দেখা দিয়াছে। যাঁহারা বলেন, এই বাহুল্য, প্রাচুর্য ব্যতীত শিক্ষার উপযুক্ত পটভূমি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, তাঁহারা ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এবং তাহার বাস্তব ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহিত নন। ভারতবর্ষ চিরদিন উপকরণবাহুল্যকে পরিহার করিয়া আসিয়াছে। আমরা আমাদের প্রাঙ্গণে মাদুর বিছাইয়া অতি সহজেই আসর জমাইতে পারি ; সোফা, কৌচ প্রভৃতি আসবাবপত্রের বিলাসের প্রয়োজন হয় না। এদেশে ধনীর যজ্ঞের ভোজ

কলাপাতায়ই চলে। মনীষা এবং চারিত্রিক মহত্ত্বের জন্য যাঁহারা এদেশে নমস্য, তাঁহাদের অধিকাংশই দরিদ্র ঘরের সন্তান; এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের নাম স্মরণীয়। বিত্তের সহিত মহত্ত্বের যে কোনও অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক নাই, তাহা এই সকল মহাপুরুষ প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই দেশে লক্ষ্মীর নিকট হইতে ধার না লইলে, অর্থাৎ ঐশ্বর্যের উপর নির্ভর না করিলে সরস্বতীর আসনের দাম অর্থাৎ শিক্ষা বা শিক্ষায়তনের মূল্য কমিয়া যাইবে, এই কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না। **অশনে**—ভোজনে, আহারে। **হাতেখড়ি**—সর্বপ্রথম বাঙলা বর্ণমালা ভূমির উপর লিখনের শিক্ষা-রূপ সংস্কার। **আমাদের গায়ের কাপড়…সূর্যকিরণেই বোনা হইতেছে**—অনাবৃত অঙ্গে যথাসম্ভব সূর্যের কিরণ লাগাইয়া আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ স্বাস্থ্যরক্ষা করে। সর্বাঙ্গ উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত করিবার জন্য তাঁতী বা তাঁত শিল্পের উপর তাহাদের নির্ভর করিতে হয় না। **তামসিক**—তমঃ (তমস্) প্রকৃতির তৃতীয় গুণ, ইহার প্রাধান্য ঘটিলে মানুষ কামক্রোধাদি ষড়রিপু বা নীচ প্রবৃত্তির অধীন হয়। তামসিক, অর্থাৎ তমোগুণবিশিষ্ট। **সাত্ত্বিক**—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটি প্রাকৃতিক গুণ, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণ, ইহা মানবহৃদয়ে সত্য, ন্যায়, দয়া, ধর্ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ঔদার্য প্রভৃতি পবিত্রভাব উৎপাদন করে। সত্ত্বগুণপ্রভাবেই জগৎ প্রতিপালিত হইতেছে। **দৈন্য জিনিসটাকে…তামসিক**—দুর্বলতার জন্য যাহারা দীনতা বরণ করে আর সেই দীনতার লজ্জা ঢাকিবার জন্য মুখে নিবৃত্তির বড় বড় আদর্শের কথা বলে কবি তাহাদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের লজ্জা ঢাকিবার জন্য নিবৃত্তিমার্গের বড় বড় আদর্শের কথা বলিলে উপহাসাস্পদই হইতে হয়। **আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা… দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে**—ভারতবর্ষ চিরদিন সর্ববিধ আড়ম্বর, উপকরণবাহুল্যকে পরিহার করিয়া আসিয়াছে। বিলাস-বহুল ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্যের আবিলতায় নয়, আড়ম্বরহীন জীবনের নির্মলতায়ই এই দেশ সত্যের সাধনা করিয়াছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ সেই নির্মলতায়ই আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, দৈন্য নয়। অনাড়ম্বর, ভোগবিলাসের প্রতি বিমুখতাই সাত্ত্বিকভাব; ইহা বিলাসীর ভোগসামগ্রী অপেক্ষা মূল্যবান। এই অনাড়ম্বর, নির্মলতা পূর্ণতারই একটি দিক, তাহা আড়ম্বরের উপকরণপ্রাচুর্যের অভাব মাত্র নয়। এই পূর্ণতার উপলব্ধি হইলেই মানুষ সকল ভোগবিলাসের আড়ম্বরকে

পরিহার করিতে পারে। পাশ্চাত্যদেশের শিল্পপ্রধান, বাণিজ্যিক সভ্যতার কেন্দ্র নগরগুলি যেমন ধোঁয়ার কুয়াশায় সর্বদা আচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ আধুনিক সভ্যতা বস্তু তথা উপকরণের বহুলতায় কলুষিত, আচ্ছন্ন। যেদিন মানুষ আড়ম্বরহীন জীবনসত্যের নির্মলতায় স্থিত হইবে সেদিন আধুনিক সভ্যতার ভোগবাহুল্যের ও বস্তু-আড়ম্বরের আবিলতা দূর হইবে। **সেই ভাবের… যেদিন যাইবে**—আধুনিক সভ্যতার প্রাদুর্ভাবে বস্তুসম্ভার প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বস্তুর প্রাধান্যলাভের ফলে মানুষের লোভ হইয়াছে অভ্রভেদী। **অপটু দৈত্যের সাঁতার দেওয়ার মতো**—আধুনিক সভ্যতাকে অনেক সময়েই 'বস্তুতান্ত্রিক' বলিয়া অভিহিত করা হয়, কেননা আধুনিক সভ্যতার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বস্তুভার আসিয়া পড়িয়াছে। এই ভার বহন করিতে এই সভ্যতাকে যথেষ্ট জোর প্রকাশ করিতে হয়। তাই এই সভ্যতা কল্পিত হইয়াছে দৈত্যরূপে। কিন্তু উহা যে কোনরূপ অগ্রগতিতে সক্ষম নহে, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে অপটু সাঁতারুর রূপক কল্পনায়। সেই অপটু সাঁতারু অনবরত হাত পা ছুঁড়িয়া জল ঘোলা করিয়া তোলে কিন্তু এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না। **পশ্চিমের মৈত্রেয়ী…তেন কুর্যাম্**—বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার স্ত্রী মৈত্রেয়ীর এই কাহিনী আমরা পাই: ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের এক স্ত্রী মৈত্রেয়ী ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী, জ্ঞানপিপাসু, অপর স্ত্রী কাত্যায়নী সাধারণ গৃহিণী, গার্হস্থ্য-জীবনেই নিবিষ্টচিত্ত। যাজ্ঞবল্ক্য একদা সংসারাশ্রম ত্যাগে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার দুই পত্নীকে বলিলেন, 'তোমাদের সম্মতি পাইলে আমি তোমাদের দুই জনের মধ্যে অর্থসম্পদ বণ্টন করিয়া সংসার ত্যাগ করিব।' তখন মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করিলেন—'হে ভগবন, যদিই বা ধনপরিপূর্ণ এই সমগ্রা পৃথিবী আমার হয়, আমি কি তদ্দ্বারা অমর হইব?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'না, সম্পদশালী ব্যক্তিগণের জীবন যেমন (ভোগলিপ্ত), তোমার জীবনও ঠিক তেমনি হইবে, পরন্তু বিত্তের দ্বারা অমরত্বের আশা নাই।' ইহা শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্?' 'যদ্দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না তদ্দ্বারা আমি কি করিব?' এই আখ্যানটিকে অনুসরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ভোগ্যবস্তুর আড়ম্বর ও প্রাচুর্যে আধুনিক সভ্যতা ভারাক্রান্ত ও কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে; আড়ম্বরহীন নির্মল জীবনের সত্য যেদিন এই সভ্যতার মাঝখানে আবির্ভূত হইবে, সেদিন পশ্চিমের অর্থাৎ

ইউরোপের মৈত্রেয়ী অর্থাৎ জ্ঞানানুসন্ধানীদেরও ভারতের মৈত্রেয়ীর মতো বলিতে হইবে—অমৃতত্ব লাভ করিতে না পারিলে ঐশ্বর্য দিয়া কি হইবে? **গরজ**—যত্ন। **গা নাই**—মন বা ইচ্ছা নাই। **বিদেশী মাল জাহাজে… রপ্তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা**—বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা যে কখনও জাতীয় জীবনের অভ্যন্তরে পৌঁছিতে পারে না রবীন্দ্রনাথ এখানে তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। আমাদের দেশে শিক্ষা-বিস্তারের সর্বপ্রধান বাধা এই যে, তাহার ভাষা ইংরেজী। একটি উপমার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাব্যবস্থার এই ত্রুটিটি নির্দেশ করিয়াছেন। বিদেশী মাল জাহাজ বাহিত হইয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিতে পারে (রবীন্দ্রনাথ এখানে কলিকাতা বন্দরকে স্মরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়), কিন্তু সেই জাহাজে করিয়াই দেশের হাটে হাটে বিদেশী পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি করাইবার আশা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। সেইরূপ বিদেশী শিক্ষা হইতে আমরা অনেক কিছু গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু বিদেশী ভাষার মাধ্যমেই তাহা দেশের চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিবার আশা করিলে আমরা ভুল করিব। **অসুখ**—অতৃপ্তি, ক্লেশ। **গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্**—ইহা মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ'-এর প্রথম সর্গের একটি চরণের অংশবিশেষ, পূর্ণ অংশ হইল:

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্
প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

কালিদাস এই প্রস্তাবনায় বলিয়াছেন, অতিবৃহৎ সূর্যবংশের (এই বংশে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন) কীর্তিগাথা ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া তিনি কিভাবে রচনা করিবেন: 'উন্নত তরুস্থিত কোনও ফল উন্নত শরীরধারী পুরুষই পাড়িতে পারে, লোভবশতঃ কোনও বামন যদি তাহা পাড়িবার জন্য বাহু উত্তোলন করে তবে লোকসমাজে সে উপহাসাস্পদই হয়। তদ্রূপ নির্বোধ হইয়া আমি যে অমর কবিদিগের যশঃস্পৃহা করিতেছি ইহাতে আমিও উপহসিত হইব সন্দেহ নাই।' ইহা কালিদাসের বিনয়বচন। রবীন্দ্রনাথ অংশটিকে কিছু পরিবর্তিত করিয়া লিখিয়াছেন।

পশ্চিম হইতে যা কিছু শিখিবার আছে…এমন জাপানির সঙ্গে নয়—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপীয় দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম, উন্নত, সবল দেশরূপে জাপানের আত্মপ্রকাশ সত্যই বিস্ময়কর। ১৮৫৪

খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রায় আড়াই শত বৎসর ধরিয়া জাপান ছিল বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন, আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শবর্জিত, প্রাচীন রাজনীতি প্রথার সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার পেরী জাপানি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিছু সুযোগসুবিধা লাভ করেন; সেই সূত্রেই জাপান ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই প্রতীচ্যের রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা, বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া ওঠে। জাপান স্বকীয় শক্তিতে, নিজের ভাষায়ই ইউরোপীয় সভ্যতার মূল্যবান উপাদানগুলিকে গ্রহণ করিয়াছে। রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-১৯০৫) রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত নবজাগ্রত জাপানের শক্তি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। ঐতিহাসিকেরা জাপানের নিজস্ব শক্তিকে স্বীকার করিয়া বলেন, তাহার উন্নয়ন 'Europeanization of Japan,' জাপানের ইউরোপীয়করণ নয়, তাহার জাতীয় সত্তারই বিকাশ। জাপান তাহার মাতৃভাষার মাধ্যমেই ইউরোপীয় সভ্যতার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, অথচ জাপানি ভাষা এমন কিছু উন্নত ভাষা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, তাহার ধারণাশক্তি (ধারণা-বোধ, প্রতীতি, নির্ধারণ, conception, comprehension) আমাদের ভাষার তুলনায় বেশি নয়। আমাদের ভাষা অনেক সম্প্রসারণশীল, নানা প্রত্যয় সহযোগে নূতন শব্দ সৃষ্টি করিবার শক্তি ইহার অপরিসীম। জাপান দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্যবোধের উগ্রতায় বহির্জগতের সহিত সর্বপ্রকার সংযোগকে প্রতিরোধ করিয়া আসিয়াছে। আমাদের ইউরোপের সহিত যোগ দীর্ঘকালের; ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তির সহিত আমাদের সাদৃশ্য গভীরতর; কিন্তু মাতৃভাষাকে অবহেলা করিয়া বিদেশী ভাষার দাসত্ব করিবার ফলে আমরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের শক্তিতে রূপান্তরিত করিতে পারি নাই। **নূতন কথা ...সৃষ্টি অপরিসীম**—বাংলাভাষা সংস্কৃত এবং নানা বিদেশী ভাষা হইতে প্রচুর পরিমাণে নূতন শব্দ আত্মসাৎ করিয়াছে। এখনও অনেক নূতন শব্দ তৈয়ারী হইতেছে। এইভাবে নানা বিদেশী শব্দ সম্ভারে বাংলা ভাষা দিন দিন সমৃদ্ধ হইয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। যে ভাষা এইভাবে যত বেশী নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা তত বেশী সমৃদ্ধ হয়, বিচিত্র চিন্তাভাবনা প্রকাশে সমর্থ হয়। আমাদের বাংলা ভাষার এই অপূর্ব বিদেশী শব্দ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে

পারিতেছি না। রায়—অভিপ্রায়, অভিমত, বিচারের সিদ্ধান্ত। আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র—মনু ব্রহ্মার দেহ হইতে উদ্ভূত হন বলিয়া তাঁহার নাম স্বায়ম্ভুব মনু। তাঁহার পুত্রকন্যা হইতেই মানবজাতির বিস্তার হইয়াছে, তিনিই আদি মানব। মানব-ধর্মশাস্ত্রের নামই মনুসংহিতা। হিন্দুজাতির আচার-ব্যবহার এবং ক্রিয়াকলাপের যথাকর্তব্য নির্ধারণ করিয়া যে সংহিতা (যাহাতে বিষয়সমূহ সংহিত, মিলিত, সংগৃহীত বা একত্রিত করা হয়) গ্রথিত হয়, তাহা মনুর দ্বারা সংকলিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদের পরে মনুসংহিতা সংকলিত হইয়া ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে শূদ্রধর্ম নির্দেশিত হইয়াছে। ইহা হইতেই সমাজে শূদ্রের যে কী স্থান ছিল, বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, উচ্চশিক্ষার বাহন ইংরেজি। যিনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সুযোগ পান নাই, কেবল বাংলাই বলেন, তাঁহাকে অশিক্ষিত, অপাংক্তেয় বলিয়াই মনে করা হয়। আধুনিক মনুসংহিতার সামাজিক বিধানে তিনি যেন শূদ্ররূপে গণ্য। তাঁহার উচ্চশিক্ষার কোনও অধিকার নাই। এই আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিতরা ভুলিয়াযান যে, মাতৃভাষায়ই প্রথম তাঁহাদের হাতে-খড়ি হয়, তাহার পর ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সুযোগ পাইয়া তাঁহারা উচ্চশিক্ষিতের গৌরব লাভ করেন। দ্বিজ—ব্রাহ্মণ। একবার মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম গ্রহণ করে, দ্বিতীয় বার উপনয়নের মাধ্যমে মহত্তর জন্মলাভ করে, সেইজন্য ব্রাহ্মণকে দ্বিজ বলা হয়। বেদমন্ত্রে একমাত্র দ্বিজেরই অধিকার। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই আমরা উচ্চশিক্ষার আভিজাত্য লাভ করি—ইহাকেই কবি কৌতুক করিয়া দ্বিজত্ব লাভ বলিয়াছেন। শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার নাই। মাতৃভাষা বাংলায়ও আমাদের উচ্চশিক্ষার অধিকার বা উপায় নাই। অনশন—অন্+অশন (ভোজন), নঞ্—উপবাস, অনাহার। অর্ধাশন—অর্ধেক আহার, আধ-পেটা খাওয়া। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য…কোন মুখে বলা যায়—বিদেশী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে; কেবল ইংরেজি নয়, ফরাসী, জার্মান ইত্যাদি ভাষা শিক্ষার মূল্যও অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালির পক্ষেই বিদেশী ভাষা শিক্ষার সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয়। সেই লক্ষ লক্ষ বাঙালির মানসিক ক্ষুধা দূরীকরণের জন্য উচ্চশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা থাকিবে না, তাহারা আধুনিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইতে বঞ্চিত থাকিবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে উপবাস কিংবা অর্ধাহারই অর্থাৎ অসম্পূর্ণ শিক্ষাই শুধু তাহাদের অদৃষ্টে জুটিবে,

একথা আমরা কোন্ মুখে বলিব। **আশু মুখুজ্জে মশায়…জুড়িয়া দিয়াছেন**—ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন, মৃত্যু ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মবীর আশুতোষের নাম চিরস্মরণীয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯০৪ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং পুনরায় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দুই বৎসরের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন; উপাচার্য হওয়ার পূর্বে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টার ফলে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির উচ্চতম পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহার শিক্ষা-পদ্ধতি অত্যন্ত যান্ত্রিক, জটিল নিয়মবদ্ধ, তাহাতে সামান্য পরিবর্তন আনয়ন করাই দুঃসাধ্য। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ওই যন্ত্রের মাঝখানেই একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন আর্থাৎ পরীক্ষার তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে বাংলার জন্য একটুখানি জায়গা করিয়া দিয়াছেন। এ ব্যবস্থা কেবল ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিদের জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, যাহারা ইংরেজি জানে না, মাতৃভাষার মাধ্যমে তাহাদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রহণ করতে হইবে। **চৌকস** (হিন্দী শব্দ)—দক্ষ, সকল বিষয়ে পটু ও সতর্ক। **পরিমণ্ডল**—পরি (চতুর্দিকে), মণ্ডল (গোলাকার), পরিধি, পরিবেষ্টন। **একদিন মোটের উপর…… জায়গা করা হইয়াছে**—কুস্তির আখড়ায়, ল্যাঙোটের মত হ্রস্বতম পোশাক পরিয়া কুস্তির চর্চা করিতে হয়, তাহাতে সৌন্দর্য ও রুচির কোনও স্থান থাকে না, সেইরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও আশুতোষের পূর্বে ছিল নিছক পরীক্ষা ('একজামিন') পাশের কুস্তির আখড়া, বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রটি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ, সভ্য সমাজের অনুপযোগী। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্যই, কেবল পরীক্ষাগ্রহণ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাচর্চার পরিধিও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। তিনি দেশ-বিদেশ হইতে মনীষীদের আহ্বান করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করেন, তাহাতেই পরীক্ষাপাশের সংকীর্ণ শিক্ষার স্থূলতার উপরে উন্নত ধরনের শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার একটা মার্জিত ও ভদ্র পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে।

অনু ২৬-৪৯ঃ আমদরবার—মুসলমান সম্রাটগণ আমদরবারে জনসাধারণকে দর্শন দিতেন। লেখক মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানাইয়াছেন। **আমি এই বলি…তাতে বাধাটা কী**—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বে কেবল পরীক্ষাপাশের বিদ্যাচর্চায় সংকীর্ণতায় আবদ্ধ ছিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় এই সংকীর্ণ গণ্ডির বাহিরে বৃহত্তর বিদ্যাচর্চার অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পরিবেশে তৈয়ারি হয়। সেই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়ীর ভিতরের আঙিনায় অর্থাৎ পরীক্ষাপাশের শিক্ষাব্যবস্থা যেমন চলিতেছে চলুক, কেবল বাহিরের প্রাঙ্গণে আমদরবারেরও (আমদরবার—আরবী আম=সাধারণ, সর্ব-সাধারণের জন্যে দরবার) বৈঠক বসাইয়া অর্থাৎ বৃহত্তর বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সমস্ত জনসাধারণের সম্পত্তি করিয়া তোলা যাইতে পারে। **রবাহুত**—রব (গোলমাল)+আহুত (আগত), রব বা গোলমাল শুনিয়া আগত, বিনা আহ্বানে বা বিনা নিমন্ত্রণে আগত। **তাদের জন্য বিলিতি টেবিল…মন্দ কী**—বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা পরীক্ষাপাশের বিদ্যাসংগ্রহের জন্য উপস্থিত, তাহাদের জন্য বিলিতি টেবিল অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকুক, কিন্তু বৃহত্তর জনসাধারণের জন্যে দিশি কলাপাত অর্থাৎ মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক; তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের প্রাঙ্গণে শিক্ষার উদার, অকৃপণ ভোজে অংশ গ্রহণ করুক। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার তাহাদের মুখের উপর বন্ধ করিয়া শিক্ষার সুযোগ হইতে যদি তাহাদের বঞ্চিত করা হয়, তবে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-যজ্ঞে কোনও কল্যাণ হইবে না, তাহাতে জনসাধারণের অভিশাপ আসিয়া লাগিবে। **গঙ্গা যমুনার মতো**—ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নদী গঙ্গার উৎপত্তি হিমালয় পর্বতের পাদমূলে গাড়ওয়াল দেশে, আর যমুনা তেহরি রাজ্যে হিমালয় হইতে নিঃসৃত। এই দুইটি নদী এলাহাবাদ শহরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থল প্রয়াগতীর্থ নামে অভিহিত। যমুনার জল নীলাভ আর গঙ্গার জল পীতাভ, এই পার্থক্য সঙ্গমস্থলে সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। **এণ্ট্রান্সের দেউড়িটা**—পূর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষার নাম ছিল এণ্ট্রান্স। দেউড়ি—প্রবেশ দ্বার, সদর দরজা; এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই উচ্চতর শিক্ষালাভের যোগ্যতা অর্জন করা যাইত বলিয়া 'এণ্ট্রান্সের দেউড়ি' বলা হইয়াছে। **ও যেন বিলিতি তলোয়ারের……ভরিবার**

ব্যায়াম—যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তাহার পক্ষে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মতো প্রাণান্তকর কাজ আর কিছু নাই, বিলাতি তলোয়ারের খাপে দিশি খাঁড়া ঢুকাইবার বিসদৃশ, উদ্ভট ব্যায়ামের মতোই। **বিশল্যকরণীর পরিচয়…বহিতে হয়**—বিশল্যকরণী—বি (বিগত, নাই) শল্য (শেল বা চিন্তা) যাহার; ভেষজ উদ্ভিদ বিশেষ, গন্ধমাদন পর্বতের (কাহারো মতে ইহা মানস সরোবরের নিকট তিব্বতে অবস্থিত; বিষ্ণুপুরাণে সুমেরুর দক্ষিণদিকে ইহার অবস্থান নির্দেশ করা হইয়াছে) দক্ষিণ শিখরে ইহার জন্ম। রামায়ণে কথিত আছে, লক্ষ্মণ রাবণ-নিক্ষিপ্ত শক্তিশেলে অচৈতন্য হইলে হনুমান এই ঔষধ আনয়নের জন্য গন্ধমাদন পর্বতে গমন করে এবং ঔষধ চিনিতে না পারায় ইহার শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া আনিলে সুষেণ তাহা হইতে বিশল্যকরণী লইয়া তাহার প্রয়োগে লক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, হনুমান যেমন বিশল্যকরণী চিনতে না পারিয়া গন্ধমাদন পর্বত বহন করিয়াছিল, তদ্রূপ বাঙালির ছেলে ইংরেজি ভাষার প্রকৃত পরিচয় বিশল্যকরণী লাভ করিতে না পারিয়া গোটা ইংরেজি বই (গন্ধমাদন) মুখস্থ করে।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—মহীশূরের উত্তরে কিষ্কিন্ধ্যা নামক পর্বতস্থ কিষ্কিন্ধ্যা নামে নগরী এবং বালীর রাজ্য, বানরদের বাসস্থান। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বানরদের ক্রিয়াকলাপই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড বলিতে বানরসুলভ উদ্ভট, স্থূল, বিসদৃশ কার্যকলাপই বুঝায়। **মেধা**—স্মৃতিশক্তি, ধীশক্তি। **আণ্ডামানে**—আণ্ডামান বা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত, নানা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। ব্রিটিশ শাসনকালে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আন্দামানে দীর্ঘমেয়াদের দণ্ডিত কয়েদীদের, প্রধানতঃ যাবজ্জীবন দণ্ডভোগকারী কয়েদীদের জন্য বিশাল বন্দীনিবাস ছিল; স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু দেশপ্রেমিক সন্তানও এখানে তাঁহাদের জীবনের দীর্ঘদিন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সেই সময় জনবিরল জঙ্গলাকীর্ণ, অস্বাস্থ্যকর আন্দামানে নির্বাসন কঠোরতম দণ্ডরূপেই পরিগণিত হইত। **যাবজ্জীবন আণ্ডামানে চালান হইবার যোগ্য**—সংক্ষেপে, নির্বাসিত হইবার পাত্র। ইংরেজি বিদ্যালয়ে কোন বাংলা জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার থাকে না বলিয়া তাহারা যেন নির্বাসিতের মত দূরে পড়িয়া থাকে। **ইংলণ্ডে একদিন… ফাঁসি হইতে পারিত**—মধ্যযুগে ইংলণ্ড এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে লঘু অপরাধের জন্যও

কঠোরতম দণ্ড দেওয়া হইত। **সভ্যতার নিয়ম অনুসারে পুরস্কার পাইবে তারাই?**—আধুনিক যুগে স্মৃতিশক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পূর্বে মুদ্রণযন্ত্রের সুবিধা ছিল না। মানুষকে তাহার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিতে হইত; আধুনিক কালে ছাপাখানাই মানুষের স্মরণশক্তির কাজ মিটাইয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্মৃতিশক্তি নির্ভর পরীক্ষা-পাশের বিদ্যার অসঙ্গতি প্রসঙ্গে যথার্থই বলিয়াছেন, মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় নিজস্ব বুদ্ধির কিছুমাত্র পরিচয় থাকে না। অথচ আধুনিক সভ্যতার যুগে তাহারাই পরীক্ষাপাশের পুরস্কার পায়; স্বাধীন বিচার-বোধহীন নিছক স্মৃতিশক্তির ও নিম্নস্তরের মুখস্থ করার ক্ষমতার জোরে ধার করা বিদ্যার দৌলতে তাহারা শিক্ষিতের সম্মান লাভ করে। ইহা শিক্ষা নয়, শিক্ষার নামে পরিহাস। **হাবড়ার পুলটাই না হয়…পানসি?**—পূর্বে কালকাতা ও হাবড়া বা হাওড়ার মধ্যে সংযোগকারী একটি ভাসমান সেতু ছিল, জাহাজ চলাচলের সময় দুইদিক হইতে সেতুটির দুই অংশ তুলিয়া লওয়া হইত। ইংরেজি ভাষানির্ভর পরীক্ষার পাশের বিদ্যা যাহারা পার হইতে পারিল না, তাহাদের পক্ষে হাবড়ার সেতুটা না হয় দুফাঁক হইয়া রহিল, অর্থাৎ শিক্ষার রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিবার অন্য উপায় রহিল না; কিন্তু বিদ্যালয়ের জন্য রাষ্ট্রের দিক হইতে কোনরকম ব্যবস্থা (সরকারী খেয়া) থাকিবে না কেন? হাবড়ার সেতুকে ফাঁক করিয়া রাখা হইলে স্টীমার বা পানসিতে (হালকা সরু নৌকা) করিয়া নদী পার হইবার ব্যবস্থা থাকিত, সেইরূপ কোনও ব্যবস্থা না রাখিবার যুক্তি কোথায়? স্টীমার অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ব্যবস্থা যদি না থাকে তবে পানসি অর্থাৎ ক্ষুদ্র স্বল্পব্যয়ের ব্যবস্থাও তো করা যায়।

প্রেপারেটারি ক্লাস—যেখানে উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করা হয়, প্রাথমিক শিক্ষা-শ্রেণী। **সদর রাস্তা**—যে পথে সর্বসাধারণ চলিতে পারে। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হইলে সর্বসাধারণই শিক্ষালাভের সুযোগ পাইবে। সেইটাই হইবে সদর রাস্তা। শিক্ষা ব্যবস্থার ভাষার মাধ্যম ইংরেজি হওয়ায় উহা জনসাধারণের ব্যবহারে লাগে না। উহা যেন সংরক্ষিত রাস্তা। জনসাধারণের সেখানে চলিবার অধিকার নাই। **বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়**—উচ্চতর শিক্ষার প্রারম্ভকাল। **ভাগ্যমন্তের ছেলে……বঞ্চিত করা কেন**—ভাগ্যমন্ত, ধনীগৃহের

শিশুসন্তানের পুষ্টির জন্য ব্যবস্থার কোনও অভাব হয় না, সে তাহার ধাত্রীর স্তন্যেই পুষ্ট, স্বাস্থ্যবান হইয়া উঠিতে পারে। দরিদ্র সন্তানের মাতৃস্তন্যই একমাত্র ভরসা। অপেক্ষাকৃত বিত্তবান বংশের সন্তানেরা ইংরেজি শিক্ষা পাইয়া বৈষয়িক জীবনে সাফল্য অর্জন করুক, তাহাতে কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু দরিদ্রের সন্তানদের মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষালাভের অধিকার হইতে কেন বঞ্চিত করা হইবে? **কেয়ারি**—উদ্যানে বৃক্ষাদির কৃত্রিম ভাবে আলিবদ্ধ ক্ষেত্রখণ্ড, আল দিয়া ঘেরা রোপিত ক্ষেত্রখণ্ড।

বঙ্গসাহিত্যপরিষদ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলিকাতায় অবস্থিত, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। ইহার বিপুল গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান পুঁথি, পুস্তক, সংবাদপত্র রক্ষিত আছে। এগুলি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় গবেষণায় অপরিহার্য। ১৩০১ সালে Bengal Academy of Literature বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রূপান্তরিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন ইহার প্রথম সভাপতি (১৮৯৪)। 'পরিষদ সৃষ্টির শুরু হইতেই রবীন্দ্রনাথ উহার সহিত যুক্ত ছিলেন। আজ সাহিত্য পরিষদ বলিতেই আমাদের মনে যে সুরম্য অট্টালিকা ও বিরাট গ্রন্থাগার প্রভৃতির কথা জাগে, তখন সেসব কিছুই ছিল না; শোভাবাজার রাজবাটীর একটি প্রকোষ্ঠে কয়েকজনে মিলিয়া সভা করিতেন। নিজস্ব গৃহ বলিতে পরিষদের তখনো কিছু হয় নাই'। (রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যদুনাথ সরকার প্রমুখ মনীষীরা বিভিন্ন সময়ে পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

পরিভাষা—বিশেষ অর্থবোধক শব্দ, terminology। **ঢিমাচালে**—মন্থর, বিলম্বিত ভঙ্গিতে। **টাকশাল**—যেখানে মুদ্রা প্রস্তুত হয়। **বাংলার যজ্ঞে**—যজ্ঞের অর্থ, জগতের হিতের জন্য যে পূজার অনুষ্ঠান করা হয়। বাংলার যজ্ঞে—বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের মহৎ পূজায়, পুণ্যানুষ্ঠানে। **রাজভাষার দর···আদরও বেশি**—ইংরেজি ভাষা রাজভাষা। সরকারী কাজকর্মে উহা ব্যবহৃত হয়, কাজেই উহা আয়ত্ত করিলেই অর্থকরী সাফল্যলাভ হইবে, সামাজিক প্রতিষ্ঠাও লাভ করা যাইবে। এইজন্য ইংরেজি ভাষার মর্যাদা ও আদর বেশি। **বীজ হইতে অঙ্কুরকে······মুক্তিদান করিতেছে**—আলোক ও বাতাসের দাক্ষিণ্যে বীজ হইতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর হইতে বৃক্ষের বিকাশ সম্ভবপর হয়; সেইরূপ ইউরোপ-আমেরিকার বিশ-

বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীদের অপরিণত মানসিক শক্তিগুলি যাহাতে পূর্ণতার ঐশ্বর্যে বিকশিত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্য লইয়াই শিক্ষাদানের মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া থাকে। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় দেশের চিত্তকে জাগ্রত করিবার এই মহৎ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই। **পোশাকি ভাষাটা**—পোশাকির অর্থ, যাহা পরিধান করিয়া সভাসমিতি নিমন্ত্রণাদিতে গমন করিতে পারা যায়, যাহা সর্বদা ব্যবহার করা যায় না এবং প্রায়ই তুলিয়া রাখা হয়। পোশাকি ভাষা—আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভাষা, অর্থাৎ ইংরেজি। ইহার সহিত দৈনন্দিন জীবনের কোনও সম্বন্ধ নাই। **আটপৌরে**—সংস্কৃত অষ্টপ্রহর+ইয়া, অষ্টপ্রহরিয়া, তাহা হইতে আটপৌরে; যাহা সর্বদা ব্যবহার করা হয়, নিত্যব্যবহার্য, তোলা বা পোশাকির বিপরীত। **রাজা উজির মারি**—শুধু কথায় রাজা ও মন্ত্রীকে (উজির) হত্যা করি, রাজা উজির মারা বলিতে নিজেদের সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত গালগল্প করাই বুঝায়। **বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া…রাজা উজির মারি**—ভাষা হইল চিন্তার স্বাভাবিক বাহন। আমাদের দেশে প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষার ফল এই হইয়াছে যে, আমরা যাহা কিছু শিক্ষা করি, তাহা বিদেশী ভাষায় শিখি বলিয়া সহজে আমাদের নিজেদের জিনিস হইতে চাহে না। পরিচ্ছদের বেলায়, পোশাকি ও আটপৌরে বলিয়া যে পার্থক্য আছে, ভাষার ক্ষেত্রেও আমাদের তেমনই একটা পার্থক্য আছে। ইংরেজিটা শেখা হয় পোশাকি রূপে; এদিকে আমাদের মনের ভাব ব্যক্ত করি বাংলা ভাষায়; আলনায় তুলিয়া রাখা পোশাকের মত ইংরেজি ভাষাকেও আমরা প্রতিদিনকার জীবন হইতে সরাইয়া রাখি। ফলে ভাষার মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা তোলাই থাকে। পক্ষান্তরে যদি বাংলা ভাষায় শিক্ষা অর্জন করি তবে তাহা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সহজেই প্রকাশ পায়। অর্থাৎ শিক্ষার সহিত প্রাণের যোগ স্থাপিত হয়। **পোষণ**—পুষ্টকরণ, বর্ধন, পালন। **ডিগ্রির টাকশালার ছাপ**—টাকশাল হইতে যেমন ছাপমারা মুদ্রা প্রস্তুত করা হয়, তদ্রূপ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রির ছাপ মারা যে বিদ্যা পাই, তাহা অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই ছাঁচেঢালা বিদ্যায় আমরা জীবনের প্রকৃত পাথেয় পাই না। **অর্ঘ্য**—যাহার দ্বারা পূজা করা হয়, পূজার উপকরণ।

বরদা—অভীষ্টদাত্রী বা দেবতা বা মহৎ ব্যক্তি—যিনি প্রার্থিত বস্তু দান করেন। **বাঙালী অভিভাবকদের…কিনা সন্দেহ**—বাস্তব জীবনে আমরা

অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লাভবান হইতে চাই, সেই লাভালাভের বিচারে মাতৃভাষা উপেক্ষিত হইয়াছে। অভিভাবকেরা এই লাভালাভের বিচার করিয়াই ইংরেজির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। **ইংরেজি চালুনির ফাঁক... এখানে পাওয়া যাইবে**—চালুনি, ধান ইত্যাদি চালাইয়া পরিষ্কার করিবার বংশ-নির্মিত অজস্র ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার চালুনির ফাঁক দিয়া যে সকল ছাত্র পড়িয়া থাকিতেছে, অর্থাৎ ইহার সুযোগ লাভ করিতেছে না, তাহারা মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে। **বাজারদরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে**—বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষাপাশের যে বিদ্যা বিতরণ করে, জীবিকার বাজারেই তাহার মূল্য নিরূপিত হয়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত বাংলা ভাষার মাধ্যমে সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটা পরিমাণেই এই বাজারদরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, নিছক জীবিকা সংস্থানের দ্বারা তাহার উপযোগিতা বিচার করা হইবে না। **আঁধি**—বায়ুবেগে উত্থিত ধুলায় চতুর্দিক অন্ধকারময় হয় এবং সকলকে অন্ধ করে। আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষার পাণ্ডিত্যের ধুলায় ছাত্রদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়, তাহাদের প্রকৃত জ্ঞানদৃষ্টি জন্মায় না। **একদিন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি...বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল**—উনবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিই বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়া ইংরেজিতে রচনাপূর্বক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য মোহগ্রস্ত হইতেন। মাইকেল মধুসূদন ইংরেজি ভাষায় কবি-খ্যাতি অর্জনের জন্য 'ক্যাপ্‌টিভ লেডি' রচনা করিয়াছিলেন, স্বয়ং বঙ্কিমও 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ' নামে একটি ইংরেজি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহাদেরই হৃদয়ের শ্রদ্ধায় প্রীতিতে অভিষিক্ত হইয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত হইল। **যাচনদার**—দ্রব্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ এবং তাহার মূল্য যে পরীক্ষা ও নির্ধারণ করে। **বনস্পতি**—যে বৃক্ষের ফল হয় কিন্তু ফুল লক্ষিত হয় না। অশ্বত্থ, বট ইত্যাদি বৃক্ষ; বিশাল, বিরাট বৃক্ষ। **তপোবন**—তপঃ (তপস্যার) বন (আশ্রয়), মুনি ঋষিদের তপস্যার স্থান। **নালন্দা**—বিহারের বড়গাঁও স্টেশন হইতে এক মাইল এবং রাজগীর হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এখানে জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। নালন্দার মঠ সম্রাট অশোক কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া উক্ত হয়; পরে শংকর ও সুন্দলগোমী নামক ব্রাহ্মণ-

দ্বয় কর্তৃক সংস্কার করা হয় ও মঠ এবং শিক্ষায়তন বিস্তৃততর ক্ষেত্র ও বৃহত্তর আকারে নির্মিত হয়। এত বিশাল বিদ্যায়তন তখন ভারতবর্ষে আর ছিল না। বহু দূরবর্তী দেশগুলি হইতেও শিক্ষার্থীরা এখানে সমবেত হইত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্ নালন্দায় দুই বৎসর কাল ধরিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নালন্দায় সঙ্ঘারামসমূহে তখন শত শত আচার্য ও দশ সহস্রাধিক ছাত্র বাস করিত। হুয়েনসাঙের অবস্থিতিকালে বঙ্গদেশের অন্তর্গত সমতটের রাজবংশোদ্ভব শীলভদ্র নামে একজন মহাপণ্ডিত ভিক্ষু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাস্থবির ছিলেন। পালরাজাদের সময় ইহা প্রধান বৌদ্ধতীর্থ ছিল। নাগার্জুনও এখানে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নয়নপালদেবের রাজত্বকালে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নালন্দার সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত হন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নালন্দা বিহার বিরাজমান ছিল। কোন্ সময়ে ইহার ধ্বংস হয় জানা যায় নাই। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধযুগের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি। **তক্ষশিলা**—পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি হইতে কুড়ি মাইল দূরে কাল্‌কাসরাইয়ের (সরাইকেলা স্টেশন) সন্নিহিত শাহদেরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন নগরী। তক্ষ বা তক্ষাক নামক তুরাণী জাতি এই প্রদেশে বাস করিত বলিয়া অনুমিত হয়; এই জাতির নাম হইতে তক্ষশিলা নাম উৎপন্ন। মহাভারতের উল্লেখ অনুযায়ী এই স্থানে মহারাজ জনমেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইহা গান্ধারের প্রাচীন রাজধানী ছিল। এই স্থানের খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ধর্ম, রসায়ন, চিকিৎসা ও অন্যান্য বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কেন্দ্রস্থল হিসাবে জগতে বিখ্যাত হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডার এখানে তিনদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তখন এখানকার সম্রাট্ ছিলেন তক্ষশিলেশ। ইহার আশি বৎসর পরে সম্রাট্ অশোক তক্ষশিলা জয় করেন। **টোল**—সংস্কৃত পাঠশালা। **চতুষ্পাঠী**—চতুর (চারিটি বেদ) পাঠ (অধ্যয়ন) হয় যেখানে,—বেদ অধ্যয়নের স্থান। **ভারতের দুর্গতির দিনেও……সাহস করিয়া বলা যাক না কেন**—বৈদেশিক শাসনাধীনে ভারতবর্ষের যখন শোচনীয় অবস্থা, তখনও টোল চতুষ্পাঠী প্রভৃতি শিক্ষায়তনগুলি দেশের প্রাণপ্রবাহ হইতেই প্রাণশক্তি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বিদ্যাচর্চায় দেশকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়কেও সেইভাবে চারিপাশের জীবনের সহিত যুক্ত হইয়া সেই জীবনীশক্তির সাহায্যে মানুষলোকে নূতন সৃষ্টির

ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে। **সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র—"আমরা চাই"**—উপনিষদে আমরা দেখি, সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি একাকিত্বে সন্তুষ্ট না হইয়া বহুত্বে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিলেন, তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা হইতেই জগৎ-সংসারের সৃষ্টি হইল। এই আকাঙ্ক্ষাই সকল প্রকার সৃষ্টির মন্ত্র। সেইরূপ দেশের শিক্ষাগুরুরা মাতৃভাষায় সকলের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য উৎসুক হইলেই মাতৃভূমি সৃষ্টির ঐশ্বর্য পূর্ণ হইবে। **আচার্য**—যিনি শ্রেষ্ঠ আচার (শাস্ত্রের ব্যবহারে) গ্রহণ করাইয়া সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করান, শিক্ষক। **বাষ্প যেমন মেঘে······পূর্ণ করিয়া তুলিব**—এই পংক্তি কয়টির মধ্যে প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ দেশের শিক্ষাপিপাসু জনচিত্ত ও দেশের সাহিত্যসাধক—এই দুয়ের মধ্যে প্রত্যাশিত মিলনের এক অন্তরঙ্গ চিত্র রূপকাত্মক ভঙ্গিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আশাবাদী প্রবন্ধকারের বিশ্বাস, যাহাদের মধ্যে যোগ স্বাভাবিক নিয়মে অবশ্যম্ভাবী তাহারা কোন না কোন দিন পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইবেই। মাতৃভাষার শিক্ষার প্রসাদলাভে ধন্য হইবার জন্য দেশবাসী আকুল। একদিকে দেখা দিয়াছে এই ঐকান্তিক আগ্রহ, আর একদিকে দেশের সাহিত্যসেবী সাধক বা আচার্যস্থানীয় মনীষিগণের মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকাদি রচনায় সুবিপুল সৃজনক্ষমতা—এই দুই-এর মধ্যে মিলন না হইলে বিপর্যয় অনিবার্য। বাষ্প মেঘের সহিত মিলিত না হইলে এবং মেঘ দ্রবীভূত হইয়া ধারাবর্ষণে ধরণীতল সিক্ত না করিলে যেমন স্বাভাবিক বিপর্যয় ঘটে, শিক্ষার্থী মনের অপরিসীম আকুলতা দেখিয়া তাহা মিটাইবার জন্য দেশের মনীষিগণের মধ্যে মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনার ব্যাকুলতা দেখা না দিলে ঠিক তেমনই বিপর্যয় আসিয়া উপস্থিত হয়। লেখকের মতে ইহা অসম্ভব। **কেজো কথা**—কাজের কথা বা প্রয়োজনীয় কথা।

॥ ব্যাখ্যা ॥

[১] চাষিকে বিদ্যা······শুনিতে পাওয়া যায়। (অনু-১)

আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন' নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। যে শিক্ষা মানবজীবনে অপরিহার্য তাহাকে সর্বসাধারণের

মধ্যে বিস্তৃত করা একান্ত প্রয়োজন—অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন এক শ্রেণীর লোক তাহা স্বীকার করেন না। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় সংকীর্ণ-বুদ্ধি মধ্যযুগীয় মনোভাবকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক শিক্ষাকে সর্বজনীন করিয়া তুলিবার বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। তাঁহাদের এই মতবাদের সপক্ষে তাঁহাদের বক্তব্য—যে চাষী বা শ্রমজীবীর শ্রমের উপর নির্ভর করিয়া মানুষের জীবনযাত্রা চলিতেছে তাহাদের ভিতর শিক্ষার প্রচলন হইলে চাষবাসের কাজে তাহাদের স্বাভাবিক ভাবেই বিতৃষ্ণা আসিবে। তাহারাও চাকরীর বাজারে ভিড় করিবে। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কেও ইহারা বিরুদ্ধবাদী। এক্ষেত্রে তাঁহাদের বক্তব্য, ভারতীয় স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম পতিসেবা ; দেবতা-ব্রাহ্মণে অবিচল ভক্তি রাখিয়া স্বামীর সংসার পরিচালনায় তাহার নারীজীবনের সার্থকতা। শিক্ষার আলোক পাইলে, মনুষ্যত্ব বিকাশলাভ করিলে, এতকাল অন্ধভাবে নির্বিচারে যাহাকে একমাত্র ধর্ম বলিয়া মানিয়াছে, পুরুষ-প্রধান সমাজ ব্যবস্থা নির্বিচারে যে সকল অনাচার ও অবিচারকে ধর্মের অনুশাসন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে হয় তো সে অস্বীকার করিয়া বসিবে। এখানেই ইহাদের আতঙ্ক। সমাজদেহের অর্ধাংশকে পঙ্গু রাখিয়া অপরার্ধ যে কর্মক্ষম থাকিতে পারে না—স্বার্থবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হইয়া ইহারা তাহা বিস্মৃত হন।

[২] এই আলোতে······বিচ্ছিন্ন হয়। (অনু-২)

উদ্ধৃত অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন' নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। নিছক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বেও বিদ্যার বৃহত্তর সার্থকতার আলোচনা প্রসঙ্গে কবি এই উক্তিটি করিয়াছেন।

নিছক প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় যে মানুষের কত প্রয়োজন মিটে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমা ছড়াইয়া বিদ্যা বা জ্ঞানের গভীরতর ও বৃহত্তর মূল্য দেখিতে পাওয়া যায়। একটি তুলনার দ্বারা এই সত্যটিকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। দিনের আলোক আমাদের ব্যবহারিক জীবনের নানা কাজের পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাহার সকল সার্থকতা ইহাতেই নিঃশেষিত হইয়া যায় না। আমরা যখন মানুষের জাগরণের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করি, তখন দিনের আলোককে কাজের প্রয়োজন অপেক্ষা

আরও বড় করিয়া দেখিতে পারি। দিনের আলোকের বৃহত্তর সার্থকতা আছে। এই আলোকে মানুষ পরস্পরকে চিনিতে পারিয়া মিলিত হয়, কিন্তু এই আলোকের অবসানে অন্ধকারে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়। সেইরূপ বিদ্যার পুণ্য তীর্থে মানুষ সম্মিলিত হইতে পারে, সহস্র হৃদয় বিদ্যার রাখীবন্ধনে বাঁধা পড়িতে পারে। মানবসমাজে জ্ঞানই সর্বপ্রধান ঐক্যসূত্র। অজ্ঞানতায় মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়, বৃহত্তব জগতের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক থাকে না। জ্ঞানের নির্মল আলোকে এই বিশাল জগৎ মানুষের নিকট উন্মোচিত হয়, পক্ষান্তরে অন্ধকার তাহাকে দৃষ্টিশক্তিহীন করে ও বৃহত্তর জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তোলে।

[৩] যদি ভারতের দেবতা স্বর্গ বিশ্বদেবতার। (অনু. ৭)
[বর্ধঃ বিশ্বঃ ১৯৭১]

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন' নামক প্রবন্ধ হইতে উৎকলিত হইয়াছে। আমাদের দেশে কেন বিদ্যা আমাদের জীবনের সামগ্রী হইয়া ওঠে না, এই প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য উক্তিটি করিয়াছেন।

বস্তুত সত্য কোনও সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নহে, তাহা সর্বজনীন, সর্বদেশেব সর্বকালের মানুষের জীবনের সামগ্রী , তাহা মহাদেশের মতোই ব্যাপ্ত, দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন নয়। যদি এমন কোনও ভালো জিনিস থাকে যাহা একমাত্র ভারতবর্ষের পক্ষেই ভাল, তবে তাহা যে যথার্থ ভালো নয়, একথা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভারতবর্ষেও একদিন যে সত্যেব দীপ প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা যদি পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিতে না পারে তবে তাহা আলোকই নয়। ভাবতের দেবতা যদি একমাত্র ভারতেরই সম্পত্তি হন, তাঁহাকে এখানেই গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন , কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার, সর্বজাতির। আমাদের দেবতা আর কাহারও নহে, এই অন্ধ, সংকীর্ণ ভক্তিতে যথার্থ কল্যাণকে পাওয়া যায় না। নিখিল মানব প্রাণের ঐক্যবোধেই আমরা তাহাকে পাইতে পারি। সত্য সার্বভৌম এবং সনাতন, তাহাকে কেবল মাত্র নিজেদের সম্পত্তি করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে আমরা তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইব।

[৪] আমরা ঠিক করিয়াছি সংসারে চলিবার পথে…… আমাদের ডানা ঠিক তার উল্টো দিকে গজাইবে। (অনু. ৮)

উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

আলোচ্য অংশে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সর্বজনীন:প্রসারে একদল লোক যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন।

এক সময়ে মহামতি গোখলে ভারতবর্ষে সর্বজনীন শিক্ষার প্রসারকল্পে আবেদন করিয়াছিলেন। সে সময় তিনি বাংলাদেশ হইতে সর্বাপেক্ষা বেশি বাধা পান। বাংলাদেশের এই দুর্বুদ্ধিকে ধিক্কার জানাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, তখন যেন বাংলাদেশকে ভূতে পাইয়াছিল। প্রচলিত বিশ্বাস, ভূতের গতি পশ্চাৎমুখী। এই শব্দটিকে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে প্রয়োগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের সেই দুর্বুদ্ধিকে উপহাস করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, একটি বিষয়ে বাঙালী পাশ্চাত্যমুখী—তাহা হইতেছে রাষ্ট্রীয় নীতি-নিয়ম লইয়া রাজনীতির প্যাঁচ কষাকষি। অথচ সামাজিক জীবন শিক্ষায় সভ্যতায় পূর্ণ না হইলে জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়—এ সত্য যেন বাঙালীর বিচারবুদ্ধির অতীত। অশিক্ষিত মানুষকে দিয়া কোন কাজই হয় না। সুতরাং দেশের প্রকৃত কল্যাণের জন্যই অশিক্ষার অন্ধকার নাশ করিয়া জ্ঞানের আলোকে দেশবাসীর চিত্তকে উদ্ভাসিত করা প্রয়োজন। এ প্রয়োজন অস্বীকার করিলে সমাজ আত্মঘাতী হইবে। অথচ বাঙালী এই অপরিহার্য কর্তব্য উপেক্ষা করিয়া জাতীয় জীবনের গতির ক্ষেত্রে পিছু হাঁটিতেছে, কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রে সে বড় বড় পা ফেলিয়া সম্মুখে চলিতেছে। বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া এই অগ্রগমনের প্রয়াস চিন্তার বিকৃতি মাত্র। এমন বিকৃতিকে ভূতে পাওয়া ছাড়া আর কী বলা যাইতে পারে!

গোখলে পরিচালিত সর্বজনীন শিক্ষার বিরোধিতা করিয়াই বাঙালী এই তিক্ত মন্তব্যের সম্মুখীন হইয়াছে।

[৫] এ দেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার……আমাদের কাছে চলিবে না। (অনু. ১১)

আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। এখানে লেখক তথাকথিত উচ্চশিক্ষার আড়ম্বর ও ব্যয়বহুলতার বিরুদ্ধে মন্তব্য করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গটি আলোচনা করিতে বসিয়া লেখক দেখাইয়াছেন, ভারতীয় জীবনাদর্শে আড়ম্বরের কোন স্থান নাই। এদেশে আঙিনায় বিছানো মাদুরের

উপরে যে কোন আসর জমিয়া উঠিতে পারে। ধনীর বাড়ীর ভোজেও এখানে কলার পাতায় সুতৃপ্ত ভোজন হয়। টেবিল-চেয়ার কিংবা কাঁটা-চামচের কোন প্রয়োজন হয় না। বিদ্যার ক্ষেত্রেও এই কথাটি সমভাবেই সত্য। সেখানে লক্ষ্য করা যায় দৈন্য কখনও সুশিক্ষার পথে প্রবল অন্তরায় হইয়া উঠিতে পারে নাই। বরং অনেক ক্ষেত্রেই দৈন্য সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি লাভের সহায়ক। ধনীর বৈভব-বিলাসের মধ্যে বিদ্যার সহজ বিকাশ কুণ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে দেখা যায়, দরিদ্র ঘরে জন্মলাভ করিয়াও দারিদ্র্যের দারুণ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অনেকে পাণ্ডিত্যের উচ্চশিখরে স্থানলাভ করিয়াছেন। দারিদ্র্যে তাঁহাদের প্রতিভা ম্লান হয় নাই, বরং উজ্জ্বলতর হইয়াছে। সুতরাং আমাদের ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে প্রকৃত শিক্ষাকে কখনও লক্ষ্মীর কৃপা-নির্ভর হইয়া থাকিতে হয় নাই। তাহাকে লক্ষ্মীর কৃপা-নির্ভর বলাও তাই অসঙ্গত। এদেশে চিরকালই অনাড়ম্বর পরিবেশে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়াছে।

[৬] ঘরের দেয়াল আমাদের পক্ষে……দেবতার 'পরে।

(অনু. ১২)

সচ্ছল ইউরোপীয় দেশগুলির মত আমাদের এই দরিদ্র দেশেও আমরা যদি আমাদের শিক্ষায়তনগুলিকে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ করিয়া তুলি, তবে আমরা ভুল করিব, এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ উক্তিটি করিয়াছেন।

দেশের জল-হাওয়া, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই আমাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে। শীতপ্রধান ইউরোপে প্রকৃতি কৃপণ বলিয়াই মানুষকে নিজের চেষ্টায় নানা উপকরণ, সাজসরঞ্জাম তৈয়ারী করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। প্রকৃতির নির্মমতাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য ঘর সেখানে নিশ্ছিদ্র, দেহ জটিল পোশাক-পরিচ্ছদে আবৃত, দেহে উত্তাপ সঞ্চারের জন্য বিপুল ভোজ্যবস্তুর সমারোহ। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রকৃতি উদার, উন্মুক্ত, অকৃপণ; জীবনযাত্রায় প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা এত বেশি যে, এখানে উপকরণ-বাহুল্যের কোনও প্রয়োজন হয় না। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে হাওয়া চলাচলের জন্য ঘরের দেয়াল অপেক্ষা দেয়ালের ফাঁকই বেশি প্রয়োজন। ইউরোপের মতো আমাদের সর্বাঙ্গ পোশাকে আচ্ছাদিত করিতে হয় না, আমাদের দেহের অনেকটা অংশই সূর্যকিরণে সতেজ ও পুষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন, আমাদের গায়ের

কাপড়ের অনেকটা অংশ তাঁতীর তাঁতের চেয়ে আকাশের সূর্যকিরণেই বোনা হইতেছে। দেহে উত্তাপ সঞ্চারের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহার জন্য আমাদের রন্ধনশালার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয় না; আমরা দেবতার দানস্বরূপ প্রকৃতির নিকট হইতেই অনেকটা পরিমাণে সেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকি। সুতরাং বস্তুবাহুল্য আমাদের স্বভাবের উপযোগী নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করিয়া লইলে উহাই আমাদের পক্ষে কল্যাণকর হইবে।

টীকা: বরাত (ফারসী শব্দ)—কাজের ভার।

[৭] উপকরণের একটা সীমা……সেখানে দুর্বল। (অনু. ১৩)

উদার, উন্মুক্ত, অকৃপণ প্রকৃতির দান লাভ করিয়া ভারতবর্ষ চিরদিন আড়ম্বরকে পরিহার করিয়া আসিয়াছে, তাহার সেই জীবনধর্ম প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য উক্তিটি করিয়াছেন।

মোহগ্রস্ত না হইয়া সত্যকে আমরা যদি গভীর ভাবে দেখিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, উপকরণ-প্রাচুর্যে আমরা সত্য ও অমৃতকে পাই না। জীবনযাত্রার জন্য উপকরণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য, কিন্তু উপকরণাদি বৃদ্ধি করিবার একটা সীমা আছে; সেই সীমা অতিক্রম করিলেই মানবাত্মার চিরন্তন অমৃত-সম্পদের সহিত তাহাদের বিরোধ উপস্থিত হয়। ভোগ্যবস্তুর মাত্রাতিরিক্ত প্রাচুর্যে, আড়ম্বরপূর্ণ সমারোহে মানবাত্মা তৃষ্ণার্ত হইয়া হাহাকার করিতে থাকে; সে কোনও আশ্বাস, আশ্রয় খুঁজিয়া পায় না। ঐশ্বর্যের উপকরণ-বাহুল্য তাহাকে দুঃখজয়ী অমৃতের স্পর্শ আনিয়া দিতে পারে না; তাহার অন্তর উপবাসীই থাকিয়া যায়। মেদের প্রাচুর্য স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, প্রকৃত জীবনী-শক্তির লক্ষণ নয়। মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দুর্বল। সেইরূপ যে জীবনে উপকরণ যত অধিক, আত্মার অমৃত-ঐশ্বর্য তত কম।

টীকা: মজ্জা—অস্থির মধ্যে যে কোমল স্নেহময় পদার্থ থাকে marrow; ইহাই সার-অংশ।

[৮] দৈন্য জিনিসটাকে আমি……তাহা সাত্ত্বিক। (অনু. ১৪)

উপকরণ বাহুল্য পরিহার করিয়া ভারতবর্ষ যে চিরদিন সরল জীবনধারাকে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে, সেই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিটি করিয়াছেন।

সরলতা এবং দৈন্য এক বস্তু নয়। দীনতা, অভাব মানুষকে ক্ষুদ্র ও মলিন করে; তাহা তামসিক, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিমূলক; তাহাতে মানুষের কোনও গৌরব ও মহত্ত্ব নাই। দৈন্য নিশ্চয়ই কাম্য বস্তু হইতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত অনাড়ম্বর সরলতা আড়ম্বরের অভাব মাত্র নয়, তাহা পূর্ণতারই একটি দিক, জীবনের পরম ঐশ্বর্য। এই সরলতা মানুষের জীবনকে নির্মল ও পবিত্র করে; ইহা তাহার মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায়। এই অনাড়ম্বর সরলতা বিলাসীর ভোগসামগ্রী অপেক্ষা অনেক মূল্যবান, ইহা শুদ্ধ সাত্ত্বিক। সাত্ত্বিকতা গুণের প্রভাবে যেমন মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া প্রভৃতি জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তেমনি অনাড়ম্বর, নির্মল জীবন মানুষকে অমৃতের স্পর্শ আনিয়া দেয়, তাহাকে পূর্ণ ও বিকশিত করে।

টীকা: তামসিক, সাত্ত্বিক—শব্দার্থ ও টীকা অংশ দেখ।

[৯] যে বেচারা বাংলা বলে……আমরা দ্বিজ হই?

(অনু. ২০)

আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন' নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। মাতৃভাষাই যে শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত এখানে লেখক দৃঢ়ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

জাপানী ভাষার ধারণশক্তি বাংলা ভাষা অপেক্ষা অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও জাপান মাতৃভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিয়া অল্পকালের মধ্যে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়াছে। অথচ আমাদের দেশে মাতৃভাষা একমাত্র প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। উচ্চ-শিক্ষার মাধ্যম রহিয়াছে বিদেশী ভাষা—ইংরেজি। যাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিবে, তাহাদের বিদেশী ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ফলতঃ মুষ্টিমেয় লোকই এই উচ্চশিক্ষার অধিকার পাইতেছে আর লক্ষ লক্ষ লোক উচ্চশিক্ষা লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে

লেখক এই জাতীয় মনোভাবের প্রতি ব্যঙ্গ করিয়া একটি উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন। মনুসংহিতার নির্দেশ অনুসারে শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার নাই; একমাত্র ব্রাহ্মণই উহার অধিকারী। যাহারা ইংরেজি জানে না তাহারা যেন শূদ্র—উচ্চশিক্ষায় তাহাদের কোন অধিকার নাই। কিন্তু ইংরেজি ভাষা

শিখিলেই তাহাদের বিজয় লাভ হইবে, উচ্চশিক্ষার আসরে তাহাদের প্রবেশ-লাভ ঘটিবে।

[১০] যে ছেলে পরীক্ষাশালায়……কম কী করিল।

(অনু. ৩১)

আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। শিক্ষার মাধ্যম যে মাতৃভাষাই হওয়া উচিত লেখক তৎ-প্রসঙ্গেই এই মন্তব্য করিয়াছেন। মন্তব্যটি রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব মৌলিক পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচায়ক।

বিদেশী ইংরেজি ভাষার সহিত বাঙালীর স্বাভাবিক অপরিচয় ও দূরত্বের জন্য এই ভাষা সহজে আয়ত্ত হয় না। তখন মুখস্থ বিদ্যার আশ্রয় লইতে হয়। এক্ষেত্রে অধিক মুখস্থ করিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, তাহারা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই মুখস্থশক্তি কম থাকাটা কোন অপরাধ নয়; বরং এই মুখস্থ বিদ্যা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকেই নষ্ট করিয়া দেয়।

শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষলাভ, চিত্তবৃত্তির সমুন্নতি সাধন। কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষাগৃহে বই দেখিয়া নকল করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। সে প্রকৃতপক্ষে কতটুকু শিখিল, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি কতটুকু বিকাশলাভ করিল, বই দেখিয়া নকল করায় তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সে নিন্দার পাত্রও বটে। কিন্তু যদি কোন শিক্ষার্থী কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়—তাহার সাফল্য আমরা স্বীকার করিয়া লই। কিন্তু এক্ষেত্রে শিক্ষার ফলে তাহার চিত্তবৃত্তির কি উৎকর্ষলাভ হইল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহারা না বুঝিয়া মাত্র মুখস্থ বিদ্যার জোরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, কবি তাহাদের চৌর্যবৃত্তির অপরাধে অভিযুক্ত করিয়াছেন। চাদরের তলায় বই লুকাইয়া নকল করা যেমন চৌর্যবৃত্তি, শিক্ষণীয় বিষয় মুখস্থ করিয়া মগজের মধ্যে পুরিয়া লইয়া পরীক্ষা দেওয়াও অনুরূপ চৌর্যবৃত্তি। চাদরের তলায় লুকানো বই যেমন শিক্ষার্থীর অন্তরের সামগ্রী নহে, মুখস্থ বিদ্যালব্ধ জ্ঞানও সেইরূপ তাহার অন্তরের সামগ্রী নহে। ইহা প্রকারান্তরে চৌর্যবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

[১১] ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে……মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন ? (অনু. ৩৫)

আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এখানে লেখক ইংরেজি শিক্ষিত ভাগ্যবানদের কথা প্রসঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা-বঞ্চিত ভাগ্যহীনদের পক্ষে কিছু মন্তব্য করিয়াছেন।

প্রবন্ধকারের ধারণা, একই বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ইংরেজি ও বাংলা ভাষার গঙ্গা ও যমুনা প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়, তবে ইংরেজি রাস্তাটিতে পদক্ষেপকারীদের ভাগ্যেই বেশী সমাদর জুটিবে। লেখক তাহাতে কোন অনুযোগ করিতেছেন না, কেন না অনুযোগ করিবার কিছু নাই। জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই যে ইংরেজি ভাষার মূল্য বেশী তাহা তিনি ভাল ভাবেই জানেন। তাঁহার মতে বাংলা ভাষা কিছুটা অনাদর সহ্য করিতে অরাজী নহে ; কিন্তু নির্মম অবহেলা সহ্য করা তাহার পক্ষে কঠিন। জীবনে টিঁকিয়া থাকিবার একটি পথ খোলা থাকা প্রয়োজন। এই পথ যে আরামের হইতে হইবে তাহা নহে, তবে তাহা উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন।

ধনীর সন্তান হইয়া যে জন্ম নিয়াছে, সেই ভাগ্যবান যদি ধাত্রীর স্তন্যপানে পরিপুষ্ট হয় তাহাতে আপত্তি নাই ; কিন্তু দরিদ্র-সন্তান যদি তাহার দরিদ্র মাতার স্তন্য পান করিবার সুযোগ পায় তবে আর আক্ষেপ করিবার কিছু থাকে না। কিন্তু ধাত্রীস্তন্যও জুটিল না আবার মাতৃস্তন্য হইতেও বঞ্চিত হইতে হইল, এমন অবস্থার সৃষ্টি হইলে তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করাই সুকঠিন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা ইংরেজি পদ্ধতিতে লেখাপড়া শিখিতেছে তাহারা ধাত্রীস্তন্য-পালিত ধনী-সন্তানের তুল্য। কিন্তু যাহারা বাংলা ভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষাই বোঝে না, তাহারা যদি বাংলা ভাষায় কিছু শিখিতে না পায় তবে তাহাদের অবস্থা হইবে মাতৃস্তন্য বঞ্চিত দুর্ভাগা সন্তানের ন্যায়। এখানে প্রবন্ধকার শিক্ষাকে জীবনধারণের স্তন্যের সহিত, ইংরেজি ভাষাকে ধাত্রীস্তন্য ও বাংলা ভাষাকে মাতৃস্তন্যের সহিত তুলনা করিয়া বক্তব্যটিকে সহজ সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজি শিক্ষা ব্যয়সাধ্য বলিয়াই উহা একমাত্র ভাগ্যবানদের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব, আর বাংলায় কোন আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই বলিয়াই উহা দরিদ্রের নিকটও সহজলভ্য এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

[১২] বাষ্প যেমন মেঘে মেলে… পূর্ণ করিয়া তুলিবে। (অনু ৪৮)
[বর্ধঃ বিশ্বঃ ১৯৬৮]

আলোচ্য অংশে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে পরস্পর সম্মিলিত হইবার জন্য দেশের শিক্ষকদের প্রতি উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছেন।

পুঞ্জ পুঞ্জ বাষ্পকণাসমূহ একত্রিত হইয়াই মেঘ সৃষ্টি করে, সেই মেঘেরই ধারাবর্ষণে পৃথিবী অভিষিক্ত হয়, মৃত্তিকা সুফলা হইয়া ওঠে। বাষ্প মেঘের মধ্যে আসিয়া মিলিত হয় বলিয়া পৃথিবীর তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দূর হয়। ঠিক তেমনিভাবে দেশের যাঁহারা শিক্ষক, জ্ঞানব্রতী, তাঁহারা যদি তাঁহাদের জ্ঞানের প্রচেষ্টাগুলিকে বিচ্ছিন্ন না রাখিয়া মাতৃভাষায় যদি তাহাদের বিভিন্ন ধারাগুলিকে সম্মিলিত করেন, মাতৃভাষার পুণ্য প্রাঙ্গণটিতে সকলে আসিয়া সম্মিলিত হন, তবে তাঁহাদেব সাধনা মেঘের মতোই মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে। আমাদের বিদ্যাচর্চার বাহন মাতৃভাষা নয় বলিয়াই তাহা দেশের জনসাধারণের মানসিক ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে দূর করিতে পারিতেছে না, জনচিত্ত মরুভূমির মতোই শুষ্ক ও তাপদগ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রের আচার্যেরা যদি মাতৃভাষায় তাঁহাদের সাধনার ধারাগুলিকে একত্রিত করেন, তবে তাহা সমগ্র দেশের তৃষ্ণায় জল ও ক্ষুধায় অন্ন দান করিতে পারিবে।

[১৩] কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো কথায়……সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়। (অনু. ৪৯)

রবীন্দ্রনাথ আশা করিয়াছেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অতীতের নালন্দা তক্ষশিলার মতোই শিক্ষার পুণ্যতীর্থ হইয়া উঠিবে। বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিসিঞ্চিত করে, তেমনি করিয়া দেশের শিক্ষাগুরুরা একত্রে মিলিত হইবেন, তাঁহাদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে। সেই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিটি করিয়াছেন।

বাংলাদেশের পরাধীনতার সময়ই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই আশার বাণীটি

ভাষা শিক্ষায় স্বভাবতই অপটু, তাহারা কোনও মতে প্রবেশিকা স্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অকৃতকার্য হয়। বিশেষত, প্রথম দিকে উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে যথাযথ নিয়মে ইংরেজি শিক্ষা করিবার সুযোগ অতি অল্প ছেলেরই হয়, দরিদ্র ঘরের ছেলের তো হয়ই না, তাহাদের অন্ধভাবে মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর করিতে হয়, আর যাহাদের মেধা নিতান্ত সাধারণ তাহারা তাহাও পারে না। তাহাদের অকৃতকার্যতা দেশের পক্ষে মর্মান্তিক অপচয়। চিন্তার স্বাভাবিক বাহন মাতৃভাষা। আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত বলিয়াই আমরা উচ্চাঙ্গের শিক্ষা পাইয়াও উচ্চস্তরের চিন্তা করিবার শক্তি অর্জন করিতে পারি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাসের ছাঁচে-ঢালা বিদ্যায় দেশের চিত্ত-শক্তির উদ্বোধন কোনদিনই হইবে না।

বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষাদানের বাধা হিসাবে কেহ কেহ বলিতে পারেন, বাংলা ভাষায় উচ্চস্তরের শিক্ষাগ্রন্থ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষার প্রচলন ইহার প্রতিকারের কার্যকরী উপায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পরিভাষা রচনা ও সংকলনের ভার লইয়া এই কাজের গোড়া পত্তনের চেষ্টা করিতেছেন; বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে এই জাতীয় প্রচেষ্টা আরও ব্যাপক ও ফলপ্রসূ হইয়া উঠিবে। এই বৃহত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীন ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। ইংরেজি বিদ্যার যে যন্ত্রটা চলিতেছে, সেই ছাঁচে-ঢালা ডিগ্রীর ছাপমারা বিদ্যার পাশে ঐ সজীব বিদ্যা একদিন বৃদ্ধি পাইয়া বনস্পতির মতো সকলকে আশ্রয় দিবে; এই অংশেই দেশের অধ্যাপকদেরও প্রতিভার বিকাশ হইবে, তাঁহাদের সাধনা সার্থক হইয়া উঠিবে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিদেশী ভাষাশ্রিত শিক্ষার অসঙ্গতি যেভাবে নির্দেশ করিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। ইংরেজি ভাষায় অপটুতার জন্য ছাত্রদের শক্তির প্রভূত অপচয় ঘটে, তাহাদের শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম বিকাশের স্বাভাবিক পথ না পাইয়া নিষ্ফল হয়। অন্যদিকে শিক্ষার নামে ছাত্রেরা মুখস্থ বিদ্যার বোঝা বহন করে মাত্র। শিক্ষার বাহন বিদেশী ভাষা হওয়ার জন্য মানসিক দিক হইতে তাহারা চিরকাল পঙ্গু হইয়া থাকে, তাহাদের চিন্তাশক্তি কখনও জাগ্রত হয় না; শিক্ষা তাহাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ কথিত এই শিক্ষা-সমস্যা এই যুগেও আমরা লক্ষ্য করি।

আজ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা জীবন ও শিক্ষার এই বিরোধমূলক অসংগতি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার সমাধানের জন্য বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষাদানের যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও যুক্তিপূর্ণ সন্দেহ নাই। মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চা ব্যতীত মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না।

২। প্রশ্ন: 'দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তাহারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।' উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইহার যৌক্তিকতা বিচার কর।

উত্তর: সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমরা কোনদিন উৎকণ্ঠিত হই নাই। আমরা নিজেরাই শিক্ষার ভোজের অংশ পাইয়াছি, বৃহত্তর জনসাধারণের শিক্ষার ক্ষুধার প্রতি দৃষ্টি দিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা বোধ করি নাই। আমাদের দেশে বিদ্যাবিস্তারের প্রধান বাধা হইল, ইহার বাহন ইংরেজি। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা কখনো জাতির হৃদয়ে বিস্তীর্ণ ও দৃঢ়মূল হইয়া উঠিতে পারে না। দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষা-পাসের বিদ্যাচর্চার সংকীর্ণ সীমাতেই আবদ্ধ ছিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টার ফলে, সেই সংকীর্ণ গণ্ডির বাহিরে বিদ্যার একটি প্রশস্ত পরিবেশ তৈয়ারী হইয়া উঠিতেছে, এখন দেশী-বিদেশী মনীষীরা আসিয়া নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন অংশে পরীক্ষাপাসের জন্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা থাকুক, কারণ সেই শিক্ষার যান্ত্রিক ব্যবস্থা এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহাতে কোনও পরিবর্তন আনয়ন করাও দুঃসাধ্য; সেই অচলায়তনকে সংস্কার করাও একরূপ দুঃসাধ্য। কিন্তু তাহার এই নূতন অংশে বিদ্যাচর্চার মুক্ত ও উদার প্রাঙ্গণটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সমগ্র বাঙালি জাতির চিত্তসম্পদ করিয়া তোলা যাইতে পারে। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা পাসের ছাড়পত্রের পথ লইয়াছে, তাহাদের জন্য ইংরেজি-শিক্ষা থাকুক, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিঃপ্রাঙ্গণে, প্রশস্ত ক্ষেত্রটিতে জনসাধারণের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পবিত্র কর্তব্য এই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করুক।

এইভাবে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার দুই ধারা যদি প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাযমুনা যেমনভাবে মিলিত হইয়াছে তেমনি ভাবে মিলিত হয় তবে তাহা বাঙালি শিক্ষার্থীদের পক্ষে তীর্থস্থান হইয়া উঠিবে। প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে দুইটি নদীর জলধারায় দুই বিভিন্ন বর্ণের ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই বিভাগ সত্ত্বেও তাহারা একসঙ্গেই প্রবাহিত হইয়া চলে। সেইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়েও গঙ্গাযমুনার দুই স্রোতের সাদা কালো রেখার বিভাগের মতো ইংরেজি এবং বাংলা শিক্ষার প্রভেদ থাকিবে বটে কিন্তু তাহারা একই সঙ্গে বহিয়া চলিবে। এই যুগ্মধারায়ই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যথার্থ গভীর, বিস্তীর্ণ এবং সত্য হইয়া উঠিবে। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সুযোগ এবং পটুতা সকলের থাকে না, ফলে উচ্চশিক্ষার বাহন ইংরেজি হওয়ার জন্য তাহাদের শক্তির মর্মান্তিক অপচয় ঘটে। শিক্ষাকে কেবল ইংরেজি ভাষায় আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে নষ্ট করিয়া দিবার কোন যুক্তি নাই। বিদেশী ভাষাশ্রিত শিক্ষায় দেশের চিত্তশক্তির বিকাশ কখনই সম্ভবপর নয়। সেইজন্যই উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা পাইয়াও আমরা চিন্তার শক্তি অর্জন করিতে পারি না। আমাদের অনেককে ব্যবসায় কিংবা জীবিকার জন্য ডিগ্রী লইতে হয়। ডিগ্রীর ছাপ মারা, ছাঁচেঢালা এই বিদ্যায় কখনও জীবনের গভীরতম ঐশ্বর্যকে লাভ করা যাইতে পারে না। আমরা যথার্থ বিদ্যালাভ করি না, তাহার একটা ছাঁচ পাই মাত্র। কিন্তু সে পথ যাহাদের নিকট বন্ধ, কিংবা যাহারা কেবল শিক্ষার জন্যই শিখিতে চাহিবে, তাহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাশিক্ষা বিভাগে আকৃষ্ট হইবে। কেবল তাহাই নয়, যাহারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রী লাভের শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে তাহারাও অবকাশমত বাংলা ভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ, কিছুদিন যাইতে না যাইতেই দেখা যাইবে, এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে, তাঁহাদের সাধনা—'মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে।' ইংরেজি শিক্ষার যান্ত্রিকতার পাশে এই সজীব শিক্ষাই হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত অংশের সর্বাপেক্ষা বড় দান।

অবশ্য এই দ্বৈত-ব্যবস্থার সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু বিশ্বকবি যখন এ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন তখন দেশ ছিল পরাধীন। তখন ইংরেজির পরিবর্তে বাংলাভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করার কোন সম্ভাবনা ছিল

না; তাই এই দ্বৈত-ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়া কবি বাংলা ভাষাকে সম্মানজনক স্থান দিয়াছিলেন এবং শিক্ষা-সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতও দিয়াছিলেন।

৩। প্রশ্ন: "আজ আক্ষেপের কথা এই যে, আমাদের উপায় আছে, উপকরণ আছে, ক্ষেত্র নাই। বাংলার যজ্ঞে আমরা অন্নসত্র খুলিতে পারি। অথচ যেসব বাঙালি কেবল বাংলা জানে তাদের উপবাস কোনদিন ঘুচিবে?"—এই উক্তিটির মধ্যে আমাদের শিক্ষার অসংগতি কিভাবে নির্দেশিত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

উত্তর: আমাদের দেশে শিক্ষার বাহন ইংরেজি, ইহাই শিক্ষাবিস্তারের সর্বাপেক্ষা প্রধান বাধা। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকে কখনও দেশের মধ্যে বিস্তীর্ণ করিয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়, কারণ উহা বিদেশী ভাষা। উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশীয় ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে, এই প্রত্যয় আমরা অর্জন করিতে পারি নাই, ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়; তাই রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপের সহিত প্রশ্ন করিয়াছেন, মাতৃভাষা সম্বন্ধে আমাদের ভীরুতা কি কোনও দিনই দূর হইবে না? পশ্চিম হইতে শিক্ষণীয় যাহা কিছু আছে, জাপান তাহা সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিয়াছে, তাহার কারণ, সে সেই শিক্ষাকে তাহার দেশীয় ভাষার আধারেই গ্রহণ করিয়াছে। অথচ জাপানী ভাষার শক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে হইলে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

মাতৃভাষার শক্তি এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দিগ্ধ, দ্বিধাগ্রস্ত, তাঁহারা বলিতে পারেন, বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা বিতরণ করিতে চাহিলে কি হইবে, বাংলা ভাষায় উচ্চস্তরের শিক্ষাগ্রন্থ কোথায়? বাংলা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থের অভাব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বাধা অনতিক্রমণীয় নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষার প্রচলনই এই অভাব প্রতিকারের একমাত্র উপায়। আমরা যে একেবারে উপায়হীন, নিঃস্ব তাহা তো সত্য নয়। বাংলা ভাষায় শিক্ষা যদি প্রবর্তিত না হয় তবে কি করিয়া শিক্ষাগ্রন্থ

পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইবে? উপায় যেমন আছে, উপকরণেরও তেমনি অভাব নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কিছু কাল হইতে বাংলায় উচ্চাঙ্গের গ্রন্থরচনার ভিত্তি নির্মাণের চেষ্টা করিতেছেন। এই কাজের পক্ষে অপরিহার্য পরিভাষা রচনা ও সংকলনের ভার পরিষদ গ্রহণ করিয়াছেন, কিছু কিছু কাজও করিয়াছেন। তাঁহাদের কাজের গতি যে মন্থর, আশানুরূপ নয় তাহা অবশ্যই স্বীকার কবিতে হইবে। কিন্তু সমগ্র দেশে এই পরিভাষা তৈয়ারির তাগিদ বা ইহার ব্যবহারের সুযোগ দেখা দিলে এই বিষয়ে অগ্রগতি ত্বরান্বিত হইতে পারে। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও দিন বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তবে সেই প্রয়োজনে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই উপকরণ নির্মাণের কাজে আরও অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

সেইজন্য ববীন্দ্রনাথ আক্ষেপেব সঙ্গে বলিয়াছেন, মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উপায় এবং উপকরণ আছে, কিন্তু তাহার প্রয়োগের ক্ষেত্রটিই আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। শিক্ষার মূল ব্যাপারেই আমরা এখনও হাত দিতে পারি নাই। বাংলা ভাষার যজ্ঞেই তো আমরা সকলের শিক্ষার ক্ষুধা দূর করিবার অন্নসত্র খুলিতে পারি অর্থাৎ ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে পারি। বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের উপায়, উপকরণ, সম্ভাবনা সকলই রহিয়াছে, অথচ যে সকল বাঙালি কেবল বাংলা জানে তাহাদের উচ্চশিক্ষা লাভের কোন সুযোগ নাই। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের এই অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করিয়াছে বলিয়াই তিনি এই প্রশ্নের আকারে তাঁহার বেদনা ও উৎকণ্ঠাকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

৪। প্রশ্ন: "খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভরতি করে, দেহপুর্তি করে না।"—উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

অথবা, "সে-সুবিধাটি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে।" —রবীন্দ্রনাথ এখানে কোন্ অংশের কথা বলিয়াছেন? বিশ্ববিদ্যালয়

এই অংশে কিভাবে নিজেকে সৃষ্টি করিতে পারিবে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটির অনুসরণে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

উত্তর: বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আমরা যে শিক্ষা লাভ করি, তাহা কখনও আমাদের সমগ্র জীবনের পাথেয় হইতে পারে না; দেশের মনকে মানুষ করা অর্থাৎ দেশবাসীর বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিন্তাশক্তির উদ্বোধন ও বিকাশ কোনমতেই বিদেশী ভাষায় সম্ভবপর নয়। ইংরেজি ভাষাশ্রিত শিক্ষার পরিণতি পর্যালোচনা করিলে এক শোচনীয় অপচয়ের চিত্রই উদ্ঘাটিত হয়। আমরা যে শিক্ষা লাভ করি তাহা আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করে না। আমরা চিন্তা করি, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে, অথচ সেই সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িবে না, অপরিপুষ্ট হইয়াই থাকিবে, সমস্ত শিক্ষাকে নিষ্ফল করিবার এমন উপায় আর কিছু নাই।

এইরূপ বিকলাঙ্গ শিক্ষার ফল হইয়াছে, উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই, উচ্চস্তরের চিন্তা করিতে আমরা সমর্থ হই না। ইহার কারণ, চিন্তার স্বাভাবিক বাহন মাতৃভাষা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার এক বিসদৃশ অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়: বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া আমরা পোশাকি-ভাষা অর্থাৎ ইংরেজি ফেলিয়া রাখি, তাহার সহিত আমাদের কোন আত্মিক সম্পর্ক থাকে না। তাহার পর আমাদের চিরদিনের আটপৌরে বাংলা ভাষায় আমরা গল্পগুজব করি, সহজ আলাপে স্বচ্ছন্দ, তৃপ্ত হই।

এই অসঙ্গতি সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যে উপবাসের অর্থাৎ মানস সম্পদের অভাবের লক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণেই দেখা যায়। এমন রোগী দেখা যায়, যে খায় প্রচুর অথচ তাহার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে; ঠিক তেমনিভাবে আমরা দেখি, আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তাহার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গে পুষ্টি সঞ্চার করিতেছে না, আমাদের শিক্ষার কোনও ঐশ্বর্যেই আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতেছে না। ইহার কারণ, শিক্ষা বিদেশী ভাষা-নির্ভর হওয়ার জন্য শিক্ষারূপ খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের পূর্ণ সংযোগই নাই, ফলে আমরা ইহা হইতে কোনও প্রাণশক্তিই সংগ্রহ করিতে পারি না। আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া শিক্ষারূপ খাদ্যবস্তু গ্রহণ করি না, ইংরেজি ভাষা-নির্ভর শিক্ষার ফলে আমাদের উদরপূর্তিই হয়, তাহা দেহকে স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ করিতে পারে না। নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষণীয় বস্তু গ্রহণ

করিতে না পারিলে তাহা কখনও আমাদের চিত্তসম্পদে পরিণত হইতে পারে না। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আমরা যে শিক্ষা লাভ করি, তাহার সহিত আমাদের কোনও আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় না, সেইজন্যই সে শিক্ষা আমাদের সাহিত্যকে প্রবল প্রাণশক্তিতে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে নাই। এই জন্যই বিশ্বকবি ·বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষাক্রমের সহিত বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে শিক্ষার সর্বজনীন রূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই স্বাভাবিক পথে বিশ্ববিদ্যালয় দেশে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা লাভের পথ সুগম করিয়া তুলিবে।

৫। প্রশ্ন : 'কল যখন আকাশে ধোঁয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উদগার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয়দান করিবে।'—'কল', 'বনস্পতি' এবং 'কলভাষী বিহঙ্গদল' বলিতে লেখক কি বুঝাইয়াছেন ? বনস্পতি কিভাবে আশ্রয়দান করিবে, এই প্রসঙ্গে তাহাও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে 'কল' বলিতে যান্ত্রিক ইংরেজি শিক্ষা, 'বনস্পতি' অর্থে মাতৃভাষার শিক্ষা এবং 'কলভাষী বিহঙ্গদল' বলিতে তরুণ শিক্ষার্থিগণকে বুঝাইয়াছেন।

ইংরেজি ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন বলিয়া তাহা আমাদের দেশে বিস্তীর্ণ হইতে পারে নাই। আর যাহারা সে শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছে, তাহাদের জীবনে এই বিদেশী ভাষাশ্রিত শিক্ষা সুফলপ্রসূ হইয়া ওঠে নাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর ছাপমারা বিদ্যা ছাঁচে-ঢালা, নিষ্প্রাণ; দেশের জীবনের সহিত সম্পর্কবিহীন। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ এই যান্ত্রিক শিক্ষাকে 'কল' বলিয়াছেন। এই কলে আমাদের শিক্ষারূপ যে খাদ্য খাওয়ানো হয়, তাহাতে আমাদের দেহের সভ্যকারের পুষ্টি হয় না। ইংরেজি বিদ্যার এই কলটির পরিবর্তন সাধন আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। কারণ, প্রথমত, এই কলটি একটি বিশেষ ছাঁচে গঠিত, একেবারে গোড়া হইতে সে ছাঁচ বদল করা সহজ

নয়। দ্বিতীয়ত, এই ছাঁচে-ঢালা বিদ্যার প্রতি ছাঁচ-উপাসকদের ভক্তি এমন প্রগাঢ় যে, তাহা হইতে তাঁহাদের মন কিছুতেই মুক্তি পায় না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন, ইহার সংস্কারের একটি মাত্র উপায়ই আছে—এই ছাঁচের পাশেই মাতৃভাষার মত সজীব জিনিসকে একটু স্থান দেওয়া।

বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষাশ্রিত শিক্ষার পাশে বাংলা শিক্ষা স্থান পাইলে দেখা যাইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অংশেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এইখানেই তাঁহাদের প্রতিভার ধারাবর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত স্নিগ্ধ শান্ত হইবে। এমনি করিয়া যাহা প্রাণবন্ত, সজীব তাহা একদিন নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণিত করিবে। বাংলা ভাষার শিক্ষা ইংরেজি বিদ্যার কলের বিরুদ্ধে তর্কে, বিরোধে, উগ্রতায় আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজিবে না। আমরা দেখি, চটকল আকাশে ধোঁয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা তৈয়ারী করিয়া চলে; সেইরূপ ইংরেজি বিদ্যার কলও ব্যবসায় এবং জীবিকার বাজারে বিকাইবার জন্য ডিগ্রীর ছাপমারা বিদ্যা উদ্গীরণ করিয়া দেয় মাত্র। এই কল যখন স্থূল বৈষয়িক প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে থাকিবে, তখন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মাতৃভাষাবাহিত শিক্ষা পূর্ণতায় ঐশ্বর্য অর্জন করিবে, বনস্পতির মত নিঃশব্দে ফল দিবে, ছায়া দিয়া দেশের মানুষকে স্নিগ্ধ করিবে এবং নিজের সহস্র শাখায় দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে অর্থাৎ আবেগমুখর তরুণ শিক্ষার্থীদের আশ্রয় দিবে। বিদেশী ভাষা শিক্ষার দুরূহতায় এবং দূরত্বের কঠিনতায় তাহাদের আর মাথা কুটিয়া মরিতে হইবে না; এই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষায় তাহাদের সকল প্রকার মানসিক ক্ষুধা মিটাইতে পারিবে। তাহারা বিদেশী শিক্ষার নিষ্ফলতায় আর তাপদগ্ধ হইবে না। রবীন্দ্রনাথ এইভাবে ইংরেজি শিক্ষার নিষ্ফলতা ও যান্ত্রিকতার পটভূমিতে মাতৃভাষার শিক্ষার সজীবতা ও পূর্ণাঙ্গ সার্থকতা নির্দেশ করিয়াছেন।

৬। প্রশ্ন: 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ যেভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিন্তায়, কর্মে, সাহিত্যসাধনায় পূর্ণতা ও সামঞ্জস্যের আদর্শই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের ইংরেজি

ভাষাবাহিত যান্ত্রিক শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি স্বভাবতই পূর্ণতার পূজারী কবিকে পীড়িত করিয়াছে। যে শ্রেয়োবোধ ধ্রুবতারার অনির্বাণ জ্যোতিতে সর্ববিধ রচনাকে মহিমোজ্জ্বল করিয়াছে, তাহা তাঁহার শিক্ষাসমস্যামূলক প্রবন্ধ 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটিতেও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশে মানুষের যে পূর্ণতা ঘটে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে শিক্ষার প্রকৃত আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটিতে তিনি বলিয়াছেন: "জার্মানিতে, ফ্রান্সে, আমেরিকায়, জাপানে যে সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্‌ঘাটিত করিতেছে।"

দেশের মনকে মানুষ করার দায়িত্ব মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার বাহন ইংরেজি। তদুপরি বিদ্যায়তনগুলিকে উপকরণবাহুল্যে আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া তুলিয়া সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তরের পথকে অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলাই যে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রধানতম কার্যকরী উপায়, জাপানের সাফল্যের দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও আমরা শিক্ষার সেই মৌলিক সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারি নাই। চিন্তার স্বাভাবিক বাহন মাতৃভাষা। আমাদের শিক্ষার বাহন বিদেশী ভাষা বলিয়াই আমাদের মানসদৈন্য কখনও দূর হয় না; উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা পাইলেও উচ্চস্তরের চিন্তা করিবার শক্তি হইতে আমরা বঞ্চিত। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার এই অসংগতি ও অসম্পূর্ণতার জন্যই আমাদের শিক্ষা সাহিত্যে প্রাণসঞ্চার করিতে পারে নাই।

মানুষের অন্তর-সম্পদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশকেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এদেশের বিদেশীভাষা-নির্ভর শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি তিনি এমন গভীর ও অব্যর্থভাবে উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিয়াছেন। ভাষা শিক্ষার দক্ষতা সকলের থাকিতে পারে না, তাই ছাত্রদের মুখস্থবিদ্যার উপর অন্ধভাবে নির্ভর করিতে হয়। মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় সাফল্যলাভকে কবি সঙ্গতভাবেই চৌর্যবৃত্তি বলিয়া কঠিন ধিক্কার দিয়াছেন। আর যাহাদের মেধা দুর্বল, তাহারা

অকৃতকার্য হইয়া এই শিক্ষার নিষ্ফলতাকে মর্মান্তিকভাবে উদ্ঘাটিত করিতেছে। ভালোমত ইংরেজি শিখিতে পারিল না বাংলাদেশে এমন ভালো ছেলে প্রচুর আছে; তাহাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে চরিতার্থ হইবার সুযোগ না দিয়া শক্তির প্রভূত অপব্যয়ই ঘটানো হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমরা ডিগ্রীর ছাপমারা ছাঁচে-ঢালা যান্ত্রিক শিক্ষাই পাই, প্রকৃত বিদ্যা পাই না; ইহা জীবিকার বাজারদরের দাসত্ব করে মাত্র।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক শিক্ষার জন্য কবি গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন বলিয়াই মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের পুণ্যব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ব্যাকুলকণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা অংশের শিক্ষা জীবিকার স্থূল প্রয়োজন হইতে মুক্ত হইবে, এই ক্ষেত্রেই অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে, বাংলার তরুণ শিক্ষার্থীরা, তাহাদের চিত্তের প্রকৃত আশ্রয় খুঁজিয়া পাইবে, এই স্বপ্নে রবীন্দ্রনাথ উদ্বেলিত হইয়াছেন। শিক্ষকদের সাধনা বাংলা ভাষায়ই যথার্থ সার্থকতা অর্জন করিবে, তাঁহার এই উৎকণ্ঠিত আকূতি হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, মাতৃভাষাশ্রিত প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার কবির অন্তরের কি গভীর ধ্যানের বিষয় ছিল। তাই তিনি একান্ত আগ্রহে সেই দিনটির শুভ আবির্ভাবের এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন —"বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে, তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে।"

৭। প্রশ্ন: বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব, এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে"—রবীন্দ্রনাথ "শিক্ষার বাহন" প্রবন্ধে যে সব যুক্তি দিয়া এই অভিমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় বিবৃত কর।

[বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২]

উত্তর: যে শিক্ষা মানুষের অন্তর-সম্পদকে পূর্ণরূপে বিকশিত করে, ভাবুক-কবি রবীন্দ্রনাথের মতে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি এবং জাতীয় জীবনের প্রকৃত সম্পদ।

আমাদের দেশের তথাকথিত উচ্চশিক্ষার মাধ্যম বিদেশী ইংরেজি ভাষা এবং এই শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত জাতীয় জীবনের যোগসূত্র নাই। রবীন্দ্রনাথের মতে এ যেন খাদ্যের সংগে প্রাণের যোগের একান্ত অভাব। তাই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা দেশকে সৃষ্টি করে না, দেশের মনকে মানুষ করে না। এই উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা বাজার দরের দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। ইহা উচ্চ অঙ্গের চিন্তার প্রতিবন্ধক। এ শিক্ষা জীবনকে স্বাভাবিক সাফল্য দান করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দুর্বল। বিদেশীভাষাশ্রিত এই শিক্ষা-ব্যবস্থা উপকরণ বাহুল্যে দরিদ্র দেশের সর্বজনের বিদ্যা শিক্ষার অন্তরায়।

সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রচলনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইংরেজি ভাষাশ্রিত শিক্ষা এবং তাহার বহিরঙ্গ-সৌষ্ঠবের আকর্ষণ যে দুর্দমনীয় কবি তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি তিনি মনে করেন—আগ্রহ থাকিলে মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠ্য-পুস্তকের অভাব ইত্যাদি যে কোন অন্তরায় দূরীভূত করা অসম্ভব নয়। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি জাপানের কথা বলিয়াছেন। জাপান পাশ্চাত্য বিদ্যাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে নিজের বাণীমন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তাহার সাফল্য সর্বক্ষেত্রে সুবিদিত।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, হীনাহম্ মনোভাব দূর করিয়া মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জাপান প্রমাণ করিয়া দিয়াছে—এ ব্যবস্থা অসম্ভব নয়, বরং একান্ত স্বাভাবিক, এবং যদি আমরা এই কার্যে ব্রতী হই, আমরা জাতিকে বিদ্যার অনশন হইতে মুক্তি দিতে পারিব। স্বভাবতঃই বিশ্ববিদ্যালয়ও নিজেকে স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিক রূপে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। পঠন-পাঠনে স্বাভাবিকতা আসিবে এবং শিক্ষা সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করিয়া সর্বজনের নিকট সজীব ও সত্য হইয়া উঠিবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে'।

উৎসবের দিন

॥ সার-সংক্ষেপ ॥

সকালবেলায় অন্ধকার ভেদ করিয়া দিনের আলোক প্রকাশিত হইলেই পক্ষিকুল নিজেদের জীবনকে নূতনভাবে উপলব্ধি করিয়া অন্তরের আনন্দকে সংগীতের কলকাকলিতে প্রকাশ করে। সেইরূপ জগতের বাধামুক্ত শক্তির প্রভূত প্রকাশ যেখানে হয়, সেইখানেই যেন প্রাণোচ্ছল উৎসব আমরা লক্ষ্য করি। মানুষ যেদিন প্রাত্যহিক প্রয়োজন তথা সাংসারিক সুখ-দুঃখের ক্ষুদ্র-সীমায় আবদ্ধ না হইয়া আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে উপলব্ধি করে সেইদিনই তাহার উৎসবের দিন। প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দিনে মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, বিচ্ছিন্ন; কিন্তু এই উৎসবের দিনে সকল মানুষের সঙ্গে মিলনে এবং সমস্ত মনুষ্যত্বের অনুভূতিতে সে মহৎ।

জ্ঞান, প্রেম এবং কর্মের তপস্যায় প্রয়োজন-সাধনের সীমাকে অতিক্রম করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বের যে অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশিত করিয়াছে, উৎসবের আনন্দ-সংগীতে সেই শক্তির প্রয়োজনাতীত পরম গৌরব ধ্বনিত হইয়া থাকে। মনুষ্য:ত্বর তপস্যার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, মানুষের কর্ম যেখানে সববিধ স্থুলস্বার্থের গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্য:ত্বর পূর্ণশক্তির বিকাশে মানবজীবনের পরম গৌরবকে লাভ করিতে পারিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নয়, দেশানুরাগও নয়, তাহা সর্বত্রচারী। জলভারাবনত নিবিড় মেঘের ন্যায় নিজেকে নির্বিচারে নিঃশেষিত করিয়া দেওয়াই তাহার স্বধর্ম। যে রাজশক্তি অত্যাচার-নিপীড়নে, অধিকার-বিস্তারে লুব্ধ ও হিংস্র, এই ভারতবর্ষে সম্রাট অশোক সেই রাজশক্তিকেই ধর্ম-বিস্তার এবং মঙ্গলসাধনকার্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কালের আঘাতে বহু সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু অশোকের সেই মঙ্গলশক্তি আজও আমাদের জীবনে শক্তি সঞ্চার করিতেছে।

ঈশ্বরের শক্তির বিকাশ আমরা প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের মধ্যে দেখি; কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যেই যেদিন তাঁহার বিরাট বিকাশকে দেখিতে পাওয়া যায় সেইদিনই তো আমাদের সর্বাপেক্ষা মহৎ, শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই উৎসবের দিন

কেবল মাধুর্য উপভোগের দিন নয়; ইহা শক্তি উপলব্ধির দিন। এই শক্তি উপলব্ধি ও শক্তিসংগ্রহের দিনে আমরা যাহাতে প্রাত্যহিক জীবনের জড়তা হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যত্বের কঠোর সাধনায় উদ্‌বুদ্ধ হইতে পারি, তাহারই জন্য ঈশ্বরের নিকট আমাদের দীক্ষা লইতে হইবে।

॥ বক্তব্য-সংকেত ॥

[১] আমোদ-প্রমোদ ভোগমুখী। তাহা মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বকে ভুলাইয়া দেয়। সম্ভোগের মাদকতায় মানুষকে সঙ্কীর্ণ ও দুর্বল করিয়া তোলা নিছক প্রমোদের ধর্ম। কিন্তু ভারতীয় উৎসবের লক্ষ্য মানুষকে দুর্বল করিয়া না তুলিয়া তাঁহাকে বৃহত্তের আস্বাদন দান করা।

[২] প্রতিদিনের তুচ্ছতা, সঙ্কীর্ণতা চারিপাশে গণ্ডী রচনা করিয়া জগৎ হইতে আমাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। উৎসবের দিনে সেই গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যায়, জগতের সহিত মিলনের পুণ্য লগ্ন আসে। আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মানুষ সেদিন বন্ধনমুক্ত হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ করে। তাহার প্রাণের তন্ত্রীতে উঠে সংগীতের সুর।

[৩] প্রতিদিনকার মানুষ দীন, ক্ষুদ্র; উৎসবের দিনের মানুষ শক্তিমান। উৎসব তাই শক্তির উৎস। সকলের সহিত একত্র হইয়া সে বৃহৎ, সকলের সঙ্গে মিলনে সে মহৎ।

[৪] একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে এই শক্তির বিশেষ কোন অবদান নাই। ব্যক্তিগত জীবনে আছে শোক, আছে ভয়, আছে মৃত্যু। কিন্তু সমগ্র মানুষ্যত্ব শোক, ভয় ও মৃত্যুর উপর জয়ী।

[৫] বুদ্ধের ব্রহ্মবিহার ও মহারাজা অশোকের জনহিত-ব্রত মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তিতে উজ্জ্বলতম বিকাশের দৃষ্টান্ত।

[৬] মহাশক্তির মহিমাবোধ হইলেই তবে উৎসব হয় মহোৎসব। এই শক্তি-সাধনা নিছক ভাবালুতা বা মাধুর্যমদিরতায় সম্ভব নহে। তাহাতে অসংযম প্রকাশ পায়, দেখা দেয় চিত্তের দৈন্য ও সংকীর্ণতা। সাধারণ মানুষের উৎসবে এই দৈন্যেরই প্রাধান্য।

[৭] রবীন্দ্রনাথ উৎসবের দিনকে সার্থক করিবার উপায় হিসাবে ঈশ্বরের

নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কারণ তাঁহার বিশ্বাস, মানুষের মধ্যে যে বিরাট শক্তির বিকাশ হয় তাহা ঈশ্বরেরই শক্তির প্রকাশ।

[৮] বৃহৎ শক্তির উপলব্ধির পথে প্রয়োজনীয় কঠোর ত্যাগ, আত্মবিসর্জন ও সংগ্রামের জন্য প্রবন্ধকার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

॥ রচনা-পরিচিতি ও রসগ্রাহী সমালোচনা ॥

'উৎসবের দিন' প্রবন্ধটি রচনা করার সময় বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের যে আলোড়ন দেখা দিয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের মনকেও স্পর্শ করিয়াছিল। কবির 'অন্তর নিত্যধর্মবোধের কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সাময়িক উত্তেজনায় আচ্ছন্ন না হইয়া ভারতীয় আদর্শের দীক্ষায় আত্মশক্তির উদ্বোধনই তিনি চাহিয়াছিলেন। ১৩১১ সালের ৭ই পৌষের ভাষণ 'উৎসবের দিন' এই জীবনাদর্শের গভীর অভিব্যক্তি।' এই ভাষণটির পটভূমি সম্বন্ধে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মু'খাপাধ্যায় বলিয়াছেন: 'দেশের সর্বস্তরে মানুষকে যথাযথভাবে দেখিবার ও সর্বশ্রেণীর মধ্যে মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও শক্তিবোধ জাগ্রত করিবার যে প্রয়োজন, এই কথাটি কবি নানাভাবে দেশসমক্ষে প্রচার করিয়াছেন। বাঙালির রাষ্ট্রিক জীবনে নানাভাবে দুর্দিন ঘনায়মান; তাই কবি স্বদেশীয় সমাজকে বিদেশীয় সংস্পর্শ ও বিজাতীয় অনুকরণপ্রিয়তা হইতে দূর করিয়া সমাজ-সেবার নূতন কর্মপথে চলিবার কথা বলিলেন। সমাজের শ্রেণীগত ভেদকে মানিয়া লইয়াই তিনি বলিলেন যে, সংঘকল্যাণের জন্য মিলিত কর্মের মধ্যেই মুক্তির সাধনা। আবার সকল কর্মের নিত্যপ্রয়োজনের বাহিরেও মিলনভূমি আছে, সেটি হইতেছে তাহার উৎসবক্ষেত্র। এই উৎসবের দিনে মানুষে মানুষে ভেদ ভুলিয়া মানুষ তাহার মনুষ্যত্বের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিবে—ইহাই ছিল কবির স্বপ্ন বা আশা।' উৎসবের দিন-এর মত আধ্যাত্মিক অনুভূতি-নির্ভর রচনা সম্বন্ধে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলিয়াছেন: 'রবীন্দ্রনাথও সত্য বা ধর্মকে কোন মতবাদের খাঁচায় পুরিয়া বিচারবিতর্কের দ্বারা একেবারে মাপিয়া জুপিয়া তুলিতে চাহেন নাই; জীবনের সত্য—জীবনের ধর্ম—জীবনের

অখণ্ড ইতিহাসের ভিতর আপনাকে ছড়াইয়া রাখিয়া কেবলই 'হইয়া' উঠিতেছে। —বিশ্বজীবনের সেই অখণ্ডতার সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া লাভ করিতে হয় সত্যকে। নিখিল গগন জুড়িয়া দেশে দেশে কালে কালে সত্য আপনাকে প্রকাশ করিতেছে এক বিরাট রাগিণীর সুরে; বিশ্ব-জোড়া সেই রাগিণীর সহিত হৃদয়-বীণার রাগিণীকে যুক্ত করিতে হইবে, তবেই-ত মিলিবে সত্যের সন্ধান। ...রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় কতকগুলি লেখার ভিতরে প্রকাশ-ভঙ্গির দিক হইতেও একটা কাব্যধর্ম লক্ষণীয়।' এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য: 'ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেগধর্মী ব্যাখ্যার প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি ও প্রগাঢ়তর অধ্যাত্ম-অনুভব ইহাদিগকে উচ্চতর সাহিত্যিক পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। ঐশী স্পর্শলাভের জন্য লেখকের আবেগ-ময় আকুতি, লৌকিক উৎসব-অনুষ্ঠানের পিছনকার মূল ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও কাব্যসৌন্দর্যময় প্রকাশরীতি ইহাদিগকে একাধারে সাহিত্য-রসিক ও ধর্মপিপাসু উভয় শ্রেণীর পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছে।' মানুষ-যেদিন বৈষয়িক জীবনের সকল প্রয়োজনের স্থূলতার ঊর্ধ্বে নিজের মনুষ্যত্বের শক্তিকে বিশেষভাবে স্মরণ ও উপলব্ধি করে সেইদিনই তাহার উৎসবের দিন। এই দিনেই ঈশ্বরের নিকটে মনুষ্যত্বের কঠোর তপস্যার দীক্ষা লইতে হইবে—এই আধ্যাত্মিক জীবন-প্রত্যয়টি 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধটির ধ্রুপদী (classical) ভাষার গাম্ভীর্যে, উপলব্ধির গভীরতায়, চিত্রকল্পের সৌন্দর্যে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রবন্ধের তুলনায় 'ধর্ম' গ্রন্থটির ভিতর প্রকাশিত লেখাগুলির স্বাতন্ত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। এ সম্বন্ধে সমালোচক যথার্থ ই বলিয়াছেন: 'গদ্য রচনার আর একটি রীতি রবীন্দ্রনাথ চর্চা করেছিলেন তাঁর ধর্মবিষয়ক রচনাগুলিতে। এই রচনার ভাষা ও ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের অন্য রচনার মত নয়, এমন-কি মূল কাঠামোটিই এক কিনা সন্দেহ। এতে রবীন্দ্রনাথ মৌলিক ভঙ্গির থেকে সরেই এসেছিলেন, তাই এর ভাষা বরং প্রাচীন সাহিত্যের সাহিত্যিক ভাষার সঙ্গেই কিছু মিলবে। প্রাচীন সাহিত্যের যেসব জায়গায় ধর্ম বা নীতির আদর্শ সম্বন্ধে প্রসঙ্গযুক্ত আলোচনা আছে তার সঙ্গে 'ধর্ম' বইটির ভাষার তুলনা করলেই গভীর সাদৃশ্য চোখে পড়বে। ভাষার উদাত্ততা, সাধু তৎসম শব্দের অবিরল প্রয়োগ, বাক্যের

পল্লবিত বিস্তার বিশ্লেষণ ও অন্যান্য অলংকরণের প্রাচুর্য—এসব দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কথ্যগদ্য বা অন্যান্য প্রবন্ধের ভাষার থেকে আলাদা রীতিকে অনুসরণ করেছেন। ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনার বিষয় এবং প্রসঙ্গ ভিন্ন বলেই এর ভাষার পিছনের কণ্ঠস্বরও অন্যরকম এবং তা প্রাচীন সাহিত্যের ভাবমগ্ন গভীরতার সঙ্গেই মিলবে। ধর্মের এই প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথ সেই সময়েই লিখেছেন, যে সময়ে তিনি রাজনৈতিক ভাবনা নিয়েও ব্যস্ত ছিলেন। অথচ এতে সাময়িক প্রসঙ্গ বিশেষ নেই। মানসিক প্রসঙ্গ এবং ভাষাতে তিনি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছেন। এই রচনার আত্মভাব-প্রাধান্যের জন্যও একে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মব্যাখ্যানের গদ্যপদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করা যায়।' (ভবতোষ দত্ত)।

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

অনু. ১-২ : ছিন্ন করিয়া—দূর করিয়া। **উপবন**—উপ (সদৃশ) বন, নির্মিত বন বা উদ্যান। **উৎসব**—আনন্দজনক অনুষ্ঠান। **বিহঙ্গ**—পাখি। **প্রাণবান**—জীবনী শক্তিতে ভরপুর। **গতিমান**—বেগসম্পন্ন। **চেতনাবান**—জাগ্রত। **প্রতিদিন প্রভাতে……উৎসারিত করিয়া দেয়**—পাখিরা মুক্ত প্রাণের আনন্দে এবং অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিময়তায় নিজেদের পক্ষিজন্মের সার্থকতাকে প্রভাতের আলোকেই সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে বলিয়াই সেই মুহূর্তে তাহাদের অন্তরের আনন্দকে কাকলিরূপ সংগীতে উৎসারিত করিয়া দেয়। **অব্যাহত শক্তি**—যে শক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয় না। **মূর্তিমান উৎসব**—যেন আনন্দানুষ্ঠান দেহরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। **পক্বশস্য-সমুদ্রে**—পাকা ফসলের ক্ষেতকে সাগররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। **সোনার উৎসব**—সোনালী রঙের পাকা ধানের সমারোহ। **হিল্লোলিত**—তরঙ্গের মত নৃত্য-উচ্ছল। **আম্রমঞ্জরী**—আমের মুকুল। **কুঞ্জবনে**—লতাগৃহাদি সমন্বিত উপবনে। **পুষ্পবিচিত্র**—নানা ফুলের সমারোহে, যেখানে সৌন্দর্য সৃষ্টি হইয়াছে। **উদ্দাম**—দুর্বার।

অনু. ৩-৪ : মনুষ্যত্বের শক্তি—মানুষের আত্মোপলব্ধির শক্তি। **প্রাকৃতিক নিয়মপরম্পরা**—আমাদের প্রবৃত্তিময়, ইন্দ্রিয়নির্ভর ক্ষুধাতৃষ্ণার

জৈবিক অস্তিত্ব কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন মাত্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাকৃতিক নিয়মের প্রভাবেই ক্ষুধা পাইলে পশুর মধ্যে যেমন, তেমনি মানুষের মধ্যেও আহার্য সংগ্রহের চেষ্টা দেখা যায়। জড়বস্তু, উদ্ভিদ, সাধারণ প্রাণী, মানুষ সকলই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। **ক্রীড়াপুত্তলী**—খেলার পুতুল, অর্থাৎ শক্তিহীন। **জড়**—অচেতন পদার্থ। **উদ্ভিদ**—উৎ (ঊর্ধ্ব) ভিদ্। (ভেদ করা)+ক্বিপ্ (র্তৃ)—যে মাটি ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বে উঠে, বৃক্ষ। **সর্বজয়ী মানবশক্তি**—মানুষ তাহার জৈবিক অস্তিত্বের ক্ষেত্রে জড়বস্তু উদ্ভিদ্ কিংবা সাধারণ জন্তুর মত প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অধীন, কিন্তু এই গণ্ডিতে সে আবদ্ধ থাকে না; সে তাহার স্থূল জড়জীবনের সকল বাধা, সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করিয়া নিজের অপরিমেয় মনুষ্যত্বের শক্তিকে চরিতার্থ করিতে অগ্রসর হয়; সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ ইহাকে 'সর্বজয়ী মানবশক্তি' রূপে অভিহিত করিয়াছেন। **ক্লিষ্ট**—ক্লিশ্ (ক্লেশ পাওয়া)+ত (র্তৃ), ক্লেশপ্রাপ্ত, পরিশ্রান্ত। **সংসারচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি**—সাংসারিক জীবনের দৈনিক কলরব, যাহা প্রত্যহই চাকার মত আবর্তিত হইতেছে। **সেদিন আমরা...... সংগীত শোনা যায় না**—আমরা যেদিন ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনের প্রয়োজন ও সুখদুঃখের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকি, সেদিন সর্বজয়ী মানবশক্তিকে উপলব্ধি করি না, নিজেদের উজ্জ্বলভাবে ভূষিত করি না, অর্থাৎ নিজেদের অন্তরের প্রকৃত ঐশ্বর্যকে তাহার সকল মহিমায় উদ্‌ঘাটিত করি না। ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ ও আচ্ছন্ন হইয়া আমরা কাহাকেও সেদিন উদারভাবে আহ্বান করিতে পারি না। আমাদের ঘরে সংসারচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি (চাকা ঘোরার শব্দ) অর্থাৎ সাংসারিক জীবনযাত্রার কলকোলাহলই শোনা যায়, কিন্তু মনুষ্যত্বের উপলব্ধিতে নির্মল পবিত্র হৃদয়ের আনন্দ সংগীত সেদিন শ্রুত হয় না; সেখানে বৈষয়িক জীবনের স্থূলতা ও কর্কশতাই বিরাজ করে।

অনু ৫-৬ : ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া—প্রাত্যহিকতা অর্থাৎ অন্নবস্ত্র, হিংসাদ্বেষ প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠিয়া। **দুর্লক্ষ্য**—যাহাকে ভালভাবে দেখা যায় না, অর্থাৎ উপলব্ধি কর যায় না। **দুর্গম**—যেখানে প্রবেশ কষ্টসাধ্য। **জ্ঞানী জ্ঞানের কোন্ দুর্লক্ষ্য দুর্গমতার মধ্যে ধাবমান হইয়াছে**—মানুষের জ্ঞানের সাধনার ইতিহাস স্মরণ করিলে দেখি, প্রতি পদে অনিশ্চয়তা, সামাজিক সংস্কারের বাধা, সাফল্য অপেক্ষা বিফলতার মধ্য দিয়াই

যুগে যুগে জ্ঞানসাধকেরা অগ্রসর হইয়াছেন। লক্ষ্যবস্তু অস্পষ্ট ও বহুদূরবর্তী তবু তাঁহারা নিবৃত্ত হন নাই। তাই দেখা যায়, গ্যালিলিও জ্যোতির্বিজ্ঞানের নূতন সত্য প্রচার করিতে গিয়া সমকালীন সমাজের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। এইভাবেই জ্ঞান-সাধকদের দুর্লক্ষ্য দুর্গমতার মধ্যে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। **প্রেমিক প্রেমের……উত্তীর্ণ হইয়াছে**—সত্যকারের প্রেম স্বার্থ বমুখ, তাহা নিজের সুখ নয়, আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়াই গভীর চরিতার্থতাকে অন্বেষণ করে। **অকুতোভয়ে**—কোনরূপ ভয় না করিয়া। **অতীত, ভবিষ্যতের সুমহান্ মানবলোকের দিকে**—জ্ঞানে প্রেমে কর্মে অতীতে মনীষী সাধকেরা যে মনুষ্যত্বের সাধনা করিয়াছেন, তাহার এবং ভবিষ্যতের সাধকদের সাধনার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। **অভ্রভেদী**—[অভ্র—আকাশ] যাহা আকাশ ভেদ করিয়াছে; সুউচ্চ।

অনু. ৭৮ঃ মানুষের কর্ম………লাভ করিয়াছি—কি মানুষ, কি ইতর প্রাণী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশেই নিজ সন্তান বা দলের জন্য আত্মত্যাগেও প্রস্তুত হয়। কিন্তু মানুষেব সঙ্গে ইতর প্রাণীর পার্থক্য সেইখানে—যেখানে মানুষ সব কিছু ছাড়িয়া অসীমের দিকে ছুটিয়া যাইবার প্রেরণা লাভ করে। তাহার কৃত সমস্ত কর্ম ব্রহ্মকে সমর্পণ করে। এইখানেই মানবতার পূর্ণ বিকাশ। **বুদ্ধদেবের করুণা**—যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৫৫৬ বৎসর পূর্বে কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন এবং তাঁহার স্ত্রী মায়াদেবীর পুত্র বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণের সময় তাঁহার নাম সিদ্ধার্থ রাখা হয়। যুবরাজ সিদ্ধার্থ একদিন প্রমোদ কাননের বহির্ভাগে ভ্রমণের সময় পথে জরাজীর্ণ, মৃত ও মুমূর্ষু এবং জনৈক ভিক্ষুকে দেখিয়া অত্যন্ত বেদনার্ত হন এবং অনিত্য সাংসারিক জীবনের দুঃখ ক্লেশ চিন্তা করিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি পত্নী গোপা এবং নবজাত পুত্রের মায়াবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। কিছুকাল পরে সিদ্ধার্থ গয়াধামের নিকটবর্তী স্থানে এক বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া ছয় বৎসর কাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়া বুদ্ধ (অর্থাৎ জ্ঞানী হইলেন)। নিজে জগৎ সংসার সম্বন্ধে পরম জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধদেব সকলের মুক্তির জন্য ধর্মপ্রচারে ব্রতী হইলেন। আত্মোৎকর্ষ সাধনই ধর্মের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান উপায়—করুণা। করুণা বা মৈত্রী বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান সাধনা। প্রাণের যে অবস্থায় অপরের দুঃখে দুঃখ

উপস্থিত হয়, অপরের দুঃখ ও অহিত দূর করিবার বাসনা হয় তাহাকেই করুণা বলা হয়। খ্রীঃ পূঃ ৫৪৩ বা ৪৭৮ অব্দে বুদ্ধদেবের দেহবসান হয়। জলপূর্ণ মেঘ যেমন আপনার জলভারের প্রাচুর্যেই সকলের উপর জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ বুদ্ধদেবের করুণাও উদ্বেলিত হইয়া নির্বিশেষে সর্বলোকের উপর বর্ষিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'সন্তানের জন্য আমরা মানুষকে দুঃসাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক জন্তুকেও সেইরূপ দেখিয়াছি; স্বদেশীয় স্বদলের জন্যও আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি; পিপীলিকাকে ও মধুমক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সেইখানেই মানুষ আপনার মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরবলাভ করিয়াছে। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে—বৎস যেমন গাভীমাতার স্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপর বর্ষণ করিতেছে।' মাতা যথা নিয়ং…বিহার মিধমাহু—পালি ভাষায় প্রকাশিত বুদ্ধদেবের এই উপদেশের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী অংশে নিজেই দিয়াছিন। মৈত্রভাবে—বন্ধুভাবে, মৈত্রী বা করুণাপূর্ণভাবে। ব্রহ্মবিহার—ব্রহ্মের স্বরূপে বিরাজ বা বিহার (বিচরণ করা)। রবীন্দ্রনাথ ইহার ব্যাখ্যায় অন্যত্র বলিয়াছেন…যেখানে বাসনার ক্ষয় হয় সেখানে যে কিছুই বাকি থাকে না তাহা নহে। সেখানে সমস্ত আসক্তি ও রিপুর আকর্ষণ দূর হইয়া যায় বলিয়াই দয়া প্রেম আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। সেই পরিপূর্ণতাই ব্রহ্মের স্বরূপ। অতএব যিনি ব্রহ্মভূত হইবেন, ব্রহ্মের স্বরূপে বিরাজ করিবেন, তাঁহাকে কেবল ত্যাগের রিক্ততা নহে, ত্যাগের দ্বারা প্রেমের পূর্ণতালাভ করিতে হইবে। এইজন্যই ব্রহ্মবিহার কাহাকে বলে বুদ্ধ তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন—মাতা যথা নিয়ং…বিহার মিধমাহু। এইরূপ বিশ্বব্যাপী প্রেমের মধ্যে চিত্তকে প্রসারিত করাকেই বুদ্ধ ব্রহ্মবিহার বলিয়াছেন। 'ব্রহ্মবিহার' প্রবন্ধেও কবি বলিয়াছেন: 'অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য নয়—মা তাঁর একটি মাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন, সেইরকম ভালোবাসা। ব্রহ্মের অপরিমিত মানস

যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে ; এক পুত্রের প্রতি মাতার যে একমুখী প্রেম, সেই প্রেম তাঁর সর্বত্রমুখী। তাঁর সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো ব্রহ্মবিহার হল না।' **অভ্যস্ত নীতিকথা**—মামুলী উপদেশ বাক্য। **বিশ্বব্যাপী**—যাহা সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া আছে। **চিরজাগ্রত করুণা**—যে দয়া চিরদিন সমভাবে অবস্থিত। **ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে…উদ্ভূত হইয়াছে**—বুদ্ধদেব ব্রহ্মবিহার বা করুণার যে বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সাধারণ, গতানুগতিক বহুল ব্যবহারে পরিচিত (অভ্যস্ত) নীতিকথা নয় , তিনি তাঁহার সমগ্র জীবন দিয়া ইহাকে উপলব্ধি এবং পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনাচরণেই ইহা সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। **এই সমস্ত আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি**—মৈত্রী শব্দের সাধারণ অর্থ মিত্রের ভাব বা মিত্রতা। মিদ্ (স্নেহ করা) এই ধাতু হইতে মিত্র শব্দের উদ্ভব ; মিত্রের অর্থ, যে স্নেহ করে ; সুতরাং মৈত্রীর অর্থ স্নেহশীলতা। সর্বজীবের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত অপরিমিত মৈত্রী বা স্নেহশীলতা পোষণ করার শক্তিই মৈত্রীশক্তি। ইহা সকল প্রয়োজনের অতীত, উহার সহিত কোনরূপ স্বার্থের বন্ধন জড়িত নাই ; এই মৈত্রী অহেতুক, বিনা কারণেই উৎসারিত হয়। সূর্য যেমন আলোক বিকীর্ণ না করিয়া পারে না, তাহা বিকীর্ণ করিয়াই নিজের স্বরূপ-ধর্মকে চরিতার্থ করে, সেইরূপ মৈত্রীর শক্তি চতুর্দিকে নিজেকে বিস্তৃত করিয়া দিয়াই চরিতার্থ হয়।

অনু. ৯ঃ মহাসম্রাট অশোক……নিযুক্ত করিয়াছিলেন— অশোক মগধের মৌর্য রাজবংশের তৃতীয় সম্রাট। তাঁহার পিতামহ এবং পিতা যথাক্রমে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় মৌর্যসম্রাট বিন্দুসার। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক তাঁহার ভ্রাতাদের পরাজিত এবং নিহত করিয়া মগধ সাম্রাজ্য অধিকার করেন। অশোক খ্রীঃ পূঃ ২৭৩ অব্দ হইতে খ্রীঃ পূঃ ২৩২ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন বলিয়া অনুমান করা হয়। সম্রাট অশোক প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। অভিষেকের কয়েক বৎসর পর তিনি বহু সৈন্যসহ কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে জয়ী হইলে কলিঙ্গ প্রদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে এক লক্ষ লোক নিহত, দেড় লক্ষ লোক দেশান্তরিত এবং উহার বহুগুণ লোক যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যুদ্ধের এই শোচনীয়, মর্মান্তিক পরিণাম

দেখিয়া সম্রাট অশোকের হৃদয় গভীর শোকে ও অনুশোচনায় পূর্ণ হয় এবং তাহার কিছুকাল পরেই সম্ভবতঃ উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। এই ধর্মের প্রভাবে তাঁহার জীবন-ধারা আমূল পরিবর্তিত হয়। তিনি তাঁহার রাজশক্তিকে বৌদ্ধধর্মের প্রচার এবং সর্বসাধারণের কল্যাণে নিয়োগ করেন। 'তীর্থযাত্রা ছাড়াও সম্রাট অশোক তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যময় ধর্মযাত্রা অর্থাৎ ধর্মপ্রচারের জন্য গমন করিতেন এবং সাধারণ লোকেদের সহিত মেলামেশা করিয়া তাহাদের নিকট ধর্মব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার অভিষেকের বার বৎসর পর হইতে পরবর্তী পনর বৎসর ধরিয়া তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের নানা স্থানে পর্বতগাত্রে ও শিলাস্তম্ভে ধর্মের বাণী খোদিত করাইয়া ধর্মের প্রচার ও জনসাধারণের মানসিক উন্নতির ব্যবস্থা করেন।... সম্রাট অশোক স্বীয় পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবার জন্য সিংহলে প্রেরণ করেন। রাজকর্মচারিগণ রাজকার্য পরিদর্শন ও পরিচালনার সঙ্গেই ধর্মপ্রচার করিতে আদিষ্ট হয়। ...সর্বজীবে তাঁহার দয়া ছিল। পথিপার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ, কূপ খনন, বিশ্রামাগার নির্মাণ, রাজ্যের নানাস্থানে মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি তাঁহার হিতকর প্রচেষ্টা-সমূহের নিদর্শন।' এই করুণা ধর্ম ও দেশনিরপেক্ষ ছিল। **রাজশক্তির মাদকতা ...প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র**—স্বেচ্ছাচারপ্রমত্ত রাজশক্তি তীব্র মাদকতাময়। ইতিহাসের সাক্ষ্যেই দেখা যায়, এই শক্তির ঔদ্ধত্যের নেশায় বহু নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই শক্তি বিশ্বগ্রাসী হিংস্র ক্ষুধায় লোলুপ হইয়া থাকে। চেঙ্গিস খান, নাদির শাহের পররাজ্য-লুণ্ঠনের ইতিহাস তো সুপরিচিত। আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সীজারের বিজয়াভিযানে রাজশক্তির নির্মমতাই দেখি। রোমান সম্রাট নীরো তাঁহার রাজকীয় শক্তির দম্ভে রোমনগরী পুড়াইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান রাজশক্তির উন্মাদনা এবং প্রভুত্বলিপ্সায় সমগ্র ইউরোপে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়াছিলেন। জার্মান সম্রাট কাইজারও এইভাবে পররাজ্য গ্রাসের লোভে প্রথম মহাযুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা বা মত্ততায় শাসকবৃন্দ যে কত উদ্ধত ও নিষ্ঠুর হইতে পারে, ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবাসী তাহা দেখিয়াছে। **বিশ্বলুব্ধ**—জগতের যাবতীয় জিনিসের উপর যাহার অপরিসীম লোভ। **মঙ্গলের দাসত্বে**—সাধারণের কল্যাণকার্যে আত্মনিয়োগে। **মঙ্গল শক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য**—সাধারণের

কল্যাণকার্যে আত্মনিয়োগের প্রবল আগ্রহ ও ক্ষমতা। **চক্রবর্তী রাজা**—চক্রবর্তী—চক্র (দেশসমূহ) বৃত (বর্তমান থাকা)+ইন্ র্তৃ, শীলার্থে, বহুবিস্তৃত রাজ্যের রাজা ; আসমুদ্র করগ্রাহী সম্রাট। পুরাণে ভরত, অর্জুন (কার্তবীর্য), মান্ধাতা, ভগীরথ, যুধিষ্ঠির, সগর, নহুষ এই সাতজনকে চক্রবর্তী রাজা বলা হয়।

অনু. ১০-১১ **জ্যোতিরুন্মেষ**—জ্যোতিঃ (তেজ, দীপ্তি, আলোক)+উন্মেষ (উদয়, প্রকাশ) ; জ্যোতির প্রকাশ। **ফাল্গুনের পুষ্পপর্যাপ্তি**—ফাল্গুন বসন্তের মাস বলিয়া এই সময় বহুপ্রকার ফুলের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। **মহাসমুদ্রের নীলাম্বুনৃত্য**—নীল+অম্বু (জলরাশি), বিশাল সমুদ্রের জলরাশির তরঙ্গের নৃত্য। **প্রাত্যহিক জড়ত্ব**—প্রতিদিনের গতানুগতিক জীবনযাত্রার জড়তা, অভ্যাসের দাসত্ব। **নির্বীর্য নিশ্চেষ্টতা**—পৌরুষহীন, সংকীর্ণ জীবনের উদ্যমহীনতা, আলস্য। **আবরণ আচ্ছাদন**—জীবনে যে সকল মোহ, সংস্কার, আসক্তি আমাদের মনুষ্যত্বকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। **আজ তুমি……উদ্ধার করো**—প্রাত্যহিক জীবনাচরণে আমাদের নানা দুর্বলতা প্রকাশ পায়। কিন্তু আজ উৎসবের দিনে সেই সব ক্ষুদ্রতা, দুর্বলতা হইতে মুক্ত হইয়া আমরা উদার হইব, বীর্যবান হইব। **ক্ষুদ্র দম্ভ**—সামান্য লৌকিক সম্পদ, ক্ষমতা ইত্যাদির অর্থহীন বড়াই। **মিথ্যা কোলাহল**—ঐশ্বর্য-বৈভবের অর্থহীন মিথ্যা আড়ম্বর। **অপবিত্র আয়োজন**—আরাম, বিলাস, ক্ষুদ্র সুখের দ্বারা কলুষিত, মনুষ্যত্ববিরোধী আয়োজন ; তাই ইহা অপবিত্র। **মনুষ্যত্বের সেই অভ্রভেদী চূড়াবিশিষ্ট…আমাকে দাঁড় করাইয়া দাও**—কঠোরতায়, উদ্যমে, আত্মবিসর্জনেই আমাদের মানব-জীবনের মহৎ সার্থকতা ; উহাই আমাদের মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বকে কবি এক বিশাল রাজনিকেতনরূপে কল্পনা করিয়াছেন, ইহার চূড়া অভ্র-(আকাশ) ভেদী ; অর্থাৎ ইহার মহিমা সীমাহীন, সমুন্নত ; ইহা নিরাভরণ ও নিস্তব্ধ। পার্থিব জীবনের ঐশ্বর্য ও কল-কোলাহল হইতে মুক্ত বৈরাগ্য ও ত্যাগের নির্মল, পবিত্র রিক্ততা এবং গাম্ভীর্যই ইহার বৈশিষ্ট্য। এই মনুষ্যত্বের রাজনিকেতনের দ্বারের নিকট দাঁড় করাইয়া দিবার জন্যই, অর্থাৎ তাহার মহিমা উপলব্ধির সুযোগ লাভের জন্যই কবি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন। **সেই বহুযুগের অনিমেষ দৃষ্টিপাতের সম্মুখে**—মনুষ্যত্ব অর্জনের কঠিন সাধনার ক্ষেত্রেই যুগযুগান্তর ধরিয়া ঈশ্বর নির্নিমেষ, পলকহীন নেত্রে তাকাইয়া আছেন। সেই অনিমেষ দৃষ্টিপাতের

সম্মুখেই কবি তাঁহার নিকট হইতে মনুষ্যত্বের সাধনার দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

দাও হস্ত তুলি···নিষ্ফল প্রয়াসে—প্রাচীনকালে বীর যোদ্ধারা তাঁহাদের গুরুদের নিকট অস্ত্রচালনার দীক্ষা গ্রহণ করিতেন। কবিও ঈশ্বরের নিকট মনুষ্যত্বের কঠোর দুঃখময় দীক্ষা লইবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন। ঈশ্বরই তাঁহার অক্ষয় তূণ হইতে কবিকে অমোঘ অব্যর্থ শরগুলি তুলিয়া দিবেন, অর্থাৎ মনুষ্যত্ব অর্জনের কঠোর সংগ্রামের শক্তি কবি ঈশ্বরের নিকট হইতেই লাভ করিবেন। তাঁহার পিতৃস্নেহ কর্তব্য পালনের কঠোর আদেশেই অভিব্যক্ত হইবে। দুরূহ কর্তব্যভার অর্পণ করিয়া, সংগ্রামের আদেশ দিয়া এবং নূতন বীর যোদ্ধার বেশে তাঁহাকে সজ্জিত করিয়াই ঈশ্বর কবিকে সম্মানিত করিবেন। ঈশ্বরের আদিষ্ট কর্তব্যপালন করিতে গিয়া কবি যে আঘাত পাইবেন, তাহা তো তাঁহার অলংকার, তাঁহার জীবনের পরম ঐশ্বর্য। উহা পাইবার জন্যই তো তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন। কবি তাঁহার মনুষ্যত্বের সংগ্রামে কখনও সফল, কখনও বা বিফল হইবেন। সফলই হউক, আর নিষ্ফলই হউক, সকল প্রচেষ্টায় ঈশ্বর যেন কবিকে ধন্য, সার্থক করেন।

এই পংক্তিগুলি 'নৈবেদ্য'-এর ৪৭ সংখ্যক কবিতার অন্তর্ভুক্ত। কবিতাটির নাম 'দীক্ষা'। এই কবিতাটি হইতে ছত্রগুলি গৃহীত হইয়াছে। কবিতাটির প্রথম তিন ছত্র ও শেষ দুই ছত্র বর্জন করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ ছত্রগুলি লইয়া সমগ্র কবিতাটি পাঠ করিলে তবেই মর্ম গ্রহণ সম্ভব হয়। এখানে আমরা বর্জিত ছত্রগুলি উল্লেখ করিতেছি :

প্রথম ছয় ছত্র : "আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠি অলংকার রাশি।
খুলিয়া ফেলেছি দূরে।"

* * *

শেষ ছয় ছত্র : "ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন॥"

প্রখ্যাত কাব্য-সমালোচক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'রবিরশ্মি' গ্রন্থে এই কবিতাটির 'মর্ম কথা হিসাবে' নিম্নরূপ বক্তব্য রাখিয়াছেন :

"বিরোধ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ একটি ঐক্যকে খোঁজে, সেটি শিবম্। মঙ্গলের মধ্যেই মন্দ-অকটি এইখানে দুই ভাগ হইয়া বাড়িয়ে চলিয়াছে। মঙ্গলের

মধ্যেই সুখদুঃখ, ভালোমন্দ। মাটির মধ্যে যে রাজ্যটি ছিল সেটি এক, সেটি শান্ত, সেখানে আলো আঁধারের লড়াই ছিল না; লড়াই বাধিল শিবকে জানিতে গিয়া—শিবকে জানার বেদনা বড়ো তীব্র, এইখানে মহদ্ভয়ং বজ্রম্। কিন্তু এই বড়ো বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্মবোধের যথার্থ জন্ম ও পরীক্ষা। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ শান্তির মধ্যে তাহার গর্ভবাস। কবি ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী সত্যের, ন্যায়ের, ধর্মের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছেন। বাঙালীর ভয়বিহ্বলতা হইতে অব্যাহিত লাভের জন্য কবি বহু কবিতায় প্রার্থনা করিয়াছেন।"

॥ ব্যাখ্যা ॥

[১] সেইজন্য হেমন্তের······উদ্দাম হইয়া উঠে। (অনু. ২)

আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কবি উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করিয়াছেন।

জগতের যেখানে সর্ববিধ বাধামুক্ত অবারিত শক্তির প্রভূত প্রকাশ ঘটে, সেইখানেই যেন উৎসবকে মূর্ত ও প্রাণোচ্ছল হইয়া উঠিতে দেখা যায়। প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা এই সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারি। শস্য ও ফলফুলের প্রাচুর্যে প্রকৃতি যখন আপনার অপরিমিত শক্তিকে প্রকাশ করে, তখনই আমরা উৎসবের সমারোহ দেখি। হেমন্তের নির্মল আকাশ হইতে সূর্যকিরণ যখন চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, অগ্রহায়ণের পক্বশস্যক্ষেত্র সমুদ্রের মতই তরঙ্গিত হয়, তখনই আমরা সেই আলোক আর শস্যের স্বর্ণোজ্জ্বলতায় উৎসবের হিল্লোল অর্থাৎ দোলাকে অনুভব করি। বসন্তেই প্রকৃতির প্রাণশক্তি অবারিতভাবে প্রকাশিত হয়। বসন্তকালে আম্রমুকুলের গন্ধে, নানা বর্ণের পুষ্পশোভিত কুঞ্জবনে উৎসব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; আর তখনই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিবার মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হয়।

[২] প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র······অনুভব করিয়া মহৎ। (অনু. ৪)

[ক. বি. প্রাক্ বিশ্ব ১৯৬২; ব. বি. প্রবেশিকা, ১৯৬১]

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

মানুষ তাহার প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনে, স্বার্থচিন্তায়, তুচ্ছ সুখদুঃখে ক্ষুদ্র, দীন এবং একাকী হইয়া থাকে। এখানে সাধারণ প্রাণীর সহিত

তাহার পার্থক্য বিশেষ নাই ; মানুষ শুধু প্রাকৃতিক নিয়মের দাসত্ব করিয়া চলে মাত্র। প্রাত্যহিক জীবনের গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া মানুষ অপরের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না, সে তাহার ক্ষুদ্রতায় এবং দৈন্যে বিচ্ছিন্ন থাকিতে বাধ্য হয়। আর মানুষ যেদিন নিজের মনুষ্যত্বের শক্তিকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেই দিনই তাহার উৎসবের দিন, সেই দিনই সে তাহার সকল ক্ষুদ্রতা ও দীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বৃহৎ হয়। মানুষের সেই আত্মোপলব্ধির দিনেই সকল মানুষের সঙ্গে মিলিত হইয়াই সে তাহার জীবনের বিরাটত্বকে অনুভব করিতে পারে, অসীমতার স্বাদ পায়। এই উৎসবের দিনেই তো মানুষ তাহার সকল মনুষ্যত্বের শক্তিকে, তাহার মানবজীবনের পরম সার্থকতাকে অনুভব করিয়া মহৎ হয়।

[৩] **জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে·· ··জানিয়া ধন্য হইব।** (অনু. ৫)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

জগতের যেখানে শক্তির অবারিত প্রাচুর্যের প্রকাশ ঘটে, সেইখানেই উৎসব। মানুষের মধ্যেও যে অপরিমেয় শক্তি যুগে যুগে সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যখন আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি এবং উপলব্ধি করি তখনই তো আমাদের উৎসবের দিন আসিয়া উপস্থিত হয়। মানুষ জ্ঞানের সাধনায় কত দুঃখ বরণ করিয়াছে, প্রেমিক প্রেমের জন্য আত্মবিসর্জন দিয়াছে, কর্মবীর কর্মের তপস্যায় দুঃসহ দুঃখ বরণ করিয়াছে। মানুষের সেই সকল দুঃখবরণে, ত্যাগে, দুশ্চর তপস্যায় তাহার মনুষ্যত্বের যে অপরিমেয় শক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে, আমরা তাহার গৌরব স্মরণ করিয়া উৎসব করিব। তাহাই তো আমাদের জীবনের যথার্থ উৎসব হইবে। আমরা যখন নিজেকে ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া জানি তখন আমরা ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ ; বৃহতের উপলব্ধি হইতে আমরা বঞ্চিত। কিন্তু উৎসবের দিনেই আমরা আপনাকে ক্ষুদ্র সাংসারিক সীমায় আবদ্ধ ব্যক্তি বিশেষ হিসাবে নয়, মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্যে চিরভাস্বর, মহিমায় শাশ্বত মানুষ বলিয়া জানিয়া ধন্য হইব, নিজেদের মানবজন্মকে চরিতার্থ করিব।

[৪] **কিন্তু যেখানটা মানুষের সমস্ত···চেষ্টা করিতেছে।** (অনু. ৬)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

মানুষের মধ্যে এক আশ্চর্য অপরিমেয় শক্তি আছে। তাহার এই শক্তি যদি কেবল নিজের প্রয়োজন সাধনের সীমার মধ্যে সার্থকতা লাভ করিত, তাহা হইলেও আমরা জগতের সকল জীবের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতাম। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও মানুষ তাহার শক্তির ক্ষেত্রে এক গভীর ও বৃহত্তর চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে সেই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিটি করিয়াছেন।

যেখানে মানুষ আপনার সকল ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া উর্ধ্বে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইখানেই তাহার গভীরতম ও শ্রেষ্ঠতম শক্তি সর্বদাই আপনার স্বাধীন আনন্দে সুদূরাভিসারে যাত্রা করিয়াছে, ইহাই আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। মানুষের এই অব্যাহত শক্তি সকল বাধাবিঘ্ন প্রভৃতির প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন। নিজের প্রাণপ্রাচুর্যে আনন্দোচ্ছলতায় সে দুর্গম দুরূহ পথের যাত্রী। সেই শক্তির প্রেরণায়ই জ্ঞানী জ্ঞানের তপস্যায় সকল দুরূহতাকে বরণ করেন, প্রেমিক আত্মবিসর্জনের মধ্যেই তাহার প্রেমের পরিপূর্ণতা খোঁজে, কর্মী দুঃসাধ্যসাধনের কঠিন ব্রতকে বরণ করিয়া লয়। এই সকল ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করিয়া মানবাত্মার গভীরতম শক্তি নিজের প্রাণপ্রাচুর্যেই প্রকাশিত হইতে দেখি। নিজের প্রয়োজনসাধনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া উদ্দামগতিতে মুক্ত প্রাণের আনন্দ-লোকে ছুটিয়া চলা এই শক্তির ধর্ম।

[৫] **এই শক্তি অভাবের উপরে জয়ী……মৃত্যুর উপরে জয়ী।**

(অনু. ৬)

আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। আমাদের উৎসব যে ব্যক্তির উৎসব, প্রবন্ধকার উহা বুঝাইবার প্রসঙ্গে এই উক্তি করিয়াছেন।

মানুষের মধ্যে আছে অপরিসীম শক্তি, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের অতি সাধারণ দিনের তুচ্ছতার মধ্যে তাহার প্রকাশ নাই। উৎসবের দিনে মানুষ যখন প্রাত্যহিকতার সংকীর্ণতা বর্জন করিয়া নিজেকে সকলের করিয়া তোলে তখনই তাহার এই শক্তির উপলব্ধি সম্ভব। এই শক্তি ব্যয়িত হয় ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনে। ইহার নিকট মানুষের শোক-দুঃখ, ভয়-ক্রোধ এমনকি মৃত্যুও তুচ্ছ হইয়া যায়। সংকীর্ণ পরিধির বাহিরে যে বৃহত্তর আনন্দের জগৎ আছে, মানুষ

দিনে মানুষ বৃহৎ।' এই বৃহৎ সত্তার চেতনা মানবচিত্তে কিভাবে উদ্বোধিত হইয়া থাকে, 'উৎসবের দিন' প্রসঙ্গটি হইতে তাহা বিশদ কর। [বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭, ১৯৭০]

উত্তর: জগতের যেখানে সকল বাধামুক্ত শক্তির প্রবল প্রকাশ হয়, সেইখানেই আমরা যেন উৎসবকে মূর্ত হইতে দেখি। প্রভাতের আলোকোন্মেষে, ফাল্গুনের পুষ্পসমারোহে, বিশাল সমুদ্রের নীল জলরাশির তরঙ্গলীলায় আমরা ঈশ্বরের শক্তিবিকাশকে দেখি এবং তখনই উৎসবের প্রাণোচ্ছলতা অনুভব করি। জগতের যে সকল অংশে এই শক্তির প্রাচুর্য দেখি, সেইখানেই উৎসবের সমারোহ।

মানুষ যেদিন নিজের মনুষ্যত্বের শক্তিকে বিশেষভাবে স্মরণ এবং উপলব্ধি করে, সেই দিনই তাহার উৎসবের দিন। যেদিন আমরা প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সাংসারিক সুখদুঃখে বিচলিত, জড়বস্তুর ন্যায় প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর দাসমাত্র, সেইদিন আমরা নিজেদের মধ্যে সর্বজয়ী মানবশক্তিকে উপলব্ধি করিতে অক্ষম, আমরা সেদিন ক্ষুদ্র, দীন, একাকী। কিন্তু আমাদের উৎসব অর্থাৎ মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের দিনে আমরা সমগ্র মানব সমাজের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা এবং সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া বৃহৎ এবং মহৎ হই। যুগে যুগে জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে, নানা দুশ্চর তপস্যায় মানুষ যে অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছে, এই বিশেষ দিনেই আমরা তাহার গৌরব স্মরণ করি। ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সীমিত ব্যক্তিবিশেষ রূপে নয়, মনুষ্যশক্তির সেই প্রয়োজনাতীত শক্তির অংশভাগী নিত্যকালের মানুষ বলিয়া নিজেদের জানিয়া আমরা ধন্য হই।

এই উৎসবের দিনেই আমরা মানবাত্মার মধ্যে সকল বাধাবিঘ্ন, প্রয়োজন প্রভৃতির প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন সেই বিরাট শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া মানবজন্মের সার্থকতা অনুভব করিতে সক্ষম হই; বুঝিতে পারি, মানুষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকে—ব্যক্তিগত, পরিবারগত, দেশ বা গোষ্ঠিগত, সর্ববিধ স্বার্থের গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য বা দেশানুরাগের মত বিশেষ ক্ষেত্রে সীমিত নয়, ইহা অহৈতুকী অর্থাৎ স্বার্থহীন ও সর্বব্যাপী; তাই নিজের প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে

জলভারাবনত নিবিড় মেঘের ন্যায় নির্বিশেষে সর্বলোকের উপর বর্ষণ করাই ইহার ধর্ম। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণাই তো মনুষ্যত্বের চিরস্থায়ী সম্পদ। এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট অশোক যেভাবে তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তার ও মঙ্গলসাধন কার্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও মঙ্গলশক্তির সীমাহীন প্রাচুর্য প্রকাশিত হইয়া সমস্ত মনুষ্যত্ব, অর্থাৎ মানবজাতির অন্তর সম্পদকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

জগতের উৎসব আর মানুষের উৎসবের ভাবগত যোগসূত্র স্থাপিত হইলে উভয়ের মধ্যেই ঈশ্বরের শক্তির প্রভূত বিকাশ ঘটে। কিন্তু মানুষের উৎসব মহত্তর, কারণ তাহার মধ্যে সেই শক্তির বিরাট বিকাশই ঘটে, যাহা অভাব, ভয়-শোক, মৃত্যুর উপর জয়ী হইয়া চিরকাল ধরিয়া আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করে। বুদ্ধদেব এবং অশোকের মধ্যে সেই শক্তিরই মহিমান্বিত প্রকাশ মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মত সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা হেমন্তের সূর্যকিরণে, অগ্রহায়ণের পক্বশস্যক্ষেত্রে, নববসন্তের আম্রমঞ্জরীর গন্ধে ও পুষ্পশোভিত কুঞ্জবনে, প্রভাতের আলোকোন্মেষে, ফাল্গুনের পুষ্পসমারোহে, মহাসমুদ্রের তরঙ্গলীলায় ঈশ্বরের শক্তিবিকাশকে দেখিয়া উৎসবের দিনে আনন্দে নিমগ্ন হই, কিন্তু মানুষের উৎসবের দিনে মনুষ্যত্বের শক্তি উপলব্ধি এবং সংগ্রহের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, সমগ্র মানবের মধ্যে ঈশ্বরের বিরাট শক্তির বিকাশ দেখিতে আমরা যেদিন সমবেত হই, সেইদিনই আমাদের মহামহোৎসব।

[২] **প্রশ্ন: 'আজ উৎসবের দিন শুদ্ধমাত্র ভাবরসসম্ভোগের দিন নহে।'—উৎসবের দিনের প্রকৃত সার্থকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন?** [ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প), ১৯৫৭]

উত্তর: জগতের যেখানে বাধামুক্ত, অবারিত শক্তির প্রকাশ ঘটে সেইখানেই আমরা উৎসবকে মূর্ত হইতে দেখি। রূপে রূপে অপরূপা প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্যে ঈশ্বরের প্রভূত শক্তির বিকাশ দেখিয়া আমরা উৎসবের মধুর ভাবরসে নিমগ্ন হই। কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে আমরা যেদিন ঈশ্বরের শক্তির বিরাট বিকাশ দেখিতে সমবেত হই, সেইদিনই আমাদের মহত্তম উৎসবের দিন। নিজের প্রয়োজন সাধনের সীমায় আবদ্ধ না থাকিয়া মানুষ জ্ঞানে, প্রেমে,

কর্মে কঠোর দুঃখময় তপস্যায় তাহার মনুষ্যত্বের অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছে। মানুষের কর্ম যেখানে সর্ববিধ স্বার্থের গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়াছে, সেইখানেই সমগ্র মানবজাতি মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরবলাভে চরিতার্থ হইয়াছে। বুদ্ধদেবের করুণা মাত্র সন্তানবাৎসল্য বা দেশানুরাগের মধ্যে সীমিত নয়, তাহা আপনার অপরিমিত প্রাচুর্যেই নির্বিশেষে সকলের উপর বর্ষিত হয়। ধর্মবিস্তার এবং মঙ্গল-সাধনে অশোকের রাজশক্তির প্রয়োগে আমরা মঙ্গলশক্তির সীমাহীন প্রাচুর্যই দেখি।

মানবের মধ্যে ঈশ্বরের বিরাট শক্তির এই জ্যোতির্ময় মহিমান্বিত প্রকাশ— মানুষের এই মনুষ্যত্ব আমরা যেদিন স্মরণ ও উপলব্ধি করি, সেইদিনই তো আমাদের উৎসব। মানবজীবনে এই পরিপূর্ণতা উপলব্ধির মধ্যে উৎসবের দিনের একটি গভীর তাৎপর্য আছে। ইহা শুধু মধুর ভাবরস সম্ভোগের দিন নয়, মাধুর্যের মধ্যে নিমগ্ন বা তৃপ্ত হইবার সময় নয়। প্রতিদিনের দাসত্বে আমরা ক্ষুদ্র, দীন, একাকী হইয়া থাকি; উৎসবের দিনেই সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমরা মনুষ্যত্বের শক্তির উপলব্ধিতে বৃহৎ ও মহৎ হই। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তান-বাৎসল্য কিংবা দেশানুরাগ নয়, তাহা জলভারাবনত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপর বর্ষণ করে। ইহাই মানবত্বের পরিপূর্ণতার চিত্র। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারের চিরস্থায়ী সম্পদ, আমাদের গৌরব। বিশ্বগ্রাসী রক্তলোলুপ রাজশক্তিকে অশোক মঙ্গলকর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে মঙ্গলশক্তির সেই মহিমা যত আবির্ভাব গৌরবের সম্পদ হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিতেছে।

সেইজন্যই উৎসবের দিনে আমাদের সকলের সম্মিলনের মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যতের মানব-লোকের সাহিত আত্মীয়তার বোধে আমাদের সেই শক্তিকে উপলব্ধি এবং স্মরণ করিতে হইবে, এইদিনে ঈশ্বর যেন আমাদের বৃহৎ মনুষ্যত্বের মধ্যে আহ্বান করেন। এইদিনে ঈশ্বরের নিকট আমরা এই প্রার্থনা জানাইব, তিনি যেন বিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনের প্রাত্যহিকতার জড়তা, ঔদাসীন্য, পৌরুষহীন নিশ্চলতা, স্থূল সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আবেশ হইতে আমাদের উদ্ধার করিয়া মনুষ্যত্ব-সাধনায় যে কঠোরতা, এবং আত্মবিসর্জনে যে পরম সার্থকতা, তাহার মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করেন। সকল মোহ, সংস্কার, ক্ষুদ্র দম্ভ, মিথ্যা

কোলাহল, আরামবিলাসের কলুষিত আয়োজন দূর হউক, আমাদের এই উৎসবের দিনে মনুষ্যত্ব-সাধনার কঠিন ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে যেন এই সংগ্রামের দীক্ষা লইতে পারি; তবেই আমাদের উৎসব উদ্‌যাপন সার্থক হইবে।

[৩] রবীন্দ্রনাথের 'উৎসবের দিন প্রবন্ধে উৎসবের অন্তর্নিহিত আদর্শটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর। আমাদের উৎসবে এই আদর্শ কতটা অনুসৃত হইয়া থাকে সে বিষয়ে তোমার অভিমত প্রকাশ কর। **[ক. বি. মাধ্যমিক, ১৯৫২]**

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'মানুষের উৎসব কবে; মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে সেই দিন।' প্রকৃতির রাজ্যে, ইতর প্রাণীর রাজ্যেও আনন্দের অফুরন্ত প্রকাশের মধ্যে আমরা এই উৎসবের বিকাশ দেখিতে পাই। সাধারণতঃ মানুষ সংসারের সুখদুঃখ, স্বার্থবুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া গতানুগতিক জীবন যাপন করে; নানা মালিন্যে আচ্ছন্ন হইয়া প্রাণের ঔদার্য হারাইয়া ফেলে। সংসার-চক্রের ঘর্ঘর ধ্বনিতে উৎসবের মন-মাতানো আনন্দের সুর চাপা পড়িয়া যায়। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ একক, ক্ষুদ্র, দীন—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ। উৎসবের দিনটিতে মানুষ সকল মানুষের সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া জীবনের বৃহত্তর ও মহত্তর তাৎপর্য উপলব্ধি করে। এইভাবে মানুষ যখন নিজের মনুষ্যত্বের শক্তিকে উপলব্ধি করে—সেই দিনই তাহার প্রকৃত উৎসব। বন্ধনমুক্তচিত্ত মানুষ যখন জ্ঞানে ও কর্মে বরণীয় হইয়া উঠে তখনই তাহার উৎসব। জগতের মহামানবদের জীবনাচরণের মধ্যে আমরা এইসকল মহৎ শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া গৌরব বোধ করি, আনন্দ বোধ করি। প্রসঙ্গতঃ মহামানব বুদ্ধদেবের মানব-কল্যাণের জন্য ত্যাগের ব্রত ও সাধনার কথা এবং রাজাধিরাজ অশোকের মানব-কল্যাণে রাজশক্তিকে নিয়োজিত করার কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তান-বাৎসল্য বা দেশানুরাগের মত বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল না। উহা ছিল অহৈতুকী অর্থাৎ সকল প্রত্যাশাশূন্য এবং সর্বব্যাপী; তাই জলভারাবনত মেঘের ন্যায় নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরই উহা বর্ষিত হইয়াছে। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণাই মনুষ্যত্বের চিরস্থায়ী সম্পদ। রাজাধিরাজ অশোক রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তার ও প্রজার মঙ্গল সাধন কর্মে নিয়োজিত করিয়া-

ছিলেন। তাঁহার মধ্যে মঙ্গলশক্তির সেই মহিমান্বিত প্রকাশ মানবজাতির গৌরবের সম্পদ হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিতেছে।

ভারতের উৎসবের অন্তর্নিহিত অর্থটি হইল—উৎসবের দিনে সকলের মিলনের মধ্যে আত্মীয়তার বোধে মনকে উদ্‌বুদ্ধ করা, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা। তিনি যেন বৃহৎ মনুষ্যত্বের আলোকে আমাদের অন্তরকে আলোকিত করেন। আমাদের জীবন যেন ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনের তুচ্ছতা, প্রাত্যহিকতার জড়তা, পৌরুষহীন নিশ্চলতা ও স্থূল সুখ-স্বাচ্ছ্যন্দের আবেশ হইতে মুক্ত হয়। মনুষ্যত্ব সাধনায় যে কঠোরতা, এবং আত্মত্যাগে যে পরম সার্থকতা ইহা যেন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। মনুষ্যত্ব সাধনার কঠিন ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের নিকট সংগ্রামের দীক্ষা লইতে পারি। তবেই সার্থক হইবে আমাদের উৎসব।

ভারতের উৎসব এই মহান ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। উৎসবের এই মহান আদর্শ—এই মঙ্গল-শক্তির মহিমা স্মরণ করিয়া সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যদি আমরা উৎসব অনুষ্ঠান করিতে পারি, তবেই ইহার অন্তর্নিহিত সুমহান আদর্শটি আমাদের আনন্দলোকে উত্তরণে সহায়তা করিবে।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের উৎসবের এই মহান্ বৈশিষ্ট্য আর পরিলক্ষিত হয় না। উৎসব যে অন্তরেরই প্রতিষ্ঠা, তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। তাই আমাদের উৎসব প্রতিদিন সংকীর্ণ হইতেছে। এতকাল যাহা ছিল প্রীতি ও নম্রতার রসে অভিষিক্ত, এখন তাহা ঐশ্বর্য আর অহঙ্কারের আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। এখন বন্ধুবান্ধব ছাড়া, ধনীমানী ছাড়া সর্বসাধারণের নিকট উৎসবের দ্বার রুদ্ধ। আজ আমরা মনুষ্য সাধারণকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মগর্বে স্ফীত হইয়া থাকি। উৎসবের মধ্যে ঈশ্বরের নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার পবিত্র প্রকাশকে উপলব্ধির ক্ষমতাও হারাইয়া ফেলিয়াছি। আত্মাদরে পরম সুখ ও গর্ব অনুভব করিতেছি।

[৪] **প্রশ্ন: 'উৎসবের দিন' 'এবং সেইদিন আমাদের মহা-মহোৎসব' বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝাইয়াছেন? 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধটি অবলম্বনে 'উৎসব' এবং 'মহামহোৎসব' সম্বন্ধে তুলনামূলক ভাবে আলোচনা কর।**

উত্তর: প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেখ।

শ্রাবণ-সন্ধ্যা

॥ সার-সংক্ষেপ ॥

শ্রাবণের অশান্ত ধারাবর্ষণে মূক সন্ধ্যাপ্রকৃতি কি যেন বলিবার চেষ্টা করিতেছে; তাহার সাড়া আমাদের মনে আসিয়া লাগিয়াছে, আমাদের মনও যেন একটা কিছু বলিবার জন্য উৎসুক। কিন্তু কথায় তাহা প্রকাশিত হইবার উপায় নাই বলিয়াই তাহা একটি সুরকে অনুসন্ধান করিতেছে। বিশাল প্রকৃতির মর্মবাণী স্পষ্টকথায় নয়, কেবল আভাসে ইঙ্গিতে, ছবিতে গানেই অভিব্যক্ত হয়। কথা মানুষেরই, তাহা সুস্পষ্ট এবং প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। গান প্রকৃতির, তাহা অস্পষ্ট এবং অসীমতার ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। তাই গানের মাধ্যমেই মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মিলিত হইতে পারে। মানুষ প্রতিদিনের ভাষায় সম্পূর্ণ তৃপ্ত না হইয়া তাহার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনের ভাষাকে মিলাইয়া লইবার জন্য প্রথমাবধিই সচেষ্ট। প্রকৃতি হইতে রং এবং রেখা লইয়া মানুষ নিজের চিন্তাকে ছবিতে এবং প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতেই সুর ও ছন্দ হইয়া নিজের ভাবকে কাব্য-সংগীতে রূপান্তরিত করিতেছে। এইভাবেই অচিন্ত্যনীয় ও অভাবনীয়ের সহিত তাহার হৃদয়ের রাখীবন্ধন হয়, তাহার সকল অনুভূতি অসীমতার সহিত যুক্ত হইয়া একটি বৃহৎ অপরূপতা লাভ করে।

প্রকৃতির সহিত মানবহৃদয়ের সম্বন্ধটি বড় বিচিত্র। বাহিরে তাহার কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতির এক মূর্তি, আর আমাদের অন্তরের মধ্যে তাহার আর এক মূর্তি। ফলের জন্যই গাছের ফুলের সাজসজ্জা, তাহার এই প্রয়োজনের বাহন মৌমাছি। যখনই ফুল এই প্রয়োজন মিটাইয়া ফেলে তখনই তাহাকে খসিয়া ঝরিয়া পড়িতে হয়। আবার এই ফুলটি মানুষের অন্তরে তাহার সকল কাজের তাড়া ঘুচাইয়া শান্তি সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রকাশ রূপে দেখা দেয়। বিজ্ঞান আমাদের বলে, ফুলের সঙ্গে মানুষ সৌন্দর্য মাধুর্যের যে সম্বন্ধ পাতায় তাহা তাহার কল্পনার সৃষ্টিমাত্র, সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কাজের জন্যই আসিয়াছে। আমাদের হৃদয় ইহাকে স্বীকার করে না। বাহিরের জগতে কাজ ছাড়া ফুলের আর কোন পরিচয় নাই, কিন্তু আমাদের অন্তরের জগতে সে সৌন্দর্য ও আনন্দের দূত হইয়া আসে। সীতা যখন রাবণের লঙ্কাপুরীতে বন্দিনী হইয়া ছিলেন, তখন রামচন্দ্রের দূত

হনুমানের নিকট আংটি দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই দূত তাঁহার প্রিয়তমের নিকট হইতেই আসিয়াছে ; রামচন্দ্র তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। আমরাও সীতার মত সংসারে—সোনার লঙ্কায় ভোগপ্রাচুর্যের মধ্যে নির্বাসিত হইয়া আছি। ফুলও আমাদের কাছে প্রিয়তম, সুন্দর ও আনন্দময় ঈশ্বরের দূত হইয়া মুক্তির আশ্বাস জানায়, তাহার রঙের শোভায় আমরা তাঁহার মিলনের আংটিকে চিনিতে পারি ; এই সংসারের বাহিরে বৃহত্তর জীবনের চরিতার্থতা অনুভব করি।

আমরা প্রকৃতির এই দুই রূপই দেখি, বন্ধন ও মুক্তির এবং তাহার একই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের মধ্যে দুইটি সুরই পাই, প্রয়োজন এবং আনন্দের। শ্রাবণের বর্ষণমুখরিত সন্ধ্যায় প্রকৃতির সকল কাজের কথা আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে, আমরা আমাদের অন্তরে কেবল বিরহিণী রাধার বেদনার গানই শুনিতে পাইতেছি। আমরাও রাধার মত ঈশ্বরের বিরহে দিন কাটাই, কিন্তু আমাদের জানিতে হইবে, এই বিরহ মিলনের অঙ্গ। এই শ্রাবণ-সন্ধ্যায় আমরা যেমন সেই বিরহকে অনুভব করি, তেমনই সেই বিরহ-বেদনার মধ্যে এক গভীর আনন্দময় আশ্বাসকে খুঁজিয়া পাই। আমাদের বিরহ-বেদনা তাঁহার সর্বব্যাপী অস্তিত্বের নিগূঢ় অনুভূতিতে সার্থক হইয়া উঠে।

।। বক্তব্য-সংকেত ।।

[১] প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ। শ্রাবণ সন্ধ্যার সংস্পর্শে মানুষের অন্তরে কিরূপ ভাবের উদয় হয় তাহাই এই প্রবন্ধের উপজীব্য।

[২] আমাদের কর্মব্যস্ত জীবনে অনেক প্রভাত, অনেক গোধূলি অলক্ষ্যে অতিক্রান্ত হয় ; কিন্তু শ্রাবণ-সন্ধ্যায় এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যাহা জগতের আর সমস্ত কিছু ভুলাইয়া দিয়া মানুষের অন্তরে আধিপত্য করিতে চাহে ; স্পর্শকাতর মানব হৃদয় বিচলিত না হইয়া পারে না।

[৩] প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্বন্ধ—পারস্পরিকতার, আদান-প্রদানের। প্রকৃতি মানুষকে যাহা জানায় তাহা গানের মাধ্যমেই জানায়, সুতরাং মানুষকেও উপযুক্ত ভঙ্গিতে অর্থাৎ কথায় নহে—গানের মাধ্যমেই সাড়া দিতে হইবে। কথার সহিত যখন সুর যুক্ত করা হয়, তখন সে 'পূর্ণিমার দেহহীন চামেলীর লাবণ্য বিলাসে' অনায়াসে মিশিয়া যাইতে পারে। তাই কবি বলিয়াছেন—
"আর গান ছাড়া আর কোন কথা নেই।"

[৪] কিন্তু মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের সাধারণ দিকটুকুই এই প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য নহে ; শ্রাবণ-সন্ধ্যার সঙ্গীত আমাদের প্রাণতন্ত্রীতে যে সঙ্গীতের সুর ধ্বনিত করে, তাহা দেখানোর জন্যই কবি-প্রাবন্ধিকের এই আয়োজন। এই সঙ্গীত প্রথমে শান্তি সৌন্দর্যের, পরে সুগভীর অধ্যাত্ম-আবেদনের।

[৫] বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়াই প্রকৃতি আমাদের নিকট আসে সুন্দর ও আনন্দের প্রতীক হইয়া, আসে আমাদের নিকট প্রিয়তমের দূত রূপে ; কিন্তু শ্রাবণ-সন্ধ্যার গান মন-মাতাইয়া, প্রাণ-কাঁদাইয়া আমাদের নিকট আসে। ইহার রাগিণী বিরহের রাগিণী।

[৬] শ্রাবণ-সন্ধ্যা কবিকে শুধুমাত্র প্রকৃতি-সচেতনই করে নাই, করিয়াছে অধ্যাত্ম-সচেতন। ইহাতে আনন্দ আছে তবে তাহা অশ্রুসিক্ত। অশ্রু এই কারণে যে, ইহা জাগায় বিরহ, আবার আনন্দ এই কারণে যে, বিরহ সে-তো মিলনেরই অঙ্গ।

[৭] সুগভীর অনুভূতির বলে কবি তাই শ্রাবণ-সন্ধ্যার অবিরাম ধারাবর্ষণের মধ্যে বৃন্দাবনের সেই বিরহ-জাগানো বাঁশীর করুণ-মধুর রাগিণী শুনিতে পাইতেছেন।

॥ রচনা-পরিচিতি ও রসগ্রাহী সমালোচনা ॥

'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' (১১) বক্তৃতামালার অন্তর্গত। 'শান্তিনিকেতন হইতে ১৯০৯ হইতে ১৯২৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ছোটো পুস্তিকার আকারে সতেরো খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ১৩২১ সালের পৌষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের মন্দিরে ও অন্যত্র নানা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই এই সতেরো খণ্ডে সংগৃহীত হইয়াছিল।' (গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্রজীবনী—পঞ্চদশ খণ্ড)। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—'গত একবৎসরের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অনেকগুলি মৃত্যুর আঘাত পাইয়াছেন—বিশেষভাবে পূজাবকাশের মধ্যে যে মৃত্যু-সংবাদগুলি পান, তাহার একটির জন্যও মন প্রস্তুত ছিল না। মনের ও শরীরের এই সহায়হীন অবস্থায় অন্তরাত্মা গভীরের মধ্যে প্রবেশের জন্য ব্যাকুল। কবি একাই থাকেন

শান্তিনিকেতনের দ্বিতলে ; প্রতিদিন প্রাতে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া মন্দিরের পূর্বতোরণ তলে উপাসনায় বসেন ও ধ্যানে মগ্ন হন। ক্রমে দুই একজন অধ্যাপক ও ছাত্র আসিয়া জোটেন। প্রত্যুষান্ধকারে যে কথাগুলি বলিতেন ক্রমে তাহা ঘরে ফিরিয়া লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫ হইতে ১৩১৬ সনের ৭ই বৈশাখ পর্যন্ত উপদেশগুলি প্রায় ধারাবাহিকভাবে চলে।'

'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই আত্মীয়মন্ময়তাপ্রধান(subjective) রচনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন : "রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধ-এ সংগৃহীত এমন কতকগুলি রচনা আছে, যথা কেকাধ্বনি, নববর্ষা, শ্রাবণ-সন্ধ্যা, পাগল প্রভৃতি—যেগুলিতে যুক্তিবাদ ও তথ্যালোচনার পরিবর্তে কবির একটি বিশেষ ভাবানুভূতি, ধ্যান দৃষ্টির একটি অতর্কিত উৎক্ষেপ, স্বপ্নাতুর কল্পনার একটি বর্ণাঢ্য চিত্রকল্প কাব্যসৌন্দর্যের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এই রচনাগুলি সম্পূর্ণরূপে মন্ময় ও আবেগধর্মী। ইহাদের ক্ষেত্রে গদ্য-পদ্যের সীমারেখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

শশিভূষণ দাশগুপ্তের আলোচনায় 'শ্রাবণ-সন্ধ্যার' স্বরূপবৈশিষ্ট্য সুন্দররূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে : "এই ভাবস্থ রচনার পশ্চাতে থাকে লেখকের একটা বিশেষ মানসিক অবস্থা এবং তাহার ভিতর দিয়াই জাগে একটা বিশেষ ভাবদৃষ্টি। মজা এই, বিশেষ ভাবদৃষ্টির ভিতর দিয়া বাহিরে প্রকাশলাভ করে লেখকের ভিতরকার সহজ মানুষটি। এই ভাবদৃষ্টি আপনার ভিতরে আপনি যখন একান্ত অনির্বচনীয় হইয়া উঠে তখন প্রকাশের জন্য সে সঙ্গীতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, তখনই সে রূপ গ্রহণ করে লিরিক কবিতার ; আর ভাবনার দোলায় স্থিরবদ্ধ ভাবটি যখন নিজেকে একটু একটু করিয়া চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে থাকে তখনই সৃষ্টি হয় এই জাতীয় রচনার। লিরিক কবিতার সহিত এই জাতীয় রচনার আকৃতিগত ভেদ যতই থাকুক, প্রকৃতিগত ভেদ বিলক্ষণ নহে। রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাই এই ভাবের সহিত ভাবার মিশ্রণে জাত। কোথাও হয়ত ভাবই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, কোথাও ভাবনা। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের এই রচনাগুলি স্থানে স্থানে তাঁহার লিরিক কবিতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সকল ভাবস্থ রচনার ভিতরে 'শ্রাবণ- সন্ধ্যা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহিঃপ্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতি এখানে পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া একেবারে এক

হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে যেমন দেখিতে পাই,—"আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে...এ যেন শব্দের অন্ধকার," অন্যদিকে তেমনই ইহার সহিত আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিরও গভীর মিল রহিয়াছে। তাই,—"আজ এই বোবা সন্ধ্যা প্রকৃতির ··গানকেই জাগিয়ে তোলে।" রবীন্দ্রনাথ এখানে এই মূক প্রকৃতির শব্দের অন্ধকারের ভিতরে যদি নিজেকে একেবারে নিমগ্ন করিয়া দিতেন তবে 'অনির্বচনীয়ের আভাসে ভরা গান'কে সৃষ্টি করিতেন ; রবীন্দ্রনাথ এখানে ভাবস্থ, কিন্তু একেবারে বিলীন নহেন ; তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে জাগিয়াছে ভাবনা— মানুষের ভাষা আর প্রকৃতির ভাষা সম্বন্ধে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের যোগ সম্বন্ধে, বিশ্বপ্রকৃতি তাহার সকল সৌন্দর্য দূতের মুখে কোন্ প্রিয়তমের বার্তা কেমন করিয়া পাঠাইতেছে, আর প্রকৃতি এই শ্রাবণের অবিরল বর্ষণধ্বনির ভিতর দিয়াই বা কোন্ অনাদি বিরহের বার্তা পাঠাইয়াছে তাহার সম্বন্ধে। এই যে একটির পর একটি করিয়া ভাবনা আসিতেছে তাহারা বিশেষ কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য নৈয়ায়িক পারম্পর্যে অন্বিত নহে, একটি ভাবাবেশের দ্বারাই অন্বিত।"

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

অনু ১-৩ : শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে—শ্রাবণ বর্ষার মাস বলিয়া এই সময় সাধারণতঃ অশ্রান্ত বর্ষণই হয় ; ধারা—জলাদির প্রবাহ। **জগতের যতকিছু···দিয়েছে**—এখানে 'কথা' বলিতে পশুপক্ষী এবং প্রকৃতির সর্বপ্রকার শব্দকেই বুঝানো হইয়াছে, কেবলমাত্র, মানুষের কথা নয়। **মাঠের মধ্যে···আজ নিবিড়**—শ্রাবণ মাসের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর প্রবল ধারাবর্ষণে সমস্ত কিছুর উপর যেন একটা যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে। **যে কখনো···জানে না**—অন্ধকার যদিও দৃষ্টিগ্রাহ্য, শ্রুতিগ্রাহ্য নহে, কিন্তু কবি কল্পনা করিয়াছেন যেন অন্ধকারের মুখে আজ কথা ফুটিয়াছে। **সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে**—অন্ধকারের কোনও ভাষা নেই, সে মূক (মূক—মূ+ক ; বাক্‌শক্তিহীন, বোবা), কিন্তু শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণের ধ্বনি যেন সেই ভাষাহীনকে কথায় ভরিয়া তুলিয়াছে। **অন্ধকারকে···পতনধ্বনি**—শ্রাবণের ধারাপতনের শব্দকে কবি অন্ধকারের

ভাষা বলিয়াছেন। ভাব প্রকাশক না হইলে শব্দকে ভাষা বলা যায় না। শ্রাবণের ধারাপতনের এই শব্দ যেন কবির নিকট ভাব-প্রকাশক্ষম ভাষারূপে প্রকাশমান। অন্ধকারে চোখে কিছু দেখা যায় না—কিন্তু উহা মনের মধ্যে একটি ভাব-রূপে প্রতিফলিত হয়। শ্রাবণের এই ধারাপতন ধ্বনিও কোন বিশেষ ভাষা না হইয়াও কবির মনে ভাষার রূপ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। **বৃষ্টি-পতনের…অন্ধকার**—নিঃশব্দ অন্ধকারে যখন শ্রাবণের ধারাপতনধ্বনি শোনা যায়, তখন মনে হয় এই শব্দ যেন অন্ধকারকে ঘনীভূত করিয়া বিশ্ব-জগতের নিদ্রাকে নিবিড় করিয়া তোলে। শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের এই একাকার অনুভূতি শ্রাবণের ঘনবর্ষার একটি বৈশিষ্ট্য। অন্ধকার বস্তুপুঞ্জের পার্থক্যকে দূরীভূত করিয়া তাহাদের একাকার করিয়া দেয়। এই একত্রীকরণ অন্ধকারের বৈশিষ্ট্য ; সেইজন্য এই ধারাপতনকে কবির নিকট শব্দের অন্ধকার বলিয়া মনে হইয়াছে। **আজ এই কর্মহীন…খুঁজে পেয়েছে**—ইষ্টমন্ত্র (যে মন্ত্রে নিজের আরাধ্য দেবতার উপাসনা করিতে হয়) পুনঃ পুনঃ নীরব আবৃত্তি করাকেই জপ বলা হয়। এই শ্রাবণ-সন্ধ্যায় কাহারও কোনও কাজ নাই, এই কর্মহীন শ্রাবণ-সন্ধ্যায় অশ্রান্ত ধারাবর্ষণেই যেন তাহার (অর্থাৎ আরাধনার) মন্ত্রটিকে খুঁজিয়া পাইয়াছে, বার বার তাহাকে আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে।

অনু. ৪-৫ : **বোবা সন্ধ্যা প্রকৃতির**—কবির বক্তব্য সন্ধ্যা-প্রকৃতি স্বভাবতঃ ভাষাহীন হইলেও শ্রাবণসন্ধ্যার পরিবেশে সে যেন মুখর হইয়া উঠিয়াছে। **সে তো কথা দিয়ে হবার জো নেই…সুরকে খুঁজছে**—শ্রাবণ সন্ধ্যায় অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে সন্ধ্যাপ্রকৃতির কণ্ঠ খুলিয়া গিয়াছে। আমাদের মনেও তাহার একটা সাড়া জাগিয়াছে, সেও একটা কিছু বলিবার জন্য উৎসুক। সন্ধ্যাপ্রকৃতির মতই আমাদের মন একেবারে জল, স্থল, আকাশ পূর্ণ করিয়াই বলিতে চায়, কিন্তু তাহা কথায় প্রকাশ করা যাইবে না, কারণ কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ ; গভীর ভাবানুভূতি প্রকাশের পক্ষে ইহা অনুপযুক্ত, সেইজন্যই ইহা একটা সুরকে অনুসন্ধান করিতেছে। যাহা অনির্বচনীয়, গভীর, অসীমের অনুভূতিতে ব্যাকুল তাহাকে গানের মধ্যেই প্রকাশ করা যায়। **সে কেবল…ছবিতে গানে**—প্রকৃতির ভাষা অর্থের বন্ধনে আবদ্ধ নয়, তাই সে কোন প্রয়োজন সাধন করে না। একটা অস্পষ্ট উপলব্ধি

প্রকাশে সে সক্ষম। **এইজন্যে প্রকৃতি যখন ·· গানকেই জাগিয়ে তোলে**—বিশাল প্রস্তুতির যাহা কিছু শোভা, বর্ণ, সম্পদ, তাহা স্পষ্ট কথায় নয়, গানেই অভিব্যক্ত হয়। সেইজন্যই প্রকৃতি যখন আলাপ করিতে থাকে, সংগীতমুখর হয়, তখন সে স্থূল প্রয়োজনের বাহন কথাকে নিরস্ত অর্থাৎ স্তব্ধ করিয়া দেয়, আমাদের প্রাণের ভিতরে যাহা অনির্বচনীয়, অসীম, তাহার আভাসে-ভরা গানকে জাগাইয়া তোলে, তাহার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় আমাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় এই বক্তব্যটিই সুন্দরভাবে কাব্যময় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন :

"মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানুষের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে ;
ধূলি ছাড়ি একেবারে উর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তস্বর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।"

জগতের বিরাট··· থাকে না—কবি সীমার সহিত অসীমের, ব্যক্তি মানুষের সহিত নিখিল বিশ্বের মিলন সাধনের ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই মিলন সাধনেই মানবজীবনের চরিতার্থতা।

অনু ৬-৯ : প্রতিদিনের ভাষা—দৈনন্দিন প্রয়োজনের ভাষা। **রন্ধনের ভাষা**—যে ভাষা প্রয়োজনের গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে। চির-আনন্দ উপলব্ধির ভাষা। **অব্যক্ত**—শ্রাবণ-সন্ধ্যার এই ভাষা প্রকৃতির ভাষা, কোনও নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে না— তাই তাহা অব্যক্ত। **ব্যক্ত**— মানুষের ভাষা, যাহা নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। **আজ যুক্তিতর্ক···কথা নেই**—কবির বক্তব্য : মানুষের সহিত প্রকৃতির আদান-প্রদান যুক্তি দিয়া বোঝান যায় না। যুক্তি দ্বারা যাহার নাগাল পাওয়া যায় না—সুরের সাধনার মধ্য দিয়াই সেই অব্যক্ত প্রকৃতির লীলার আনন্দে মানুষ পরিপ্লুত হইতে পারে। **মনুষ্যলোকালয়ের বেড়াকে**— সমাজ সংসারের প্রাত্যহিকতার ক্ষুদ্র চিন্তাভাবনা তথা প্রয়োজনকে।

অনু ১০-১৩ঃ অফিসের সাজ—আপিসে, কর্মস্থলে কাজ করিতে হইলে শৌখিনতা পরিহার করিয়া বাহুল্যবর্জিত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিতে হয়। **মরুভূমি**—জল, বৃক্ষ, প্রাণিহীন বালুকাময় ভূমি। **মৌমাছির পাদরেণুপাতে যেমনি তার…নির্মমভাবে বিসর্জন দেয়** - ফুলের মধু এবং গন্ধ মৌমাছিকে আকৃষ্ট ক'র, মৌমাছি মধুপান করিতে আসিয়া তাহার পায়ে ফুলের রেণু বা পরাগ লইয়া অন্য ফুলে বসিলে নূতন ফুলের বীজ সৃষ্টি সম্ভব হয়। সেই প্রয়োজন মিটিয়া গেলেই ফুলকে নিঃশেষিত হইতে হয়। **প্রকৃতির বাহির বাড়িতে**—প্রকৃতির দুইটি রূপের মধ্যে প্রয়োজনের দিকটি হইল বাহিরের দিক। **নামঞ্জুর**—অস্বীকৃত, যাহাতে সম্মতি দেওয়া হয় নাই, যাহা গৃহীত হয় নাই, পরিত্যক্ত। **মজুরি**—শ্রমজীবীর কর্ম, মজুরের কাজ। **বিজ্ঞান**—(বি—বিশেষ—'সমগ্র সত্যের মধ্যে পরিস্ফুট জ্যোতি, রসায়ন প্রভৃতি নানা প্রকার শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধীয় বৈশেষিক জ্ঞান, তাই তাহার আদিতে বি-জ্ঞান)। বিশেষ বিশেষ শাখায় আবদ্ধ বিশিষ্টরূপ জ্ঞান; পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ-মূলক বিশেষ জ্ঞান। **বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে**—সমগ্র জগতে। **অনবচ্ছিন্ন কার্যকারণসূত্রে**—বহির্বিশ্বে প্রতিটি কার্য নিরবচ্ছিন্ন কারণের সূত্রে বাঁধা, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অধীন। ফুল ফোটার মধ্যেও আমরা এই ধারাবাহিক কার্যকারণ সূত্র দেখিতে পাই। **আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে**—এই অংশটি তৈত্তিরীয়োপনিষৎ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার অর্থ, 'আনন্দ হইতেই এই ভূতবর্গ (জীব, প্রাণী) জাত হয়। ব্রহ্মা জগৎনিয়ন্তা, ঈশ্বর আনন্দময়, আনন্দস্বরূপ, তাঁহা হইতেই জীবের উৎপত্তি'।

অনু. ১৪-১৯ঃ সেই সুন্দরের ··খবর—সুন্দর ও আনন্দময় অর্থে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের এক কল্পনা-প্রসূত অশরীরী সত্তাকে বুঝানো হইয়াছে। অসীমই বিশুদ্ধ আনন্দের উৎস—তিনিই ঈশ্বর। **মধুকর**—মৌমাছি। **হাজরি**—উপস্থিতি। **বিচ্ছিন্নতার দ্বীপ** মানুষ যখন সুখ-দুঃখে ভরা দৈনন্দিন দিন যাপনের গ্লানি বহন করিয়া চলে, তখন সে সুন্দরের সহিত বিচ্ছিন্ন হয়। অখণ্ড জীবন-সমুদ্রে এক একটি মানুষ যেন সীমার বন্ধনে আবদ্ধ দ্বীপের ন্যায় বিরাজিত। **সীতা যখন রাবণের ঘরে…প্রিয়তমের কাছ থেকে এসেছে**—রাবণের লঙ্কাপুরীতে বন্দিনী সীতাকে অন্বেষণ করিবার জন্য রামানুচর হনুমান সেখানে উপস্থিত হন। রাক্ষসীগণ কর্তৃক পরিবৃতা শোকাতুরা সীতাকে

তিনি দেখিতে পাইলেন। তিনি বৃক্ষের শাখা হইতে কিছুদূরে নামিয়া সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। "হনুমান বললেন, 'দেবি, আমি রামের বার্তা নিয়ে এসেছি, তিনি কুশলে আছেন, তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। লক্ষ্মণ নতমস্তকে তোমাকে প্রণাম জানিয়েছেন।' রামলক্ষ্মণের কুশল জেনে সীতা অত্যন্ত প্রীত হলেন। হনুমান আরও নীচে নেমে এলেন। তখন সীতা ভয় পেয়ে বললেন, 'মায়াবী নিশাচর, তুমি জনস্থানে পরিব্রাজকরূপে আমার কাছে এসেছিলে। আমি উপবাসে কৃশ এবং দুঃখে কাতর, কেন আমাকে পুনর্বার সন্তাপ দিচ্ছ?' হনুমান রামলক্ষ্মণের রূপ গুণ সবিস্তারে বললেন এবং সীতা-হরণের পরবর্তী সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে বললেন, 'মৈথিলী, তুমি আশ্বস্ত হও। ......। তোমার প্রত্যয়ের জন্য রাম তাঁর নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয় দিয়েছেন দেখ।' সীতা অঙ্গুরীয় নিয়ে দেখতে লাগলেন, তাঁর মুখ রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হল।" (রাজশেখর বসুকৃত রামায়ণের অনুবাদ) **সংসারের সোনার লঙ্কায়.....আমাকেই ভজনা করো**—সোনার লঙ্কাপুরীতে, রাবণের ঐশ্বর্যের বিপুল প্রলোভনের মাঝখানে সীতা বন্দিনী ছিলেন, রাক্ষস রাবণ আসিয়া বার বার তাঁহাকে এইভাবে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিত: 'দেবী, ভয় পেয়ো না, আমাকে বিশ্বাস কর, আমাকে গ্রহণ করে সর্বপ্রকার সুখলাভ কর, মহার্ঘ বসন-ভূষণ, শয্যা-আসন, মদ্য, নৃত্যগীত, বাদ্য প্রভৃতি উপভোগ কর।' আমরাও সোনার লঙ্কার মত সংসারের নানা ঐশ্বর্য, সুখভোগের আয়োজন (রাজভোগ) প্রভৃতির মধ্যে প্রিয়তম অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে নির্বাসিত হইয়া আছি। রাক্ষস অর্থাৎ স্থূল ভোগপ্রবৃত্তি তাহাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য কেবলই আমাদের লুব্ধ, প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। **মানুষের মনের মধ্যে...চিঠি নিয়ে আসে**—প্রেমের চিঠি রঙীন কালিতেই লেখা হয়, সেইরূপ মানুষের হৃদয়ের কাছে ফুলের বর্ণ সৌন্দর্যের সহিত প্রয়োজনের কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহা গভীর প্রেমের বাণীই বহন করিয়া আনে।

অনু. ২০-২৪: এই দেখ...নিয়ে এসেছি—হনুমান যেমন রামচন্দ্রের আংটি দেখাইয়া সীতা দেবীকে তাহার পরিচয়ের কথা নিবেদন করিয়াছিল, ফুলটিও যেন সেই পরম সুন্দরের কথাই বলিতেছে। সে সেই পরম সুন্দরেরই বার্তা-বাহক। **সোনার লঙ্কাপুরী**—অর্থাৎ ভোগ-সুখ তথা স্বার্থসঙ্কীর্ণ

পৃথিবী। **লোহার শৃঙ্খল**—প্রয়োজনের প্রতীক। **সোনার তার**—সৌন্দর্যের প্রতীক। **রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের…দুই সুর**—রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ এক রূপে প্রকৃতির নানা প্রয়োজন সাধন করিতেছে আবার মানুষের কাছে উহাই নানা আনন্দের উপকরণ যোগাইতেছে। সেখানে উহার অন্য রূপ। **সেখানে তার কামার-শালার আগুন…বীণাধ্বনি বাজিয়ে তোলে**—বাহিরে প্রকৃতি কর্মব্যস্ত, প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সে বিনা-প্রয়োজনের আনন্দ ও সৌন্দর্যের সম্ভার লইয়া উপস্থিত হয়। সেইখানে তাহার কামার-শালার আগুন আমাদের উৎসবের দীপমালা হইয়া দেখা দেয়, কারখানার কলের শব্দই সংগীত হইয়া ওঠে, অর্থাৎ প্রকৃতির সকল কর্মের আয়োজনই মানুষের অন্তরে আনন্দ ও সৌন্দর্যের সামগ্রীতে পরিণত হয়। ফল ফলাইবার জন্যই ফুলের সাজসজ্জা, কিন্তু মানুষের অন্তরে তাহাই প্রয়োজনাতীত আনন্দ সঞ্চারিত করে। বাহিরে প্রকৃতি কার্যকারণের শৃংখলে আবদ্ধ, ফলের জন্যই তাহাকে ফুল ফোটাইতে হইবে, ফুলের মধ্যে বর্ণ-গন্ধের আয়োজন করিতে হইবে; সেখানে সে কার্যকারণের দ্বারা বন্দী, তাহার লোহার শৃংখল ঝন্‌ঝন্‌ করে, কিন্তু মানব-অন্তরে তাহার অহেতুক আনন্দের প্রয়োজন-নিরপেক্ষ স্বতঃস্ফূর্ততা সোনার তারে বীণাধ্বনি বাজাইয়া তোলে, হৃদয়বীণায় সঙ্গীতমাধুর্য সৃষ্টি করে।

অনু. ২৫-২৯: কাজের কথা…গেছে—প্রকৃতির রাজ্যে শ্রাবণ-মাসের বৃষ্টিপাতের নানা প্রয়োজন আছে। কিন্তু কাজের গণ্ডীর বাহিরে আজ সে একটা মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। **এই কথাটির…দিচ্ছে না**—কাজের বা প্রয়োজনের গণ্ডীতে শ্রাবণ-সন্ধ্যা সীমিত নহে, তাই সে প্রয়োজনের গণ্ডীর বাহিরে মানুষের মনে আনন্দ সংগীতের সুর জমাইয়া তুলিয়াছে। **আপিসের বেশ**—কাজের ও প্রয়োজনের ইঙ্গিতবাহী। **মেঘমল্লারের সুরে**—মেঘমল্লার সঙ্গীতের রাগবিশেষ, মেঘমেদুর বর্ষার সুর ও ছন্দ এই রাগে মূর্ত হইয়া ওঠে। **তিমির দিগভরি…দিনরাতিয়া**—একটি বৈষ্ণব পদ। কেহ কেহ মনে করেন ইহা কবি বিদ্যাপতির রচনা, কিন্তু আধুনিক অনেক পণ্ডিতই ইহাকে কবি রায়শেখরের রচনা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কৌতূহল তৃপ্তির জন্য এখানে পূর্ণপদটি উদ্ধৃত হইল:

এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।
তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া ॥

বাংলা অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়—

ঘোর রাত্রিতে দিগন্তব্যাপী অন্ধকার, বিদ্যুৎপংক্তি অস্থির, বিদ্যাপতি বলে, হরি ব্যতীত কি করিয়া দিনরাত্রি কাটাইব। বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। ১৩৮০ খ্রীঃ হইতে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। আলোচ্য পংক্তিগুলি বিরহিণী রাধিকার বিরহবেদনামূলক যে পদটি হইতে উদ্ধৃত, তাহা একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব-গীতিকবিতা। কাহারও কাহারও মতে, ইহা রায়-শেখরের রচনা।

তুই যে বিরহিণী—মানুষের এই বিরহ চিরন্তন সৌন্দর্যের সঙ্গে। **আমরা যে……জানা চাই**—আমরা যে সেই চির সৌন্দর্য নিকেতন হইতে বিচ্ছিন্ন এই সত্য-জ্ঞান লাভ না করিলে সংসারের ওই তুচ্ছতম স্বার্থমগ্ন জীবনকেই পরম প্রাপ্তি বলিয়া মনে করিব। অপ্রাপ্তির জ্ঞান না থাকিলে পাওয়ার আগ্রহ জন্মে না। **মানুষ কবি…গাইতে থাকে**—প্রকৃতির ভাব সৌন্দর্য সাধারণের অনুভবের বাহিরে। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, উহা চিরন্তন সৌন্দর্যের ভাবমূর্তি। কিন্তু কবির সংবেদনশীল চিত্তে সে রূপ পরিগ্রহ করে। কা

গানের মধ্য দিয়া প্রকৃতির সেই ভাবমূর্তিটি বাণীমূর্তি গ্রহণ করে। **কয়েদি**—আরবী কয়েদ্ (অবরোধ করা, আবদ্ধ, আটক) হইতে কয়েদি, অবরুদ্ধ, বন্দী। **ভরা ভাদর···মোর,** ইত্যাদি—ভাদ্রমাসের ভরা বর্ষা, আমার মন্দির শূন্য ; কৃষ্ণের বিরহে রাধার খেদোক্তি। রাধা-বিরহের এই পদটি রায়শেখরের বলিয়াই আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করিয়া থাকেন।

অনু. ৩০-৩১ : যতদূর চেয়ে······দিনরাতিয়া—রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের অভিব্যক্তি। চির-আকাঙ্ক্ষিত আনন্দলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা স্বার্থসংকীর্ণ সংসারে আবদ্ধ হইয়াছি। আজ শ্রাবণ-সন্ধ্যায় যেন কবির প্রাণে সেই স্বার্থমুক্ত সুন্দরের জন্য বিরহের আর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। **অশ্রুসিক্ত আনন্দকে······নিয়ে আসছে**—শ্রাবণের বর্ষণ-মুখর অন্ধকারে বিরহবেদনায় আমাদের কাঁদিতে হয়, কিন্তু সেই ক্রন্দন ও বেদনার মধ্যে এক গভীর আনন্দ নহিত থাকে ; সেই বেদনার মধ্য দিয়াই তো আমাদের দয়িত ঈশ্বরকে নিবিড়ভাবে অনুভব করা যায়। এই ব্যথা হইতে তাই অশ্রুসিক্ত আনন্দ উৎসারিত হয়। **তাহলে··বাঁচত না**- এই বিরহ কামনা-বাসনার চরিতার্থতার অভাবমাত্র নহে ; ইহা এক গভীর তাৎপর্য বহন করিতেছে।

তাকে না পেয়েছি না-ই পেয়েছি···সে আছে—তুলনারহিত এই বিরহ-ভাষ্য। প্রবন্ধকারের আস্তিকতার এক অপূর্ব অভিব্যক্তি এখানে লক্ষণীয়। বিরহ আমাদের কাতর করিলেও তাহাতে দুঃখ নাই। না পাওয়ার ব্যথা প্রাপনীয় বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ব্যথা যতই তীব্রভাবে অনুভূত হইবে, ততই সেই অস্তিত্ব হইবে প্রবলতর সত্য। বিরহ-বেদনা ব্যাপিয়াই বিরাজ করেন প্রেমাস্পদ। সুতরাং মিলন বা প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি যেখানে অসম্ভব সেখানে ঐ বেদনার মধ্যে অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়াই তো পরমতম প্রাপ্তি।

মানুষের চির-বিরহ ও ঈশ্বরের চির-বিরহে পার্থক্য এইখানেই। চিরকালের মতো হারাইয়া-যাওয়া প্রিয়জনের জন্য বিরহই মানুষের বিরহ, তাই বিরহ নাস্তিবাচক ; কিন্তু ভগবানের বিরহ, ভগবানের অস্তিবাচক। এখানে বিরহের অনুভূতিই মিলনের আনন্দ। **হরি বিনে·· অজস্র বর্ষণ**—কথাটি গূঢ় অর্থবাহী। শাশ্বত সৌন্দর্যের প্রাণকেন্দ্রই হরি। এই বিরহ সৌন্দর্যেরই বিরহ। ইহা সংসারের লাভালাভ বা সুখ-দুঃখের বস্তু নহে। পার্থিব জীবনে নানা অভাব, নানা দুঃখ-বেদনার জ্বালা। ইহাকে পার্থিব সুখ-শান্তির বিরহ বলা

যায়। কিন্তু এই বিরহে মাহাত্ম্য নাই। আনন্দলোকের সঙ্গে যে বিরহ এবং সেই বিরহের দুঃখানলে সৌন্দর্যলোকে উত্তরণের যে আকুল আর্তি—তাহাই বাঞ্ছিত বিরহ।

॥ ব্যাখ্যা ॥

[১] অন্ধকারকে ঠিকমতো……ধারাপতনধ্বনি। (অনু. ২)

উপরি-উদ্ধৃত অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' রচনাটি হইতে গৃহীত। শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি এই উক্তিটি করিয়াছেন।

শ্রাবণ-সন্ধ্যায় অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে জগতের আর যত কিছু কথা আছে সমস্তই ডুবিয়া গিয়াছে। মাঠের মধ্যে অন্ধকার নিবিড়। প্রকৃতির এই পরিবেশে কবির মনে হইয়াছে, অন্ধকার সাধারণত মূক, ভাষাহীন। সেই অন্ধকারকেই তাহার উপযুক্ত ভাষায় বুঝি কথা বলাইতে পারে এই শ্রাবণের অবিরাম বৃষ্টি-পাতের ধ্বনি। মূক অন্ধকারই এই বর্ষণধ্বনিতে তাহার হৃদয়ের গভীরতম ভাষাটিকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। শ্রাবণের ঝর্‌ঝর্ কলশব্দে সে যেন তাহার জপের মন্ত্রটিকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। অন্ধকার যেন সেই মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে তাহার হৃদয়ানুভূতিকে বার বার আরতি করিতেছে। শিশু তাহার নূতন-শেখা কথাটিকে যেমন অকারণে, অপ্রয়োজনে ফিরিয়া ফিরিয়া উচ্চারণ করিতে থাকে, শ্রাবণ-সন্ধ্যার অন্ধকারও যেন সেইভাবে ক্রমাগত তাহার হৃদয়ের ভাষাটিকে আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে। শ্রাবণসন্ধ্যায় বিরামহীন বর্ষণের শব্দে মূক সন্ধ্যা-প্রকৃতির কণ্ঠ যেন হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে এবং গভীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া সে যেন ক্রমাগত নিজের কানেই সেই বর্ষণশব্দ শুনিতেছে।

[২] জলের কল্লোলে……ছবিতে গানে। (অনু. ৩)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

শ্রাবণ-সন্ধ্যায় মূক সন্ধ্যার অন্ধকার যেমন বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ মানুষের মনেও ইহার সাড়া জাগিয়াছে; সেও একটা কিছু বলিতে উৎসুক।

কিন্তু অর্থের বন্ধনে আবদ্ধ কথায় তাহা প্রকাশিত হইবার উপায় নাই, তাই আত্মপ্রকাশের জন্য সে সুরকে খুঁজিতেছে। এই ভাবনার সূত্র হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য উক্তিটি করিয়াছেন।

স্পষ্ট কথায় নয় সঙ্গীত এবং চিত্রের ব্যঞ্জনায়, ইঙ্গিতময়তার মধ্যে প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। জলের কল্লোলে, বনের মর্মরে, বসন্তের সৌন্দর্যোচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে প্রকৃতির যে হৃদয়রহস্যকে আমরা অনুভব করি, তাহা সুস্পষ্ট এবং প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে না। প্রকৃতির হৃদয়-বাণীর অসীমতা স্পষ্ট কথায় নয়, কেবল আভাসে-ইঙ্গিতে, ছবিতে-গানেই ব্যঞ্জিত হইতে পারে, সেইভাবেই তাহার সার্থকতম অভিব্যক্তি ঘটে। প্রকৃতির ভাষা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন সাধনের ভাষার মত সংকীর্ণ, সীমিত নয়; তাহা অনির্বচনীয় ও রহস্যময়ের ইংগিতে ঐশ্বর্যময়। সেইজন্যই প্রকৃতি যখন আলাপরত হয়, সে আমাদের মুখের সংকীর্ণ কথাকে স্তব্ধ করিয়া দেয়, আমাদের হৃদয়ের গভীরে অনির্বচনীয়ের আভাসে-ভরা সংগীতকেই জাগাইয়া তোলে।

[৩] কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। (অনু. ৫)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

শ্রাবণ-সন্ধ্যায় অবিরাম বর্ষণ-ধ্বনিতে মূক সন্ধ্যার অন্ধকারকে বাঙ্ময় রূপে অনুভব করিয়া রবীন্দ্রনাথ কথা এবং সুরের পার্থক্য সম্বন্ধে যে চিন্তা করিয়াছিলেন, এখানে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

মানুষ তাহার প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন সাধনের জন্য কথার সৃষ্টি করিয়াছে। কথা সুনির্দিষ্ট অর্থের বন্ধনে আবদ্ধ, বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ; ইহার মাধ্যমে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে। গান প্রকৃতির। যাহা অপরিমেয়, রহস্যময়, তাহা গানের সুরে, ছন্দেই ব্যঞ্জিত হয়। গান কথার মত সুস্পষ্ট অর্থের গণ্ডিতে এবং প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ নয়, অসীমের ব্যাকুলতায় তাহা স্পন্দিত। জলের কল্লোলে, বনের মর্মরে, বসন্তের উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে, শ্রাবণের বর্ষণে বিশাল প্রকৃতির সমস্ত অংশেই তাহার হৃদয়বাণী গানের মধ্যে দিয়াই ঝংকৃত হইয়া উঠে। মানুষ সেইজন্য ই নিজের কথায় তৃপ্ত ও সীমাবদ্ধ না থাকিয়া প্রকৃতির নিকট হইতে সুর সংগ্রহ

করে। একমাত্র গানের মধ্যে দিয়াই ত সে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইতে পারে। মানুষ যখন কথার সঙ্গে সুরকে যুক্ত করে, তখন সেই বাণী আপনার অর্থকে আপনি অতিক্রম করিয়া যায়; সংসারের প্রাত্যহিকতার সহিত এই সুরস্পন্দিত কথার কোনও যোগ থাকে না। এই সুরের মাধ্যমেই মানুষের সুখদুঃখ, বেদনা 'জগতের বিরাট অব্যক্ত' অসীমের সহিত যুক্ত হইয়াই একটি 'বৃহৎ অপরূপতা' বিস্তারের ঐশ্বর্য অর্জন করে।

[৪] **সেইজন্যে কথায় মানুষ……ব্যাপ্ত হয়ে যায়।** (অনু. ৫)

তৃতীয় ব্যাখ্যার অনুরূপ।

[৫] **প্রকৃতির সঙ্গে……আর-এক মূর্তি।** (অনু. ১)

আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। এখানে লেখক মানুষের সহিত প্রকৃতির কি সম্পর্ক, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রাবণ-সন্ধ্যার অন্ধকারে বৃষ্টিপতনের শব্দ শুনিয়া কবির মনে হইয়াছে যে, মূক প্রকৃতি যেন আজ মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কবি এখানে প্রকৃতির দ্বৈতরূপ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। কবির দৃষ্টিতে প্রকৃতির এক রূপ—যে রূপ অনুভূতিবেদ্য। নিছক সংসারী মানুষের প্রয়োজনের দৃষ্টিতে অথবা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে উহার আর এক রূপ। সংসারী মানুষ অথবা বিজ্ঞানী কবির এই প্রকৃতি-দর্শনকে ভাবালুতা বলিয়া মনে করিতে পারেন, আবার সংসারী মানুষ অথবা বিজ্ঞানীর প্রকৃতির এই রূপদর্শন কবির নিকট দুর্ভাগ্যজনক রসহীনতা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এই দুই রূপকেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার অনুভূতিতে এই দুইটি রূপই সত্য। প্রকৃতিরও একটা নিজস্ব কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে। বিজ্ঞানীরা উহার মধ্যে যে কার্যকারণ ও কর্মের নিয়ম-শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রকৃতি সেখানে কর্মশৃঙ্খলে প্রয়োজনের সূত্রে বাঁধা। সূর্যের উদয়-অস্ত, ঋতুর নিয়মিত আবর্তন, ফুল—তাহা হইতে ফল—তাহা হইতে গাছের বংশবৃদ্ধি প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মিত চলিয়াছে। ইহা প্রকৃতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। আবার মানুষ তাহার প্রয়োজনে প্রকৃতির ঋতু-পর্যায়কে ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে, প্রকৃতির বনসম্পদকে কাজে লাগায়। ইহা মানুষের ব্যবহারিক দৃষ্টি।

কিন্তু মানুষ ভাবদৃষ্টিতে যখন এই প্রকৃতিকে দেখে, তাহার মূল্যও জীবনে কম নয়। বর্ষাঋতুর আকাশে যে মেঘ জমে—তাহার রূপ দেখিয়া মানুষের মন অজানা আনন্দে ভরিয়া যায়। ফসলের কথা তখন তাহার মনে পড়ে না। ফুলের গন্ধে মানুষ যে স্নিগ্ধ সুখানুভব করে, তাহা প্রয়োজনের গণ্ডীতে সীমিত নহে। প্রকৃতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। মানুষের সীমাবদ্ধ প্রয়োজনের জীবনের বাহিরে বিজ্ঞানীর যুক্তি ও বুদ্ধির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মানুষের ভাব-দৃষ্টিতে প্রকৃতি যে রূপ লইয়া ধরা দেয় তাহাকেও অলস ভাবালুতা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

[৬] একই জিনিস বাইরে প্রকৃতির…সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রকাশ।
(অনু. ১১)

রবীন্দ্রনাথের 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে আলোচ্য অংশটি সংকলিত। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক কত অন্তরঙ্গ তাহা বুঝাইবার জন্য লেখক পুষ্পের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

প্রকৃতির সহিত মানবের সম্পর্কে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। বাহিরে তাহার কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতি এক রূপে বিরাজিত, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তাহার আর এক মূর্তি। প্রকৃতির বাহির-বাড়ীতে কাজের কথা ছাড়া অন্য কথা নাই। সেখানে কুঁড়ির যাত্রা পুষ্পের দিকে, পুষ্পের যাত্রা ফলের দিকে, ফলের যাত্রা বীজের দিকে, বীজের যাত্রা গাছের দিকে। মনে হয় যেন কাহারও মুহূর্ত মাত্র বিশ্রাম নাই। এক অবিচ্ছিন্ন কর্মশৃঙ্খলের দ্বারা পুষ্পটি বাঁধা। তাই কবি-প্রাবন্ধিক ফুলকে 'কাজের অবতার' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কিন্তু এই রূপটিই তাহার একমাত্র রূপ নহে। এই ফুলেরই আর একটি রূপ আছে; সেই রূপে প্রকৃতি মানুষকে কাজের তাগিদ দেয় না, মানুষকে কাজ ভুলাইয়া দেয়। এই ভূমিকাতেই ফুল আমাদের নিকট সৌন্দর্য ও শান্তির দূত রূপে দেখা দেয়। তাহার আগমনে অন্তর পরিপূর্ণ প্রশান্তিতে এবং পরিশুদ্ধ আনন্দে ভরিয়া উঠে। প্রকৃতির নিকট এই কারণেই মানুষ চির-ঋণী।

[৭] ঐ ফুলটি কাজের……আসে মুক্ত স্বরূপে। (অনু. ১৩)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

দুইটি সত্তা লইয়াই ফুলের আত্মপ্রকাশ—একটি কাজের আর একটি অ-কাজের, একটি প্রয়োজনের আর একটি অপ্রয়োজনের। প্রকৃতির বিস্তৃত পরিমণ্ডলে সে তাহার কাজ লইয়া নিয়ত রত। কিন্তু মানবের মনোরাজ্যে যখন তাহার প্রবেশ ঘটে তখন সে বুঝিতে দেয় না যে, তাহার কাজ হইতে একবিন্দু ছুটি নাই। সে শুধু সৌন্দর্যের আবেদন লইয়া আমাদের হৃদয়-দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই কবি প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, ফুল তাহার নিজ রাজ্যে প্রতিনিয়ত আপন কর্মবন্ধনে আবদ্ধ ; কিন্তু মানুষের অন্তরে সে বন্দীসত্তায় নয়, আনন্দরূপ মুক্ত সত্তায় প্রবেশ লাভ করে। ফুল যেখানে কুঁড়ি-ফুল-ফল-বীজ-বৃক্ষের ধারাবাহিকতার কর্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ, সেখানে সে বন্দী ; কিন্তু যেখানে সে সৌন্দর্যের আধার, সেখানে সে মুক্ত। বন্ধন-দশা গোপন করিয়াই মুক্ত সত্তা লইয়া ফুল আমাদের হৃদয় দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়।

[৮] সংসারের সোনার……ভজনা করো। (অনু. ঃ৮)

[ব. বি. প্রবেশিকা, ১৯৬২]

উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' নামক প্রবন্ধের অন্তর্গত। শ্রাবণ-সন্ধ্যার অবিরাম ধারাপতনের শব্দে প্রকৃতি কিভাবে মানব-অন্তরের অন্তরঙ্গ হইতে চাহিতেছে কবি এখানে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রকৃতির দুইটি রূপ। একটি রূপে সে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ। সেখানে চলিয়াছে অস্তিত্বের সংগ্রাম। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহাই প্রকৃতির সত্য রূপ। কবিও ইহাকে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাহার মতে ফুল গাছের বংশ বৃদ্ধি করিলেও ইহাই তাহার একমাত্র কাজ নহে। উহার আর একটি কাজ হইল মানুষের মনে আনন্দ সঞ্চার করা। প্রস্ফুটিত ফুলটি যেন পরম সুন্দরের দূতরূপে মানুষের কাছে আসে, তাহার প্রাত্যহিক কাজের তুচ্ছতা হইতে তাহাকে মুক্তি দিয়া অসীম সৌন্দর্যের জগতে তাহাকে আহ্বান জানায়।

প্রসঙ্গত কবি রামায়ণ কাহিনীর সীতার আখ্যানের পটভূমিতে তাঁহার বক্তব্যকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে বন্দিনী সীতাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য নানাভাবে প্রলুব্ধ করিতেছিল। স্বামী রামচন্দ্রের বিরহে এবং রাবণের হীন প্রস্তাবে সীতা যখন বেদনায় ও হতাশায় আচ্ছন্ন, এমন সময় হনুমান রামচন্দ্রের আংটি লইয়া

সীতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আংটি দেখিয়া সীতার মনে আবার আশার সঞ্চার হয়। তিনি উপলব্ধি করিলেন, এই বন্দিনী দশাই তাঁহার জীবনের শেষ দশা নহে। পৃথিবার মানুষের অবস্থাও এই বন্দিনী সীতার মত। প্রাত্যহিক প্রয়োজনের তাগিদে ক্ষুদ্র স্বার্থ, তুচ্ছ লোভ ও মোহের বন্ধনে মানুষ সংসারের বন্দীশালায় আবদ্ধ, জীবনের বৃহত্তর সত্যকে সে বিস্মৃত হইয়াছে। স্বার্থ, লোভ, মোহ তাহাকে যেন রাবণের মত অবিরত প্রলুব্ধ করিয়া চলিয়াছে।

[৯] **প্রকৃতির মধ্যে……বিনা প্রয়োজনের আনন্দ।** (অনু. ২২)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

বাহিরের জগতে প্রকৃতি কেবল প্রয়োজনের বাহন, আর মানুষের অন্তরের জগতেই তাহার পরিপূর্ণতা, আলোচ্য অংশে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এই দ্বৈতরূপ সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন।

বাহিরের জগতে প্রকৃতি কেবল প্রয়োজনের দাসত্বই করিয়া চলে। মৌমাছি যাহাতে তাহার মধু-গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তাহার পরাগ বহন করিয়া লইয়া প্রকৃতির ফুলফোটানোর কাজকে সাহায্য করিতে পারে, সেই-জন্যই ফুলের বর্ণগন্ধের, মধুসঞ্চয়ের সমারোহ ও আয়োজন। মৌমাছির কাছেও ফুলের তথা প্রকৃতির এই প্রয়োজনের দিকটাই একমাত্র সত্য ; ফুলের বর্ণগন্ধের সাহায্যে সে তাহার ক্ষুধানিবৃত্তির মধুভাণ্ডারের সন্ধান পায়, উহাদের আর কোনও সার্থকতা তাহার নিকট নাই। কিন্তু মানুষের অন্তরের জগতে প্রকৃতির প্রয়োজনসাধনের সংকীর্ণতায় সে আবদ্ধ নয়, সে সেখানে অসীম সৌন্দর্য ও আনন্দের দূত। ফুলের যে বর্ণগন্ধ বাহিরের জগতে প্রয়োজনসাধনের উপায়, তাহাই মানুষের অন্তরে অনাবিল সৌন্দর্য, প্রয়োজনাতীত বিশুদ্ধ সৌন্দর্য। এই বর্ণগন্ধের মধ্য দিয়াই প্রকৃতির নিগূঢ় হৃদয়ের প্রেমের বাণী মানুষের অন্তরে আসিয়া উপস্থিত হয়।

[১০] **আমরা যে তাঁরই বিরহে……আরম্ভ-উচ্ছ্বাস।** (অনু. ২৮)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। [ব. বি. প্রবেশিকা, ১৯৬১]

শ্রাবণ-সন্ধ্যায় অবিরাম ধারাপতনে রবীন্দ্রনাথের মনে যে ভাবনা জাগিয়াছে, আলোচ্য-অংশে কবি তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণে সন্ধ্যার আকাশ যখন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে,

তখন কবি অনুভব করিয়াছেন, মানুষের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও যেন এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হইয়া নামিয়াছে, সেখানে কাজের কথার কোনও স্থান নাই; সেখানে কবি-রচিত বিরহ-সংগীতের মেঘমল্লারের স্বরমূর্ছনা যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাধা বর্ষার তিমিরঘন রাত্রিতে বিরহবেদনায় মগ্ন, হরির বিরহে দিনরাত্রি সে কিভাবে অতিবাহিত করিবে, বিদ্যাপতির এই বিরহসংগীত কবির অন্তরকে আলোড়িত করিয়া তোলে। কবি ভাবেন, সেই পরম দেবতার বিরহের জন্যই যে আমরা এমন আকুল হইয়া আছি, তাহা আমাদের একান্তই জানা দরকার। আমাদের আর্তির উৎস যে সেই পরম দেবতার বিরহ, তাহা আমাদের জানিতেই হইবে। কেন না বিরহ মিলনের অঙ্গ, তাহার উপক্রমণিকা, আরম্ভ-উচ্ছ্বাস। রাধা বিরহে অশ্রু দিয়াই হরির সহিত তাঁহার মিলনের অর্ঘ্যটি রচনা করিয়াছেন। আমরাও সংসারে ঈশ্বরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্বাসিত হইয়া আছি, সেই পবিত্র বেদনার মধ্য দিয়াই তো তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি; বেদনার সেতুতেই তাঁহার সহিত আমাদের মিলন রচিত হইবে। বিজ্ঞান মনে করে, ফুলের বর্ণগন্ধ শুধু মৌমাছিকে আকর্ষণ করে তাহার বংশরক্ষার জন্যই, শ্রাবণের বর্ষণের সার্থকতা শুধু প্রত্যেকটি ঘাস এবং গাছের প্রত্যেকটি পাতায় রস যোগানোয়; ইহারা প্রকৃতির নিয়মের কারাগারে বন্দী, একজনের সঙ্গে আর-একজন বাঁধা থাকিয়া দিনরাত্রি কেবল বোবার মত নিঃশব্দে কাজ করিয়া যাইতেছে; কিন্তু তাহাদের সেই কর্মবন্ধন আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি, তাহা এই বিরহেরই গান, মিলনের আহ্বান-সংগীত। তাহারাই তো সেই বিরহ সম্বন্ধে আমাদের গভীরতম অনুভূতিকে সজাগ করিয়া তোলে, তাঁহার সংবাদ আনিয়া দেয়। এই সংবাদকে অর্থের বন্ধনে আবদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, কবি তাহাকেই গানের ছন্দে ও সুরে মুক্তি দেন।

॥ অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ॥

[১১] **এইজন্যে প্রকৃতি যখন···গানকেই জাগিয়ে তোলে।**

উত্তর-সংকেত: শব্দার্থ ও টীকা অংশ দেখ। (অনু. ৪)

[১২] **এই একই জিনিস বাইরে প্রকৃতির…পূর্ণপ্রকাশ** (অনু. ১১)
[বর্ধ. বি. ১৯৭২]

[৯ নং ব্যাখ্যা দেখ]

[১৩] **সেখানে তার কামারশালার আগুনে……বীণাধ্বনি বাজিয়ে তোলে।** (অনু. ২৩)

উত্তর-সংকেত : শব্দার্থ ও টীকা অংশ দেখ।

[১৪] **একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা…অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।** (অনু. ২৪)

উত্তর-সংকেত : দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরের শেষাংশ দেখ।

[১৫] **প্রহরের পর…কাটছে।** (অনু. ২৬)
[ক. বি. প্রাক্., ১৯৬৩]

উত্তর-সংকেত : শব্দার্থ ও টীকা অংশ দেখ।

॥ প্রশ্নোত্তর ॥

১। 'এই উপায়ে চিন্তা অচিন্তনীয়ের দিকে ধাবিত হয়, ভাব অভাবনীয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে।'

—লেখক কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করিয়াছেন? চিন্তা যে উপায়ে অচিন্তনীয়ের দিকে ধাবিত হয়, এবং ভাব অভাবনীয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে তাহা লেখককে অনুসরণ করিয়া বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : এক শ্রাবণ-সন্ধ্যায় অশ্রান্ত ধারা-বর্ষণের সময় রবীন্দ্রনাথের মনে হইয়াছে, এই ধারাপতন-ধ্বনিতে মূক সন্ধ্যাপ্রকৃতির কণ্ঠ যেন হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে; সে যেন স্তব্ধ হইয়া ক্রমাগত নিজের কথা নিজের কানেই শুনিতেছে। আমাদের মনেও যেন তাহার একটা সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছে; আমাদের মনও একটা কিছু বলিবার জন্য যেন উৎসুক। ঐ সন্ধ্যাপ্রকৃতির মতই সে জল স্থল

আকাশ একেবারে ভরাইয়া দিয়াই কি বলিতে চায়, কিন্তু অর্থবদ্ধ ভাষার মাধ্যমে তাহাকে প্রকাশ করিবার উপায় নাই ; সেইজন্য মন তাহার আত্ম-প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে একটা সুরকে অন্বেষণ করিতেছে। জলের কল্লোলে, বনের মর্মরে, বসন্তের উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে বিশাল প্রকৃতির যাহা কিছু মর্মবাণী অভিব্যক্ত হয়, তাহার অবলম্বন কথা নয়, ছবি ও গানের নিগূঢ় ব্যঞ্জনা। কথা এবং গানের এই স্বরূপগত পার্থক্যের আলোচনা প্রসঙ্গেই কবি এই উক্তিটি করিয়াছেন।

কথা জিনিসটা একান্তভাবে মানুষেরই, প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন সাধনে তাহার সার্থকতা। কথা সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট অর্থের গণ্ডিতে এবং প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ। কিন্তু গান অস্পষ্ট, অসীম অব্যক্তের উদ্দেশ্যে তাহার চির-অভিসার যাত্রা। শ্রাবণ-সন্ধ্যার অশ্রান্ত ধারাবর্ষণের মধ্যে প্রকৃতি যখন সুরস্পন্দিত হয়, তখন সুরের সেই আলাপ আমাদের মুখের কথাকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া আমাদের হৃদয়ের ভিতরে অনির্বচনীয়ের ইঙ্গিতে-ভরা গানকেই জাগাইয়া তোলে। কথায় মানুষ কেবল মনুষ্যলোকের সঙ্গে মিলিতে পারে, কিন্তু গানের মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবহৃদয়ের রাখীবন্ধন স্থাপিত হয়। সেইজন্যই কথার সঙ্গে মানুষ সুরকে জুড়িয়া দেয় ; তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়াইয়া গিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্তিলাভ করে। সেই সুরই মানুষের সুখদুঃখকে সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া দেয়, তাহার বেদনাকে প্রভাতসন্ধ্যার দিগন্তের বর্ণ-সমারোহের সহিত মিলাইয়া দেয়, জগতের বিরাট অব্যক্তের সহিত যুক্ত হইয়া তাহা একটি অপরূপতা এবং অপরিমেয়তা লাভ করে।

সেইজন্যই প্রাত্যহিক জীবনের ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনের এই সুরছন্দ ব্যঞ্জনাময় ভাষাকে মিলাইয়া লইবার জন্য মানুষের মন প্রথম হইতেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। প্রকৃতি হইতে রঙ এবং রেখা লইয়াই মানুষ নিজের চিন্তাকে ছবিতে ফুটাইয়া তুলিতেছে ; ছবির সৌন্দর্যে, বর্ণসুষমায় তাহার চিন্তা অসীমতার ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হইতেছে। প্রকৃতি হইতেই সুর এবং ছন্দ লইয়া সে নিজের ভাবকে কাব্য করিয়া তুলিতেছে, তাহার ভাব অনির্বচনীয়, অব্যক্তের দ্যোতনায় ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। এই উপায়েই মানুষের চিন্তা ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত না হইয়া অচিন্তনীয়ের দিকে ধাবিত হয়, ভাব অভাবনীয়ের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করে। এই উপায়েই, প্রকৃতি হইতে লব্ধ রঙ, রেখা, সুর

এবং ছন্দ প্রয়োজনের দৈন্য, ক্ষুদ্রতা ও আড়ষ্টতা এবং নিত্য-ব্যবহারের মালিন্য দূর করিয়া এবং চিরন্তনের সহিত যুক্ত হইয়া মানুষের মনকে সরস, নবীন এবং মহৎ মূর্তিতে উদ্ভাসিত করে।

২। 'প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধটি বড়ো বিচিত্র। বাহিরে তার কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতি একরকমের, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তার আর এক মূর্তি।'

—উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর এবং 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা'য় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চেতনার যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাও উল্লেখ কর

অথবা,

'বাইরে প্রকৃতি যতই ভয়ানক ব্যস্ত, যতই একান্ত কেজো হোক না, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তার একটি বিনা কাজের যাতায়াত আছে।'

—রবীন্দ্রনাথের 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' প্রবন্ধটি হইতে এই উক্তির তাৎপর্য নির্ণয় কর। [বর্ধঃ বিশ্বঃ—১৯৭১]

উত্তর : এক শ্রাবণ-সন্ধ্যার অশ্রান্ত বর্ষণের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি এবং মানুষের হৃদয়গত সম্বন্ধ বিষয়ে যে চিন্তা-ভাবনা করিয়াছেন, আলোচ্য অংশে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। বাহিরে কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতির যে রূপ আমরা দেখি, তাহা প্রয়োজনের গণ্ডিতে একান্তভাবেই সীমাবদ্ধ। গাছের ফুলের দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা প্রকৃতির কর্মের দিকটির পরিচয় লইতে পারি। ফুলকে দেখিতে যতই সুন্দর, মনোরম বলিয়া বোধ হউক, প্রয়োজন-সাধনের জন্যই তাহার উৎপত্তি; প্রকৃতিনির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের জন্যই তাহার এই সাজসজ্জা, বর্ণগন্ধের সমারোহ। বৃক্ষবংশের ধারা পৃথিবীতে বাগাতে অব্যাহত থাকে, সেই জন্য যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে ফল ফলাইতে হয়। সেইজন্য তাহার বর্ণগন্ধের যত আয়োজন। তাহার বর্ণগন্ধে তথা মধুসঞ্চয়ে আকৃষ্ট হইয়া মৌমাছি তাহার নিকট আসিয়া তাহার রেণু লইয়া প্রকৃতির সেই প্রয়োজন সাধনে সাহায্য করিয়া থাকে; সেই প্রয়োজন মিটিয়া গেলেই ফুল শুকাইয়া ঝরিয়া যায়। প্রকৃতির বাহিরের প্রাঙ্গণটিতে এই কাজের নির্মম তাগিদ

সকলকেই এইভাবে ব্যস্ত থাকিতে হয়। সেখানে কুঁড়ি হইতে ফুল ফুল হইতে ফল, ফল হইতে বীজ, বীজ হইতে বৃক্ষ—এই নিরবচ্ছিন্ন পরিণতির কর্মশৃংখলে প্রত্যেকে বাঁধা। বর্ণে-গন্ধে যে ফুলটিকে অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং সুকুমার বলিয়া বোধ হয়, তাহাকেও রৌদ্রে-জলে প্রকৃতি নির্দিষ্ট কর্মের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতি মুহূর্ত পরিশ্রম করিয়া যাইতে হয়, তাহার বিশ্রামের কোনও অবকাশ থাকে না। প্রকৃতির কর্মশালায় তাহাকে প্রতি মুহূর্তেই কাজের হিসাব না দিলে চলে না।

আবার এই ফুলই কাজের সকল ব্যস্ততা দূর করিয়াই মানুষের হৃদয়ে উপস্থিত হয়। মানুষের হৃদয়ে ফুল যখন প্রবেশ করে তখন তাহার অখণ্ড অবকাশ প্রয়োজনাতীত বৃহত্তর সার্থকতায়। শান্তি ও সৌন্দর্যে পূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে তাহার সৌন্দর্য-মাধুর্যের সম্পর্ক ; তাহার সহিত প্রকৃতির কর্মজগতের কোন যোগ নাই। মানুষের অন্তরে ফুল মুক্তি, আনন্দ ও সৌন্দর্যজগতের রাজদূত। প্রকৃতির কর্মের জগতে মৌমাছি ফুলের বর্ণ-গন্ধকে কেবল তাহার ক্ষুধানিবৃত্তির পথের 'উপায়চিহ্ন' রূপেই জানে, কিন্তু মানুষের মনে তাহাই সৌন্দর্য-বোধ জাগায়, বিনা প্রয়োজনের আনন্দ জাগায়। এই বর্ণগন্ধই মানুষের নিকট প্রকৃতির প্রেমের বাণীটিকে বহন করিয়া আনে।

প্রকৃতির এই দ্বৈতরূপ বড়ো বিচিত্র। একই সময়ে তাহার এই দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির : এক দিকে ঐ ফুল কাজের পরিচয়পত্র লইয়া প্রকৃতির কর্মশালায় প্রবেশ করে, বৃক্ষের বংশরক্ষার জন্য ফল ফলাইবার কর্মবন্ধনে সে বন্দী ; অন্যদিকে সেই ফুলই মানুষের অন্তরে সৌন্দর্যের পরিচয়-পত্র লইয়া, সকল প্রয়োজনের বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত স্বরূপে উপস্থিত হয়। প্রকৃতির একই রূপ-রস-গন্ধের মধ্যে দুইটি সুরই পাই : একটি প্রয়োজনের, অপরটি আনন্দের। এই ফুলের দৃষ্টান্তটিকে অনুসরণ করিয়াই আমরা দেখি, বাহিরের দিকে তাহার কর্মব্যস্ততা। কুঁড়ি হইতে গাছ পর্যন্ত এই কর্মচাঞ্চল্যের কোথায়ও এতটুকু অবসর নাই, কিন্তু মানুষের অন্তরে কর্মচাঞ্চল্যের কোনও স্থান নাই, ফুল তখন অচঞ্চল শান্তির পূর্ণ প্রকাশ। এই সময়ে প্রকৃতির একদিকে তাহার কর্ম, সেখানে প্রতিমুহূর্তেই তাহাকে কর্মের হিসাব দিতে হয়, অন্যদিকে মানুষের অন্তরে সকল কর্মবন্ধন হইতে তাহার মুক্তি, পরিপূর্ণ অবকাশ ; বাহিরের দিকে প্রকৃতির তটভূমি তাহার কর্মক্ষেত্র, অন্তরের দিকটিতে তাহার সমুদ্র ; সেইখানে

সে সকল প্রয়োজনের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন, নিজের সৌন্দর্যের তরঙ্গলীলায় মনোরম, সঙ্গীতের সুরলহরীতে মানুষের হৃদয়ের অতুলনীয় সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতিরসিক কবি। প্রকৃতির সহিত তাঁহার নিবিড় আত্মিক-সম্পর্ক তাঁহার বিভিন্ন রচনায় রূপায়িত হইয়াছে। 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা'য়ও প্রকৃতির সহিত মানবহৃদয়ের সৌন্দর্য-মাধুর্যের সেই সম্বন্ধটি তিনি সুন্দরভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। বর্ষণমুখরিত শ্রাবণ-সন্ধ্যার যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা কবির হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতিতে অভিষিক্ত। প্রকৃতির এই জীবন্ত পটভূমিতেই প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্ক, প্রকৃতির দ্বৈতরূপ বিষয়ে তিনি তাঁহার ভাবনাকে রূপায়িত করিয়াছেন। এই ভাবনার পরই আসিয়াছে কবির অন্তরের গভীর উপলব্ধি: তিনি আকাশভরা শ্রাবণের ধারাবর্ষণকে নিজের অবারিত অন্তরের মধ্যে আহ্বান করিয়া লইয়াছেন; তাঁহার অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হইয়া নামিয়াছে। এই শ্রাবণ-সন্ধ্যার প্রকৃতি তাঁহার অন্তরে পরমদেবতার মহৎ বিরহসংগীত অনুরণিত করিয়া তুলিয়াছে। শ্রাবণ-আকাশের মত কবি-হৃদয়ের আকাশও যেন ঝর্ ঝর্ বর্ষণের ক্রন্দনে বলিতেছে, হরি বিনা দিনরাত্রি কেমন করিয়া কাটিবে! এই অন্ধকারের, এই শ্রাবণের কথা হইতেই, একটি পুষ্পবিকশিত বনের সজল গন্ধের মতই, সেই বেদনার মধ্য হইতেই পরমেশ্বরের অনুভূতির অশ্রুসিক্ত আনন্দ উৎসারিত হইয়াছে। কবির ভাবনা এইভাবে প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া পরম গভীরতায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

৩। 'তখনি আমরা বুঝতে পারি, এই সোনার লঙ্কাপুরীই আমার সব নয়—বাইরে আমার মুক্তি আছে, সেইখানে আমার প্রেমের সাফল্য, আমার জীবনের চরিতার্থতা।'

—উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

উত্তর: প্রকৃতির দুইটি রূপ আছে, একটি তাহার বাহিরের কর্মের রূপ আর একটি তাহার ভিতরের রূপ, সেখানে মানুষের সহিত তাহার সৌন্দর্য-মাধুর্যের নিত্যসম্বন্ধ। গাছের ফুলের দৃষ্টান্তে আমরা প্রকৃতির এই দ্বৈতরূপের একটি সার্থক পরিচিতি লাভ করি। ফুলকে প্রকৃতির নির্দিষ্ট কর্মপালনে, বৃক্ষের বংশরক্ষার প্রয়োজনে প্রতিটি ঋতুতে যথাসময়ে উপস্থিত হইতে হয়; এই

প্রয়োজন সাধনের জন্যই তাহার যত বর্ণগন্ধের আয়োজন। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে সে রাজদূতের মতই বৃহত্তর জীবনের বার্তা লইয়া উপস্থিত হয়।

সীতার আখ্যানের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সহিত মানবহৃদয়ের এই নিগূঢ় সম্বন্ধটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সীতা যখন রাবণের লঙ্কাপুরীতে রাবণ কর্তৃক নির্যাতিত হইয়া অশোককাননে বন্দিনী ছিলেন, তখন হনুমান রামচন্দ্রের দূতরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। তিনি সীতার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য রামচন্দ্রের আংটি নিজের সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। এই আংটি দেখিয়াই সীতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই দূতই তাঁহার প্রিয়তমের নিকট হইতে আগমন করিয়াছে, রামচন্দ্র তাঁহাকে বিস্মৃত হন নাই, তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইবেন বলিয়াই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।

আমরাও সীতার মত সোনার লঙ্কাপুরীরূপ সংসারের সুখভোগের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছি; স্থূল ইন্দ্রিয়রূপ রাক্ষস আমাদের কেবলই তাহাকে ভজনা করিবার জন্য প্ররোচিত করিতেছে। কিন্তু রামচন্দ্রের প্রেরিত দূত হনুমানের মতই সংসার-সাগর পারের খবর লইয়া, আমাদের প্রিয়তম অর্থাৎ ঈশ্বরের দূত হইয়া ফুল আমাদের হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। সে আমাদের নিকট ঈশ্বরের এই বাণীকেই জানায়: সে সেই সুন্দর এবং আনন্দময়ের দূত, তাঁহার সংবাদ লইয়াই সে আসিয়াছে। লঙ্কাদ্বীপের মতই যে সংসারদ্বীপে আমরা অবস্থান করিতেছি, তাহার সহিত ঈশ্বরের বিচ্ছেদের অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্রের ব্যবধান। কিন্তু ফুলের বার্তায় আমরা বুঝিতে পারি আমাদের এই বিচ্ছিন্নতার দ্বীপ-জীবনের সহিত তাঁহার মিলনের সেতু বাঁধা হইয়া গিয়াছে, তিনি আমাদের এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই, তিনি আমাদের উদ্ধার করিবেন; সংসারের মোহ আমাদের এমন করিয়া চিরদিন বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। ফুলের সৌন্দর্য তথা বর্ণগন্ধ তাঁহার প্রেমের আশ্বাসের অভিজ্ঞান।

আমরা উপলব্ধি করতে পারি, ফুলের বর্ণগন্ধ, রূপরস তো আমাদের পরমদেবতারই মিলনের আংটি। আমরা তখন আমাদের আশপাশের সমস্ত কিছুকে ভুলিয়া যাই, সেই আনন্দময়ের অভিজ্ঞান আমাদের হৃদয়মনকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। আমরা সেই ব্যাকুলতায় উপলব্ধি করি, এই সোনার লঙ্কাপুরী, এই সংসার এবং তাহার সুখভোগের সকল আয়োজনই আমাদের সব কিছু নয়। ইহার বাহিরেও, ঈশ্বরের প্রেমে-প্রীতিতে তাঁহার দান সৌন্দর্যে-মাধুর্যে

মানুষের মুক্তি আছে; সেইখানেই তাহার প্রেমের সাফল্য, তাহার জীবনের চরিতার্থতা। প্রকৃতি এইভাবে ঈশ্বরের দূতরূপে আমাদের নিকট বৃহত্তর জীবনের গভীরতম ঐশ্বর্য বহন করিয়া আনে।

৪। 'একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা—বন্ধনের এবং মুক্তির; একই রূপ-রস-শব্দ গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং আনন্দের; বাইরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি; একই সময়ে একদিকে তার কর্ম, আর একদিকে তার ছুটি, বাইরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।'

—এই উক্তিটির মধ্যে প্রকৃতির যে রূপ-বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

উত্তর: দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেখ।

৫। 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' প্রবন্ধটির রচনা-সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

উত্তর: শ্রাবণ-সন্ধ্যা রবীন্দ্রনাথের আত্মমুখী (Subjective) ভাবনার পরিচায়ক—ভাবপ্রধান রচনা। একটি বর্ষণমুখর শ্রাবণ-সন্ধ্যায় কবির মনে যে ভাবনা ও ভাব জাগিয়াছে, তাহা অতুলনীয় চিত্র-সৌন্দর্যে, সার্থক বর্ণাঢ্য উপমায়, ধ্যান-নিবিড়তায় এবং উপলব্ধির ঐকান্তিকতায় আলোচ্য প্রবন্ধটিতে গীতি-কবিতার ছন্দ ও লাবণ্য লাভ করিয়াছে। মানুষের ভাষা আর প্রকৃতির ভাষা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের যোগ, ভগবান প্রকৃতি-দূতের মাধ্যমে তাঁহার সৌন্দর্য ও আনন্দের ঐশ্বর্যের সংবাদ কেমন করিয়া মানবের নিকট পাঠাইতেছেন, আর প্রকৃতি শ্রাবণ-সন্ধ্যার বর্ষণধ্বনির ভিতর দিয়া পরমদেবতার সহিত মানবের অনাদি বিরহের বাণী কিভাবে বহন করিয়া আনিয়াছে—শ্রাবণ-সন্ধ্যার পটভূমিতে এই সকল বিষয়ে কবির মনের ভাবনাগুলি এখানে প্রকাশিত হইয়াছে। গীতিকবিতার মত নিগূঢ় স্বচ্ছন্দচারী ভাব-প্রেরণার নিগূঢ় যোগসূত্রে এই ভাবনাগুলি সমন্বিত হইয়াছে।

কবি প্রথমেই শ্রাবণ-সন্ধ্যার একটি সুন্দর-রেখাচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন: 'আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে জগতে আর-যত-কিছু কথা আছে সমস্তকেই

ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে ; মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়—এবং যে কখনো একটি কথা কইতে জানে না সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে।' কবির ভাবচারণায় বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি নিবিড়ভাবে সম্মিলিত হইয়াছে: 'আজ বোবা সন্ধ্যা-প্রকৃতির এই যে হঠাৎ কণ্ঠ খুলে গিয়েছে এবং আশ্চর্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে সে যেন ক্রমাগত নিজের কানেই শুনছে, আমাদের মনেও এর একটা সাড়া জেগে উঠেছে, সেও কিছু একটা বলতে চাচ্ছে।·ঐরকম খুব বড়ো করেই বলতে চায়—কিন্তু সে তো কথা দিয়ে হবার জো নেই, তাই সে একটা সুরকে খুঁজছে। জলের কল্লোলে, বনের মর্মরে, বসন্তের উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে, বিশাল প্রকৃতির যা-কিছু কথা সে তো স্পষ্ট কথায় নয়—সে কেবল আভাসে ইঙ্গিতে, কেবল ছবিতে গানে।' উপলব্ধির গভীরতায় এবং অনুপম প্রকাশকলার লাবণ্যে এই অংশটি আমাদের নিকট গভীরভাবে আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

'প্রকৃতির দরজায় যে ফুলকে যথা-ঋতুতে যথাসময়ে মজুরের মতো হাজরি দিতে হয়, আমাদের হৃদয়ের দ্বারে সে রাজদূতের মতো উপস্থিত হয়ে থাকে'—এই সংক্ষিপ্ত অর্থগূঢ় ভাষণেই প্রকৃতির কর্মজগতের রূপ, আর মানুষের অন্তরে তাহার বৃহত্তর জীবনের আনন্দ ও সৌন্দর্যের বার্তাবহনকারী রূপ—এই দ্বৈতরূপ সার্থক-ভাবে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। স্বর্ণলঙ্কাপুরীতে বন্দিনী সীতার এবং রামচন্দ্রের দূতের চিত্রকল্পে সাংসারিক জীবনের ক্ষুদ্রতার দ্বীপবাসী মানুষের বিড়ম্বনা এবং ফুলের বর্ণগন্ধের মাধ্যমে ঈশ্বরের মিলনের বাণী প্রেরণে আমাদের অন্তর্জীবনের সত্য উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির সকল প্রয়োজনের কর্মই মানুষের অন্তরে সুন্দর ও মধুর হইয়া উঠে, প্রকৃতি ও মানুষের এই হৃদয়সম্বন্ধকে কবি ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ বাচনভঙ্গিতে সুরময় ও সৌন্দর্যময় করিয়া তুলিয়াছেন: 'সেখানে তার কামারশালার আগুন আমাদের উৎসবের দীপমালা হয়ে দেখা দেয়, তার কারখানা-ঘরের কলশব্দ সংগীত হয়ে ধ্বনিত হয়। প্রকৃতির কার্যকারণের লোহার শৃঙ্খল ঝম্‌ঝম্ করে, অন্তরে তার আনন্দের অহেতুকতা সোনার তারে বীণাধ্বনি বাজিয়ে তোলে।'

প্রবন্ধটির উপসংহারে কবি শ্রাবণ-প্রকৃতি যে কি ভাবে অন্তরতমের বিরহ-বেদনা এবং সেই বেদনার অর্ঘ্য মানুষের নিকট বহন করিয়া আনে, সেই উপলব্ধিকে গীতিকবিতার ভাবগভীরতায় এবং সুরমূর্ছনায় এইভাবে ঐশ্বর্যময় করিয়া তুলিয়াছেন: 'তবু এ অন্ধকারের, এই শ্রাবণের বুকের মধ্যে

একটি নিবিড় রস অত্যন্ত গোপনে ভরা রয়েছে; একটি কোন্ বিকশিত বনের সজল গন্ধ আসছে, এমন একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য যা এখনি প্রাণকে ব্যথায় কাঁদিয়ে তুলছে, তখনি সেই ব্যথা ভিতর থেকে অশ্রুসিক্ত আনন্দকে টেনে বের করে নিয়ে আসছে।'

৬। 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' প্রবন্ধটির প্রথম অংশে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির বাহির ও ভিতরের রূপ এবং দ্বিতীয় অংশে বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; এই দুইটির মধ্যে যোগসূত্র কোথায় তাহা আলোচনা করিয়া দেখাও।

উত্তর: দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেখ।

৭। 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' প্রবন্ধে লেখকের যে চিন্তাধারা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর। [ক. বি. প্রাক্ ১৯৬২]

অথবা, 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা'য় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধটি রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় প্রকাশ কর। [ক. বি. প্রবেশিকা, ১৯৬১]

অথবা, 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা'য় রবীন্দ্রনাথ যে অনুভূতির কথা বলিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় প্রকাশ কর। [ক. বি. মধ্যমিক (বিকল্প), ১৯৬০]

অথবা, 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার মর্ম সংক্ষেপে লিখ। [ক. বি. প্রাক্, ১৯৬৪]

অথবা, 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত ভাব-বস্তু নিজ ভাষায় বিশদ কর। [বর্ধ. বিশ্ব. ১৯৬৮]

উত্তর: ৫নং প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে লিখ।

শিক্ষার মিলন

॥ সার-সংক্ষেপ ॥

বিরাট বস্তুবিশ্ব নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়মের জ্ঞানেই পাশ্চাত্য দেশ চতুর্দিকে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে বিশ্বের নিয়মের সঙ্গতি আছে; এই নিয়মের অধিকার মানুষের নিজের মধ্যে নিহিত—ইহা মানিয়াই মানুষ আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। য়ুরোপ যখন বিজ্ঞানের আলোচনায় নিয়মের এই ভিত্তিটি উপলব্ধি করিয়াছে, তখন হইতেই তাহার রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা তাহা বুঝি নাই বলিয়াই পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। অবশ্য য়ুরোপ নিয়মের চর্চায় যে বিপুল ঐশ্বর্য সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে মানুষের যথার্থ তৃপ্তি ঘটিতে পারে না। বিশ্বের বাহিরের দিকে যান্ত্রিক সভ্যতার এই জ্ঞানচর্চা সত্য এবং উপযোগী, কিন্তু তাহা যদি মানুষের অন্তরকেও গ্রাস করে, তবে সর্বনাশ দেখা দেয়। য়ুরোপের ক্রমবর্ধমান অতৃপ্ত ঐশ্বর্যলোভে, সাম্রাজ্যবাদের শোষণে, আসন্ন সামাজিক বিদ্রোহে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের মত রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধে তাহার সংকীর্ণ জাতীয়তার মধ্যে মানবজাতির সঙ্কটকেই আমরা লক্ষ্য করি।

ভারতবর্ষের ঋষিদের বাণীতেই জীবনের প্রকৃত চরিতার্থতার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহারা ঐক্যানুভূতিকেই জীবনের পরম আদর্শরূপে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। বস্তু-জগৎ হইতে আত্মাকে মুক্ত করা আত্মিক সাধনার একটি প্রাথমিক পর্যায়। বস্তুবিশ্বের নিয়মে, বিজ্ঞানের অনুশীলনে ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাধি হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার যে চেষ্টা পাশ্চাত্য দেশে দেখা যায় তাহা মানুষের মুক্তিসাধনার একটা দিক। আর প্রাচ্যদেশ অমৃত লাভের যে সাধনা করিয়াছে তাহা মুক্তিসাধনার অপর দিক। সুতরাং পূর্ব ও পশ্চিমের মানস যদি মিলিত না হয় তবে উভয়েরই জীবন ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

স্বাজাত্যের অহমিকাপূর্ণ ভেদবুদ্ধি হইতে মুক্তিদান করাই এ যুগের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত; সেই লক্ষ্যের সাধনায়ই আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রকে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের পুণ্যতীর্থ করিয়া তুলিতে হইবে। আর্যসভ্যতায় যজ্ঞে

যেমন, তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্য অস্বীকারেও পাশ্চাত্যদেশের সেই ভেদ-বুদ্ধিই প্রকাশিত। আমাদের সেই মোহ দূর করিতে হইবে এবং সত্যের নির্মলতায় যে মানুষের আত্মার যথার্থ প্রকাশ, তাহা শিক্ষার মধ্যে প্রচারিত এবং কর্মের মধ্যে প্রতিফলিত করিতে হইবে।

॥ বক্তব্য-সংকেত ॥

[১] প্রাচ্য অপ্রাকৃত শক্তির মহিমারূপেই এই বিশ্বকে দেখিয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্য এই বিশ্বকে জানিয়াছে এক নিয়মের রাজত্ব রূপে।

[২] আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পিছনে আছে আলস্য, জড়তা ও মূঢ়তা। আমরা পশ্চিমের ঐ বিশ্ববিজয়ী বিদ্যাকে শিক্ষা করিয়াই আমাদের দুর্বলতা ঢাকিতে আগ্রহী।

[৩] বস্তুবিশ্ব যে নিয়মে চলে আমাদের বুদ্ধিও চলে সেই নিয়মে। তাই বস্তুবিশ্বের নিয়মকে অধিগত করা দুরূহ নহে বুদ্ধির ভীরুতাই হইতেছে শক্তিহীনতার প্রধান কারণ।

[৪] বিজ্ঞানের বলে পশ্চিম ভীরুতা কাটাইয়াছে বলিয়া পশ্চিমে জাগিয়াছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মহিমা, আর আমরা বলিয়াছি 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'।

[৫] য়ুরোপের যান্ত্রিক সভ্যতা জ্ঞানচর্চার উপযোগী কিন্তু তাহা অন্তরকে গ্রাস করলে সমূহ ক্ষতি।

[৬] প্রাচ্যদেশ বস্তুজগৎ হইতে আত্মাকে মুক্ত করিয়া অমৃত লাভের সাধনায় রত।

[৭] প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানসের যদি মিলন না হয় তবে সমূহ ক্ষতি। তাঁহার মতে অহমিকাপূর্ণ ভেদবুদ্ধি হইতে মনকে মুক্তিদান করাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

॥ রচনা-পরিচিতি ও রসগ্রাহী সমালোচনা ॥

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আজীবন চিন্তিত ছিলেন। শিক্ষাই মনুষ্যত্ব বিকাশের, মানবজীবনের পূর্ণতা অর্জনের এবং জাতীয় জীবনের শক্তি-প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছে। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটিতে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার সেই

উৎকণ্ঠাই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃত শিক্ষাদর্শ প্রচলিত করিবার জন্যই তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রবন্ধটির পটভূমি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন য়ুরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার অভিমত জানিবার জন্য দেশবাসী উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। গান্ধীজী পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান বর্জনের উপদেশ দিয়াছিলেন। "১৫ আগস্ট (১৯২১) য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত কবি-সংবর্ধনা সভায় তিনি 'শিক্ষার মিলন' ভাষণ পাঠ করিলেন।...রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও সকলেই বুঝিলেন যে, গান্ধীজী যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিন্দা করিতেছেন তাহা আধুনিক ভারতের পক্ষে আদৌ সদুপদেশ নহে। দৈব ও জাদুমন্ত্রে মুক্ত হয় না; স্বরাজের প্রতিষ্ঠা বাহিরে নয়, যে আত্মবুদ্ধির প্রতি আস্থা আত্মশক্তির প্রধান অবলম্বন সেই আস্থার উপরে; রবীন্দ্রনাথ চিরদিন এই আত্মবুদ্ধি ও আত্মশক্তির উদ্‌বোধনের জন্য বলিয়া আসিয়াছেন, আজও তিনি সেই কথা বলিলেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যদেশের ন্যাশনালিজমের বীভৎস রূপের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল মনীষীরা আত্মসর্বস্ব দেশপ্রেমকে দুর্বুদ্ধিরই নামান্তর মনে করিতেছেন। দেশের সর্বজনীন এই আত্মম্ভরিতা নূতন রূপ লইয়া য়ুরোপে কী মহা অশান্তি আনিয়াছে তাহা তো তিনি স্বয়ং দেখিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং পৃথিবীতে নূতন ভাবের আদর্শ প্রচারের জন্য নূতন শিক্ষার প্রয়োজন। য়ুরোপের ন্যাশনালিজমের আবর্জনা পাছে এদেশে আসিয়া ভারতবর্ষের মৈত্রীর সাধনাকে ম্লান করিয়া ফেলে তজ্জন্যই রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে সাবধান করিয়া দিলেন। ভারতের সাধকের মন্ত্র ভেদবুদ্ধি দূর করিবার মন্ত্র সুতরাং ভারতবর্ষে ন্যাশনালিজমের ও অসহযোগের যে যুগ্ম রূপ দেখা দিয়াছে, তাহা ভারতীয় সাধকদের সাধনালব্ধ ঐশ্বর্য নহে। এইজন্যই কবির মতে ভাবী ভারতে শিক্ষার অসহযোগ নহে, শিক্ষার মিলন ঘটাইতে হইবে।" (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় —রবীন্দ্রজীবনী)

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটির সমগ্র অংশেই রবীন্দ্রনাথের নির্মোহ উদার ও মানবিক প্রজ্ঞাদৃষ্টির স্বচ্ছ আলোক বিচ্ছুরিত। যে বিজ্ঞানবুদ্ধির চর্চায় পাশ্চাত্য দেশ বাহিরের জগতের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে, তিনি তাহার

উপযোগিতা যথাযথ ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন; আমাদের দেশ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া বুদ্ধির ভীরুতাপ্রসূত দৈবের উপর নির্ভরশীলতায় পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, তাহা উল্লেখ করিতেও তিনি ভোলেন নাই। তেমনি আত্মাকে, তাহার মিলনের ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া য়ুরোপ তাহার শক্তিকে যে ভাবে ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থচেতনার বাহন করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি আশ্বস্ত হইতে পারেন নাই। বিজ্ঞানবুদ্ধির অভাবে প্রাচ্য দৈন্যগ্রস্ত ও নিষ্প্রাণ; অন্তরাত্মার মৈত্রীবুদ্ধির অভাবে, ভেদবুদ্ধির বিষবাষ্পে প্রতীচ্য ক্ষুব্ধ, পীড়িত।

সভ্যতার ভবিষ্যৎ প্রতীচ্যের বিজ্ঞানবোধ এবং প্রাচ্যের আত্মার মৈত্রী ভাবনার সমন্বয়ের উপরই নির্ভরশীল। সেইজন্য আমাদের দেশের বিদ্যালয়কে পূর্ব পশ্চিমের মিলনের ক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইবে; আমাদের বোঝা দরকার যে, সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের কোনও বাধা নাই। গভীর মননশীলতা ও আবেগের সমন্বয়ে, প্রকাশভঙ্গির চারুতায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার এই সার্বভৌম মহৎ আদর্শ আমাদের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন। শিক্ষার খুঁটিনাটি পরিকল্পনাগত সমস্যা তাঁহার আলোচ্য নয়। তিনি সভ্যতার মূল্যবোধের আলোকে ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচিন্তার পটভূমিকায়, শিক্ষার মৌলিক নীতিই নির্দেশ করিয়াছেন।

বুদ্ধি-দীপ্ত ভাষার মাধ্যমে দৃষ্টির গভীরতা এবং বিস্তার প্রবন্ধটিকে সার্থক ও রসোত্তীর্ণ করিয়াছে।

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

অনু. ১-৬ঃ সেই দিকে সে মস্ত একটা কল—যন্ত্র যেমন বাঁধা নিয়মে চলে, বস্তুবিশ্বও চলে তেমনি বাঁধা নিয়মে; তাই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁহার 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধে সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—'এ পৃথিবী নিয়মের রাজত্ব, উঠিতেও নিয়ম, বসিতেও নিয়ম।' **বস্তুবিশ্বের দুর্গম... হাতে**—বস্তুবিশ্বের যে পথে আমাদের চলিতে হয় সে পথ বড় দুর্গম। এই বস্তুবিশ্বে চলার পথ নিয়মের যন্ত্রে বাঁধা। যে এই নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া চলিতে চায়, সে নিজেকেই ফাঁকি দেয়। আর যে এই পথে নিয়মনিষ্ঠ হইয়া চলিবার

বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে সে কেবল বস্তুর বাধা অতিক্রম করে নাই, উপরন্তু বস্তুই তাহার সহায়ক হইয়াছে। **বিশ্বভোজ**—আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে যে বিরাট বস্তুবিশ্ব পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার বস্তুসম্পদ নিঃসন্দেহে মানুষের ভোগের জন্য সমাহৃত, কিন্তু সকলের ভাগ্যে এই ভোগ সমান ভাবে জোটে না। প্রকৃতপক্ষে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। **বিদ্যা যে সত্য**—বিদ্যার দ্বারা জগতের চিরন্তন সত্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ করা যায়। যাহা সত্য তাহার বিনাশ নাই। আজ পশ্চিমের লোক যে বিদ্যাকে আয়ত্ত করিয়া বিশ্বজয় করিতেছে তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই সত্য আছে। এই সত্যকে অস্বীকার করার মধ্যে কোন যুক্তি নাই। ইহাকে অস্বীকার করার অর্থ সত্য-জ্ঞান হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখা। পশ্চিমের লোক সাধনার বলে বিদ্যা অর্জন করিয়া নানা অজ্ঞাত বস্তুকে জানিতেছে, ফলস্বরূপ তাহারা নিজেরা উপকৃত হইতেছে, বিশ্বও উপকৃত হইতেছে। এইখানেই বিদ্যা শাশ্বত মূল্যের অধিকারী; ইহাই বিদ্যার সত্যরূপ। **এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়**—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে নিয়ম প্রতিনিয়ত নিজেকে প্রকাশ করে তাহা ত্রুটিহীন—এই যুক্তি বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের বলেই পশ্চিমের লোক বিশ্বের বহু ব্যাপারে জয়লাভ করিতেছে। যে সত্য যুক্তিনির্ভর, সেই সত্যকে উপলব্ধি করিলে নিজের জীবনের উপর কর্তৃত্বের অধিকার পাওয়া যায়।

আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি…সামঞ্জস্য আছে—বিশ্বে প্রতিনিয়ত চলিতেছে যে শক্তির লীলা, আমরা বুদ্ধি দ্বারা তাহা উপলব্ধি করিব—ইহাই সত্যদৃষ্টি। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি নানা অবাঞ্ছনীয় প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। তাই প্রজ্ঞার সাহায্যে বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সত্যের পথে চালিত করা প্রয়োজন। বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত ও মোহমুক্ত হইলে তাহার আলোকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নিখুঁত নিয়মে পরিচালিত সেই শক্তিকে, যাহার লীলা বিশ্বের অণুতে পরমাণুতে। ব্রহ্মাণ্ডের চলার নিয়মের সহিত আমাদের বুদ্ধির নিয়মের মধ্যে আছে অদ্ভুত স্বাজাত্য, আছে অপূর্ব সামঞ্জস্য। বলা বাহুল্য, উভয় নিয়মই সমজাতীয়।

পুলিশের দারোগা থেকে ম্যালেরিয়ার মশা পর্যন্ত—রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি ইংরেজ সাম্রাজ্যশাসনকালে রচিত। সেই যুগে সাধারণ মানুষ দারোগার অত্যাচার বা ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশার উপদ্রবকে দৈববিধান রূপেই

মানিয়া লইত। বুদ্ধির ভীরুতাই…আড্ডা—বিশ্বনিয়মের নিয়ন্ত্রিত শক্তি যে বিশ্বশক্তি, তাহাকে বুদ্ধিদ্বারাই উপলব্ধি করিতে হয়। মানুষের আত্মশক্তির বোধ জন্মে তখনই যখন সে এই সত্য উপলব্ধি করে যে,বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বনিয়মেরও সামঞ্জস্য আছে, অতএব নিয়মের উপর অধিকার মানুষের মধ্যেও নিহিত আছে। নিজের বুদ্ধির উপর আস্থা না থাকিলে জীবনে স্বাবলম্বী হওয়া যায় না—কোনও নূতন কিছু জানিবার বা বুঝিবার ইচ্ছাও জাগ্রত হয় না। তখন কেবল একজন বাহিরের কর্তার উপরই নির্ভরতা আসে। আত্মবিশ্বাসী লোক চুরি-ডাকাতি হইলে নিজের স্বাধীন বুদ্ধি তথা শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহা হইতে নিস্তার লাভের চেষ্টা করে, দারোগা-পুলিশের উপরই কেবল নির্ভর করে না, কিন্তু আত্মবিশ্বাস-হীন ভীরু বিপদে দারোগা পুলিশের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে এবং প্রবঞ্চিত হয়। ম্যালেরিয়ার মশা রোগজীবাণু ছড়ায়। দৈবের বিধান বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে মশার হাত এড়াইবার উপায় নাই, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যায়। আত্মশক্তির অভাব এবং বুদ্ধির দৈন্যই মানুষকে দুর্বল করিয়া রাখে।

পোলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্য—মধ্যযুগে ধর্ম বা রাজতন্ত্রের অনুশাসনকে দৈববিধান রূপেই নির্বিচারে মানিয়া চলিতে হইত। আধুনিক যুগে রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়ের খেয়ালখুশির বিধান নয়, তাহার সহিত প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। এই চেতনা দেখা দিবার পর হইতে পাশ্চাত্য দেশে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হয়, স্বেচ্ছাচারী রাজা বা ধর্মযাজকগোষ্ঠী কর্তৃক যথেচ্ছভাবে আরোপিত নিয়মপাশ হইতে মানুষ মুক্তিলাভ করে। দৈব—অদৃষ্ট, পূর্বজন্মকৃত কর্ম। এরা একটা কর্তা…বেঁচে যায়—যাহারা আত্মশক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহারাই দৈবের উপর নির্ভরশীল হয় এবং কোন একজন কর্তার উপর সমস্ত দায়-দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া নিজেরা বাঁচিতে চায়। ঘরে আগুন লাগা ইহাদের কাছে দৈবের নির্বন্ধ, কিন্তু পানীয় জলের অভাব ঘটিলে ইহারা কর্তার উপর নির্ভরশীল হয়। স্বভাবতই কর্তাও অনেক জুটিয়া যায় কিন্তু এই হতভাগ্যদের অভাব মোচন হয় না। চিন্তা ও কর্মের দৈন্য এবং আলস্য হইতেই এই জাতীয় মূঢ়তা জন্মিয়া থাকে।

অনু ৭-১০ : উপনিষৎ—ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল, যে বিদ্যার তাত্তিক অনুশীলনে অবিদ্যাদি সংসারবন্ধন নিঃশেষে বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। বেদের

শেষভাগে এই ব্রহ্মজ্ঞান আছে বলিয়া ইহাকে উপনিষৎ বলা হয়। উপনিষৎ ভারতবর্ষের দর্শন ও ধর্মমত চর্চার প্রাণকেন্দ্র। যাথাতথ্যতোঽর্থান্...সমাভ্যঃ —ইহা ঈশোপনিষদের অষ্টম শ্লোক। সম্পূর্ণ শ্লোকটির বাংলা অর্থ হইল : তিনি (আত্মা) সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়। তিনি অশরীরী, অক্ষত, শিরাহীন, নির্মল, অপাপবিদ্ধ, সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম ও স্বয়ম্ভু। নিত্যকালস্থায়ী সংবৎসরাখ্য প্রজাপতিদিগের জন্য তিনি যথাযথ কর্তব্যবিধান করিয়াছেন।' অর্থাৎ বিশ্বনিয়ন্তার বিধান চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট। সত্য চিরকাল একই রূপে প্রতিষ্ঠিত ; ইহা কোনদিন তথ্যকে অতিক্রম করে না। বিশ্বনিয়মে খামখেয়ালির কোন স্থান নাই।

অর্থের বিধান—নীতি, মঙ্গল বা উদ্দেশ্যের নিয়ম। যথাতথ—যেমন তেমনি। পেয়াদার ঘুষ...হতে হত—সরকারের আইনের ভয়ে অনেক সময় পাইক-পেয়াদাকে ঘুষ দিয়া অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করা হয়। বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বর ভগবানেরও আছে এক কঠোর বিধান। মূঢ় ব্যক্তি এই বিধানের স্বরূপ কি তাহা জানে না—তাই ভীত হয়। বিশ্বনিয়ন্তার বিধানের অনমনীয়তাকে মর্যাদা না দিয়া ভীরু এবং দুর্বল মানুষ তাহাকে স্তুতি করে। এই বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য ঈশ্বর আমাদের দিয়াছেন স্বরাজের দলিল। এই দলিলেই তাঁহার মহা আশ্বাসবাণী নিহিত আছে। সেই আশ্বাসবাণীর মর্মার্থ গ্রহণ করিয়া বিশ্বনিয়মের সহিত বুদ্ধির নিয়মের সমন্বয়-সাধনেই আমাদের জয় হইবে। কর্তাভজা—খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, আউলেচাঁদ চৈতন্য সম্প্রদায়ের অনুরূপ বা তাহার শাখা স্বরূপ ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ রূপে এই সাধনমত প্রবর্তিত করেন। আউলেচাঁদের শিষ্যেরা তাঁহাকে 'জয়কর্তা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাহা হইতেই এই সম্প্রদায়ের নাম কর্তাভজা হইয়াছে। ইহা হইতেই, কর্তৃত্বসম্পন্ন, ক্ষমতাবান ব্যক্তির ভয়ভীত উপাসক অর্থে কর্তাভজা শব্দটির প্রয়োগ প্রচলিত হইয়াছে।

কেবল ছোট্ট ঐ 'স্ব' টুকুকে বাঁচানোই দায় হবে—মন্তব্যটি ব্যঙ্গাত্মক। 'স্বরাজ' শব্দটির প্রথমে আছে 'স্ব'। এই অংশটি বাদ গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, ইহা বুঝাইবার জন্যই লেখক এই বিদ্রূপাত্মক উক্তি করিয়াছেন। আমাদের দেশে বহু লোকই 'স্বরাজ্য' 'স্বরাজ্য' ব'লয়া উদ্বুদ্ধ হইতে থাকেন। কিন্তু স্বরাজ্য বলিতে যে স্বাবলম্বন, স্বাধীন মন, স্বাধীন উদ্যোগ

ও অবিচলিত আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন তাহা চিন্তা করিয়া দেখেন না। এইজন্যই আত্মকর্তৃত্বের অধিকারী না হইয়া আমরা হইয়া পড়ি 'কর্তাভজা।'

অনবচ্ছিন্ন সাতমাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম—১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ হইতে আমেরিকায় আসেন। বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার ও অর্থসংগ্রহের পরিকল্পনা লইয়াই তিনি এই বিদেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। আমেরিকায় ঐশ্বর্যের বিপুল আয়োজন ও ভোগযত্নতা কবিকে পীড়িত করিয়াছিল।

Titanic wealth—গ্রীক পুরাণে কথিত Titan-এর অর্থ হইতেছে Uranus এবং Ge (earth) এর সন্তান Hyperion, Themis ইত্যাদি দ্বাদশ titan হইতে উদ্ভূত বিশালকায় বলিষ্ঠ জাতিবিশেষ। তাহা হইতে বৃহৎ, বিশাল কিছু বুঝাইতে Titanic বিশেষণপদটি উৎপন্ন হইয়াছে। বিরাট ঐশ্বর্য।

লক্ষ্মী—বিষ্ণুর পত্নী। তিনি সমুদ্রমন্থনকালে অমৃতভাণ্ড হস্তে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। যে ঐশ্বর্য-সম্পদের সহিত কল্যাণ জড়িত তিনি তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। **কুবের**—যক্ষপতি ও ধনাধিষ্ঠাতা দেবতা। **উল্লম্ফন**—লাফ দিয়া পার হওয়া। **তত: কিম্**—তাহার পর কি। **আটলান্টিকের ওপারে ইটপাথরের জঙ্গলে**—অট্টালিকা সমাকীর্ণ আমেরিকায়। **তালের খচমচর…কোথায়**—সুর এবং তালের সংযোগেই সংগীত পরিপূর্ণতা লাভ করে, শ্রুতিসুখকর হয়; কিন্তু মূলে সুরই যদি না থাকে তবে তালের কোন অর্থ থাকে না। তেমনি মানুষের জীবনে যদি কেবল ভোগের উন্মাদনাই থাকে তবে তাহার নিকট ত্যাগব্রতের সুন্দর রূপ অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। ভোগের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে উচ্ছৃঙ্খল উপভোগের আনন্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু জীবনের সত্যকার আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায় না অন্তরের স্থায়ী তৃপ্তি সেখানে লাভ করা যায় না। পশ্চিমের অজস্র ঐশ্বর্য ও ভোগের উন্মাদনার রূপ দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে হইয়াছে, সেখানে কেবল তালের খচমচানিই আছে, কিন্তু সুর নাই; মহৎ ভাবের কোন প্রকাশ নাই। সেখানে ভোগের আড়ম্বর আছে, কিন্তু চেতনশীল সত্তার অভিব্যক্তি নাই।

অনু. ১১-১৫: আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করিনে—রবীন্দ্রনাথ জীবনে কখনও শূন্যমার্গে বিচরণ করেন নাই, এবং তিনি এই পথে চলায় পক্ষপাতীও ছিলেন না। তিনি বৈরাগ্য ধর্মটিকে কখনও ব্যক্ত

করিতে চাহেন নাই, তিনি চাহিয়াছেন তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে অথবা এক বিশিষ্ট মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিতে। যে বৈরাগ্য মনে শূন্যতার জন্ম দেয়, রবীন্দ্রনাথ তাহার সমর্থন করেন না। একটি কবিতায় কবি লিখিয়াছেন :

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয় !
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।'

কবির নিকট বৈরাগ্যের মূল্য ছিল, তবে তাহা শূন্যতার উপাসনা নয়, সংযমের সাধনা।

সতীত্ব—স্ত্রীর ধর্মসুলভ নিষ্ঠা। **আধিভৌতিক**—ত্রিতাপের অন্যতম : পঞ্চভূত বা জন্তুগণ হইতে যে উপদ্রব, ভয় বা দুঃখ জন্মে। **মানব সম্বন্ধের… ঘটেছে**—পাশ্চাত্য সমাজ যান্ত্রিকতাকেই বড় করিয়া তুলিয়াছে ; ফলে মানুষের সহিত মানুষের আন্তরিকতার সম্পর্ক সেখানে দৃঢ়বদ্ধ হয় নাই। স্ক্রু অথবা আঠা দিয়া আঁটা কোন জিনিস যেমন বেশীদিন আটকাইয়া রাখা যায় না, তেমনি যথার্থ প্রেমের সম্পর্ক যান্ত্রিকতার নিয়মে রক্ষা করা যায় না, তাহার মধ্যে আত্মিক বন্ধনের প্রয়োজন হয়।

বিশ্বের বাহিরের…করে না—বিশ্বের বাহিরের দিকে যান্ত্রিকতা সত্য হইলেও অন্তরের দিকে তাহার কোন সত্যরূপ নাই। যান্ত্রিকতা মানুষের লোভকে বাড়াইয়া চলে। মানুষের কাছে মানুষকে ছোট করিয়াই তাহার প্রসার ও অগ্রগতি। আত্মিক সাধনালব্ধ সত্যকে যান্ত্রিকতা ম্লান করিয়া ফেলে।

দড়ির বাঁধন—যান্ত্রিক নিয়মশৃঙ্খলা। **বিশ্লিষ্ট**—বিচ্ছিন্ন।

অনু. ১৬-১৯ : তাঁরা বলেন…একের মধ্যে—পাশ্চাত্য সমাজে মানুষের দুর্বার লোভ মানুষের সমাজে একটা বিচ্ছিন্নতা আনিয়া দিয়াছে। আবার, ভারতীয় সমাজের আচারের বাহ্যবন্ধন সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট করিয়া মানুষকে নির্জীব করিয়া ফেলিয়াছে। ভারতবর্ষের ঋষিরা সমাজ-জীবনের চরিতার্থতার পথের সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ঐক্যানুভূতির মধ্যেই ইহার চরিতার্থতা নিহিত। যিনি এই ঐক্যানুভূতির ধারক তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

আপেল পড়ার সত্য—গাছ হইতে আপেল পড়া দেখিয়াই নিউটন

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। **মানুষের স্বরূপ…অন্তহীন সংখ্যায়**—একটি মাত্র আপেল পড়া দেখিয়া যেমন অসংখ্য আপেল পড়ার সত্যে (আকর্ষণ-তত্ত্ব) আসিয়া পৌছানো যায়, তেমনি সত্যের প্রকাশ ঘটে পরম একের উপলব্ধিতে। এই উপলব্ধিই আমাদিগের মধ্যে ঐক্যানুভূতি জাগ্রত করে।

যস্তু সর্বাণি…ন ততো বিজুগুপ্সতে—ঈশোপনিষৎ এর এই শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধের বক্তব্য অনুসারে নিজস্ব ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার আসল অর্থ হইল—কিন্তু যিনি সমুদয় বস্তুই আত্মাতে এবং সমুদয় বস্তুতে আত্মাকে (আপনাকেই, নিজ আত্মাকে তাহাদের আত্মারূপে) দেখেন, তিনি সেই দর্শনের বলেই কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

বুদ্ধদেব মৈত্রীবুদ্ধিতে—সম্ভবত ৫৬৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে ক্ষত্রিয় শাক্যবংশে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। পিতা শুদ্ধোদন। মৈত্রীবুদ্ধি বা ভাবনা, অর্থাৎ সর্বজীবের প্রতি মমতা বোধ বুদ্ধদেব তাঁহার বাণীতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

আর যে বণিক.. আফিম গিলিয়াছে—উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ সাম্রাজ্যশক্তি এশিয়াতে তাহার প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করে। চীন তাহার অধিবাসীদের নেশার দাসত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্য এবং নিজের আর্থিক ক্ষতি নিবারণের জন্য বৃটেনের যথেচ্ছ আফিম ব্যবসায়ে বাধা দিলে বৃটেনের সহিত চীনের যে যুদ্ধ বাধে (১৮৩৯-১৮৪২) ইতিহাসে তাহাই 'অহিফেন যুদ্ধ' নামে খ্যাত। বস্তুত বৃটেন তাহার ব্যবসায়িক স্বার্থই নিরংকুশ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিল। এই যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ড হংকং লাভ করে। **আত্মিক সাধনার…মুক্ত করা**—ভারতবর্ষ তাহার আত্মিক সাধনার দ্বারাই চিরদিন নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে ; এই সাধনার বলেই সে নিজেকে জড়বিশ্বের অত্যাচার হইতে মুক্ত রাখিয়াছে। এই আত্মিক সাধনাই ভারতীয় সভ্যতার উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য।

বিদ্যাং চাবিদ্যাং বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে—যিনি জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়কে একত্র (অর্থাৎ একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলিয়া) মানেন, তিনি (শাস্ত্রীয়) কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন।

যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—পৃথিবীতে যাহা কিছু অনিত্য বস্তু-সমূহ আছে। ঈশাবাস্যমিদং—নিয়ন্তা পরমেশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদনীয়। ঈশোপনিষৎ-এর প্রথম শ্লোকের দুইটি অংশ এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্পূর্ণ শ্লোকটি হইল :

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

—যাহা কিছু এই জগতে বিরাজিত সমস্তই ঈশ্বরময়। সুতরাং সমস্ত বিশ্বকে আত্মময় মনে করিতে হইবে—এই মনোভাব হইতে যে ত্যাগের প্রবৃত্তি জাগিবে তাহারই বলে প্রলোভনের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে। অপরের ধন আত্মসাৎ করা চলিবে না। যাহা কিছু এই জগতের শক্তি সম্পদ তাহাকে উপলব্ধি করিতে গেলে প্রয়োজন বিজ্ঞান এবং এই জ্ঞান যে সমস্তই ঈশ্বরময়। এবং যেহেতু ঈশ্বর আমাদের নিজেদের মধ্যে বিরাজিত সুতরাং আত্মময় এই চিন্তার জন্য প্রয়োজন তত্ত্বজ্ঞান। এই ভাবেই প্রাবন্ধিক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ঋষিগণ মানুষের যে কর্তব্যের নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন তাহাতে এই বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান উভয়ের মিলিত পথেই মানুষকে চলিতে বলা হইয়াছে।

অনু. ২০-২৩: এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে—সেই পরম একের মধ্যেই মানুষের সত্যকার চরিতার্থতা। সেই পরম এক অখণ্ডনীয় একটি নিয়মের মধ্যে বস্তুবিশ্বে বিরাজ করিতেছেন। যাহার ফলে আপেল মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বে বাঁধা পড়িয়াছে। মানুষের মধ্যে সেই 'পরম একের' সন্ধান লাভ করা যায় যখন মানুষ অনুভব করে, 'সর্বভূতে আমি এবং আমাতেই সর্বভূত।'

ইম্পিরিয়ালিজম্—রাজশক্তি দ্বারা শাসন বা সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যের উপযোগিতায় বিশ্বাস। আধ্যাত্মিক—অধ্যাত্ম বা আত্মা সম্বন্ধীয়। সত্যকার ....প্রতিষ্ঠা হয়—মানুষের জীবনে স্বাতন্ত্র্যের বিশেষ একটি মূল্য আছে। সব কিছুকে অস্বীকার করিয়া একাকার করিলেই এক হওয়া যায় না। যাহারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে তাহারাই এক হইতে পারে। প্রত্যেক জাতি বা ধর্মের একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে। এই স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইলে তাহার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। যে জাতি অপর জাতির স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে তাহারা একসূত্রে আবদ্ধ হয় না, বরং তাহাদের ঐক্য লুপ্ত হয়। পাশ্চাত্য দেশে ইম্পিরিয়ালিজম্ বলিয়া যে কথাটি প্রচলিত তাহার ঐক্যনীতি অজগর সাপের ঐক্যনীতির সঙ্গেই তুলনীয়। অজগর সাপের সবকিছুকে গিলিয়া খাইয়া এক করাকে যেমন কোন

মতেই এক করা বলা যায় না, তেমনই কোনটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া ঐক্যস্থাপন করা যায় না ; কারণ বিলুপ্ত হওয়ার ফলে যাহার অস্তিত্বই নাই তাহার সহিত ঐক্য স্থাপনের প্রশ্ন ওঠে না। ঐক্য হয় উভয়ের সমন্বয়ে। **তারাই প্রকাশ পেয়েছে**—যাহারা পরকে নিজের মত ভাবিতে শিখিয়াছে তাহারা কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারে না ; কারণ তাহারা নিজেকে সকলের মধ্যেই অনুভব করে। সর্বভূতে নিজেকে প্রত্যক্ষ করিবার এই অনুভূতিতেই মানব সমাজ মহাজাতিরূপে প্রকাশ লাভ করে। ইহাই যথার্থ প্রকাশতত্ত্ব।

ইতিহাসের গোড়াতেই···একত্র হয়েছে—পর্বত বা সমুদ্রের ভৌগোলিক সীমানা বেষ্টিত ভূখণ্ডেই মানুষ জাতিরূপে সংঘবদ্ধ হইয়াছে।

যদুবংশের মাতাল বীরদের মতো—যদুবংশের (বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই বংশেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন) বীরদের নৃশংসতা ও পাপাচারের জন্য বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ মুনি যদুকুলের ধ্বংসের অভিশাপ দিয়াছিলেন। বৃষ্ণি, অন্ধক—যদুবংশের এই সকল শাখার বীরেরা প্রচুর পরিমাণ মাংস মদ্য লইয়া তাঁহাদের পরিবারবর্গ ও সৈন্যদের সঙ্গে প্রভাসে গমন করেন। সেখানে সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রমুখ পানোন্মত্ত যদুবীরদের মধ্যে বচসা উপস্থিত হয়। উত্তেজিত হইয়া তাঁহারা পরস্পরকে হত্যা করিতে থাকেন ; যদুবংশ সেই আত্মকলহেই নির্মূল হয়।

একত্র হবার···করে ভুগোল—বিজ্ঞান তাহার শক্তিবলে মানুষকে একত্রিত করিয়াছে, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে নাই। একত্র হওয়ার পিছনে স্বার্থবুদ্ধি থাকে, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মূলে থাকে আন্তরিক প্রীতির উপলব্ধি। একটির মূলে বাহ্যশক্তি, অপরটির মূলে আন্তরশক্তি। বিজ্ঞান এই বাহ্যশক্তির উৎস, আন্তরশক্তির উৎস অধ্যাত্ম বোধ। য়ুরোপ এই আন্তরশক্তিকে অবহেলা করিয়াছে, বাহ্যশক্তিকে দিয়াছে প্রাধান্য। ফলে পৃথিবীর দিগন্তে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিতেছে দুর্যোগের কালো মেঘ। মানুষের সহিত মানুষের ঐক্যবোধ জাগ্রত হইতেছে না। **ভুগোলের বেড়া**—ভৌগোলিক সীমানা। **সংযোগ**—সম্মিলন। **গণ্ডীর ভিতরে···শেখেনি**—প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ একদিন উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লইয়া গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাস সুরু করে, এবং এইভাবেই জাতিত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়ে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই জৈব প্রেরণায় তাহারা এইভাবে সম্প্রদায় গড়িয়া তোলে। কিন্তু তাহাদের মানসিক সংকীর্ণতা এই প্রয়োজনের গণ্ডির বাহিরে তাহাদের উদারতার প্রশস্ত পথে অগ্রসর হইতে

দেয় নাই। স্বার্থ-বুদ্ধির প্রভাবে আসল ঐক্যতত্ত্ব তাহাদের জীবনে ধরা দেয় নাই।

অনু. ২৪-২৬ঃ গণ্ডীর মধ্যে সত্যকে পায় বলেই—মানুষ তাহার প্রয়োজনের অনুরোধে সাময়িক কারণে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বসবাস করে এবং এই গণ্ডীবদ্ধ জীবনের মধ্যেই নিজের সম্প্রদায় তথা জাতিকে ভালবাসিতে শেখে। এই ভালবাসাই হইল মানবিকতা। ইহা যত ব্যাপকতা লাভ করে মানবিকতা তত সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু মানুষ মোহগ্রস্ত হইলে এই মানবিকতা হইতে ভ্রষ্ট হয়; তখন মানুষের কাছে মানুষ ছোট হইয়া যায়; গণ্ডী বড় হইয়া উঠে। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতায় অন্ধ হইয়া সে সত্যজ্ঞান হারায়। তাহার কাছে তখন দেবতা অপেক্ষা পাণ্ডা পূজনীয়। রাজা অপেক্ষা দরোয়ান মান্য হইয়া দাঁড়ায়। **পৃথিবীতে নেশন…সত্যের জোরে**—রবীন্দ্রনাথের মতে 'নেশন' কথাটির মধ্যে এই সত্যটি নিহিত আছে যে 'নেশন' বা গণ্ডীবদ্ধ সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া একটি বৃহত্তর মানবতাবোধ বিকাশ লাভ করে। কিন্তু ইহা যখন উৎকট জাতীয়তাবোধের মধ্যে নিজের পরিণতি খোঁজে তখন মানুষ এই সত্যকে হারায়। তখন নিজের শক্তিবলে অপর জাতির স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিয়া দিয়া তাহার সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে।

কিন্তু ন্যাশন্যালিজম সত্য নয়…টানাটানি পড়ে গেল—অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই দেখা যায়, পাশ্চাত্য জাতিগুলির সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র জাতীয়তা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকারবোধের মনুষ্যত্বহীন অহংকারে ও তাহার চরিতার্থতার অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় প্রকাশিত হইতে শুরু করিয়াছে। আফ্রিকায় ও এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারে, উহাদের যথেচ্ছ লুণ্ঠনে, অধীনস্থ দেশের অধিবাসীদের উপর উৎপীড়নে জাতির নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধিতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের জাতীয়তাবোধ তৃপ্ত হইত, সাম্রাজ্যের শাসনশোষণের অধিকার উহারই অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি মিত্রশক্তির সহিত জার্মানীর সংঘাতের মূলে ছিল এই জাতীয় স্বার্থচেতনা-প্রসূত বিদ্বেষবিষ-জর্জরিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। **ইষ্টদেবতা**—বহু আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ অর্থাৎ—ইম্পিরিয়ালিজম্। পরের রাষ্ট্র গ্রাস করিবার আকাঙ্ক্ষা। **এ যখন একদিন…কোমল অংশে বেছে দাঁত বসিয়েছিল**—পাশ্চাত্য জাতীয় স্বার্থপরতা প্রাচ্য দেশের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি গ্রাস করিয়াছিল, এখানে সেই পররাজ্য

লোলুপতাই উল্লিখিত হইয়াছে। **ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে সন্ধি-পত্রের মুখোশ পরে**—১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে জার্মানীর পরাজয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন ফ্রান্সের ভার্সাইতে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি মিত্ররাষ্ট্রের এবং জার্মানীর প্রতিনিধিদলের মধ্যে সন্ধিচুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ জার্মানীকে পঙ্গু করিয়া রাখিবার এবং তাহাকে শোষণ করিয়া জয়ের লাভ সংগ্রহের জন্যই এই দেশের উপর অবমাননাকর শর্তসমূহ চাপাইয়া দেয়। ভার্সাই-এর সন্ধিচুক্তিতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয় নাই, বরং উহাকে কেন্দ্র করিয়া জার্মান জাতির অসন্তোষ দীর্ঘকাল ধরিয়া ধূমায়িত হইয়াছে এবং অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পুনরায় ধ্বংসের আগুন জ্বালাইয়াছে। ঐতিহাসিকেরা তাই বলিয়াছেন, ভার্সাই-এর ঐ সন্ধিপত্রেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ বপন করা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, শান্তিপ্রতিষ্ঠার আন্তরিক ইচ্ছায় নয়, তাহার আবরণে যুদ্ধের বৈরিতা, বিদ্বেষ, জাতিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লোলুপতাই ঐ সন্ধিপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। **কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে…জড়ানো চলেছে**—রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে হনুমানের বিরাট লেজ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিল; সেইরূপ প্রথম মহাযুদ্ধে পাশ্চাত্যের শক্তির মদমত্ততা দেখিয়া বিশ্ববাসী হতচকিত হইয়াছে। হনুমান তাহার লেজের অগ্নিতে লঙ্কায় আগুন লাগাইয়া যে লঙ্কাকাণ্ড বাধাইয়াছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের শেষেও তাহার সূচনা দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের ইন্ধন হনুমানের লেজরূপ স্বার্থপর শক্তির দম্ভকে সন্ধিপত্রের শান্তিবচনের ছলনায় আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। পরবর্তী কালে এই আবরণ হইতে মুক্ত স্বার্থপর শক্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছে। **বর্তমান যুগের…হওয়া চাই**—বর্তমান যুগের সাধনা বিজ্ঞান-ভিত্তিক। বিজ্ঞান দূরের মানুষকে কাছে আনিয়াছে; সে হিসাবে বলা যায় বিজ্ঞান মানুষের মিলনের সহায়ক। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বিজ্ঞানের বলে শক্তিমান হইয়া এক জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য-বিস্তারে সচেষ্ট হইয়া মানব সমাজের অকল্যাণ ডাকিয়া আনিতেছে। সুতরাং এই সর্বনাশা মনোবৃত্তিকে সংযত করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন। যে পাশ্চাত্য শিক্ষা মানুষের মনে অহমিকা জাগ্রত করে, শক্তির দম্ভে মানুষকে মত্ত করে, সেই শিক্ষার রূপকল্পের পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। মিলন-ধর্মী সেই শিক্ষাই মানুষকে এই

অভিশাপ হইতে মুক্তি দিতে পারে। সে হচ্ছে…করবার মন্ত্র—স্বদেশের গৌরবে আমাদের অবশ্যই গৌরববোধ করিতে হইবে। কিন্তু অপরের নিকৃষ্টতা যেন আমাদের দম্ভে স্ফীত না করে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, আমাদের দেশের সাধকগণ সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি দূর করিবার মন্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমরা যেন মনে করিতে পারি যে, আমাদের দেশের সেই মহা সাধকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশদেশান্তরের মানুষের নিকট মহামিলনের মন্ত্র প্রচার করা আমাদের কর্তব্য। আমরা যেন পশ্চিমকে ডাকিয়া বলিতে পারি, আমাদের এই একত্বের মহামন্ত্রকে অস্বীকার করিবার ফলেই তাহাদের এই মোহগ্রস্ত অবস্থা এবং মোহের অবশ্যম্ভাবী ফল এই শোক। যস্মিন্ সর্বাণি… একত্বমনুপশ্যতঃ—জ্ঞানীর যে আত্মায় সমুদয় বস্তু আত্মরূপে এক হইয়া গেল, সেই একত্বদর্শী আত্মার মোহই বা কি, আর শোকই বা কি?

শান্তং শিবমদ্বৈতম্—উপনিষদে পরমেশ্বরকে শান্ত, শিব (মঙ্গলময়) এবং অদ্বৈত (অদ্বিতীয়, সমস্ত ভেদ বিকল্প রহিত) রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। **রুদ্রদেবতা**—পুরাণে আছে, কল্পারম্ভে ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি-চিন্তায় নিরত, তখন এক বালক মূর্তি তাঁহার ললাট হইতে আবির্ভূত হইয়া রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে রোদনে নিবৃত্ত হইতে বলেন। সূর্যাদিতে ইঁহার অবস্থিতি স্থান নির্ধারিত হয়। ইনি অজ, মহেশ্বর, ত্র্যম্বক ইত্যাদি একাদশ মূর্তিতে একাদশ রুদ্র নামে পরিচিত। শিবের সংহারমূর্তিকে এই অর্থেই 'রুদ্রদেবতা' বলা হইয়াছে।

আবর্জনার পীঠস্থাপন করে—শুধুমাত্র স্বদেশের গৌরবে গর্বিত ও স্ফীত হইয়া একান্ত আত্মগত হইয়া থাকার যে অতিপ্রাচীন অভ্যাস সেইটি নিছক জীর্ণতারই পরিচায়ক। আত্মসম্প্রসারণের পথে এই জীর্ণ সংকীর্ণ মনোভাব আবর্জনার ন্যায় বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমরা যদি সেই আত্মকেন্দ্রিক হইয়া থাকিবার পুরাতন অভ্যাসকেই অতি পবিত্র বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে কার্যত আবর্জনাকেই দেবতার আসনে বসান হয়।

তামসী পূজাবিধি—তামসীর (কালী) পূজা পদ্ধতি, তমোগুণ বা কামাদি নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য স্থূল, হীন পূজাবিধি। এখানে পাশ্চাত্য ভোগলুব্ধতার ইংগিত দেওয়া হইয়াছে।

অনু. ২৭-২৮: সত্যলাভের ক্ষেত্রে…বাধা নেই—সত্যজ্ঞান লাভ

করিবার স্থান বিশ্বানিকেতন। অতএব এই বিশ্বানিকেতনই হইবে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন-নিকেতন। বিষয় লাভের ব্যাপারে মানুষের বিরোধ বাধে কিন্তু সত্যলাভের ক্ষেত্রে বিরোধের কোন কারণ থাকিতে পারে না। সংসার জীবনে কেবল নিজের পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া থাকিলে উদার বিস্তৃততর কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, বৃহত্তর সত্য হইতেও নিজেকে বঞ্চিত থাকিতে হয়। কেবল নিজের ভোজনশালাকে কেন্দ্র করিয়া সত্যলাভ করা যায় না— তাহার জন্য অতিথিশালা প্রয়োজন। এই অতিথিশালায়ই সমগ্র বিশ্বকে আদর অভ্যর্থনা জানাইতে হইবে; তবেই বাঞ্ছিত মিলন সম্ভব হইবে। বিশ্বানিকেতনই এই অতিথিশালা। এই অতিথিশালার মাধ্যমেই পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত মিলনের বাধাকে অপসারিত করিতে হইবে।

ম্যাক্সমূলরের পাঠশালা—বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ এবং প্রাচ্যবিদ্যা-বিশেষজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলর (১৮২৩—১৯০০)। জার্মান দেশের Dessaw নগরে ইহার জন্ম। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভাষাসমূহের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ঋক্‌বেদ সম্পাদনা করেন, পুরাণ ধর্মতত্ত্বের বিষয়েও গবেষণা করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হয়।

ম্যাক্সমূলর পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের ভাবনার আলোকে এদেশীয় শাস্ত্রাদির বিচার ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বভাবতই তাঁহার চিন্তার মধ্যে প্রাচ্যভাবনার যথাযথ রূপায়ণ ছিল না। অথচ এদেশের অনেকে তাঁহার ভাবশিষ্য ছিলেন। তাঁহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা বা গবেষণা না করিয়া তাঁহাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিতেন বলিয়াই কবি এই পরিহাসোক্তি করিয়াছেন।

গড়ের বাদ্যের কড়ি মধ্যম—গড়ের (দুর্গের তথা ফৌজের) বাজনা, বা গোরা বা ইংরেজসৈন্যের বাজনা (কলিকাতার কেল্লার সংলগ্ন গড়ের মাঠে এই বাজনা শোনা যাইত বলিয়াও গড়ের বাদ্য বলা হইত), তাহার কড়ি মধ্যম, অর্থাৎ তীব্র মধ্যম স্বর। আধুনিক ভারতের আর্যসভ্যতার দম্ভে পশ্চিম গড়ের বাদ্যের কড়ি মধ্যম, অর্থাৎ পাশ্চাত্য সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের অহংকারই প্রতিধ্বনিত হয়।

পশ্চিমরাগেরই তারসপ্তকের নিখাদ তীব্র হয়ে বাজে—সা রে গা মা ইত্যাদি সাতটি স্বর লইয়া এক-একটি সপ্তক হয়। সাধারণতঃ মানুষের

কণ্ঠনিঃসৃত সুরে তিনটি সপ্তকই গণনা করা হয়। সব শেষেরটি নামই তারা (উচ্চ) সপ্তক, তাহার নিখাদ (সঙ্গীতের সাতটি মূল সুরের সপ্তম সুর)। ভারতবর্ষ যখন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রবল নিন্দায় অস্বীকার করে, তখন পাশ্চাত্য জাতীয়তাবোধের অহংকারই সর্বাপেক্ষা উদগ্র ও তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতের চোখ দিয়া যাঁহারা প্রাচ্যের ভাব ও ভাবনার পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তার বিকৃতি ও দৈন্য সম্পর্কে কবির মন্তব্য লক্ষণীয়।

দেউড়ি—ফটক, তোরণ, সদর দরজা।

তার সাধনসম্পদ আছে—এখানে বলা হইয়াছে ভারতীয় ঋষিদের ঔপনিষদিক সাধনার কথা। ইহা হইল সেই সাধনা যাহাতে মানুষ পায় 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'-এর সন্ধান, যে অদ্বৈত সার্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় এবং একমাত্র যাঁহারই আশ্রয়ে বিশ্বের মানুষ শান্তি পাইতে পারে; সকল ভেদবুদ্ধির কবল হইতে মুক্ত হয়। এই সাধনা হইল মানুষের প্রকাশের সাধনা, মানবতার উপলব্ধির সাধনা—সর্বভূতকে আপনার মতো দেখিয়া ও আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখিয়া মানুষ মাত্রকেই আত্মীয় মনে করার সাধনা।

নবযুগের……জরামুক্ত হব—ভারত যে অগাধ ঔপনিষদিক সাধন-সম্পদের অধিকারী তাহারই বলে সে বিশ্বকে আমন্ত্রণ জানাইবে। কোন সুবিধালাভের জন্য নয়, কোন সম্মান লাভের জন্যই নয়; মানুষের আচ্ছন্ন আত্মাকে জ্ঞানের আলোকে মুক্তি দিবার জন্যই ভারতের অতিথিশালায় এই নিমন্ত্রণ। ভারতের এই সাধনার মধ্য দিয়াই সমগ্র বিশ্বে আত্মীয়তাবোধ প্রকাশ লাভ করিবে; এক শান্তিময় নবযুগের আবির্ভাব ঘটিবে; মানুষের অন্তরে মানবতার পরিপূর্ণ উপলব্ধি ঘটিবে।

॥ ব্যাখ্যা ॥

[১] কিন্তু তাঁর পেয়াদার……স্বরাজের দলিল। (অনু. ৭)

আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' শীর্ষক প্রবন্ধটি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

আত্মশক্তির চর্চা না করিয়া দৈবানুগ্রহের উপর নির্ভর করার ফলে আমাদের জীবন যেভাবে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, সেই প্রসঙ্গে দেশবাসীকে বিধাতার নিয়মের সত্যটিকে স্মরণ করাইয়া দিয়া লেখক এই উক্তিটি করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে গ্রামে আগুন লাগিলে যখন ঘর-দুয়ার ভস্মীভূত হইতে থাকে তখন অগ্নিনির্বাপণের জন্য সচেষ্ট না হইয়া অদৃষ্টকে দায়ী করিয়া গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। একটি কুয়ার ব্যবস্থা করিলে এই বিপর্যয়কে রোধ করা যায়। সে কথা বলিলে তাহারা উহার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। এই দৈব এবং পরনির্ভরতাই এদেশের দুর্গতির মূল কারণ। অথচ বিশ্বরাজ্যে ঈশ্বর আমাদের স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সেই শাশ্বত নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করিবার অধিকার আমাদের রহিয়াছে। কিন্তু মানুষের রাজ্যে কোনও অধিকারের দলিল পাইতে হইলে আদালতের পেয়াদা প্রভৃতি কর্মচারীদের প্রভুত্ব সহ্য করিতে হয় এবং তাহাদের সন্তুষ্ট করিতে হয়। আমরা নানা দৈবদুর্বিপাক, বিপর্যয়ে নিজেদের মোহগ্রস্ততার জন্যই মিথ্যা দৈবী বিভীষিকা দেখিয়া থাকি। ঈশ্বরই যে আমাদের স্বাধীনতার অধিকার দিয়া আমাদের সেই বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমাদের সেই বিধিদত্ত স্বরাজ বুঝিয়া আত্মশক্তি উদ্‌বোধনে সচেষ্ট হইতে হইবে।

[২] বিধাতা স্বয়ং যেখানে···বাঁচানোই দায় হবে। (অনু.-৮)

[বর্ধঃ বিশ্বঃ—১৯৬৮]

প্রসংগ পূর্ববৎ।

এখানে দেশপ্রেমিক কবি রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে ভারতের ব্যর্থতার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—বিধাতা নিয়মের রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নিয়মের সহিত বুদ্ধির নিয়মের সামঞ্জস্যে আত্মশক্তির উদ্বোধন হয়। কিন্তু বুদ্ধির দৈন্য ভারতবর্ষকে দুর্বলচিত্ত শরণাগত হইবার প্রবৃত্তি দান করিয়াছে। ভগবান মানুষকে আত্মকর্তৃত্বের যে সম্মান দান করিয়াছেন, তাহাকে গ্রহণ করিবার যোগ্যতা তাহার নাই। তাই স্বরাজ্যের আন্দোলনে কাহাকেও রাজপদে বসাইতে না পারিলে তাহার স্বস্তি নাই। স্বভাবতই রাজা তাহার রাজভোগ গ্রহণ করিবেই এবং ইহারা সেই পরিত্রাণ-পরায়ণের শরণাগত থাকিয়া যাইবে।

দরদী কবি তাই সুতীব্র ক্ষোভের সহিত বলিয়াছেন—ইহাদের নিকট হইতে রাজভোগ গ্রহণ করিবার জন্য রাজার অভাব কোনদিন হইবে না। যাহাদের স্ব অর্থাৎ নিজের অধীন অর্থাৎ স্বাধীন হইবার যোগ্যতা নাই, তাহাদের

পরের অধীন অর্থাৎ পরাধীন থাকিতেই হইবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় স্বরাজের স্ব-টুকু বাঁচানো দায় হইবে।

[৩] **লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি……বহুলত্ব লাভ করে।** (অনু. ৯)
[বর্ধঃ বিশ্বঃ—১৯৬৭]

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় অবস্থানকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐশ্বর্যের যে বিপুল আয়োজন দেখিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গেই আলোচ্য অংশটি লিখিত হইয়াছে।

লক্ষ্মী ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কুবেরও ঐশ্বর্যেরই দেবতা, কিন্তু দু'জনের মধ্যে পার্থক্য অনেক। লক্ষ্মী কল্যাণের দেবী, তাঁহার মহিমা মঙ্গলমাধুর্যসিক্ত, শতদল পদ্মের শুচি সৌন্দর্যে তিনি বিরাজমান। যে ঐশ্বর্য লক্ষ্মীর কল্যাণপূত, তাহা মানুষের মঙ্গলের জন্যই নিয়োজিত হয়। তাহা ব্যাধি-দারিদ্র্য দূর করে, জীবনকে সুন্দর রাখে। এই ঐশ্বর্য ত লক্ষ্মীর আশীর্বাদ, তাঁহার অমৃতদান; জীবনের কল্যাণসাধনে তাহা শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠে। আর কুবেরের ঐশ্বর্য কেবল লাভের সংগ্রহ; ইহা ভোগসুখের আড়ম্বরে, অজস্র উপকরণে, অভ্রভেদী অট্টালিকায় তাহার প্রাচুর্যকে ঘোষণা করে। ক্রমাগত স্ফীতিতে, বাহুল্যেই এই ঐশ্বর্যের গৌরব, তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষায় মানুষ ইহার পরিমাণকে বৃদ্ধি করিয়া চলে। এই সংগ্রহের ঐশ্বর্যে কল্যাণের শ্রী নাই, বরং ইহা জীবনের শূন্যতাকেই উদ্ঘাটিত করে।

[৪] **অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন, সেই হ'লো প্রকৃত মিলন।** (অনু. ১১)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য—তথাকথিত বৈরাগ্যের নামে শূন্য ঝুলির সমর্থন করার মধ্যে কোন যুক্তি নাই। এ যেন অপদার্থ দরিদ্রের অপদার্থতা গোপনের অপপ্রয়াস মাত্র। ভারতের ইষ্ট দেব-দেবীর দেবরূপ পরিকল্পনার ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি প্রাচ্য ধর্মানুমোদিত বৈরাগ্যের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্তরের পূর্ণতা বৈরাগ্যের প্রধান উপকরণ। যাহার চিত্তে পূর্ণতা নাই, তাহার মধ্যে সংযমের অবকাশ নাই। ঐশ্বর্যের মধ্যে যেখানে সংযত চিত্তের ভোগের যথার্থ প্রকাশ, সেখানেই ত্যাগব্রতী বৈরাগ্যের পরিপূর্ণতা। স্বার্থমুক্ত

এই বৈরাগী মন মানব সমাজকে স্বার্থ কলুষ হইতে মুক্তি দিতে পারে। বাক্যের সহিত অর্থের মত ঘনসংযুক্ত ষড়ৈশ্বর্যময়ী অন্নপূর্ণার সহিত বিভূতিভূষিত মহাদেব ভারতের সার্থক ঐক্য-সাধনার রূপক প্রতিমূর্তি।

[৫] মানুষের যেখানে ·····প্রকাশ হয় অমৃতরূপে। (অনু. ১২)

[বর্ধঃ বিশ্বঃ ১৯৬৬, '৬৭, '৭০]

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ভোগসুখমত্ততায় মানুষের প্রকৃত সত্তা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু এই কথার অর্থ ইহা নয় যে, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, কলকারখানা—বাহিরের জীবনের নানাবিধ অভাব পূরণের এই সকল উপকরণের কোনও আবশ্যকতা নাই। উহাদের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। কিন্তু ঐ সমস্ত উপকরণ কেবল মানুষের ব্যবহারিক জীবনের অভাবকেই পূর্ণ করে; তাহার হৃদয়কে পরম ঐশ্বর্যে ভরিয়া তুলিতে পারে না, হৃদয় উপকরণ-প্রাচুর্যের মাঝখানে উপবাসী থাকে। উপকরণের অভাব পূরণের ক্ষেত্রেই মানুষের যত ঈর্ধাবিদ্বেষ দেখা যায়। এখানেই মানুষ তাহার লোভের বস্তুসম্ভারকে স্বার্থ-বুদ্ধির সংকীর্ণতায় রক্ষা করিবার জন্য নিজের চারিদিকে বিচ্ছেদের প্রাচীর গড়িয়া তোলে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যেখানে মানুষ বস্তুসংগ্রহের পরিবর্তে আত্মার শুভবুদ্ধিতে, কল্যাণ কামনায় প্রকাশিত হয়, সেইখানেই আমরা তাহার পূর্ণতার অমৃতরূপ লক্ষ্য করি। মানুষ তখন হৃদয়ের উদার আতিথ্যে সকলকে গ্রহণ করে, নিজের জীবনকে সে আর লোভে, ঈর্ষা-বিদ্বেষে, স্বার্থপরতায় বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিত করিয়া রাখে না, তাহার সত্যকারের ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়।

[৬] ভক্তি নেই বলেই······বিদ্রোহী হয়। (অনু. ১৬)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

বাণিজ্যিক সভ্যতার নিয়মের যান্ত্রিকতাকে অন্তরে এবং বাহিরে বড় করিয়া তোলায় পাশ্চাত্য সমাজে যে মানব-সম্বন্ধের বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়াছে, সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য উক্তিটি করিয়াছেন।

অন্তরের ভক্তি এবং প্রীতির সূত্রেই মানুষের সমাজে গভীর এবং স্থায়ী ঐক্যবন্ধন স্থাপিত হয়। মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার সফলতা অবশ্যই আছে,

কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের সফলতার জন্য তাহার প্রয়োজনীয়তা; তাহাকে মানুষের অন্তরের উপরেও প্রাধান্য দিলে সেই যান্ত্রিক শৃংখলার বন্ধনে সত্যকারের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, উহা দড়ির বাঁধনের মতই মানুষকে পীড়িত এবং ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলিত হয়, এই বাহিরের ঐক্যের যান্ত্রিকতায় সেই 'সৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন' প্রাণময় বন্ধন শিথিল হইতে থাকে, অবশেষে সে বিদ্রোহী হয়। যান্ত্রিক সামাজিক ঐক্য-শৃংখলার বিরুদ্ধে য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক বিদ্রোহের সূচনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। য়ুরোপ হৃদয়ের ভক্তি প্রীতিকে উপেক্ষা করিয়া কেবল ব্যবহারের বাহ্যিক বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করিতে চাহিয়াছে, সেখানে সেই বাহির হইতে আরোপিত ঐক্যে সমাজকে সে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, আর ভারতবর্ষও যেখানে হৃদয়কে উপবাসী রাখিয়া আচারের বাহ্য বন্ধনে মানুষকে এক করিতে চাহিয়াছে, সেখানে সেই হৃদয়হীন ঐক্যে সে সমাজকে নির্জীব করিয়া তুলিয়াছে।

[৭] আপনাকে আপনাতেই···সেই হয় প্রকাশিত। (অনু. ১৮)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

মানুষের জীবনের সত্য, তাহার চরিতার্থতা নির্দেশ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিটি করিয়াছেন।

ব্যবহারিক জীবনের নিয়মের যান্ত্রিকতায়, উপকরণ-বাহুল্যে মানুষের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। যে মানুষ নিজের স্বার্থপরতার গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে, সে তাহার প্রকৃত সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আর যে মানুষ নিজেকে সকলের মধ্যে বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়, নিজেকে অপরের ভিতরে উপলব্ধি করে, সে-ই তাহার মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্যে প্রকাশিত হয়। উপনিষদের বাণীতেও বলা হইয়াছে, যিনি সকলকে নিজের আত্মার মত দেখেন এবং আত্মাকে সকলের মধ্যে দেখেন তিনি স্ব-প্রকাশ মহিমায় ভাস্বর হইয়া ওঠেন। ইতিহাসে মনুষ্যত্বের প্রকাশ ও প্রসন্নতায় উজ্জ্বল এবং শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত আছে। বুদ্ধদেব তাঁহার মৈত্রীভাবনায় বিশ্বের মানুষকে এক করিয়া দেখিয়াছিলেন, চীন তাঁহার সেই ঐক্যের প্রেরণায় অমৃত লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। আর আধুনিককালে ইংরেজ বণিকেরা ব্যবসায়িক স্বার্থের লোভে সেখানে যুদ্ধ বাধাইয়াছে, মনুষ্যত্বকে আচ্ছন্ন আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

[৮] মানুষ কিসে প্রকাশ……দেখা যায় নি। (অনু. ১৮)

আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। লেখক এখানে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে মানবাত্মার প্রকাশতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সর্বভূতের মধ্যে নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করিয়া আত্মার প্রকাশেই মানব-জীবন চরিতার্থতা লাভ করে। যে মানুষ নিজেকে নিজের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে তাহার বিলুপ্তি ঘটে, আর যে মৈত্রীবুদ্ধিতে সকলের মধ্যেই নিজেকে উপলব্ধি করে, সে হয় প্রকাশিত। বুদ্ধদেব মৈত্রী-বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হইয়াই তাঁহার নিজের আনন্দের উপলব্ধি ও মুক্তিকামনাকে বিশ্বের সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার ঐক্যতত্ত্ব চীনকে দিয়াছিল অমৃতের সন্ধান, আর যে ইংরেজ বণিক লোভের তাড়নায় নিজ স্বার্থসাধনের জন্য ঐক্যতত্ত্ব জলাঞ্জলি দিয়া চীনকে আফিং ধরাইয়াছিল, সে দিয়াছিল মৃত্যুর বিষবাণ। বুদ্ধদেবের কাছে বিশ্বমানব লাভ করিয়াছে নিজেকে প্রকাশের মন্ত্র, ইংরেজ বণিকের কর্মের নামে অপকর্ম মানুষের মনুষ্যত্বকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এক মহাপ্রাণের কাছে মানুষ লাভ করিয়াছে বিশ্বপ্রেমের উদারতা, আর স্বার্থবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন অপরজনের কাছে পাইয়াছে স্বার্থসাধনের জন্য অপরকে দলিত করিবার হীন মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তি মানুষের আত্মিক প্রকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়, মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিক্ষেপ করে।

[৯] এখানকার নিয়মতত্ত্বকে……মুক্তিলাভ করে। (অনু. ১৯)

উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উৎকলিত হইয়াছে। মানুষের আত্মার প্রকাশের জন্য বস্তুবিশ্বে যে একটি নিয়ম আছে লেখক এখানে সেই সম্বন্ধেই বলিয়াছেন।

আত্মিক সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ—জড় বিশ্বের অত্যাচার হইতে আত্মাকে মুক্ত করা। পাশ্চাত্য দেশ সাধনার এই দিকটি অবলম্বন করিয়াছে। ইহা সাধনার সর্বনিম্ন স্তর, কিন্তু এই সাধনার ভিত্তিকে পাকা করিয়া তুলিতে না পারিলে অধিকাংশ মানুষকে পেটের দায়ে কেবল জড়ত্বের গোলামি করিতে হইবে। পাশ্চাত্যদেশ তাই নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, উপর দিকে মাথা তুলিবার অবসর তাহার নাই। এই পাকা ভিতের উপর যখন উপরতলা উঠিবে, তখনই আলো হাওয়ার যাহারা ভক্ত, তাহাদের বাসাটি হইবে বাধাহীন।

জ্ঞানীরা বলিয়াছেন, না-জানাই বন্ধনের কারণ, আর জানাতেই ঘটে মুক্তি। বস্তুবিশ্বেও ঠিক এই নিয়ম। এখানকার নিয়মতত্ত্ব জানিতে পারিলে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় না, মুক্তির আস্বাদ লাভ করা যায়। বিষয় রাজ্যে বাহিরের যে বন্ধন কল্পনা করা হয় উহা একটি মায়া; বিজ্ঞান এই মায়া হইতে নিষ্কৃতিলাভের পথ দেখায়। পশ্চিম মহাদেশ যে মুক্তির সাধনা করিতেছে তাহা হইল বাহ্য বিশ্বের মুক্তির সাধনা। সেই সাধনা ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্ম, রোগ-দৈন্যের মূল খুঁজিয়া বাহির করিতেছে, মৃত্যুর আঘাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর পূর্ব-মহাদেশ করিতেছে তাত্ত্বিক সাধনা, যাহার দ্বারা অমৃতের অধিকার লাভ করা যায়। সুতরাং পূর্ব-পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তবে উভয়েই ব্যর্থ হইবে। তাই আমাদের উপনিষৎ যে মিলনমন্ত্র দান করিয়াছেন তাহাই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। সেই মিলনমন্ত্রেই পূর্ব-পশ্চিমের মিলনকে সম্ভব করিয়া মানুষকে বিশ্বের কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে।

[১০] ইম্পারিয়ালিজম্ হচ্ছে......প্রচার করে। (অনু. ২০)

[বর্ধঃ বিশ্বঃ—১৯৭২]

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মিলনের যৌক্তিকতা বর্ণনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ এখানে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতেছেন।

প্রাবন্ধিকের মতে দুই ধারার মধ্যেই সত্য আছে। কিন্তু বর্তমান যুগে প্রাচ্যের জীবন-ধারার মধ্যে দরিদ্রের বৈরাগ্যের অভিমান মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়; আর পাশ্চাত্য জীবনে আছে ভোগীর অসংযত সর্বগ্রাসী লোলুপতা।

এই সর্বগ্রাসী প্রয়াসের আর এক নাম ইম্পীরিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ। উপনিবেশ স্থাপনে তৎপর এই সাম্রাজ্যবাদকে রবীন্দ্রনাথ অজগর সাপের গিলিয়া খাওয়ার নীতির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। যাহাকে গিলিয়া খাওয়া হইল, তাহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিল না। ইহাকে ঐক্য বলে না। একাকার হওয়া ঐক্য নয়। পরস্পরের স্বক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে যদি স্বাতন্ত্র্য থাকে, তবে ঐক্য তথা সমন্বয় সত্য-স্বরূপে বিধৃত হয়। এখানেই নিখিল মানবের মুক্তি নিহিত আছে।

[১১] যখন মিটল……মুখোশ প'রে। (অনু. ২৪)

উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এখানে লেখক যুরোপের ন্যাশনালিজমের অনিষ্টকর প্রভাবের কথা আলোচনা করিয়াছেন।

ঐক্যের বিচারে নেশন কথাটির মধ্যে একটা সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ন্যাশনালিজমের মধ্যে কোন সত্যতা নাই; ইহা নিছক সংকীর্ণ জাতীয়তা-বাদের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ন্যাশনালিজমের দেবতার পূজার অর্ঘ্য রচনায় যুরোপ নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান চালাইয়াছে। যতদিন বিদেশী বলি জুটিয়াছে ততদিন তাহাদের নিজের দেশে এই পূজার অর্ঘ্য খুঁজিতে হয় নাই; কিন্তু বিধাতার অমোঘ নির্দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেই নরমেধ যজ্ঞের রক্তাক্ত উৎসব তাহাদের নিজ ভূখণ্ডেই ঘটিয়া গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন প্রচণ্ডভাবে চলিতেছিল তখন অনেকেই আশা করিতেছিল যে, যুদ্ধ মিটিয়া গেলেই সমস্ত অকল্যাণ বুঝি দূর হইবে। কিন্তু যুদ্ধ যখন মিটিয়া গেল তখন দেখা গেল, সন্ধিপত্রের মুখোশ পরিয়া সেই যুদ্ধই আবার ফিরিয়া আসিতেছে, শুধু প্রস্তুতির কালটুকুরই অপেক্ষা।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের লঙ্কাদহন বৃত্তান্তের সহিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থার বেশ একটি সাদৃশ্য কল্পনা করা যায়। হনুমানের বিরাট লেজ ভীতির কারণ হইয়া পড়িয়াছিল; রাজা রাবণের আদেশে সেই বিরাট লেজে আগুন ধরাইয়া হনুমানকে পুড়াইয়া মারিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু ফল ফলিল বিপরীত। হনুমানের লেজের আগুনে লঙ্কাপুরী দগ্ধ হইয়া গেল। রামায়ণে ইহাকেই লঙ্কাকাণ্ড বলা হয়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড কথা দুইটির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুরোপীয় রাষ্ট্রকর্ণধারগণ সন্ধিপত্রে যে সকল শর্ত আরোপ করেন উহা যেন হনুমানের লেজে কাগজ জড়ানোর মত কূটবুদ্ধির কাগজ জড়ানো। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ফলে যুরোপে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তথাকথিত ন্যাশনালিজমের দুর্বুদ্ধিই যুরোপীয় রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণকে এই সর্বনাশা কাজে প্ররোচিত করিয়াছিল।

[১২] **বিষয়লাভের ক্ষেত্রে……মিলনের বাধা নেই।** (অনু. ২৭)
[ব. বি. পুরাতন কোর্স, ১৯৬৫]

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ

আমাদের দেশের শিক্ষানিকেতনকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সভ্যতার মিলনের পুণ্যতীর্থ করিয়া তুলিতে হইবে, সেই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য উক্তিটি করিয়াছেন।

মানব সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখি, বৈষয়িক স্বার্থসাধনের ক্ষেত্রে এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের বিরোধ ক্রমাগত চলিতেছে। সে বিরোধ সহজে মিটিবার নহে। মানুষের স্বার্থবোধ উদগ্র ও অনমনীয়। সভ্যতার যতই অগ্রগতি হউক, স্বার্থের দাসত্ব হইতে মানুষ নিজেকে মুক্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু সত্যলাভের ক্ষেত্রে আমাদের মিলনের কোনও বাধা নাই। বাধা নাই বলিয়াই প্রতিটি যুগে এক দেশের মনীষীদের সত্যসাধনা অপর দেশকে ধ্রুবতারকার মত অনির্বাণ জ্যোতিতে পথ দেখাইয়াছে; এক জাতির বিজ্ঞানচর্চা সমগ্র মানবজাতির চিরস্থায়ী সম্পদে পরিণত হইয়াছে। য়ুরোপের সহিত ভারতবর্ষের বিভেদ ও বৈষম্য যতই দুস্তর হউক, তাহার সভ্যতার যাহা কিছু সত্য, বিশ্বসভ্যতার সম্পদ, তাহাকে গ্রহণ করিয়া আমরা সভ্যতার মিলনের ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারি।

[১৩] **সেই সম্পদের জোরে……অধিকার পাবে।** (অনু. ২৮)

উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উৎকলিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে বিশ্বের অতিথিশালা হিসাবে কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার কামনা—ভারতবর্ষ এই অতিথিশালায় সমগ্র বিশ্বকে অভ্যর্থনা জানাক, সত্যসাধনার পথ প্রদর্শন করুক। আমাদের বিদ্যানিকেতনগুলি পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-নিকেতন হইয়া পরম সত্যলাভের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করুক।

ভারত ধনসম্পদে দরিদ্র বটে, কিন্তু অধ্যাত্ম-সম্পদে সে ঐশ্বর্যবান্। উপনিষদের ঋষিদের সাধনা-সম্পদের রত্নরাজিতে ভারতের সাংস্কৃতিক ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রণ জানাইবে, বিশ্বকে

শুনাইবে তাহার মানবতার সাধনার কথা, তাহার আত্মিক প্রকাশ পদ্ধতি। সমগ্র বিশ্বকে আত্মীয় করিবার মন্ত্র সে বিশ্ববাসীকে দান করিবে। ইহা হইল সেই সাধনা, যাহা হইতে মানুষ পায় 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'-এর সন্ধান; যে অদ্বৈত সর্বমানবের পরম আশ্রয় এবং একমাত্র যাহার আশ্রয়েই বিশ্বমানব শান্তিলাভ করিতে পারে। এই সাধনা মানবতার উপলব্ধির তথা প্রকাশের সাধনা; সর্বভূতকে আপনারই মতো দেখিবার, আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া মানুষমাত্রকেই আত্মীয় মনে করার সাধনা। এখানেই ভারত তাহার স্বকীয়তায়, তাহার সাংস্কৃতিক অবদানে সমগ্র বিশ্বের নিকট উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিবে।

॥ প্রশ্নোত্তর ॥

১। 'এইজন্যই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলননিকেতন করে তুলতে হবে।'

শিক্ষার এই আদর্শটি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধে কিভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা নিজের কথায় বুঝাইয়া দাও।

[বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪]

অথবা, 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য— উভয়ক্ষেত্রেই অপূর্ণতা দেখিয়াছেন। এই অপূর্ণতা কেন এবং কী উপায়েই বা ভারতবর্ষে 'সত্যশিক্ষার অতিথিশালা' প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তার আলোকে নির্ণয় কর।

[বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫]

অথবা, 'এই জন্যেই আমাদের বিদ্যা-নিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুলতে হবে।' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলিত সাধনায় কিভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব-সভ্যতা বিকশিত হইতে পারে— রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার মিলন' অবলম্বনে তাহা পরিস্ফুট কর।

[বর্ধঃ বিশ্বঃ—১৯৬৮]

উত্তর: পাশ্চাত্য দেশ বিজ্ঞানের নিয়মের চর্চায় বস্তুজগতের উপর

আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে ; তাহাদের এই বিস্তার মূল্যকে আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না, কারণ তাহার মূলে সত্যতা রহিয়াছে। যখন হইতে বিজ্ঞানের আলোচনায় পশ্চিম দেশবাসী তাহাদের মনকে ভ্রমমুক্ত করিয়াছে, যে দিন হইতে ইহা জানিয়াছে যে, সেই নিয়মই সত্য যাহা ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা পরিবর্তিত হয় না, তখনই—সেই দিন হইতেই তাহাদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবাসী সেই নিয়মের জ্ঞানচর্চায় আত্মশক্তির উদ্‌বোধনের পরিবর্তে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে বুদ্ধির ভীরুতায় এবং পরনির্ভরতায় নিজেদের জীবনকে দুর্বল, রুগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। অথচ প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেরই উপনিষদে আত্মশক্তির মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল। ঈশ্বর অনন্তকাল হইতে অনন্ত কালের জন্য অর্থের যে বিধান করিয়াছেন তাহা অপরিবর্তনীয়। এই বিধি-বিধান নিজের হাতে গ্রহণ করিবার অধিকার তিনি মানুষকে অর্পণ করিয়াছেন। ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ যথার্থ আত্মশক্তিতে যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে অন্য সকল রকম স্বাধীনতা পায় এবং পাইয়া রক্ষা করিতেও পারে।

আমাদের এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে হইবে যে, মানুষের আত্মিক ঐক্যকে উপেক্ষা করিয়া কেবল বৈষয়িক জীবনের লোভের চরিতার্থতায় জাতীয় স্বার্থ-সাধনে য়ুরোপ তাহার বিজ্ঞান-বুদ্ধিকে প্রয়োগ করিয়া জীবনের সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। সুতরাং একদিকে যেমন বিজ্ঞানের চর্চায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি, দৈন্য দূর করিয়া বাহির বিশ্বে মুক্তির সাধনা করিতে হইবে, অপরদিকে তেমনি প্রাচ্যদেশের অন্তরাত্মার সাধনায় জীবনের পূর্ণতা খুঁজিতে হইবে। মানুষের অধিকাংশ শক্তি যদি ক্ষুধার তাড়না দূরীকরণেই ব্যয়িত হয়, তবে জড়জগতের দাসত্বে নিঃশেষিত হওয়া ছাড়া তাহার আর কোনও উপায় নাই। সুতরাং বিজ্ঞানের সাহায্যে এই দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ তাহার আত্মিক সাধনার সর্বনিম্ন অঙ্গ। কিন্তু প্রতীচ্য দেশের মত মানুষকে এখানেই থামিলে চলিবে না, তাহাকে মানবাত্মার ঐক্যের সত্যে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, নিজের মনুষ্যত্বের গৌরবে প্রকাশিত হইতে হইবে। জীবনের পূর্ণতার জন্যই প্রতীচ্যের বিজ্ঞান এবং প্রাচ্যের সত্য-জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

শিক্ষাই জীবনের পূর্ণতা অর্জনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপায়। সেইজন্যই আমাদের শিক্ষানিকেতনকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের পুণ্যতীর্থ করিয়া

তুলিতে হইবে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের ঐ দুই সাধনার ধারাকে সম্মিলিত করিতে হইবে। আমরা যখন আর্যসভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব করি, বা পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলশ্রুতি বিজ্ঞানকে প্রবল ধিক্কারে অস্বীকার করি, তখন আমরা পশ্চিমের সংকীর্ণ জাতীয়তা-প্রসূত ভেদবুদ্ধিকেই পরোক্ষে প্রশ্রয় দিই। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ সহজে মিটিতে চায় না, কিন্তু সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের কোন বাধা নাই। কোনও জাতিকেই নিজের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিলে চলে না, বিশ্বের সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত করিয়া তাহাকে পূর্ণতার সাধনা করিতে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রই জাতির অতিথিশালা, সেইখানেই তাহাকে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের সত্যসাধনা করিতে হইবে; প্রাচীন ভারতবর্ষ সেই পথেই মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইবার দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষাদর্শের উপযোগিতা আমরা আধুনিককালেও অনুভব করি। এযুগেও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভে বা পাশ্চাত্যের সভ্যতাকে ধিক্কারে আমাদের সেই বিভ্রান্তি এবং মোহ প্রকাশ পায়। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বস্তু-সাধনা ও সত্যসাধনার যে সমন্বয়ের অভাব কবি লক্ষ্য করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমাদের কালেও দূর হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি-সমন্বয়-মূলক শিক্ষাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে আমাদের শিক্ষার সকল আয়োজন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে—ইহা আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে।

২। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ কেবল উভয় দেশের শিক্ষার প্রসঙ্গই আলোচনা করেন নাই, আপনার সমগ্র জীবনদর্শন সম্পর্কেই ইঙ্গিত করিয়াছেন।'—আলোচনা কর।

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘজীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনায় যে শ্রেয় এবং প্রেয়োবোধের, সৌন্দর্য এবং মঙ্গলের সমন্বয়কে রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধ-সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি যখন সমাজ, শিক্ষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন বিচ্ছিন্নভাবে তাহাদের বিচার করেন নাই, তাঁহার সমগ্র জীবনাদর্শের পটভূমিকায়ই বিষয়গুলিকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার কোনও বিচার-বিশ্লেষণ, আলোচনা, সিদ্ধান্ত, মতামত সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক বা চিন্তাগত আন্দোলনের উত্তেজনা, অস্থির ভাববিলাস-প্রসূত কিংবা উহাদের

প্রতিক্রিয়ার ফল নয় ; সমস্ত ক্ষেত্রেই যাহা ক্ষণিক, ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ তাহাকে বর্জন করিয়া অবিচলিত দৃঢ়চিত্ততায় তিনি তাঁহার ধ্রুব জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। উপনিষদের বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া বৃহত্তর মানবতার ঐক্যধর্মকেই তিনি তাঁহার জীবনপ্রত্যয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য, সমস্ত অসঙ্গতিতে সঙ্গতির ছন্দটিকেই ব্যাকুলভাবে অন্বেষণ করিয়াছেন। এই সমগ্রতার সাধনাই তাঁহার মানস-ধর্ম।

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি লিখিবার সময় সমগ্র দেশ রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনায় অস্থির এবং উত্তপ্ত ছিল। কিছুকাল পূর্বে আর্যসভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভে আমরা মত্ত হইয়া ছিলাম, এইবার প্রবল ধিক্কারে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে বর্জন করিবার উদগ্র উৎসাহ আমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল। আমরা যে উভয় ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য জাতীয়তাবোধের বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়াছিলাম, তাহা আমাদের চেতনায় ধরা পড়ে নাই। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান বর্জনের অসুস্থ মনোভাবের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া কবি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বুদ্ধির চর্চাকে উহার নিজস্ব মূল্যে আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। পশ্চিমের লোকেরা যে বিদ্যায় বিশ্বজয় করিয়াছে, তাহার শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত বিশ্বশক্তি হইতেছে বিশ্বনিয়মেরই রূপ ; কেবল মাত্র আমাদের স্বেচ্ছা-চালিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে। এই নিয়মের উপরে অধিকার স্থাপন করিবার চেতনাই আমাদের আত্মশক্তিকে বিকশিত করে ; আমরা স্বাবলম্বী হই। য়ুরোপ বিজ্ঞানের আলোচনায় নিয়মের সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে বলিয়াই তাহার রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হইয়াছে। য়ুরোপ আবার এই শক্তির সাধনায় যান্ত্রিকতাকে, সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থবোধের ভেদ-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়াছে বলিয়া সে সত্যভ্রষ্ট হইয়াছে। আর আমরা সেই বিজ্ঞানবুদ্ধির অবহেলায় দৈব ও পরনির্ভর হইয়া জাতীয় জীবনকে দুর্বল করিয়া রাখিয়াছি। অপরদিকে য়ুরোপের স্বাজাত্যের আত্মম্ভরিতার বিষ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। অথচ ভারতবর্ষের সত্যসাধক ঋষিরা বিধাতার নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করিবার মানবিক স্বাধীনতার বাণী, ভেদবুদ্ধি দূর করিবার এবং ঐক্যপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রই আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাই আমাদের শিক্ষাকে স্বাজাত্যের অহমিকা হইতে মুক্ত করিয়া তাহাতে পাশ্চাত্যের

বিজ্ঞান ও প্রতীচ্যের আত্মিক সাধনাকে সম্মিলিত করিতে হইবে। সত্যের তথা ঐক্যের সাধনায় আত্মাকে প্রকাশিত করিয়া নবযুগের উদ্বোধন করিতে হইবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ আভাসিত হইয়াছে। শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি যে সমন্বয়ের, ঐক্যের সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, তাহাই তাঁহার জীবনের গভীর প্রত্যয়; 'শিক্ষার মিলনে' কবির এই সমগ্রতাবোধ আবেগের উষ্ণতায় পাঠকের নিকট সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত।

৩। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত ঐক্যতত্ত্ব বা প্রকাশতত্ত্বের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া এই তত্ত্বকে শিক্ষার আদর্শরূপে গ্রহণ করার সার্থকতা নির্দেশ কর এবং 'শিক্ষার মিলন' বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝাইয়াছেন তাহাও ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে 'ঐক্যতত্ত্ব' এবং 'প্রকাশ-তত্ত্ব' উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা মূলত একই সত্যকে প্রতিফলিত করিয়াছে। মানুষের অভাব পূরণের প্রয়োজনে কলকারখানা প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণের আয়োজন। কিন্তু এই প্রয়োজনের সহিত হৃদয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই। য়ুরোপ যন্ত্রের নিয়মে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে বাঁধিয়া, যান্ত্রিকতাকেই অন্তরে বাহিরে বড় করিয়া তুলিয়া মানব সমাজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। মানুষের আত্মাকে উপেক্ষা করিয়া বাহির হইতে আরোপিত যান্ত্রিক বন্ধনকেই চিন্তায় এবং কর্মে প্রধান করিয়া তুলিলে যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণে পরস্পর মিলিত হয়, সেই সজীব বন্ধন ক্রমাগত শিথিল হইতে থাকে, অবশেষে সমাজে বিদ্রোহ দেখা দেয়। য়ুরোপের সংকীর্ণ স্বার্থাশ্রয়ী জাতীয়তাবোধের ভেদবুদ্ধি পররাজ্যলুণ্ঠনেই তৃপ্ত হয় নাই, অবশেষে নিজেদের মধ্যেও নিষ্ঠুর অমানুষিক সংগ্রাম বাধাইতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই।

ভারতবর্ষের ঋষিরা ঐক্যের মধ্যেই জীবনের পরম চরিতার্থতার সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। উপনিষদের ঋষিরা তাঁহাদের বাণীতে বলিয়া গিয়াছেন, যিনি সমস্ত বস্তুকে নিজের আত্মার মত দেখেন এবং আপনাকে সর্ববস্তুতে দেখেন তিনি স্বপ্রকাশ-মহিমায় ভাস্বর হইয়া ওঠেন। ঐক্যানুভূতিতেই মানুষের

মনুষ্যত্বের, তাহার যথার্থ স্বরূপের বিকাশ হয়। নিজের স্বার্থের গণ্ডীতেই যে নিজেকে আবদ্ধ করে, তাহার অপমৃত্যু অনিবার্য। আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে, সে-ই সত্যের অমৃতরূপে উদ্ভাসিত হয়। ঐক্যের মধ্যে মনুষ্যত্বের এই বিকাশই রবীন্দ্রনাথ-উল্লিখিত ঐক্যতত্ত্ব ও প্রকাশতত্ত্বের মূল কথা। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, একাকার হওয়াই যথার্থ এক হওয়া নয়; যাহারা স্বতন্ত্র তাহারাই যথার্থ ঐক্যের বন্ধনে মিলিত হইতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ পরজাতির স্বাতন্ত্র্য অপহরণ করে বলিয়াই সর্বজাতির ঐক্যকে গ্রাস করে, স্বাতন্ত্র্যের অবলুপ্তিকেই সাম্রাজ্যবাদ ঐক্য বলিয়া প্রচার করে। মানুষ যেখানে এক সেখানে তাহার সত্য ঐক্য লক্ষ্য করা যায়, কেননা সেই সমন্বয়েই তাহার স্বকীয়তার মর্যাদা রক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, যাহারা নবযুগের সাধক, ঐক্যের সাধনার জন্যই তাহাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা এবং মনে রাখিতে হইবে যে, এই সাধনার ফলশ্রুতি জাতি বিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবেরই মুক্তি।

ঐক্যের মধ্যে মানুষের আত্মার প্রকাশের গূঢ় তত্ত্বকেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার যথার্থ আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশ যে বিজ্ঞান-বুদ্ধি অনুশীলনে বস্তু-জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহাকে অবহেলা করার ফলে আমাদের আত্মশক্তির বিকাশ ঘটে নাই; দৈব ও পর-নির্ভরতায় আমাদের জাতীয় জীবন পঙ্গু রহিয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগে আবার পাশ্চাত্যের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে আমাদের মন আচ্ছন্ন হইয়াছে, প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করার দুর্বুদ্ধি এদেশে দেখা দিয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষ ঐক্যের সমন্বয়ের আদর্শ ই প্রচার করিয়াছিল। সেই ঐক্যের ধ্যানমন্ত্রের উপলব্ধিতে মানবত্ব প্রকাশের সেই সনাতন সত্যকে উদ্বোধিত করিয়া আমাদের নবযুগকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। সেইজন্যই ভারতবর্ষের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলননিকেতন করিয়া তোলা দরকার। এদেশের শিক্ষায় যেন প্রতীচ্যের বিজ্ঞানের এবং প্রাচ্যের অধ্যাত্ম সাধনার ধারা সম্মিলিত হয়, তাহা যেন সত্যসাধনার অতিথিশালা হইয়া উঠে। এখানে সমস্ত বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষ ধন্য এবং পূর্ণ হইবে, শিক্ষার মিলন বলিতে রবীন্দ্রনাথ ইহাই বুঝিয়াছেন। এই শিক্ষার সমন্বয়ের সত্যসাধনায়ই মানুষের মনুষ্যত্ব, তাহার আত্মা প্রকাশিত হইবে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটিই আমাদের শিক্ষার

মধ্যে প্রচার করিতে হইবে এবং কর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। শিক্ষার সরকারী ব্যবস্থার কৃপণতায় তাহা সম্ভব নয়। আমাদের জাতীয় দৈন্য এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নিষ্ফলতার পটভূমিকায় মনুষ্যত্ব বিকাশের এই শিক্ষাদর্শের সমীচীনতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

৪। 'স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা।'—'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ হইতে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির উদ্দেশ্য পরিস্ফুট কর। [বর্ধঃ বিশ্বঃ—১৯৬৯]

উত্তর : একদিন ভারতের তপোবনে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অমৃতত্বের বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞানকে চাই আর চাই তত্ত্বজ্ঞান। এই দুইয়ের সমন্বয়ে জীবন সত্য-স্বরূপে প্রকাশিত হয়।

পাশ্চাত্য জগৎ নিয়মের রাজত্বকে করতলগত করিয়া আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাইয়াছে। সেই শক্তির প্রয়োগে সে অজগরের মত সমস্ত কিছু গ্রাস করিতে ব্যাকুল। স্বাজাত্যাভিমান বা nationalism ভোগলুব্ধ মানুষকে স্বভাবতঃই গণ্ডী-দেবতার পূজায় প্রণোদিত করিয়াছে। উপনিবেশগুলি প্রথমে তাহাদের পূজার নরবলির যোগান দিয়াছে। কিন্তু রক্তের মাদকতায় এবং শক্তির দম্ভে তাহারা ক্রমেই নিজেরা নিজেদের বলির উপকরণ হইয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তাহার পরবর্তীকালের ইতিহাসের দিকে ইংগিত করিয়াছেন। পশ্চিম আজ অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, নিরানন্দ ; বিচ্ছিন্নতার মধ্যে বিব্রত পশ্চিম আজ শান্তির জন্য ব্যাকুল।

এদিকে বর্তমানের প্রাচ্য দেশ বিকৃত বৈরাগ্যের সাধনা করিয়া দৈন্য-পীড়িত, নির্জীব এবং কর্তাভজা। আত্মবিস্মৃত জাতি নিজেদের ঐশ্বর্য ঋষির সাধনা-লব্ধ তত্ত্বজ্ঞান ভুলিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের বিকৃত দৃষ্টিতে প্রাচ্যের জীবন-বেদ যেভাবে বিধৃত হইয়াছে, সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা দৈন্য-পীড়িত জাতিকে সেই বিদ্যা ভিক্ষাদান করা হইতেছে। আজ তাহাদেরও আত্মাভিমানের সীমা নাই। বর্তমান ভারতের কণ্ঠে পাশ্চাত্য বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শোনা যায়। দুর্বলের ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত এই প্রতিধ্বনি যেন প্রাচ্যের আত্মাকে উপহাস করে।

একদিন যে ভারত ছিল সমন্বয়ের বাণীর উদ্গাতা, আজ সে স্বাজাত্যের মিথ্যা

অহমিকার আচ্ছন্ন। তাই সত্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথ উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন—আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে, তার অপমৃত্যু অনিবার্য। আর সকলের মধ্যে আপনাকে যিনি উপলব্ধি করেন, তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন; তাঁহারই অন্তরের আলোকে বিশ্বজগৎ প্রকটিত হয়। ভারতের ঋষি বলিয়াছেন—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্। বুদ্ধদেব দিয়াছিলেন মৈত্রী ও করুণার বাণী। ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার জ্ঞান-ভাণ্ডার অশান্ত বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছিল।

আমাদের জাতীয় জীবনের জ্ঞান-সম্পদ সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা নাই, মূল্যবোধ নাই, আছে মিথ্যা অভিমান। কিন্তু পশ্চিমাগত এই বিকৃত আত্মকেন্দ্রিকতা হইতে আমাদের মুক্তি পাইতেই হইবে। আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে হইবে।

বস্তু-জ্ঞানে বস্তুর উপর অধিকার জন্মে; কিন্তু ধীরে ধীরে যন্ত্রবদ্ধ মানুষ বস্তুর দাস হইয়া যায়। আত্মজ্ঞানে এই দাসত্বের বন্ধন তথা যান্ত্রিকতার বন্ধন হইতে মানুষ মুক্তি পায়। এই তত্ত্বজ্ঞানে মানুষ স্বাজাত্যের অহমিকা হইতে মুক্তি পাইয়া উদার মানবতার মহৎ ক্ষেত্রে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইবে। ঐশ্বর্যের সংগে সংযত-চিত্ত ভোগীর ত্যাগ-ব্রতের সমন্বয় সাধনে বর্তমান যুগের শিক্ষাক্রম রূপায়িত হইবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

॥ সার-সংক্ষেপ ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিমণ্ডলের মধ্যে লিখিত এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই লক্ষ্য করিয়াছেন তৎকালীন য়ুরোপীয় সভ্যতার বিপুলতা। এই বিস্ময়কর ব্যাপ্তি ও বিপুলতার মূল খুঁজিতে গিয়া তিনি একটি আশ্চর্য সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, ইহা পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার ন্যায় এক দেশ—এক সভ্যতা, অথবা এক জাতি—এক সভ্যতা নহে। নানা দেশ ও নানা জাতির সমবায়ে য়ুরোপীয় সভ্যতা বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের সভ্যতায় এক একটি ভাব প্রধান হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রধান ভাব হইল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।

দেশ বিদেশের সভ্যতা যে ভাব আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠুক, উহা যখন তদপেক্ষা উচ্চতর ভাবের হন্তারক হয় তখনই তাহার বিনাশ হয় আসন্ন। সভ্যতার ইতিহাসে আমরা দেখি, প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে, তেমনি তাহার অতীত সর্বজনীন মানবধর্মও আছে। জাতিধর্ম এই মানবধর্মকে আঘাত করিলে তাহা নিজের সর্বনাশকেই বহন করিয়া আনে। ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রম ধর্ম উচ্চতম ধর্মের মর্যাদা লংঘন করিয়াছে বলিয়াই তাহা কলুষিত হইয়াছে। আমাদের দেশের বর্ণাশ্রম ধর্মের পতনের কারণ এই মানবধর্মের, নিত্যধর্মের, শাশ্বত ধর্মের অবমাননা। শূদ্র বলিয়া মানুষকে ঘৃণা করার ফলেই ব্রাহ্মণ হয় অধঃপতিত। পরে আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে জ্ঞানের চেতনা দেখা দেওয়ায় শূদ্র জাগিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জাগিতেছে ব্রাহ্মণ। য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ধর্মকে অতিক্রম করিতে উদ্যত; সেই কারণেই তাহার মধ্যে সর্বনাশের অশুভ চিহ্ন দেখা দিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় ঐক্য, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহংকার কোনও দিন হিন্দুসভ্যতার লক্ষ্য ছিল না। হিন্দুসভ্যতা রাষ্ট্রনির্ভর নহে, সমাজনির্ভর; সুতরাং ইহার সাময়িক পতন দেখা দিলেও, ইহাকে বাঁচাইবার আশা করা যায়। তবে 'নেশন'-এর মোহ ভারতেও আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, ইহা বিপদের কথা। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কোথায়ও

এই নেশনের ভাবটির সহিত কোন ভাবসঙ্গতি নাই, কারণ আমাদের সকল আদর্শের বড় আদর্শ যে আত্মার স্বাধীনতা, য়ুরোপে নেশন-আদর্শের মধ্যে তাহার কোন স্থান নাই। সমাজের কল্যাণের জন্য জীবনাচরণই ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ। য়ুরোপের জাতীয়তার আদর্শকে গ্রহণ করিয়া আমরা সর্ববিধ মিথ্যাচারের পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছি। প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় আছে; হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। য়ুরোপের জাতীয়তাই সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ইহা মনে করিলে আমরা ভুল করিব।

॥ বক্তব্য-সংকেত ॥

[১] নানা দেশ নানা জাতির সমবায়ে য়ুরোপীয় সভ্যতা বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রধান ভাব হইল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।

[২] সকল জাতির জাতিধর্ম ছাড়াও আর একটি ধর্ম আছে, তাহার নাম মানবধর্ম। জাতিধর্ম যদি মানবধর্মকে আঘাত করে তবে তাহার নিজের সর্বনাশই ডাকিয়া আনে।

[৩] ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম এই মানবধর্মকে লঙ্ঘন করিয়াছিল তাই তাহার পতন হইয়াছিল। য়ুরোপের সভ্যতার মূল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি মানবধর্মকে অতিক্রম করিতে বসে তবে তাহারও পতন ঘটিবে।

[৪] প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় থাকে। হিন্দু সভ্যতার মূলে—সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে—রাষ্ট্রনীতি। কিন্তু য়ুরোপের জাতীয়তাই সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি—এই ধারণা ভুল।

॥ রচনা-পরিচিতি এবং রসগ্রাহী সমালোচনা ॥

সংকলনের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রবন্ধটি প্রথমে নবপর্যায়ে প্রকাশিত বঙ্গদর্শনের ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ' নামে প্রকাশিত হয়, পরে উহা 'স্বদেশ' গ্রন্থটিতে সংগ্রথিত হয়। ১৩০৮ সালের বৈশাখে পুনরুজ্জীবিত বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন। এই সময়ে রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন প্রশ্নে বাংলার মনীষীরা চিন্তিত ছিলেন। "রাজনৈতিকেরা রাষ্ট্রতন্ত্র, শাসন-সংস্কার, কংগ্রেস ও কনফারেন্স লইয়া ব্যস্ত; সমাজসংস্কারকগণ সামাজিক হিতসাধনের জন্য উন্মুখ; ইঁহাদের বাহিরে মুষ্টিমেয়

ভাবুকের দল ভারতীয় সংস্কৃতির মূলগত ঐক্যভূমির সন্ধানে নিরত। তাঁহাদের মতে মানবজীবনের সমস্যাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখা যায় না, রাষ্ট্র ও সমাজ অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সেইজন্যই তাঁহারা পরাধীন ভারতের রাষ্ট্রনীতির সহিত যুক্ত ভারতের সমাজ-নীতির সম্বন্ধ আবিষ্কারের জন্য মনোযোগী হইয়াছিলেন।" (রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)। রবীন্দ্রনাথও এই পর্যায়ে জাতীয় জীবনের ও সমস্যার বিশ্লেষণ এবং সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশে উদ্যোগী হন। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে এবং এই সময়ে রচিত প্রবন্ধগুলিতে আমরা দেখি, কবি তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনা-সঞ্জাত সহজ সমাধানের প্রগল্‌ভতাকে সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। পরম মঙ্গলের সনাতন ধর্মাদর্শের পটভূমিতেই পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতি ও ভারতীয় ধর্মগত ঐতিহ্যের সংঘাতে আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ জাতীয় জীবনের সমস্যাকে পর্যালোচনা করিয়াছেন। এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবন্ধটিকে মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছে।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রবন্ধটির প্রতি ছত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞাদৃষ্টির গভীরতা আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। কবি যথার্থ ই বলিয়াছেন, রাষ্ট্রীয় স্বার্থচেতনা য়ুরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজের এই জাতীয়তার আদর্শকেই ভারতবর্ষের শিক্ষিতশ্রেণী নির্বিচারে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল। প্রত্যেক জাতিরই এক একটি ধর্ম, সভ্যতার মূলভাব, আশ্রয় থাকে। হিন্দুসভ্যতার মূল ভিত্তি ন্যাশনালিজম্ বা রাষ্ট্রীয় ঐক্য নয়, সমাজ।

প্রাচীন ভারতের হিন্দুসমাজ বহুকে এক করিয়াই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিল। উদার সত্য-সন্ধানী মানসদৃষ্টির বিশ্লেষণে কবি আমাদের দেখাইয়াছেন, জাতিধর্ম যখন উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করে, তখন তাহা বিকৃত হয়। বর্ণাশ্রয়ী ধর্ম বৃহত্তর মানবতার ধর্মকে লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়াই তাহার শোচনীয় দুর্গতি লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুসভ্যতার নিজস্ব সামাজিক আদর্শেই যে তাহাকে ভিতর হইতে গড়িয়া তুলিতে পারা যাইবে, এ আশা কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না। আমরা যদি আমাদের সমাজের মুক্তির আদর্শকে সঞ্জীবিত করিতে পারি, তবেই আমরা প্রতিষ্ঠিত হইব।

য়ুরোপের জাতীয়তাবাদ মানবধর্মকে আঘাত করিয়া ভয়াবহ সংকটকে যে আসন্ন করিয়া তুলিতেছে, তাহাও অত্যন্ত স্পষ্ট। নেশনই মানবসভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চরম অভিব্যক্তি নয়। অপ্রমত্ত চিন্তাশীলতায়, সভ্যতার মূল্যবোধের

সমগ্রতায়, প্রত্যয়ের নিরুচ্ছ্বসিত, শান্তকঠিন আবেগে এবং প্রকাশভঙ্গির ঋজুতায় ও মন্ত্রোচ্চারণের গাম্ভীর্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তব্যকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

অনু ১-৫ঃ অন্য সকল সভ্যতাই……জাতির সভ্যতা—য়ুরোপীয় সভ্যতা অন্যান্য সভ্যতার মত এক দেশ বা এক জাতির সভ্যতা নহে। য়ুরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া—এই তিনটি মহাদেশের সমবায়ে য়ুরোপীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিরাট ভূভাগে একটি মাত্র সভ্যতার প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি আশ্চর্য বৃহৎ ব্যাপার সন্দেহ নাই। **সমিধকাষ্ঠ**—যজ্ঞীয় কাষ্ঠ।

য়ুরোপীয় সভ্যতা হোমানলের সমিধকাষ্ঠ—সমগ্র য়ুরোপ জুড়িয়া আধুনিক জড়বাদী ও ভোগবাদী সভ্যতা প্রবল হইতে প্রবলতর আকার ধারণ করিতেছে; তাহাকে প্রবন্ধকার একটি হোমানলের সহিত উপমিত করিয়াছেন। হোমের অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য উহাতে মধ্যে মধ্যে ঘৃতসিক্ত সমিধ নিক্ষেপ করিতে হয়। য়ুরোপীয় সভ্যতার অগ্নিকুণ্ডে উপকরণ যোগাইতেছে তিনটি মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত নানা দেশ, নানা জাতি।

জাতিরক্ষা এক মূর্তি ধারণ করিয়া—জাতীয় স্বার্থরক্ষায় একই কার্যকলাপ ও চিন্তা অবলম্বন করিয়া। **জাতিরক্ষা আমাদের সংস্কার**—বৈদিক যুগের বর্ণাশ্রম ধর্ম কালক্রমে মনুষ্যত্ব-বোধের উচ্চতর দিকগুলিকে উপেক্ষা করিয়া তথাকথিত জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে মুখ্য বলিয়া গ্রহণ করিল—যাহার ফলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রচিত হইল। ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারকে জাতিরক্ষার রক্ষাকবচ মনে করিয়াছে। আর এই জাতিরক্ষার তাগিদেই মনুষ্যত্বকে চরম অমর্যাদায় লাঞ্ছিত করিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসিগণও তেমনি রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষার তাগিদে মনুষ্যত্ববোধকে বিসর্জন দিয়াছে।

দেশবিদেশের সভ্যতা ভাববিশেষকে অবলম্বন করে—প্রত্যেক দেশের সভ্যতার মধ্যে বিশেষ কোনও মৌলিক ভাবপ্রেরণা থাকে। যেমন, জীবনের সমস্ত দিকের যথাযথ বিকাশ গ্রীক সভ্যতার মূল লক্ষ্য ছিল, তেমনি ভারতীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র সামাজিক কল্যাণবোধ।

অনু. ৬-১৪ : জাতিধর্মের অতীত……প্রতিঘাত করিল—প্রত্যেক জাতিরই একটি নিজস্ব জাতিধর্ম আছে। প্রত্যেক জাতি তাহার আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি প্রভৃতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে গড়িয়া উঠে। কিন্তু জাতিধর্মেরও অতীত যে মহত্তর ধর্ম—মানবধর্ম, তাহাকে জলাঞ্জলি দিয়া জাতিগত বৈশিষ্ট্য-গর্বে মানুষ যদি অন্ধ হইয়া পড়ে তবে সে নিশ্চিত আত্মবিনাশের পথেই অগ্রসর হয়। তখন এই বিনষ্টি হইতে পরিত্রাণের উপায়ও থাকে না। ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম যেদিন মানবতার মহৎ আদর্শ ভুলিয়া এই মানবধর্মকে আঘাত করিল—তখন ধর্ম তাহাকে প্রত্যাঘাত করিল। বর্ণাশ্রম ধর্ম—বৈদিক যুগেই ভারতবর্ষের সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণে (গুণ এবং কর্মের যোগে যাহা গ্রহণ করা যায় তাহাকে বর্ণ, অর্থাৎ জাতি বলে) বিভক্ত ছিল। এই প্রসঙ্গে গীতার 'জ্ঞানযোগ' শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে :—"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ"। প্রথম দিকে গুণ ও কর্মের পার্থক্যই শুধু ছিল, পরবর্তীকালে বংশানুক্রমিকতায় জাতিভেদ দেখা দিলে তদনুযায়ী বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। যজন-যাজন, অধ্যাপনা ব্রাহ্মণদের কার্য ; ক্ষত্রিয় যোদ্ধা, সমাজের রক্ষাকর্তা ; বাণিজ্যের দায়িত্ব বৈশ্যের ; আর জমিচাষ ইত্যাদি কর্মের দায়িত্ব শূদ্রের। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিভুক্ত লোকদিগের জীবনকে চতুরাশ্রমে বিভক্ত করা হইত। অল্পবয়সে উপনয়নের পর গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যপালন ; দ্বিতীয় আশ্রম হইল গার্হস্থ্য, গৃহস্থ বা সংসারীসুলভ জীবনাচরণ, পঞ্চাশোর্ধ বয়সে অরণ্যে গমন করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন এবং সর্বশেষ পর্যায়ে সন্ন্যাসী হইয়া মুক্তির সাধনা—ইহারই নাম ছিল বর্ণাশ্রম। মহাকবি কালিদাস বিরচিত "রঘুবংশম্" কাব্যের প্রথম ভাগে রঘুবংশের রাজাদের জীবন-চর্যায় ইহার উল্লেখ আছে—

বাল্যেঽভ্যস্তবিদ্যানাম্ যৌবনে বিষৈষিনাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাম্ যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥

জীবনাচরণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের অধিকার আর্যসভ্যতার প্রথম যুগে সঙ্কুচিত করা হয় নাই। কিন্তু কালক্রমে সমাজের উচ্চবর্ণের আচার-অনুষ্ঠানগত আত্মম্ভরিতার ফলে জাতীয় ধর্ম বিকৃত হইল।

প্রতিঘাত—আঘাত ফিরাইয়া দেওয়া, প্রত্যাঘাত।

ধর্ম এব হতো হন্তি……রক্ষিতঃ—ধর্ম অতিক্রান্ত হইলে (অতিক্রম-

কারীকে) বিনষ্ট করে। ধর্ম (যথাযথভাবে) পরিপালিত হইলে (পরিপালন-কারীকে) রক্ষা করে।

নীচের দিকে টানিয়া রাখিল—তুলনীয় :

"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

দুর্ভাগা দেশ—রবীন্দ্রনাথ

যখন জ্ঞানের বন্ধনমুক্তি হইল—ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের দম্ভজনিত কুসংস্কার প্রকৃত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ইংরেজের আগমনে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের ফলে ভারতবাসীর মনের সেই আচ্ছন্নতা বর্তমানে অনেক কাটিয়া গিয়াছে; আজ তাহারা সকল মানুষকে সমানভাবে দেখিবার উদার দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিয়াছে। ইহাকেই লেখক জ্ঞানের বন্ধনমুক্তি বলিয়াছেন। **মূর্ছাপগমের**—মূর্ছা অর্থাৎ জড়তার অপসারণের, বিনাশের। **নিত্যধর্ম**—মানুষের পালনীয় পৃথিবীর কল্যাণকর কার্য।

শনি—সূর্যতনয়, সপ্তম গ্রহ। শনির ক্রূর বা প্রতিকূল দৃষ্টিতে সর্বনাশ হয় বলিয়া মনে করা হয়। সুতরাং সাধারণভাবে শনির অর্থ অমঙ্গল, সর্বনাশ। **য়ুরোপীয় সভ্যতার……প্রবেশ করিবে**—য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ। এই স্বার্থবুদ্ধি যদি ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠিয়া মানব-ধর্মের সীমাকে অতিক্রম করে, তবে তাহার জাতীয় জীবনে একদিন ধ্বংসের বীজ প্রবেশলাভ করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ যেখানে স্বার্থের অধিষ্ঠান, সেখানে বিরোধও অনিবার্য। **যে ধর্মনীতি……উঠিতেছে**—রাষ্ট্রকেন্দ্রিক য়ুরোপীয় সভ্যতা আজ প্রচার করিতেছে, যে ধর্মনীতি ব্যক্তি বিশেষের জীবনে বরণীয়, তাহাই রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের ব্যাপারে বর্জনীয় হইতে পারে; য়ুরোপীয় সভ্যতা রাষ্ট্রীয় নীতিতে মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা ইত্যাদিকে অন্যায় আচরণ বলিয়া মনে করে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা রাষ্ট্রনীতির এই অপপ্রয়োগকে কূটনৈতিক সাফল্য বলিয়া গর্ববোধ করে। কারণ এইগুলির সহায়তায় সে পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

শ্রেয়োজ্ঞান—শ্রেয়ঃ (শুভকর, হিতজনক, কল্যাণের পথ) জ্ঞান। **ফরাসী, ইংরেজ গালি…দিতেছে**—রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি রচনার সময়

য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সংকটের পূর্বলক্ষণ দেখা দিতেছিল। এই সকল দেশে তখন প্রথম মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছিল এবং প্রত্যেকেই নিজেদের কূটনৈতিক অভিসন্ধি গোপন রাখিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপে মুখর হইয়াছিল। **ধ্রুবধর্ম**—চিরন্তন সত্যধর্ম ; মানবধর্ম।

অনু. ১৫-২০ : এখন গত শতাব্দীর সাম্য সৌভ্রাত্রের মন্ত্র···সুর লাগে না—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভলতেয়ার, রুশো প্রভৃতি য়ুরোপীয় মনীষী যে সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্বের—তথা মানবিকতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীতেও য়ুরোপের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির কণ্ঠে আমরা তাহার প্রতিধ্বনি শুনিয়াছি। কিন্তু পরবর্তীকালে উগ্র রাষ্ট্রীয় স্বার্থচেতনায় য়ুরোপীয়দের বিবেক ও ধর্মবোধ অসাড় হইয়া পড়ে ; তাহাদের মুখে সেই সাম্য-সৌভ্রাত্রের মন্ত্র পরিহাস-বাক্য হইয়া উঠে। কারণ বাস্তব আচরণে, অপর জাতির সহিত ব্যবহারে তাহাদের মনুষ্যত্বহীন নিষ্ঠুরতাই প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্টান মিশনারীরা অর্থাৎ ধর্মপ্রচারকেরা প্রাচ্য দেশে আসিয়া ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সকলকে যখন 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করেন, তখন তাঁহাদের কণ্ঠেও ভ্রাতৃভাবের প্রকৃত আন্তরিক সুরটি বাজিয়া উঠে না, তাঁহাদের চিত্ত য়ুরোপীয় জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বাভিমানের সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন।

হিন্দুসভ্যতা···প্রতিষ্ঠিত নহে—ভারতীয় সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার ন্যায় রাষ্ট্রনির্ভর নহে। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি তাহার সমাজ। তাই সমাজের ভিতর তাহার সঞ্জীবনী শক্তি বাঁচিয়া আছে। সেই শক্তির বলেই পরাধীনতার গ্লানির মধ্যেও তাহার আত্মিক শক্তিকে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও এই আত্মিক শক্তির বলেই সে বাঁচিয়া থাকিবে।

নেশন—বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রানুগত্য থাকিলেও যে সর্বজনস্বীকৃত, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনগঠনকারী চেতনা (জাতীয়তাবোধ, ন্যাশনালিজম্) নেশন বা জাতিকে গঠন করে তাহার সূত্রপাত অষ্টাদশ শতাব্দীতে হইয়াছিল বলা চলে। মধ্যযুগে সভ্যতা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক ; পরবর্তীকালে বিভিন্ন জাতির শিক্ষিত ব্যক্তিরা ফরাসী সভ্যতাকেই জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। সাধারণ ভৌগোলিক সীমা, সাধারণ ধর্ম, ভাষা, একই স্বার্থবোধ, এক ঐতিহ্য, এক শাসনের আনুগত্য—প্রভৃতির সমবায়ে 'নেশন' গড়িয়া উঠে ; ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে একটি কি ততোধিক উপাদান জাতি গঠনের সর্বাপেক্ষা

প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবোধ এত প্রবল হয় যে, উহাকে 'য়ুরোপীয় জাতীয়তাবাদের যুগ' নামে অভিহিত করা হয়। জাতীয়তাবাদের যুগে জাতিগঠনের এই নীতি স্বীকার করা হয় যে, একটি জাতিই একটি রাষ্ট্র গঠন করিবে এবং রাষ্ট্রই ধর্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে একটি সমগ্র জাতিকে তাহার মধ্যে স্থান দিবে।

ন্যাশনাল মহত্ত্ব—জাতীয়তাবোধের একপ্রকার উন্মত্ত আবেগ।

ব্রহ্মনিষ্ঠো...ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন। তিনি যে কর্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। **মটজর বন্দুক**—জার্মানীতে নির্মিত এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় পিস্তল (Mauser)। এক একবার ট্রিগার টিপিবার কালে যাহাতে একাধিক গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, ইহা সেইভাবে নির্মিত।

দমদম বুলেট—দমদমে অবস্থিত অস্ত্রাগারে বিশেষ এক ধাঁচ অনুযায়ী এই বুলেটগুলি নির্মিত হইত বলিয়া ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে উহাদের এইরূপ নামকরণ (Dum Dum Bullet) হয়। ইহাদের এই বিশেষত্ব ছিল যে, উহারা নিক্ষিপ্ত হইবার পর ছড়াইয়া পড়িত এবং আহত দেহে বীভৎস ক্ষত সৃষ্টি করিত। সাধারণ গুলি কার্যকর না হওয়ায় দুর্ধর্ষ উপজাতিদের বিরুদ্ধে সীমান্ত-যুদ্ধে এই দমদম বুলেট ব্যবহৃত হইত।

ধর্ম এব হতো···হতোবধীৎ—ধর্ম অতিক্রান্ত হইলে (অতিক্রমকারীকে) বিনষ্ট করে। ধর্ম (যথাযথভাবে) পরিপালিত হইলে (পরিপালনকারীকে) রক্ষা করে। অতএব ধর্মকে অতিক্রম করা উচিত নয় এবং অনতিক্রান্ত ধর্মও যেন (আমাদিগকে) বিনষ্ট না করে। ইহা মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোক।

॥ ব্যাখ্যা ॥

[১] **সেই শক্তির অভ্যুদয়···নির্ভর করে।** (অনু. ২)

উদ্ধৃত অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। প্রত্যেক সভ্যতার মূলেই যে একটি নিয়ামক শক্তি আছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপুল ব্যাপ্তির আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক উক্ত মন্তব্য করিয়াছেন।

সমস্ত কিছুর পশ্চাতেই কোন নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি আছে। কোন সভ্যতাই আকার প্রকার বিহীন হইতে পারে না; আর ইহাকে চালনা করিতেছে, এমন একটি বিশেষ শক্তিও নিশ্চয়ই আছে। এই শক্তির দ্বারাই তাহার চরিত্রবৈশিষ্ট্য গঠিত হয়। যদি এই নিয়ামক শক্তির কল্যাণকর দিকটি পরিস্ফুট হয় তবেই সভ্যতা উন্নততর পথে অগ্রসর হয়, কিন্তু যদি এই শক্তি বিপথগামী হয় তবে সভ্যতার অবক্ষয় ও পরিশেষে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। ঐ পরাজয় আসে, তখনই, যখন কোন জাতি মনুষ্যত্বধর্ম বিসর্জন দিয়া রাষ্ট্রীয় তথা ব্যক্তির স্বার্থ-সাধনকেই মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করে। আর এই পরাজয়ের অনিবার্য ফল বিনষ্টি। য়ুরোপীয় সভ্যতা আজ মানবধর্মকে পদদলিত করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়াছে এবং এইভাবেই নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের ধ্বংসের বীজ বপন করিতেছে।

[২] সেইখানে তাহার একাগ্র ·····দণ্ডায়মান হয়। (অনু ৪)

উপরি-উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। য়ুরোপের রাষ্ট্রচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণে লেখক এই উক্তিটি করিয়াছেন।

প্রত্যেক সভ্যতার কেন্দ্রেই একটি মূল শক্তি থাকে, তাহাই উহাকে চালনা করিয়া থাকে। এই শক্তির অভ্যুদয় এবং পরাজয়ের উপরই সভ্যতার উন্নতি এবং ধ্বংস নির্ভরশীল। য়ুরোপীয় সভ্যতার ক্ষেত্রেও আমরা তাহাই দেখি। য়ুরোপ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া—এই তিনটি মহাদেশেই এই সভ্যতা বিস্তৃত; নানা দেশ ও জাতির সমবায়ে উহা গঠিত। স্বভাবতঃই অন্য সকল বিষয়ে দেশ ও জাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে য়ুরোপীয় সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, কেবল একটি বিষয়েই তাহার ঐক্য বিদ্যমান, তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ। য়ুরোপের সকল দেশেই জনসাধারণের মধ্যে চিন্তা ও বিশ্বাসের পার্থক্য আছে, কিন্তু নিজেদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যেমন করিয়া হউক রক্ষা ও পোষণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে কোনও মতবিরোধ নাই। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগিলেই জনসাধারণ প্রবল শক্তির একাগ্রতায় এক হয়, সমস্ত মতবিভেদ ভুলিয়া যায়। নিজেদের দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার, বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ইত্যাদি সম্পর্কে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মতের প্রভেদ আছে, কিন্তু

সাম্রাজ্য শাসন ও শোষণ সম্বন্ধে তাহারা একমত। উপনিবেশগুলির জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর, অমানুষিক অত্যাচার সমর্থন করিতে তাহাদের বিবেক পীড়িত হয় না।

[৩] ইতিহাসের কোন্ গূঢ়......ধ্বংস অদূরবর্তী হয়। (অনু. ৫)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। য়ুরোপীয় সভ্যতার উদগ্র রাষ্ট্রীয় স্বার্থচেতনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যটি করিয়াছেন।

প্রত্যেক দেশের সভ্যতার মূলেই একটি কেন্দ্রীয় ভাব থাকে, তাহার শক্তিই উহাকে পরিচালিত করিয়া থাকে। য়ুরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-চেতনা। য়ুরোপীয় দেশগুলির বহুবিধ বিভেদ ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও ঐ ঐক্যতন্ত্র বিরাজিত। অতীতে ভারতবর্ষ বর্ণাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিল। এইভাবে একটি দেশের সভ্যতা যে ভাববিশেষকে অবলম্বন করে, তাহার মূলে ইতিহাসের কোন্ গূঢ় নিয়ম সক্রিয় থাকে তাহা নিরূপণ করা কঠিন। কিন্তু এই সভ্যতার ভাব জাতিধর্ম অপেক্ষাও উচ্চতর, সর্বজনীন। ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে শুভময়তা-প্রসূত কল্যাণধর্ম আছে। জাতিধর্ম যখন তাহার সংকীর্ণতায় উহাকে আঘাত করে, তখন ধ্বংস আসন্ন হয়। ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রম ধর্ম যখন ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়া মানব জাতির সেই সার্বভৌম ধর্মকে আঘাত করিয়াছিল, তখন ব্রাহ্মণ তাহার ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইল, ধর্ম দেশের ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। য়ুরোপীয় রাষ্ট্র-চেতনাও মিথ্যাচারে, অন্যায় অবিচারে, নিষ্ঠুরতায় উচ্চতর মানব-ধর্মকে আঘাত করিতেছে, তাই সে সভ্যতায় সর্বনাশের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

[৪] সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে......অন্তঃকরণের মধ্যে নাই।
(অনু. ১৬) [ক. বি. ১৯৬৫ ; বর্ধ বি. ১৯৬৫]

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। য়ুরোপীয় ন্যাশনাল মহত্ত্বের প্রতি অন্ধমোহের আকর্ষণে ভারতীয় জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্টতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য উক্তিটি করিয়াছেন।

'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায়, দেশে কোন কালে ছিল না। আধুনিক যুগে য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রসাদে আমরা ন্যাশনাল মহত্ত্বকে অতিমাত্রায় মূল্য দিতে শিখিয়াছি। ন্যাশনাল মহত্ত্বের অর্থ হইল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সম্বন্ধে উদগ্র চেতনা, রাষ্ট্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রবাসীদের সর্বপ্রকার মিথ্যাচার, সত্যভঙ্গ এবং প্রবঞ্চনায় প্রশ্রয়দানের মনোবৃত্তি। মানুষের ধ্রুব ন্যায়াদর্শ, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা—

সকল কিছুর উপর ছলে বলে কৌশলে নিজের রাষ্ট্রের স্বার্থসাধন—ন্যাশনাল মহত্বের এই আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের জীবনাচরণে, চিন্তায়, ইতিহাসে, ধর্মে, সমাজে, কোথায়ও এই য়ুরোপীয় রাষ্ট্রাদর্শ গৃহীত হয় নাই, নেশন গঠনের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই। ভারতীয় সভ্যতার প্রাণসত্তা এবং তাহার ঐতিহ্য য়ুরোপীয় রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের ধ্যানধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। য়ুরোপ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা আত্মিক মুক্তিকে সেই স্থান দিই. আত্মার স্বাধীনতা ব্যতীত অন্য স্বাধীনতার মহিমা আমাদের স্বীকার্য নয়।

[৫] নেশনই যে সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, সে কথার চরম পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি তাহার চরিত্রের আদর্শ উচ্চতম নহে। তাহা অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ।

(অনু. ১৮) [বর্ধ. বি. ১৯৬৪]

আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

উদগ্র রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-চেতনা-সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কবি এই সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃত সভ্যতার মূল আশ্রয় যে মানবতা-ধর্ম-বোধ, পাশ্চাত্য সভ্যতায় তাহার একান্ত অভাব। ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ একটি জাতির নগ্ন আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপরতা তথা-কথিত nationalism এর মূল উপাদান। স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। কাজেই বিরোধ মূলক রাষ্ট্রতন্ত্রে মিথ্যাচরণ, সত্যভঙ্গ, প্রবঞ্চনা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। উপনিবেশগুলির জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর ও অমানুষিক অত্যাচার হইতে বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই নেশন-কেন্দ্রিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় নয়।

[৬] আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। (অনু. ২১) [বর্ধ. বি. ১৯৬৯]

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ

উদগ্র রাষ্ট্রীয় স্বার্থ চেতনা-সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত প্রাচ্য-সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা-প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যটি করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য নেশন-কেন্দ্রিক সভ্যতায় মূলে আছে ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ

একটি জাতির আত্মম্ভরিতা তথা স্বার্থপরতা। তাই মিথ্যাচার তথা অত্যাচারে অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার তাহার ধর্ম।

কিন্তু যে কেন্দ্রীয় শক্তি ভারতীয় সভ্যতার নিয়ামক তাহা আত্মার মুক্তি সাধনা। ব্রহ্মবাদী ভারত সব কার্য ব্রহ্মে সমর্পণ করেন। তাই "অহংকার" নয়, "অহম্ মুক্তি" তাহার জীবনের ধর্ম। এই মানবতা-বোধ দীর্ঘদিনের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারত-আত্মাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে আমাদের মধ্যে তথাকথিত রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-চেতনা দেখা দিলেও ভারতের চিত্তে তাহার স্থায়ী প্রভাব নাই।

॥ প্রশ্নোত্তর ॥

১। 'প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে, তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, যাহা মানব সাধারণের।'

—এই উক্তিটির পটভূমিকায় পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া কোন্‌টির সহিত মানব-সাধারণের ধর্মের অধিকতর সঙ্গতি আছে, নির্দেশ কর।

অথবা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার গতিপ্রকৃতির মূল পার্থক্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি তাঁহার প্রবন্ধ অনুসরণ করিয়া ব্যক্ত কর। [ক. বি পুরাতন সিলেবাস, ১৯৬৫]

অথবা, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সুপরিস্ফুট কর। [বর্ধঃ বিশ্বঃ ১৯৭১]

উত্তর: প্রত্যেক জাতির সভ্যতার একটি বিশেষ ভাব বা ধর্ম আছে। উহা আকার-প্রকারহীন হইতে পারে না। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতারও অবলম্বন একটি বিশেষ ধর্ম। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি হইল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও চেতনা। বিভিন্ন চিন্তা, নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে য়ুরোপীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু রাষ্ট্রগত স্বার্থবোধে তাহারা এক। ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি য়ুরোপীয় জাতিগুলির ধর্মই হইল প্রবল জাতীয়তাবোধ। এই সকল

দেশের অধিবাসীদের মতগত পার্থক্য যতই থাকুক, নিজেদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই।

ভারতবর্ষের ধর্ম, হিন্দুসভ্যতার আদর্শ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। পাশ্চাত্যসুলভ সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থপরতা আমাদের জীবনপ্রত্যয়ে, ইতিহাসে, ধর্মে, সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনে কোনও দিন ছিল না। য়ুরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেওয়া হয়, আমরা আত্মার মুক্তিকে আমাদের সমস্ত জীবনাচরণে সেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ব্যতীত অন্য কোনও স্বাধীনতার মহিমা আমরা স্বীকার করি নাই। সমস্ত কর্ম ঈশ্বরকে সমর্পণ করিয়া আত্মার মুক্তি-সাধনাই আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্যের আদর্শ।

আমরা ইতিহাসের সাক্ষ্যেই জানি, জাতিধর্মের অতীত একটি সর্বজনীন মানব-সাধারণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে। প্রত্যেক সভ্যতা যে বিশেষ মূলভাবের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাকে ঐ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। জাতিধর্ম যদি উদার ও ব্যাপক না হয়, যদি তাহা সার্বভৌম মানবধর্মকে পীড়িত, লাঞ্ছিত করিয়া বর্ধিত হয়, তবে তাহার আপাত উন্নতিতেই সর্বনাশের চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠে। জাতিধর্ম সেই উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিলে সংকট অনিবার্য হয়। এক সময়ে ভারতবর্ষের আর্যসভ্যতা আত্মরক্ষার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণ শূদ্রের দুস্তর ব্যবধান বর্ণাশ্রম ধর্মের উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল। বর্ণাশ্রম নিজের গণ্ডীকে রক্ষার জন্য তৎপর হইল, কিন্তু উচ্চতর ধর্মের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিল না। মনুষ্যত্বের চর্চা হইতে বর্ণাশ্রম যখন শূদ্রকে বঞ্চিত করিল, তখন ব্রাহ্মণসমাজও নিজের জ্ঞানধর্ম লইয়া আর পূর্বের মত অগ্রসর হইতে পারিল না, শূদ্রোচিত সংস্কারে, অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। এইভাবে বর্ণাশ্রম ধর্মের সংকীর্ণতা নিত্য-ধর্মকে নানাস্থানে খর্ব করিয়াছিল বলিয়াই উহা কলুষিত ও বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল।

অন্যদিকে য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ক্রমাগত উদগ্র ও প্রবল হইয়া উচ্চতর ধর্মের সীমাকে লঙ্ঘন করিতেছে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নামে সমস্ত রকমের মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, অন্যায় অবিচার, ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা প্রশ্রয় পাইতেছে; ধ্রুব ধর্মের উপর এই আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় য়ুরোপীয় জাতিধর্মের

সংকট আমাদের নিকট স্পষ্ট। তাহার আপাত উন্নতি তাহার স্থায়িত্ব অথবা শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন নয়।

সুতরাং উচ্চতর মানবধর্মের পটভূমিকায় বিচার করিলে প্রাচ্য সভ্যতার সহিতই উহার অধিকতর সঙ্গতি আছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। রাষ্ট্রনীতির মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য অর্জন করিতে পারে, কিন্তু আমরা বাস্তবক্ষেত্রে দেখিতেছি যে য়ুরোপীয় জাতীয়তাবাদ সে পথে অগ্রসর হয় নাই, তাহার চরিত্র-আদর্শ উচ্চতম নয়। তাহা অন্যায়, অবিচার ও মিথ্যায় পূর্ণ এবং তাহার সমগ্র প্রকৃতির মধ্যেই একটি অমানুষিক নিষ্ঠুরতা আছে। বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ অথবা আত্মার মুক্তির সাধনার আদর্শে এখন আমাদের সমাজ সজীব নাই বলিয়াই আমাদের হতাশ হইলে চলিবে না; উচ্চতর মানবধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তাহার শক্তি লুপ্ত হইবার নহে। নিজেদের অটল সংকল্পের ব্রত উদ্‌যাপনেই আমরা তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি।

২। 'আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি।'

—উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

অথবা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার গতি-প্রকৃতির মূল পার্থক্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি তাঁহার প্রবন্ধ অনুসরণ করিয়া ব্যক্ত কর। [ব. বি. (পুরাতন কোর্স), ১৯৬৫ ।

অথবা, "সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি য়ুরোপীয় ছাঁচে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।" এই মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে মৌলিক পার্থক্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন তোমার নিজের কথায় তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

[বর্ধ : বিশ্ব : ১৯৬৭]

উত্তর : পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় থাকে; বিশেষ কোনও ভাব বা ধর্ম অবলম্বন করিয়াই তাহা বিকশিত হইতে চেষ্টা করে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি হইল রাষ্ট্রনীতি; তাহার এই জাতীয়তাবোধ বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থচেতনাই তাহার প্রধান চালকশক্তি। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি বিভিন্ন য়ুরোপীয় দেশে জনসাধারণের মধ্যে মত-বিশ্বাস বা ধ্যান-ধারণার নানা পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু নিজেদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সমস্ত শক্তি দিয়া রক্ষা ও পোষণ করিতে হইবে, এসম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ক্ষুদ্রতম আঘাত লাগিলেই তাহারা সকল বিভেদ ভুলিয়া এক হয়। সেই স্বার্থের সংরক্ষণে সকল রকমের মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, নিষ্ঠুরতাকে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে; ইহাতে তাহাদের বিবেকবোধ কিছুমাত্র পীড়িত হয় না। ইংরেজ বাল্যকাল হইতেই জানে, তাহাদের পূর্বপুরুষেরা ব্যবসায়-বাণিজ্যে, যুদ্ধজয়ে, দেশ অধিকারে রাষ্ট্রের প্রাধান্যকে চতুর্দিকে বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থসাধনের অধিকারবোধ তাহার রক্তমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হইয়া যায়। বস্তুত রাষ্ট্র-নীতির মূলেই বিরোধের ভাবটি বর্তমান। যে ধর্মনীতি—সত্যের মর্যাদা-রক্ষা ব্যক্তিগত জীবনাচরণে পালনীয়, তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রয়োজনের অনুরোধে বর্জনীয়,—ইহাই হইতেছে য়ুরোপের সভ্যতার রাষ্ট্রতান্ত্রিক নীতি।

এই রাষ্ট্রতন্ত্র, য়ুরোপীয় ন্যাশনালিজমের আদর্শ আমাদের দেশে কোনও দিন ছিল না। য়ুরোপীয় জাতীয়তাবাদের আপাত চমকপ্রদ উন্নতিতে মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত হইয়া আমরা ইহা ভুলিতে বসিয়াছি। পাশ্চাত্য দেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরায়ণতার আদর্শ আমাদের হৃদয়ে নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ, গৃহ, জীবনাচরণের আদর্শ কিছুই নেশন গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে নাই। ভারতবর্ষ কোন দিন রাষ্ট্রীয় স্বার্থসাধনের জন্য বাণিজ্যবিস্তারে ও পররাজ্য অধিকারে উদ্যোগী ও উৎসাহী হয় নাই। ঐক্যনিরূপণ, মিলনসাধন, শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তিলাভের অবকাশ—ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য। সেই সাধনার ক্ষেত্র সমাজ—রাষ্ট্র নহে। সেইজন্য এই দেশের সভ্যতায় রাষ্ট্রীয় রাজনীতির চর্চা কোন দিন স্থান পায় নাই। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই রাজনৈতিক উন্নতির ভিত্তি। আর পরের সহিত আপনার সম্বন্ধ বন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে কল্যাণমূলক সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টাই হইল ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। চিন্তায়, কর্মে, ধ্যানধারণায় উহারই প্রতিফলন

ভারতবর্ষের সভ্যতার মর্মকথা। যুগে যুগে যে সকল সত্যসাধক ঋষি কবি মনীষী বহু দুর্যোগের অন্ধকারেও, বিদেশী রাষ্ট্রের আক্রমণ-লুণ্ঠন ও অত্যাচারের মাঝখানে ভারতীয় সভ্যতার প্রদীপকে নিজেদের অন্তরে অনির্বাণ রাখিয়াছিলেন তাঁহারা এই সামাজিক জীবনের ধর্মাচরণকেই জীবনের আদর্শরূপে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

সামাজিক মহত্ত্বে মানুষ মহিমা অর্জন করিতে পারে। রাষ্ট্রনৈতিক মহত্বেও হয়ত পাবে; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রীয় চেতনা উচ্চতর ধর্মের মর্যাদাকেই লঙ্ঘন করিতেছে। সুতরাং য়ুরোপীয় ছাঁচে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রগতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য ভাবিলে আমরা বিভ্রান্ত হইব সন্দেহ নাই।

৩। "ইহাকে যদি ঘরে ঘরে সঞ্জীবিত করিতে পারি তবে মউজর বন্দুক ও দমদম বুলেটের সাহায্যে বড় হইতে হইবে না।" 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রবন্ধের এই উক্তিতে রবীন্দ্রনাথ কাহাকে সঞ্জীবিত করিবার কথা বলিয়াছেন? এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে য়ুরোপীয় ন্যাশনাল আদর্শের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

[বর্ধ: বিশ্ব: ১৯৬৬]

উত্তর: বিশ্ব-প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ উদগ্র রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-চেতনা সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে অনৈক্য তথা বিরোধের কণ্টক-ক্ষত লক্ষ্য করিয়াছেন। যে ধর্মনীতি তথা মানব-ধর্ম সভ্যতার আশ্রয়স্থল তথা শক্তি, পশ্চিম রাষ্ট্রতন্ত্রে সেই ধর্মকে লঙ্ঘন করিয়া মিথ্যাচার তথা অত্যাচারের মাধ্যমে তাহাদের প্রাধান্য বজায় রাখিতে চাহিতেছে। কৃত্রিম ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ তথা-কথিত জাতীয়তাবোধ মানবতার মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে। ইহার অনিবার্য পরিণতি সর্বগ্রাসী অশান্তির দাবানল।

য়ুরোপীয় ন্যাশনালিজমের চমকপ্রদ উন্নতিতে প্রাচ্য দেশ কিছুটা মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত। ভাবুক কবি বলিতেছেন, তাহার মূল কারণ ভারতবর্ষের সভ্যতার মূলে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের সমবায়ে যে সমাজ, যে সমাজে আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয় না,—সেই সমাজ-জীবন মৃতপ্রায়।

বর্ণাশ্রম ধর্মের সংকীর্ণতা যেদিন নিত্যধর্মকে খর্ব এবং ক্ষুব্ধ করিয়াছে, সেই দিন হইতে আমাদের সভ্যতার বিশুদ্ধ মূর্তি বিকৃত ও নির্জীব হইয়া গিয়াছে। স্বভাবতঃই জাতীয় জীবনে চিন্তার দৈন্য লক্ষণীয়।

প্রাচ্য সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের জন্য যাঁহারা য়ুরোপের অনুকরণে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-চেতনা জাগরণের প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। পাশ্চাত্য সভ্যতাব উপাদান হিসাবে অনেক মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু নিবপরাধের রক্তে পৃথিবী কলুষিত হইতেছে। সবলের সর্বগ্রাসী অত্যাচাবে দুর্বলেব হাহাকার আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করিতেছে। প্রেমিক কবির তাই মনে হয়, এই সভ্যতার অনুকরণ পথের নামে অপথে যাইবার অপপ্রয়াস মাত্র।

বিশ্বকবি প্রাচীন ভারতবর্ষের মানবতা-বোধকে সঞ্জীবিত করিবার কথা বলিয়াছেন। এই ঐক্য-ধর্মী বোধ, মানুষকে মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করে না, মানুষে মানুষে ব্যবহারে সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয়। এই মানবতা-বোধ তথা প্রাচ্য সভ্যতার মূলকথা অহংকার নয়, অহম্ মুক্তি।

ভারতবর্ষের ইতিহাস

॥ সার-সংক্ষেপ ॥

সকল দেশের ইতিহাস সমান হইতে পারে না। য়ুরোপীয় ইতিহাস ও ভারতের ইতিহাসের মধ্যে একটা জাতিগত পার্থক্য লক্ষণীয়। য়ুরোপের ইতিহাস মূলত রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, পলিটিক্যাল ইতিহাস। রাজবংশের কাহিনী, জয়-পরাজয়ের বর্ণনা, উত্থান-পতনের কাহিনী লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে সে ইতিহাস। এই হিসাবে ভারতের ইতিহাস প্রায় তুচ্ছ। কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের জীবনীতে যেমন ধনকুবের রথচাইল্ডের বাণিজ্যিক কর্মপ্রচেষ্টাময় জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রত্যাশা করা অসঙ্গত, তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে য়ুরোপীয় সভ্যতাসুলভ রাষ্ট্রীয় উপাদান অনুসন্ধান যুক্তিসঙ্গত নয়।

প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপনই ভারতবর্ষের চিরকালীন জীবনসাধনা, এই দেশের প্রধান সার্থকতা। ভারতের ঐক্যসাধনাই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্র-গৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়া রাখিয়াছে, কারণ বিরোধই হইল রাষ্ট্রীয় গৌরবের ভিত্তি। জাতিবৈরতায় য়ুরোপ রাজনীতির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, কিন্তু নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে সে অক্ষম। ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতির সভ্যতার উপকরণ স্বীকার এবং গ্রহণ করিয়া স্বকীয় ঐক্যের মূলভাবের শৃঙ্খলায় তাহাদের সকল বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যকে সমন্বিত করিয়াছে। য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া বা তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া নিজেকে ও সভ্যতাকে রক্ষা করে। যদি ধর্মকেই মানবসভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে ভারতবর্ষের সামঞ্জস্যের পদ্ধতিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

পরকে আপন করিয়া তাহার সকল উপাদানের মধ্যে নিজের আধ্যাত্মিকতা প্রকাশিত করিবার প্রতিভা ভারতবর্ষের আছে। এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলা-স্থাপন ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায়ই শুধু নয়, তাহার ধর্মনীতিতেও অভিব্যক্ত। পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ বিভিন্নকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজমান; তাহার ইতিহাসে উদ্ঘাটিত সেই চিরন্তন ভাবটিকে আমরা যখন অনুভব করিব, তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ দূর হইবে।

॥ বক্তব্য সংকেত ॥

[১] সকল দেশের ইতিহাস সমান হইতে পারে না, তাই য়ুরোপ ও ভারতের ইতিহাসে পার্থক্য আছে। ভারতের ইতিহাসে আছে ভারতের মর্মবাণী।

[২] য়ুরোপ রাষ্ট্রগৌরবকেই সকলের উপর স্থান দিয়াছে। য়ুরোপের লক্ষ্য পলিটিক্যাল উন্নতি, ভারতের লক্ষ্য ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি।

[৩] য়ুরোপ পরকে উৎসাদন করিয়া নিজের সমাজকে নিরাপদে রাখিতে চাহে ; ভারতবর্ষ চাহে পরকে আপন করিতে। পরকে আপন করার প্রতিভা ভারতের আছে।

[৪] ভারতবর্ষের ইতিহাস বিভিন্নকে, বহুকে, নানাকে এক করিবার ইতিহাস।

॥ রচনা-পরিচিতি ও রসগ্রাহী সমালোচনা ॥

'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধটি ১৩০৯ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের মজুমদার লাইব্রেরির সংশ্লিষ্ট 'আলোচনা সমিতি'র সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত এবং নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনে (১৩০৯) ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ; পরে তাঁহার 'গদ্যগ্রন্থাবলী'র দ্বাদশ ভাগ 'স্বদেশ'এ (১৩০৮-১৩১৫) সংকলিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই ভারতবর্ষের সত্যকারের শক্তির উৎস-সন্ধানে মনীষীরা ব্যাকুল হইয়াছিলেন। বিদেশী ভাবধারার সহিত ভারতের সংঘাত যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল, ততই স্বদেশের ঐতিহ্যের ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ পরিচয়লাভ করিয়া তাহাতেই আশ্রয়লাভ করিবার আকুলতা তাঁহাদের মানসে জাগ্রত হইয়াছিল। এই ভাবগত আন্দোলনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য প্রবন্ধটি রচিত হয়।

'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভারতের জীবন-সাধনার ঐতিহাসিক পরিচিতি নির্ণয়ে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক উত্থান-পতনের রাজনৈতিক ইতিহাসের পদ্ধতি অবলম্বনের যৌক্তিকতা অস্বীকার করিয়াছেন। জগতে প্রত্যেক জাতিরই একটি নিজস্ব সার্থকতা আছে, তাহাদের ইতিহাসের মধ্যে উহার যথাযথ স্বরূপ খুঁজিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সার্থকতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ভারতবর্ষ চিরদিনই প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া, বহুর মধ্যে এককে অন্তরঙ্গরূপে উপলব্ধি করা এবং বাহিরের যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা ভারতবর্ষের সাধনা। ভারতবর্ষের উদার মানসিকতায় কবির মন ছিল চিরসঞ্জীবিত, রাজনৈতিক কলকোলাহলের মাঝখানেও তাঁহার সেই প্রজ্ঞাদৃষ্টি ছিল স্থির, অকম্পিত। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধটির প্রতিটি অংশেই তাহার নিদর্শন মেলে। অপ্রমত্ত শুভবুদ্ধিতেই তিনি য়ুরোপীয় সভ্যতার বিরোধমূলক দিকটিকে নির্দেশ করিয়াছেন, জাতির গৌরবের অন্ধ উচ্ছ্বাসে নয়। কবির গভীর উপলব্ধি-সঞ্জাত এই প্রবন্ধটির সংহত এবং স্বচ্ছ রচনাশৈলীতে তাঁহার সেই সত্যদৃষ্টির নির্মলতা উদ্ভাসিত।

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

অনু ১-৩ : রথচাইল্ড—একটি ইহুদী পরিবারের নাম, যাহা পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যিক কর্মপ্রচেষ্টা ও বিপুল ঐশ্বর্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ফ্রাংকফুর্টে এই পরিবারের আদিনিবাস ছিল। এই বংশের অন্যতম পূর্বপুরুষ Mayer Anselm (১৭৪৪-১৮১২) মহাজনী ব্যবসায়ে বিত্তবান হন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র Nathan Mayer (১৭৭৭-১৮৩৬) ইংলণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত হন ও তাঁহার সময় হইতেই রথচাইল্ড্ পরিবার ক্রমাগত সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি অর্জন করিতে থাকে।

খ্রীষ্ট—যীশুখ্রীষ্ট জুডিয়ার বেথলহেম-এ এক দরিদ্র পরিবারে, দারিদ্র্যের পরিবেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রীয় দফ্তর—রাষ্ট্র সম্পর্কীয় নথিপত্র যেখানে সংরক্ষিত হয়।

রাজবংশমালা—রাজন্যবর্গের বংশতালিকা।

যেখানে পলিটিক্স্ নাই সেখানে আবার হিস্ট্রী কিসের—য়ুরোপীয় ইতিহাস মূলত রাষ্ট্রশক্তির উত্থান-পতনের রাজনৈতিক ইতিহাস। ইহাকেই যাহারা ইতিহাসের একমাত্র চরিত্রলক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা

ভারতবর্ষে সেই রাজনৈতিক ঘটনাধারা না দেখিয়া এদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন। **প্রাজ্ঞ**—যাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে।

অনু ৪-৯ঃ এই এককে……করিয়াছে—বহুর মধ্যে এককে অনুভব করা, বিভেদের মধ্যে মিলনকে সম্ভব করিয়া তোলা এবং সকলের মধ্যে ঐক্যভাবের অনুভূতি সঞ্চারিত করিয়া দেওয়াই ভারতীয় কৃষ্টির মুখ্য অবদান; এইজন্যই ভারত কোনদিনই রাষ্ট্রগত প্রতিষ্ঠালাভে আগ্রহী হয় নাই।

রাষ্ট্রগৌরবের মূলে……পারে না—স্বীয় রাষ্ট্রগত স্বার্থপরতা এবং পর-রাষ্ট্রের উপর বিদ্বেষপরায়ণতাই রাষ্ট্রগৌরবের মূলে কাজ করে। পররাষ্ট্রের প্রতি শত্রুভাব ও বিদ্বেষভাব ভিন্ন এই রাষ্ট্রমর্যাদাবোধ সম্ভব নহে। পররাষ্ট্র বলপূর্বক দখল করার মধ্যেও এই রাষ্ট্রগৌরব বর্তমান।

পরের বিরুদ্ধে……উন্নতির ভিত্তি—জগতে কোন দেশ রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির উপাসক আবার কোন দেশ ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির উপাসক। রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতি এবং ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিলাভের পথ এক হইতে পারে না; বরং বলা যায় একটি অপরটির বিপরীতমুখী। কারণ, কোন দেশের যে কোনও উপায়ে স্বার্থসাধনের উপরই রাষ্ট্রীয় উন্নতি নির্ভরশীল; পক্ষান্তরে ধর্মনৈতিক উন্নতি সাধনের পথে স্বার্থসাধনের ব্যাপার নাই। পরকে আপন করা, পরের স্বার্থে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া—ইহাই ধর্মনীতি এবং সমাজের সংকীর্ণ শ্রেণীগত বৈষম্যকে অস্বীকার করিয়া, অনৈক্যকে দূর করিয়া ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সুন্দর সুস্থ জীবনযাপন করাই সমাজনীতি। য়ুরোপ রাষ্ট্রীয় উন্নতির প্রয়াসী, পক্ষান্তরে ভারত ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির অভিলাষী।

য়ুরোপীয় …..করিয়া রাখিয়াছে—য়ুরোপীয়রা যে ঐক্য সাধনা করে, তাহার মধ্যে আন্তরিকতার স্থান নাই। কারণ ঐ ঐক্যসাধনার একমাত্র লক্ষ্য রাষ্ট্রীয় স্বার্থসাধন। ইহাকে ঐক্য না বলিয়া বলা যায় স্বার্থসাধনকল্পে ঐক্যের মিথ্যা আবরণ। তাই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের খাতিরে অপর জাতির রাষ্ট্রীয় অধিকার হরণে তাহাদের যে ঐক্য লক্ষিত হয় তাহা স্থায়ী রূপ পায় না। স্বার্থের সংঘাত ঘটিলেই এই সকল ঐক্যের আবরণ খসিয়া পড়ে। এইজন্য সেখানে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, রাজায়-প্রজায়, ধনী-দরিদ্রে বিরোধ ও সংঘাত লাগিয়াই আছে।

বিধাতা ভারতবর্ষের……আসিয়াছে—প্রাচীনকাল হইতেই বিদেশ নানা জাতি ভারতভূমিতে আসিয়াছে। ফলে নানা দেশ ও জাতির কাছে

ভারত যে সংস্কৃতি ও সভ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহারই মিলিত রূপ এই ভারতীয় সভ্যতা। অপরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির এই সমন্বয় সাধনের ফলেই ভারত সর্বোত্তম সভ্যতার পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে।

পর বলিয়া……স্বীকার করিয়াছে—পাঠান, মোগল, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি নানাজাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছে। এই বৈদেশিক জাতিসমূহের সভ্যতা সংস্কৃতিকে ভারত অবজ্ঞা করে নাই। যাহার যেটুকু গ্রহণীয় তাহাকে মর্যাদার সহিত গ্রহণ করিয়াছে।

এই গ্রহণ……ভাবটি ভারতবর্ষের—ভারতবর্ষ নানাজাতির নানা সংস্কৃতি-সম্পদকে সাদরে বরণ করিয়াছে, কিন্তু পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সু-বিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দিয়াছে। বহুর মধ্যে এই যে সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা ইহার উৎসমূলে আছে ভারতীয় ঐক্যসাধনা এবং তাহার সামঞ্জস্যবিধায়িনী শক্তি।

য়ুরোপ পরকে……পর্যন্ত পাইতেছি—য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া, উচ্ছেদ করিয়া আপদমুক্ত হইতে চায়। আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান, পরবর্তীকালে আমদানীকৃত নিগ্রো আজ নিষ্পেষিত; অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী শ্বেতজাতি কর্তৃক প্রায় নিশ্চিহ্ন। দক্ষিণ আফ্রিকার কাফ্রিরা আজ পর্যুদস্ত। এইভাবে য়ুরোপীয়রা নানা দেশে যাইয়া সেখানকার আদিম অধিবাসী-দিগকে বিতাড়িত করিয়া নিজেরা পরমানন্দে বসবাস করিতেছে এবং নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির জয় ঘোষণা করিতেছে।

আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, কেপ-কলনিতে তাহার পরিচয় আমরা আজ পর্যন্ত পাইতেছি—য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া নিজের সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায়, এখানে তাহারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ান ও নিগ্রোদের নির্যাতিত করিয়া য়ুরোপীয়রা নিজেদের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা ছিল মূলতঃ অস্ট্রালয়েড শ্রেণীভুক্ত। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম ড্যাম্পিয়ারের অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাংশ পরিদর্শনের পর হইতে য়ুরোপীয়রা এদেশে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে; তাহাদের অত্যাচারের ফলে এখানকার আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায়। নিউজীল্যাণ্ড প্রশান্ত মহাসাগরে

অবস্থিত দ্বীপসমষ্টি। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপীয় ধর্মপ্রচারকেরা এখানে অবতরণ করে; তাহার পর হইতেই এখানকার আদিম অধিবাসীদের উৎসাদন পর্ব শুরু হয়। মাওরি যুদ্ধে (১৮৬১-১৮৭১) শ্বেতাঙ্গরা নিউজীল্যাণ্ডের অন্যতম আদিম গোষ্ঠী মাওরি সম্প্রদায়ের বহু লোককে হত্যা করে। কেপ কলোনি আফ্রিকার একেবারে দক্ষিণাংশে অবস্থিত, সরকারীভাবে উত্তমাশা অন্তরীপের প্রদেশরূপে অভিহিত। ১৭৮৫-১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হইতে ব্রিটেন তাহার দখল পায়। ডাচ আমলেই য়ুরোপীয়দের সহিত প্রাচীন অধিবাসী বুশমেন, বুঅর, হটেনটট প্রভৃতির সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। ইংরেজ আমলেও একই ব্যাপার দেখা যায়।

যদি ধর্মের……দিতে হইবে—প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই তাহার নিজস্ব রাষ্ট্রধর্ম আছে। কাহারও এই রাষ্ট্রধর্ম হরণ করা অধর্ম। সভ্যতাব কাজ হইল অপরের ধর্মকে রক্ষা করা, তাহাকে মান্য করা, তাহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিয়া অন্য ধর্মের প্রতি মর্যাদা দান। ভারতীয় সভ্যতার ইহাই আদর্শ এবং এইজন্যই ভারতীয় সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসান যায়।

পরকে আপন……নিজস্ব—প্রতিভা—যাহাকে আমবা নব নব উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি বলি, তাহার অভাব ঘটিলে পরকে আপন কবা যায় না। পরকে আপন করিতে হইলে দুইটি শক্তির প্রয়োজন। একটি হইল অন্যের অন্তরের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লওয়া, অপরটি হইল অন্যকে সম্পূর্ণ নিজের করিয়া লইবার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা। **অন্যের সামগ্রী**—অপর জাতির নানাবিধ আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি ইত্যাদি। **পুলিন্দ**—ম্লেচ্ছ বা অনার্য জাতি-বিশেষ। **শবর**—ব্যাধজাতি।

গীতায় জ্ঞান…চেষ্টা দেখি-গীতা হিন্দুদের নৈতিক ও ধর্ম-জীবনের আদর্শ-সমন্বিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মোটামুটি চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে গীতার উৎপত্তিকালের নির্দেশ করা হয়। গীতায় জ্ঞানযোগ, ভক্তি (প্রেম) যোগ ও কর্মযোগের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং কর্মযোগ—প্রত্যেকটি পথের সামঞ্জস্য সাধনে মুক্তিলাভ সম্ভব।

পৃথিবীর সভ্য সমাজের…বিরাজ করিতেছে—বিবিধ ও বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যসাধন, শৃঙ্খলা স্থাপন, বিরোধের মধ্যে মিলনের আদর্শ বিশ্ব-সংসারে একমাত্র ভারতবর্ষেই মিলিবে। ভারতীয় সভ্যতার এই উন্নত মিলনমূলক আদর্শ পৃথিবীর কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় না।

একেকে বিশ্বের…ইহাই করিতেছে—ভারতবর্ষ চিরদিন ঐক্যের সাধনা করিয়াছে। এই ঐক্য-সাধনায় সর্বাগ্রে চাই ঐক্যানুভূতি। পৃথিবীর বহু বিচ্ছিন্ন জাতির মধ্যে আন্তর মিলনের সন্ধান করিয়া নিজ অন্তরে ইহার উপলব্ধি ঘটিলেই ঐক্যানুভূতি জন্মে। এই ঐক্যানুভূতি যখন জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের দ্বারা বাহিরে বিকাশ লাভ করে তখনই এই ঐক্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে। নানা প্রতিবন্ধকতা, নানা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও ভারত যুগ যুগান্ত এই ঐক্যের সাধনা করিয়াছে।

॥ ব্যাখ্যা ॥

[১] **সকল খেতের আবাদ এক নহে…সে-ই প্রাজ্ঞ।** (অনু. ১)
[বর্ধঃ. বিশ্ব. ১৯৭১]

উপরি-উদ্ধৃত অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। সকল দেশের ইতিহাস সমান হইবে এইরূপ আশা করা যে অযৌক্তিক, আলোচ্যমান অংশটিতে লেখক একটি উপমার সাহায্যে তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য সকল দেশেই সমান হইবে, ইহা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র এবং ভ্রান্ত ধারণা বলিয়াই বর্জনীয়। য়ুরোপীয় সভ্যতা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক, তাই সেখানকার ইতিহাসের ভিত্তি হইল রাষ্ট্রীয় রাজনীতি। ভারতবর্ষ কোনও দিন রাষ্ট্রীয় শক্তির উপাসনা করে নাই; সে প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপনকেই জীবনের শ্রেয়োধর্ম বলিয়া জানিয়াছে। স্বভাবতঃই এই অধ্যাত্মসাধনার দেশে য়ুরোপের মত রাষ্ট্রশক্তির উত্থানপতনের রাজনৈতিক ঘটনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। সেইজন্য য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসকেই ইতিহাসের একমাত্র আদর্শ ধরিয়া যাঁহারা ভারতবর্ষের কোনও ইতিহাস নাই, এইরূপ মতবাদ পোষণ করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট। সকল ক্ষেত্রে একই ফসলের চাষ সম্ভব হয় না,

ইহা বুঝিয়া যে-ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্তের প্রত্যাশা করে, তাহাকে যেমন আমরা জ্ঞানী বলিয়া জানি, তেমনি যিনি বিভিন্ন দেশের প্রাণধর্মের স্বকীয়তাব মধ্যে তাহাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করেন, তাঁহাকেই প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরূপে নির্দেশ করিতে হয়।

[২] যীশুখ্রীষ্টের হিসাবের……নগণ্য হইয়া যায়। (অনু. ২)
[ক. বি. মাধ্যমিক দ্বিতীয় ভাষা, ১৯৬৪]

উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধের অন্তর্গত। ইতিহাসের মাপকাঠি সর্বত্র এক ও অভিন্ন নহে, দেশভেদে ইহার স্বতন্ত্র রূপ ও স্বতন্ত্র প্রকৃতি; তাই ভারতীয় ইতিহাসের রূপ সম্পর্কে আমাদের নৈরাশ্য পোষণের কোনও কারণ নাই—এই বক্তব্যের সমর্থনেই লেখক বর্তমান আলোচনাটি করিয়াছেন।

জগদ্বিখ্যাত ধনকুবের রথচাইল্ডের জীবনেতিহাস বিপুল অর্থোপার্জনের সাফল্যে উজ্জ্বল; কিন্তু কেহ যদি জীবনেতিহাসের ঔজ্জ্বল্য বলিতে এই অর্থোপার্জনকেই উহার মাপকাঠি হিসাবে নির্বাচন করেন, তাহা হইলে যীশুখ্রীষ্টের জীবনেতিহাসের জমা-খরচের অঙ্ক দেখিয়া তিনি অবশ্যই নৈরাশ্য বোধ করিবেন। বৈষয়িক বুদ্ধি নহে—আধ্যাত্মিক মহত্ত্বই তাঁহার জীবনেতিহাসের উপকরণ; মানবের মুক্তিসাধনের অবদানেই সে চরিত্র মহীয়ান।

বৈষয়িক সাফল্যের মাপকাঠিতে নহে, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষেই যেমন যীশুর জীবনেতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি রাষ্ট্রগৌরবে নহে, পরন্তু আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির গৌরবে ভারতের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারত চিরদিন পররাজ্য জয় ভিন্ন দেশের সৌভাগ্য-সম্পদ হরণ সম্পর্কে উদাসীন; সেইজন্য ভারতের ইতিহাসে ধনগৌরব, পাশব শক্তির গৌরব স্থান পায় নাই। ভারতের ইতিহাসের উপকরণ তাহার জাতি-ধর্ম-সমাজের বহুবিচিত্র বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা, তাহার আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি। ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দীন কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পদে সে মহীয়ান্।

[৩] ভারতবর্ষের চিরদিনই……অধিকার করা। (অনু. ৩)
[ক. বি. দ্বিতীয় ভাষা, ১৯৬৫]

আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক

প্রবন্ধের অন্তর্গত। ভারতীয় জাতীয় জীবনের ইতিহাসে তাহার সার্থকতা এবং মহিমা কোথায় তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক উক্ত মন্তব্য করিয়াছেন।

বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষ। নানা ধর্ম, নানা শ্রেণী, নানা মতবাদের লোক এই বিশাল দেশের অধিবাসী। বহু বিচিত্র তাহাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। এই নানা মত ও পথকে এক উন্নত আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া, নানা প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করিয়া, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া, বহুর মধ্যে এককে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করাই তাহার সাধনা। মানুষের নানা বাহ্যিক বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে একটা মূলগত ঐক্য বিদ্যমান আছে ভারত তাহাকে আবিষ্কার করিয়াছে। বাহিরের এই বৈচিত্র্যকে সে আঘাত করে নাই—তাহাকে মানিয়া লইয়াছে। বিরোধের মধ্যে মিলন ঘটানো, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যভাবকে অন্তরে অনুভব করা, আপাতদৃষ্ট স্বাতন্ত্র্যকে লুপ্ত না করিয়া অন্তরতম মিলনের প্রয়াস—ইহাই ভারতবর্ষের সাধনা, তাহার ধর্ম; ধর্মের এই প্রাণশক্তিই ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদান।

[৪] য়ুরোপীয় সভ্যতা যে-ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বিরোধ-মূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে-ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলন-মূলক। [বর্ধঃ বিশ্বঃ, ১৯৬৫]

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। আলোচ্য অংশে প্রাবন্ধিক কবি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে আছে উদগ্র রাষ্ট্রীয় চেতনা। ইহার সর্বগ্রাসী শক্তি বিরোধের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া ওঠে।

ইউরোপে ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ খণ্ড খণ্ড বহু জাতির বাস। তাহাদের মধ্যে চিন্তাধারার পার্থক্য সত্ত্বেও সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রশক্তি সাধনার আদর্শে ঐক্য আছে। তাই য়ুরোপীয় সভ্যতায় বিরোধ-মূলক ঐক্য বিরাজিত।

পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিয়াছে। স্বদেশবাসী ও বহিরাগত বহু বিচিত্র মানুষের জীবনের বিভিন্ন পথকে সংহত করিয়া এবং নিজের আদর্শে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষ তাহাদের এক লক্ষ্যমুখী করিয়াছে। মিলনের মধ্যে এই সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হইয়াছে। তাই ভারতের সভ্যতা মিলন-মূলক এবং ঐক্যকেন্দ্রিক।

[৫] য়ুরোপীয় পলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে…সামঞ্জস্য দিতে পারা যায় না (অনু ৪)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। য়ুরোপীয় সভ্যতার বিরোধমূলক রাষ্ট্রতন্ত্রপরায়ণতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিটি করিয়াছেন।

য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি হইল রাষ্ট্রীয় স্বার্থচেতনা; উহার সূত্রেই য়ুরোপের বিভিন্ন দেশগুলিতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে পরীক্ষা করিলেই আমরা দেখি যে, এই ঐক্য বিরোধমূলক। পরের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, পরকে মারিয়া-কাটিয়া-খেদাইয়া পররাজ্য গ্রাস করিয়া নিজেদের রাষ্ট্রগৌরব বৃদ্ধি কবিতে হইবে, এই চেতনাতেই য়ুরোপীয়রা এক হয়। সুতরাং য়ুরোপীয় রাজনৈতিক ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধ রহিয়াছে, অন্য দেশের বিরুদ্ধে তাহা কার্যকর, সফল হইতে পারে, কিন্তু তাহার বন্ধনের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিতে পাবা যায় না। সেইজন্যই য়ুবোপীয় দেশগুলি অন্তর্বিরোধের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায় জর্জরিত। সেখানে এই রাজনৈতিক ঐক্যের বিরোধমূলক ভাব ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় বাজায়, ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদা জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে।

[৬] যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে…শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে। (অনু. ৬)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ এবং ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষার পদ্ধতির পার্থক্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করিয়াছেন।

সমাজ এবং সভ্যতায় শৃঙ্খলা রক্ষার দুইটি পদ্ধতি আছে। অপরকে, ভিন্ন দেশবাসীদের কাটিয়া-মারিয়া-খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা যাইতে পারে; অথবা, পরকে নিজের নিয়মে সংযত করিয়া কল্যাণমূলক শৃঙ্খলায় তাহাকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ কবা যাইতে পারে। বিরোধমূলক প্রথম পদ্ধতিটি য়ুরোপের। সে ইহা অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মিলনমূলক দ্বিতীয় প্রণালীটি ভারতবর্ষের। ইহার সাহায্যেই সে সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। মনুষ্যত্ব, ঔদার্য, পরার্থপরতা, কল্যাণ—এককথায় ধর্মের প্রতি যদি আমাদের হৃদয়ের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা থাকে এবং তাহাকেই যদি মানবসভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া আমরা স্থির করি, তবে ভারতবর্ষের

শৃঙ্খলাস্থাপনের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। য়ুরোপের যান্ত্রিক, কঠোর শৃঙ্খলারক্ষায় বিরোধ-জর্জরিত, কুটিল, নিষ্ঠুর রক্তাক্ত পন্থায় নয়, ভারতবর্ষের সমন্বয়ের শৃঙ্খলাস্থাপনের পদ্ধতিতেই মনুষ্যত্বের আদর্শ পূর্ণভাবে প্রতিফলিত।

[৭] পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। (অনু. ৭)
[বর্ধঃ বিশ্বঃ, ১৯৬৯]

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

আলোচ্য অংশে ভারত-প্রেমিক কবি-প্রাবন্ধিক ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রতিভা অঘটন-ঘটন পটিয়সী শক্তি। আমার সহিত অন্যের পার্থক্য স্বাভাবিক। এই পার্থক্যের প্রকৃত পরিচয় পাইলে তবে তাহার চিন্তাধারাকে সংযত করিয়া নিজের চিন্তাধারার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারা যায়। এই অঘটনকে সংঘটিত করা প্রতিভার ধর্ম। স্বীকরণ প্রবৃত্তি অহম্-মুক্ত চিত্ত ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। মুক্ত-আত্মা অবাধে অন্যের চিত্তে প্রবেশাধিকার লাভ করে এবং স্বভাবতঃই দুই বিপরীত প্রকৃতি ঐক্য-সূত্রে সমন্বিত হয়।

ইন্দ্রজাল একপ্রকার সম্মোহিনী শক্তি। এই শক্তির সাহায্যে অন্যের বুদ্ধিকে তাহার অজ্ঞাতে নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

[৮] এককে বিশ্বের…… ইহাই করিতেছে। (অনু. ৯)

আলোচ্য অংশটি কবি-প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সংকলিত। এখানে ভারতীয় চিরন্তন সাধনার প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক এই উক্তি করিয়াছেন।

চিরকাল ধরিয়া বিশাল বিচিত্র ভারতবর্ষ ঐক্য-মন্ত্রের সাধনা করিয়াছে। অধ্যাত্মসাধনার বলে ভারত বহুধা বিচ্ছিন্ন জাতিকে একসূত্রে বাঁধিতে আগ্রহী হইয়াছে। যাঁহারা এই অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহারা বিশ্বের মধ্যে এককে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের আদর্শে

অনুপ্রাণিত হইয়াই ভারতবাসী বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার মধ্যে সেই পরম একাকে উপলব্ধি করিতে উৎসুক হইয়াছে। নিখিল বিশ্বের সহিত যে মানবাত্মা অভিন্ন, এই অনুভূতিই ভারতবাসীকে প্রেরণা দান করিয়াছে।

কেবলমাত্র ঐক্যের উপলব্ধিতেই ভারতের ঐক্যের সাধনা সমাপ্ত নহে, এ সাধনা সমগ্র জীবন-চর্যায় পরিব্যাপ্ত। তাই এই সাধনায় নিয়োজিত হইয়াছে তাহার জ্ঞান, প্রেম, কর্ম। জ্ঞানের দ্বারা ঐক্যের আবিষ্কার, কর্মের মাধ্যমে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা আর প্রেমের সাহায্যে উহার স্বরূপ উপলব্ধি—ইহাই ভারতবাসীর লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে তাই জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মাধ্যমে ভারতবর্ষ যাত্রা করিয়াছে ও আদর্শের প্রচার করিয়াছে। নানা ভাগ্য বিপর্যয় ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ঐ অধ্যাত্মবাদী ঐক্যের আদর্শ ভারতবর্ষকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতেছে।

॥ প্রশ্নোত্তর ॥

১। "উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূলভাবটি ভারতবর্ষের।"—উক্তিটির মর্মার্থ পরিস্ফুট কর।

উত্তর ঃ বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষে যুগে যুগে আর্য, অনার্য, মুসলমান খৃষ্টান বহু বিচিত্র জাতি আসিয়া সমবেত হইয়াছে। ভারতবর্ষ তাহার আতিথ্যের উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সকলকেই সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। পর বলিয়া, হীন মনে করিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই; অনার্য বলিয়া কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই। শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিম ভারতবর্ষ কত ধর্ম, কত সংস্কৃতির ক্ষেত্র; এখানে কত ভাষা, কত আচার ব্যবহারের বিচিত্র সমাবেশ। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির যথার্থ সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরকাল ধরিয়াই ঐ সকল বিচিত্র উপাদানে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে, অসঙ্গত বলিয়া কোনও কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ এবং স্বীকার করিয়াছে।

কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এত গ্রহণ করিয়াও ভারতবর্ষ তাহার স্বকীয়তা রক্ষা করিয়াছে; বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতার উপকরণ-প্রাচুর্যে সে লুপ্ত কিংবা আচ্ছন্ন হয় নাই, বরং তাহার স্বকীয়তা সমন্বয়-প্রতিষ্ঠার

গৌরবে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বসভ্যতা হইতে এত উপাদান গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা, নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়—ইহাদিগকে একটি মূলভাবের দ্বারা একত্রিত করিতে হয়।

আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান কেবলমাত্র সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে নাই, ঐক্যের, মূলভাবের শৃঙ্খলায় বিসদৃশকে ও সকল বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত ও সংহত করিয়া তাহাদের এক গভীর সামঞ্জস্যে সমন্বিত করিয়াছে।

বহুর মধ্যে এককে নিঃসন্দিগ্ধরূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত করা—এই ভাবটিই হইল ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদ, ইহাই ভারতীয় সভ্যতার পরম আদর্শ এবং এখানেই ভারতবর্ষের জীবন-চর্যা তথা ইতিহাসের সার্থকতা। ইহার সাহায্যে পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া যথাবিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়ার ক্ষমতাই তাহার প্রতিভা। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে পরিপূর্ণ ভাবে আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজালকেই আমরা প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বলিয়া বুঝি। ভারতবর্ষ নির্দ্বিধায় অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। এই দেশ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতি অনার্য সম্প্রদায়দের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে প্রকাশিত করিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতার উপকরণ যেখানকারই হউক না কেন, এই সভ্যতায় তাহারা যে ভাবসূত্রে ও শৃঙ্খলায় সমন্বিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপেই ভারতবর্ষের নিজস্ব।

২। "ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কি, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে।"

পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত তুলনা করিয়া লেখক যে উত্তরটি দিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা বিচার করিয়া দেখাও।

অথবা, ভারতীয় সভ্যতার পরম আদর্শটি কী? 'ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধ হইতে এই আদর্শ ব্যাখ্যা কর।

[বর্ধ. বিশ্ব.—১৯৬৭]

অথবা, 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে'র সার্থকতা রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আলোচনা কর। [বর্ধ. বিশ্ব.—১৯৭২]

উত্তর ঃ বিশ্বসভ্যতায় পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব ভূমিকা আছে, তাহার ইতিহাসে উহাই অনুসন্ধান করা কর্তব্য। ভারতবর্ষের য়ুরোপীয় ধাঁচের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস নাই বলিয়াই আমরা তাহাকে অবজ্ঞা করতে পারি না। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন বলিয়া জানিলেও তাহার নিজস্ব বিশেষ যে মূল্য আছে, তাহাতে সে দীনতাকে তুচ্ছ কবিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী বা ভারতীয় সভ্যতার পরম আদর্শটি কী এই প্রশ্নের উত্তর আছে; রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধটিতে তাহাই তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই সার্থকতা হইল, প্রভেদ, বৈচিত্র্য, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতিভাত হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগসূত্রটির আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠা—এই ভাবটিই ভারতবর্ষের, ইহার ইতিহাসই তাহার ইতিহাস, এবং এখানেই তাহার প্রধান সার্থকতা, প্রাচ্য-সভ্যতার পরম আদর্শ।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাক্ষ্য লইলে আমরা দেখি, সকল কিছুর মধ্যে এককে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা ভারতবর্ষের স্বভাবগত বলিয়াই সে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন রহিয়াছে; কারণ রাষ্ট্রগৌরবের মূলেই বিরোধের ভাব। পরের সহিত নিজের সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। ভারতবর্ষ এই মিলনমূলক সভ্যতারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই রাজনৈতিক উন্নতির ভিত্তি এবং য়ুরোপ এই বিরোধমূলক সভ্যতাই গ্রহণ করিয়াছে। সেই কারণেই য়ুরোপের ইতিহাসে একদিকে যেমন অবিরাম অন্তর্বিরোধ, ব্যক্তিস্তে-

রাজায়-রাজায়, ধনী-দরিদ্রে বিরোধ ও বিচ্ছেদকে সর্বদা জাগ্রত দেখতে পাই, অপরদিকে তেমনি পররাজ্য আক্রমণ ও গ্রাস, জাতিবিদ্বেষ, সাম্রাজ্যবিস্তারের কূটনৈতিক চক্রান্তকে লক্ষ্য করি।

বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিয়া অপরের সম্পর্কে কেবল সহিষ্ণু নয়, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া মূলগত ঐক্যের দিকে ভারতবর্ষের সহজাত আকর্ষণ একটি ঐতিহাসিক সত্য। যুগে যুগে বহু জাতি বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি লইয়া এই 'মহামানবের সাগরতীরে' উপস্থিত হইয়াছে, কেহ ফিরিয়া যায় নাই, সকলকেই ভারতবর্ষ স্বীকার ও গ্রহণ করিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অস্পৃশ্য বলিয়া নিজের আতিথ্যের উদার, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ হইতে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই। এই সমন্বয়ের, ঐক্যের দেশ বিসদৃশকেও সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিয়া, সকল পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত এবং সংহত করিয়া তাহাকে নিজস্ব প্রতিষ্ঠায়ই ঐক্যদান করিয়াছে। এমনকি পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ, প্রভৃতি অনার্য গোষ্ঠীদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের আধ্যাত্মিকতাকে প্রকাশিত করিয়াছে।

তথাকথিত জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণতায়, বিচারহীন অন্ধ, প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাসে নয়, কল্যাণ ও সত্যবোধের গাম্ভীর্যে, স্থিরতায় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রকৃত সার্থকতাকে নির্দেশ করিয়াছেন। কবির বিশ্লেষণ তাঁহার হৃদয়ের আবেগরসসিক্ত হইয়াও সত্যের যুক্তি ও বিচারবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তাহাতে তাঁহার প্রজ্ঞাদৃষ্টিকে এমন গভীরভাবে আমরা অনুভব করি।

৩। "ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে।"

অতীত ও বর্তমান ভারতবর্ষের ইতিহাস-পাঠ হইতে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি বিচার কর। [ক. বি. মাধ্যমিক দ্বিতীয় ভাষা, ১৯৪৩]

অথবা, "ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।"

—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির আধারে ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্টতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে বিশদ করিয়া লিখ।

[ক. বি. মাধ্যমিক দ্বিতীয় ভাষা, ১৯৫১]

অথবা, ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।"—এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধে কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ?

অথবা, "পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শ-রূপে বিরাজ করিতেছে।"—এই উক্তির আলোকে "ভারতবর্ষের ইতিহাস" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

[বর্ধঃ বিশ্বঃ ১৯৭০]

উত্তরঃ যুরোপীয় সভ্যতা বহির্মুখী, বিরোধমূলক এবং বিদ্বেষ-প্রসূত; তাই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সে যে ঐক্যের সাধনা করে তাহার মধ্যে বিরোধের বীজ অঙ্কুরিত থাকে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা অন্তর্মুখী, মিলনমূলক, তাহার মধ্যে বিরোধের ভাব নাই। বহু বিচিত্র সম্প্রদায় ও জাতি ভারতের অধিবাসী। ভারতের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, বহু বিচিত্র সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে সাদৃশ্য না থাকিলেও সকলকে একটা আত্মীয়তার সম্পর্কে সে বাঁধিতে চাহিয়াছে। বলপ্রয়োগ বা আইন করিয়া এই সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নহে। তাই ভারতবর্ষ এই মিলনকে সম্ভব করিবার জন্য নিজস্ব উপায় অবলম্বন করিয়াছে। 'যাহারা এক হইবার নহে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় তাহাদিগকে পৃথক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া। পৃথককে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে। ভারতবর্ষ মিলন সাধনের এই রহস্য জানিত।' তাই ভারতবর্ষ তাহার সমাজে সমস্ত প্রতিযোগী শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিয়া ও বিভক্ত করিয়া সমাজদেহকে বিচিত্র কর্মের উপযোগী করিয়া গড়িয়াছিল। ফলে কেহই নিজের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াসী হয় নাই। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও

সম্প্রদায় প্রতিযোগিতায় নামে নাই। ভারতবর্ষেব লক্ষ্য ছিল ঐক্য, মিলন ও শক্তির মধ্যে স্থিতিলাভ ও পরিপূর্ণ মুক্তিলাভ।

প্রতিভা ছাড়া পরকে আপন করা যায় না। ভারতবর্ষ এই প্রতিভার অধিকারী। সে তাহার প্রতিভাবলে যেমন অপরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে তেমনি নিজের মধ্যে অপরকে অঙ্গীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। ভারত 'পর বলিয়া কাহাকেও দূর করে নাই। অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুই উপহাস করে নাই।' ভাবত সব কিছুকেই গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু নিজ বৈশিষ্ট্য হারায় নাই; তাহার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেয় নাই। পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ, প্রভৃতি অনার্য জাতির ভাষা, সমাজিক ক্রিয়াকলাপ, ধর্মগত অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সে গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজস্ব আধ্যাত্মিক ভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সব অনার্য জাতির ভয়ঙ্কর পূজাপদ্ধতিও নানা লৌকিক ধর্মে রূপান্তরিত হইয়া এক বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গঠনে সহায়তা করিয়াছে। অনার্য জাতির নানা পূজানুষ্ঠানেও আর্যজাতির ভাবধারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপন করিয়াছে।'

এই ঐক্যমূলক সভ্যতাই মানব সভ্যতার চরম অভিব্যক্তি। 'এই ঐক্য বিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি: গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।' 'এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই একক বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা, নানা বাধা বিপত্তি দুর্গতি সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।' এইখানেই ভারতের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা। মানবসভ্যতার এই মহান্ আদর্শের রূপকার ভারতবর্ষ।

৪। ভারতবর্ষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ পরিচয় লিখ। অথবা, রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এর শিক্ষা সরল বাংলায় বর্ণনা কর। [ক. বি. মাধ্যমিক দ্বিতীয় ভাষা, ১৯৪৩]

অথবা, ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই, এই মত খণ্ডন করিয়া

ইতিহাসের ভিতর দিয়া ভারতের চিরন্তন ভাবটি রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে অতনুব করিয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া দাও। [বর্ধঃ বিশ্বঃ—১৯৬৪]

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ শান্ত সৌম্য শুচিশুভ্র যে মহান ভারতবর্ষকে নিজে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাই তাঁহার অতুলনীয় লেখনীস্পর্শে আমাদের সম্মুখে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের যে রাষ্ট্রীয় দৈন্যকে স্মরণ করিয়া আমরা নিজেদের খর্ব মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, যে ভারতের বৈদেশিক অভিযান বা বাণিজ্য বিস্তারের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় খুঁজিয়া না পাইয়া নিজেদের নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছি—যে ভারতের পরম সার্থকতার রূপটি আমরা উপলব্ধি করি নাই, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে ভারতবর্ষের সেই প্রকৃত সার্থকতার চিত্রটি আমাদের উপহার দিয়াছেন।

কোন দেশের যাহা প্রধান সার্থকতা, তাহা লইয়াই তাহার ইতিহাস। বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে প্রত্যেক দেশেরই তাহার নিজস্ব ভূমিকা আছে। ভারতবর্ষের যুরোপীয় ধাঁচের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস নাই বলিয়াই ভারত অবজ্ঞার পাত্র নহে, ইহাই রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন বলিয়া জানিলেও বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে তাহাব গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আছে।

ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কোথায় এই প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ভারতের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে, বিভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন ও ঐক্যবিস্তারের প্রয়াসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। য়ুরোপের ঐক্য বিরোধ-মূলক, তাই য়ুরোপের বিরোধমূলক রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি ভারত উদাসীন। মিলনমূলক ধর্মনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াই ভারতের সভ্যতা প্রকাশলাভ করিয়াছে। নানা মত ও পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয় রূপে উপলব্ধি করিয়া বাহিরের পার্থক্যকে স্বীকার করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগসূত্রটি আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠা—ইহার ইতিহাসই ভারতের ইতিহাস, এখানেই তাহার সার্থকতা। ভারতের দৃষ্টি বহির্মুখী নহে—অন্তর্মুখী। তাই বৈষয়িক বুদ্ধির অতীত এক আধ্যাত্মিক লোকে সমাসীন থাকিয়া রাষ্ট্রগৌরব, দেশজয়, বাণিজ্যবিস্তার ইত্যাদি বিষয়-বুদ্ধিকে ভারত একমাত্র মর্যাদার বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। সে বুঝিয়াছে রাষ্ট্রগৌরবের মূলেই বিরোধের বীজ লুক্কায়িত থাকে। ভারত জানিয়াছে

পরের সহিত নিজের সম্বন্ধ বন্ধন, এবং নিজের বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। ভারত এই মিলনমূলক সভ্যতাকেই আশ্রয় করিয়াছে। পরকে মারিয়া কাটিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টাই য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রবণতা; তার ফলেই য়ুরোপের ইতিহাসে একদিকে যেমন অবিরাম অন্তর্বিরোধ—ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, রাজায়-রাজায়, ধনী-দরিদ্রে বিরোধ দেখিতে পাই, অপরদিকে তেমনি পররাজ্য গ্রাস, জাতিবিদ্বেষ, সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের কূট চক্রান্তকে লক্ষ্য করি।

বৈচিত্র্য এ স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিয়া অপরের মত ও চিন্তা সম্পর্কে সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, পরস্পরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করিয়া মূলগত ঐক্যকে সফল করিয়া তোলার ইতিহাসই ভারতের ইতিহাস। যুগে যুগে নানা জাতি নানা ধর্ম ও সংস্কৃতি লইয়া ভারতে আসিয়াছে, ভারত সকলকেই স্বীকার করিয়াছে, গ্রহণ করিয়াছে। তাহার সমন্বয় বুদ্ধিতে সকলকে সমবন্ধনে বাঁধিয়া বিন্যস্ত ও সংহত করিয়া নিজস্ব সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে, এমন কি পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতি অনার্য অনুন্নত জাতির সংস্কৃতিকেও সে উপেক্ষা করে নাই। তথাকথিত জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণতায় বিচারহীন উচ্ছ্বাসে নহে, কল্যাণবোধে সকলকেই আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের এই বিচিত্র সংস্কৃতি-সমন্বয়ের সাধনা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রজ্ঞাদৃষ্টির আলোকে উপলব্ধি করিয়াছেন।

৫। "শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটিতে শিক্ষা, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা'-তে সভ্যতা এবং 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এ ইতিহাসের প্রসঙ্গ আলোচিত হইলেও এই তিনটি রচনার বক্তব্য মূলত একই।" —উক্তিটির সমীচীনতা বিচার কর।

উত্তর: ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার ঐতিহ্যেই রবীন্দ্রমানস লালিত হইয়াছিল। তাঁহার দীর্ঘজীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাসে, তাঁহার কল্যাণ ও সত্যের একই প্রজ্ঞাদৃষ্টিকে আমরা প্রতিফলিত হইতে দেখি। সেইজন্যই কবির প্রবন্ধরচনার উপলক্ষ্য বা পটভূমি যাহাই হউক না কেন, তাহাদের সমস্তা পর্যালোচনায়, বিচার বিশ্লেষণে তাঁহার স্বীয় জীবনাদর্শই মূল ভাবসত্যরূপে অনুস্যূত হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে প্রেরণার

একটি মৌলিক ঐক্য লক্ষ্য করিতে পারা যায়। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল আমাদের দেশের শিক্ষার সমস্যা, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা'-র বিষয়বস্তু উভয় দেশের সভ্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' রচনাটির উপজীব্য হইল ভারতের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা। তিনটি প্রবন্ধের পার্থক্য শুধু বিষয়বস্তুর এবং প্রাসঙ্গিক সমস্যার, কিন্তু মূল দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রতিপাদ্যের দিক হইতে তাহারা এক। রবীন্দ্রনাথ কোনও বিষয়বস্তুকেই বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিতভাবে সাময়িক আন্দোলন তথা উত্তেজনার পটভূমিকায় বিচার বিশ্লেষণ করেন নাই, তাঁহার মূল্যবোধের আলোকেই উহাদের তাৎপর্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের আর্যসভ্যতার দম্ভে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে বর্জন করিবার উদগ্র উৎসাহে য়ুরোপীয় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকেই প্রতিফলিত হইতে দেখিয়াছেন, এবং শিক্ষার মৌলিক নীতি নিরূপণে ও প্রতিষ্ঠায় প্রাচীন ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিয়া মনুষ্যত্বের উদ্বোধন কামনা করিয়াছেন। কোনও বাস্তব সুবিধা বা কোন সম্মানের জন্য নয়, ঐক্য এবং কল্যাণে আত্মা যাহাতে প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার জন্যই সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি এবং বাহিরে প্রকাশিত করিতে হইবে, এবং মানুষের আত্মার, মনুষ্যত্বের প্রকাশের সেই তত্ত্বটিই আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করিতে হইবে।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রবন্ধটিতে কবি য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থচেতনার সংকীর্ণতা, মিথ্যাচার, অন্যায় অবিচারের পটভূমিকায় ভারতবর্ষের সমাজকল্যাণকেন্দ্রিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটিতে স্বার্থনির্ভর য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক সভ্যতার অসম্পূর্ণতার বিশ্লেষণই প্রাধান্য পাইয়াছে; কিন্তু তাহার সমস্ত অংশই কবির কল্যাণাদর্শটির আলোকে আমরা অনুভব করতে পারি। 'শিক্ষার মিলনে' তিনি আত্মার প্রকাশের কথা বলিয়াছেন, এখানে 'আত্মার স্বাধীনতা' উল্লেখ করিয়াছেন। ঈশ্বরের সৃষ্টির শুভময়তায় অনুপ্রাণিত হইয়া নিঃস্বার্থ কর্তব্যকর্ম পালনেই জীবনের চরম চরিতার্থতা, আত্মার মুক্তি তাহাতেই লভ্য। সুতরাং 'শিক্ষার মিলন' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা'র বক্তব্য বিষয় মূলতঃ এক।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এ ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ

করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, পরকে কাটিয়া মারিয়া খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করার য়ুরোপীয় পদ্ধতি নয়, পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সু-বিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়ার ভারতবর্ষীয় প্রণালীই মানব ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করে, ভারতবর্ষের ইতিহাস ইহারই সাক্ষ্য যুগ-যুগান্তরে বহন করিতেছে। এই প্রবন্ধটিতে আলোচিত ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের মূলেও রবীন্দ্রনাথের সেই কল্যাণের আদর্শ ই রহিয়াছে। সুতরাং 'শিক্ষার মিলন', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' এবং 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' এই তিনটি প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করিলে আমাদের মনে হয় ইহাদের বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গে পার্থক্য যতই থাকুক, প্রতিপাদ্য মূলতঃ একই, তিনটিতেই রবীন্দ্রনাথ কল্যাণের একই আদর্শ বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

নববর্ষ

॥ সার-সংক্ষেপ ॥

কর্মের উত্তেজনাকেই য়ুরোপ নিজের জীবনাচরণের একমাত্র ধর্ম বলিয়া জানিয়াছে। হিমালয় বা মেরুপ্রান্তরে কত দুর্গম স্থানে রোমাঞ্চকর অভিযানে, নিরীহ পশুপক্ষী-শিকারে, আফ্রিকা-এশিয়ার দুর্বল জাতিদের উপর নির্মম অত্যাচারে য়ুরোপীয়দের কর্মোন্মাদনা প্রকাশিত হয়। আধুনিক কালে আমরাও সেই কর্মের গৌরবে মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত হইয়াছি।

বস্তুতঃ হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করা নয়। প্রকৃতি তাহার কর্মের বিপুল আয়োজনকে গোপনে রাখিয়া এক ধ্রুবশান্তিতে ও স্তব্ধতায় পূর্ণতার সৌন্দর্যকে উদ্ঘাটিত করে। ভারতবর্ষও তাহার প্রকৃতির নিকট হইতে সেই উদার শান্তি এবং বিশাল স্তব্ধতাকে লাভ করিয়াছে, কর্মের জালে নিজেকে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ করিয়া রাখে নাই। সে ফলের আসক্তিবিহীন কর্মের মহিমা বরণ করিয়া কর্মকে সংযত রাখিয়াছে। হওয়াই অর্থাৎ মনুষ্যত্বধর্মে বিকাশ-লাভই এদেশের চরম লক্ষ্য, কর্ম উপলক্ষ্য মাত্র।

আমরা ইংরেজী-শিক্ষার অহংকারে মত্ত হইয়া ভারতবর্ষের শান্তিময় সনাতন জীবনাদর্শকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিতেছি, কিন্তু এমন একদিন আসিবে যখন বিপর্যয়ের মাঝখানে তাহার সেই আদর্শের ধৈর্যকঠিন, ত্যাগের কৃচ্ছ্রতাপূত শক্তিকে আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার বাহ্যিক আড়ম্বরে বিস্মিত হই; মনুষ্যত্বের উপর তাহার নিপীড়ন লক্ষ্য করি না। কিন্তু সামাজিক বিপ্লবে এই সভ্যতার অমানুষিকতার রক্তাক্ত, ভয়াবহ পরিণতি প্রকাশিত হয়। যান্ত্রিক সভ্যতার নাগপাশে মানুষ কেবল কর্মের ক্রীতদাসে পরিণত হয়, কলকারখানার ধূম্রমলিন কুৎসিত রুদ্ধশ্বাস পরিবেশে তাল পাকাইয়া থাকিতে থাকিতে, জীবনের সত্যকারের কোনও স্বাদ, স্তব্ধতার, শান্তির অমৃতস্পর্শ না পাইয়া শ্রমজীবী মানুষেরা কর্মবিরতির ক্ষণগুলিতে মদ খাইয়া প্রমোদমত্ত হইয়া নিজেদের ভুলিবার চেষ্টা করে। আর যাহারা বিত্তবান, ভোগী, তাহারা ভোগের নিত্যনূতন উত্তেজনায় ক্লান্ত হইয়া পড়ে; প্রমোদমত্ততা যে মুহূর্তে কাটিয়া যায়, সেই মুহূর্তে নিজেদের অন্তর্জীবনের শূন্যতা তাহাদের

নিকট দুর্বিষহ বলিয়া বোধ হয়। য়ুরোপ প্রবৃত্তিকে লালন করিয়া চতুর্দিকে যেভাবে মৃত্যু ও সর্বনাশের বীজ ছড়াইয়া দিতেছে, সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন হইতে হইবে। প্রভুত্ব বিস্তারের কামনার অভাব ও সন্তোষই জাতির মৃত্যুর কারণ, য়ুরোপ ইহা প্রচার করিলেও তাহাকেই আমাদের দেশের সভ্যতার মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই।

স্বার্থের তৃপ্তিবিহীন উত্তেজনা নয়, সন্তোষই ভারতবর্ষের সভ্যতার ভিত্তি। সন্তোষের বিকৃতিতে জড়তায় শৈথিল্য ঘটে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা যে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটায় তাহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু এই সকল আলোচনা ছাড়িয়া আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, সন্তোষ, সংযম, শান্তি, ক্ষমা, এ সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ। কর্মে বাসনা, সামাজিক দ্বন্দ্বসংঘাত ও প্রভুত্বের উত্তেজনা হইতে মুক্ত হইয়া ভারতবর্ষ যে পরম মুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে, য়ুরোপের রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাহার তুলনায় তুচ্ছ। ভারতবর্ষের সেই মুক্তিকে যদি অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, তবে তাহার মহত্ত্বের নিকট রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা-মদমত্ত দেশগুলিও একদিন মাথা নত করিবে।

॥ বক্তব্য-সংকেত ॥

[১] য়ুরোপ কর্মের নেশায় মত্ত। তাই ওখানে সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সবকিছুই সংঘটিত হইতেছে এবং তাহার মধ্য দিয়াই ওদেশের কর্মের গৌরব বজায় থাকিতেছে।

[২] ভারতীয় আদর্শ কর্মের মাহাত্ম্য স্বীকার করে, কিন্তু কর্মের উন্মত্ত কোলাহলকে স্বীকার করে না। ভারতীয় কর্মের আদর্শ প্রকৃতির ছাঁচে ঢালা, প্রকৃতির কাছে শেখা।

[৩] ভারতবর্ষ কর্মের ক্রীতদাস নহে। হওয়াই এখানে মূল লক্ষ্য, করা উপলক্ষ্য মাত্র।

[৪] কর্মের প্রতিযোগিতার অশান্তি নহে, আত্মগত অনুষ্ঠানের শান্তিতেই ভারতবর্ষের শক্তির উৎস।

[৫] পাশ্চাত্যদেশে কর্মের উত্তেজনা ও আয়োজন মানুষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। সেখানে উপরে সভ্যতার আয়োজন, নীচে নরমেধ যজ্ঞ।

[৬] য়ুরোপের সভ্যতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ধ্বংসের বীজ। এই

সভ্যতা আত্মঘাতী হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ইহাকে চরম আদর্শরূপে ধরিয়া ভারতবর্ষকে ছোট মনে করিবার প্রয়োজন নাই।

[৭] জিগীষার অভাব ও সন্তুষ্টি পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টিতে মৃত্যুর কারণ হইতে পারে, কিন্তু ভারতীয় মতে উহাই সভ্যতার ভিত্তি। ভারতের দৃষ্টিতে সন্তোষ, সংযম, শান্তি, ক্ষমা—সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ।

[৮] ভারতবর্ষের মহিমা হইল মুক্তির মহিমা। তবে ইহার সহিত য়ুরোপের 'ফ্রীডম্'-এর কোন মিল নাই। 'ফ্রীডম্'-এর মূলে আছে নিষ্ঠুরতা, আত্মম্ভরিতা, পরের প্রতি অবিশ্বাস। এই ফ্রীডম ভারতের লক্ষ্য নহে।

[৯] আমাদের সনাতন আদর্শ—যাহা বলিয়াছে 'ওঁ ইতি ব্রহ্ম,' 'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি,' 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান, ন বিভেতি কদাচন।'—সেই ভারতবর্ষের জয় হইবে।

।। রচনা-পরিচিতি ও রসগ্রাহী সমালোচনা ।।

১৩০৭ সালে লিখিত 'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় সভ্যতার আত্মিক সাধনার সত্যকে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই কাব্যটির প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে সরল জীবন যাপন; উপকরণ-বহুল আধুনিক সভ্যতার প্রতি কবির তীব্র বিতৃষ্ণা। প্রায়-সমসাময়িক একখানি পত্রে স্ত্রীকে লিখিতেছেন, 'আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই, আমাদের জীবন সহজ এবং সরল হোক, আমাদের চতুর্দিক প্রশান্ত এবং প্রসন্ন হোক, আমাদের অভাব অল্প, উদ্দেশ্য উচ্চ, চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কাজ আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক।' কবির অন্তরের এই আকাঙ্ক্ষা 'নৈবেদ্য'র মধ্যে রূপ লইয়াছে; কবি ভারতের এই আকাঙ্ক্ষিত দীনতার জয়োচ্চারণ করিলেন—

> 'হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন
> বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
> দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
> তাহার ঐশ্বর্য যত।'

'নৈবেদ্য' রচনার সমকালীন যুগেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন। ভারতবর্ষের নির্মল শুচির আদর্শে কয়েকজন ছেলেকে মানুষ

করিয়া তোলাই কবির প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল। নববর্ষের দিনে (১৩০৯) এই আশ্রম-বিদ্যালয়ে প্রথম নববর্ষে রবীন্দ্রনাথ 'নববর্ষ' নামক যে ভাষণটি দান করেন, তাহাতে নৈবেদ্যের মূল প্রত্যয়টি প্রকাশিত হয়। এই ভাষণে 'স্বদেশ'-এ সংকলিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা,' 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রভৃতি রচনাগুলির মত প্রতীচ্য ও প্রাচ্য সভ্যতার প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্দেশ করিয়া আমাদের চৈতন্য উদ্বোধনের জন্য প্রাচ্য সভ্যতার মহিমার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই বিদেশী শাসন, শিক্ষা, সভ্যতার সহিত ভারতবর্ষের সংঘাত যত জটিল হইয়া উঠিতেছিল, ততই নিজেদের দেশের সভ্যতার মর্মানুসন্ধানে শিক্ষিত সমাজের উৎকণ্ঠা তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। বিদেশী সভ্যতার মোহান্ধতা হইতে ধীরে ধীরে আমাদের চৈতন্য উন্মেষিত হইতেছিল। আমরা বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, ভোগবাদী য়ুরোপীয় সভ্যতার বৈষয়িক সাফল্য যতই চমকপ্রদ হউক না কেন, তাহা মানুষকে জীবনের কোনও ধ্রুব আশ্রয়ের আশ্বাস আনিয়া দিতে পারে নাই, সেই সভ্যতা পৃথিবীর একমাত্র সভ্যতা নহে, প্রাচ্যের ধর্মপ্রধান সভ্যতা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' স্বদেশীয় সভ্যতার সেই মূল্যানুসন্ধানই রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষ' প্রবন্ধটিতে সার্থকতম বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। অন্যান্য রচনার মত এইখানেও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তা ক্ষুদ্র স্বাজাত্যাভিমানের আস্ফালনে নয়, মানবজীবনের গভীরতম মূল্যবোধের ব্যাকুল অন্বেষণ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার মঙ্গলধর্মে মুক্তির সাধনাকে সর্বজনীন মানবতার আদর্শরূপেই কবি উপলব্ধি করিয়াছেন এবং ভারতীয় সভ্যতার সেই মহত্ত্বকে বজ্রকঠিন বিশ্বাসের গভীরতা ও উজ্জ্বলতায়, ধ্যানের গাম্ভীর্যে, শ্লোকের মত সংহত প্রকাশভঙ্গিতে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

অনু. ১-৪ঃ লাগাম-পরা অবস্থায়—অশ্বাদির মুখে বল্গা বা লাগাম পরাইয়া তাহাদের চালনা করা হয়, অনেক সময় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে করিতে লাগাম-পরা অবস্থায়ই তাহাদের মৃত্যু ঘটে। কর্মের লাগাম পরিয়া, অর্থাৎ তাহার গুরুভারকে অবিরাম বহন করিয়া চলিবার সময় মৃত্যু বরণ করা

য়ুরোপে গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, কর্মের উত্তেজনা সেখানে এতই তীব্র। 'To die in harness' এই ইংরেজি ইডিয়মটির বঙ্গানুবাদ করিয়া কবি-প্রাবন্ধিক ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। **এই কর্ম-নাগরদোলার ঘূর্ণিনেশা।**—উপর নীচে অর্থাৎ চক্রাকারে ঘুরিবার মত বৃহৎ দোলাকে নাগর-দোলা বলে ; তাহাতে ঘুরিতে ঘুরিতে যে স্ফূর্তি বা আমোদের উত্তেজনা হয় তাহাই ঘূর্ণিনেশা। সেইরূপ মানুষ নাগরদোলারূপ কর্মের বিরতিহীন আবর্তে আবদ্ধ হইয়া এক উত্তেজনার ঘোরে মত্ত হইয়া পড়ে। **তখন দুর্গম-হিমালয়-শিখরে প্রাণ ত্যাগ করিতে থাকে**—হিমালয়ের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে লোমশ ছাগের ন্যায় যে সকল নিরীহ প্রাণী শান্তিতে চরিয়া বেড়ায়, য়ুরোপীয় অভিযান-কারীরা কেবল অভিযানের নেশায় মত্ত হইয়াই নিষ্ঠুর উল্লাসে তাহাদের নির্বিচারে বধ করিতে থাকে। **বিশ্বস্তচিত্ত সীল এবং পেঙ্গুয়িন……রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠে**—উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে সীল এবং পেঙ্গুয়িনরা দীর্ঘকাল নির্বিরোধে এবং নিরুদ্বিগ্নচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইত, নিজেদের জীবনে সুখ অনুভব করিত। তাহাদের নিরুদ্বিগ্ন জীবনে মৃত্যু-রূপ অশান্তি আসিবে না—ইহাই ছিল তাহাদের ধারণা ; সেইজন্যই তাহাদের 'বিশ্বস্তচিত্ত' বলা হইয়াছে। য়ুরোপীয় অভিযানকারী ও শিকারীরা তাহাদেরও নিষ্কৃতি দেয় নাই ; অভিযানের উদগ্র নেশায় তাহাদের হত্যা করিয়া মেরু প্রান্তরেও শুভ্র, অকলঙ্কিত তুষারকে (নীহার) রক্তে রঞ্জিত করিয়া তাহাদের পাশব প্রবৃত্তির উন্মাদনাকে চরিতার্থ করে। **অকলঙ্ক শুভ্র……হইয়া উঠে**—প্রকৃতির নির্জনতার মধ্যে যে শান্ত সুন্দর রূপ আছে, জনহীন তুষার মরুর মধ্যে নির্বিরোধে প্রাণধারণের যে সুখটুকু আছে, শিকারীর নিষ্ঠুর মারণাস্ত্রের আঘাতে তাহা রক্তরঞ্জিত হয়। কর্মোন্মাদ মানুষ সেখানে তাহার নিষ্ঠুর সভ্যতার রক্তচিহ্ন আঁকিয়া দেয়। **কোথা হইতে বণিকের কামান……করিতে থাকে**—উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেন চীনদেশে যথেচ্ছভাবে আফিম ব্যবসায় চালাইত। জাতীয় জীবনে আফিমের নেশা ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িলে স্বভাবতঃই চীন ঐ ব্যবসায়ে বাধা দেয় ; তখন বৃটেনের সহিত চীনের যে যুদ্ধ বাধে (১৮৩৯ ৪২), ইতিহাসে তাহাই 'অহিফেন যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ। বৃটেনের বাণিজ্যিক স্বার্থশক্তি কামান অর্থাৎ সামরিক বলপ্রয়োগে চীনাদের অহিফেন সেবনে বাধ্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, নানাবিধ শিল্পকর্মে দক্ষ (শিল্পনিপুণ) প্রাচীন

সভ্যতার দেশ চীনের কণ্ঠে বণিকের কামান অহিফেনের পিণ্ডবর্ষণ করিতে থাকে। **আফ্রিকার নিভৃত……প্রাণত্যাগ করে**—আফ্রিকা নিবিড় অরণ্য এবং কৃষ্ণবর্ণের অধিবাসীদের মহাদেশ। আফ্রিকার এই কৃষ্ণবর্ণের অধিবাসীরা তাহাদের নিভৃত আরণ্যক জীবন লইয়াই সন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য জাতিদের প্রভুত্ববিস্তারের উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা তাহাদের নিজেদের জীবনের গণ্ডিতে স্বস্তিতে ও সুখে থাকিতে দেয় নাই। আফ্রিকায় সভ্যতা প্রচারের নামে আফ্রিকানদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়া তাহাদের যথেচ্ছভাবে হত্যা করিয়া পাশ্চাত্য জাতিরা সেই লালসাকে চরিতার্থ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাই কঠিন ব্যঙ্গে বলিয়াছেন, সভ্যতার বজ্রে, অর্থাৎ য়ুরোপীয় বৈষয়িক স্বার্থ-কেন্দ্রিক সভ্যতার লোভের আঘাতে অত্যাচারে আফ্রিকার নিভৃত অরণ্য-সমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব, অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের অধিবাসীদের নিভৃত আরণ্যক জীবনের নিজস্ব ধারা ছিন্নভিন্ন হয়। **তপ্ততাম্র আকাশ……জলজ্জটামণ্ডিত বিরাট মধ্যাহ্ন**—ভারতবর্ষের মধ্যাহ্ন প্রকৃতির রূপ-বৈশিষ্ট্যকে এখানে একটি রূপক কল্পনায় উদ্ঘাটিত করা হইয়াছে। এ দেশের মধ্যাহ্নের রৌদ্রোজ্জ্বল তাম্রাভ আকাশকে উজ্জ্বল মহাদেবের জটা (জল+জটা) বলিয়া মনে হয়। এই জাতীয় বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায়ই পাওয়া যায়। **নিকষকৃষ্ণ রাত্রি**—নিকষ অর্থাৎ কষ্টিপাথরের মত কৃষ্ণ অন্ধকার রাত্রি। **কর্মের ক্রীতদাস নহে**—ভারতবর্ষ জীবনে কর্মকে ত্যাগ করে নাই, কিন্তু কর্মের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া নিজের আত্মিক বিকাশকেও ব্যাহত করে নাই। কর্মের আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকিলে আত্মার দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ থাকে না—এইজন্য ভারতবর্ষ সেইটুকু কর্মই বাছিয়া লইয়াছে যাহা আত্মার বিকাশকে ব্যাহত না করিয়া তাহাকে প্রকাশলাভে সাহায্য করে।

অনু ৫-৭ঃ ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম—ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ গীতায় নিষ্কাম অর্থাৎ ফলের আকাঙ্ক্ষাবিহীন কর্মের মাহাত্ম্যকে ঘোষণা করা হইয়াছে। সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় অনাসক্ত কর্মের সাধনায় রত থাকিয়াই মানুষ পূর্ণতা অর্জন করিতে পারে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—কেবলমাত্র কর্মে তোমার অধিকার আছে, ফলে নহে। এবং—

'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥

—অতএব, তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান কর। কামনা-শূন্য হইয়া কর্ম করিলে মানুষ নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে। **স্তব্ধতার আধার-ভূত**—স্তব্ধতার আধারেই ভারতবর্ষের কাঠিন্যের শক্তি নিহিত আছে। **ইংরেজি ইস্কুলের বাতায়নে বসিয়া**—ইংরেজিশিক্ষার অহংকারে গণ্ডী-বদ্ধ মন লইয়া। **বিলিতি পটহতালে**—জয়ঢাক, নাগরা জাতীয় রণবাদ্য-বিশেষকে 'পটহ' বলে। আমাদের দেশের ইংরেজিশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিদেশীদের অনুকরণে যে ভাবে বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার মাহাত্ম্যকে বক্তৃতার আস্ফালনে গর্জনে প্রকাশ করেন, তাহাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গভরে 'বিলাতি পটহতাল' বলিয়াছেন। **কৌপীন বস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে**—প্রাচীন ভারতের কৌপীনবস্ত্র-ধারী তপোবন-বাসী ঋষিরা তৃণাসনে বসিয়া অমৃতের তপস্যা করিতেন, ভারতবর্ষের প্রকৃতিতেও যেন সেই তপস্যার গাম্ভীর্য, শুচিশক্তি পরিস্ফুট। **অমৃত অশোক**—অশোক হইতেছে স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, গৌরী ইহার তলে তপস্যা করিয়া পূর্ণমনোরথ ও বিগতশোক হইয়াছিলেন বলিয়াই ইহার এই নাম। যে তপস্যায় শোকদুঃখকে জয় করা যায় অশোক তাহারই প্রতীক রূপে ব্যবহৃত। প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের ঋষিদের সেই অমৃত (প্রাণদ) অশোক অর্থাৎ দুঃখশোকজয়কারী তপস্যাশক্তি এখনও ভারতবর্ষের সকল দারিদ্র্য, কৃশতার মধ্যে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। **অভয় হোমাগ্নি**—হোম অর্থাৎ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দেবতার উদ্দেশ্যে ঘৃতাহুতি দানের জন্য অগ্নিকুণ্ড রচনা করা হইত, সেই হোমাগ্নি তো প্রাচীন যুগের ঋষিদের তপস্যারই প্রতীক; ইহার শক্তিতেই তাঁহারা এই জীবনের সকল দুঃখদৈন্য ও ভীতির মাঝখানেও নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, স্থির ও নির্মলচিত্ত থাকিতে পারিতেন। সেই জন্যই সেই তপস্যাকে 'অভয় হোমাগ্নি' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই অগ্নি তথা তপস্যার শক্তি এখনও অনির্বাণ রহিয়াছে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য। **পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি**—সমুদ্রের তরঙ্গ হইতে যেমন ফেনরাশি উদ্গত হয়, সেইরূপ এদেশের শিক্ষিত সমাজ আধুনিক সভ্যতার যে সকল বস্তু লইয়া আস্ফালন করে, তাহা আসলে পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্ছিষ্ট ও উদ্গীর্ণ (যাহা বমন করা হইয়াছে, বা উৎক্ষিপ্ত) ফেনরাশিমাত্র। **জটাজুট**—জটার জুট (সমূহ)।

নরমেধযজ্ঞ—নর+মেধ (যজ্ঞ), যে যজ্ঞে নরবলি দিয়া সেই বলির মাংস দ্বারা আহুতি প্রদানের বিধি ছিল। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা নানাভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে; দুর্বার লোভ অসংখ্য জীবনকে ধ্বংস করিতে কুণ্ঠিত হয় না; এখানে রবীন্দ্রনাথ তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন। **বড়ো টাকা ছোটো টাকাকে**—য়ুরোপে দেখা যায়, আর্থিক শক্তিতে সমৃদ্ধতর বলশালী দেশ অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলিকে সকল সময়েই গ্রাস করিতে সচেষ্ট থাকে। মানুষের ইতিহাসের অনেক পাতা এইরূপ অত্যাচার উৎপীড়নের করুণ কাহিনীতে কলঙ্কিত হইয়া আছে। ভারতবর্ষ ইহাকে মাৎস্যন্যায় আখ্যা দিয়াছে।

অনু. ৮-১৩ : কৃষ্ণধূমশ্বসিত দানবীয় কারখানাগুলো—কারখানাগুলির চিমনী হইতে অবিরাম কালো ধোঁয়া বাহির হয় বলিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহাদের 'কৃষ্ণধূমশ্বসিত' বলিয়াছেন, আর এই সকল বৃহদাকার, বিশাল যন্ত্রসমন্বিত কারখানাগুলির ধূম্রমলিন পরিবেশের নিষ্পেষণে মানুষের দেহমনের চরম দুর্গতি ঘটে বলিয়া ইহাদের 'দানবীয়' আখ্যা দিয়াছেন। **নির্জনত্বের...... আবরুটুকু**—য়ুরোপীয় যান্ত্রিক সভ্যতা দানবীয় কারখানাগুলির মধ্যে মানুষকে এমনভাবে তাল পাকাইয়া রাখিয়াছে যে, আত্মবিকাশের জন্য যে মানুষের একটু নির্জনতা, একটু একাকিত্বের স্নিগ্ধ অবসর প্রয়োজন তাহা যেন সে ভুলিয়া গিয়াছে। জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাহাদের কর্মের উন্মাদনা আছে; অন্তরকে বিকশিত করিবার অবসর বা চিন্তা নাই। নির্জনতার, নীরবতার স্নিগ্ধ আনন্দ য়ুরোপের মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে।

রক্তসমুদ্রের তীরে—নিষ্ঠুর লোভে, স্বার্থপরতায় চারিদিকে সর্বনাশের আগুন জ্বালাইয়া য়ুরোপ যেন এক রক্তবর্ণের প্রলয়সমুদ্রের তীরে উপস্থিত। **আফ্রিকায় এশিয়াতে...উদ্যত করিতেছে**—সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভে ক্ষুধিত ব্যাধের (লুব্ধক) মতই য়ুরোপের বিভিন্ন জাতি আফ্রিকা এবং এশিয়ার একদিকে আক্রমণ চালাইতেছে, অপরদিকে পররাজ্য-লোলুপ অন্যান্য শক্তিদের অভিযানের আশঙ্কায় নিজেদের অস্ত্রসজ্জিত করিয়া রাখিতেছে। **দৃঢ়বদ্ধ সমাজনীতির সহিত...আসন্ন হইয়া রহিয়াছে**—সমাজে সকল মানুষেরই সমান অধিকার, এই মতবাদের নামই সোশ্যালিজ্‌ম্ বা সমাজতন্ত্রবাদ।

নিহিলিজম্ একটি নেতিবাদী তত্ত্ব, ইহা প্রচলিত ধর্মগত, নৈতিক সমস্ত বিশ্বাসকেই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। ইহা উনিশ শতকের রাশিয়ার চরম সন্ত্রাসবাদী দলের তত্ত্ব ছিল। রাশিয়ার নিহিলিস্টরা সামাজিক বিধিনিয়ম সমস্ত কিছুকেই অগ্রাহ্য করিতে চাহিয়াছিল। উনিশ শতক হইতেই য়ুরোপে দৃঢ়বদ্ধ সমাজনীতি, অর্থাৎ প্রচলিত রীতিনীতি বিশ্বাসে সুদৃঢ়ভাবে বিন্যস্ত সমাজে বিধিবিধান অবশ্য পালনীয়, এই নীতির সহিত সোস্যালিজম্ ও নিহিলিজম্-এর সংঘর্ষ দেখা দেয়। **সোস্যালিজম্**—ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ (Auguste Comte) 'সোস্যালজি' শব্দটির উপর ভিত্তি করিয়া 'Positive Philosophy' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন। 'সোস্যালজি' বলিতে সমাজের অন্তর্গত সকলের সমান অধিকার বুঝায়।

নাইহিলিজম্—ল্যাটিন 'নাইহাল' শব্দ হইতে উৎপন্ন। কোন বস্তুরই প্রকৃত কোনও অস্তিত্ব নাই—এই মতবাদ। যে মতবাদের উদ্দেশ্য বর্তমান সামাজিক প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া জমি ও সম্পত্তির উপর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া নূতন সমাজ গঠন। রাশিয়ার প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক টুর্গেনিভ (Turgenev) 'Father and Sons' নামক উপন্যাসে বিপ্লববাদের এই নামকরণ করেন। **য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ**—ছলে-বলে-কৌশলে পররাজ্য গ্রাস, অপর জাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া নিজেদের রাষ্ট্রের আর্থিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করিতে হইবে, ইহাই য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ। ইহাকে মানব-সভ্যতার চরম আদর্শ মনে করিয়া তাহার মানদণ্ডে ভারতবর্ষকে বিচার করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। **জিগীষার অভাব···মৃত্যুর কারণ**—য়ুরোপীয় সভ্যতার মতে জয়লাভের আকাঙ্ক্ষার অভাব এবং আত্মসন্তুষ্টিই উন্নতির পথের অন্তরায়। উন্নতির অভাবই অগ্রগতি রোধ করে, যাহা মৃত্যুরই নামান্তর। কিন্তু ভারত বলে, অন্তরের সন্তোষই তাহার সভ্যতার ভিত্তিভূমি। য়ুরোপ যদি বলে সব সভ্যতাই সমান এবং বৈচিত্র্যহীন সভ্যতার আদর্শ একমাত্র য়ুরোপেই আছে তবে তাহার এই কথা শুনিয়া আমাদের নিজেদের অমূল্য সম্পদ বিসর্জন দিবার প্রয়োজন নাই। য়ুরোপ যদি বলে—'সন্তোষ মনের জড়তা আনে, কর্মে শৈথিল্য আনে, ইহার পা · মৃত্যু', তবে আমরাও বলিতে পারি—আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্যে দুরাকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অপঘাত মৃত্যু।

নি ফললোলুপ…পরিবেষ্টিত—ভারতবর্ষ চিরদিনই ফললাভের জন্য কর্মভোগ এবং সেই কর্মের তাড়না হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া সুগভীর শান্তির আসনে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সর্বপ্রকার প্রতিযোগিতা, নিষ্ঠুর সংঘর্ষ এবং ঈর্ষার কালিমা হইতে নিজেকে মুক্তরাখিয়া ভারতবর্ষ বিশ্বজগতে নিজের মর্যাদার আসন গ্রহণ করিয়াছে।

অনু. ১৪-১৮ঃ ব্রহ্মের পথে—পরমেশ্বরের মঙ্গলের পথে। য়ুরোপ যাহাকে 'ফ্রীডম' বলে—য়ুরোপে স্বাধীনতার সংজ্ঞা মূলত রাষ্ট্রনৈতিক তথা বৈষয়িক। বৈষয়িক বনের কতকগুলি অধিকার, যেমন ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের অ্‌া.্‌.াএ ম প্রকাশের অধিকার, রাষ্ট্রযন্ত্রে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার প্রভৃতিকেই য়ুরোপে স্বাধীনতা বলিয়া মনে করা হয়। ভারতবর্ষ কোন দিন এইরূপ বিষয় তথা বস্তুগত স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নাই। সে চিরকাল বৃহত্তর মঙ্গলধর্মে আত্মার মুক্তিকেই অন্বেষণ করিয়াছে। য়ুরোপ নিজেদের স্বার্থসাধনের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার জন্য যেমন অন্য দেশকে আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তেমনি তাহাকে নিজেকেও অপরের আক্রমণের আশঙ্কায় সকল সময়ই অস্ত্রসজ্জিত করিয়া রাখিতে হয়। নজের দেশের যে সমস্ত লোককে সে সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করে, তাহারা ম ত্ব হারাইয়া যন্ত্রে পরিণত হয়। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের এই স্বা তাকে 'দানবীয়'রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের নগ্নচরণের… ত্র হইবে—ভারতবর্ষের শিক্ষিত ব্যক্তিরা য়ুরোপীয় ভোগসুখ, রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির বিপুল আড়ম্বরে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের দারিদ্র্যে, ঐশ্বর্যের চাকচিক্যহীন রিক্ততায় লজ্জিত হয়। কন্তু এই মোহান্ধতা দূর করিয়া আমরা যদি য়ুরোপীয় ভোগসুখের স্বাধীনতার আদর্শ অপেক্ষা উন্নততর, বিশালতর যে মহত্ত্ব ও মুক্তি ভারতবর্ষের সভ্যতার ধন, তাহা পুনরায় সমাজের মধ্যে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করি, তবে সকল বিষয়বৈভবহীনতা সত্ত্বেও এই দীনদরিদ্র ভারতবর্ষের স্পর্শে অন্যান্য দেশ পবিত্র হইবে। বড়ো বড়ো রাজমুকুট—অর্থাৎ বৃহৎ বিপুল ঐশ্বর্যদীপ্ত রাজশক্তি। অদ্যকার নববর্ষে…জয় হইবে—এই নববর্ষের পুণ্যদিনে ভারতভূমির চিরপুরাতন নবীনতাকেই আমাদের বরণ করিয়া লইতে হইবে। সাহাকে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে তখনো সেই অম্লান

গৌরবের মালাখানি আশীর্বাদের সঙ্গে আমরা উত্তরাধিকারীর ললাটে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে নির্ভয়চিত্তে জয়যাত্রার পথে পাঠাইয়া দিব। সেখানেই লভ্য হইবে ভারতবর্ষের জয় গৌরব। **মিলি মিলি যাওব সাগর-লহরী সমানা**—'আমরা বর্ষে বর্ষে' এর সহিত মিল রাখিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির 'সাগর-লহরী-সমানা' পংক্তিটির সহিত 'মিলি মিলি যাওব' কথাগুলিকে সংযোজিত করিয়াছেন। ইহার অর্থ হইল, সাগর-লহরী অর্থাৎ সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন উঠিয়া সমুদ্রের বুকে মিলাইয়া যায়, সেইরূপ আমাদের কোনও চিহ্ন থাকিবে না। বিদ্যাপতির প্রার্থনা-বিষয়ক পদের মূল পদ্যাংশটি হইল—

'কত চতুরানন মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা!
তোঁহে জনমি পুন তোঁহে সমায়ত
সাগর-লহরী সমানা!'

ইহার মর্মার্থ হইল, বিভিন্ন যুগের সৃষ্টিশক্তি (চতুরানন, প্রজাপতি ব্রহ্মা) সমুদ্রের তরঙ্গের মতই তোমা (পরমেশ্বর, নারায়ণ) হইতে উদ্ভূত হইয়া তোমাতেই বিলীন হয়. তোমার আদি অন্ত নাই। **ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী… রুহিয়া থাকিবে**—কবি এখানে ভারতভূমিকে সন্ন্যাসীর রূপে কল্পনা করিয়াছেন। কারণ ভারতবর্ষ চিরদিনই নিরাসক্ত, নির্বিকার। এই নিরাসক্ত সন্ন্যাসী মৃগচর্মে আসীন হইয়া ত্যাগ. কর্ম, তপস্যা এবং শান্তি এই চতুষ্পথ রচনা করিয়াছেন। এই ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী ভারতের কাছে যখন আমাদের উত্তরাধিকারীরা করজোড়ে মন্ত্রভিক্ষা করিবে তখন তিনি তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যা দান করিবেন। **চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে**—চতুষ্পথের সাধারণ অর্থ চৌরাস্তা, যেখানে চারিটি পথ মিলিত হয়। এখানে ইহার অর্থ, যে সাধনার পথে চারি বর্গ, অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ মিলিত। প্রাচীনযুগের ঋষিরা ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া মৃগচর্মে বসিয়া এই চতুর্বর্গের সাধনাই করিতেন। সেই সন্ন্যাসীদের তপস্যার আদর্শ আধুনিকতার সকল ফেনিল উচ্ছ্বাসের মধ্যে আশ্চর্য স্তব্ধতায়, অটুট গাম্ভীর্যে নিগূঢ় শক্তিরূপে বিদ্যমান; তাহাকে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা পাশ্চাত্য সভ্যতার নাই। **ওঁ ইতি ব্রহ্ম**—ব্রহ্মা পরমেশ্বরের উদ্দেশে উপনিষদে উচ্চারিত শ্রদ্ধাবাচন; ওঁ [অ. উ. ম.—প্রণব, আত্মবীজ] এই পবিত্র শব্দটি মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে

উচ্চারণ করিতে হয়। **ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি**—ভূমা অর্থাৎ ব্যাপ্তিতে সুখ, অল্পে সুখ নাই; উপনিষদের বাণী। **আনন্দং…কদাচন**—ছান্দোগ্য উপনিষৎ হইতে সংকলিত। সমগ্র মন্ত্রটি—

যত বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন (কুতশ্চন)॥

—ব্রহ্মকে উপলব্ধির যে আনন্দ তাহা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। ব্রহ্মানন্দকে উপলব্ধি করিলে জীবনে আর কোন ভয় থাকে না।

॥ ব্যাখ্যা ॥

[১] **হওয়াটাই জগতের.. হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে।** (অনু. ২)

আলোচ্য পংক্তিগুলি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষ'-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কবি এখানে য়ুরোপের কর্মোন্মাদনার নিষ্ফলতা নির্দেশপূর্বক প্রকৃতির স্বরূপধর্মের পটভূমিকায় মানবজীবনের যথার্থ পূর্ণতার আদর্শটি তুলিয়া ধরিয়াছেন।

আধুনিক কালে য়ুরোপীয় কর্মের গৌরবের আদর্শে বিভ্রান্ত হইয়া আমরা জীবনের প্রকৃত আদর্শকে ভুলিয়া যাই। ধৈর্যে, ক্ষমায়, সন্তোষে, শুদ্ধতায় মানুষের শুদ্ধতম সত্তার যে বিকাশ ঘটে, সেই বিকশিত হওয়াটাই মানবজীবনের সত্যকারের আদর্শ, কর্মের উত্তেজনা নয়। কর্মের বিরামহীন উত্তেজনার বেগে য়ুরোপীয়রা নিরীহ প্রাণীগুলিকেও নির্বিচারে হত্যা করে, এশিয়া-আফ্রিকার জাতিগুলির উপর অমানুষিক উৎপীড়ন চালাইতে কুন্ঠিত হয় না। শান্তিনিকেতনের নির্জন প্রকৃতির শুচিস্তব্ধতায় রবীন্দ্রনাথ এই হওয়ার মঙ্গলময় আদর্শের মহাত্ম্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন। ক্ষুদ্র বীজটুকু হইতে বিরাট বৃক্ষে প্রাণের পূর্ণতা দান, অজস্র ফুলের বর্ণগন্ধ রচনা, শাখাপত্রপল্লবের বিচিত্র সজ্জা গঠন—প্রকৃতির রাজ্যে বিপুল কর্মের আয়োজন; কর্মের কোথাও আড়ম্বর, নাই উত্তেজনার মত্ততা নাই, তাহার সকল কর্ম, পরিশ্রম, চেষ্টা একটি শতদল পদ্মের মত নিঃশব্দে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া উঠে; তাহার অখণ্ড

শান্তি; স্তব্ধতা, গাম্ভীর্য হওয়ার আদর্শকেই আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরে।

[২] এই কর্মের চতুর্দিকে……তাহাই তাহার বল। (অনু. ৩)
[বর্ধ. বিশ্ব: ১৯৬৮]

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

কর্মের উত্তেজনার আস্ফালন নয়, 'হওয়াটাই' জীবনের যথার্থ আদর্শ। প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা যে এই সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারি, সে প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি করিয়াছেন।

প্রকৃতির রাজ্যে কর্মের সীমা নাই। ফুলফোটায়, তাহার বর্ণগন্ধের নব নব আয়োজনে, ফলের পরিণতিতে, পত্রপল্লবের বিচিত্র সজ্জায়, জীর্ণ পাতা ঝরিয়া পড়ায়, অঙ্কুরের বিকাশে—প্রতি মুহূর্তেই তাহার নির্মাণ-বর্জন-গঠনের অজস্র কর্ম চলিতেছে। অথচ তাহার মধ্যে কোথাও আধুনিক যুগের মানুষের মত কর্মের উত্তেজনা, আড়ম্বর বা অস্থিরতা দেখা যায় না। ফুল যে কখন বিচিত্র বর্ণে-গন্ধে বিকশিত হইয়া উঠে, বীজের অঙ্কুরগুলি নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে, এক এক ঋতু অনুযায়ী প্রকৃতির সজ্জার পরিবর্তন হয়, আমরা তাহা জানিতেই পারি না। প্রকৃতি এমনই স্তব্ধতায়, অটুট শান্তিতে কাজ করিয়া কর্মের সমস্ত আড়ম্বরকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে। সেই কারণেই কর্মের পীড়নে ক্লান্ত, অবসন্ন পঙ্গু হইয়া প্রকৃতিকে মানুষের মত কর্মের দাসত্ব করিতে হয় না; সে সকল সময়েই সৌন্দর্যের নির্মলতায় নিজেকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। কর্মের এত বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও প্রকৃতির দিকে তাকাইলেই আমরা দেখি কোথাও কর্মের ব্যস্ততা বা উত্তেজনা নাই; সে যেন কাহার নিমন্ত্রণে সজ্জিত হইয়া বিস্তীর্ণ নীলাকাশে আরামে আসন গ্রহণ করিয়াছে। কর্মের চতুর্দিকে এই অবকাশ রচনা, কর্মের চাঞ্চল্যকে ধ্রুবশান্তিতে আবৃত করিয়া রাখা,—ইহারই জন্য প্রকৃতিকে যদি মানুষের মত অস্থির ও উত্তপ্ত হইতে হইত, তবে ফুলের মধ্যে প্রকৃতির রচনার সৌন্দর্য এত নবীন হইয়া প্রতিদিন দেখা দিত না। শুধু মাত্র নবীনতা নয়, ইহার মধ্যেই তাহার শক্তি নিহিত। অজস্র কর্ম করিয়াও তাহার অবসাদে, ক্লান্তিতে জীর্ণ না হইয়া

গভীর প্রশান্তিতে, স্তব্ধতায় নিজেকে প্রকাশ করা—এই 'হওয়াটাই' যেমন প্রকৃতির নবীনতার রহস্য, তেমনি তাহার শক্তিও।

[৩] **ফলের আকাঙ্ক্ষা……করা উপলক্ষ্য মাত্র।** (অনু. ৫)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

ভারতবর্ষ যে য়ুরোপের মত মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্মকে বড়ো করিয়া তোলে নাই, সেই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য উক্তিটি করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ কর্মের প্রতি উদাসীন নহে, কিন্তু সে কখনও য়ুরোপের মত মানুষকে কর্মের ক্রীতদাস করিয়া তুলিতে চাহে নাই। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কর্মযোগের শাস্ত্র 'গীতা'য় কর্মের এই বাণী প্রচার করা হইয়াছে—মানুষকে ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, সম্পূর্ণ নিরাসক্ত চিত্তে কর্ম করিয়া যাইতে হইবে, তবেই তাহার সাধনার সিদ্ধি ঘটিবে। রবীন্দ্রনাথ গীতা তথা ভারতবর্ষের সেই কর্মের বাণীকেই এখানে স্মরণ করিয়াছেন। সাপের বিষদাঁত উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলে যেমন তাহাকে সহজেই বশীভূত করা যায়, তেমনি ফলের আকাঙ্ক্ষা দূর করিলে কর্মের উত্তেজনা ও অস্থিরতার বিষময় পরিণামকে নিবারণ করা যায়; কর্ম মানুষের মনুষ্যত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে ক্রীতদাসে পরিণত করিতে পারে না। কর্ম হইতে আসক্তি দূর করিতে পারিলেই মানুষ কর্মের জালে আবদ্ধ না হইয়া তাহার উপরে নিজের মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেকে বিকশিত করিবার সুযোগ পায়। মনুষ্যত্বের ধর্মের এই বিকশিত হওয়াই ভারতবর্ষের জীবনাচরণের লক্ষ্য, কর্ম তাহার উপলক্ষ্য মাত্র। কর্মের আড়ম্বরের নিকট ভারতবর্ষ কোনও দিন আত্মবিক্রীত হয় নাই, সকল কর্মের মাঝখানেও আত্মার স্তব্ধতায় পূর্ণ ও সার্থক হইতে চাহিয়াছে। ভারতবর্ষের সকল কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে 'হওয়া'র আদর্শটি ধ্রুবতারকার মত পথদ্রষ্টা।

[৪] **যখন ঝড়ের গর্জনে……শঙ্কিত হইয়া উঠিবে।** (অনু. ৬)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজ ইংরেজিশিক্ষার যে অহংকারে তাহার সনাতন শাশ্বত তপস্যাশক্তিকে অবহেলা করে, কোনও এক প্রবল বিপর্যয়ে তাহা ধূলিসাৎ হইবে, সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য অংশে ভারতের সেই শাশ্বত তপস্যা-শক্তির মহিমা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনে উপবাসব্রতধারী যে সন্ন্যাসীরা কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে বসিয়া অটল স্তব্ধতায় মুক্তির তপস্যা করিতেন, তাঁহারাই দেশের সত্যকারের প্রতিনিধি; তাঁহাদের সেই তপস্যার শক্তিই ভারতের যথার্থ শক্তি। এই ত্যাগের, দারিদ্র্য বরণের, শুদ্ধতার, দুঃখের কৃচ্ছ্রসাধনের কঠিন শক্তি আজও ভারতবর্ষের জীবনের মর্মকোষে বিরাজ করিতেছে, তাহা অক্ষয় অমর। ইংরেজিশিক্ষার মোহে অন্ধ আধুনিকতার ধ্বজাধারীরা পাশ্চাত্য শিক্ষাসংস্কৃতির আস্ফালনে ভারতবর্ষের সেই তপোবনসভ্যতার মূল্যবোধকে অবজ্ঞা করিতে পারে, কিন্তু যদি কখনও কোনও সামাজিক বিপর্যয়, বিপ্লব ঝড়ের ন্যায় প্রচণ্ডশক্তিতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন দেখা যাইবে, ইংরেজিশিক্ষার সমস্ত অহংকার নিস্ফল হইয়াছে। সেই প্রলয়ের কলরোলে এই শিক্ষিতদের অতিবিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজিতে বক্তৃতা, যাহা লইয়া তাহাদের এত গর্ব, তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সেই দুর্যোগের মুহূর্তেই দেখা যাইবে, ভারতীয় সভ্যতার শক্তি অবিচলিত শক্তিতে সন্ন্যাসীর দীপ্ত চক্ষুতে প্রলয়ের সকল মেঘ-গর্জনের উপরেও ধ্বনিত তাহার দক্ষিণবাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণঝঙ্কারে জাগ্রত হইয়াছে, তাহাকে আর অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। প্রবল সামাজিক বিপর্যয়ে সন্ন্যাসী ঋষিদের তপস্যাপূত ভারতীয় সভ্যাদর্শের শক্তি যে কঠিনতায় ও গাম্ভীর্যে অনুভূত হইবে, সন্ন্যাসীর লৌহবলয় ও লৌহদণ্ডের ঘর্ষণঝঙ্কারের রূপকে রবীন্দ্রনাথ তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন।

[৫] কিন্তু বিধাতার কাছে……সংবাদ পাওয়া যায়। (অনু. ৭)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

আমরা বাহির হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐশ্বর্য-বিলাসের বিপুল আড়ম্বরে বিস্ময়বিগলিত হই, কিন্তু তাহার অন্তরালে মানুষের মনুষ্যত্ব এবং জীবন ধ্বংস করিয়া প্রতিদিন যে নরমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য উক্তিটি করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই। কিন্তু তাহার অন্তরালে মনুষ্যত্বের যে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে, তাহা গোপন থাকে। য়ুরোপে প্রতিযোগিতার নিষ্ঠুর তাড়নায়, কর্মের বিরাট আয়োজনের জটিলতায়

ও উত্তেজনার তীব্রতায় কর্মজীবীরা যন্ত্রেরও অধম হইয়া পড়ে; তাহাদের নিজেদের মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে হয়। এই যান্ত্রিক সভ্যতার নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে কত লোকের যে আত্মিক মৃত্যু ঘটে, তাহার হিসাব ত আমরা রাখি না; কিন্তু সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের নিকট তাহা গোপন থাকে না, থাকিতে পারে না। দীর্ঘকাল ধরিয়া সেই অত্যাচার ও নিপীড়নে মনুষ্যত্বের অবমাননা পুঞ্জীভূত হইতে হইতে যখন তাহা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মত সামাজিক বিপ্লবের বা যুদ্ধবিগ্রহের দুর্যোগ সৃষ্টি করে তখনই আমরা তাহার পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন হই। য়ুরোপের ইতিহাসে এইরূপ সামাজিক ভূমিকম্প অর্থাৎ বিপর্যয়ের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়, ফরাসী বিপ্লব তাহার অন্যতম।

[৬] যে লোক জাহাজে আছে ··সেই বিধান নহে। (অনু. ১১)

[বর্ধ. বিশ্বঃ ১৯৬৭]

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় যাহারা মানুষ হইয়াছেন, তাঁহারা অনেকে মনে করেন সন্তোষ ভারতবর্ষের দীনতার মূল কারণ। কবি রবীন্দ্রনাথ এই মতকে স্বীকার করেন না। উদাহরণ স্বরূপ আলোচ্য অংশে তিনি বলিতেছেন, দেশ-ভেদে জীবনচর্যায় পার্থক্য থাকিবেই। যিনি জাহাজে আছেন, তাঁহার কর্ম-ধারার সহিত গৃহবাসী মানুষের কর্মধারার পার্থক্য থাকা একান্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু এই পার্থক্যের জন্য অস্বস্তি বোধ করা হীনমন্যতার পরিচায়ক। প্রাচ্যের জীবন-চর্যার সপক্ষে কবির যুক্তি তাঁহার সুগভীর অনুভূতির সজীব প্রকাশ।

[৭] প্রথমটাতে যদি রোগে······অপঘাতে মৃত্যু হয়।

(অনু. ১২)

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ

য়ুরোপীয় সভ্যতা বলে, সন্তোষই জাতির মৃত্যুর কারণ। রবীন্দ্রনাথ সেই অভিযোগ বিচার করিতে গিয়া মাত্রাতিরিক্ত সন্তোষের মত অত্যাকাঙ্ক্ষার বিপদও আলোচ্য অংশে নির্দেশ করিয়াছেন।

কেবলমাত্র য়ুরোপীয়দের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া যে কোনও বক্তব্যকে বিনাবিচারে মানিয়া লইলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। য়ুরোপ বলে, সন্তোষই জাতির মৃত্যুর কারণ, অথচ ইহাই ভারতীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র। সভ্যতার ধর্ম সকল দেশে সমান হইতে পারে না। সন্তোষে বিকৃতি ঘটিলে তাহা জড়তায় পর্যবসিত হইয়া কাজে শৈথিল্য আনে—ইহা যদি সত্য হয়, তবে অত্যাকাঙ্ক্ষা তীব্র হইয়া নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে যে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, অনাবশ্যক জঞ্জাল সৃষ্ট হয়, আমাদের তাহাকেও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে; একচক্ষু হরিণের মত কেবল সন্তোষের বিকৃ পরিণামের দিকে তাকাইলেই চলিবে না। সন্তোষ মাত্রাতিরিক্ত হইলে সেই গতির ফলে জড়তার শৈথিল্য-রোগ যদি জাতির মৃত্যুর কারণ হয়, তবে অ কাঙ্ক্ষার তীব্র উত্তেজনা ও অস্থিরতায় জাতির অপঘাত মৃত্যু অবশ্যম্ভা। তীব্র উন্মাদনায় পরের জীবন যেমন, তেমনি নিজের জীবনকেও ধ্বংস করিতে য়ুরোপীয়দের কুণ্ঠাবোধ হয় না।

[৮] ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত·····প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে।

(অনু. ১৫) [বর্ধ. বিশ্বঃ, ১৯৬৪]

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ।

আত্মতুষ্টি প্রাচ্য-দেশের মহতী বিনষ্টির মূল কারণ মনে করিয়া যে সমস্ত পাশ্চাত্যানুরাগী ক্ষুব্ধ, আলোচ্য অংশে উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা কবি তাহার বিরুদ্ধে শান্ত-সুন্দর কিন্তু সুদৃঢ়-গম্ভীর ভাবে তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছেন।

পশ্চিম যখন বস্তু-বিশ্বকে করতলগত করিবার নেশায় উদ্ভ্রান্ত, ভারতবর্ষ যেন তখন মৃগচর্মাসনে উপবিষ্ট বিভূতিভূষিতদেহা সন্ন্যাসীর মত অমৃতের সাধনা করিয়া চতুর্বর্গ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ করায়ত্ত করিয়াছে এবং উত্তরপুরুষের জন্ম সেই মহামন্ত্র রক্ষা করিতেছে।

আলোচ্য অংশে ভাষার শুচিতা হৃদয়ানুভূতির রস-সিঞ্চিত হইয়া শুচি-সুন্দর বক্তব্যকে অনুপম মাধুরী দান করিয়াছে।

॥ প্রশ্নোত্তর ॥

১। 'নববর্ষ' প্রবন্ধটির তাৎপর্য বিশদ কর।

[বর্ধঃ বিশ্বঃ—১৯৬৯]

[সার-সংক্ষেপ ও রসগ্রাহী সমালোচনা অবলম্বনে উত্তর লিখ।]

২। য়ুরোপ বলে, জিগীষার অভাব ও সন্তোষই জাতির মৃত্যুর কারণ। তাহা য়ুরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুর কারণ হইতে পারে বটে কিন্তু আমাদের সভ্যতার তাহাই ভিত্তি।"

—এই মন্তব্যটির যৌক্তিকতা নিরূপণ কর।

উত্তর : নিজেদের কর্মোন্মাদনার সমর্থনে য়ুরোপীয়দের কণ্ঠে আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, প্রাধান্য বিস্তারের ইচ্ছার অভাব ও সন্তোষই জাতিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেয়। য়ুরোপীয় সভ্যতার ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে আমরা এতই মুগ্ধ যে, বিচারহীন অন্ধতায় য়ুরোপের যে কোনও কথাকেই চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের মধ্যে বহু চিন্তাবিদের চিত্তেও কোন দ্বিধা জাগে না। প্রভুত্বের বাসনার অভাবে ও সন্তোষে হয়ত য়ুরোপীয় সভ্যতা নিশ্চল হইয়া পড়িতে পারে, ধ্যানের শান্তিতে মগ্ন হইবার পরিবর্তে কর্মের মত্ততায় চঞ্চল, তীব্র, তপ্ত হওয়াই য়ুরোপীয়দের স্বভাবধর্ম। কর্মোন্মাদনার মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া সারাজীবন তাহারা কর্মের তাড়নায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, তাহাতেই তাহাদের যত গৌরববোধ।

প্রভুত্বলাভের ইচ্ছার অভাব ও সন্তোষ হয়ত কর্মোন্মাদনার আদর্শে তৃপ্ত য়ুরোপীয় সভ্যতার পক্ষে মৃত্যুর কারণ হইতে পারে, কিন্তু উহাই আমাদের সভ্যতার ভিত্তি। সভ্যতার আদর্শ সকল দেশে সমান নয়, সমান হইতেও পারে না। য়ুরোপ যদি বলে, সভ্যতামাত্রই সমান এবং সেই বৈচিত্র্য-হীন সভ্যতার আদর্শ একমাত্র য়ুরোপেই আছে, তবে সেই স্পর্ধাবাক্য শুনিয়া বিচলিত হইয়া ভারতীয় সভ্যতার সত্যসাধনার নিজস্ব ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিতে উদ্যত হওয়া কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

ভারতবর্ষ কোনও দিন স্বার্থসর্বস্ব কর্মের অহংকারমত্ততাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। সে প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া শত্রুহস্তে প্রাণ দিয়াছে, 'নিজদেশ ও পরদেশের প্রতি আসক্তি ছিল না বলিয়া' বিদেশীর নিকট নিজের দেশেকে বিসর্জন দিয়াছে ; কিন্তু কখনও য়ুরোপের মত লোভ ও আসক্তির হিংস্র নখরাঘাতে অপরকে রক্তাক্ত, জর্জরিত করে নাই। কর্মের আড়ম্বরে বা উত্তেজনায় নয়, ভোগের বিলাসে বা মত্ততায় নয়, ঐশ্বর্যের তীব্রছটায় নয়, উপবাসব্রতধারী কৌপীন-বস্ত্রধারী, তৃণাসনে উপবিষ্ট সমাধিস্থ মৌন সন্ন্যাসীর প্রবৃত্তিদমনের ও গভীর প্রশান্তি অর্জনের দুরূহ তপস্যার মধ্যে ভারতবর্ষের নিজস্ব আত্মিক শক্তি প্রকটিত হইয়াছে। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিতে, সন্তোষের প্রবিত্রতায় প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের সভ্যতা জীবনের চরিতার্থতাকে অন্বেষণ করিয়াছে। জিগীষার অভাব ও সন্তোষ যথার্থই ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি।

ভারতবর্ষ কোনদিন য়ুরোপের যান্ত্রিক সভ্যতার কর্মোন্মাদনায় মত্ত হইয়া পৃথিবীর সর্বনাশকে ডাকিয়া আনে নাই চতুর্দিকে মৃত্যুর বীজ ছড়াইয়া লোভের আক্রমণে অপরকে আহত, রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়া, অশান্তিতে আশঙ্কায় নিজের আত্মহত্যার পথকেও প্রস্তুত করিয়া কর্মের তীব্র প্রেরণাকে চরিতার্থ করিতে চাহে নাই। সন্তোষ, সংযম এ সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ এবং ভারতবর্ষ তাহকেই দৃঢ়রূপে গ্রহণ করিয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার জিঘাংসায় সমগ্র পৃথিবী আলোড়িত, তাহার নিজের মধ্যেও বহুবিধ দ্বন্দ্বসংঘাত আবর্ত রচনা করিয়া চলিয়াছে। ভারতবর্ষের দুর্গতি দেখিয়া কিংবা য়ুরোপীয়দের অহংকারে আস্ফালনে বিভ্রান্ত হইয়া তাহার সভ্যতার মর্মগত সত্য ও শক্তিকে অস্বীকার করা উচিত নয়। সভ্যতার ঐতিহাসিক বিচারের পটভূমিতেও রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্যটির যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না।

৩। "অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব।"

—উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

উত্তর : য়ুরোপের বৈষয়িক জীবনের কর্মোন্মত্ততায় আমরা যতই মুগ্ধ হই না কেন, সনাতন ভারতবর্ষের তপোবন-সভ্যতার অক্ষয় শক্তিকে অস্বীকার করা

যায় না। আমরা ইংরেজিশিক্ষার প্রভাবে এখনও ভারতবর্ষ হইতে দারিদ্র্যের কঠিন বল, মৌনের দৃঢ় গভীর আবেগ, নিষ্ঠার কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের উদার গাম্ভীর্যকে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। আমাদের ইংরেজিশিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুকরণের উদ্ধত অহংকারের ফেনিলতার মাঝখানে ভারতবর্ষের সেই চিরপুরাতন শান্তির মর্মগত বিপুল শক্তি বিরাজ করিতেছে, তাহা প্রাচীন ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীর কঠোর তপস্যার ফলশ্রুতি। এদেশের তপ্তাম্র আকাশ, শুষ্ক ধূসর প্রান্তর, মহাদেবের পিঙ্গল জটার ন্যায় বিরাট মধ্যাহ্ন, নিকষকৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রি এই প্রকৃতিরই দান, তাহাকে অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ এক নববর্ষের দিনে শান্তিনিকেতনে নির্জন প্রকৃতির উদার-গাম্ভীর্যে সমস্ত হৃদয় ভরিয়া লইয়া য়ুরোপীয় সভ্যতার কর্মোন্মাদনার নিষ্ফলতার পটভূমিকায় ভারতবর্ষের সেই 'চিরপুরাতন' অর্থাৎ আসক্তিবিহীন কর্মসাধনার কঠিন সংযম, সন্তোষ, ক্ষমা প্রভৃতিতে বিকশিত হইবার 'হওয়ার' শাশ্বত ধর্মকে অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করিয়াছেন। য়ুরোপের কর্মোত্তেজনা চিত্তে প্রতিটি ক্ষেত্রে যে সর্বনাশ ছড়াইয়া দিতেছে, তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে তাহার সত্য-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। কর্মের উত্তেজনায় য়ুরোপ পররাজ্য আক্রমণে, লুণ্ঠন ও মারণযজ্ঞে উন্মত্ত, এক শক্তিশালী দেশ অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশকে গ্রাস করিতে সতত সচেষ্ট, তাহার শ্রমজীবীরা মনুষ্যত্ব হারাইয়া যন্ত্রের ক্রীতদাসে পরিণত, ভোগীরা ভোগের নব নব উত্তেজনায় ক্লান্ত, অবসন্ন। য়ুরোপের কর্মোন্মাদনা, প্রবৃত্তির প্রবলতা, প্রভুত্বের লালসা মানুষকে শান্তি ও পরিপূর্ণতায় লইয়া যাইবার পরিবর্তে কেবল বিদ্বেষকলঙ্কিত সংঘাতের রক্তাক্ত পরিণামের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

আমাদের তাই য়ুরোপীয় সভ্যতার আদর্শে বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া ভারতবর্ষের সেই চিরপুরাতন আদর্শ হইতে নূতন জীবন লাভ করিতে হইবে। যে শাশ্বত, সনাতন ভারতবর্ষ ফলাসক্ত কর্মের তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, একাকিত্ব ও স্তব্ধতার মধ্যে আসীন, প্রতিযোগিতার সংঘর্ষ ও ঈর্ষা-কালিমা হইতে মুক্ত, তাহাকে যদি আমরা অন্তরের মধ্যে আবাহন করিতে পারি, তাহার তপস্যার ধন মহত্ত্ব ও মুক্তিকে যদি একান্তভাবে উপলব্ধি করি, তবেই আমাদের জীবনে নূতন শক্তি, নূতন প্রাণের সঞ্জীবতা

সঞ্চারিত হইবে। নববর্ষের দিনটি সেই প্রাচীন ভারতবর্ষকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিবার সর্বাপেক্ষা শুভ সময়। এই মাহেন্দ্রক্ষণটিতেই আমরা ভারতের সাধনার সম্পদ হইতে নূতন শক্তি সংগ্রহ করিয়া নবীনতায় সঞ্জীবিত হইব। 'অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব'—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি যথার্থই আধুনিক ভারতবর্ষের নূতন প্রাণশক্তি আবাহনের বাণীমন্ত্র।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

আধুনিক কাল

বাংলা গদ্য

১। প্রশ্ন : বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশে খ্রীষ্টান মিশনারীগণের দানের পরিমাণ নির্ণয় কর।

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৪, ১৯৬৯]

অথবা, : উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলা গদ্যরীতির প্রতিষ্ঠায় বিদেশীদের কৃতিত্ব কতটা তাহা আলোচনা কর।

[উঃ বঙ্গ বি ১৯৬৯]

অথবা, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা গদ্যসাহিত্য কি ভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার বিবরণ সংক্ষেপে দাও।

[ক. বি বি এ. ১৯৬৮]

উত্তর : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তাহার গদ্য সাহিত্য। উনিশ শতকের নব-জাগৃতির পূর্বে ইহার সম্যক্ উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয় নাই। পূর্বে পয়ার লাচাড়ি ছন্দের মধ্যেই কাব্যরূপে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ পাইত। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সব কিছুরই প্রকাশ ছিল ছন্দে। কেবল মাত্র চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ বা ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যামূলক কড়চা জাতীয় রচনায় গদ্যের সামান্য প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মনোভাব প্রকাশের বাহন হিসাবে ইহা ছিল সীমিত। পরবর্তীকালে য়ুরোপীয় মিশনারীগণ তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে বাংলা গদ্যের চর্চা করিতে শুরু করেন। তাঁহাদের অবশ্য বাংলা গদ্যের স্রষ্টার সম্মান দেওয়া যায় না, কিন্তু খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগেই বাংলা গদ্য ইহার স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করিল।

ইংরেজদের আগমনের পূর্বেই এই মিশনারীরা তাহাদের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য এই দেশে আসিয়াছিল। তাহারা একই সঙ্গে আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক এবং বৈষয়িক বাণিজ্যও আরম্ভ করিল। নিজেদের ধর্মমত প্রচারের জন্য তাহারা প্রথম হইতেই এদেশীয় মানুষের মধ্যে চলিত ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল। এই কাজ প্রথমে শুরু করে পর্তুগীজ পাদ্রীরা ষোড়শ শতকে। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যেসুইট সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক ফ্রান্সিসকো ফের্নানদেশ ঢাকা জেলার শ্রীপুর গ্রামে খ্রীষ্টধর্মের মূল আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া প্রশ্নোত্তরমূলক "ছোট কড়চা" বই রচনা করেন এবং দোমিনিক্ দে সুজা এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ দস্যু এবং পাদ্রীরা পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা নারী পুরুষও অপহরণ করিত। এইরূপে তাহারা ভূষণার রাজপুত্রকেও অপহরণ করে এবং ধর্মান্তরিত করিয়া তাহার নাম রাখিল দোম এন্তোনিয়ো। তিনি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' নামে একখানি বাংলা পুস্তিকা রচনা করেন। আরেকজন পর্তুগীজ পাদ্রী মনোএল-দ্য আসসুম্পসাঁও খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও হিন্দুধর্মের অসারতা প্রতিপাদনের জন্য লিখিলেন 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৩৪)। এই গ্রন্থে তিনি আঞ্চলিক কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। ইঁহার আর একখানি গ্রন্থ হইল *Vocabulario em Idioma Bengalla Portuguez*। ইহা একখানি পর্তুগীজ বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ। এই গ্রন্থ দুইটি রোমান হরফে ছাপা হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিসবন নগরে প্রকাশিত হয়। পর্তুগীজ পাদ্রীদের তিনটি গ্রন্থই অষ্টাদশ শতকে রচিত।

পর্তুগীজ মিশনারীদের রচিত গ্রন্থগুলি তৎকালীন বাংলাদেশের বাঙালী মনে তেমন প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কারণ এই গ্রন্থগুলির শব্দপ্রয়োগে, বাক্যবিন্যাসে এবং বানানে পোর্তুগীজ ভাষারীতির ছাপ ছিল সুস্পষ্ট। পরবর্তী কালে ইংরেজ মিশনারীরা বাংলা কথ্য ভাষার প্রচলিত কাঠামোকে অনুসরণ করিয়া বাংলা গদ্য রচনায় ব্রতী হন। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে পোর্তুগীজ শব্দগুলিই বর্তমানে পোর্তুগীজ মিশনারীদের অবদানের একমাত্র সাক্ষ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশের শাসনভার গ্রহণ করিল। তখন দেশ শাসনের জন্য কোম্পানীর কর্মচারীরা দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেন। কোম্পানীর অন্যতম কর্মচারী হ্যালহেড সাহেব বাংলা ভাষায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় একখানি বাংলা ব্যাকরণের বই "The Grammar of the Bengal Language" (১৭৭৮) রচনা করিলেন। বাংলা কাব্য হইতে তিনি বহু দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন। এই উদাহরণগুলি মুদ্রিত করিবার জন্য বন্ধু

[illegible]স উইলকিনস্ এবং হুগলীর পঞ্চানন ক[illegible]র [illegible] হ্যালহেড এক [illegible] বাংলা হরফ প্রস্তুত করেন। ফলে মুদ্রা[illegible] স[illegible] হইল [illegible]ং [illegible] গদ্য বিকাশের পথ পাইল। [illegible] ১৭৮৫-৯২ সালে জোনাথান ডানকান নীল [illegible]মিন, এডমনস্টোন এবং ফরস্টার বাংলা [illegible]আইনবিধির অনুবাদ [illegible]। এই সময়ে [illegible] যোগ্য [illegible] হইল [illegible]জোনসের ইংরাজি ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ [illegible] (১৭৯৭) মিলারের শিক্ষাগুরু বা The Tutor' (১৭৯৭) এবং ফরস্টারের Vocabulary [illegible] ইংরেজী বাংলা অভিধান (১৭৯৯-১৮০২)। এই সমস্ত গদ্যগ্রন্থ [illegible] রাজনের তাগিদে এবং সরকারী প্রয়োজনায় রচিত হইয়াছিল। সেজন্য [illegible] ভাষাও কোনমতে বক্তব্য প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরী জন টমাস ওয়ার্ড মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারীগণ শ্রীরামপুরে প্রটেস্টাণ্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাহারা এই [illegible] একটি প্রেসও স্থাপন করেন। বাংলা গদ্যের বিকাশে ইহা যুগান্তকারী [illegible]ন সাধন করে। এই শ্রীরামপুর মিশনই [illegible]ল ইংরেজ মিশনারীদের [illegible] কর্মকেন্দ্র।

উইলিয়াম কেরী মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারীগণ [illegible] ভাষা উত্তমরূপে [illegible] করিয়াছিলেন। তাহারা মিশন প্রেস হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, সংস্কৃত ব্যাকরণ [illegible] প্রধান [illegible] মধ্যে [illegible] কেরীর [illegible] ফেলিকস কেরী অনূদিত বিদ্যাহারাবলী বা চিকিৎসাশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ [illegible] দত করেন। এই মিশনের ছাপাখানা হইতেই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল [illegible] মার্শম্যানের সম্পাদনায় বাংলা ভাষার প্রথম মাসিকপত্র 'দিগদর্শন' প্রকাশিত হয়। ইহার একমাস পরে এই প্রেস হইতে মার্শম্যানের সম্পাদনায় [illegible] পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সহায়তায় 'সমাচার দর্পণ' নামক [illegible]ক পত্রিকাও আত্মপ্রকাশ করে। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'বাঙ্গাল গেজেট' (১৮১৮) পত্রিকাও এই ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়। এই পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা গদ্যের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পাইল, বাংলা গদ্যের নূতন যুগ শুরু হইল এবং বিকাশ-পথ ত্বরান্বিত হইল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরীর St Matthew's Gospel-এর বঙ্গানুবাদ 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' প্রকাশিত হয়। তারপর একে একে বাইবেলের বহু অনুবাদ এখানে মুদ্রিত হয়। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র বাইবেল 'ধর্মপুস্তক' নামে প্রকাশিত হয়। এই অনূদিত বাইবেলের ভাষা অত্যন্ত জড়তাপূর্ণ। এই গ্রন্থে ইংরেজী বাক্যরীতি ও তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। কেরী ও তাহার সহকারী পাদ্রীগণ তাহাদের ধর্ম-

পুস্তক বাংলায় অনুবাদ করিয়া এদেশীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই মিশনারীদের সাড়ম্বর বাংলা গদ্যরীতি ইংরেজী বাক্‌রীতি অনুসরণ করিবার ফলে পরবর্তী বাংলা গদ্যের উপর তাহার প্রভাব ক্ষীণ। কিন্তু তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন এবং ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া বাংলা গদ্যকে একদিকে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া এবং অপর দিকে ছাপাইয়া ব্যাপক প্রসারের পথ উন্মুক্ত করিলেন। তাহা ছাড়া উইলিয়ম কেরী সংস্কৃত পণ্ডিতদের সহযোগিতায় বাংলা গদ্যকে সংস্কৃত আদর্শের অনুগামী করিয়া বাংলা গদ্যের ভাষা পথ একাধারে সুদৃঢ় এবং সুগম করিয়া দিলেন। এই পথেই রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বাংলা গদ্যের বিকাশ সম্ভব করিয়া তুলিলেন। সেইজন্য বাংলা গদ্যের বিকাশে মিশনারীদের অবদান এখনো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

২। প্রশ্ন : ১৮০০ খ্রীঃ অঃ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব পর্যন্ত বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

[ক বি. বি এ পার্ট ওয়ান, ১৯৬২]

অথবা, বঙ্কিম-পূর্ববর্তী বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাটি নির্ণয় কর। [ক বি বি এ ১৯৬৬]

উত্তর : বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড হইতে আগত তরুণ ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা শিখাইবার উদ্দেশ্যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার পূর্বে প্রকৃত প্রস্তাবে এই দেশে ইংরেজী শিক্ষারও প্রবর্তন ঘটে নাই। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সহিত এই দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে চিন্তা-ধারার বিপুল পরিবর্তন সূচিত হইল। তাহা ছাড়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই সর্বপ্রথম সংগঠিতভাবে অনুশীলন আরম্ভ হইল। তাহার পূর্বে বাংলা গদ্য বলিতে কিছু চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, মিশনারীদের রচিত ধর্মগ্রন্থ, বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ ছাড়া আর কিছু ছিল না। সেইজন্য বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে এই খ্রীষ্টাব্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরী এবং তাঁহার অনুচরবর্গ শ্রীরামপুরে একটি প্রোটেস্টান্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারই এই মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য থাকিলেও প্রচারের বাহন হিসাবে ব্যবহার করিতে গিয়া তাঁহারা বাংলা গদ্যেরও অনুশীলন এবং উন্নতি সাধন করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কেরী সাহেব 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' (St. Mathew's Gospel) প্রকাশ করেন। এই মিশন হইতে

দিগদর্শন (১৮১৮) নামক মাসিক পত্রিকা ও সমাচার দর্পণ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই মিশনের ছাপাখানা হইতেই সর্বপ্রথম কাত্তবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত মুদ্রিত হয়।

ইংরেজ সিবিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা প্রদান [illegible] সুপণ্ডিত উইলিয়ম কেরী লক্ষ্য করিলেন যে, বাংলা গদ্য গ্রন্থের [illegible] অভাব। ইংরেজ কর্মচারী ও মিশনারীদের চেষ্টায় যে সব বাংলা [illegible] প্রকাশিত হয়, সেগুলির শব্দযোজনা—পদান্বয় ও বাক্যরীতির মধ্যে [illegible] উৎকট ভাষা-ভঙ্গিমা বর্তমান ছিল, তাহা হইতে জ্ঞান সঞ্চয় [illegible] ছিল।

কেরী ভারতীয় ভাষায় অভিজ্ঞ [illegible] তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ওয়েলেসলি [illegible] বাংলা [illegible] বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত [illegible] এবং একদল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও মুন্সী [illegible] পাঠ্য [illegible] গদ্য গ্রন্থ রচনা করা। প্রথম রচনায় [illegible] তাহার প্রথম হইল কথোপকথন (১৮০১ [illegible] ইতিহাসমালা [illegible] ১৮১২)। [illegible] ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনার সময়ে তিনি [illegible] ব্যাকরণ A Grammar of the Bengali Language [illegible] ইহা ছাড়া তিনি দুইখণ্ড ইংরেজী বাংলা অভিধান রচনা [illegible] সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামরাম বসু, [illegible] মুখোপাধ্যায়, গোলকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন [illegible] তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলির বিষয় ছিল ইতিহাস, জীবনী, গল্প [illegible] লেখার কৌশল ইত্যাদি। উদ্দেশ্যমূলক রচনা হইলেও এই [illegible] বাংলা গদ্যের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। একথা স্মরণীয় যে পণ্ডিত [illegible] বিদ্যালঙ্কারের বাক্যগঠন রীতিতে বাংলা ভাষার [illegible] এই ভাষা কাঠামোর আদর্শে পরবর্তিকালে বিদ্যাসাগর [illegible] উঠে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণের মধ্যে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেন—বত্রিশ সিংহাসন, (১৮০২), হিতোপদেশ (১৮০৮) ও রাজাবলী (১৮০৮)। তাঁহার মৌলিক রচনা ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’ প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে। ইহা ছাড়া রামরাম বসু রচনা করেন প্রতাপাদিত্য-চরিত (১৮০১) ও লিপিমালা (১৮০২)। ইনি আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং প্রথম দিকে উইলিয়ম কেরীর শিক্ষক ছিলেন বলিয়া তিনি ‘কেরী সাহেবের মুন্সী’ নামেও পরিচিত। গোলকনাথ শর্মা রচনা করেন হিতোপদেশ (১৮০২)। এই গ্রন্থটি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। চণ্ডীচরণ মুন্সী রচনা করেন তোতা ইতিহাস। ফারসী ভাষায়

রচিত 'তুতিনামা' গ্রন্থের অনুবাদ এই গ্রন্থটি। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচনা করেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্ (১৮০৫) এবং হরপ্রসাদ রায় মিথিলার বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতি রচিত 'পুরুষ পরীক্ষা' গ্রন্থের অনুবাদ করেন (১৮১৫)।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্গত না হইলেও বিদ্যাসাগর মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতির নির্মিত পথেই বাংলা গদ্য সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। বিদ্যাসাগর তিন শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রথম—সংস্কৃত, ইংরেজী প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ বা অনুবাদ অবলম্বনে রচিত শকুন্তলা (১৮৫৪), সীতার বনবাস (১৮৬০), বেতাল-পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)। দ্বিতীয়—সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় নানা তর্ক-বিতর্কের প্রস্তাব—'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' এবং 'বহু বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' এবং তৃতীয়—আত্মকথনজাতীয় রচনা 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' ও 'বিদ্যাসাগর চরিত'।

বিদ্যাসাগরের বিপরীত রীতিতে বাংলা গদ্যের চর্চা করেন প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে 'টেকচাঁদ ঠাকুর'। বাংলা গদ্যের বিবর্তনে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বাংলা গদ্যে কথ্য ভাষাকে স্থান দিয়া তাহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল'। বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় তিনি নারী শিক্ষা প্রচারের জন্য সহজ চলিত ভাষায় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা বাহির করেন। প্যারীচাঁদের সঙ্গে উল্লেখ করিতে হয় কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম। তাঁহার ব্যঙ্গ রচনা 'হুতোম পেঁচার নকশা'য় তিনি আগাগোড়া কলিকাতার চলতি বুলি প্রয়োগ করিয়া নিপুণ ও তীক্ষ্ণ ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ধ্বনি অনুযায়ী বানান রীতি অনুসরণ করিয়াছেন, সেজন্য ব্যাকরণ-সঙ্গত বানান তিনি গ্রাহ্য করেন নাই।

প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা গদ্যের বিদ্যাসাগরী এবং আলালী—এই দুই রীতি সুসমন্বিত পরিণতি লাভ করিয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন, তাঁহার সৃষ্টিকর্মের যথার্থ বাহনরূপে উন্নীত করিলেন। বঙ্গদর্শন (১৮৭২) পত্রিকার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই বিদ্যাসাগরী এবং আলালী রীতির সংমিশ্রণে বাংলা গদ্যের পরীক্ষা করিলেন। বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যশৈলী নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে আরও দুইজন লেখকের নাম স্মরণীয়। তাঁহারা হইলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুর। ভূদেবের পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২), সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), আচার প্রবন্ধ (১৮৯৫) এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৯৭) উল্লেখযোগ্য। গুরু-গম্ভীর সাধু ভাষা রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। তাঁহার ভাষা সংযত ও পৌরুষমণ্ডিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' একটি চমৎকার গ্রন্থ। ইহার মধ্যে তিনি সংযত ভাষায় সহজ সরলভাবে নিজের স্মৃতি রোমন্থন করিয়াছেন।

৭। প্রশ্ন : (ক) বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান নিরূপণ কর।

[ক. বি বি এ পার্ট ওয়ান, ১৯৬২]

খ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠায় বাংলা সাহিত্য কিভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

[ব বি বি এ পার্ট ওয়ান, ১৯৬৪]

গ) বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতমণ্ডলীর দান নির্ধারণ কর। [ক বি ডিগ্রী (মডিফায়েড), ১৯৬৪]

উত্তর : ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে উদ্দেশ্য ছিল ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি সুদক্ষ সিভিলিয়ানগোষ্ঠী গড়িয়া তোলা। কোম্পানীর প্রশাসনিক কাজে সহায়তার জন্য ইংলণ্ড হইতে যে 'অভিনব যুবক সাহেব'দের আনা হইত তাহারা যাহাতে এদেশের ভাষা এবং রীতি-নীতি বিষয়ে যথার্থ শিক্ষালাভ করিতে পারে সেইজন্য লর্ড ওয়েলেসলি এই কলেজে ব্যাপকভাবে ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারই নির্দেশে বাংলা ভাষা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য উইলিয়ম কেরীকে অনুরোধ জানানো হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কেরী বাংলা ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই বিভাগের পণ্ডিতের পদে নিয়োগ করা হয় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার এবং রামনাথ বাচস্পতিকে। সহকারী রূপে নিযুক্ত হন শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসু।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতেই বাংলা গদ্যের যথার্থ সূচনা হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। কারণ পর্তুগীজ এবং ইংরেজ মিশনের ধর্মপ্রচারকদের চেষ্টায় ইতিপূর্বে যে গদ্য রচিত হইয়াছিল বাংলা গদ্যের পরবর্তী ধারায়

তাহারা অনুবর্তিত হয় নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেই প্রথম বাঙালী লেখকেরা সংগঠিত ভাবে বাংলা গদ্যের বনিয়াদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান মিশনারীদের নিকট বাংলা গদ্য ছিল ধর্ম প্রচারের মাধ্যম মাত্র, ধর্মপ্রসঙ্গই ছিল তাঁহাদের রচনার একমাত্র বিষয়। অন্যপক্ষে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকদের রচনায় অনুবাদ, ইতিহাস জীবনী ও নানাধরনের কাহিনী বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হওয়ায় গদ্য ব্যবহারের সীমা সম্প্রসারিত হয়। বিষয়ের এই বৈচিত্র্যে সদ্যোগঠিত ভাষার শক্তি পরীক্ষার সুযোগ বাড়িয়া যায় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া সর্বপ্রকার ব্যবহারে প্রয়োগের উপযোগী গদ্য গড়িয়া উঠিতে থাকে।

উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে গিয়া ছাত্রদের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের অভাব অনুভব করেন। সেই সময়ে যে দুই একটি গদ্য পুস্তক পাওয়া সম্ভব ছিল তাহা সবই খ্রীষ্টানধর্ম বিষয়ক রচনা; বাংলা গদ্যে কোন গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন তখনও অনুভূত হয় নাই। কেরী তাঁহার নিজের ছাত্রদের জন্য পুস্তক রচনায় অগ্রসর হইলেন প্রধানত তাঁহারই উৎসাহে এবং পরিচালনায় কলেজের অধ্যাপকেরা অনেকগুলি ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই রচনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত' (১৮০১), 'লিপিমালা' (১৮০২), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ 'সিংহাসন' (১৮০২), 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' (১৮৩৩),' গোলকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' (১৮০৫), চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস (১৮০৫), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫) এবং কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পদার্থ কৌমুদী' (১৮২১)। কেরীর নিজের নামে প্রকাশিত হইয়াছিল 'কথোপকথন' (১৮০১) এবং 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)। এই সব গ্রন্থের বিষয়বস্তু যেমন বিচিত্র, রচনা-রীতিতেও তেমনই কোন একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসৃত হয় নাই। রচনার বিষয়বস্তু কেরীই নির্বাচন করিয়া দিতেন, কিন্তু গদ্য ভাষার কোন অনুসরণযোগ্য আদর্শ তখনও ছিল না। লেখকেরা নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং রুচি অনুসারে গদ্যের এক-একটিধরন সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। এইসব গ্রন্থের ভাষায় প্রধানত দুইটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়; সংস্কৃত-ভাষায় যাঁহাদের অধিকার ছিল তাঁহারা প্রধানত সংস্কৃত শব্দ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহাদের ভাষা-রীতিও ছিল সংস্কৃতের অনুগামী। অন্যপক্ষে কাহারও কাহারও রচনায় লোক-প্রচলিত কথ্য বাংলার ছাঁদ অনুসৃত হইয়াছে। কথ্য ভাষার রীতি যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহাদের রচনায় আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার বেশী। এইসব রচনার অধিকাংশই ছিল অনুবাদমূলক, প্রধানত ইংরেজী, সংস্কৃত এবং ফারসী ভাষা হইতে রচনার বিষয় সংগ্রহ করা হইত। রচনার বিষয় যে ভাষা হইতে

সংগৃহ করা হইয়াছে সেই মূল ভাষার প্রভাব অনেক পরিমাণে অনুবাদের ভাষাকেও প্রভাবিত করিয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থাবলীর ভাষায় ছেদচিহ্ন ব্যবহারের অল্পতা প্রধান ত্রুটি; ইহা ছাড়া Parenthesis-এর অতিরিক্ত ব্যবহার এবং দূরান্বয়ের ফলে বাক্যগুলির অর্থবোধ অনেক ক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য। এই লেখকগোষ্ঠীর হাতে ভাষার যে রূপ সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। প্রায়ই একসঙ্গে একাধিক বহুবচনাত্মক বিভক্তি ব্যবহার করা হইত। তৃতীয় এবং সপ্তমীতে 'এতে' বিভক্তির ব্যবহার সাধারণ রীতি ছিল। তৃতীয়ার শব্দের সহিত বিভক্তিচিহ্নের পরিবর্তে অনেক সময় 'করণক' শব্দ ব্যবহার করা হইত, যেমন 'হংস হত হইল পথিক করণক'। ষষ্ঠীর বহুবচনে 'তাহারদিগের' 'রাজারদিগের' এইরূপ পদের ব্যবহার করা হইত। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, বাংলা ভাষার স্বভাবের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যাকরণের সুষ্ঠু রীতি তখনও গড়িয়া ওঠে নাই। পদ গঠনের এই বিচিত্র বিধাতের জন্যই এই সব গ্রন্থের ভাষা কৃত্রিম মনে হয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের মধ্যে রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্য-চরিত বাঙালীর লেখা প্রথম গদ্যগ্রন্থ এবং মৌলিক রচনা। রামরাম বসুর রচনার ভাষায় সাহিত্যিক গুণ ছিল না সত্য কিন্তু তিনি প্রথমতঃ ভাঙ্গাচুরা যে ভাষা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাহাতে কথ্য রীতির গদ্যের একটা পূর্বাভাস পাওয়া যায়। অতিরিক্ত আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার রামরাম বসুর ভাষার প্রধান ত্রুটি। অবশ্য এই ধরনের শব্দ তিনি বিশেষ করিয়া মুসলমান আমলের শাসনব্যবস্থা এবং রাজস্বব্যবস্থার বিবরণ প্রসঙ্গেই ব্যবহার করিয়াছেন, অন্যত্র প্রধানত খাঁটি বাংলা শব্দই ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত **লিপিমালা** তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ। লিপিমালা পত্রাকারে লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সঙ্কলন। 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' এর তুলনায় ইহার ভাষা অনেক উন্নত। ইংরেজ শিক্ষার্থী-দের চলতি ভাষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্যই এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি রচিত হইয়াছিল। লোকপ্রচলিত শব্দ ও ইডিয়মের ব্যবহারে রামরাম বসু তাঁহার রচনায় কথ্য ভাষার ছাঁদটি অনেক পরিমাণে পরিস্ফুট করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাষার 'প্রধান গুণ হইতেছে সরল ও সুগম রীতি এবং লোক প্রচলিত শব্দ ও ইডিয়মের ব্যবহার।' রামরাম বসু যাহা কিছু লিখিয়াছেন সমস্তই মৌলিক রচনা, এই দিক হইতে তাঁহার সহকর্মীদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে রচনাসংখ্যা এবং রচনারীতির

উৎকর্ষ—উভয় দিক হইতেই শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), হিতোপদেশ (১৮০৮), রাজাবলী (১৮০৮), প্রবোধ চন্দ্রিকা (১৮১৩) এবং বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭) এই পাঁচটি গ্রন্থ মৃত্যুঞ্জয় রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ের অন্যান্য লেখকদের মত পাঠ্যপুস্তক রচনাই মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তিনি রচনার বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্যসাধনের জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন। নানা ধরনের বিষয়বস্তু লইয়া গ্রন্থ রচনা করিতে গিয়া ভাষাশৈলীর বৈচিত্র্যসাধনও তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার রচনায় সংস্কৃত-আশ্রিত সাধু ভাষা এবং চলতি ভাষা এই উভয় রীতিরই পরিচ্ছন্ন গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা হইতে চলতি ভাষার একটি নিদর্শন উদ্ধার করিয়া প্রমথ চৌধুরী মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'ইহার গতি মুক্ত; ইহার শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই। আমার বিশ্বাস আমাদের পূর্ববর্তী লেখকেরা যদি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা সুসংস্কৃত ও পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত।" মৃত্যুঞ্জয় রামমোহন রায়ের পূর্বেই সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং রামমোহনের পূর্বে তিনি যে গদ্য লিখিয়া গিয়াছেন তাহা বহু ক্ষেত্রে রামমোহনের রচনা হইতেও উৎকৃষ্ট। প্রতিভায়, পাণ্ডিত্যে রামমোহনের পূর্বে বাঙালি সমাজে সবচেয়ে প্রভাবশালী পুরুষ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়।

বাংলা ভাষার লেখক হিসাবে উইলিয়ম কেরীর কৃতিত্ব বিচার করিবার উপায় নাই। কারণ, তাঁহার নামে প্রচলিত গ্রন্থ দুইটির মধ্যে কতটুকু অংশ তাঁহার নিজের রচনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিন্তু বাংলা গদ্যের প্রস্তুতির পর্বে তিনি ভাষা-বিজ্ঞানীর দৃষ্টি লইয়া বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর পরিচালকরূপে এই সময়ের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার নিয়ামক ছিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণা এই লেখকগোষ্ঠীকে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির সম্ভাবনাযুক্ত এক নূতন সাহিত্যের ভিত্তি রচনার কাজে প্রণোদিত করিয়াছিল। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত এই বিদেশী মনীষীটির নাম তাই চিরদিন সংযুক্ত হইয়া থাকিবে।

৪। প্রশ্ন: বাংলা গদ্য ভাষার ইতিহাসে রামমোহন রায়ের কীর্তির মূল্য নির্ণয় কর।

উত্তর: ইংরেজ রাজত্বের সূচনা পর্বে এই নবাগত বিদেশী রাজশক্তি ভারতের জনচিত্তকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করিয়া দিয়াছিল। আচারের অত্যাচারে এবং চিন্তার স্থবিরতায় ভারতবর্ষীয় সমাজ বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কালজীর্ণ

ধ্যানধারণাগুলিকেই শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া জানিত। তাহারা যখন নিষ্ক্রিয়তায় আচ্ছন্ন হইয়া দিন যাপন করিতেছিল তখন ইংরেজ জাতি এদেশের জীবনের জীর্ণ বনিয়াদকে প্রকম্পিত করিয়া এক অপ্রতিরোধ্য প্রবল শক্তিরূপে আবির্ভূত হইল। রাজনীতিতে, শাসনব্যবস্থা পরিচালনায়, বৈষয়িক সমৃদ্ধিতে এই নবাগত জাতির অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বই সে দিনের সমাজের অগ্রসর শ্রেণীর মনে মোহ বিস্তার করিয়াছিল। ইংরেজ রাজত্বের সূত্রে ভারতবর্ষের ইতিহাস এক নূতন যুগে পদার্পণ করিয়াছে—একথা অনেকেই তখনও অনুভব করিতে পারেন নাই। বহুকালের প্রাচীন ভারতবর্ষীয় জীবন বিন্যাসে যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছিল—তাহার তাৎপর্য সর্বপ্রথম রামমোহন রায়ের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। তিনিই প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই ক্রান্তি লগ্নের যথার্থ বিশিষ্টতা অনুভব করিয়াছিলেন এবং আগামীসম্ভব নূতন সংস্কৃতির বনিয়াদ নির্মাণের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইংরেজের শক্তি তাঁহাকে মোহাচ্ছন্ন করে নাই, সেজন্য তিনিই প্রথম ইংরেজ জাতির যথার্থ পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি যথার্থই বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজ জাতি আধুনিক য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পণ করিয়াছে। বুঝিয়াছিলেন, সমাগত নূতন যুগের আহ্বান বিশ্বের সহিত ঐক্যের আহ্বান। এই আহ্বানে সাড়া দিতে হইলে নিজেকে প্রস্তুত করিতে হইবে। বিজয়ীর প্রসাদ লাভের জন্য যাহারা ইংরেজের দরজায় ভিড় করিয়াছিল তাহাদের অন্তর-বাহিরের দীনতাই ছিল এই মিলনের প্রধান অন্তরায়। অন্য পক্ষে যাহারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে সনাতন প্রথার বাহিরে আসিতে চাহে নাই তাহারাও যুগসত্যের মর্ম উপলব্ধি করিতে পারে নাই। রামমোহন রায় তাঁহার সর্বতোমুখী বুদ্ধি এবং সর্বত্র প্রসারিত হৃদয় লইয়া নির্মোহ দৃষ্টিতে ভারতীয় সভ্যতার মর্মোদ্ধার করিয়া তাহারই ভিত্তিতে বিশ্বের সহিত মিলনের উপায় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার মধ্যে তাঁহার জাগ্রত বুদ্ধি এবং প্রখর আত্মমর্যাদাবোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়। "তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে; কিন্তু সেই অতীত কালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই। তার অন্য দিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবী কালের অভিমুখে। তিনি চিত্তের মধ্যে নিজেকে মুক্তি দিতে পেরেছেন, যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত.. রামমোহন যে কালে বিরাজ করেন সে কাল অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারিনি।" (রবীন্দ্রনাথ)।

রামমোহন রায়ের এই ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে তাঁহার জীবনব্যাপী কর্মে এবং তাঁহার রচনাবলীতে। নবযুগের উদ্বোধনের জন্য মোহমুক্ত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া তিনি অতীত ভারতবর্ষের সাধন-সম্পদের মর্ম উদ্‌ঘাটন ও সর্ব-

সাধারণের জন্য সেই সম্পদ অবারিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলীর একটা বড় অংশ প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে অনুবাদ। ভারতবর্ষের অন্তরাত্মার পরিচয় সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরার আকাঙ্ক্ষাই ছিল এই জাতীয় রচনার মূল প্রেরণা। এই উদ্দেশ্যেই তিনি 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্ত সার' (১৮১৫) এবং কয়েকটি উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বজাতির চক্ষে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্যই তিনি বেদ ও পুরাণ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া সকলের অধিগম্য ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই কাজে তিনি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন কিন্তু আপন শক্তির বলে সেই বাধা অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আত্মবিস্মৃত জাতির জীবনে নবজাগরণ সম্ভব হইয়াছে।

[illegible] তিনি যুগের [illegible] দাসত্বভাব [illegible] তাহার মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন, সেই দাসত্ব [illegible] এবং সেই আদর্শের বাস্তব রূপায়িত করিয়া তোলা সহজসাধ্য ছিল না [illegible]। [illegible] পদে পদে তাঁহাকে বাধা দিয়াছে, [illegible] সম্মুখীন [illegible]। এই [illegible] সম্মুখে দাঁড়াইবার জন্য এবং আধুনিক যুগের [illegible] তাহাকে নবযুগের [illegible] পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু সমাজকে তিনি প্রচলিত [illegible] বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন—তাই সমাজের নানাবিধ কুসংস্কারের [illegible]। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে [illegible] সমাজের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। [illegible] একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে গিয়াও তাহাকে [illegible] প্রাচীন সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সমাজে ধর্ম [illegible] লাভ করিয়াছে। এই বিতর্ক [illegible] ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ' (১৮১৮), [illegible] সহিত বিচার (১৮২[illegible]) 'পথ্য প্রদান' সহমরণ বিষয়ক (১৮২৯) প্রভৃতি রচনা লিখিত হইয়াছিল। [illegible] ক্রিয়াপদের উপযুক্ত ব্যবহার এবং বিরতি-চিহ্নের ব্যবহারের কোন স্থির আদর্শ না থাকায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে তখনকার কোন রচনার অর্থ উদ্ধার করা সহজ ছিল না। বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় গদ্যপাঠের নিয়ম সম্পর্কে তিনি যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন সেই আলোচনায়, এই সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার সচেতনতা এবং সতর্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহনের নিজের রচনার ভাষা ত্রুটিহীন ছিল না। ক্রিয়াপদের দুর্বলতা, বিরতিচিহ্নের বিরল ব্যবহার এবং কোথাও পণ্ডিতী রীতির অনুসৃতিতে তাঁহার ভাষাকেও

মাঝে মাঝে পারিপাট্যহীন মনে হয়। তবুও ভাষার প্রাঞ্জলতার দিক হইতে রামমোহন যে সে যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তখনকার অগঠিত বাংলা গদ্যেই তিনি গভীরতম দার্শনিক তত্ত্ব এবং সমাজের জটিলতম সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিষয় যাহাই হউক, যুক্তি সংবদ্ধ সুনির্দিষ্ট বক্তব্য তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। প্রতিটি বাক্য অন্তর্নিহিত যুক্তির বন্ধনে সংবদ্ধ হইয়া নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইয়া যায়। যুক্তির ভাষা মননশীলতার ভাষারূপে গদ্যের একটা পরিচ্ছন্ন রূপ রামমোহন যে গড়িয়া তুলিয়াছেন, বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ইতিহাসে ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রামমোহনের ভাষা সম্পর্কে যথার্থই বলিয়াছিলেন, "তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদঘটিত বিষয় লেখার মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।" রামমোহন কখনও বর্ণনাত্মক গদ্য লেখেন নাই, তিনি বিচার-বিতর্কের প্রয়োজনেই গদ্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। বুদ্ধি সাধনার ভাষারূপে গদ্যের মধ্যে যতদূর সম্ভব প্রাঞ্জলতা সঞ্চার করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল এবং এই দিক হইতে তাঁহার সাফল্য তর্কাতীত।

৫। প্রশ্ন: (ক) "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।"—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনাবলীর পরিচয় দাও এবং প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

(খ) বাংলা গদ্যের বিকাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দানের পরিমাপ কর।

[ক বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫]

(গ) 'বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দান সম্পর্কে আলোচনা কর এবং এই প্রসঙ্গে "বাংলা সাধুভাষার গদ্যের জনক বিদ্যাসাগর"—এই উক্তিটির সত্যতা বিচার কর।

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩]

উত্তর: 'বিদ্যাসাগর' ও 'দয়ার সাগর' রূপে যিনি বাঙালী জাতির নমস্য সেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শুধু মাত্র পণ্ডিত ও সমাজ-সংস্কারকই ছিলেন না, ছিলেন একনিষ্ঠ শিক্ষা-সংস্কারকও। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি নূতন করিয়া সাজাইয়া তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে ছিলেন আগ্রহী। তাই বাংলা

গদ্যের প্রস্তুতি পর্বে তাঁহার দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহিত্যিক জীবনের প্রসার ১৮৪৭ হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এবং খণ্ড প্রবন্ধ লইয়া তিনি প্রায় ২০ খানি পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। সংখ্যার হিসাবে তাঁহার সাহিত্যকীর্তি বিপুল নয়, কিন্তু এই সব রচনায় ভাষার যে রূপ তিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তাহা এক মহৎ কীর্তিরূপে স্বীকৃত। কর্ম-জীবনের প্রথম দিকে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি 'বাসুদেব চরিত' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বাসুদেব চরিত কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' মুদ্রিত রচনাবলীর মধ্যে প্রথম রচনা। ইহার পর শকুন্তলা (১৮৫৪), সীতার বনবাস (১৮৬০), মহাভারতের উপক্রমণিকা (১৮৬০), বাংলার ইতিহাস (১৮৪৮), জীবন চরিত (১৮৪৯), বোধোদয় (১৮৫১), কথামালা (১৮৬৯) এবং ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) প্রকাশিত হয়।

মহাকবি শেকস্‌পীয়র রচিত 'Comedy of Errors'-এর উপন্যাসধর্মী বঙ্গানুবাদ 'ভ্রান্তিবিলাস' আক্ষরিক অনুবাদ নয়, লেখক মূল ঘটনাকে পাঠক-বর্গের সুবিধার জন্য স্বদেশের পটভূমিকায় স্থাপন করিয়াছেন এবং পাত্র-পাত্রীর নামও পরিবর্তন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থগুলির সবকয়টিরই বিষয়বস্তু সংস্কৃত অথবা ইংরেজী গ্রন্থ হইতে আহৃত, তাই অনেকে ইহাদের মৌলিক রচনার সম্মান দিতে কুণ্ঠিত। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুবাদক এবং পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তির দৈন্যের জন্যই যে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত এবং ইংরেজী হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। তাঁহার রচনাগুলি মূল গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া পড়িলে দেখা যায়, কাহিনী উপস্থাপনের ভঙ্গিতে এবং বর্ণনারীতিতে তিনি যে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহার ফলে রচনাগুলি সম্পূর্ণই নূতন আকার লাভ করিয়াছে। এক-মাত্র মহাভারতের অনুবাদটিই মূলানুগ, অন্য সমস্ত রচনাই এই অসাধারণ ভাষাশিল্পীর বিশিষ্ট প্রতিভার স্পর্শে নূতন সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। ভাষার কলানৈপুণ্যই এই রূপান্তরের প্রধান কারণ এবং এই প্রসঙ্গটিই বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের লেখকদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে শ্রীমণ্ডিত উন্নত ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন—এই প্রশ্নে বিতর্কের অবকাশ আছে। উপরন্তু মনে রাখা উচিত ভাষা একটি স্থির অচল বস্তু নয়। প্রাণবান ভাষা নিত্য বিবর্তিত হইতে থাকে এবং এই বিবর্তনে সমস্ত লেখকের দানই

গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায় বা অন্যান্য লেখকদের কাহারও প্রতি অবিচার না করিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ কৃতিত্ব কোথায় তাহা বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগরের পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গলা গদ্য যে শক্তি অর্জন করিয়াছিল তাহার যে কোন বিষয়েরই প্রকাশ মাধ্যমরূপে এই ভাষার সামর্থ্য সম্পর্কে সংশয়ের কোন অবকাশ ছিল না। কোন ভাষার পক্ষে এই শক্তি অর্জন করাও কম গৌরবের কথা নয় এবং যে সব লেখকের চেষ্টায় গদ্য ভাষা এই সামর্থ্য অর্জন করিয়াছিল তাঁহাদের কৃতিত্বও কম নয়। কিন্তু জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাপন করা এবং হৃদয়ানুভূতি অন্যের চিত্তে সঞ্চার করা ছাড়াও ভাষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ কল্পনাকে রূপায়িত করা। এই বাস্তব জগতের রূপই তাহার কল্পনার ভিত্তি। এই কল্পনার রূপায়ণের কাজ যখন শুরু হয় তখনই ভাষার যথার্থ সৃষ্টি-পর্বের সূচনা হয়। বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাংলা গদ্যের যে নিদর্শন আমরা পাই তাহার মধ্যে সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর কোথাও নাই। বিদ্যাসাগরের প্রধান গ্রন্থগুলিতে তিনি বর্ণনাত্মক গদ্যের যে রূপসৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে জীবন ও জগতের বিচিত্র চিত্রপ্রবাহ দেখিতে পাই। যথাযথ ভাবে অর্থজ্ঞাপনের অতিরিক্ত একটা শক্তি এই ভাষায় সঞ্চারিত হইয়াছে। বিষয়বস্তু যাহাই হউক, যে ভাষায় সেই বিষয় উপস্থাপিত হইতেছে তাহার নিজস্ব সৌন্দর্য যদি না থাকে তবে রচনা সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বপ্রথম গদ্যের নিজস্ব সৌন্দর্য পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছিলেন। "ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে, সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। বাংলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরতা হইতে মুক্ত করিয়া তাহার পদগুলির মধ্যে অংশ যোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলির নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন" (রবীন্দ্রনাথ)। এইভাবে তিনি গদ্য রচনাকে শিল্পকর্মের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল বিধবা বিবাহ আন্দোলন, বহুবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ, যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন প্রভৃতি সংস্কারমূলক কাজে। সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম—১৮৫৫, ২য়—১৮৫৫) এবং 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এত-

বিষয়ক বিচার' (১ম—১৮৭১, ২য়—১৮৭৩) নামে চারিখানি পুস্তিকা তিনি রচনা করিয়াছিলেন। এই সব রচনায় বিদ্যাসাগরের বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য এবং যুক্তিনিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় ভাষায় লিখিত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসরূপে তাঁহার 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) নামক পুস্তিকাটি ঐতিহাসিক মর্যাদা সম্পন্ন রচনা।

সামাজিক কুপ্রথা উচ্ছেদের জন্য বিদ্যাসাগর যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা রক্ষণশীল সমাজ-নেতাদের প্রবল বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করিয়া তখন পত্রিকায় যে সব রচনা প্রকাশিত হইত তাহা তিনি নীরবে সহ্য করেন নাই। প্রতিপক্ষের দাম্ভিকতা এবং মূঢ়তার প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে বিদ্যাসাগর যে সব ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) এবং 'ব্রজ বিলাস' (১৮৮৭)। 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য'—ছদ্মনামে এই রচনাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। সামাজিক প্রথাগুলির মূল্য বিচারের জন্য বিদ্যাসাগর যুক্তির পথেই অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিরোধী পক্ষ যুক্তির পরিবর্তে উপহাস এবং কটূক্তির আশ্রয় নিতেন। তিনি পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি ধর্মশাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াও বাদীর প্রতি উপহাস বাক্য, কটূক্তি প্রয়োগ করা এদেশের বিজ্ঞের লক্ষণ।" অতএব আক্রান্ত হইলেই প্রতি-আক্রমণের জন্য তিনিও উপহাস এবং কটূক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। বিদ্যাসাগরের এই রচনার ভাষাভঙ্গি অন্য রচনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এইসব রচনায় তৎসম শব্দের পরিবর্তে প্রাকৃতোদ্ভূত, বিদেশী হইতে গৃহীত এবং তদ্ভব শব্দের ব্যবহার বেশী এবং সাধু ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইলেও কথ্য ভাষার তীক্ষ্ণতাই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিদ্যাসাগর যে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী ও উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রচেষ্টা হইতেই পাওয়া যায়। তিনি মার্শম্যানের রচিত 'History of Bengal' অবলম্বনে বাংলার ইতিহাস (১৮৪৮) এবং চেম্বার্সের 'Rudiments of Knowledge' ও 'Biography' অবলম্বনে বোধোদয় (১৮৫১) ও জীবন চরিত (১৮৪৯) রচনা করেন। ইহা ছাড়া 'বর্ণ পরিচয়', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'নীতিবোধ' প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন।

বিদ্যাসাগর আত্মজীবনী রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অসম্পূর্ণ আত্মচরিত তাঁহার মৃত্যুর পরে 'বিদ্যাসাগর চরিত, (১৮৯১) নামে প্রকাশিত হয়। তাঁহার আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৬৩)। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশু

৫। প্রভাবতীর মৃত্যুতে শোকাভিভূত হইয়া বিদ্যাসাগর এই নিবন্ধটি রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও মূলতঃ হৃদয়বাদী ছিলেন। তাঁহার রচনায় হৃদয়ের উত্তাপ সঞ্চারিত হওয়ায় তাহা সহজেই পাঠক চিত্তে সংবেদনা সৃষ্টি করে। গদ্যশিল্পী হিসাবে এইখানেই বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব।

৬। **প্রশ্ন ঃ বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের স্থান নির্ণয় কর।** [ক. বি. ১৯৬৮]

[**উত্তর-সংকেত ঃ** ১নং, ৫নং প্রশ্নের উত্তর ও ৭নং প্রশ্নের উত্তরে **দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর** শীর্ষক অংশ লইয়া উত্তর রচনা করিতে হইবে।]

৭। **প্রশ্ন ঃ সাহিত্যিক গদ্যের সৃষ্টিতে ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, আলালী ও হুতোমী রীতির দান কি তাহা নির্ণয় কর।**

[ক. বি. বি এ পার্ট ওয়ান. ১৯৬৫]

অথবা, **বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও প্যারীচাঁদের দানের পরিমাণ নির্ণয় কর।** [ক. বি. ১৯৭০]

উত্তর ঃ ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পর্কে ৫নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

অক্ষয়কুমার দত্ত—অক্ষয়কুমার দত্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার (ভাদ্র ১২৫০) সম্পাদক এবং প্রধান লেখক ছিলেন। আধুনিক রীতির বাংলা গদ্যের তিনিই ছিলেন প্রথম সুলেখক। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ জর্জ কুম্বের (১৭৮৮-১৮৫৮) সামাজিক মত তাঁহার বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি জর্জ কুম্বের 'Constitution of Man' অবলম্বনে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (প্রথম ভাগ ১৮৫২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩) রচনা করেন। অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ রচনা 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (প্রথম ভাগ ১৮৭০, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩)। হোরেস হ্যম্যান উইলসন রচিত 'Sketch on the Religious Sects of the Hindus' অবলম্বনে রচিত। তাহা ছাড়া অক্ষয়কুমার কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন—ভূগোল (১২৪৮), চারুপাঠ (প্রথম ভাগ ১৮৫২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতীয় ভাগ (১৮৫৯) এবং পদার্থ বিদ্যা (১৮৫৬)।

অক্ষয়কুমারের দৃষ্টি ছিল বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সংস্কারমুক্ত এবং যুক্তিনিষ্ঠ। সেজন্য তিনি প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র বেদবেদান্ত উপনিষদকেও ঈশ্বরের

মুখনিঃসৃত বাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। জগৎ ও জীবনের প্রতি বৈজ্ঞানিক, কার্যকারণাত্মক ও বস্তুগ্রাহ্য মনোভাবই বাংলা গদ্যে অক্ষয়কুমারের বিশেষ অবদান।

অক্ষয়কুমার রসস্রষ্টা সাহিত্যিক ছিলেন না। সেজন্য তাঁহার রচনাভঙ্গিতে মাধুর্যগুণ প্রধান হয় নাই। তাঁহার লেখা ছিল বিষয়বস্তুর উপযোগী, প্রকাশ-ক্ষম, ব্যবহারোপযোগী এবং প্রসাদগুণ বিশিষ্ট। সেইজন্য তাঁহার রচনায় তৎসম শব্দের বাহুল্য ছিল। বাংলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের তিনিই আদি রচয়িতা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—তত্ত্ববোধিনী সভার এবং পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একজন প্রধান লেখক ছিলেন। তিনি সেকালের একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের একজন সাধক। তিনি ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে যে সব বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাই পরে ব্রাহ্মধর্ম (১৮৬২), ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা (১৮৬৯-৭২) ইত্যাদি নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনচরিত (১৮৯৮) বাংলা ভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

দেবেন্দ্রনাথের রচনারীতি ছিল সবল, সরস, সংযত ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, "বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা প্রথম প্রবর্তিত করেন। ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতাব মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যা অতি প্রসিদ্ধ, উহা তড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তুলে এবং মনশ্চক্ষুসমক্ষে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে। তিনি তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা প্রকাশ না কবিলে এবং বহুল আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকারপূর্বক প্রথম প্রথম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রস্তাবগুলি বিশেষরূপে সংশোধিত করিয়া না দিলে বাঙ্গলা ভাষার বর্তমান উন্নতির পত্তনভূমি সংস্থাপিত হইত না।

প্যারীচাঁদ মিত্র—প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) নামক সাময়িক পত্রিকাটির প্রকাশ সাহিত্যে চলতি ভাষার মর্যাদা স্বীকৃতির দিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় মন্তব্যে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছিল, "যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।" এই পত্রিকাতেই প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) গ্রন্থের অধিকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্যারীচাঁদ "টেকচাঁদ ঠাকুর" ছদ্মনামে লিখিতেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি

উপায়' (১৮৫৯), রামারঞ্জিকা (১৮৬০), অভেদী (১৮৭১) এবং আধ্যাত্মিকা (১৮৮০)।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসাবে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' ঐতিহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থ; তেমনই পূর্বোপর দুশ্যত চলতি-ভাষার ব্যবহারের দ্বারা তিনি এই গ্রন্থে চলতিভাষার মর্যাদা স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে কোন লেখক সংস্কৃতের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়া বাংলা গদ্য রচনায় এমন দুঃসাহস প্রকাশ করেন নাই। প্যারীচাঁদ চরিত্র এবং পরিবেশ অনুযায়ী গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কথিত ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। লোকমুখে প্রচলিত ভাষা তিনি বহুক্ষেত্রে অপরিমার্জিতভাবেই ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং কথ্য ভাষার মধ্যেও যে সর্বজনভোগ্য রসোদ্রেক ক্ষমতা থাকিতে পারে তাহার বিস্ময়কর প্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের কীর্তির মূল্য বিচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল, যে বাঙ্গালা সর্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজগুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে।...প্যারীচাদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি-কর্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।" আলালের ঘরের দুলালের মতই কথ্য ভাষায় প্যারীচাঁদ 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' নামক গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন। জীবনের বাস্তব রূপ পরিস্ফুট করিবার জন্য বাস্তব জীবনের রসে পুষ্ট ভাষা ব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত এই দুইটি গ্রন্থে তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন পরবর্তী কালে মধুসূদন এবং দীনবন্ধু সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের অবিস্মরণীয় প্রহসনগুলি রচনা করিয়াছেন। গদ্যের সাধুরীতি এবং সংস্কৃত প্রভাব যতদূর সম্ভব বর্জন করাই প্যারীচাঁদের প্রধান অভিপ্রায় ছিল। তাই সাধুভাষাও তাঁহার হাতে জটিলতা-মুক্ত এবং স্বাভাবিক হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অন্যান্য পুস্তকে সাধু ভাষাই প্রধানত ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু সেই ভাষা বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভাষাগত বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া তাঁহার সাধুভাষাতেও সর্বত্র দেশী শব্দ এবং ইডিয়মের ব্যবহার করিয়াছেন। সমাসবদ্ধ পদ পরিহার ও যৌগিক বাক্যের পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত সরল বাক্য গঠন এবং অর্থসঙ্গতি রক্ষা করিয়া খাঁটি বাংলা শব্দের প্রয়োগের ফলে সাধুরীতির গদ্য তাঁহার রচনায়

আশ্চর্য স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার ভাষার শক্তি এবং সৌন্দর্য তাঁর যথাযথ ভাবে সাধু ভাষার [illegible] যদি একমাত্র তাহা হইলেই যে আদর্শ বাংলা গদ্যের রূপ [illegible] পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার লেখকবৃন্দ সম্মুখে দৃষ্টান্তের [illegible] হিসাবে [illegible] গিয়াছেন।

[illegible] ভাষায় প্রথম রচনার সে দৃষ্টান্ত 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ স্থাপিত হইয়াছিল সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৩১—১৮৭২) তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' (১৮৬২) লেখেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' খণ্ড খণ্ড রচনার সংকলন। ইংরেজ শাসনের রাজধানীরূপে কলিকাতা নগরী সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এখানে বসবাস করিতে শুরু করে। এই নাগরিক সমাজে নানা শ্রেণী নানা স্তর এক একটি বৈশিষ্ট্য লইয়া বিকশিত হইতে থাকে। একদিকে যেমন বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির সমাবেশে কলিকাতার জীবনের একাংশে সংস্কৃতির নবরূপ নির্মিত হইয়া উঠিতেছিল, অন্যদিকে তেমনই আধুনিকতার নামে অনুকরণ-সর্বস্ব ভ্রষ্টাচার এবং চারিত্রিক বিকার-বিকৃতি ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রহসন ও ব্যঙ্গ রচনায় নাগরিক জীবনের বিকার-বিকৃতিই প্রধান বিষয়বস্তুরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' অদ্বিতীয় গ্রন্থ। ভাষার দিক হইতে প্যারীচাঁদের অনুগামী হইলেও কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। প্যারীচাঁদ চলতি ভাষার শব্দ-সম্পদ এবং বাগ্‌ভঙ্গি ব্যবহার করিলেও তাঁহার আলালের ঘরের দুলালের ভাষায় ক্রিয়াপদে এবং বাক্যের গঠনে সাধু-রীতির প্রভাব সর্বত্র অস্বীকার করিতে পারেন নাই। হুতোমের ভাষায় এইরূপ মিশ্রণ কোথাও নাই। কলিকাতার মানুষের মুখের বুলি এবং গ্রামাঞ্চলের কথ্য ভাষার এমন অবিমিশ্র প্রয়োগ বাংলা সাহিত্যে আর কোন গ্রন্থে দেখা যায় নাই। তিনি কথ্য ভাষায় বিশেষ বিশেষ শব্দের উচ্চারণের ধ্বনি-রূপটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বহুক্ষেত্রে বানানের সাধারণ নিয়ম উপেক্ষা করিয়া ধ্বনি অনুসারে বানান লিখিয়াছেন। হুতোমের ভাষা নির্মম শ্লেষের ভাষা। যাহারা তাহার বিদ্রূপের লক্ষ্য তাহাদের কশাঘাত করিবার জন্য তিনি অশ্লীলতার সীমা মানেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র রুচিহীনতার অভিযোগে হুতোমকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নক্শাগুলি রচনার মূলে সমাজের বিকার বিকৃতি দূর করিবার যে মহৎ অভিপ্রায় ছিল তাহা মনে রাখিলে এইরূপ অভিযোগের কোন কারণ থাকে না। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' বাংলাদেশের বিশেষত কলিকাতার সামাজিক ইতিহাসের একখানি মূল্যবান দলিলরূপে চিরদিন সমাদৃত হইবে।

৮। প্রশ্ন ঃ বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিচয় দাও।

অথবা, **বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ শাখার অগ্রগতির একটি ধারাবাহিক বিবরণ দাও।** [ক বি ১৯৬৭]

অথবা, **বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান কি তাহা তাঁহার প্রবন্ধ রচনার উল্লেখ করিয়া নির্ণয় কর।** [উ. বঙ্গ বি. ১৯৬৯]

উত্তর ঃ 'প্রবন্ধ' শব্দটি আধুনিক সাহিত্যে ইংরেজী 'essay'-র মত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অবলম্বনে, ভাবগত ঐক্য বা যুক্তিশৃংখলা সমন্বিত পরিমিত আয়তনের যে-কোন গদ্য রচনাকে প্রবন্ধ নামে অভিহিত করা হয়। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে 'প্রবন্ধ' শব্দটি রচনার শ্রেণীর পরিবর্তে রচনার একটি বিশেষ গুণ বুঝাইতে ব্যবহার করা হইত। কোন রচনার প্রতিটি অংশের অন্তর্গত পারস্পরিক অন্বয় বা প্রকৃষ্ট বন্ধনকেই অলংকার শাস্ত্রে প্রবন্ধ বলা হইত। বাংলা ভাষায় রচনার শ্রেণীবিশেষকে প্রবন্ধ নামে অভিহিত করা হইলেও ইহার ধাতুগত অর্থ 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' এই জাতীয় রচনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বিষয় যাহাই হউক রচনার প্রথম বাক্য হইতে শেষ বাক্যটি পর্যন্ত যুক্তির বন্ধন বা ভাবনাগত ঐক্য বন্ধন না থাকিলে তাহাকে প্রবন্ধ নামে অভিহিত করা যায় না। যুক্তির পারম্পর্য বা ভাবনা প্রবাহের স্তরপরম্পরা অনুযায়ী অনুচ্ছেদ বিন্যাস প্রবন্ধের [illegible] গঠনের মূল কৌশল।

প্রবন্ধ যেহেতু গদ্য ভাষাতেই লিখিত হয় তাই গদ্যের বিকাশের সহিত সাহিত্যের এই শাখাটির বিকাশও [illegible] সম্পৃক্ত। সাধারণত পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতার [illegible] এই শ্রেণীর রচনার উদ্ভব হইয়া থাকে। পত্র-পত্রিকার স্বল্প পরিসরের মধ্যে নানা ধরনের রচনা পরিবেশন করিতে হয়, তাই সংক্ষিপ্ত অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনার উপর [illegible] পত্রিকাগুলিকে নির্ভর করিতে হয়। বাংলা গদ্যের সূচনা কাল হইতেই নানা [illegible] পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। বাংলা গদ্যের প্রধান লেখক [illegible] সকলেই কোন না কোন পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন এবং সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা তাঁদের ভাষা চর্চার প্রধান ক্ষেত্র ছিল। ফলে প্রধানত সাময়িক পত্রিকাগুলিকে আশ্রয় করিয়াই বাংলা গদ্য এবং প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশ [illegible] হইয়াছে।

বাংলা গদ্যের প্রথম লেখকগোষ্ঠী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকবৃন্দ। ইঁহাদের রচনা গ্রন্থাকারেই প্রকাশিত হইত। কোন কোন গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত এবং ধারাবাহিকতাহীন খণ্ড খণ্ড রচনা সংকলন করা হইত। এইসব গ্রন্থের খণ্ড রচনাগুলিতে বাংলা প্রবন্ধের আদি রূপ পাওয়া যায়। রামরাম বসুর 'লিপিমালা' (১৮০২) এই ধরনের একটি [illegible] গ্রন্থ। পত্রাকারে লিখিত

৪০টি খন্ড রচনার মধ্যে অনেগুলি প্রবন্ধের আকার লাভ করিয়াছিল। কেরীর ইতিহাসমালা (১৮১২) বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩ গ্রন্থ দুইটির কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিন্তু যথার্থভাবে প্রবন্ধ সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ধর্ম সম্পর্কিত বিতর্কের সূত্রে। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দ, খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় ও রামমোহনের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে যে বিচার-বিতর্কের সূচনা হয় সেই বিতর্কমূলক রচনাবলীতেই বাংলা প্রবন্ধের কায়া গঠিত হইয়া উঠে। এই সব রচনার উদ্দেশ্য ছিল প্রতিপক্ষকে আক্রমণ এবং বিরুদ্ধবাদীদের মতামত খণ্ডন। প্রতিপক্ষের বক্তব্য খণ্ডন করিয়া আপন মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য এই লেখকেরা তথ্য-প্রমাণ, বিচার বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইতেন। বিশেষভাবে রামমোহনের রচনায় সিদ্ধান্তের সপক্ষে পুরাণ-ইতিহাস এবং শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য সমাবেশ এবং আহরিত তথ্য যুক্তির শৃঙ্খলে সংবদ্ধ করিয়া নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যে প্রয়াস দেখা যায় তাহাতেই প্রবন্ধের আদর্শটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

রামমোহনের পরবর্তী যুগের প্রধান লেখকেরা সকলেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে সব বক্তৃতা দিতেন পরে সেগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। দেবেন্দ্রনাথের এই রচনাগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের নিদর্শন। তাঁহার ধর্মবিষয়ক রচনায় তথ্য এবং যুক্তির প্রাচুর্য ছিল না। তিনি নিজের গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথাই অকৃত্রিম, সুষমামণ্ডিত ভাষায় প্রকাশ করিতেন। রামমোহনের রচনার মধ্যে যেমন যুক্তি-বিচারের একটা নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গি আছে দেবেন্দ্রনাথের রচনায় তাহা নাই। তাঁহার রচনায় তাঁহার ব্যক্তিরূপেরই আনন্দ বেদনার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের দুটি শ্রেণী দেখা যায়। এক শ্রেণীর প্রবন্ধের লেখকের উদ্দেশ্য কোন নূতন জ্ঞানের কথা, নূতন তত্ত্ব বা তথ্য পাঠককে জানানো। এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনায় বিষয়টাই প্রধান। আর এক শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে যেখানে বিষয়বস্তু যাহাই হউক লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশটাই প্রধান হইয়া উঠে। লেখকের আনন্দ-বেদনা, তাঁহার মানসপ্রকৃতির ধ্যান-ধারণার বিশিষ্টতা এই সব রচনার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া এমনভাবে প্রকাশ পায় যে, এই সব প্রবন্ধ তত্ত্ব ও তথ্য জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া সৃষ্টিশীল সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই ধরনের রচনাকে 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' বা 'রচনা সাহিত্য' নামে অভিহিত করিয়া ইহার স্বাতন্ত্র্য

নির্দেশ করা হইয়া থাকে। দেবেন্দ্রনাথের লেখায় ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ধর্ম অনেক পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছিল বলা যায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাবলীও এই পত্রিকাতে প্রথমে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়া পরে গ্রন্থে সংকলিত হয়। তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে তত্ত্বালোচনামূলক প্রবন্ধের পরিচ্ছন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। আজও বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের নিতান্ত অভাব, কিন্তু অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া বাংলা গদ্যের সামর্থ্য তর্কাতীতভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাংলাদেশের চিত্ত যখন চিরাভ্যস্ত জড়তা হইতে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল—সেই জাগরণের দিনে শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যতকিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই গদ্যভাষায় প্রবন্ধের আকারে সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কিত রচনা 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' এবং 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' নামক চারিটি প্রবন্ধের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' ভারতীয় ভাষায় লিখিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস। বঙ্কিম-পূর্বযুগের সিরিয়স প্রবন্ধের মধ্যে এই রচনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪)। ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে অজস্র প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্বকীয়তায় উজ্জ্বল এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই। রক্ষণশীল সমাজের পণ্ডিতদের মতো অন্ধ সংস্কারের বশে তিনি হিন্দু আদর্শের গৌরব করেন নাই; প্রখর যুক্তির আলোকে হিন্দু সমাজের রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই যুক্তিনিষ্ঠাতেই তাঁহার আধুনিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূদেবের ভাষাও ছিল একান্তভাবে যুক্তিনিষ্ঠ মনের বাহন। জ্ঞানের কথা প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করাই বিচার-বিতর্কমূলক রচনার ভাষার আদর্শ এবং এদিক হইতে বিচার করিলে ভূদেবের ভাষা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মনে হয়। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২), সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), বিবিধ প্রবন্ধ (দুইখণ্ড, ১৮৯৫ এবং ১৯০৫) গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলির জনাই তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া আছেন।

বাংলা প্রবন্ধ পরিপূর্ণতা লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। "যে প্রবন্ধ এতদিন নাতিসূক্ষ্ম চিন্তা মননের বাহন ছিল, যাহার পরিধি জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের তথ্য ও তত্ত্বের গুরুভারক্লিষ্ট, মন্থরগতি সারসংকলনে সীমাবদ্ধ ছিল তাহা অকস্মাৎ প্রতিভার স্পর্শে প্রাণের বিচিত্র ছন্দায়িত স্পন্দনে আন্দোলিত, জীবন তরঙ্গের বহুমুখী উদ্বেলতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ইহার স্থলে প্রয়োজনাত্মক উচ্চারণ-শ্লথতার মধ্যে শ্লেষ-ব্যঙ্গ-তির্যক ভাষণের তীক্ষ্ণতা, পরিহাস-রসিকতার চমক, আবেগের ভাবমুগ্ধতা, গীতিকবিতার সুরের উচ্ছ্বাস, জীবন পর্যালোচনার অন্তরঙ্গ অন্তর্মুখিতা, ক্ষোভ-অনুযোগ-আশানৈরাশ্যের সম্মিলিত ঐকতান—মানবকণ্ঠের সমস্ত সুরগ্রাম, অনুভূতির সর্বসঞ্চারী ভাব-সমষ্টি আপনাদের বাক-ছন্দটি খুঁজিয়া পাইয়াছে।...বঙ্কিমের হাতে প্রবন্ধের এক নবজন্ম পরিগ্রহ ঘটিল। জ্ঞানপ্রধান প্রবন্ধ ভাবপ্রধান রসরচনার রূপ গ্রহণ করিল।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। বঙ্কিম নূতন শব্দসম্ভার সৃষ্টি করেন নাই। তাহার পদবিন্যাস রীতিও অনেকক্ষেত্রে পূর্ববর্তী লেখকদের অনুবর্তী। কিন্তু তাঁহার গদ্য ভাষার ছত্রে ছত্রে কি এক বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া আছে—যে শক্তির স্পর্শে প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি পদ সজীব এবং প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে। প্রবন্ধের গঠনের দিক হইতে অনুচ্ছেদ বিন্যাস অনুযায়ী বিভিন্ন পরিমাপের অনুচ্ছেদ পর পর সাজাইয়া প্রবন্ধের কায়া গঠনগত সৌন্দর্য সুসম্পন্ন করিবার সজ্ঞান-প্রয়াস বঙ্কিমচন্দ্রেই দেখা যায়।

সাময়িক পত্রিকার আশ্রয়েই বাংলা প্রবন্ধের জন্ম ও পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রেরও প্রবন্ধ রচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাপূরণের জন্য তাঁহাকে একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিচিত্র রসের প্রবন্ধ বিপুল পরিমাণে রচনা করিতে হইত। বঙ্গদর্শন এবং পরবর্তী কালে 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ পরে 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৪), 'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৭৫), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (দুই খণ্ড) 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮৪), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৬) প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি হাস্যরসাত্মক রচনা, বিজ্ঞান-ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা এবং দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব—এই চারিটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসাত্মক তিনটি গ্রন্থ 'লোকরহস্য', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর মধ্যে কমলাকান্তের দপ্তর শ্রেষ্ঠ রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে কমলাকান্তের দপ্তর-কে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মনে করিতেন। অহিফেন-আসক্ত অর্ধ-উন্মাদ কমলাকান্ত চরিত্রটির জবানীতে তিনি বিচিত্র কৌতুকবহ ভঙ্গিতে জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি প্রজ্ঞার আলোকে, গূঢ় অনুভূতির বলে যে জীবন-দর্শন নিজের অন্তরের

মধ্যে গড়িয়াছেন তাহার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিয়াছে এই গ্রন্থের রচনাগুলিতে। দপ্তরের প্রতিটি চরণে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের স্পর্শ লাভ করা যায়। ব্যক্তিত্ব-প্রধান প্রবন্ধের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় গ্রন্থ।

'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধগুলিতে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানববুদ্ধির অধিগম্য সকল বিষয়ে বঙ্কিম-মনীষার অবাধ অধিকারের প্রমাণ আছে। এই সব প্রবন্ধে শুধু পূর্বগামী পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত বিদ্যার চর্বিত-চর্বণ নহে, প্রতিটি বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র পর্যালোচনা করিয়াছেন স্বকীয় দৃষ্টিকোণ হইতে। তাহার দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতার জন্যই আহৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রবন্ধের বক্তব্যেও একটা নূতন তাৎপর্য আরোপিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রই যথার্থভাবে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। সাহিত্যসম্রাট রূপে বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ এবং পাঠকদের রুচিবোধের সংস্কার সাধনের জন্য সমালোচনার কাজে তাঁহাকে ব্রতী হইতে হইয়াছিল। তাঁহার সমালোচনামূলক প্রবন্ধাবলীতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য এবং বিদেশী সাহিত্যের চিরায়ত গ্রন্থগুলির পর্যালোচনা দ্বারা একটি উচ্চ মানের সাহিত্য আদর্শ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক লেখকদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু, প্যারীচাঁদ মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র প্রভৃতি প্রধান লেখকদের রচনার মূল্য বিচার প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন আজ পর্যন্ত তাহাই চূড়ান্ত রূপে গ্রহণ করা যায়।

জীবনের শেষদিকে বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য এক সর্বজন-যোগ্য আদর্শের অনুসন্ধানে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে গভীর অনুশীলনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থ দুইটিতে তাঁহার পরিণত চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্র এবং পুরাণের পুনর্বিচার করিয়া তিনি আদর্শ মানবরূপে কৃষ্ণচরিত্রকে নূতনভাবে গঠন করিয়াছিলেন।

[illegible] প্রশ্ন [illegible] বাংলা [illegible] সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনে বাংলা সাময়িক পত্রিকার [illegible] বঙ্গদর্শন পর্যন্ত [illegible] পত্রের কর্মবিবরণের [illegible] পর্যালোচনা করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দাও।

[illegible] বাংলা সাময়িক পত্রের আবির্ভাব [illegible] প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আবির্ভাবকাল পর্যন্ত এই আলোচনা সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। [ক. বি. বি. এ পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫]

অথবা, প্রাগ্‌বঙ্গদর্শন বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর [ক. বি. বি. এ পার্ট ওয়ান, ১৯৬৪]

উত্তর ঃ বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাস সাময়িক পত্রের ইতিহাসের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। বস্তুত সাময়িক পত্রকে আশ্রয় করিয়াই গদ্য ভাষা বিবর্তিত ও পরিণত হইয়াছে। সাময়িক পত্র প্রকাশের মূলে থাকে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর উদ্যোগ, 'পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশের জন্য একটি লেখকগোষ্ঠী গড়িয়া তুলিতে হয়। সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় এক একটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া যে লেখকগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে সেই লেখকেরাই সাহিত্যের প্রগতি-ধারাকে পর্ব হইতে পর্বান্তরে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের ক্রমপরিণতির এক একটি স্তরকে তাই বিশেষ পত্রিকার নামে চিহ্নিত করা যায়। আধুনিক সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ সাময়িক পত্রিকা।

মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই বাংলাদেশে সাময়িক পত্রিকার জন্ম হয়। কোন দেশেই সাময়িক পত্র সাহিত্যের পর্যায়ে স্থান পায় না। কিন্তু ভাষার বিকাশে সাময়িক পত্রের দান অনস্বীকার্য। বাংলা গদ্যের বিকাশেও সাময়িক পত্রের অবদান অমূল্য। বাংলা গদ্য চর্চার আদিযুগের শেষ পর্যায়ে সাময়িক পত্রগুলির আবির্ভাব। এই সব পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশনে কটুচপল ভাষার আশ্রয় নেওয়ার ফলে বাংলা গদ্যরীতি অনেকখানি পরিমাণে সুষ্ঠু সরল হইয়া উঠে। বাংলা দেশে ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষেই প্রকাশিত হইয়াছিল। হিকি সাহেবের 'বেঙ্গল গেজেট' ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাংলা সাময়িক পত্রিকার জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। কারণ মুদ্রণ শিল্পের সহায়তা এবং গদ্য ভাষার মাধ্যম ভিন্ন সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করা যায় না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মুদ্রণ-শিল্পের বৈপ্লবিক সহায়তা দান করিয়া শ্রীরামপুর মিশন বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রগতি ত্বরান্বিত করিয়া তোলে। এই শ্রীরামপুর মিশন হইতে ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। পত্রিকাটির নাম ছিল 'দিগ্‌দর্শন'। দিগদর্শন মাসিক পত্রিকা ছিল। এই বৎসরেই মে মাসে শ্রীরামপুর হইতে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা কার্যে মার্শম্যানকে সাহায্য করিতেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, তারিণীচরণ শিরোমণি প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। সংবাদ রচনায় যে এই পণ্ডিতদের সাহায্য নেওয়া হইত তাহা সমাচার দর্পণের কোন কোন রচনার ভাষার উৎকট পণ্ডিতী রীতি হইতে বোঝা যায়। সমাচার দর্পণের যে সব লেখায় পণ্ডিতদের হাত ছিল সেগুলি কৃত্রিম, কিন্তু সহজ গদ্যে নানা প্রকার চিত্তাকর্ষক বিষয়ে নিবন্ধ রচনার দৃষ্টান্তও এই পত্রিকায় পাওয়া যায়। সমাচার দর্পণের আর একটি বড় আকর্ষণ পাঠকদের চিঠিপত্র। এই সব চিঠিতে তখনকার সমাজের নানা সমস্যা বিষয়ে

মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। প্রায় ৩৫ বৎসর কাল সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সামাজিক অবস্থার দলিলরূপে পত্রিকাটি মহা মূল্যবান।

সমাচার দর্পণ পত্রিকায় মাঝে মাঝে হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ চালান হইত। এই সব সমালোচনার উত্তর দিবার জন্য রামমোহন রায়ের উৎসাহে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রামমোহনের সহিত ভবানীচরণের মতবিরোধ হওয়ায় তিনি সম্বাদ কৌমুদীর সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়া ১৮২২ সালের মার্চ মাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮২১ সালেই প্রকাশিত রামমোহনের ব্রাহ্মণ সেবধি পত্রিকাটির কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকাগুলিতে ধর্ম এবং সমাজসংস্কার বিষয়ে বিতর্কমূলক রচনা প্রকাশিত হইত। পারস্পরিক আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণের মধ্যে যে সব চিন্তাপ্রবাহ বহিতেছিল তাহারই প্রকাশ ঘটিত। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মুখপত্র সংবাদ তিমির নাশক-ও (১৮২৩) ধর্মাদর্শঘটিত বিতর্কের আবহাওয়া যথেষ্ট উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই যুগের সাময়িক পত্রিকার ভাষার উপরে রামমোহনের এবং ভবানীচরণের প্রভাব আড়ম্বরপূর্ণ পাণ্ডিত্যী রীতির গদ্য লেখকদের উৎকট গদ্যের পরিবর্তে প্রাঞ্জল ও অর্থবহ গদ্য রচনার ধারাটিকে শক্তিশালী করিয়া তোলে।

ক্রমে বাঙালী সমাজের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে নূতন আদর্শের অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষ তীব্র হইতে থাকে। বাঙালী চিত্তের জড়ত্ব দূর হইতে থাকে। যে নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনা সেই সময়ে সমাজে সঞ্চারিত হইতেছিল তাহারই প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন বিষয়ের বিচিত্র পত্র-পত্রিকা প্রকাশের আয়োজনের মধ্যে। ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ এই দশ বৎসরের মধ্যে ৩০টিরও বেশী সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১)। ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনা গুণে সংবাদ প্রভাকর অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক জনসমাদর লাভ করে এবং ইহার মাসিক, সাপ্তাহিক ও দ্বিসাপ্তাহিক সংস্করণ বাহির হয়। অবশেষে ১৮৩৯ সালে সংবাদ প্রভাকরের দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় ইহাই প্রথম দৈনিক পত্রিকা। তখনকার পত্রিকাগুলির মধ্যে সংবাদ প্রভাকর ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। সরস ভঙ্গীতে সাময়িক প্রসঙ্গগুলি সম্পর্কে এই পত্রিকায় যেমন আলোচনা করা হইত তেমনি বাংলাদেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতার পরিচয় এই পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইত। ঈশ্বর গুপ্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রাচীন কবিদের বিস্মৃতপ্রায় রচনা এবং তাঁহাদের জীবনী সংগ্রহ করিয়া

ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন সাহিত্যের লুপ্ত ইতিহাস যেমন পুনরুদ্ধার করিয়াছেন তেমনি তরুণ লেখকদের প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করিয়া বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির পথ সুগম করিয়াছেন তাহার সময়ে তিনিই ছিলেন সাহিত্যগুরু এবং বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি নবযুগের শ্রেষ্ঠ লেখকেরা তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সাহিত্যিক জীবন শুরু করিয়াছিলেন। সংবাদ প্রভাকরের রচনায় যে ভাষা ব্যবহৃত হইত তাহার একটা স্বতন্ত্র রূপ ছিল। অনুপ্রাস এবং অলঙ্কারের মাত্রাহীন ব্যবহার এই ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বর গুপ্ত অলঙ্কৃত গদ্যের যে রূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকার ভাষার তুলনায় তাহা অনেক পরিমাণ কৃত্রিম এবং কোথাও কোথাও হাস্যকর মনে হয়। তবুও কবিগান, আখড়াই গানের আবহাওয়ায় লালিত জনসমাজের পক্ষে এই ভাষাই রুচিকর মনে হইত। অবশ্য কবিজীবনী বা এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ রচনায় যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা অনাবশ্যক অলঙ্কার ভারমুক্ত অতি সহজ স্বাভাবিক গদ্য।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তৎকালীন বাংলাদেশের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ হয় এই পত্রিকায়। এই পত্রিকা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিভাষিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হইয়া বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই একত্রে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ং বেঙ্গলদের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' দ্বিভাষিক পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা গদ্যের পরিপুষ্টি সাধনের দিক হইতে **তত্ত্ববোধিনী** পত্রিকার ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সভার মুখপত্র রূপে ১৮৪৩ সালের আগস্ট মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্তকে দেবেন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, শ্রীধর প্রসাদ রায় প্রভৃতি সদস্যদের লইয়া পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি নির্বাচনের জন্য একটি পেপার কমিটি গঠন করা হয়। পেপার কমিটির অধিকাংশ সদস্যের দ্বারা অনুমোদিত না হইলে কোন রচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা হইত না। দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা এই পত্রিকার সহিত যুক্ত হইয়াছেন এবং অক্ষয়কুমার দত্তের মতো প্রতিভাবান একাগ্রচিত্ত সম্পাদক পত্রিকাটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় তত্ত্ববোধিনী সহজেই একটি শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রিকায় পরিণত হয়।

তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধগুলিতে য বপুল তথ্য ... করা হইত ... মৌলিকত প্রকাশ পাইত তখনকার ই'ব ন ন ... প্রকার তাহাব স ... তন ভাবতবে ... ছেন সাহিত্য ... তত্ত্ব পর্যাত এবং সমসাময়িক ... সমস্যা বিষয়ে যে সব রচনা প্রকাশ ... গদ্য ভাষা ... বিষয়ের ... দেখা দিল তেমনই ... ধারণ ... বাংলা গদ্যের শক্তিও প্রমাণিত হইল।

তত্ত্ববোধিনী সাময়িক পত্রিকার ... স্থাপন ... ইহ ... হল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের **বিবিধার্থ সংগ্রহ** পত্রিকা। ভার্নাকিউলার ... সোসাইটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গ সর্বসাধারণের উপযোগী ... পরিবেশন করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্যরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ... নাথের ভাষায় বিবিধার্থ সংগ্রহ ছিল 'সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার ... একখানি ম্যাগাজিন কাগজ'। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার যে বিভাগটি প্রবর্তন করিয়াছিলেন বাংলা পত্রিকায় তাহা নূতন এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংযোজন।

বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্র এবং রাধানাথ সিকদারের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত **'মাসিক পত্র'** (১৮৫৪) পত্রিকাটির বিশেষ স্থান আছে। প্যারীচাঁদ মিত্র কথ্যভাষাকে সাহিত্যে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গদ্যের ক্ষেত্রে যুগান্তসাধন করিয়াছিলেন। এই পত্রিকাই ছিল প্যারীচাঁদের সাহিত্যচর্চার প্রধান ক্ষেত্র। তাহার আলালের ঘরের দুলাল 'মাসিক পত্রেই' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কালীপ্রসন্ন সিংহের **'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'** (১৮৫৫), এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত **'সোমপ্রকাশ'** (১৮৫৮)। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি নানাভাবে এই পত্রিকা সম্পাদনায় দ্বারকানাথকে সাহায্য করিতেন। রাজনীতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সোমপ্রকাশেই প্রথম আরম্ভ হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় **'বঙ্গদর্শন'** পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও

এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপি-কৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। ...যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।" পত্রিকাটিকে বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র বাঙালী জাতির সর্বাত্মক আত্মোন্নতির মাধ্যমরূপে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস একটি নূতন যুগের প্রস্তুতির ইতিহাস। বঙ্গদর্শনই সেই প্রস্তুতির পূর্ণ পরিণাম। বঙ্কিমপ্রতিভার যাহা-কিছু কীর্তি তাহা এই পত্রিকাটিকে আশ্রয় করিয়াই দেশের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছিল। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী ভিন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ রচনা এই পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। নবযুগের নূতন বাণীর পণ্য বঙ্গদর্শনই বাঙালীচিত্তের দুয়ারে বহন করিয়া আনিয়াছিল, বাংলা ভাষার নিহিত প্রাণশক্তি বঙ্গদর্শনই পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত করিয়া তোলে। বঙ্গদর্শনের সময় হইতেই প্রাণাবেগে পরিপূর্ণ ভাষা নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ করিয়া লইয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠীতে ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি। চারবৎসর বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইবার পর পত্রিকাটির প্রকাশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় আবার বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কিছুদিন এই পত্রিকার সম্পাদনা করিয়াছেন। চতুর্থ পর্যায়ে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

১০। প্রশ্ন : বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক প্রাবন্ধিকদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান লেখকের পরিচয় দাও।

উত্তর : ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশের পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনী—এই তিনটি উপন্যাসের লেখকরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশের সময় হইতে তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন যুগের সূচনা হয় এবং নিজ যোগ্যতায় তিনি সাহিত্যজগতে নেতৃপদটি অধিকার করিয়া ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাত্মক উন্নতি ত্বরান্বিত করেন; একদিকে তিনি যেমন কঠোর সমালোচনা দ্বারা অক্ষম লেখকদের নিবৃত্ত করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রের শুচিতা এবং উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেন, অন্যদিকে তেমনই শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে যথার্থ শক্তিমান লেখক আবিষ্কার করিয়া

তাঁহাদের প্রতিভা বিকাশে সর্বান্তঃকরণে সহায়তা করিতেন। তাঁহারই প্রযত্নে গঠিত একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সমৃদ্ধিসাধন করিয়া বাংলা সাহিত্যকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। তখনকার লেখকদের মধ্যে যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন নাই তাঁহাদের পক্ষেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত যুগের লেখকদের মধ্যে **রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর** নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬) বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। কবি হিসাবেই তিনি সাহিত্যজীবন শুরু করেন কিন্তু চিন্তাশীল প্রবন্ধ-লেখক হিসাবেও তখনকার দিনে তাঁহার খ্যাতি ছিল। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গ্রন্থ 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' একখানি ছাত্রপাঠ্য বই। এই বইটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'যে দাতা মনে করিলে অনেক রাজ্য এবং রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে। মুষ্টিভিক্ষা, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি।' লেখক হিসাবে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় এই উক্তিটিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নানা-নিবন্ধ' নামে সেই প্রবন্ধগুলির একটি সঙ্কলন গ্রন্থ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে তিনি নানা-নিবন্ধে'র লেখকরূপেই পরিচিত। বইটি দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক প্রভাবশালী ছিলেন **অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)**। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরজীবনে 'প্রচার' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ধর্ম ও দর্শন চিন্তাতে যখন আত্মনিয়োগ করেন সেই সময়ে নবজীবন পত্রিকার সম্পাদকরূপে অক্ষয়চন্দ্র বাংলা সাহিত্যের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। "অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল তাঁহার অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ ও স্বদেশ-প্রীতি। বাঙালীর যাহা-কিছু সম্পদ বলিয়া তিনি জ্ঞান করিতেন তাহাকেই তিনি সকল আক্রমণ হইতে পক্ষিমাতার মত রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন।" অক্ষয়চন্দ্রের এই দেশাত্মবোধের মূলেও যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ছিল তেমনই তাঁহার রচনার ভাষাও ছিল বিশেষভাবে বঙ্কিমচন্দ্র-প্রভাবিত। অক্ষয়চন্দ্রের লেখা 'চন্দ্রালোকে' নামক প্রবন্ধটি কমলাকান্তের দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় অক্ষয়-চন্দ্রের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য 'সমাজ সমালোচনা' (১৮৭৯), 'আলোচনা' (১৮৮২), 'সনাতনী' (১৯১১) এবং 'রূপ ও রস' (১৯১৩)।

বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৫-১৮৮৯) বঙ্গদর্শন পত্রিকার অন্যতম লেখক ছিলেন এবং কিছুদিন বঙ্গদর্শন পত্রিকা সম্পাদনা করিয়াছিলেন। প্রতিভার মানের বিচারের দিক হইতে বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই সঞ্জীবচন্দ্রের স্থান। সংখ্যার হিসাবে অন্যান্য লেখকদের তুলনায় তাঁহার রচনা খুব বেশি না হইলেও তিনি যাহা-কিছু লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে অনন্য-সদৃশ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সঞ্জীবচন্দ্রের চরিত্রে দীর্ঘদিন একাগ্রভাবে কোন কাজে আত্মনিয়োগ করিবার মতো নিষ্ঠা ছিল না। সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও এই চারিত্রিক ত্রুটির জন্যই তিনি প্রতিভার উপযুক্ত স্বাক্ষর রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার রচনা হইতে অনুভব করা যায় তাঁহার প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু সেই প্রতিভাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার হাতের কাজ দেখিলে মনে হয়, তিনি যতটা কাজ দেখাইয়াছেন তাহার সাধ্য তদপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাঁহার মধ্যে যে পরিমাণ ক্ষমতা ছিল সে পরিমাণ উদ্যম ছিল না। তাঁহার প্রতিভায় ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না।"—রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণে সঞ্জীবচন্দ্রের লেখক-চরিত্র সঠিকভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাঠক-সাধারণের জন্য যাহা তিনি পরিবেশন করিয়াছেন তাহা সুসজ্জিতভাবে সংহত আকারে পরিবেশন করিবার দায়িত্ব বোধ করেন নাই। লেখক হিসাবে তাঁহার স্বীয় বৈশিষ্ট্যগুলির যে চকিত পরিচয় রচনার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায় অনুশীলনের দ্বারা তাহার পূর্ণতা সাধনের জন্য তিনি কখনো উৎসাহ বোধ করেন নাই। তবুও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রতিভার ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ স্বকীয় একটি রচনাশৈলী নির্মাণ করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে একমাত্র তাঁহার রচনাকেই সম্পূর্ণভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত মনে হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে অধিকাংশই উপন্যাস। রামেশ্বরের অদৃষ্ট (১৮৭৭), কণ্ঠমালা (১৮৭৭), জালপ্রতাপচাঁদ (১৮৮৮), মাধবীলতা (১৮৮৮), দামিনী (১৮৯৩) প্রভৃতি উপন্যাস ভিন্ন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ এবং **'পালামৌ'** (১৮৯৩) নামক ভ্রমণবৃত্তান্ত তিনি রচনা করিয়াছিলেন। মাত্র ৫০ পৃষ্ঠার ভ্রমণবৃত্তান্ত 'পালামৌ' বইটির জন্যই সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যিক খ্যাতি আজ পর্যন্ত অম্লান হইয়া আছে। 'পালামৌ' বঙ্গদর্শনে যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তখন, 'প্র. না. ব.' ছদ্মনাম ব্যবহৃত হইয়াছিল। বইটির বিষয়বস্তু এমন-কিছু অসাধারণ নয়, কিন্তু তুচ্ছ বস্তুর মধ্যেই, চতুর্দিকে পরিকীর্ণ পরিচিত সংসারের মধ্যে সৌন্দর্য আবিষ্কার করিবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় এই রচনার প্রতিটি ছত্রে অনুভব করা

যায়। তিনি নিপুণ পর্যবেক্ষকের মতো প্রকৃতি ও মানুষে মিলাইয়া পালামৌ-এর রূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিয়াছেন এবং দক্ষ চিত্রকরের মতো চোখে দেখা সেই জগৎটিকে রচনার মধ্যে অবিকলভাবে আঁকিয়া তুলিয়াছেন। আর বর্ণনার পরতে পরতে তাঁহার সৌন্দর্যরসিক ও ভাবুক হৃদয়ের রস নিষিক্ত করিয়া দিয়া রচনাটিকে প্রথম শ্রেণীর শিল্পকৃতিতে পরিণত করিয়াছেন। পালামৌ-এর সহিত তুলনা করা যায় এমন ভ্রমণ বৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় আর একটিও নাই।

বঙ্গদর্শন পত্রিকাতে বঙ্কিমচন্দ্রই যথার্থভাবে সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত সাহিত্যের এই শাখাটিকে যাঁহারা সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুইজন বিশিষ্ট লেখক চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) এবং ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩)। চন্দ্রনাথ বসু বঙ্গদর্শন পত্রিকার লেখক ছিলেন। স্বদেশ ও বিদেশের দর্শন চিন্তার প্রতি তিনি আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধের মধ্যেও দার্শনিক মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার শকুন্তলাতত্ত্ব (১৮৮১), ত্রিধারা (১৮৯১), সাবিত্রীতত্ত্ব (১৯০০) প্রভৃতি গ্রন্থ এক সময় বাংলাদেশের জ্ঞানীগুণীদের সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গদর্শন পত্রিকার সহিত কখনো যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রচার' পত্রিকায় তাঁহার কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্যরীতি অনুসরণ করিয়া ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সাহিত্য সমালোচনা করিতেন। সামাজিক ন্যায়নীতির পরিবর্তে বিশুদ্ধ শিল্প হিসাবে সাহিত্যের মূল্য বিচারের যে পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করিতেন, তখন সেই পদ্ধতি খুব বেশি পরিচিত ছিল না। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনা পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহাকে বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইয়াছে। সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা হিসাবে এইসব রচনার কিছু মূল্য আছে। কেশবচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধ লইয়া 'সাহিত্যমঙ্গল' (১৮৮৮) নামে তাঁহার একটিমাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঠাকুরদাসের আর সমস্ত রচনাই পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) ছাত্রজীবনেই বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে লেখা তাঁহার বহু প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রাচ্য-বিদ্যার এই খ্যাতিমান পণ্ডিত প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার মনে সূক্ষ্ম রসবোধ এবং উন্নত সাহিত্যরুচি সঞ্চারিত

হইয়াছিল। পাণ্ডিত্য এবং শিল্পবোধের এমন সমন্বয় বাংলা দেশে দুর্লভ। পাণ্ডিত্যে উচ্চচূড়ায় অধীত এবং আয়ত্ত বিদ্যা সঞ্চয় করিয়া না রাখিয়া সাধারণ মানুষের জীবনের সহিত জ্ঞানচর্চার মূল সংযোগ ঘটাইবার প্রচেষ্টাই ছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যচর্চার মূল উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এই প্রচেষ্টায় তিনি তাঁহার সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ মনে প্রাণে অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার কোন রচনাই পাণ্ডিত্যের ভারে দুরূহ হইয়া উঠে নাই। অত্যন্ত সরল ভঙ্গিতে, প্রায় মৌলিক আলাপের ভাষায় তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে যে প্রবন্ধাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন বাংলা গদ্য-সাহিত্যের তাহা এক অমূল্য ঐশ্বর্য। শুষ্ক তথ্যপ্রমাণ পুঞ্জীভূত করিয়া তোলা তাঁহার ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব চর্চার আদর্শ ছিল না। একটি যুগের মানুষের জীবনাচরণের বৈচিত্র্য, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে অনুধাবন করাকেই তিনি ইতিহাস চর্চার আদর্শ মনে করিতেন সজীব মানুষের জীবনধারার বৈশিষ্ট্যই ছিল তাঁহার অনুসন্ধানের বিষয়। বিগত যুগের মানুষের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উদ্ধার করিবার জন্য তিনি সারাজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তাঁহার গবেষণালব্ধ তথ্যগুলি ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পূর্বাপর ধারা বুঝিবার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অতীতের সত্যরূপ আবিষ্কার এবং তখনকার মানুষের বাস্তব জীবনযাত্রার পরিচয় প্রকাশের জন্যই তিনি প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। অতীত সমাজের জীবন্ত রূপ তিনি বেনের মেয়ে (১৯২০) এবং কাঞ্চনমালা (১৯২০) উপন্যাস দুইটিতে কৃতিত্বের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। তঁহার প্রবন্ধাবলী পত্র পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল—ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় দুই খণ্ড গ্রন্থাবলীতে বহু রচনা সঙ্কলিত হইয়াছে।

১১। প্রশ্ন: রবীন্দ্রযুগের কয়েকজন প্রধান প্রাবন্ধিকের পরিচয় দাও।

[বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও প্রমথ চৌধুরী]

অথবা, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দান সম্বন্ধে আলোচনা কর। **[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৪]**

উত্তর: রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম প্রতিভা যখন বাংলা সাহিত্যের সর্বস্তরে ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বিরাজিত ছিল, সেই সময়ে বহু কুশলী লেখক বিশেষ বিশেষ ধারায় নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। হয়ত রবীন্দ্র প্রতিভার

জ্যোতিতে এই সব লেখকেরা অনেক পরিমাণে ম্লান হইয়া গিয়াছেন, তবুও ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে ইঁহাদের কৃতিত্ব শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। রবীন্দ্রযুগের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল লেখকদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং প্রমথ চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র **বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৭০-১৮৯৯) মাত্র ২৯ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই স্বল্পায়ু প্রতিভাবান লেখকের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করিবার ছিল কিন্তু প্রতিভার শক্তি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইবার পূর্বেই তাঁহার অকালমৃত্যু হয়। বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথেরই সস্নেহ পরিচর্যায় উন্মীলিত হইয়াছিল। স্বভাবতই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান ধারণা এবং রচনাশৈলীতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের গদ্য পড়িতে গেলেই মনে হয় এক মহাকবির কল্পনাপ্রভাবে গদ্যভাষার মধ্যেও ভাবলোকের অতল রহস্য এবং সৌন্দর্য বিকীর্ণ হয়। নীরস তথ্য ও যুক্তি স্তূপীকৃত করিয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধরচনার সাধারণ পদ্ধতি তিনি কখনো অনুসরণ করেন নাই। প্রবন্ধও যে শিল্পাকৃতির পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থের রচনাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। বলেন্দ্রনাথও এই দৃষ্টান্তই অনুসরণ করিয়াছেন। বিষয়-বস্তু যাহাই হউক সর্বত্রই তাঁহার মার্জিত মনা-বৈদগ্ধ্য সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-দৃষ্টিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। বিষয়কে অতিক্রম করিয়া সর্বত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা belles letters বলিতে যে শ্রেণীর রচনা বুঝায় বলেন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধই সেই জাতের। আশৈশব অনুশীলনের দ্বারা তিনি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট গদ্যরীতি আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। গভীর আবেগ ও অনুভূতি সূক্ষ্ম-বর্ণালি ভাষায় কি ভাবে আকার-বদ্ধ করিতে হয়—সে বিষয়ে তাঁহার বোধশক্তি এবং দক্ষতা ছিল অসাধারণ। বলেন্দ্রনাথের জীবৎকালে 'চিত্র ও কাব্য' নামে একটিমাত্র সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা হইতে তাঁহার বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি সঙ্কলন করিয়া সম্প্রতি একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা সংগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে।

শিল্পগুরু **অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর**ও (১৮৭১-১৯৫১) রবীন্দ্রনাথেরই প্রেরণায় সাহিত্য চর্চা শুরু করিয়াছিলেন। রং ও তুলিই তাঁহার আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম ছিল, রেখা ও বর্ণের ভাষাতেই তিনি ভাবনা রূপায়ণে অভ্যস্ত। গদ্য-ভাষার ক্ষেত্রেও তিনি সেই চিত্রশিল্পীর স্বভাব হইতে বিচ্যুত হন নাই। চিত্র-রূপময়তা তাঁহার গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলা গদ্যের একটি সম্পূর্ণ নূতন রূপ তিনি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। পটের উপরে রেখা এবং রং-এর সাহায্যে

যেমন প্রত্যক্ষ রূপ সৃষ্টি হয়, অবনীন্দ্রনাথ শব্দের পর শব্দ গাঁথিয়া ঠিক সেই রূপই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার রচনার আর একটি বিশেষত্ব কথকতার ভঙ্গিযুক্ত শিল্পশ্রী-মণ্ডিত কথ্যভাষার অনায়াস ব্যবহার। গল্প, স্মৃতিকথা বা প্রবন্ধ রচনা সর্বত্রই তিনি এই কথকতার রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার রচনাগুলি শিল্পতত্ত্ব, স্মৃতিকথা এবং বিচিত্র গল্প—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগেশ্বরী অধ্যাপকরূপে তিনি শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহা 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'ভারত শিল্প' এবং 'ভারত শিল্পে ষড়ঙ্গ' নামক ছোট বই দুইটিও শিল্পতত্ত্বের আলোচনা হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আপন কথা, ঘরোয়া এবং জোড়াসাঁকোর ধারে—নামে তাঁহার তিনটি স্মৃতিকথা-মূলক রচনা আছে। ক্ষীরের পুতুল, শকুন্তলা, রাজকাহিনী প্রভৃতি গল্পের বইগুলিতে অবনীন্দ্রনাথ এক নূতন রূপকথার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

রবীন্দ্রযুগের অন্যতম শক্তিমান প্রাবন্ধিক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৮৯৯)। বাংলা প্রবন্ধের তিনি একজন প্রথম সারির লেখক। তাঁহার প্রবন্ধে একদিকে আছে গভীর মননশীলতা, তীব্র যুক্তিতর্ক এবং অন্যদিকে আছে কৌতুকরসের লঘু আবহাওয়া। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে বাংলা সাহিত্যে তিনি দুর্লভ প্রবন্ধ শৈলীর অবদান রাখিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমবয়স্ক এবং বিজ্ঞানের অধ্যাপক। অধ্যাপকরূপে তিনি প্রথমে পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি কেবলমাত্র বিজ্ঞানচর্চায় আবদ্ধ থাকেন নাই। সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, স্মৃতি, পুরাণ, ব্যাকরণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের তিনি কৌতূহলী পাঠক ছিলেন। বৈজ্ঞানিক মন লইয়া তিনি এইসব বিষয়ে তৃপ্তিহীন অনুশীলন করিয়াছেন। জ্ঞানরাজ্যের এই অনুসন্ধিৎসু মানুষটি ঐকান্তিক নিষ্ঠায় বিশ্বরহস্যের অন্তঃপুরে প্রবেশের নব নব দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। যাহাকে 'এনসাইক্লোপীডিক' জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলে, আচার্যের তাহা যেন নখদর্পণে ছিল। তিনি বিজ্ঞান ও দর্শনকে সমন্বিত করিয়া নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি আলোচ্য বিষয়কে দেখিতেন বৈজ্ঞানিকের মন হইয়া কিন্তু আলোচনা করিতেন তত্ত্বজিজ্ঞাসু দার্শনিকের মত। রামেন্দ্রসুন্দর এক মৌল দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আলোচনার মূল বক্তব্যকেই উপস্থাপিত করিতেন।

'প্রকৃতি' (১৮৯৬), 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪), কর্মকথা' (১৯১৩), 'নানা কথা' (১৯১৪), 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০) প্রভৃতি রামেন্দ্রসুন্দরের প্রধান প্রবন্ধগ্রন্থ।

এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বিজ্ঞানের পথে, ধর্ম ও দর্শনের পথে জীবনের সত্য সন্ধানে তাঁহার ক্লান্তিহীন সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রবন্ধ নীরস যুক্তিতর্কে ভরা নহে পাণ্ডিত্যের নখদন্ত ভাঙ্গিয়া তিনি তাঁহার আলোচ্য বিষয়কে মনোহারী করিয়া তুলিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞান রহস্য' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' ছাড়া এই সার্থক রচনাভঙ্গী আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। তাঁহার বিপুল রচনা সম্ভারের মধ্যে এক বিস্ময়কর মনস্বিতার পরিচয় লিপিবন্ধ হইয়া আছে। বিজ্ঞানচর্চা এবং দূরূহতম জ্ঞান সাধনার মাধ্যমরূপে বাংলা ভাষার ব্যবহারে তিনি সমস্ত সংশয় নিরতিশয়ভাবে দূর করিয়াছেন। প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি তাঁহার ভাষার মধ্যে এমন এক শক্তি সঞ্চার করিয়াছে—যাহার তুলনাযোগ্য দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী নাই। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষা বিষয়ানুযায়ী গম্ভীর, কিন্তু জীবন্ত। তত্ত্বকথায় তিনি যেমন অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ ভাষা ও রচনারীতিকে কৌতুকরসোচ্ছল করিয়া তিনি প্রবন্ধের সীমা বিস্তৃত করিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের আলোকে জীবনের অর্থ ও সত্য অনুসন্ধান করিয়াছেন। সেখানে তিনি পাশ্চাত্যের বস্তুবিজ্ঞান হইতে ভারতীয় যোগশাস্ত্র পর্যন্ত বিচার করিয়াছেন। জ্ঞানপিপাসু চিত্তের প্রবল উৎকণ্ঠায় তিনি যে ব্যাপক অধ্যয়ন ও অনুশীলনের পথ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রকাশরীতি অনবদ্য এবং অভিনব। পরবর্তীকালে আচার্য জগদীশচন্দ্র, জগদানন্দ রায় প্রমুখ মনীষী লেখকগণ রামেন্দ্রসুন্দর প্রচলিত রীতিতেই নানা বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা করিয়াছেন। মননশীলতায় এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁহার সমকক্ষ পারদর্শী আর কেহ বাংলা সাহিত্যে আছেন কিনা সন্দেহ।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক রূপে প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন আবির্ভূত হন সেই সময় তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল। 'সবুজপত্রে'র পূর্ব পর্যন্ত সাধু রীতির গদ্যই ছিল সাহিত্যের একমাত্র বাহন, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী সাধুভাষার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করিলেন। চলতি বাংলাই একমাত্র অকৃত্রিম ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যের সর্ববিধ প্রয়োজনে চলতি ভাষার মর্যাদা স্বীকার করা ভিন্ন সাহিত্যে প্রগতি সম্ভব নয়—প্রমথ চৌধুরীর এই মতবাদ সাহিত্য জগতে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করে। শুধু ভাষার ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক এবং সাহিত্যিক ধ্যানধারণার প্রতিটি ক্ষেত্রে যাহা কিছু শাশ্বত বলিয়া নির্বিচারে স্বীকার করা হইত, প্রমথ চৌধুরী সেই অটল ধারণাগুলির উপরে নির্মমভাবে আঘাত হানিতে থাকেন। বুদ্ধির মুক্তি এবং আধুনিক বিশ্বের উন্মুক্ত আকাশের নীচে সকলের সহিত

সমান মর্যাদায় একত্রিত হইবার জন্য আত্মশক্তির উদ্বোধনই ছিল প্রমথ চৌধুরীর লক্ষ্য। "সাহিত্য মানব জীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার থেকে ছিনিয়ে জাগরূক করে তোলা।" এই উক্তিটির মধ্যে তাঁহার সকল কর্মের মূলগত প্রেরণা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তাঁহাকে ঘিরিয়া একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই গোষ্ঠীর লেখকগণ ছিলেন প্রধানত বুদ্ধিজীবী প্রাবন্ধিক। এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি মননশীল ব্যক্তিগণ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন। সবুজপত্রের চলতিভাষা প্রচলনের আন্দোলনের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার ধারাতেও পরিবর্তন দেখা দেয়। সবুজপত্রের যুগ হইতে রবীন্দ্রনাথ গল্প উপন্যাস-প্রবন্ধ রচনায় চলতি ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলা গদ্যের আদিপর্ব হইতে সাধু বনাম চলতি ভাষার যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল প্রমথ চৌধুরীই তাহার অবসান ঘটাইয়া সাহিত্যে চলতি ভাষার মর্যাদা স্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ গদ্য রচনা 'বীরবল' ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার 'তেল-নুন-লকড়ী', 'বীরবলের হালখাতা', 'নানা কথা', 'নানা চর্চা' প্রভৃতি গ্রন্থের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি বিভিন্ন বিষয়ে লেখা তাঁহার মূল্যবান গ্রন্থাবলী বিষয় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' নামে দুইটি খণ্ডে প্রকাশ করা হইয়াছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের পরবর্তী ধারায় রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন একমাত্র প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবই সুদূরপ্রসারী এবং বহু লেখকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় :

'এসিয়াটিক রিসার্চ' পুস্তকাবলীতে হোরেস হেম্যান উইলসন 'Sketch of the Religious Sects of Hindus' নামে একটি নিবন্ধে ৪৫টি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উইলসনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়গুলির একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ প্রকাশে উদ্যোগী হন। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে তিনি ১৮২টি সম্প্রদায়ের বিস্তৃত পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গবেষণালব্ধ তথ্যগুলি সুবিন্যস্ত করিয়া 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামে

দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ১৮৭০ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের দীর্ঘ উপক্রমণিকা অংশে আর্য ভাষার বিভিন্ন শাখা এবং বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম-দর্শন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা সংযোজিত হইয়াছিল। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বাংলা ভাষায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার প্রথম নিদর্শন। বস্তুত এজাতীয় সুবৃহৎ গবেষণা গ্রন্থ বাংলা ভাষায় আর রচিত হয় নাই।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫):

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) রামমোহন রায়ের সহযোগী-রূপে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক জীবন শুরু করিয়াছিলেন। 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) পত্রিকার সম্পাদকরূপে রামমোহনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল কিন্তু সমাজ-সংস্কার এবং নূতন ধর্ম-চিন্তায় রামমোহনের মতবাদ মানিয়া লইতে না পারায় ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ক্রমে তিনিই রক্ষণশীল সমাজের মুখপাত্ররূপে রামমোহনের প্রধান সমালোচক হইয়া উঠেন। আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা এবং সংস্কার আন্দোলনের প্রতি ভবানীচরণের আস্থা ছিল না, তাই ব্যঙ্গবিদ্রূপে আধুনিকতাবাদীদের তিনি বিদ্ধ করিতেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার সম্পাদক ও 'ধর্মসভা' নামক সংস্থার প্রধান নায়করূপে সমাজে তিনি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ভবানী-চরণের রচনাবলীর মধ্যে 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) এবং 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫) বিখ্যাত গ্রন্থ। কলিকাতা কমলালয়-এর ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, "এই কলিকাতা মহানগরের স্থূল বৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থ করণে প্রবৃত্ত হইলাম। এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌চাতুরী ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন।" নূতন শহর কলিকাতার রীতিনীতির সহিত নবাগত পল্লীগ্রামের মানুষদের পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল। ভবানীচরণের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'নববাবু বিলাস' 'প্রমথনাথ শর্মণ' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। নবগঠিত কলিকাতা নগরীতে তখনকার দিনে 'বাবু' বলিতে যে শ্রেণীকে বুঝানো হইত তাহাদের সম্পর্কে ভবানীচরণ লিখিয়াছেন, "বাবুদের পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া বেতনভুক হইয়া কিম্বা....চৌকিদারী জুয়াচুরী পোদ্দারী করিয়া ধনাঢ্য হইয়াছেন।" শিক্ষাদীক্ষাহীন, বিকৃতরুচি এই বাবু সম্প্রদায়ের বিলাস ব্যসনে সেই সময়ে কলিকাতার আবহাওয়া কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভবানীচরণ 'নববাবু বিলাস' গ্রন্থে বাবু সমাজের বিচিত্র জীবনাচরণের ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়াছেন। রচনাটি সংহতিহীন এবং মাত্রাতিরিক্ত

ব্যঙ্গপ্রবণতায় আচ্ছন্ন। তবুও ইহার মধ্যে তখনকার কলিকাতার একটা বাস্তব প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের প্রহসন এবং ব্যঙ্গরচনায় উপরে বইটি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় :

উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান পুরুষদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫-১৮৯৪) বিশিষ্ট স্থান ছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় যে যুগের মানুষ, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ এবং নির্বিচারে পাশ্চাত্য জীবনধারা অনুসরণের প্রবণতা বাঙালী সমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। তিনি নিজে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার আবহাওয়ার মধ্যেই বড় হইয়া উঠিয়াছিলেন বলা যায়। কিন্তু তাঁহার সহপাঠী মধুসূদনের এবং আরও অনেকের চরিত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিষয়ে যে অন্ধ মোহ দেখা দিয়াছিল—ভূদেব চরিত্রে তাহার বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আধুনিক শিক্ষার প্রতি অনুরাগ কম ছিল না, কিন্তু নির্বিচারে তিনি পাশ্চাত্য জীবনবাদ স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। ইংরেজী শিক্ষার গুণে তাঁহার চিন্তায় যুক্তিনিষ্ঠতা দেখা দিয়াছিল, সেই যুক্তিনিষ্ঠ মন লইয়া প্রাচীন ও আধুনিক জীবনের রীতিনীতি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি একটি আদর্শ জীবনবাদ উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসীর প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু সেই শ্রদ্ধা তাঁহাকে মোহান্ধ করে নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্য যেমন তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই, স্বদেশের জীবনধারার মধ্যে সঞ্চিত কুসংস্কার ও প্রথাবদ্ধতা বিষয়েও তেমনিই তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন। এই দুই জীবনাদর্শের কোনোটিকে তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেন নাই। "বিচারকুশল প্রাচীনকালের প্রবীণ আচার্যের ন্যায় নিজের ব্যক্তিত্ব ও বিচারশক্তির সাহায্যে উভয়ের অন্তর্নিহিত সার্বভৌম উদার আলোকে উভয়কে বুঝিয়াছিলেন—চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা নিজের গন্তব্যপথের নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন।" ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনার ভাষাও ছিল আবেগবর্জিত যুক্তিবিচারেরই ভাষা। তিনি ধীরভাবে আলোচ্য বিষয়ের সমগ্র দিক বিচার বিশ্লেষণের পথে ধাপে ধাপে নিজের বক্তব্য এবং সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাংলা প্রবন্ধের একটি পরিচ্ছন্ন সুগঠিত রূপ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার তথ্যবহুল যুক্তিতে পরিপূর্ণ প্রবন্ধগুলির মধ্যে এক অনমনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দৃঢ় প্রত্যয় এবং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তাঁহার সুস্পষ্ট মৌলিক মতবাদই প্রবন্ধগুলিকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করিয়াছে। তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ

(১৮৮২), সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২) এবং বিবিধ প্রবন্ধ (১৮৯২) বই তিনটি প্রবন্ধের নিদর্শন হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। ইহা ছাড়া তখনকার দিনে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তিনি একাধিক পাঠ্য-পুস্তকও লিখিয়াছেন।

ভূদেবের অন্যান্য রচনার মধ্যে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) বইটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা। ঐতিহাসিক উপন্যাসে 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামে দুইটি গল্প আছে। লেখকের ভাষায়, "গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।··· উভয় উপন্যাসেই রাজাসম্বন্ধীয় যে সকল কথা আছে তাহা প্রকৃত ইতিহাস-মূলক। অপরাপর যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহারও কোন কোন অংশমাত্র ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় কিন্তু তাহাও সর্বতোভাবে প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য নহে।" অর্থাৎ প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত কাল্পনিক কাহিনী মিশ্রিত করিয়া গল্পগুলি রচিত হইয়াছিল। এই কাহিনী দুইটিতে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র কোন কোন চরিত্র এবং ঘটনা-পরিকল্পনায় 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়'এর প্রভাব আছে।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ :

'প্রভাত চিন্তা' (১৮৭৭), 'নিভৃত চিন্তা' (১৮৮৩), 'নিশীথ চিন্তা' (১৮৯৬) প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৩৪-১৯১০) এক সময়ে 'পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর' নামে খ্যাত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের রচনা-শৈলী অনুসরণকারী লেখকদের মধ্যে কালীপ্রসন্নই ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আদর্শে তিনি ঢাকা হইতে 'বান্ধব' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেন।

প্রথম যৌবনে তিনি ইংরেজী ভাষায় বাগ্মিতার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়া-ছিলেন, পরে মাতৃভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং 'বঙ্গ সাহিত্যে শুদ্ধি ও সৌন্দর্যের একত্র সমাবেশ করা' তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা লাভ করিয়াই বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার 'বান্ধব' পত্রিকার কথা উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল এক্ষণে বান্ধব, আর্যদর্শন প্রভৃতি দ্বারা তাহা পূরিত হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্রের আরব্ধ কাজের ভার বহন করিবার যোগ্যতা কালীপ্রসন্ন অর্জন করিয়াছিলেন ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ নাটক ॥

প্রশ্ন : মধুসূদনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটক এবং রঙ্গমঞ্চের প্রস্তুতির ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা কর এবং এই পর্বের প্রধান নাট্যকারদের পরিচয় দাও।

অথবা, **মধুসূদনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটকের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ কর। [ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩]**

উত্তর : বাংলাদেশে 'থিয়েটার' বা রঙ্গমঞ্চাশ্রিত অভিনয়-কলা একান্ত ভাবে আধুনিক কালের সৃষ্টি। যদিও 'নাটক' সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ শাখা এবং প্রাচীন ভারতে অভিনয়শিল্পও যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তথাপি বাংলার পুরাতন সাহিত্যে নাটক রচনার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বাংলার দেশজ অভিনয়কলার একটি রূপ পাওয়া যায় 'যাত্রা'য়। আধুনিক থিয়েটারের সহিত যাত্রার কোন মিল নাই। যাত্রাভিনয়ে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন হইত না, মুক্তাঙ্গনে দৃশ্যপটের সহায়তা ছাড়াই যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হইত। সঙ্গীত ছিল প্রধান আকর্ষণ। পালাবন্ধভাবে সাজানো গান এবং মাঝে মাঝে সংলাপের সাহায্যে কোন ধর্মীয় বিষয়াশ্রিত কাহিনী যাত্রায় পরিবেশিত হইত। লোক সমাজে এই অভিনয়রীতিই ব্যাপকভাবে সমাদৃত ছিল। কৃষ্ণযাত্রার প্রচলনই আমাদের দেশে অধিক ছিল। সংস্কৃত নাট্যকলা অনুবর্তনের কোন চেষ্টাও প্রাচীনকালের বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় না। সুতরাং বাংলা নাটক এবং আধুনিক অভিনয়কলার সহিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক সংযোগ অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নাই। দেখিতে হইবে ইংরেজ আমলে শিল্প সাহিত্যে যখন পাশ্চাত্য প্রভাব ক্রিয়াশীল হইতে থাকে সেই সময়ে কিভাবে এই শিল্পটি উদ্ভূত হয় এবং বিকাশলাভ করে।

সুপ্রাচীন কবিগান, পাঁচালী, কথকতা ও যাত্রার মধ্যে ছিল যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দের উপাদান, যাহা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালী মনকে পরিতৃপ্ত করিত। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর নাট্যরসের পিপাসা তাহাতে মিটিত না; অই শিক্ষিত বাঙালীগণ পাশ্চাত্য নাটকের অনুসরণে নাট্য রচনায় ব্রতী হইলেন। ইহার সঙ্গে প্রয়োজন হইল নাট্যমঞ্চের; কেন না নাটক বর্ণনাত্মক নহে. দৃশ্যাত্মক। তাই পাশ্চাত্য নাটক ও নাট্যশালার প্রভাবে বাংলা নাটকের সূত্রপাত হইল ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা ইংরেজদেরই হাতে গড়া শহর। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের সূচনা হইতে বহু ইংরেজ কলিকাতায় বসবাস করিত এবং দীর্ঘদিন ইংরেজরা কলিকাতার জনসমাজের এক বৃহৎ অংশ ছিল। এখানে যে সব বিদেশী স্থায়ীভাবে বসবাস করিত, তাহারাই নিজেদের আমোদ প্রমোদের জন্য রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্য অভিনয় পদ্ধতি প্রচলিত করে। বলা বাহুল্য, এইসব রঙ্গমঞ্চে ইংরেজী নাটকই অভিনীত হইত। ১৭৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'প্লে-হাউস' সম্ভবত ইংরেজদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার প্রথম রঙ্গালয়। সে যুগের ইতিহাসে 'বিস্টো থিয়েটার', 'চৌরঙ্গী থিয়েটার', 'খিদিরপুর থিয়েটার' প্রভৃতি বহু রঙ্গালয়ের নাম পাওয়া যায়। তখনকার দিনে দেশীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত ইংরেজ সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং ইংরেজদের রঙ্গালয়ে শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হইতেন। এইসব রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখিয়া তাঁহারা বাংলায় থিয়েটার গড়িবার প্রেরণা লাভ করিলেন। বস্তুত কলিকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির উদ্যোগেই বাংলা-থিয়েটারের সূচনা হইয়াছিল। অবশ্য বাঙালীদের মধ্যে থিয়েটার-প্রতিষ্ঠায় কেহ উদ্যোগী হইবার বহুপূর্বে একজন বিদেশী ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা নাটক অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। ইনি রুশ-পর্যটক ও ভারততত্ত্ববিদ্ **হেরাসিম লেবেডেফ**। ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় লাভের জন্য তিনি এদেশে আসেন। গোলোকনাথ দাস নামক এক ভদ্রলোকের কাছে লেবেডেফ এদেশের ভাষা শিখিতেন। এই গোলোকনাথের সহায়তায় 'The Disguise' এবং 'Love is the Best Doctor' নামে দুখানি ইংরেজী নাটক তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। গোলোকনাথেরই প্রেরণায় তিনি এই নাটক দুটি অভিনয়ের আয়োজন করেন। লেবেডেফ নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে ডোমতলা-লেনে একটি বৃহৎ রঙ্গালয় গড়িয়া তোলেন এবং এই মঞ্চে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে The Disguise নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয়ে বাঙালী অভিনেতা অভিনেত্রীরাই অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নাটক Love is the Best Doctor-এর অভিনয় হয় ১৭৯৬ এর মার্চে। নাটকে ভারতচন্দ্র রচিত সঙ্গীত ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই অভিনয় প্রভূত জনসমাদর লাভ করে।

লেবেডেফের 'বেঙ্গলী থিয়েটার' ব্যবসায়িক দিক হইতে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, জনসমাদর লাভ করিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অনুসরণ করিয়া আর কেহ 'বাংলা-থিয়েটার' প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন নাই। আমাদের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে লেবেডেফের প্রচেষ্টা একটা বিস্ময়কর ব্যতিক্রম এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা। যথার্থ ভাবে রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস শুরু হয় অনেক পরে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। 'হিন্দু থিয়েটার' বাঙালীর

উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এখানে কোন বাংলা নাটক অভিনীত হয় নাই। বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন নবীনচন্দ্র বসু। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নবীন বসু-প্রতিষ্ঠিত এই রঙ্গমঞ্চে বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয়ে যথার্থ ভাবে 'বাংলা থিয়েটার'-এর ধারাবাহিক ইতিহাসের সূচনা হয়। শহরের বিত্তবানদের, উদ্যোগে ইহার পরে একে একে বহু রঙ্গমঞ্চ গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহাদেরই উৎসাহে বাংলা ভাষার লেখকদের মধ্যে নাটক রচনার প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছিল। এইসব রঙ্গমঞ্চের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' (১৮৫৭), রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' (১৮৫৮), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যালয়' (১৮৬৫) আর 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অভিনয়শিল্পের প্রতি জনমানসে আগ্রহ সঞ্চার এবং বাংলা নাটকের সমৃদ্ধির দিক হইতে এইসব রঙ্গমঞ্চের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষদের আমোদ-প্রমোদের মধ্যেই শখের থিয়েটারগুলি সীমাবদ্ধ ছিল, সাধারণ মানুষের এখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। ইতিমধ্যে নূতন নাটক রচিত হইয়াছে, কুশলী শিল্পীগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই নবোদ্ভূত শিল্পের রসাস্বাদের জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়াছে। জনসাধারণের জন্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তাই অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নিয়মিত অভিনয়ের উদ্দেশ্যে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠায় এই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর উদ্বোধন হয়। তারপর হইতে আজ পর্যন্ত নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সুদীর্ঘ ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে।

রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের সহিত নাটকের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। রঙ্গমঞ্চের চাহিদা মিটাইবার জন্যই নূতন নাটক সৃষ্টি হয়। রঙ্গমঞ্চের সূচনা যখন হয় তখন অভিনয়যোগ্য বাংলা নাটক ছিল না, তাই ইংরেজী এবং সংস্কৃত হইতে অনুবাদ ও ভাবানুবাদ করিয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইত। এইসব অনুবাদে আন্তরিকভাবে মূলের অনুসরণ না করিয়া অনুবাদকেরা প্রভূত পরিমাণে স্বাধীনতা গ্রহণ করিতেন এবং ইহার মধ্যে বাঙালী লেখকদের স্বাধীনভাবে নাটক রচনার চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইত। প্রথম দিকের অনুবাদ নাটকের মধ্যে 'মার্চেন্ট অব ভিনিস' এবং 'রোমিও জুলিয়েত' অবলম্বনে রচিত হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩) ও 'চারুমুখ চিত্তহারা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম অনুবাদ নাটক 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' রচনা করিয়াও যখন নাটকটি অসার্থক প্রতিপন্ন হইল তখন তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তখন তিনি সংলাপে পদ্যাংশের বাহুল্য এবং কাহিনীর বৈদেশিকতা পরিবর্তন করিয়া

মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে তাঁহার একমাত্র মৌলিক নাটক 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৮) রচনা করিলেন, কিন্তু আঙ্গিক সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় এই নাটক ব্যর্থ হইল। তাঁহার সর্বশেষ নাটক ব্রহ্মদেশের এক মনোহর কাব্য অবলম্বনে রচিত। কিন্তু এই নাটকও তাঁহাকে সাফল্য আনিয়া দেয় নাই। মৌলিক নাটক রচনার চেষ্টা দেখা যায় জি. সি, গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) এবং তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'-এ (১৮৫২)। প্রথম ট্রাজেডি রচনার প্রয়াস হিসাবে 'কীর্তিবিলাস' নাটকটি উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতের পরিবর্তে পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শই বাংলা নাটকে ক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই দিক হইতে 'কীর্তিবিলাস'-এর লেখকের চেষ্টা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন। অবশ্য সংস্কৃত নাটকের প্রভাব 'কীর্তিবিলাস' এবং 'ভদ্রার্জুন-এর লেখক সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে পারেন নাই। দৃশ্যবিন্যাস এবং অঙ্কবিভাগ পদ্ধতিতে পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণ করিলেও 'নান্দী' এবং 'প্রস্তাবনা' প্রভৃতি অংশে ইহারা সংস্কৃত প্রভাব মানিয়া লইয়াছিলেন।

মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্বে নবগঠিত রঙ্গমঞ্চগুলির প্রয়োজন অনুযায়ী নাটক রচনা করিয়া সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছেন রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬) [ক. বি. ১৯৬৪]। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং রচনা-নৈপুণ্যের দিক হইতে তিনিই ছিলেন সে-যুগের একমাত্র সক্ষম লেখক। রামমোহন রায় যে সমাজসংস্কার আন্দোলনের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন ক্রমে সেই আদর্শ অনুসরণে সমাজের কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধে নানামুখী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বাংলা নাটক-প্রহসন এই সব আন্দোলনের প্রধান হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। রামনারায়ণ নাটকের বিষয়বস্তুরূপে তখনকার সমাজ জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলিই ব্যবহার করিতেন। কৌলীন্য প্রথার কুফল প্রদর্শনের জন্য তিনি ১৮৫৪ খ্রীঃ কুলীনকুলসর্বস্ব লিখিয়া প্রচুর খ্যাতিলাভ করেন। পূর্বাপর ধারাবাহিক কাহিনীর অভাব এবং দৃশ্যগুলির যোজনায় শিথিলবন্ধতার জন্য ইহাকে রসোত্তীর্ণ নাটক বলা যায় না। দৃশ্যগুলি পরস্পর হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে। কৌতুকবহ পরিস্থিতির মধ্যে কোন কোন চরিত্র ব্যঙ্গরচনা হিসাবে উপভোগ্য কিন্তু কাহিনী ও চরিত্রের পারস্পরিক সংযোগে নাটকটিতে অখণ্ড প্লট সৃষ্টি হইয়া উঠে নাই। এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও বাংলা নাটকের ইতিহাসে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' গুরুত্বপূর্ণ রচনা, কারণ বিষয়বস্তুর দিক হইতে ইংরেজী বা সংস্কৃতের উপরে নির্ভরতার পরিবর্তে বাঙালী জীবনের সচল ধারার উপর নির্ভর করিয়া রামনারায়ণ এই নাটকের মাধ্যমে বাংলা নাটককে বাঙালী জীবনের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকো নাট্যশালার পরিচালকদের অনুরোধে রামনারায়ণ বহু-বিবাহ

সমস্যা বিষয়ে 'নবনাটক' (১৮৬৬) রচনা করেন। ইহা ছাড়া তাঁহার পৌরাণিক বিষয়াশ্রিত এবং অনুবাদমূলক রচনার মধ্যে প্রধান প্রধান রচনা 'রুক্মিণী-হরণ' (১৮৭১), 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), 'কংসবধ' (১৮৭৫) এবং রত্নাবলী (১৮৫৮)।

এই যুগের নাটকের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটক' (১৮৫৪) এবং বিধবাবিবাহ বিষয়ে লেখা উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক' (১৮৫৮)-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা এবং অভিনয়কলারসিক একটি নূতন শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে অনেক লেখকই এই সময়ে নাটক রচনায় উৎসাহিত বোধ করিয়াছেন। কিন্তু রচনার আগ্রহ ব্যাপক হইলেও নাটক সম্পর্কে কোন সুষ্ঠু ধারণা তখনও গড়িয়া উঠে নাই। ইহারা সকলেই সংলাপের মাধ্যমে কোন ঘটনাচিত্র পরিস্ফুট করাকেই নাট্যকারের প্রধান কাজ মনে করিতেন। 'কাহিনী ও চরিত্রের টানা-পড়েনে বিপরীতমুখী আবেগের সংঘাতে নাটকের মধ্যে দ্বন্দ্বময় জীবনের প্রতিরূপ কিভাবে ফুটাইয়া তুলিতে হয় তাহা ইহারা জানিতেন না। সৃষ্টিকল্পনাহীন এই লেখকদের প্রয়াসে যথার্থ রসোত্তীর্ণ নাটক একটিও রচিত হয় নাই। মধুসূদনই বাংলা নাটকের প্রথম প্রতিভাশালী লেখক এবং তিনিই বাংলা নাটকের শিল্পরূপ গঠন করিয়া তোলেন।

২। প্রশ্ন : মধুসূদনের নাটক ও প্রহসনগুলি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে আলোচনা কর এবং বাংলা নাটকের শিল্পরূপ তাঁহার রচনায় কিরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছিল তাহা বিশ্লেষণ কর।

অথবা, মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৬]

উত্তর : ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে মধুসূদন মাদ্রাজ প্রবাস হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ইহার পূর্বেই কলিকাতার অভিজাত পরিবার-গুলির উদ্যোগে নাট্যান্দোলন বেশ প্রসারলাভ করিয়াছিল এবং শখের থিয়েটার-গুলিতে নিয়মিতভাবে না হইলেও প্রায়ই অভিনয়ের আয়োজন হইত। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া মধুসূদন পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিলেন এবং ক্রমে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী হইয়া উঠিলেন। বাংলা সাহিত্যের দৈন্যদশা তাঁহাকে পীড়িত করিত, কিন্তু তিনি নিজে বাংলা ভাষায় কিছু রচনা করিবার কথা ভাবেন নাই। এমন সময়ে পাইকপাড়ার রাজাদের 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'য় 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় উপলক্ষে বিদেশী

শ্রোতাদের জন্য নাটকটির একটি ইংরেজী তর্জমা করিয়া দিতে তিনি অনুরুদ্ধ হন। রত্নাবলী নাটকের মহড়া দেখিয়া এমন একটি নিকৃষ্ট নাটক মঞ্চস্থ করিবার জন্য অজস্র অর্থব্যয় হইতেছে দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে বাংলায় নাটক রচনার প্রতিজ্ঞা করেন। এই আকস্মিক ঘটনাটিই মহাকবি মধুসূদনের প্রতিভা-স্ফুরণে সহায়ক হইয়াছিল। কয়েকদিনের মধ্যে মধুসূদন মহাভারতের আদিপর্বের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী কাহিনী অবলম্বনে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি রচনা করিয়া বন্ধুমণ্ডলীকে বিস্মিত করিয়া দেন। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের লেখকরূপে, নাট্যকার-রূপেই মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন। ১৮৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে 'শর্মিষ্ঠা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার পরে ১৮৬১ সালের মধ্যে তিনি 'পদ্মাবতী নাটক' (১৮৬০), '**কৃষ্ণকুমারী নাটক**' (১৮৬১), [**ক. বি. ১৯৬৬**] এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) নামক প্রহসন দুইটি রচনা করিয়াছেন। এই নাটকগুলি তাঁহার নাট্য প্রতিভার স্বর্ণস্বাক্ষর বহন করিতেছে। কবি-নাট্যকার মধুসূদন নিজেই লিখিয়াছেন : "In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiment ; with us it is softness, all romance. We forget the world of reality and dream of fairyland. Ours are dramatic poems" এই উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, নাট্যকার মধুসূদন য়ুরোপীয় এবং আমাদের দেশের নাট্যকলার মূলগত পার্থক্য সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। বলা-বাহুল্য, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সার্থক ভাবে য়ুরোপীয় নাট্যরীতির প্রতিষ্ঠা করেন।

সংখ্যার বিচারে মধুসূদনের নাটক খুব বেশী না হইলেও তাঁহার রচনা-বলীতেই বাংলা নাটক যথার্থ শিল্পশ্রী-মণ্ডিত হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের চর্চায় পরিশীলিত মন লইয়া মধুসূদন বাংলা নাটক রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠিপত্রে তাঁহার নাট্যাদর্শ বিষয়ে যে চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া একান্তভাবে পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসারে নাটকরচনাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল। হৃদয়াবেগ ও প্রবৃত্তির প্রবল দ্বন্দ্বই নাট্যরসের পক্ষে উপযোগী এবং এই দ্বন্দ্বমথিত জীবনের প্রতিরূপ য়ুরোপীয় এবং ইংরেজী নাটকে যেভাবে শক্তি ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সহিত তুলনাযোগ্য কোন দৃষ্টান্ত তিনি ভারতীয় সাহিত্যে খুঁজিয়া পান নাই। বাংলা ভাষায় যথার্থ নাটক সৃষ্টি করিতে হইলে তাই পাশ্চাত্যের নাট্য-সাহিত্যের কৌশলগুলি যে আয়ত্ত করা প্রয়োজন এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাঁহার রচনায় তিনি পাশ্চাত্য নাট্যকলা বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদনের প্রথম রচনা শর্মিষ্ঠায় অনেক ত্রুটি চোখে পড়ে। প্রথমতঃ সংলাপ রচনার জন্য কোন আদর্শ ভাষা মধুসূদন তখনও উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। সংলাপ অনেকটা সংস্কৃত নাটকের ভঙ্গিতে রচিত হইয়াছে এবং প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহারের ফলে ভাষার গতি অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কাহিনীটি প্রত্যক্ষ ঘটনার মাধ্যমে পরিস্ফুট না করিয়া বর্ণনাত্মক সংলাপের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই সংলাপ আবার কোথাও কোথাও অতিমাত্রায় কাব্যধর্মী হইয়া পড়ায় নাটকের দ্বন্দ্বময় বাস্তবতা অনেক পরিমাণে আচ্ছন্ন হইয়াছে। তবুও যযাতি-শর্মিষ্ঠা দেবযানীর এই কাহিনীর মধ্যে প্রেম-ঈর্ষা-প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব যে তীব্র নাটকীয় রূপ লাভ করিয়াছে তাহা বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিনব। এই রচনাটিতেই তখনকার নাট্যকলা রসিকেরা প্রথম যথার্থ নাট্যরসের স্বাদ পাইয়াছেন। মধুসূদন এই নাটকের জন্য বিপুলভাবে অভিনন্দিত হন।

তাঁহার দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' বস্তুতঃ একটি গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর রূপান্তর। গ্রীক পুরাণের 'Apple of Discord' নামক প্রসিদ্ধ কাহিনীটিকে ভারতীয় পুরাণের শচী, মুরজা, রতি, ইন্দ্রনীল প্রভৃতি দেবদেবীর চরিত্রের সাহায্যে রূপায়িত করিয়াছেন। যদিও এই নাটকে ঘটনাগুলি নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয় নাই, দৈবশক্তির প্রভাবে ঘটনাগতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তবুও সমগ্র নাট্যকাহিনী প্রত্যক্ষ ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় শর্মিষ্ঠার তুলনায় এই নাটকে নাট্যগুণ বেশি পরিস্ফুট। দেবদেবীর চরিত্র চিত্রণে ভারতীয় আদর্শের পরিবর্তে গ্রীক আদর্শই অনুসৃত হইয়াছে। পদ্মাবতী নাটকের সংলাপে মিলনহীন পয়ারের ব্যবহারে অমিত্রাক্ষরের পূর্বসূচনা দ্যোতিত হয়।

'কৃষ্ণকুমারী' মধুসূদনের সুপরিণত রচনা। এই নাটকের কাহিনী রাজপুতনার ইতিহাস হইতে গৃহীত। রাণা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণা। মানসিংহ এবং জয়সিংহ দুই রাজা কৃষ্ণার পাণিপ্রার্থী। কৃষ্ণাকে না পাইলে ইহারা ভীমসিংহের রাজ্য আক্রমণ করিবে। পটভূমিতে ভীমসিংহের মনে কন্যার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ এবং দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ—প্রবল দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। কৃষ্ণা আত্মহত্যা করিয়া স্বদেশের মর্যাদা রক্ষা করিয়া যায়। ভীমসিংহের প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণাম ঘটে উন্মত্ততায়। এই শোচনীয় কাহিনীতে উচ্চস্তরের ট্রাজেডির গুণগুলি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির রস আমাদের নাট্যসাহিত্যে প্রথম এই নাটকে সফলভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে চরিত্রসৃষ্টি এবং ঘটনাসংস্থানে মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী'তে বিস্ময়কর সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন।

বিভিন্ন দৃশ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতির পটে টাইপ চরিত্রের অবস্থা বিপর্যয়ের

চিত্র লইয়া যে নক্‌শা জাতীয় রচনা ইতিপূর্বে নাটক নামে চলিত সেই অপসৃষ্টির হাত হইতে উদ্ধার করিয়া এই তিনটি রচনায় নাটকের একটি উচ্চ মান তিনি স্থাপন করেন। ঘটনার সহিত চরিত্রের যুক্তিসঙ্গত সংযোগ রক্ষা করিয়া মানবিক হৃদয়াবেগের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মুখর, আদ্যন্তযুক্ত কাহিনীসমন্বিত নাটক রচনার শিল্পকৌশল মধুসূদনই বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন করেন। সুতরাং তাঁহাকে 'বাংলা নাটকের জনক' বলা যাইতে পারে।

নানা সামাজিক সমস্যা লইয়া ব্যঙ্গাত্মক নক্‌শা-জাতীয় রচনার ধারা মধুসূদনের পূর্বেই সূচিত হইয়াছিল। এই ধরনের লঘুরসের ব্যঙ্গরচনার মধ্যে যে শিল্পগত সম্ভাবনা ছিল 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক প্রহসন দুটিতে মধুসূদন তাহার পরিপূর্ণতা সাধন করেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় আধুনিক শিক্ষাভিমানী ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের চারিত্রিক বিকার-বিকৃতির ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটিতে রক্ষণশীল সমাজে ধর্মের আবরণে যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হইত—তাহারই প্রতি মধুসূদন বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছিলেন। দুটি প্রহসনে নাগরিক জীবন এবং গ্রাম বাংলার দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু উভয় পরিবেশেরই একান্ত বাস্তবরূপ মধুসূদন নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। এই প্রহসন দুটির সংলাপের ভাষা হইতে বুঝা যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মুখের ভাষা সম্পর্কে মধুসূদনের ধারণা কত ব্যাপক ছিল। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ প্রহসন। এই ব্যঙ্গ-রচনাটির মধ্যে চরিত্রসৃষ্টির দুর্লভ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মের ভেকধারী ভক্তপ্রসাদ নামক বৃদ্ধ জমিদার চরিত্রটি স্বল্পায়ত কাহিনীর মধ্যেই সম্পূর্ণ নাটকীয় চরিত্রের আকার লাভ করিয়াছে এবং তাহার মধ্যে মনুষ্যত্বভ্রষ্ট অথচ করুণ একটি মানুষের মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নাটক এবং প্রহসন—উভয় শাখাতে মধুসূদন যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন বাংলা নাটকের পরবর্তী ধারায় সেই আদর্শই দীর্ঘকাল অনুসৃত হইয়াছে। যেমন কাব্যের ক্ষেত্রে তেমনই নাটকেও মধুসূদনের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী এবং ব্যাপক। বাংলা নাটকে যথাযথ শিল্পরূপ সৃষ্টি করিয়া তিনিই সাহিত্যের এই শাখাটির ভবিষ্যৎ পরিণতির পথনির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

৩। প্রশ্ন : বাংলা নাটকের আদি পর্যায়ে রামনারায়ণ তর্করত্ন ও মধুসূদন দত্তের কৃতিত্ব কতখানি তাহা আলোচনা কর।

[ব. বি. ডিগ্রী পার্ট ওয়ান, (মডিফায়েড) ১৯৬৪]

উত্তর : প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৪। প্রশ্ন : দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ও প্রহসনগুলির পরিচয় দাও এবং বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তাঁহার কীর্তির মূল্য বিচার কর।

অথবা, **দীনবন্ধু মিত্র নাট্যরচনায় সে-যুগে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার অসাধারণ বীজ কোথায় কোথায় ছিল তাহা আলোচনা করিয়া নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর দান সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা কর।**

[ব. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩]

অথবা, **দীনবন্ধুর নাট্য-প্রতিভা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।**

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৬]

অথবা, **বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিকাশে দীনবন্ধু মিত্রের দানের পরিমাণ ও গুরুত্ব নির্দেশ কর।** [উ. ব. বি. ১৯৬৯]

উত্তর : ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের অনুকরণে বাংলা নাটকরচনায় যে সসংকোচ, আত্মপ্রত্যয়হীন প্রয়াস সূচিত হইয়াছিল মধুসূদনের আকস্মিক আবির্ভাবে সেই দ্বিধার ভাব সহজেই কাটিয়া যায়। মধুসূদন আপন প্রতিভার শক্তি প্রয়োগ করিয়া বাংলা নাটকের শিল্পগত সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন, ফলে বাংলা নাটকের সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত হইয়া উঠিল। মধুসূদনের পরে বাংলা নাটকের সমৃদ্ধিসাধনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছেন দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু বিশেষ ভাবে নাট্যকারের প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাটকে ঘটনা প্রবাহ এবং চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের টানা পোড়েনে যে জগৎ রচিত হইয়া উঠে তাহার মধ্যে লেখকের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে না। সম্পূর্ণ আত্ম-নিরপেক্ষ বিষয় ভাবনার কৌশলে নাট্যকারকে জীবনের রূপ প্রত্যক্ষ আকারে নাটকের মধ্যে তুলিয়া ধরিতে হয়। কল্পনার এই objectivity নাটকীয় প্রতিভার প্রধান লক্ষণ। লেখক যাহা রচনা করিতেছেন, যে ঘটনা এবং চরিত্রের জাল বুনিতেছেন তাহার মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করিয়া দেন। যেন যথাপ্রাপ্ত জগতেরই বস্তুরূপের প্রতি তন্ময় হইয়া সেই জগৎটিকে নাট্যকার দৃশ্যমান করিয়া তোলেন। এই অহংভাবমুক্ত সৃষ্টি-কল্পনা বাংলা সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ। বাংলার নাট্য-সাহিত্যে একমাত্র দীনবন্ধুর মধ্যেই প্রকৃত নাট্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এদিক হইতে তাহার রচনাবলী বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। লেখক হিসাবে তাঁহার প্রধান সম্বল ছিল ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং 'প্রবল স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি'। বাংলার লোক-জীবনের সর্বস্তরের মানুষ সম্পর্কে এমন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লেখক খুব

বেশি নাই। তিনি যাঁহাদের সান্নিধ্যে আসিতেন প্রবল সহানুভূতিবশে সেই সব মানুষের সহিত একাত্ম হইয়া যাইতেন। তাঁহার রচনায় তাই সহজেই বাস্তব চরিত্রগুলির অন্তর-বাহিরের প্রতিকৃতি পূর্ণায়তভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। রচনার বিষয়বস্তুর জন্য দীনবন্ধু পুরাণ ইতিহাসের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতার বিপুল সম্পদের উপরেই নির্ভর করিয়াছেন। সমসাময়িক সমাজের বাস্তব জীবনস্রোতে যেসব সমস্যা আবর্তিত হইয়াছে, দীনবন্ধুর অনুসন্ধিৎসু মন তাহারই মধ্যে মানবজীবনের রহস্যের অনুসন্ধান করিয়াছে। তাঁহার সৃষ্টি-কল্পনা একান্তভাবে ধূলিমাটির সংসারের সহিত সমাজের জটিল বিন্যাসে জীবনের যে রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে তাহারই সহিত যুক্ত ছিল। দীনবন্ধুর এই তীব্র ও ব্যাপক জীবনাগ্রহ শুধু নাটকেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে নূতন স্বাস্থ্যের দীপ্তি সঞ্চার করিয়াছে। মধুসূদন বাংলা নাটকের গঠনগত সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন আর দীনবন্ধু এই নূতন শিল্পমাধ্যমটিকে আমাদের জীবনের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

তাঁহার প্রথম নাটক **'নীলদর্পণ'** (১৮৬০) রচনার মূলেও ছিল তাহার জীবনাগ্রহ এবং প্রবল সহানুভূতি। বাংলাদেশে দীর্ঘকাল হইতে নীলের চাষ প্রচলিত ছিল। বিদেশী বণিকেরা গ্রামাঞ্চলে কুঠি নির্মাণ করিয়া চাষীদের দ্বারা নীল চাষ করাইত। কিন্তু ক্রমে নীলকর সাহেবদের লুব্ধতা এতদূর বৃদ্ধি পায় যে সর্বপ্রকারে তাহারা চাষীদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতে আরম্ভ করে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগ্রিম দাদনের জালে জড়াইয়া নীলচাষে তাহাদের বাধ্য করিতে থাকে। সিপাহী বিদ্রোহের পরে এই নীলকর সাহেবদের অনাচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশময় একটা প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন দমনের জন্য নীলকরেরা যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিল বহু বাঙালী পরিবার তাহাতে বিধ্বস্ত হইয়াছে। নীলকরদের এই নির্যাতন চাষী জীবনে যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়। দীনবন্ধু এই অভিজ্ঞতাই তাঁহার 'নীলদর্পণ' নাটকে লিপিবদ্ধ করিলেন। ১৮৫৯-৬০ সালের সেই গণ-অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় দীনবন্ধুর প্রতিভা যথার্থ প্রকাশের পথ খুঁজিয়া পায়। ১৮৬০ সালে বাংলাদেশ যখন নীলবিদ্রোহে আলোড়িত হইতেছিল সেই সময়ে 'নীলদর্পণ' নাটক বাঙালী জীবনের চরম সঙ্কটের বাস্তব প্রতিচ্ছবি তুলিয়া ধরিল। রেভারেন্ড লঙ কবি মধুসূদনকে দিয়া নাটকখানি ইংরেজীতে অনুবাদ করাইয়া 'The Indigo Planting Mirror' নামে প্রকাশ করিলেন। মূল নাটকে লেখকের নাম ছিল না তাই দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে নীলকরেরা কোন অভিযোগ আনিতে পারে নাই। ইংরেজী অনুবাদের প্রকাশক হিসাবে লঙ-এর বিরুদ্ধে তাহারা বিচারালয়ে অভিযোগ উত্থাপন করিল। লঙকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইল এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইল। এই জরি-

মানার টাকা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তৎক্ষণাৎ বিচারালয়ে দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় চাষীদের উপর অত্যাচার বন্ধ হইয়াছিল। বাংলাদেশের কৃষকসমাজ নীলচাষের অভিশাপ হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়াছিল।

দীনবন্ধুর এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন নাটকটির সাহিত্য মূল্যও নগণ্য নয়। ভদ্রশ্রেণীর চরিত্রগুলির সংলাপের ভাষায় আড়ষ্টতা, বিপুল ঘটনা-সমাবেশ এবং ঘটনাধারায় যুক্তিসঙ্গত পারম্পর্যের অভাব, করুণ রসসৃষ্টির মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহে আকস্মিক মৃত্যু ও শোকোচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি প্রভৃতি যে সব অভিযোগ এই নাটক সম্পর্কে, উত্থাপন করা হয় তাহা মানিয়া লইয়াও চরিত্রসৃষ্টির দিক হইতে এবং বাস্তব জীবনের যথাপ্রাপ্ত আবহ পরিস্ফুটনের অসামান্য দক্ষতার দিক হইতে এই নাটকটিকে একটি অসাধারণ রচনা বলা যায়। তোরাপ এবং অন্যান্য চাষী চরিত্র, রেবতী, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি চাষীর ঘরের বধূ ও কন্যার চরিত্র চিত্রণে দীনবন্ধু যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন বাংলা নাট্য-সাহিত্যে তাহার সহিত তুলনীয় কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। 'নীলদর্পণ' বহুবার সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। এই নাটকেরই অভিনয়ে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামক প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয়।

'নীলদর্পণ' নাটকের শক্তি ও দুর্বলতা বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কিন্তু এই নাটকের উৎকর্ষ সম্পর্কে তর্ক না করিলেও বলা চলে, দীনবন্ধু সিরিয়াস নাটকের চেয়ে লঘুরসের প্রহসন রচনাতেই সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। প্রহসন রচনায় তিনি একান্তভাবে মধুসূদনের আদর্শই অনুসরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ উদ্ভট পরিস্থিতির পটে টাইপ চরিত্রের বিকৃতির চিত্র অঙ্কনের পরিবর্তে চারিত্রিক ভারসাম্য হারানো মানুষের জীবনের হাস্যকরুণ রূপ মূর্ত করিয়া তোলার দিকেই তাহার প্রবণতা ছিল। শুধুমাত্র বিসদৃশ পরিস্থিতির সৃষ্টি না করিয়া চরিত্র সৃষ্টির উপরেই তিনি গুরুত্ব আরোপ করিতেন। **'সধবার একাদশী'** (১৮৬৬) [ক. বি. ১৯৬৪, '৬৭] দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ প্রহসন এবং শ্রেষ্ঠতম রচনা। নব্যশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত যুবকসম্প্রদায়ের মদ্যাসক্তি তখনকার দিনে একটা প্রবল ব্যাধির আকারে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। মদ্যাসক্তির জন্য বহু প্রতিভাশালী শিক্ষিত যুবকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। হয়তো মদ্যপানের কুফল প্রদর্শনই এই নাটক রচনায় দীনবন্ধুর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু নীতি প্রচারের উদ্দেশ্যমূলকতা এই নাটকে গৌণ হইয়া গিয়া ইহার মধ্যে অত্যুচ্চ সৃষ্টিকল্পনার নিঃসংশয় প্রকাশ ঘটিয়াছে। 'সধবার একাদশী'র নায়ক নিমচাঁদ এক আশ্চর্য সৃষ্টি। নানা বিদ্যাচর্চায় শাণিত বুদ্ধি এবং গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী নিমচাঁদের চরিত্রে মদ্যাসক্তি এক দুরপনেয় প্রবৃত্তি।

বিশুষ্ক জীবন সুখ বিফলীকৃত শিক্ষা'র জন্য নিমচাঁদের অনুশোচনার অন্ত নাই। নিজের অধঃপতন সম্পর্কে সে পূর্ণ সচেতন। কিন্তু এই প্রবৃত্তির হাত হইতে নিস্তার লাভেরও তাহার কোন উপায় নাই। প্রখর আত্মসচেতনতা তাহার চরিত্রে তীব্র যন্ত্রণাবোধ সঞ্চার করিয়াছে। নাটকটি ব্যঙ্গকৌতুকে পূর্বাপর হাস্য মুখরিত অথচ ইহারই মধ্যে নিমচাঁদের কণ্ঠে মাঝে মাঝে সুগভীর নৈরাশ্য এবং বিষাদের সুর উচ্চকিত হইয়া উঠিয়া হাসিকেও কেমন যেন বেদনা ভারাক্রান্ত করিয়া আনে।

দীনবন্ধুর 'বিয়েপাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) এবং 'জামাই বারিক' (১৮৭২) প্রহসন দুটি 'সধবার একাদশী'র মতো শিল্পসাফল্যমণ্ডিত না হইলেও উপভোগ্য রচনা। বিবাহবাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের যে লাঞ্ছনার কাহিনী 'বিয়েপাগলা বুড়ো' প্রহসনে রচিত হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তাহা তখনকার কোন জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া রচিত। 'জামাই বারিক' প্রহসনটি কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ঘর জামাই রাখার প্রথাকে ব্যঙ্গ করিয়া রচিত হইয়াছে। দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'লীলাবতী' (১৮৬৭) এবং 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩)।

শুধু সাহিত্য হিসাবেই যে দীনবন্ধুর রচনাবলী মূল্যবান তাহা নহে, তাহার নাটকগুলির জন্যই বাংলাদেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও নাট্যশিল্পের দ্রুত প্রসার সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার নাটকের বিষয়বস্তু সামাজিক জীবন হইতে আহরিত, তাই অভিনয়ের জন্য বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং মঞ্চের সাজসজ্জার প্রয়োজন হইত না। ধনী পরিবারগুলির শখের থিয়েটারের বাহিরে ব্যাপক জনসমাজের জন্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা এই সহজে রূপায়ণযোগ্য নাটকগুলির জন্য সম্ভব হইয়াছিল। জনসাধারণের জন্য রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় যে সব বিত্তহীন যুবক উদ্যোগী হইয়াছিলেন দীনবন্ধুর নাটকই ছিল তাঁহাদের একমাত্র ভরসা। গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, "মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।"

৫। প্রশ্ন : বাংলা নাটকের উদ্ভবযুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও এবং মধুসূদন ও দীনবন্ধুর হাতে বাংলা নাটক কি ভাবে নবজীবন লাভ করিল তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫]

উত্তর : ১, ২ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখ।

৬। প্রশ্ন : মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটকগুলিতে বাংলা নাট্যকলা কতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, উভয়ের কয়েকটি নাটক বিচার করিয়া তাহা নির্দেশ কর।

উত্তর : ২ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখ।

৭। প্রশ্ন : ১৮৫৪ হইতে ১৮৭২ খৃঃ অঃ পর্যন্ত বাংলা নাটকের যে পরিণত রূপ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এই যুগের মুখ্য নাটকগুলি অবলম্বন করিয়া তাহার একটি বিবরণ দাও।

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৫৫]

উত্তর : ১, ২ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখ।

৮। প্রশ্ন : বাংলা নাটকের ইতিহাসে মনোমোহন বসু এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান নির্দেশ কর।

উত্তর : আধুনিক নাট্যশিল্পের উদ্ভবের আগে বাংলা দেশের জীবনে যাত্রাগানের ব্যাপক সমাদর ছিল। সঙ্গীতবহুল যাত্রার পালাগুলিই ছিল সাধারণ মানুষের নাট্যরস পিপাসা-পরিতৃপ্তির একমাত্র উপায়। কলিকাতার সমাজে যখন রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা এবং নূতন আদর্শে নাটক রচনার ধারা সুপরিণত হইয়া উঠিতেছিল তখনও যাত্রার সমাদর হ্রাস পায় নাই। ক্রমে দেখা গেল নবগঠিত রঙ্গমঞ্চের অভিনয় রীতির উপর যাত্রার প্রভাব নানাভাবে কাজ করিতেছে। কেহ কেহ নূতন নাট্য শিল্পের সহিত প্রাচীন যাত্রাগানের সম্মিলন সাধনের জন্যও সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) এই দলের মুখপাত্র হিসাবে স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছিলেন, "আমরা মধ্যস্থ মানুষ ; আমরা চাই দেশে পূর্বে যাহা ছিল তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক।" স্বদেশের প্রাচীন শিল্পবস্তুর প্রতি মমত্ববোধ হইতেই মনোমোহন বসু এই কথা বলিয়াছিলেন। নিজের সাধ্য অনুসারে প্রাচীন যাত্রার ত্রুটি সংশোধন করিয়া এক ধরনের ভক্তিরসাশ্রিত পালাগান তিনি প্রবর্তন করেন। এই পালাগান 'গীতাভিনয়' নামে পরিচিত। তিনি পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি বিষয়বস্তুরূপে ব্যবহার করিতেন। 'সতী নাটক' (১৮৭৩), 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' (১৮৭৫) প্রভৃতি মনোমোহন বসু বিরচিত গীতাভিনয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু মনোমোহন তাঁহার এই প্রচেষ্টা দ্বারা বাংলা নাটকের প্রগতিতে বাধা দিয়াছেন। মধুসূদন ও দীনবন্ধুর সৃষ্টিতে নাট্যশিল্পের যে আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার অনুবর্তনেই বাংলা নাটকের

যথার্থ সমৃদ্ধি হইতে পারে—একথা বুঝিবার মতো শিল্পবোধ মনোমোহন বসুর ছিল না। তাঁহার জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তাই বলতে হয়, নাট্যকলার যে উচ্চ আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করার পরিবর্তে বিরূপতা সৃষ্টি করিয়া তিনি বাংলা নাটকের ইতিহাসে প্রগতিবিরোধী শক্তিরূপে কাজ করিয়াছেন। তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে দেখা যায়, মনোমোহন বসুর গীতাভিনব জাতীয় নাটকই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। এমন কি গিরিশচন্দ্রও তাঁহার প্রভাব স্বীকার করিয়া ভক্তিরসের উচ্ছ্বাসপূর্ণ নৃত্যগীতবহুল নাটক রচনা করিয়াছেন এবং রঙ্গমঞ্চে এই ধরনের নাটক ব্যাপকভাবে অভিনীত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রভাব বৃদ্ধির পূর্বে নাট্য সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) বিশেষ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন লেখক ছিলেন। মনোমোহন বসু রঙ্গমঞ্চে যাত্রাগানের প্রচলনের যে চেষ্টা শুরু করিয়াছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহা দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া নাটকে মধুসূদন-দীনবন্ধু প্রবর্তিত আদর্শ অনুবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাংলাদেশে স্বাদেশিকতার চেতনা যে কয়েকজন মানুষের কর্মধারাকে অবলম্বন করিয়া প্রথম উন্মীলিত হইয়াছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধ সঞ্চারের শক্তিশালী মাধ্যমরূপে নাটক ও রঙ্গমঞ্চের উপযোগিতা সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা লইয়া তিনি নাটক রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯), 'স্বপ্নময়ী নাটক' (১৮৮২) প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রিত নাটকে প্রাচীনকালের পটভূমিতে স্বদেশ-প্রেমের আদর্শ রূপায়িত করিয়া বাংলা নাটকে একটা নূতন ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের নাট্যচিন্তার সহিত বাঙালী পাঠকদের পরিচয় সাধনের দিক হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদগুলিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তবে তিনি সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন প্রহসনে। 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৩০৯), 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২), 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬) প্রভৃতি প্রহসনে রচনার একটা নূতন আদর্শ স্থাপিত হইয়াছিল। সামাজিক অনাচার, কুপ্রথা প্রভৃতি বিষয়-বস্তুর উপর ব্যঙ্গ রচনার পরিবর্তে বিশুদ্ধ কৌতুকরস বা হিউমার পরিবেশনই ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনের লক্ষ্য। ইহাদের মধ্যে 'হঠাৎ নবাব' এবং 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' মলিয়েরের প্রহসন অবলম্বনে রচিত।

৯। **প্রশ্ন: বাংলা নাটক এবং রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের কীর্তির মূল্য বিচার কর।**

অথবা, গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[ক. বি. বি. এ. ১৯৬৭]

কুমারের অভিনয়-নৈপুণ্যে বহু নাট্য-রসিকদের আকর্ষণ করিয়াছে। ক্ষীরোদ প্রসাদের অন্যতম বিখ্যাত নাটক 'রঘুবীর'-এ রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব স্পষ্ট। ইহার সংলাপের কিছু অংশ রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান পয়ার বা অমিত্রাক্ষর ছন্দেব অনুকরণে রচিত। "আর্যশিক্ষা ও আদর্শের সঙ্গে অনার্য প্রবৃত্তি ও কর্তব্য-বোধের অনিবার্য সংঘর্ষ হইতেছে রঘুবীরের একমাত্র সমস্যা। রঘুবীর ও অনন্তরাও, এই দুই ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের ছায়া পড়িয়াছে। ...ক্ষীবোদপ্রসাদের নাট্যরচনার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে কাহিনীর মনোহারিত্ব অর্থাৎ প্লটের গল্পরস। গিরিশচন্দ্র যে ভক্তিরসোচ্ছ্বাসের বন্যা আনিয়াছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহা প্রতিরোধ করিলেন কাহিনীতে বোমান্সের গাঢ়তা আনয়ন করিয়া। আলোচ্য যুগের নাট্যকারদের মধ্যে শুধু ক্ষীরোদপ্রসাদই রবীন্দ্র-নাথেব অনুসরণ করিবাব প্রয়াস করিয়াছিলেন।" —(সুকুমার সেন)

১২ঃ প্রশ্নঃ দ্বিজেন্দ্রলাল বা গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [ক. বি. ১৯৬৭]

[**উত্তর সংকেতঃ** ৯নং ও ১১ নং প্রশ্নেব উত্তর দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় পর্ব

॥ কাব্য-কবিতা ॥

১। প্রশ্ন ঃ ঊনবিংশ শতকে আবির্ভূত কবিওয়ালাদের গানের ভাল-মন্দ দুই দিকই নির্দেশ কর।

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৬ ।

উত্তর ঃ ঐতিহাসিক ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল এই একশত বৎসর কবিওয়ালাদের বিকাশের পূর্ব-যুগ। তাহার পর রুচি ও যুগ প্রভাবে ব্যাপক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে এবং বহু উন্নততর সংস্কৃতির প্রভাবে কবিগান প্রায় বিলুপ্ত হইল।

প্রধানতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যই আদি কবিওয়ালাদের অনুপ্রেরণা। কিন্তু যে ভক্তিরস ও বিশ্বাস প্রবণতা বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমস্ত পুনরাবৃত্তি দোষ, গতানুগতিকতা এবং কিঞ্চিৎ আদি রস প্রবণতা সত্ত্বেও মহৎ শিল্পগৌরবে মণ্ডিত করিয়াছিল কবিওয়ালাদের যুগে সেই ভক্তি ও বিশ্বাস ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। এদিকে জমিদারতন্ত্র ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িয়াছে এবং সমাজের অধিকার আসিয়া ন্যস্ত হইয়াছে নব উদীয়মান কলিকাতার বণিক-তন্ত্রের হাতে। এই নব ধনিকগোষ্ঠীর কোন রুচিগত আভিজাত্য ছিল না, তাই তাহারা এই সুলভ ও বিরত রসকে আনন্দ উপকরণ হিসাবে পোষকতা করিতে লাগিল। বৈষ্ণব ভক্তি প্রবাহ একেবারে যে রহিল না, তাহা নহে, কিন্তু তাহার সঙ্গে আসিয়া মিশিল খেউড় ও লহর গান। অভব্যতায় এইগুলি তুলনাহীন। বিশেষভাবে নদীয়া শান্তিপুর একসময় এই কুৎসিত গীতি-সাহিত্যের পীঠস্থান হইয়া উঠিল। সহজ কথায়, মুসলমান শাসনের অন্ত্যপর্ব এবং কোম্পানীর আমলের আদিপর্ব সারাদেশে যে ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বহিয়া আনিয়াছিল- ভারতচন্দ্রের সেই বিকৃত রুচির পটভূমিতে এবং ক্ষয়িষ্ণু বৈষ্ণব ধর্মের পরকীয়া রসের উল্লাসের মিশ্র ফল এই কবিগান।

তথাপি কবিগানের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বের কথা ভুলিলে চলিবে না। প্রথমত, ইহা ছিল সর্বতোভাবে গণ-সাহিত্য। দ্বিতীয়ত, ইহার মধ্যে মানবিকতা বা human element ছিল প্রধান। বৈষ্ণব রসতত্ত্ব কবিগানের উপলক্ষ হইলেও লক্ষ্য ছিল জীবন এবং এই কারণেই রাম বসুর বিরহ বা আগমনী এতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

কবিগানে নিম্নরুচি দেখা দিলেও কবিওয়ালাদের প্রতিভাকে অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। আসরে বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষের কাটান

তৈয়ারী করা, কখনও তাহাকে সরস ব্যঙ্গ আবার কখনও বা মধুর কাব্যরসে পরিবেশন করা সহজ কৃতিত্বের কাজ নয়। এণ্টনি ফিরিঙ্গির সঙ্গে লড়াইয়ে ভোলা ময়রা অথবা রামপ্রসাদ ঠাকুর এবং রাম বসুর বাটান রীতিমত স্মরণীয় শিল্প প্রতিভার পরিচায়ক।

কিন্তু বিপদ হইল, সাধারণ দর্শকের রুচির মুখ চাহিয়াই কবিওয়ালাদের গান গাহিতে হইত; এবং বীভৎসতাই অনেকক্ষেত্রে জয়মাল্য লাভের এক . উপকরণ হইয়া দাড়াইত। উন্নত রসের পরিবেশন এই সমস্ত আসরে সহজসাধ্য হইত না এবং শ্রোতাদেরও ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কা থাকিত। সুতরাং ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক সময় হরু ঠাকুর বা রাম বসুর মত শক্তিমান কবিকেও ..-রুচির তাগিদে পংকস্নান করিয়া আসর জমাইতে হইত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালাদের মধ্যে হরু ঠাকুর, এণ্টনি ফিরিঙ্গি ও ভোলা ময়রা বিশিষ্ট ছিলেন। তাহাদের মধ্যে হরু ঠাকুরকে অষ্টাদশ শতা... কবিওয়ালাও বলা যায়। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৮১২ খ্রীঃ অঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহারা ছাড়া বলাই সরকার, হোসেন ... ঠাকুরদাস সিংহ, যজ্ঞেশ্বরী, বলাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিওয়ালার নামও উল্লেখযোগ্য।

হরু ঠাকুরের (১৭৩৯-১৮১২) পূর্ণ নাম ছিল হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। শোভা-বাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল নিবিড়। কবি-ওয়ালাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। কারণ, সেকালে তাঁহার মত বাঁধনদার আর ছিল না। বহু দলের তিনি গান বাঁধিয়া দিতেন। হরু ঠাকুর ভবানী বিষয়ক, সখী-সংবাদ, বিরহ, খেউড়, লহর প্রভৃতি সকল রকম গান রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হরু ঠাকুরের খেউড় এবং লহর গান ছিল সর্বোত্তম। ঈশ্বর গুপ্ত সেগুলিকে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট মনে করিয়াছিলেন। হরু ঠাকুরের শিষ্যগণের মধ্যে ভবানে বেনে, নীলু ঠাকুর, ভোলা ময়রা বিখ্যাত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাম বসুর (১৭৮৬-১৮২৮) কবিখ্যাতি চরমে উঠিয়াছিল। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই রাম বসু কলাপাতায় কাব্যচর্চা করিতেন এবং বার বছর বয়সের সময় তখনকার বিখ্যাত কবিওয়ালা ভবানী বেনে নিজ দলে তাঁহার গানগুলি গাওয়াইবার জন্য গ্রহণ করেন। তাঁহার উমামূলক সঙ্গীতগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'বিরহ' এককালে সমগ্র বাংলা দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল।

ভোলা ময়রার (১৭৭৫—১৮৫১) সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়

লিখিয়াছেন, "বাংলা দেশের সবাইকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রাম গোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তার, হুতোম প্যাঁচার লেখলের ন্যায় রসিক লোকের এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার নিতান্ত আবশ্যক।" ভোলা ময়রা নিজের পরিচয়ে বলিয়াছেন—

আমি ময়রা ভোলা, ভিয়াই খোলা,
বাগবাজারে রই।

জনপ্রিয় ভোলা ময়রা ছিলেন হরু ঠাকুরে প্রিয় ছাত্র। বলাই সরকার, হোসেন সেখ, এন্টনি ফিরিঙ্গির সঙ্গে ভোলা ময়রার কবির লড়াইয়ের খ্যাতি আজিও লুপ্ত হয় নাই।

কবিওয়ালা হিসাবে এন্টনি ফিরিঙ্গি (?—১২৪৩) একটি মূল্যবান আসনের অধিকারী। এন্টনি জাতিতে পর্তুগীজ। তিনি একটি ব্রাহ্মণ কন্যার প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করেন। তখন হইতেই ভারতীয় রীতিতে বসবাস করিতে থাকেন। হিন্দু পর্বে এবং উৎসবে তিনি সানন্দে যোগদান করিতেন। অবশেষে তিনি এক কবির দল গঠন করেন। বাগবাজারের বিখ্যাত কবিওয়ালা ভোলা ময়রা, রাম বসু, ঠাকুর সিং প্রভৃতির সহিত তাহার কবিগানের যুদ্ধ অত্যন্ত উপাদেয় হইত। রাম বসু তাঁহাকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন—

সাহেব মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদ্রি সাহেব শুনতে পেলে, গালে দেবে চুনকালি।

এন্টনি ইহার যাহা জবাব দিয়াছিলেন তাহা বাংলা সাহিত্যে খোদিত হইয়া আছে—

খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে, এও কথা শুনি নাই।

রসিকতা এবং ব্যঙ্গ—এই দুই বস্তুর আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়াছে সাহেব কবিওয়ালার বাক্-চাতুর্যে। ভোলা ময়রার ব্যঙ্গ প্রায় ক্ষেত্রেই শালীনতার ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু এন্টনির ব্যঙ্গ রুচিশীল কবিওয়ালার স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

২। প্রশ্ন : বাংলা কাব্যের ইতিহাসে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্থান নির্দেশ কর।

অথবা, বাংলা কাব্যের পালাবদলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দান সম্পর্কে আলোচনা কর। **[বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩]**

উত্তর ঃ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যগুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যসমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে একজন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্য ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে? তাহাও দেখিতে পাই—নিজ প্রতিভা গুণে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে এখন ইহা একপ্রকার স্বাভাবিক নিয়ম যে, প্রতিভা ও সুরুচি পরস্পর সখী- প্রতিভার অনুগামিনী সুরুচি। ঈশ্বর গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে হইবে।" ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা সক্ষমতা এবং দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে যেমন তাঁহা কবিস্বরূপের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়, তেমনিই তিনি যে কালের মানুষ, সে কালের স্বরূপ বিশ্লেষণও প্রয়োজন। ঈশ্বর গুপ্তের আয়ুষ্কাল ১৮১২ হইতে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে মধ্যভা পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অপ্রতিহত একাধিপত্য ছিল। এই কালখণ্ডে বাংলার নবজাগরণের প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়। নূতন শিক্ষার আলোকে নবজাগ্রত বাঙালী মনীষা আত্মপ্রকাশের নূতন নূতন পথ অনুসন্ধান করিতেছে ধর্মচিন্তায়, সামাজিক মূল্যবোধে দ্রুত রূপান্তর ঘটিতেছে। প্রাচীন ও নবীন জীবনাদর্শের সংঘর্ষে নূতন আদর্শ উদ্ভাবনের আগ্রহে সমাজ তখন প্রাণচাঞ্চল্যে পূর্ণ। জাতীয় জীবনে নবীন আশার অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, উজ্জ্বল ভবিষ গড়িয়া তুলিবার সম্ভাবনা প্রবল আবেগ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে—কিন্তু কো স্থায়ী কীর্তি তখনও অর্জিত হয় নাই। গ্রাম্য সমাজাশ্রিত প্রাচীন সংস্কৃতি ধারায় ছেদ পড়িয়া গিয়াছে—কিন্তু আধুনিক সংস্কৃতির রূপ তখনও স্প হইয়া উঠে নাই। তখনও বিলীয়মান অতীত ধারার মধ্যে যেটুকু প্রাণশ অবশিষ্ট ছিল কবিগানে, আখড়াই গানে তার উচ্ছ্বাস দেখা যাইত। কলিকা মহানগরীর নবগঠিত জনসমাজের কোন কোন স্তরে সেই গানের সমাদরও ছিল কিন্তু সমাজের উচ্চকোটিতে রুচি-পরিবর্তনের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে ছিল। রামমোহন ভাব-বিপ্লবের সূচনা করিয়াছেন, পত্র-পত্রিকায় ধর্ম সমাজের নানা দিক সম্পর্কে বিচার-বিতর্ক শুরু হইয়াছে। উদীয়মান মধ্যবি শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ব্যাপক হইতেছে। এই অশান্ রূপান্তরমুখী সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের জীবনের পটভূমি। ঈশ্বর গুপ্ত গ্রামে মানুষ। কোন নিয়মবদ্ধ শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে বিদ্যার্জনের সুযোগ তি পান নাই। মুখে মুখে পদ্যরচনার সহজাত ক্ষমতা ছিল—সেই গুণে তি কবির দলের গায়কদের সমাদর লাভ করেন। কবি ও হাফ-আখড়াই-এর দলে জন্য তিনি গান বাঁধিয়া দিতেন। তাঁহার রুচি ও মানসপ্রকৃতির উপরে এ

লোকায়ত সাহিত্য এবং সঙ্গীতের প্রভাব গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। খাঁটি বাঙালী মেজাজ এবং বাংলার লোকজীবনের সহিত সংযুক্ত চলমান ভাষা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লেখক হিসাবে তাঁহার একমাত্র সম্বল; এই মন লইয়া কলিকাতার নূতন সমাজে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধান করিতে আসেন। পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে এবং সহায়তায় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা (১৮৩১) প্রকাশ করিয়া তিনি সাংবাদিকের জীবন শুরু করেন। 'সংবাদ প্রভাকর'ই তাঁহার প্রতিভা বিকাশের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তাঁহাকে নিয়ত পরিবর্তনশীল জীবনধারার নিকট সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে। বাংলাদেশের ইতিহাসের সেই গতি পরিবর্তনের যুগে সমাজের মধ্যে নিত্য নূতন আলোড়ন জাগিত। সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক হিসাবে প্রতিদিন প্রতিটি ঘটনার প্রতি তাঁহাকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে, বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে। সাংবাদিকের পক্ষে বাস্তবজীবনের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ অত্যাবশ্যক। এই বৃত্তির জন্যই তাঁহার মন একান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। পুরাতন কালের আবহাওয়ায় লালিত ঈশ্বর গুপ্তের মতো মানুষের পক্ষে মতবাদের দিক হইতে রক্ষণশীল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সংবাদ প্রভাকরের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন বিষয়ে তিনি যে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে উদার, প্রগতিশীল চিন্তা-ধারারই পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন বা নারী-শিক্ষায় পাশ্চাত্য আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হয় যে, তিনি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর সংস্কার চেষ্টার পথে বাধা সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার চিন্তাভাবনার কেন্দ্রে ছিল গভীর দেশপ্রেম। দেশের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য উৎকণ্ঠার মূলে ছিল তাঁহার গভীর দেশাত্মবোধ। যাহা কিছু নূতন—শুধু অভিনবত্বের জন্য তিনি তাহা নির্বিচারে মানিয়া লইতে পারিতেন না। সংশয় ও সন্দেহপ্রবণতা তাঁহার মানস প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমালোচকের তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিতেন বলিয়াই সর্বপ্রকার অসঙ্গতি তাঁহার দৃষ্টিপথে সহজে ধরা পড়িত। কৃত্রিমতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কৃত্রিমতার প্রতি অবিশ্রান্ত শ্লেষ-বিদ্রূপের শর বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল যে, তিনি খাঁটি জিনিস বড় ভালবাসিতেন, মেকির বড় শত্রু—সকল রকম মেকির উপর তিনি গালিবর্ষণ করিতেছেন—গভর্ণর জেনারেল হইতে কলিকাতার মুটে পর্যন্ত কাহারও মাফ নাই। জীবনে স্নেহ-স্পর্শ ঈশ্বরচন্দ্র কোন দিন পান নাই। হয়তো এই কারণে তাহার মনে স্নিগ্ধ প্রসন্নতা ছিল না। ভাবাবেগের স্পর্শলেশহীন তাঁহার অন্তঃকরণ পৃথিবীর প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি মেলিতে পারে নাই, স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের সন্ধান কোনদিন পায়

নাই। কবি হিসাবে তাঁহার দুর্বলতার হেতু বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বঙ্কিম চারিটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—"(১) পুস্তক-দত্ত সুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সমধর্মিণী অর্থাৎ যাহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম শিক্ষা করে, তাঁহার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ।"

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় জীবনের গূঢ়-গভীর রহস্য উন্মোচনে সক্ষম কবি-কল্পনার পরিচয় নাই। তাঁহার কবিতায় সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের মায়া কোথাও নাই, কেন যে নাই তাহার কারণ উপরের বিশ্লেষণ হইতে বুঝা যায়। সম্পাদক হিসাবে সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠা পূরণের তাগিদে অজস্র কবিতা তিনি রচনা করিয়াছেন। একান্ত সাময়িক-প্রসঙ্গ-নির্ভর কবিতার সংখ্যাই তাঁহার রচনার মধ্যে বেশি, সেইসব রচনা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে তাঁহার কবিতার একাধিক সংকলন প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি সংকলন বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদনা করিয়াছিলেন। কোনটিই পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ নহে। তাঁহার যে কবিতাগুলি পাওয়া যায় তাহা (১) পারমার্থিক ও নৈতিক, (২) সামাজিক এবং (৩) প্রেমবিষয়ক, এই তিন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর কবিতা সংখ্যায় বেশি, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নীরস রচনা। তবুও এই কবিতাগুলির মধ্যে কবির অকৃত্রিম আন্তরিকতার পরিচয় আছে। ঈশ্বর গুপ্তের সমগ্র ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে কবিতাগুলি অপরিহার্য।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা অর্থাৎ সমাজিক এবং বাস্তব জীবন পর্যবেক্ষণ-মূলক কবিতাগুলিই কবি হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের জনসমাদরের প্রধান কারণ। এইসব রচনাতেই তাঁহার রচনা-নৈপুণ্যের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া পড়িলে তখনকার কলিকাতার সমাজের একটি অখণ্ড চিত্র পাওয়া যায়। নানা স্তরের মানুষ তাহাদের বিচিত্র মনোবৃত্তি, রুচি-প্রকৃতির বিশিষ্টতা লইয়া খণ্ড খণ্ড রচনাগুলিতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথাসিদ্ধ খাদ্য বর্ণনাতেও ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক প্রবণতার গুণে অতুলনীয় কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার তপসে মাছ, পাঁটা, আনারস কিংবা পিঠাপুলি বা বিলাতী খানার বন্দনা বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়।

নারী-প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই; বরং এইসব রচনায় তাঁহার প্রবল নারীবিদ্বেষই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার ভাষা ব্যবহারের বিশিষ্টতা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন এমন খাঁটি বাংলায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই—পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধতার বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে।" দেশজ ভাষার শক্তি এবং সৌন্দর্য কোথায় তাহা ঈশ্বর গুপ্ত জানিতেন। আধুনিক বাংলা কবিতার ভাষা সেই দেশজ ভাষা হইতে ক্রমেই দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। কবিতাকে যদি ব্যাপক জনচিত্তের নিকট গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে কাব্যের ভাষায় সেই দেশজ ভাষার স্বাস্থ্য সঞ্চার অত্যাবশ্যক। এই দিক হইতে ঈশ্বর গুপ্তের রচনা আজও শিক্ষাপ্রদ মনে হয়।

৩। প্রশ্ন : কবি মধুসূদনের কাব্যগুলির পরিচয় দাও এবং বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যুগান্তর সাধনে তাঁহার ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

অথবা, **মধুসূদনের প্রতিভা বাংলা কাব্যধারায় যে বিস্ময়কর পরিবর্তন আনিয়াছে তাহা কবির কাব্য রচনার উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দাও।** **[উঃ বঙ্গঃ. বি. ১৯৬৯]**

উত্তর : মধুসূদনের পূর্বেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হইয়াছিল। কবিতাতেও ঈশ্বর গুপ্তের বিদ্রূপপরায়ণ মনের বস্তুনিষ্ঠতায়, রঙ্গলালের ইংরেজী কাব্য-নির্ভর রোমাণ্টিক মনোভঙ্গিতে আধুনিকতার অস্ফুট আভাস পাওয়া যায়। ইংরেজী কাব্যের সহিত পরিচয়ের ফলে যে নূতন রস-রুচি তখন গড়িয়া উঠিতেছিল—আবহমান কালের গ্রাম্য-সাহিত্যে সেই নবজাগ্রত রসতৃষ্ণা তৃপ্তিকর কিছু খুঁজিয়া পায় নাই। রঙ্গলাল এই নবগঠিত পাঠকসমাজের সমস্যা বুঝিয়াছিলেন এবং ইংরেজীশিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী পাঠকদের জন্য ইংরেজী কাব্যের ভাবানুবাদ করিতেছিলেন। দেশী আখ্যানের ছকে বিদেশী ভাবনা কল্পনার প্রতিফলনের জন্য তাঁহার কাব্য তখনকার পাঠকদের নিকটে স্পৃহনীয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এই পটভূমিতে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হন। মধুসূদনের কবিজীবনের পরিধি মাত্র ছয় বৎসর কাল। **তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য** (১৮৬০), **মেঘনাদবধ কাব্য** (১৮৬১), **ব্রজাঙ্গনা কাব্য** (১৮৬১), **বীরাঙ্গনা কাব্য** (১৮৬২) এবং **চতুর্দশপদী কবিতাবলী** (১৮৬৬)—এই পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ তাঁহার ছয় বৎসরের কাব্যচর্চার ফল। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আকস্মিক ভাবেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার রচনাবলীর

মধ্যে সর্বত্র দৃঢ়প্রত্যয়শীল, আপন প্রতিভার শক্তি সম্পর্কে নিঃসংশয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যাহা করিতে চাহিয়াছেন সেই সংকল্প কোন দ্বিধার দ্বারা সংশয়িত বা খণ্ডিত হয় নাই। প্রতিভার অমোঘ শক্তিতে তিনি বাংলা কাব্যের ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে অনায়াসে বিপ্লব সাধন করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপ হইতে আগত নূতন ভাবের সংঘাতে বাঙালী চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়া নানামুখী কর্মে ও চিন্তায় নিজেকে প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই উদ্যমের মূলে ছিল মানবতার প্রতি অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধাবোধ। আত্মশক্তিতে উদ্বোধিত মনুষ্যত্বের মহিমা য়ুরোপীয় সাহিত্য হইতে প্রতিফলিত হইয়া বাঙালীর ধ্যান ধারণায় যে মৌলিক রূপান্তর সাধন করিতেছিল—মধুসূদন সেই রূপান্তরিত জীবন-চেতনাকেই কাব্যে রূপবন্ধ করিয়াছেন। দৈব বা কোন অলৌকিক রহস্যময় শক্তির নিকট ভীরুতাপূর্ণ আত্মসমর্পণ নয়, নিজেরই জাগ্রত বুদ্ধি এবং হৃদয়ানুভূতির আলোকে জীবনের সত্যকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধির আনন্দ মধুসূদনের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। মধুসূদন কাব্যের বিষয়বস্তুর জন্য রামায়ণ-মহাভারতের উপর নির্ভর করিয়াছেন, কিন্তু এই রূপান্তরিত জীবনচেতনার স্পর্শে সেই পৌরাণিক কাহিনী এবং চরিত্রগুলি তাঁহার কাব্যে সম্পূর্ণ নূতন তাৎপর্য মণ্ডিত হইয়া নূতন মূর্তি লাভ করিয়াছে। জীবনের বিচিত্র সমস্যার পটে মানব-মহিমায় উজ্জ্বল নর-নারীর ব্যক্তিত্বের এক-একটি অনন্যসদৃশ রূপ তাঁহার সৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। মনুষ্যত্বের এই স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি কাব্যের আধারে রূপবন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে নূতন কাব্য-ভাষা এবং ছন্দ-সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল।

মধুসূদনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ **তিলোত্তমাসম্ভব** প্রকাশের পূর্বে নাট্যকার রূপে তিনি প্রভূত জনসমাদর লাভ করিয়াছিলেন। নাটকের সংলাপ রচনার জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় তিনি বাংলাছন্দের রূপান্তর সাধনে প্রবৃত্ত হন। 'পদ্মাবতী' নাটকে প্রথম তিনি **অমিত্রাক্ষর ছন্দ** লইয়া পরীক্ষা করেন। মধুসূদনের ধারণা ছিল, সংস্কৃতের মতো সমৃদ্ধ ভাষা যে ভাষার জননী সেই বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ আদৌ অসম্ভব নয়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলায় অমিত্রাক্ষর সম্ভব নয়—এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের প্রথম সর্গ রচনা করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দেন। এই ছন্দ আবিষ্কারের উদ্দীপনাই তাঁহার প্রতিভার শক্তিকে সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাচীন পয়ারে কবিতার প্রতিটি চরণ ৮ এবং ৬ মাত্রার দুটি পর্বে গঠিত, অন্ত্যমিল সম্পন্ন এইরূপ

দুইটি চরণের মধ্যে একটি ভাব সম্পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক। পয়ারের আর একটি বৈশিষ্ট্য শ্বাস-যতি এবং অর্থ-যতির সহাবস্থান। ফলে শ্বাসগ্রহণের জন্য যেখানে থামিতে হয় অর্থও সেখানেই সম্পূর্ণ করিতে হয়। মধুসূদন তাঁহার নূতন ছন্দে চরণান্তিক মিল বর্জন করিলেন এবং শ্বাসযতি অর্থযতির সহাবস্থান নীতি অগ্রাহ্য করিলেন। অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণের জন্য ৮ মাত্রা এবং ৬ মাত্রার পরে পূর্বের মতো থামিতে হইলেও ভাবপ্রবাহ সেখানে খণ্ডিত করিবার কোন বাধ্যবাধকতা থাকিল না। দুই চরণের সীমা অতিক্রম করিয়া এক একটি ভাবপ্রবাহকে বহু চরণে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়ার স্বাধীনতা দেখা দিল এই ছন্দে। এইভাবে মধুসূদন বাংলা কাব্যে ছন্দোমুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়া কবিতার প্রকরণের ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেন। 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্যে কবির সমগ্র শক্তি এই ছন্দের নবরূপায়ণেই নিয়োজিত হইয়াছিল। ছন্দের পরীক্ষাটাই এ কাব্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। চার সর্গে বিভক্ত এই কাব্যের বিষয়বস্তু সুন্দ-উপসুন্দ ও তিলোত্তমার কাহিনী। সুন্দ-উপসুন্দকে বিনষ্ট করিবার জন্য ব্রহ্মা বিশ্বের সৌন্দর্য-সার সংগ্রহ করিয়া অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেন। এই রমণীকে লাভ করিবার জন্য সুন্দ ও উপসুন্দের পারস্পরিক বিরোধ ও বিনাশের কাহিনী 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনীতে কোন জটিলতা নাই, বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে ঘটনাগুলি বিবৃত হইয়াছে। 'নিদ্রা', 'স্বপ্ন,' 'ব্রহ্মা' প্রভৃতি কোন কোন দেবদেবী চরিত্রের কল্পনায় গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উপমা উৎপ্রেক্ষায় কোথাও কোথাও বিদেশী কাব্যের অনুসরণ করা হইয়াছে। মধুসূদনের প্রতিভার বিশিষ্টতার পরিচয় এ কাব্যে পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় নাই, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম কাব্য হিসাবেই এই রচনাটি ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন।

মধুসূদনের মহত্তম সৃষ্টি **'মেঘনাদবধ কাব্য'** (১৮৬১)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত নিবিড় ও ব্যাপক পরিচয়জনিত অভিজ্ঞতা, তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার জীবনের ভিত্তিস্বরূপ মনুষ্যত্বের নূতনআদর্শ —এক প্রবল সৃষ্টিকল্পনায় একাকার হইয়া এই কাব্যে রূপলাভ করিয়াছে। শুধু কবির ব্যক্তিজীবনের নয়, সমগ্রভাবে নবজাগ্রত বাঙ্গালী চিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এই কাব্য। মেঘনাদবধ কাব্যের নয়টি সর্গে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবাহুর মৃত্যু হইতে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ কর্তৃক নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে হত্যা এবং প্রমীলার সহমরণ পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। ঘটনা সামান্য, ঘটনাকালের পরিধি মাত্র তিন দিন। কিন্তু এই স্বল্পায়ত কাহিনীটুকু স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, সমুদ্র ও পৃথিবীর বিশাল পটভূমিতে স্থাপন করিয়া কবি তাঁহার স্বাধীন কল্পনার অবাধ বিচরণ ভূমি প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। একদিকে

ভীতসন্ত্রস্ত দেবতা ও মানবের সমবেত যুদ্ধায়োজন, অন্যদিকে দুর্ভাগ্যের পাশ-বদ্ধ অটল পৌরুষের প্রতিমূর্তি রাবণ, আর তাহার স্নেহের মমতার আশ্রয়স্থল বীরবাহু-ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার দুঃখাহত জীবনের করুণ সৌন্দর্যে এই কাব্যের মধ্যে মানবজীবনের বহুমাত্রিক রূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নয়টি সর্গে ঘটনাগুলি বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একমাত্র অষ্টম সর্গের প্রেতপুরীর বর্ণনাই এই কাব্যের পক্ষে অবাস্তব মনে হয়। 'মেঘনাদবধ'-এর কেন্দ্রীয় ঘটনা মেঘনাদের শোচনীয় মৃত্যু। মেঘনাদই এ কাব্যের নায়ক। কিন্তু সমগ্র কাব্যের ঘটনা ধারায় অবিসংবাদিত ভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে রাবণ। রামায়ণে রাবণ নীতিহীনতা ও পাপাচারের মূর্ত প্রতীক। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে এই চরিত্রের প্রতিই কবির পক্ষপাত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে; ন্যায়-নীতির সাধারণ মানদণ্ডে এই চরিত্রের বিচার করা যায় না। তাহার অপরিমিত শক্তির সম্মুখে স্বর্গ-মর্ত্যের সকলে ভীত ত্রস্ত। তাহার অটল পৌরুষ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে। অন্যদিকে এই প্রচণ্ড শক্তিধর রাবণের অন্তরের স্নেহ-প্রেমের করুণ কোমলতা মনুষ্যত্বের অন্যতম সৌন্দর্য প্রকাশ করিতেছে। "এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র-পৌত্র আত্মীয়-স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে; তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোন মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।" (রবীন্দ্রনাথ) এইভাবে মেঘনাদবধ কাব্যে সকল ধর্মের উপরে মানবতার স্বীকৃতি দ্বারা বাংলা কাব্যে যথার্থ নব-যুগের সূচনা হইয়াছে।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মেঘনাদবধের সহিত একই সঙ্গে মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রকাশিত হয়। ভাব, ভাষা, ছন্দ কোন দিক দিয়াই ব্রজাঙ্গনার সহিত মধুসূদনের অন্য কোন কাব্যের মিল নাই। এই কাব্যের খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতায় প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতার রাধা-বিরহের প্রসঙ্গ বিষয়বস্তু রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিদের আধ্যাত্মিক ভাবাবেশ এবং ভক্তিরসের উচ্ছ্বাস স্বভাবতই মধুসূদনের কবিতায় নাই, তবুও বিরহের করুণ রসে মণ্ডিত প্রেমের বিচিত্র লীলা এই কবিতাগুলিতে রমণীয় ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় এই কবিতাগুলির ভাষা এবং ছন্দ। মধুসূদন আশ্চর্য দক্ষতার সহিত

লোকায়ত বাংলা সাহিত্যের সহজ সৌন্দর্যমণ্ডিত ভাষা ব্রজাঙ্গনায় ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলা ভাষার মূল প্রকৃতির সহিত, প্রাচীন বাংলা কাব্যের সহিত কবির নিবিড় পরিচয়ের অবিসংবাদিত প্রমাণ ব্রজাঙ্গনা কাব্য। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "ব্রজাঙ্গনার ছন্দে মধুসূদন যে স্বাধীনতা দেখাইয়াছেন,—যতিসংখ্যায়, ছত্র-সংখ্যায়, মিল এবং মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারে—সে স্বাধীনতা অমিত্রাক্ষর প্রবর্তন অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাংলায় প্রথম 'ওড' অর্থাৎ অসম-চরণ লিরিক কবিতা বলিয়াও ব্রজাঙ্গনার ঐতিহাসিক মূল্য আছে।"

মধুসূদনের প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই কবিতার আঙ্গিক বিষয়ে তাঁহার নিরলস পরীক্ষার পরিচয় আছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত **'বীরাঙ্গনা'** কাব্য বাংলা ভাষায় পত্রকাব্য রচনার প্রথম দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থ রচনায় মধুসূদন ওবিদের হেরোইদায (The Herodies) কাব্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বীরাঙ্গনা কাব্য এগারটি সর্গে প্রেমাস্পদদের উদ্দেশ্যে লিখিত এগার জন নায়িকার পৃথক পৃথক পত্রের আকারে রচিত। শকুন্তলা, তারা, রুক্মিণী, কৈকেয়ী, দ্রৌপদী প্রভৃতি নায়িকার চরিত্র এবং তাহাদের জীবন সমস্যার চিত্র কবি পৌরাণিক কাহিনী হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিটি চরিত্রই এখানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এবং অনন্যসাধারণ। লিরিকের রস সৃষ্টিতে মধুসূদনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে এই কাব্যে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে শুধু আড়ম্বরপূর্ণ যুদ্ধ বর্ণনা এবং বীররসের পক্ষে উপযোগী তাহা নহে, করুণ কোমল হৃদয়ানুভূতির বিচিত্র লীলা প্রকাশেও এই ছন্দের ক্ষমতা অসাধারণ—বীরাঙ্গনা কাব্যে একথা প্রমাণিত হইয়াছে।

গীতিকবিতার অন্যতম শাখা 'সনেট'। বাংলা ভাষায় সনেট বা **চতুর্দশপদী কবিতা** প্রবর্তন মধুসূদনের আর একটি স্মরণীয় কীর্তি। ১৮৬২ সালে মধুসূদন য়ুরোপ যাত্রা করেন। য়ুরোপ প্রবাসকাল তাঁহার জীবনের এক চরম দুঃখময় অধ্যায়। কিন্তু কোন দুঃখ-দুর্দশা মধুসূদনের প্রতিভার শক্তিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভের্সাই-এ অবস্থান কালে তিনি য়ুরোপীয় কবিদের সনেট অনুসরণে বাংলা চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় ব্রতী হন। মধুসূদনের অন্যান্য কাব্য আখ্যায়িকামূলক। আখ্যায়িকা বর্ণনার মধ্যে কবির নিজের কথা বলিবার সুযোগ কম। এই সনেটগুলিতেই মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের ভাবনা চিন্তার অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থে ১২০টি সনেট সংকলিত হইয়াছিল। স্বদেশের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি কবির আন্তরিক অনুরাগ এই সব সনেটে মর্মস্পর্শী ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সনেটে কবি স্বদেশ ও বিদেশের বহু কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, বন্ধুদের প্রতি

প্রীতি নিবেদন করিয়াছেন, আপন কাব্যাদর্শের কথা বলিয়াছেন। মধুসূদনের মনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এই খণ্ডকবিতাগুলির মধ্যে লিপিবন্ধ হইয়া আছে। সনেটের গঠন ও মিল বিন্যাসের দিক হইতে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিলটনকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

৪। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে মধুসূদনের কাব্যকৃতি অন্তর্ভুক্ত করিয়া ঊনবিংশ শতকের কাব্যধারার বিবর্তন অনুসরণ কর। [ক. বি. ১৯৬৮]

[**উত্তর-সংকেত :** ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য]।

৫। প্রশ্ন : হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের হাতে মহাকাব্যধারার কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পরিস্ফুট কর। [ক. বি. ১৯৬৭]

অথবা, বাংলা কাব্যের ইতিহাসে নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের দানের মূল্য নিরূপণ কর। [ক. বি. ১৯৭০]

[**উত্তর-সংকেত :** ৭নং প্রশ্নোত্তব দেখ।]

৬। প্রশ্ন : মধুসূদনের পর ও রবীন্দ্রনাথের পূর্বে—এই অন্তর্বর্তী কালে বাংলা কাব্যের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

[ক. বি. ১৯৬২]

উত্তর : অপথে চলার পথ-নির্মাণের আত্মবিশ্বাস লইয়া কবি শ্রীমধুসূদন ভারতচন্দ্র হইতে ভার্জিলে এক সেতু-বন্ধন করেলেন। দেববাদী যুগের ভীত সংকুচিত হীনাহং মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ কাব্যে নবরূপে রূপায়িত হইল। কবি গর্বোদ্ধত কণ্ঠে বলিলেন—"I hate Rama and his Rabbles, Ravana is a grand fellow ; the very idea of Ravana enkindles my imagination.' সাহিত্যের প্রকৃতির সঙ্গে আকৃতিও পরিবর্তিত হইয়া গেল। শ্লথগতি পয়ারের স্থানে দ্রুতগতি অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি হইল। একতারা রুদ্রবীণায় পরিণত হইল। "অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনঘর্ঘর-মন্দ্রিত রথে চাড়িয়া বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম আধুনিক কাব্য রাজবদুন্নত ধ্বনি বিরাজমান।"

কবি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখিতে যাইয়া হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধু প্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধি করিলেন এবং বাংলা কাব্যের এই নূতন ভাবের প্রতিনিধি হিসাবে বাংলার সারস্বত ক্ষেত্রে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কাব্য "চিন্তা-তরঙ্গিণী"। তারপর হেমচন্দ্র আরওকয়েকখানি আখ্যান কাব্য এবং "বীরবাহু" ও "ছায়াময়ী" নামে দুইখানি রূপক কাব্য প্রণয়ন করেন। দান্তের "Divine

Comedy" অবলম্বনে "ছায়াময়ী" রচিত হইয়াছে। কিন্তু 'বৃত্রসংহার কাব্য' হেমচন্দ্রকে মাইকেলের পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট কবির মর্যাদা দান করিয়াছে। তুলনামূলক বিচারে বৃত্রসংহারের কবি নিশ্চয়ই কবি মধুসূদনের সমকক্ষ নন, কিন্তু বৃত্রসংহার কাব্যের মহাকাব্যোচিত বিশালতা লক্ষণীয়। মেঘনাদবধের কবি আত্মবিকাশ যুগে সাধারণ মানুষের ন্যায় তথা ধর্মবোধকে ক্ষুণ্ণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, কিন্তু যুগরুচিকে সর্বাংশে স্বীকৃতি দিয়া হেমচন্দ্র অধর্মাচারী বৃত্রের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। আবার এই কাব্যে "দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের কল্যাণে" ; এবং তাঁহার স্বর্গ উদ্ধারের জন্য অস্থিদান মানবতার অমর মহিমা হিসাবে রূপায়িত। তাই কবি-প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণে যে সত্য উদ্ঘাটিত হউক না কেন মধুসূদনের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্য সমুদ্রে যে তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস, হেমচন্দ্রের সৃষ্ট বৃত্রসংহার কাব্য যেন সেই তরঙ্গশীর্ষে উজ্জ্বলতম মুকুট।

সন্ধি যুগের কবি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে দেশপ্রেমের যে ইঙ্গিত, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ যাহার সার্থক প্রকাশ, হেমচন্দ্রের গীতি-কাব্যে তাহাই উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের পর যে কবি আপনার প্রাণের দুরন্ত আবেগে বাঙালীর জীবনে নবভাবের প্লাবন আনিয়াছিলেন, তিনি কবি নবীনচন্দ্র সেন। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁহার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস এই ত্রয়ী অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যরূপে চিহ্নিত হইয়াছে। মহাকাব্যের ধ্রুপদী গাম্ভীর্য এখানে নাই সত্য, কিন্তু এই তিন কাব্যের কেন্দ্র-চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে কবি যে নবভারতের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা সত্যই দরদী পাঠককে অভিভূত করে—

শিখাবো একত্ব-মর্ম,
এক জাতি, এক ধর্ম ;
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন—
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ।

কিন্তু প্রতিভার দিক হইতে নবীনচন্দ্র গীতি-কবি, তাই আবেগ-প্রবণ যুগের পাঠকের নিকট নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" সর্বাধিক সমাদৃত কাব্য।

পলাশীর যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। শত্রুর আঘাতে আহত মোহনলাল তরবারিতে ভর দিয়া মাথা উঁচু করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অস্তগামী সূর্যের শেষ রক্ত-কিরণ-রেখা রক্ত-ক্ষত মুখমণ্ডলকে আরও লাল করিয়া দিয়াছে। পশ্চিম দিগন্তে পাণ্ডুর সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন :

কোথা যাও ! ফিরে চাও সহস্র কিরণ !
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দীনমণি,
তুমি অস্তাচলে দেব, করিলে গমন
আসিবে ভারত-ভাগ্যে আঁধার রজনী—

এ যেন পরাজিত বাংলার আর্তনাদ। তাই বিদগ্ধ সমালোচক যে দোষে কবিকে অভিযুক্ত করিয়াছেন, সেই ত্রুটি, সেই উচ্ছ্বাস, সেই সুতীব্র স্বাজাত্য বোধ বাঙালীর হৃদয়ে কবির জন্য শ্রদ্ধার আসন পাতিয়া দিয়াছে।

মধুসূদনের পর যে আখ্যান-মূলক কাব্য বিষয়-গৌরবে, যুগের ভাবনার অনুবর্তনে স্বমহিমায় প্রকাশিত, নূতন যুগের নূতন ভাবনা তাহার পথরোধ করিয়াছে সত্য, তবু এই যুগের কবি অক্ষয় চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির কবিতা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী রোমান্টিক আখ্যান-কাব্যে শিল্প-সম্মত রূপমূর্তি গঠনে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। ঠাকুরবাড়ীর সহিত সম্বন্ধ সূত্রে যুক্ত উদাসীন নীরব এই কবি সাধকের 'উদাসিনী' এবং 'ভারত গাথা' উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

কবি-মন এবং দার্শনিক-চেতনার সমন্বয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের কবি-মানস রূপ-মূর্তি লাভ করিয়াছে। স্পেন্সারের বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যের স্বপ্নাবিষ্ট ভাব-তন্ময় উপলব্ধি 'ফেয়ারী কুইন'-এর আদর্শে রচিত 'স্বপ্নপ্রয়াণ" বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' যেন বহুদিন পরে রচিত কবি রবীন্দ্রনাথের 'মানস-সুন্দরী' কবিতার পূর্বাভাস। এখানে ব্যক্তিগত অনুভূতির তীব্রতা হয়ত নাই কিন্তু ইহার আবেগ বাংলা সাহিত্যে Personal lyric বা আত্মগত গীতি-কবিতার আবির্ভাবকে সুগম করিয়া দিয়াছে। কিন্তু নিরাসক্ত জীবনচর্যা দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিত্ব-শক্তিকে ব্যাহত করিয়াছে। তাই তাঁহার কাব্যে প্রতিভার দ্যূতি আছে, কিন্তু যথাযথ পরিণতি নাই। এই প্রসঙ্গে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় এবং ব্যঙ্গ-পরিহাস-রসিক ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইন্দ্রনাথের 'ভারত উদ্ধার' কাব্যে বাঙালীর বাক্‌সর্বস্ব আস্ফালনের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অতিশয় তীক্ষ্ন; এই শ্রেণীর কাব্যে স্বাভাবিক ভাবে যে কুরুচি প্রকাশিত হয়, 'ভারত উদ্ধারে' তাহার কোন চিহ্ন নাই।

এই যুগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য—কাব্যক্ষেত্রে মহিলা কবিদিগের আবির্ভাব। অন্তঃপুরের সংকুচিত পরিবেশ হইতে সারস্বত ক্ষেত্রের উদার পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সূত্র রচিত হইল। স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায় ইত্যাদি মহিলা কবিদিগের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সমালোচকের ভাষায়—"তাঁহাদের কাব্যে আছে একটি বিষণ্ণ আত্মনিবেদনের সুর। এই কবিতা যেন অবাঙ্‌মনসোগোচর বিধাতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত অর্ঘ্য রচনা।"

বাংলা সাহিত্যে আত্মগত গীতি-কবিতার প্রথম কবি "সারদামঙ্গল" কাব্যের রূপকার বিহারীলাল চক্রবর্তীর মৃত্যুতে কবিশিষ্য অক্ষয়কুমার বড়াল লিখিয়াছিলেন—

"না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি,
এসেছিলে শুধু গাহিতে প্রভাতী,
আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি,
কুহরিলে ধীরে ধীরে।
ঘুম ঘোরে প্রাণী ভাবি স্বপ্নবাণী
ঘুমাইল পাশ ফিরে॥"

বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথ কাব্যগুরু বিহারীলাল সম্পর্কে বলিয়াছেন— "সেই প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই। কেবল একটি পাখী সুমিষ্ট স্বরে গান ধরিয়াছিল, সে সুর তাহার নিজের।" "বাঙালীর কাব্য-কল্পনা প্রাণের অন্তস্তল হইতে সরস্বতীর ধ্যানমূর্তি আবিষ্কার করিল, তাহাতে বাস্তব জীবন ও বহির্জগৎকে আত্মসাৎ করিবার এক অভিনব ভাবসাধনার পদ্ধতি প্রবর্তিত হইল—বাহিরের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন আর রহিল না।"

[আধুনিক বাংলা সাহিত্য—মোহিতলাল মজুমদার]

একটা অকারণ বেদনাবোধ কবির কবিতার প্রেরণা। কিন্তু যাহার জন্য এই বেদনা তাহার স্বরূপ কবির নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত নহে। তবু সেই আত্মলীন স্বপ্নচারিণীর জন্য আনন্দ-বেদনা কাব্য রচনার প্রেরণা।

"সারদামঙ্গল" প্রকাশিত হইবার পর কবি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বিনী দেবীকে একটি গ্রন্থ উপহার দিয়াছিলেন। প্রতিদানে বৌ ঠাকুরাণী তাঁহাকে একটি আসন উপহার দিয়াছিলেন তাহাতে লেখা ছিল—

"হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দুনয়নে
কাহারে ধেয়াও।"

প্রত্যুত্তরে কবি রচনা করিলেন—"সাধের আসন"। তাহার প্রথম দুটি লাইন—

"ধেয়াই কাহারে দেবী, নিজে আমি জানিনে
কবিগুরু বাল্মীকির ধ্যান-ধনে চিনিনে।"

'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন' কাব্যে নিখিলবিশ্বের মূলীভূত সৌন্দর্য সত্তা

সারদারূপে প্রতিভাত। ইনি কখনও মাতা, কখনও জায়া, কখনও কন্যা, কখনও বা সর্বভূতে পরিব্যাপ্তা প্রাণ-শক্তি। অরূপের মধ্যে রূপের আভাস ভাবমুগ্ধ কবিকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। এই আকুলতা কখনও বা অস্পষ্ট। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন—"বিহারীলাল কবি এবং সেই জন্যেই আত্মগত গীতি-কবিতার যিনি প্রবর্তক, বাঙালী রসিকের নিকট তিনি প্রায় অজানা অচেনা থেকে গেলেন।" কিন্তু তাঁর ধ্যান ও ধারণা যুক্তি শৃংখলার যোগসূত্রে, চিন্তা ধারণা ও চিত্রকল্পের সমন্বয়ে, সৌন্দর্য ও তত্ত্বের অপূর্ব সমীকরণে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ব-সাহিত্যের প্রাঙ্গণে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বিহারীলালে যাহা প্রারম্ভিক প্রয়াস রবীন্দ্রনাথে তাহা সংহত সার্থক রূপমূর্তি লাভ করিয়াছে।

৭। প্রশ্ন ঃ **উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাংলা মহাকাব্য রচনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।**

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩]

উত্তর ঃ প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যে আখ্যান কাব্য এবং মহাকাব্য জাতীয় রচনার আধিপত্য যে কত ব্যাপক ছিল অসংখ্য মঙ্গলকাব্য এবং রামায়ণ-মহাভারতই তাহার প্রমাণ। বৈষ্ণবদের গীতিকবিতাতেও প্রকারান্তরে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আখ্যান বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর আখ্যান কাব্য বাংলাদেশে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত নূতন বস্তু নহে। বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজে কোন না কোন ধরনের গল্পরস সম্পন্ন কাব্যের প্রতি চিরদিনই আকর্ষণ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে নূতন শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে পাঠকদের রুচিতে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দেব-দেবীর অলৌকিক মাহাত্ম্যের কাহিনীতে পূর্ণ মঙ্গলকাব্য স্বভাবতই এই আধুনিক রুচির পক্ষে স্পৃহণীয় হয় নাই। নূতন যুগের পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য এক শ্রেণীর লেখক ফারসী ও হিন্দী ভাষার প্রেমকাহিনীগুলির অনুবাদ শুরু করেন। এইসব অনুবাদ মূল আখ্যায়িকার ইংরেজী রূপান্তর হইতে করা হইত, ফলে মূল ভাষার প্রভাবমুক্ত হওয়ায় সাধারণের পক্ষে আকর্ষণীয় হইয়াছিল। কাহিনীগুলির বিষয়বস্তু মানবিক প্রেম, ধর্মীয় প্রসঙ্গের পরিবর্তে রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান হওয়ায় সে যুগে জনপ্রিয় হওয়াই স্বাভাবিক। এই জাতীয় আখ্যান কাব্যের মধ্যে নীলমণি বসাক অনূদিত 'পারস্য ইতিহাস' (১৮৩৪), মহেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের 'লায়লা মজনু' (১৮৫৩) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নূতন যুগের কাব্যরসিকদের দৃষ্টি যে ক্রমেই ইংরেজী এবং য়ুরোপীয় কাব্যের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল তাহা বুঝা যায় বিভিন্ন য়ুরোপীয় আখ্যায়িকা কাব্য

বাংলায় অনুবাদের প্রচেষ্টায়। হোমার প্রভৃতি প্রখ্যাত কবিদের রচনা এই সময়ে বাংলায় কিছু কিছু অনূদিত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ফলে রসরুচির পরিবর্তন যেমন সূচিত হইয়াছিল, তেমনই দেশীয় ভাষায় দেশীয় আখ্যানবস্তুর আধারে পাশ্চাত্য কাব্যের সৌন্দর্য আত্মীকরণের আগ্রহও নবীন লেখকদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রথম সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে। রঙ্গলালই (১৮২৭-১৮৮৬) সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়া বাংলা কবিতার ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে রূপান্তর সাধনই কাব্যের মুক্তির উপায়। তিনি মনে করিতেন, 'ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীই কাব্য রচনা ভিন্ন বাংলাকাব্যের উন্নতির অন্য কোন উপায় নাই।' বিদেশের আখ্যান কাব্যগুলি অনুবাদের চেষ্টায় পাশ্চাত্য কাব্যের রসগ্রাহিতার যে আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল রঙ্গলালের রচনায় তাহারই সুস্পষ্ট পরিণতি দেখা গেল। "অনেকে কহেন, য়ুরোপীয় কবির ভাব এতদ্দেশীয় ভাষাসমূহে সংগ্রহ করা অসম্ভব কার্য। কিন্তু আমরা একথা সর্বতোভাবে স্বীকার করি না।" রঙ্গলাল তাঁহার এই ধারণার সত্যতা প্রমাণ করিলেন'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ (১৮৫৮)[ক.বি.১৯৬৬]। পদ্মিনী উপাখ্যানের বিষয়বস্তু রঙ্গলাল সংগ্রহ করিয়াছিলেন 'কর্ণেল টড্ বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ পুস্তক' হইতে। চিতোরের পতন এই কাব্যের বিষয়বস্তু। আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরাধীনতার জন্য গ্লানিবোধ এবং পাশ্চাত্যের স্বাধীন দেশগুলির মতো মুক্ত জীবনের জন্য অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল। রাজপুত-বীরত্ব এবং স্বদেশপ্রেমের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ তাঁহাদের আত্মমর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠাভূমি খুঁজিয়া পাইল। "পদ্মিনী উপাখ্যানে শিক্ষিত বাঙ্গালী আপনার চিত্তের নিগূঢ় অনুভূতিকে কতকটা বাঙ্ময় দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। রঙ্গলালের রচনার কাব্যিক মূল্য বেশী নয়। কিন্তু তাহার দ্বারা নিশীথিনীর মৌন যবনিকা অপসারণের প্রথম সংকেত ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে তাহার বিশিষ্ট মূল্যে আছে। কাব্য রঙ্গভূমিতে মধুসূদনের প্রবেশের পূর্বে রঙ্গলাল নান্দী গাহিয়াছিলেন"। (সুকুমার সেন) পদ্মিনী উপাখ্যানের বহু অংশের বর্ণনায় এবং বিন্যাসরীতিতে রঙ্গলাল প্রায় আক্ষরিকভাবে ইংরেজ কবিদের অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে।" ভাষা ও ছন্দের দিক হইতে তিনি প্রাচীন কাব্যরীতিরই অনুবর্তন করিয়াছেন কিন্তু পুরাতন আধারে নূতন ভাব ও রস পরিবেশন করিয়া পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলা কবিতার

অবশ্যম্ভাবী যুগান্তরের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবৃত্তের রোমান্সরসে পূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে মানুষের মহৎ আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার এই গাথা রচনা করিয়া এই কাব্যে রঙ্গলাল আখ্যায়িকা কাব্যে নূতন ধারার প্রবর্তন করেন। রঙ্গলালের রচনাবলীর মধ্যে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ছাড়া 'কর্মদেবী' (১৮৬২), শূরসুন্দরী (১৮৬৮) ও 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯)—এই তিনটি আখ্যায়িকা কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কর্মদেবী এবং শূরসুন্দরীর কাহিনীও রাজপুত ইতিহাস হইতে সংগৃহীত। 'কাঞ্চীকাবেরী' উড়িষ্যার ইতিহাস অবলম্বনে রচিত পুরুষোত্তম দাসের প্রাচীন কাব্যের উপরে নির্ভর করিয়া লিখিত। রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্য 'কর্মদেবী' প্রকাশের পূর্বেই বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন আবির্ভূত হন। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা কবিতার জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে।

মাইকেল-পূর্ববর্তী পর্যায়ে বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সূত্রপাত করেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যগ্রন্থ রচনার মাধ্যমে। কাব্যের জাতিবিচারে এই গ্রন্থখানি আখ্যায়িকাধর্মী কাব্য, মহাকাব্য নহে। ইহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে 'মঙ্গলকাব্য' নামে এক বিশেষ সাহিত্য শাখার অস্তিত্ব ছিল. ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মহাকাব্যের প্রসার ছিল, কিন্তু গভীরতা ছিল না। এগুলি পুরাতন ছাঁচে রচিত লৌকিক পুরাণ মাত্র।

কবিতার আঙ্গিক বিষয়ে নিরন্তর পরীক্ষানিরীক্ষার দুঃসাহস মধুসূদনের প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। য়ুরোপীয় সাহিত্যের ব্যাপক চর্চায় পরিশীলিত মন লইয়া মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি বুঝিয়াছিলেন কাব্য আঙ্গিকের রূপান্তর সাধন ভিন্ন বাংলা কবিতার যথার্থ মুক্তি সম্ভব নয়। নূতন ধ্যানধারণার আধার রচনার জন্য কবিতার ভাষাভঙ্গি ও ছন্দপ্রকরণে বহুকালের অভ্যস্ত রীতির জড়ত্বমোচন যে প্রধান কর্তব্য এ বিষয়ে প্রথমাবধি তিনি সচেতন ছিলেন। রঙ্গলাল কবিতার ভাবের ক্ষেত্রে নূতনত্বের পরিচয় দিলেও ভাষা, ছন্দ এবং কাব্য কাহিনী গঠনের কৌশলের দিক হইতে কোন নূতন পরীক্ষার ঝুঁকি নেন নাই ; এই প্রথানুগত্য এবং কাব্যের আঙ্গিক সম্পর্কে উদাসীনতা তাঁহার প্রতিভার দীনতারই প্রমাণ। মেঘনাদবধ কাব্যেই প্রথম বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কাব্য কলা সম্পর্কে প্রখর সচেতনতা এবং মৌলিক সৃষ্টিকল্পনাসম্পন্ন প্রতিভার আবির্ভাব ঘটিল। মধুসূদন পরীক্ষামূলকভাবে সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী অবলম্বনে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে ছন্দোগত পরীক্ষার প্রতিই কবির মনোযোগ কেন্দ্রিত হওয়ায় সামগ্রিকভাবে রচনাটি সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে

নাই। কাহিনীবিন্যাসে কোন সুপরিকল্পিত আদর্শের অভাবে তিলোত্তমাসম্ভব সাধারণ আখ্যানকাব্য শ্রেণীরই রচনা, কিন্তু ইহার পরে মধুসূদন কাহিনী বর্ণনাত্মক সাধারণ আখ্যানকাব্য রচনার পরিবর্তে একটা নির্দিষ্ট রূপের কাঠামোর মধ্যে কাহিনীকে বিন্যস্ত করিয়া মহাকাব্য রচনায় উদ্যোগী হইলেন। কাহিনী-বর্ণনাত্মক যে-কোন কাব্যকেই আখ্যানকাব্য বলা যায় কিন্তু মহাকাব্য রচনা করিতে হইলে একটা পূর্বনির্দিষ্ট কাব্য-রূপের শাসন মানিয়া চলিতে হয়। এখানে মহাকাব্যের প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য রীতির মধ্যে কোন্‌টি অনুসরণযোগ্য সে বিষয়ে দ্বিধা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক ছিল। মধুসূদন প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য রীতির কোন আদর্শই একাগ্রভাবে অনুসরণ করেন নাই। কাহিনীর বিয়োগান্ত পরিণাম যে ভাবে মেঘনাদবধ কাব্যে চিত্রিত হইয়াছে বা দেব-দেবী চরিত্র যেভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা আদৌ প্রাচ্যরীতি-সম্মত নহে। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র অনুসারে কবি মাইকেল নয়টি সর্গে তাঁহার 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যটি সমাপ্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার নায়কের মধ্যে ধীরোদাত্ত প্রভৃতি নায়কোচিত গুণাবলীর আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নয়; কিন্তু তিনি এ বিষয়েও প্রধানত যে য়ুরোপীয় মহাকাব্য রচনার আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন তাহার প্রমাণ আছে তাহার উক্তিতে। তিনি লিখিয়াছেন, "I shall never bow down to Viswanath of Sahitya Darpan"

আবার এই কাব্যে সর্গবিভাগ, বীররসাত্মক কাহিনী রচনার প্রতিশ্রুতি ইত্যাদিতে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি আনুগত্যই প্রকাশ পাইয়াছে। হয়তো সমালোচনা শাস্ত্রের বিচারে মেঘনাদবধ ত্রুটিহীন মহাকাব্য নহে, কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, শাখাপ্রশাখার জটিল অথচ আদ্যন্তযুক্ত একটি অখণ্ড সংহত কাহিনী এই কাব্যে রচিত হইয়াছে। এই কাব্যের স্বর্গ-মর্তব্যাপী বিরাট পটভূমিতে যে বিশালতা, বিস্তৃতি এবং ঔদার্য আছে তাহা যথাযথভাবে মহাকাব্যের বিশালতাবোধই ফুটাইয়া তোলে। মধুসূদনের নবোদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ মেঘনাদবধেই পূর্ণশক্তিতে বিকশিত হইয়া মহাকাব্যিক ঘটনা প্রবাহের উপযুক্ত বাহন হইয়া উঠিয়াছে। উপমার অজস্র ঐশ্বর্যে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ হইতে ভীতি ও বিস্ময় উৎপাদনকারী 'Sublime'-এর বর্ণনার অনায়াস দক্ষতায় মধুসূদন প্রথম শ্রেণীর মহাকাব্য রচয়িতার প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের প্লটের সংহতি অসাধারণ। প্রতি অংশের মধ্যে চরিত্রগুলির পারস্পরিক চিন্তা এবং আচরণের বুনানি এত নিপুণ যে কাহিনীর তুচ্ছতম অংশটুকুও সমগ্রের সহিত অন্তঃসঙ্গতিতে আবদ্ধ হইয়া সজীব দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। বর্ণনাত্মক কাব্য-রচনার যে প্রয়াস রঙ্গলালে সূচিত হইয়াছিল মধুসূদন তাহার পূর্ণতা সাধন করিলেন মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে। ইহার

পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে মহাকাব্য রচনার একটি ধারাবাহিক প্রয়াস দেখা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আখ্যায়িকা কাব্য এবং মহাকাব্যের ইতিহাসে মধুসূদনের পরেই স্মরণীয় **হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮৩৮-১৯০৩)। হেমচন্দ্রের প্রথম আখ্যায়িকা-মূলক রচনা **'বীরবাহু কাব্য'** প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। কবির নিজের ভাষায়—"উপাখ্যানটি আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাস-মূলক নহে। পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থে কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।" বীরবাহু কাব্যের উপবে রঙ্গলালের প্রভাবই বেশি, তবে স্বদেশ-প্রীতির প্রকাশ এই কাব্যে রঙ্গলালের রচনার তুলনায় অনেক স্পষ্ট। হেমচন্দ্রের কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি **'বৃত্রসংহার কাব্য'**। বৃত্রসংহার দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ এবং ১৮৭৭ সালে। পৌরাণিক কাহিনীর রূপান্তর সাধনের যে দৃষ্টান্ত মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন স্থাপন করিয়াছেন—হেমচন্দ্র তাহার মহাকাব্যে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। বৃত্রাসুর কর্তৃক ইন্দ্রের স্বর্গ রাজ্য অধিকারের পরের ঘটনাবলী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। কাব্য শেষ হইয়াছে দধীচির অস্থি দ্বারা নির্মিত বজ্রের আঘাতে বৃত্রের মৃত্যুতে। বৃত্রচরিত্র পরিকল্পনায় মেঘনাদবধের রাবণ চরিত্রের প্রভাব আছে। মহাকাব্য-রচনায় আয়োজনের কোন ত্রুটি হেমচন্দ্র রাখেন নাই, কাহিনীটিও মহাকাব্যোচিত। কিন্তু বিশাল কাহিনীটিকে সুসংহত শিল্পরূপের মধ্যে পরিস্ফুট করিয়া তোলার মতো প্রতিভা তাঁহার ছিল না। এত বড় একটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যথার্থ কবিতার স্তরে পৌছাইয়াছে এরূপ ছত্র খুব বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাব্যটি মিলহীন পয়ার ছন্দে রচিত। মনে হয় শ্বাস-যতি ও অর্থ-যতির সহাবস্থান নীতিতে পরিবর্তন সাধন করিয়া মধুসূদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র সেই ছন্দের কৌশল আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, শুধু চরণান্তিক মিল বর্জন করিয়া বাহিরের দিক হইতে অমিত্রাক্ষরের ধাঁচটি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈচিত্র্যের জন্য মাঝে মাঝে তিনি সমিল ছন্দও ব্যবহার করিয়াছেন।

আখ্যান কাব্যের নবরূপান্তর দেখা গেল **নবীনচন্দ্র সেনের** (১৮৪৭-১৯০৯) রচনায়। নবীনচন্দ্র খণ্ডগীতি-কবিতা দ্বারা কাব্যচর্চা শুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে আখ্যান কাব্যের মাধ্যমটির প্রতিই আকৃষ্ট হইয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন **'পলাশীর যুদ্ধ'** (১৮৭৬) কাব্যের লেখকরূপে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তায় এবং চেতনায় দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা-স্পৃহা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে দেশের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং

ব্যাধীন, বন্ধনমুক্ত জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এই সময়ে সকল কর্মোদ্যমের কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে। নবীনচন্দ্র জাতীয় মানসের এই আকাঙ্ক্ষাকেই 'পলাশীর যুদ্ধে' রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অতীতের কল্পনা-দৃষ্টিতে দেখা ইতিহাসের পরিবর্তে সদ্যোবিগত যুগের ইতিহাসের উপরেই নির্ভর করিলেন। পলাশীর যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় যে নূতন যুগের সূচনা হইয়াছিল নবীনচন্দ্র সেই যুগপরিবেশের মানুষ রূপে ওই যুগান্তকারী ঘটনাটির তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনতিদূরবর্তী কালের ঘটনা হইলেও পলাশীর যুদ্ধ এবং এই ঘটনার সহিত সম্পৃক্ত প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা নবীনচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইংরেজদের ইতিহাসে সিরাজকে যেভাবে কলঙ্কিত চরিত্রের মানুষরূপে আঁকা হইয়াছে তাহা মানিয়া না লইলেও নবীন-চন্দ্র সিরাজ চরিত্রের যথার্থ রূপ সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। ফলে কাব্যে মোহনলালই স্বদেশপ্রেমের প্রতীক চরিত্ররূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মোহনলালের কোন কোন উক্তি হইতে মনে হয়, সিরাজের পতনে ভারতবর্ষ 'যবনের' অধিকার হইতে মুক্ত হইয়াছে এবং ইহা ইতিহাসের আশীর্বাদ—লেখকের মনে এইরূপ ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল। আসলে নবীনচন্দ্র জাতীয়তাবাদ বলিতে হিন্দু জাতীয়তাবাদই বুঝিতেন, এবং মোহনলাল চরিত্রটি অবলম্বনে হিন্দু ভারতের গৌরব প্রচার করিয়াছেন। 'পলাশীর যুদ্ধের' কাহিনীটি পাঁচ সর্গে বিন্যস্ত। সিরাজের বিরুদ্ধে জগৎশেঠ কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির ষড়যন্ত্র প্রথম সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। দ্বিতীয় সর্গে প্রধান চরিত্র ক্লাইব। যুদ্ধশিবিরে দেবী ব্রিটানিয়া ক্লাইবকে জয়ের আশ্বাস দিলেন। তৃতীয় সর্গের বিষয় পলাশীর শিবিরে সিরাজের শংকা এবং ক্লাইবের সংশয় বর্ণনা। চতুর্থ সর্গে যুদ্ধের বর্ণনা এবং পঞ্চম সর্গে ইংরেজদের বিজয়োৎসব এবং সিরাজের মৃত্যু। নবীনচন্দ্র গীতিকাব্যেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিতেন। আখ্যায়িকা কাব্যেও তাহার কবিস্বভাবের গীতিক-ধর্ম প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্র সৃষ্টি বা কাব্যোৎকর্ষের দিক হইতে পলাশীর যুদ্ধ সফল রচনা না হইলেও তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিকতা যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত হওয়ায় কাব্যটি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।

নবীনচন্দ্রের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য আখ্যায়িকা কাব্য 'রঙ্গমতী' (১৮৭০)। এই কাব্যের পটভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি অঞ্চল। রঙ্গমতীর কাহিনী সম্পূর্ণই কাল্পনিক। ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ কিছু আছে কিন্তু তাহাও কল্পনার রঙে রঞ্জিত। নায়ক বীরেন্দ্রের পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের বীরত্বপূর্ণ চেষ্টার মধ্যে কবির স্বাধীনতা স্পৃহা প্রতিফলিত হইয়াছে।

নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধে' যে স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাহারই পূর্ণ পরিণাম দেখা যায় তাঁহার অভিনব ত্রয়ী মহাকাব্য **'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র'** [ক. বি. ১৯৬৬] ও **'প্রভাসে'**। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ-চরিত্র গ্রন্থে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতার আদর্শরূপে কৃষ্ণচরিত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহারই অনুসরণে নবীনচন্দ্র এই ত্রয়ী কাব্যে সমগ্র মহাভারত কাহিনীটির পুনর্বিন্যাস করেন। তিনি এই কাব্যে ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতবর্ষ এবং এক ভারতীয় জাতীয়তাবোধ সম্পর্কিত আধুনিক চেতনা কৃষ্ণচরিত্রটি অবলম্বন করিয়া রূপায়িত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যে ঐক্যবদ্ধ ভারত রচনার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। কবি গীতার নিষ্কাম ধর্মের প্রবক্তা কৃষ্ণ এবং বৈষ্ণবদের প্রেমের দেবতা কৃষ্ণের দুই রূপের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া আর্য অনার্যদের মিলনে ঐক্যবদ্ধ ভারত রচনার নায়করূপে কৃষ্ণচরিত্রটি নূতনভাবে গড়িয়াছেন। বলা বাহুল্য, যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে জাতীয়তাবোধের জাগরণ হইতেছিল অতীতের পটভূমিতে প্রক্ষিপ্ত করিয়া সেই চেতনাকেই কবি রূপায়িত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র মহাকাব্যের যোগ্য পটভূমিই গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু এই বিরাট কাহিনীকে সুসংহত আকারবদ্ধ করিয়া তুলিবার মতো কল্পনাশক্তি তাঁহার ছিল না। যত বড় আদর্শের প্রতিভূ করিয়া তিনি কৃষ্ণচরিত্র গড়িতে চাহিয়াছেন কাব্যের মধ্যে তাহার যোগ্য ব্যক্তিত্ব কৃষ্ণচরিত্রে ফোটে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত নামে পরিচিত এই ত্রয়ী কাব্যের তিনটি পৃথক খণ্ড রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস প্রকাশিত হইয়াছিল যথাক্রমে ১৮৮৭, ১৮৯৩ এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে।

অবতারকল্প মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত খ্রীষ্ট (১৮৯১) অমিতাভ (১৮৯৫) এবং অমৃতাভ (১৯০৯) নামক কাব্য তিনটিও নবীনচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র কাহিনী বর্ণনাত্মক কাব্য-রচনার যে ধারাটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার অনুবর্তন দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে রচিত আখ্যান কাব্যে। **দীননাথ ধরের কংস বিনাশ** (১৮৬১), **বলদেব পালিতের ভর্তৃহরি কাব্য** (১২৭৯), **কর্ণার্জুন কাব্য** (১৮৭৫), মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণির সপ্তদশ সর্গের মহাকাব্য নিবাতকবচ-বধ (১৭৯১), **যোগীন্দ্রনাথ বসুর পৃথ্বীরাজ, শিবাজী** (১৯১৯)—প্রভৃতি কাব্যে পুরাণ-ইতিহাস হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া বিশালকার মহাকাব্য রচনার যে প্রচেষ্টা দেখা যায় তাহাতে প্রতিভাহীন লেখকের অনুকরণ-সর্বস্বতাই প্রমাণিত হইয়াছে। এই সব লেখকদের মধ্যে কিছু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, **অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**। অক্ষয়চন্দ্রের 'উদাসিনী'তে (১৮৭৪) কাহিনী বর্ণনার মধ্যে গীতিকবিতার রস পরিবেশনে

কিছু বিশেষত্ব আছে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'ভারত উদ্ধার কাব্যে' (১৮৭৮) মহাকাব্যের প্যারডি রচনায় পরিহাস রসিকতার একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারত উদ্ধারকামী নেতাদের চিন্তা এ কর্মের অসঙ্গতি-গুলির প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ন বিদ্রূপ স্বদেশপ্রেম ও বীররসের বায়বীয় উচ্ছ্বাসের প্রতিষেধকরূপে কাজ করিয়াছিল।

বাঙালী কবিদের প্রতিভা বিশেষভাবে লিরিক প্রতিভা। মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের রচনাবলী বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, মূলতঃ ইঁহারা লিরিক প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাহিনী বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের মধ্যে লিরিকের স্রোত বহিয়া গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত আধুনিক বাংলা কাব্য গীতিকাব্যের পথেই মুক্তিপথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। অক্ষয় চৌধুরীর উদাসিনী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণ (১৮৭৫) প্রভৃতি কাব্যে দেখা যায় মহাকাব্যের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা বর্ণনাত্মক গীতিকাব্যই রচনা করিবাছেন। ক্রমে বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রতিভার স্পর্শে বাংলা গীতি-কাব্যের নূতন রূপ সৃষ্টি হইয়া উঠিল এবং তাঁহার ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় লিরিক-কল্পনার শতধারা উৎসারিত করিয়া তুলিলেন। মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্য রচনার ধারা শেষ হইয়া বাংলা কবিতায় নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। উচ্চশ্রেণীর আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য রচনার জন্য চরিত্রসৃষ্টি, প্লটগঠন প্রভৃতি বিষয়ে যে দক্ষতার প্রয়োজন হয়, মধুসূদন ভিন্ন ঊনবিংশ শতাব্দীর আর কোন কবির সে দক্ষতা ছিল না। ঘটনা ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে দৃঢ়-সংবদ্ধ প্লটের আধারে আবেগপ্রবাহ সংহত আকারের মধ্যে রূপ দেওয়ার মতো ক্ষমতার অভাবে মেঘনাদবধ ভিন্ন অন্য কোন মহাকাব্যে শিল্প-সিদ্ধি অর্জিত হয় নাই। সংখ্যায় স্ফীত হইলেও এই ধারার কাব্যে উচ্চাঙ্গের কবিপ্রতিভার পরিচয় মধুসূদন ভিন্ন আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। বরং হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের মতো কবিরা বৃহৎ আকারের মহাকাব্য অপেক্ষা খণ্ডগীতি-কবিতাতেই বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙালী কবিপ্রতিভার সহজাত গীতিকাব্য-প্রবণতা বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথে পূর্ণ পরিণতি লাভ করায় মহাকাব্য রচনার প্রথাগত অক্ষম প্রচেষ্টা শেষ হইয়া যায়।

৮। প্রশ্ন: ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতার ধারাটির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্যান্য প্রধান কবিদের পরিচয় দাও।

অথবা, ঊনবিংশ শতকে প্রাক্-রবীন্দ্র-গীতিকবিতার উদ্ভব ও ক্রম-পরিণতির বিবরণ দাও। [ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯[illegible]]

উত্তর ঃ উনবিংশ শতাব্দীকে 'মহাকাব্যের যুগ' বলিয়াই অনেকে অভিহিত করেন। উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ কবিই আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্য জাতীয় রচনায় ছিলেন পরম উৎসাহী। পুরাণ, ইতিহাস ও অন্যান্য উৎস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ইংরেজী আখ্যান কাব্যের আদর্শে যুদ্ধ বিগ্রহ বর্ণনা এবং স্বদেশানুরাগের পরিচয়বাহী কাব্য রচনা করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্র করিয়াছিলেন প্লাবিত। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী এই সময়ে কাব্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলেও সমসাময়িক রুচির দ্বারা তিনি প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত হন নাই। এক হিসাবে **বিহারীলাল চক্রবর্তীই** আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের প্রথম স্রষ্টা। তাঁহার কাব্যেই যথার্থভাবে কবির আত্মমনস্ক ভাবনা বেদনা চিত্তের নিভৃতের অন্তরঙ্গ কথা স্বগত ভঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়াছে। সমসাময়িক সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিহারীলালের কবিতার বিশিষ্টতা নির্দেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বিহারীলাল তখনকার ইংরেজী ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগ মূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত, দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এইজন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গ-রূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।" "আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা।" গীতিকবিতার বিষয় বিশেষভাবে কবির ব্যক্তিত্ব। জগৎ ও জীবনের প্রভাব তাঁহার কল্পনা-প্রতিভা-ব্যক্তিত্বকে যে আকারে গড়িয়া তোলে—কবিতার মধ্যে একান্ত অন্তরঙ্গতার সুরে সেই ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় উন্মীলিত হয়। জগৎ ও জীবনের নির্যাসিত সত্য এবং সৌন্দর্য তাঁহার স্বকীয় কল্পনাদৃষ্টিতে যে ভাবে ধরা দেয়, গীতিকবি তাহাই প্রকাশ করেন। কবিতায় তাঁহারই কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সুতরাং যথার্থ গীতিকবিতা একান্তভাবে কবির নিজের কণ্ঠে উচ্চারিত নিজেরই কথা। বাংলা সাহিত্যে বিহারীলালের রচনাতেই এই গীতিকাব্যের বিশিষ্টতা সংশয়হীন ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তবুও ইতিহাস লিখিতে হইলে আরম্ভেরও পূর্বসূত্র এবং পূর্বাভাস অনুসন্ধান করিতে হয়।

গীতিকবিতার উপরোক্ত বিশিষ্টতার কথা মনে রাখিলে খণ্ডকবিতা মাত্রকেই গীতিকবিতা বলা চলে না। যুগসন্ধির কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খণ্ড-কবিতাই লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার রচনায় কোথাও গীতিকাব্যে প্রত্যাশিত সূক্ষ্ম কল্পনার মায়ালোকে সৃজিত হয় নাই। তাঁহার রচনায় বস্তুনিষ্ঠ বিদ্রূপ পরায়ণ মনের পরিচয় যতই আকর্ষণীয় হউক, তাহা পদ্যের পর্যায় হইতে কাব্যের রসলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। গীতিকবির মানসিকতার প্রথম

পরিচয় পাওয়া যায় **মধুসূদনের** কাব্যে। তাঁহার প্রধান রচনাগুলি সমস্তই আখ্যানধর্মী। কাহিনী রচনা, চরিত্রসৃষ্টি আখ্যানধর্মী কবিতায় কবির প্রধান কাজ। কবির ব্যক্তিস্বরূপের প্রত্যক্ষ প্রকাশের সুযোগ এই ধরনের রচনায় থাকে না। তবুও মেঘনাদবধ কাব্যের বা বীরাঙ্গনার কোন কোন অংশে কাহিনী ও চরিত্রের অন্তরাল ভেদ করিয়া কবির নিজের কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন খণ্ডকবিতা লিখিয়াছিলেন কিন্তু সেখানে প্রাচীন রাধাকৃষ্ণ প্রেমকাহিনীর অন্তরালে কবির নিজস্ব অনুভূতি প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হইতে দেয় নাই। মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেই আধুনিক লিরিকের স্পষ্ট পূর্বাভাস পাওয়া যায়। সনেট লিরিক কবিতারই একটি শাখা। অবশ্য সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় কবিতার কায়াগঠন-সম্পর্কিত যে কেঠোর নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় তাহার মধ্যে কবির আত্মগত জীবন-ভাবনার গীতোচ্ছ্বাস স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিতে পারে না। চৌদ্দ চরণের সংক্ষিপ্ত পরিসরও কল্পনার অবাধ বিস্তারের পক্ষে বাধাস্বরূপ। আঙ্গিকগত নিয়মের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মধুসূদনের সনেটগুলিতে কবির নিজের প্রাণ-মনের উৎকণ্ঠা, আদর্শ-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকাব্যের কবিরূপেই যদিও বিখ্যাত তবুও কবি জীবনের প্রথম দিকে খণ্ডকবিতা লিখিয়াই কবিজীবন শুরু করিয়াছিলেন। তাঁহার খণ্ডকবিতার সংখ্যা কম নয়। 'কবিতাবলী' দুই খণ্ডে এবং 'বিবিধ কবিতা' নামক গ্রন্থে তাঁহার খণ্ডকবিতাগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কোন কোন রচনা ইংরেজী কবিতার অনুবাদ এবং ছন্দ লইয়া পরীক্ষার নিদর্শন রূপে উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাই পদ্যের স্তরের, কিন্তু অকৃত্রিম আন্তরিকতার সুর 'হুতাশনের আক্ষেপ', 'জীবন মরীচিকা', 'ভারত বিলাপ' প্রভৃতি কয়েকটি রচনাকে সার্থক লিরিকের সীমায় আনিয়া দিয়াছে।

নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার আত্মজীবনীতে নিজেকে বাংলা গীতিকবিতার স্রষ্টারূপে দাবি করিয়াছেন, "আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে খণ্ডকবিতা বঙ্গভাষায় ছিল না।' একথা সত্য যে প্রচুর সংখ্যক খণ্ডকবিতা ("অবকাশরঞ্জিনী" নামে দুই খণ্ডে ১৮৭১ এবং ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়) তিনি রচনা করিয়াছিলেন এবং বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও ছন্দের বৈচিত্র্যে সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের রচনার তুলনায় এই রচনাবলী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নবীনচন্দ্র আরো বলিয়াছেন, "পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল। কবিতানুরাগ আমার রক্তে-মাংসে, অস্থি-মজ্জায়, নিশ্বাস-

প্রশ্বাসে আজন্ম সঞ্চারিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল।" মজ্জাগত কবিতানুরাগের বশে নবীনচন্দ্র নিরন্তর কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এত কথার পর তাঁহার রচনা পড়িতে গেলে দেখা যায়, উদ্বেল হৃদয়োচ্ছ্বাসের অসংযত প্রকাশই নবীনচন্দ্রের কবিতার প্রধান লক্ষ্য। সহজেই ভাবপ্রবণ তাঁহার মন যে কোন ভাবনার স্পর্শে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। সেই উচ্ছ্বাস প্রকাশের ভাষা অনেক সময়ে নিতান্ত ছেলেমানুষির পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে। আবেগকে সংযমিত, আকারবদ্ধ করিয়া তুলিবার মতো সক্ষম সৃষ্টিকল্পনা তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না। উচ্ছ্বাস এবং লিরিক মনোভাব যে এক কথা নয়—একথা অনেকে বোঝে না। যথার্থ লিরিক কবিতায় গূঢ়চারী সৃষ্টিকল্পনা দ্বারা অনুভূতির স্তরগুলিকে অখণ্ড সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে হয়। যাঁহার দৃষ্টি জীবন ও জগতের গভীর সর্বায়ত সত্য ও সৌন্দর্যের সন্ধান পায় না তাঁহার পক্ষে যথার্থ গীতিকবিতা রচনাও সম্ভব নয়। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের গীতিকবিতায় এইরূপ কবিদৃষ্টির পরিচয় কোথাও নাই। কিন্তু শিল্পী হিসাবে নবীনচন্দ্র এবং হেমচন্দ্রের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা মনে রাখিয়াও বলা চলে, ইংরেজী লিরিকের প্রভাবে নূতন যুগের কবিদের মধ্যে গীতিকবিতার আধুনিক রূপ নির্মাণের যে প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছিল ইঁহাদের রচনায় তাহার প্রমাণ আছে। ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচিত আধুনিক কাব্য পাঠকেরা এই সব কবিতার মধ্যেই তাঁহাদের নূতন রুচির পক্ষে অনুকূল কাব্যরূপ খুঁজিয়া পাইতেন এবং সমাদর করিতেন।

এইসব বিচ্ছিন্ন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অক্ষম প্রচেষ্টার অবসান ঘটাইয়া যথার্থ গীতিকবিতার শিল্প-রূপ উদ্ভাবন করিলেন **বিহারীলাল চক্রবর্তী** (১৮৩৫-৯৪)। বিহারীলালের কবি-স্বভাবের মধ্যে আত্মপ্রচারের আগ্রহ ছিল না, কোন কিছুর বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ করেন নাই। সমাজ ও জীবনের অতি প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলি তাঁহাকে কিভাবে প্রভাবিত করিত বা আদৌ প্রভাবিত করিত কিনা জানিবার উপায় নাই। অর্থাৎ তৎকালীন অন্য কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে বাস্তব জীবনাগ্রহ, বাদ-প্রতিবাদ, বিচার-বিতর্ক এবং সকল বিষয়ে যে একটা সক্রিয় বিদ্রোহের ভাব দেখা যায়—বিহারীলালের ব্যক্তিত্বে তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। জগতের সহিত নিজেকে মিলিত করিবার ভঙ্গিটি বিহারীলালের সম্পূর্ণ পৃথক। অচেতন প্রকৃতির ফুল যেমন সবকয়টি পাপড়ি মেলিয়া দিয়া সূর্যের আলো পান করে কবিও তেমনই আপন সত্তার সবটুকু মেলিয়া দিয়া পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে নিজেকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা এমনই স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাভাবিক যে সজ্ঞান অভিপ্রায়ের প্রচেষ্টা কোন প্রকার কৃত্রিমতার ছায়া ফেলে নাই। প্রেম এবং সৌন্দর্য পিপাসার

প্রসারিত কবিহৃদয় মানব সম্পর্কের এবং প্রকৃতির মধ্যে নিহিত স্নিগ্ধতাটুকু নিঃশেষে আপনার করিয়া লইয়াছে এবং সেই উপলব্ধির নিবিড় আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে। এই প্রকাশের মধ্যে কাহাকেও শুনাইবার অভিপ্রায় নাই, যেন চিত্তের মধ্যে যে আনন্দ-বেদনার গুঞ্জন জাগিতেছে কবি নিজেই তাহার একমাত্র শ্রোতা। এমন বিশ্ব বিস্মৃত আত্মমনস্কতা আর কোন বাঙালী কবির মধ্যে দেখা যায় না। তাঁহার কাব্যের দোষ গুণ উভয়েরই মূলে আছে এই ভাবতন্ময়তা। তাঁহার কল্পনা অতিমাত্রায় Subjective ; তিনি যখন গান করেন, তখন সম্মুখে শ্রোতা আছে এমন কথাও ভাবেন না, ভাবকে স্পষ্ট রূপ দিবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার নাই। কিন্তু এই আত্মনিমগ্ন কবির স্বতঃ-উৎসারিত গীতিধারায় এমন সকল বাণী নিঃসৃত হয়, যাহাতে সন্দেহ থাকে না যে, তাঁহার মনোভৃঙ্গ সরস্বতীর আসন-কমলের মর্মমধু পান করিয়াছে, সেই পদ্মের পরাগ-ধূলি সর্বাঙ্গে মাখিয়া কবি জীবন সার্থক করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে ভাবের ঐকান্তিকতা ও গভীরতা যতটা হৃদয়গ্রাহী, ভাবের মূর্তি ততটা স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। এই কারণে তিনি আধুনিক কাব্যে একটা নূতন সাধন-রীতির দীক্ষাগুরু হইলেও কাব্যরচয়িতা হিসাবে কাব্যামোদী পাঠকের পিপাসা মিটাইতে পারেন নাই।—"(মোহিতলাল)

বিহারীলালের কাব্যগ্রন্থগুলির নাম **বঙ্গসুন্দরী** (১৮৭০), **নিসর্গ সন্দর্শন** (১৮৭০), **বন্ধুবিয়োগ** (১৮৭০), **প্রেমপ্রবাহিণী** (১৮৭০), **সারদা-মঙ্গল** (১৮৭৯) এবং **সাধের আসন** (১৮৮৯)। কাব্যগুলি কালপরম্পরা অনুসারে পড়িলে কবির ভাবনা-প্রবাহের পরিণতি-অভিমুখী ধারা লক্ষ্য করা যায়। বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি '**সারদামঙ্গল**' পাঁচ সর্গে বিন্যস্ত। কাব্যলক্ষ্মী সারদার সহিত কবির বিরহ-মিলনের এই বিচিত্র লীলাবর্ণনায় বিহারীলালের কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে। কবি বলিয়াছেন, "মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ, যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সংগীত রচনা করি।" বিরহী হৃদয়ের বেদনার মিশ্রণে কবি তাঁহার সৌন্দর্য প্রতিমা সারদার এক বিষাদময় মূর্তি রচনা করিয়াছেন। জগতে মানব সম্পর্কের মধ্যে যে প্রেম ও প্রীতি স্পন্দিত হয়, সৌন্দর্যের মধ্যে অলৌকিক শক্তির মায়া অনুভব করা যায়—সেই প্রেম ও সৌন্দর্যের সারাৎসারে বিহারীলালের 'সারদা' গঠিত। যে শক্তি "সৌন্দর্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এবং দয়া স্নেহ-প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন", তাহাকেই কবি সারদা রূপে কল্পনা করিয়া তাহার সহিত বিরহ-মিলনের বিচিত্র লীলায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। এই মানসলীলার বিবরণের মধ্যে কবির অন্তর্লোকের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে।

শুধু যেমন তেমন ভাবে কতকগুলি উচ্চ আদর্শ বা ভাবের কথা পদ্যের

আকারে প্রকাশ করা এবং পাঠককে স্পষ্টভাবে কথাগুলি বুঝাইয়া দেওয়াই যে গীতিকবিতা সৃষ্টির চরম আদর্শ নয় বিহারীলালেই প্রথম একথা প্রতিপন্ন হইল। অর্থজ্ঞাপন নহে, অর্থের অতিরিক্ত কোন অনির্বচনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করাই শ্রেষ্ঠ কবিতার ধর্ম। 'সারদামঙ্গল' গীতিকবিতায় প্রথম সেই অনির্বচনীয়ের স্বাদ আনিয়া দিল এবং ছন্দের ক্ষেত্রেও বিহারীলাল একটা নূতন আদর্শ স্থাপন করিলেন। ভাবরসে পূর্ণ শব্দের ব্যবহার, অভাবিতপূর্ব মিলের বিস্ময়করতায় এবং ছন্দোবৈচিত্র্যে কবিতার রূপগত সৌন্দর্যের মূল্য যে কতখানি তাহা তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তদ্বারা প্রমাণ করেন। বাংলা কবিতায় ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে নব-প্রবর্তনার দিক হইতে মধুসূদনের পরেই বিহারীলালের স্থান।

বিহারীলালের সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং ভাবতন্ময়তার প্রভাব ফলবান হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্য সাধনায় পূর্বগামী কবিদের মধ্যে একমাত্র বিহারীলালের প্রভাবের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বিহারীলাল ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের বাংলা কবিতার ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আলোকেই উদ্ভাসিত। তবুও এই সময়ে এমন কয়েকজন কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অপ্রধান হইলেও গীতি কবিতায় স্মরণীয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল. দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং গোবিন্দচন্দ্র দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮) সমসাময়িক গীতিকবিতার রসপ্রেরণা এবং রূপনির্মাণ রীতির অনুবর্তন করেন নাই। বিহারীলাল যে উচ্ছ্বসিত আবেগময় কাব্য রীতির প্রবর্তন করিয়াছেন সুরেন্দ্রনাথের কবিতা ঠিক তাহার বিপরীত রীতির। হৃদয়াবেগের পরিবর্তে বুদ্ধির প্রাধান্য এবং কবিতার আঙ্গিকে ভাস্কর্যের অনুরূপ দৃঢ়-সংহতি তাঁহার রচনাকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করিয়াছে। প্রেমই তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু, কিন্তু তাঁহার প্রেম-কল্পনায় অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম লীলা নাই। সৌন্দর্য ও প্রেমের বিমূর্ত ধারণা বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে ; সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। তিনি নারীকে দেখিয়াছেন সামাজিক বন্ধনের বাস্তবতার মধ্যে, পত্নী-মাতা-ভগ্নী রূপে। কবির মৃত্যুর পর ১৮৮০ এবং ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'মহিলা' কাব্যের দুই খণ্ডে মাতা ও জায়া রূপে নারীর বাস্তব-রূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্য পাঠ করিতে গেলে মনে হয় বুদ্ধির আলোকে স্পষ্টভাবে যাহা বোঝা যায় তাহার অতিরিক্ত কোন বিমূর্ত ধারণার প্রতি কবির কিছুমাত্র আকর্ষণ নাই।

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) সম্পর্কে কোন সমালোচক বলিয়াছেন যে, তিনি "বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথের ভাব-সমন্বয়পুষ্ট কবি। প্রেম ও সৌন্দর্য-রহস্যের প্রতি অক্ষয়কুমার বড়ালের বিস্ময় মিশ্রিত আকর্ষণ যে ভাবে কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহা রবীন্দ্র কাব্যকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। অক্ষয়কুমারের এই সৌন্দর্য দৃষ্টি এবং প্রেম ভাবনার বিশিষ্টতা বিহারীলালের প্রভাবের ফলে বলা যাইতে পারে। অবশ্য অক্ষয়কুমার তাঁহার কবিগুরুর চেয়ে অনেক বেশি সচেতন কবি। অর্থাৎ তাঁহার রচনায় বিহারী-লালের মতো আত্মমনস্ক ভাব-তন্ময়তা আছে কিন্তু সেই তন্ময়তা কবিতার শিল্পরূপ সৃষ্টির সমস্যাবিষয়ে সচেতনতাকে আচ্ছন্ন করে নাই। কবিতার আঙ্গিক বিষয়ে এই সচেতনতার মূলে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রভাব আছে—এ অনুমান ভিত্তিহীন নয়। অক্ষয়কুমারের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য **প্রদীপ** (১৮৮৪), **শঙ্খ** (১৯১০) এবং **এষা** (১৯১২)। পত্নীর মৃত্যুতে কবি যে রূঢ় আঘাত পাইয়াছিলেন সেই আঘাত তাঁহাকে জীবনের কঠিন সত্যের সম্মুখীন করে। কল্পনার লীলা বিন্যাসের পরিবর্তে বাস্তবজীবনে নিয়তির মুখোমুখি দাঁড়াইয়া কবি সুগভীর জীবন জিজ্ঞাসায় উচ্চকিত হইয়া উঠিয়াছেন। এই কাব্যে কোথাও কোথাও শোকের উচ্ছ্বাসকে অতিক্রম করিয়া কবি গভীর দার্শনিকতার স্তরে উপনীত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সহিত মিলাইয়া পড়িলে অক্ষয়কুমারের রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবিতার ভাষায় এবং ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যে রূপান্তর ঘটাইতেছিলেন অক্ষয়কুমার সচেতনভাবেই তাহার অনুবর্তন করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৪-১৯২০) একনিষ্ঠ রূপের পূজারী ছিলেন। তাঁহার অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের যে আদর্শ বিরাজিত ছিল বিশ্বের মধ্যে তাহারই প্রতিরূপ সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। "তাঁহার প্রতিভা আত্মমুগ্ধ", তিনি আপন হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত ভাব-নির্ঝরিণীর মধ্যে আপনাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আপনার অন্তরে যে স্পর্শমণি পাইয়াছেন তাহার স্পর্শে জগৎ ও জীবনকে সোনায় সোনা করিতে চাহিয়াছেন ; তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালিয়া অনাবিল প্রীতির মন্ত্রে সৌন্দর্য লক্ষ্মীর আরাধনা করিয়াছেন—কোনপ্রকার চিন্তা বা বিচারকে তিনি সে পূজা-গৃহে পদক্ষেপ করিতে দেন নাই। এই সৌন্দর্যমুগ্ধ কবির সৌন্দর্য সাধনায় একটি নূতন দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে—নয়ন ও হৃদয়, এই দুই-এর পরিচর্যায় সর্বেন্দ্রিয়ের উল্লাসব্যঞ্জক এক নূতন কাব্যকলার উদ্ভব হইয়াছে।"—(মোহিতলাল)। **ফুলবালা** (১৮৮০), **ঊর্মিলা কাব্য** (১৮৮০), **অশোক-গুচ্ছ** (১৯০০), **শেফালীগুচ্ছ** (১৯১২) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে সংকলিত

কবিতায় প্রকৃতি ও নারী সৌন্দর্যের যে রসমূর্তি রচিত হইয়াছে তাহা একান্তভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যের বিমূর্ত ধারণা নয়, একান্ত প্রত্যক্ষ আকারের মধ্যে, দৃষ্টির সীমার মধ্যে সৌন্দর্যকে রূপবন্ধ করিয়া তুলিবার অসাধারণ ক্ষমতা দেবেন্দ্রনাথের কাব্যকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করিয়াছে।

ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে না আসিয়াও **গোবিন্দচন্দ্র দাস** (১৮৫৫-১৯১৮) নিতান্ত স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বশক্তির বলে আধুনিক কাব্যধারায় একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিকূল ভাগ্যের সহিত তাঁহাকে প্রতি পদে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। হয়ত এই সংগ্রামশীলতার জন্যই তাঁহার চরিত্রে একটা বন্ধন-অসহিষ্ণু প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই অপরিমেয় পৌরুষের শক্তিই তাঁহার কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রেম চেতনায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সূক্ষ্মতা নাই। তিনি দেহগত কামনাকেই, বাস্তবদেহ নিয়তিকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। জীবনের প্রতি সুস্থ আগ্রহ এবং বস্তুনিষ্ঠ মনোভাবের জন্য গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা একটি স্বতন্ত্র স্বাদযুক্ত।

৬। প্রশ্ন: "আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।" বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পর্কে কবি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর এবং কবির রচনাবলীর পরিচয় দাও।

উত্তর সংকেত: [৫নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।]

৭। প্রশ্ন: মধুসূদনের পর ও রবীন্দ্রনাথের পূর্ব—এই অন্তর্বর্তী কালে বাংলা কাব্যের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

উত্তর: হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, অক্ষয়কুমার বড়াল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও গোবিন্দদাসের কাব্য আলোচনা কর।
ইঁহাদের জন্য চার ও পাঁচ নম্বর প্রশ্নের উত্তর লিখ।

৮। প্রশ্ন: টীকা লিখ:

(ক) **বিহারীলাল** [ক. বি. বি.. এ পার্ট. ওয়ান, ১৯৬৩]

(খ) **নবীনচন্দ্র সেন** [ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩]

(গ) **যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত**] ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩]

(ঘ) **সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত** [ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩]

(ঙ) **নজরুল ইসলাম** [ঐ]

উত্তর: (ক) ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

(খ) রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে **নবীনচন্দ্র সেনের** (১৮৪৭-১৯০৯) স্থান ছিল ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই এবং এই সময়ে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি। মৌলিক রচনা এবং অনুবাদ মিলাইয়া নবীনচন্দ্রের কাব্য-গ্রন্থের সংখ্যা তেরখানি। নবীনচন্দ্রের রচনার পরিমাণ যেমন বিপুল, বিষয়বস্তুও তেমনি বিচিত্র। প্রকৃতি-প্রেম—আধ্যাত্মিকতা—ইতিহাস—পৌরাণিক আখ্যান—অবতারকল্প মহাপুরুষদের জীবনী ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ তাঁহার কাব্যে তিনি বিষয়বস্তুরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। কবিতায় আঙ্গিকের দিক হইতেও তাঁহার কবিতার বৈচিত্র্য কম নয়। মহাকাব্য—আখ্যানকাব্য—গীতিকাব্য প্রভৃতি প্রচলিত কাব্য-আঙ্গিকগুলিতে তাঁহার অনায়াস অধিকার ছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বশক্তি। কবির নিজের কথায়—"কবিতানুরাগ তাঁহার রক্তে-মাংসে, অস্থিমজ্জায়, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশব হইতেই তাঁহার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল।" দশ এগার বৎসর বয়স হইতেই ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণে তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেন এবং এই কাব্যচর্চার ধারা তাঁহার জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

নবীনচন্দ্রের খণ্ডগীতিকবিতাগুলি **'অবকাশরঞ্জিনী'** নামে দুই খণ্ডে ১৮৭১ এবং ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক কাব্যগ্রন্থই নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতির প্রধান কারণ। নবীনচন্দ্র সেনের আর একটি স্মরণীয় কীর্তি মহাভারত কাহিনীর বিশাল পটভূমি অবলম্বনে রচিত ত্রয়ী কাব্য **রৈবতক** (১৮৮৭), **কুরুক্ষেত্র** (১৮৯৩) এবং **প্রভাস** (১৮৯৬)। এই ত্রয়ী কাব্যে কবি যে বিশাল পটভূমি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা মহাকাব্যেরই উপযুক্ত। কিন্তু উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে তাহা মহাকাব্য হইয়া উঠে নাই। নবীনচন্দ্রের অন্যান্য রচনার মধ্যে তিনজন অবতারকল্প মহাপুরুষের জীবনী অবলম্বনে রচিত খৃষ্ট (১৮৯১), অমিতাভ (১৮৯৫) এবং অমৃতাভ (১৯০৯) কাব্য তিনটির কথা উল্লেখযোগ্য।

(গ) রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে **যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত** (১৮৮৭-১৯৫৪) একজন বিশিষ্ট কবি। বৃত্তিতে তিনি ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। সেইজন্য তিনি বুদ্ধিগ্রাহ্য বাস্তব জীবনকেই তাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত করিয়াছেন বেশী। তিনি সাধারণ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে তীক্ষ্ম শ্লেষ ও নিপুণ যুক্তি-শৃঙ্খলার সাহায্যে প্রচলিত আদর্শবাদ ও সৌন্দর্যবোধকে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বাস্তব জীবনের কেবল দুঃখ, নৈরাশ্য এবং ব্যর্থতাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম জীবনে তিনখানি কাব্য মরীচিকা (১৯২৩), মরুশিখা (১৯২৭), মরুমায়া-র (১৯৩০) মধ্য দিয়া এই জীবনের মরুবালুকার কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি দুঃখবাদী

কবি। তাঁহার নিকট যেন জীবন, সৌন্দর্য, প্রেম ও ভক্তি সমস্তই ফাঁকি বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। ছলনাময়ী প্রকৃতি কেবল দুঃখ দিবার জন্যই মানবজীবনে মোহজাল বিস্তার করে। প্রেম তাঁহার কাছে অন্তর্জ্বালাময় কামায়ন এবং স্থূল 'অহং'-এর জান্তব পীড়ন মাত্র ; ভগবান একজন প্রচন্ড ক্ষমতাশালী ও স্বেচ্ছাচারী। যতীন্দ্রনাথ ইংরেজী 'মেটাফিজিক্যাল' কবিদের (তাত্ত্বিক কবি) ভাবের দ্বারা খুবই প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট জীবনকে মনে হইয়াছিল ঊষর মরুভূমির মত। তাই তিনি লিখিলেন,

চেরাপুঞ্জীর থেকে

একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে ?

তাঁহার সায়ম্, (১৯৪০), ত্রিযাম (১৯৪৮) ও শিক্ষান্তিকা (১৯৫৭) শেষের এই তিনখানি কাব্যে তাঁহার ও তাঁহাব প্রিয়ার বিগত যৌবন ও তিরোহিত দেহ-সৌন্দর্যের জন্য মর্মান্তিক বিলাপ ধ্বনিত হইয়াছে। উগ্র দেহাত্মবাদ এবং তীব্র যৌবন ভোগ লালসায় তিনি মোহিতলালের মতই ছিলেন দেহবাদী। তাঁহার অবরুদ্ধ প্রেমাবেগ ও যৌবন কামনা যে কত তীব্র ও নিঃসংকোচ ছিল তাহা তাঁহার শেষ পর্যাযের কাব্যগুলির মধ্যে বিবৃত হইয়াছে।

(ঘ) রবীন্দ্র সমকালীন কবিদের মধ্যে **সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের** (১৮৮৯-১৯৩২) স্থানই বিশিষ্ট। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী কবি। ব্রিটিশ শাসনের তীব্রতর শোষণের এই পর্যাযে দেশের দুঃখ দারিদ্র্য চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধের আন্দোলনও দেখা দিয়াছিল। 'ভারত-সভা' প্রতিষ্ঠার মধ্যে তাহার সংগঠিত রূপ দেখা দিল।

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল দেশের মাটির নিগূঢ় বন্ধন। সেজন্য তিনি দেশের দাবি-দাওযার আন্দোলনে কেবলমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই, দেশের গভীর বেদনাকে তিনি তীব্রভাবে ভাষারূপ দিলেন। তিনি "তাঁহার ছন্দ সরস্বতীকে মানবের বাস্তব ইতিহাসের সর্বাঙ্গীণ প্রগতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বন্দনা করিয়াছেন।" মানুষের অকথ্য দুরবস্থা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল এবং তাহাই তিনি দুঃখভোগীর মতই কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যে তখন রবীন্দ্রনাথ ছত্রপতি। গানে কবিতায় নাটকে এই যুগটিকে রবীন্দ্রনাথ এককথায় মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন। অসীম সেই প্রতিভার যাদুস্পর্শে অন্যান্য কবিরা যেন তাঁহার সুরেরই প্রতিধ্বনি করিতেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথও তাঁহার প্রভাবমুক্ত নহেন, তথাপি স্বীয় প্রতিভায় তাঁহার স্বাতন্ত্র্যও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সেখানে দেখা দিল নূতন সুর, নূতন প্রত্যয়, মানবতার জয়গান।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। সেজন্য তাঁহার রোমান্টিক কবিপ্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয় হইয়াছিল জ্ঞানভূয়িষ্ঠ মননধর্মিতা ও যুক্তিনিষ্ঠ বাস্তবপ্রবণতা। বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের বহুল পরিচয় ছন্দের যাদুকর রূপে। দেশী, বিদেশী, সংস্কৃত, বাংলা ছন্দের এমন বিচিত্র ব্যবহার তাঁহার মত অন্য কবির পক্ষে সম্ভব হয় নাই। "ছড়ার ঝোঁকে, ছন্দের নৃত্যহিল্লোলে, অনভিজাত ও বিদেশ হইতে আহৃত চটুল শব্দের ধ্বনিময় প্রয়োগে, রং ও তুলির লঘু টানে, সৌন্দর্যের অনায়াসসিদ্ধ চিত্রাঙ্কনে, সর্বোপরি মানস উল্লাস ও উত্তেজনায় উপচাইয়া-পড়া উচ্ছলতায় তিনি কবিতার এই কল্পনা লীলাকে মনোহর, সহজ-অনুভববেদ্য রূপ দিয়াছেন।" 'বেণু ও বীণা', 'কুহু ও কেকা', 'তীর্থ-সলিল', 'অভ্র-আবীর' প্রভৃতি তাঁহার বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ।

(ঙ) বিদ্রোহী কবিরূপেই **নজরুল ইসলামের** (১৮৯৯ খ্রীঃ অঃ) বাংলা কাব্যে প্রসিদ্ধি। বাংলা কাব্যের চিরাচরিত ধারায় তিনি ব্যতিক্রম। ধূমকেতুর মত তাঁহার আবির্ভাব। প্রবল উচ্ছ্বাস এবং ফেনিল উন্মত্ততায় তিনি বাংলা কাব্যকে প্লাবিত করিয়াছেন; "তাঁহার অন্তরের অনির্বাণ বহ্নি-জ্বালাই তাঁহার প্রধান, এমন কি সর্বগ্রাসী অনুভূতি। তাঁহার রক্তে, তাঁহার গভীরতর চেতনায় যে রোষ, ক্ষোভ, রিক্ত বঞ্চিতের প্রতি নিবিড় একাত্মতা বোধ বজ্রাগ্নির মত অসহনীয় উত্তাপে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করার তীব্র আকুতিই তাঁহার কাব্যপ্রেরণার মূল কারণ।" সাম্যবাদী আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত। বাংলা কাব্যে তিনি নূতন চেতনার প্রবর্তক। প্রগতিবাদীর বিদ্রোহী সুর তিনি উচ্চগ্রামে তুলিয়াছেন। তাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণায় (১৯২২) তাহার স্বভাবশক্তিরই বিস্ময়কর প্রকাশ। "উন্মত্ত, আত্মহারা হৃদয়াবেগের এরূপ প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস বাংলা কাব্যে আর দেখা যায় নাই।" তাহার এই বিদ্রোহী সত্তা বাংলা কাব্যে বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। 'সর্বহারা' (১৩৩৩), 'অগ্নিবীণা', 'ফণিমনসা' (১৩৩৪) প্রভৃতি কাব্যেই তাহার অবসান হইয়াছে। তারপর তিনি চিরন্তন প্রেম ও সৌন্দর্যে বিভোর হইয়াছেন। দোলনচাঁপা (১৩৩০), ছায়াপথ (১৩৩২), সিন্ধুহিল্লোল (১৩৩৪) প্রভৃতি তাহার বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-প্রবণ রচনা। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি অজস্র গানও রচনা করিয়াছেন। তারপর নজরুলের কবি-জীবনের অতর্কিত পরিসমাপ্তি বাংলা কাব্যে এক বিরাট সম্ভাবনাকে অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছে। কবি এখনও জীবিত কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ এবং লেখনী বহুদিন স্তব্ধ। বাংলা কাব্যের ইহা এক বড় দুর্ভাগ্য।

চতুর্থ পর্ব

॥ উপন্যাস ও ছোটগল্প ॥

১। প্রশ্ন : বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেই বাংলা উপন্যাস প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের দ্বারা কিরূপে সম্ভাবিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নির্দেশ কর। [ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, মডিফায়েড, ১৯৬৪]

উত্তর : ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য প্রভাবে বাঙালী সমাজে আধুনিক জীবন সৃষ্টির উন্মেষ এবং গদ্যভাষার উদ্ভবের ফলে উপন্যাসের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। উপন্যাসের শিল্পমাধ্যম সম্পর্কে বাঙালী লেখকদের আগ্রহের মূলে ছিল ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব। সমাজের জটিল পটভূমিতে ব্যক্তিমানুষের জীবন সমস্যাই উপন্যাসের বিষয়। সমাজে ব্যক্তির স্বতন্ত্র মর্যাদা যখন স্বীকৃত হয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ যখন জীবনের মূল্যবোধে রূপান্তর সাধন করিতে থাকে —তখনই ব্যক্তির জীবন সমস্যার দিক হইতে সমাজের সহিত ব্যক্তিব সম্পর্কের তাৎপর্য ব্যাখ্যার উপযুক্ত শিল্প-মাধ্যম উপন্যাস সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের গদ্যরচনাবলীর মধ্যে নকশা জাতীয় এক ধরনের ব্যঙ্গাত্মক রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। তখনকার দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক আবহাওয়ার মধ্যে নানা শ্রেণীর মানুষের জীবনাচরণের অসঙ্গতি ও বিকার-বিকৃতির কৌতুকবহ বাস্তব চিত্র নকশা জাতীয় রচনায় পরিস্ফুট হইয়াছে। এই সব রচনায় একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে জীবনকে দেখা এবং জীবনের যথাপ্রাপ্ত প্রত্যক্ষ রূপ প্রতিচিত্রণের আগ্রহের মধ্যে উপন্যাসের অস্ফুট আভাস পাওয়া যায়। এই দিক হইতে কলিকাতার নবোদিত বাবু-সমাজের বিকার-বিকৃতির চিত্রপূর্ণ—ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫) বইটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাস্তব জীবনাগ্রহ উপন্যাসের মানসিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য, নববাবু বিলাস এবং অনুরূপ রচনায় লেখকদের মনোভঙ্গিতে এই বাস্তব জীবনাগ্রহের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে সুসংবদ্ধ কাহিনীর মধ্যে অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে হয়। সেইরূপ কোন শিল্পসৃষ্টির গূঢ় প্রেরণা অবশ্য এই সব রচনায় দেখা যায় না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্যারীচাঁদ মিত্র সচেতনভাবে উপন্যাসের শিল্প সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার আলালের ঘরের দুলালের কথা আলোচনা করিবার পূর্বে সম্প্রতি আবিষ্কৃত শ্রীমতী মুলেন্স নাম্নী একজন মহিলার লেখা ফুলমণি ও করুণার

বিবরণ (১৮২৫) নামক গ্রন্থটি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। অনেকের মতে শ্রীমতী মুলেন্স ফরাসী ছিলেন। তাঁহার রচনায় বাংলা ভাষার উপরে যেরূপ স্বচ্ছন্দ অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে অবশ্য তাঁহাকে বিদেশিনী বলিয়া মনে করা কঠিন। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' বইটি একটি অখণ্ড কাহিনীর আকারে লেখা এবং ইহার রূপ যথার্থ উপন্যাসেরই মত। দেশীয় খ্রীষ্টান নারীদের খ্রীষ্টান জীবনাদর্শ বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার জন্যই মুলেন্স এই কাহিনী রচনা করিয়াছেন, সুতরাং ইহাকে প্রচারমূলক রচনাও বলা যাইতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক রচনা হইলেও কাহিনীটির মধ্যে গল্পের রস অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ আছে। সমসাময়িক রচনার তুলনায় এই বইটিতে ঘটনা-বিন্যাসে লেখিকা দক্ষতারই পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তবুও 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' বাংলা উপন্যাসের ধারায় স্থান পাইবে না। এই উপন্যাসের বক্তব্যগত ভিত্তি, ইহাতে পরিস্ফুট জীবনের রূপ কোনভাবেই বাংলাদেশ এবং বাঙালী সমাজের সহিত যুক্ত নহে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রূপান্তরোন্মুখ বাঙালী সমাজের পটভূমিতে জীবনের নানামুখী সমস্যার প্রতি জাগ্রত আগ্রহ লইয়া **'আলালের ঘরের দুলাল'** (১৮৫৮) [ক. বি. ১৯৬৬] গ্রন্থে **প্যারীচাঁদ মিত্রই** সর্বপ্রথম যথার্থভাবে বাংলা উপন্যাসের সূচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্য কীর্তির মূল্যবিচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন; এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টা-বশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক আলালের ঘরের দুলাল নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সর্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত' বাংলাভাষা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া প্যারীচাঁদ 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই পত্রিকাতেই "আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়। ধনী পরিবারের ছেলে মতিলালের অধঃপতন এবং আবার সৎপথে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী উপন্যাসটির মূল বর্ণনীয় বিষয়, কিন্তু শাখা কাহিনী এবং গৌণ চরিত্রগুলি প্রধান হইয়া উঠিয়া প্লটের সংহতি বিনষ্ট করিয়াছে। উপকাহিনী এবং গৌণ চরিত্রগুলিই অবশ্য এই উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ। সর্বাধিক আকর্ষণীয় মোকাজান মিঞা বা ঠকচাচা চরিত্রটি। স্পষ্টতঃ নীতি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য লইয়াই লেখক মতিলালের গল্প বলিতে বসিয়াছিলেন, কিন্তু ঠকচাচা চরিত্রটিকে কোন নীতির ছকে আদর্শায়িত করেন নাই। তাহার বাস্তব কাণ্ডজ্ঞান, শঠতা, ধূর্তামি এবং পরিণামে 'মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে' বলিয়া মর্মান্তিক অনু-

লোচনা—সমস্ত মিলাইয়া ঠকচাচা একটি জীবন্ত চরিত্র। এই চরিত্রটির জন্যই আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসের সমস্ত ত্রুটি চাপা পড়িয়া যায়। কাহিনী বিন্যাসে সংহতির অভাব, মূল কাহিনীর চেয়ে শাখা কাহিনীর প্রাধান্য চরিত্রের রূপায়ণে একমাত্র ঠকচাচা ভিন্ন সর্বত্র অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি বহুবিধ ত্রুটি সত্ত্বেও বাংলা দেশের বাস্তবজীবনের পটভূমি অবলম্বনে রচিত এই গ্রন্থটিকেই আমাদের সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দিতে হয়।

সামাজিক উপন্যাসের সূচনা হিসাবে 'আলালের ঘরের দুলাল' যেমন মূল্যবান রচনা তেমনই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে **ভূদেব মুখোপাধ্যায়**-এর **'ঐতিহাসিক উপন্যাস'** (১৮৫৭) নামক গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত **'সফল স্বপ্ন'** এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক আখ্যানদুটির কথা স্মরণীয়। 'রোমান্স অব্ হিস্টরি—ইণ্ডিয়া' নামক ইংরেজী গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া ভূদেব এই কাহিনী দুটি বচনা করিয়াছিলেন। 'সফল স্বপ্ন' নিতান্তই মূলানুগ রচনা, কিন্তু 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' প্রায় স্বাধীন রচনা। ঔরংজেব-কন্যা রোসেনারার সহিত শিবাজীর ব্যর্থপ্রণয়ের কাহিনী যেভাবে অঙ্গুরীয় বিনিময়ে বিবৃত হইয়াছে—তাহার সহিত প্রকৃত ইতিহাসের কোন যোগ নাই। দূরবিস্তারিত ঐতিহাসিক পটভূমিতে কল্পনার অবাধ প্রসারের সুযোগ গ্রহণ করিয়া রোমান্স রচনার দৃষ্টান্ত ভূদেবের এই রচনাটিতে প্রথম দেখা যায়।

২। প্রশ্ন : ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সাধারণ লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

উত্তর : বাংলা উপন্যাসের শিল্প-রূপ সম্পূর্ণতা লাভ করে **বঙ্কিমচন্দ্রের** রচনায়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে Rajmohan's wife নামক ইংরেজী ভাষায় লিখিত উপন্যাসটি রচনার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের এই নূতন শাখায় নিজের সামর্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এই রচনাটি শেষ হইবার পূর্বেই তিনি বাংলায় উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশ-নন্দিনী' প্রকাশিত হইলে, বাংলা সাহিত্যের একটি নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের উপন্যাসগুলিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিভার সামর্থ্যে অন্ধ অনুকরণের পথ বর্জন করিয়া আপন সৃষ্টি কল্পনার পক্ষে উপযোগী শিল্পরূপ উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছিলেন। আখ্যানবস্তু সুনির্দিষ্ট বক্তব্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে কাহিনীর শাখা-প্রশাখাগুলিকে একটি সংহত প্লটের অবয়বের মধ্যে সু-সমন্বিত করিয়া উপন্যাসের পরিমণ্ডলে এক একটি অণুর বিশ্বরচনার দক্ষতায় বঙ্কিমচন্দ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের সমগোত্রীয়। তাঁহার উপন্যাসগুলির কাহিনী-

পরিকল্পনা এবং গঠন-রীতি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সমগ্র রচনার মধ্যে কতগুলি সাধারণ লক্ষণ পাওয়া যায়। তাঁহার উপন্যাসে পরিচ্ছেদগুলির বিন্যাস দেখিলে মনে হয় রচনায় হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বেই তিনি কাহিনীর গঠন সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা স্থির করিয়া লইতেন। তাঁহার প্রতিটি উপন্যাসেই কাহিনীর গতি অতিশয় ক্ষিপ্র এবং প্রধানতঃ ঘটনাশ্রয়ী। বিস্তৃত মনোবিশ্লেষণের সাহায্যে চরিত্রগুলির অন্তর্লোকের পরিচয় উদ্ঘাটন না করিয়া তিনি বিরোধী ঘটনার সংঘর্ষের মাধ্যমে চরিত্রের রূপ স্পষ্ট করিয়া তোলেন। তাঁহার সমস্ত উপন্যাসেই এইরূপ নাটকীয় বর্ণনাভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের গদ্যময় বাস্তবতার উপরে কদাচিৎ নির্ভর করিয়াছেন। সমসাময়িক জীবনের আবহের পরিবর্তে অধিকাংশ উপন্যাসেই তিনি দূর-বিস্তৃত ইতিহাসের পটভূমি আশ্রয় করিয়াছেন। কৃষ্ণকান্তের উইল বা বিষবৃক্ষের মতো উপন্যাস—যেখানে প্রায় সমসাময়িক কালের সামাজিক পটভূমিই ব্যবহৃত হইয়াছে—সেখানেও সূক্ষ্ম কৌশলে কাহিনীর মধ্যে বাস্তবাতিরিক্ত কল্পনার মায়া সৃজনের সুযোগ করিয়া লইয়াছেন। উপন্যাসের নায়ক চরিত্র পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনাদর্শ অনেক পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে। সবল পৌরুষদৃপ্ত এবং জীবনের প্রতি সুস্থ মানবিক আগ্রহসম্পন্ন নায়ক-চরিত্র পরিকল্পনা তাঁহার উপন্যাসের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। নায়িকা-চরিত্রগুলিতে ব্যক্তিত্বের মহিমান্বিত রূপ, সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য এবং হৃদয়-বৃত্তির প্রচণ্ডতা আশ্চর্য দক্ষতায় তিনি রূপবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই সমস্যাগুলি দেখা দিয়াছে প্রেম নামক হৃদয়বৃত্তিকে-কেন্দ্র করিয়া। "পুরুষ ও নারীর সম্পর্কঘটিত এই যে বিরাট ও জটিল সমস্যা, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় ইহার শেষ নাই। এই রহস্যকে স্বীকার এবং ইহাকে ভেদ করিয়া—দেহ ও আত্মা, রূপ ও রস শক্তি ও অশক্তির দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হইবার যে সংগ্রাম, কবি বঙ্কিমের প্রাণ মনের প্রতিভা তাহাতেই স্ফুরিত হইয়াছে।"—(মোহিতলাল)

বিষয়বস্তুর দিক হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়।—(১) ঐতিহাসিক পটভূমি এবং ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত উপন্যাস। (২) সমকালীন সমাজের বাস্তব পটভূমি এবং গার্হস্থ্যজীবন আশ্রিত উপন্যাস। (৩) আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত উপন্যাস।

৩। প্রশ্ন : বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের কিরূপ আদর্শ স্বীকৃত হইয়াছে তাহা নির্ণয় কর।

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬২]

অথবা, **বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বাংলা সাহিত্যে ঐ জাতীয় উপন্যাসের একটি ধারাবাহিক বিবরণ দাও।**

[ক. বি. ১৯৬৬]

উত্তর : ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যবহার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের একটি সাধারণ লক্ষণ। ইতিহাস হইতে উপন্যাসের বিষয়বস্তু সংগ্রহে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবণতার কতকগুলি কারণ অনুমান করা যায়। সুকুমার সেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর উপর ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক রচনার প্রভাব নির্দেশ করিয়াছেন। ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স রচনার একটা দৃষ্টান্ত এই কাহিনীটিতে ভূদেব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এমন হইতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেবের দৃষ্টান্তেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কিংবা হয়ত তদানীন্তন কালের বাংলা দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্কটের উপন্যাসগুলির প্রভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র অতীত ইতিহাসের পটভূমি লইয়া উপন্যাস-রচনায় আগ্রহী হইয়াছিলেন। ইহার চেয়েও গভীরতর কারণ খুঁজিতে গেলে মনে হয়, ইংরেজদের দ্বারা রচিত বিকৃত ইতিহাসের প্রভাব অতিক্রম করিয়া স্বদেশের অতীত হইতে এক একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় উপন্যাসের মধ্যে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পিমনের দিক হইতে দেখিলে বলা যায়—সমসাময়িক কালের বাঙালী সমাজের কীর্তিহীন, বর্ণহীন পটভূমি তাঁহার বলিষ্ঠ কল্পনার পক্ষে আকর্ষণীয় বোধ হয় নাই। ঘটনার বিচিত্র তরঙ্গে আন্দোলিত ইতিহাসের বর্ণবৈভবপূর্ণ পটভূমির মধ্যেই তাঁহার সৃষ্টিকল্পনা অবাধ বিচরণের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে অবিমিশ্র ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু ব্যবহৃত হইয়াছে দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) মৃণালিনী (১৮৬৯) এবং রাজসিংহ—এই তিনটি উপন্যাসে। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস এবং তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসের সহিত তুলনা করিলে ইহার গঠনে, কাহিনীবিন্যাস-ভঙ্গিতে হয়ত ত্রুটি চোখে পড়িলেও পড়িতে পারে, কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনার অক্ষম প্রচেষ্টার অবসান ঘটাইয়া এই নূতন শিল্প-মাধ্যমটিকে বাংলায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। এই উপন্যাসের প্রধান চারিটি চরিত্র আয়েষা, তিলোত্তমা, ওসমান এবং জগৎসিংহকে লইয়া যে প্রেমের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে কোন জটিলতা নাই। যুদ্ধ বিগ্রহের অশান্ত পরিবেশের পটভূমিতে স্থাপিত হওয়ায় চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং

প্রেম ও ঈর্ষার সংঘাত নাটকীয় রূপ লাভ করিয়াছে। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে মানসিংহ এবং কতলু চরিত্র দুটি ঐতিহাসিক, কিন্তু কাহিনীর মধ্যে ইহাদের ভূমিকা গৌণ। ঐতিহাসিক তথ্যের বন্ধন এই উপন্যাসে স্বীকৃত হয় নাই। ইতিহাসের রূপরেখাটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনার অবাধ প্রসারের পূর্ণ স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন।

মৃণালিনীর পটভূমি ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলা দেশ। সতেরো জন মাত্র অশ্বারোহী সৈনিকের নিকট বাংলার হিন্দু রাজা পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এই প্রায় অবিশ্বাস্য কাহিনীটি বঙ্কিমচন্দ্র এখানে নূতন ভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন। বিশ্বাসঘাতকতাকেই বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ ঘটনার কারণরূপে নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন। যে সময়ের ইতিহাস মৃণালিনীর পটভূমি—তাহার কোন যথার্থ বিবরণ পাওয়া যায় না। ফলে তথ্যনিষ্ঠার বাধ্যবাধকতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মৃণালিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রগুলির সম্পর্কের মধ্যে জটিলতাসৃষ্টিতে যে অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছেন, পশুপতি ও মনোরমার প্রেমের কাহিনীটি ইহার প্রমাণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' এবং 'রাজসিংহ' আজও ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ হইয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে একমাত্র রাজসিংহকেই যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস মনে করিতেন। এই উপন্যাসে শুধু কাহিনীর পটভূমিরূপেই যে ইতিহাস ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নহে, ঐতিহাসিক যুগের সামগ্রিক জীবনধারা প্রত্যক্ষ করিয়া তোলা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য। ঔরংজেব ও রাজসিংহের ইতিহাস—প্রবল পরাক্রান্ত মোগল রাজ-শক্তির গ্রাস হইতে রাজপুত জাতির আত্মরক্ষার ইতিহাস। রাজসিংহের হস্তে ঔরংজেবের লাঞ্ছনা হইতে সেই দুর্ধর্ষ মোগল সম্রাটের পতনের সূচনা হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের ইতিহাসের এক ক্রান্তি-ক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসই এই উপন্যাসে বিষয়বস্তু রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনাবর্তের ফাঁকে ফাঁকে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাপ্রসূত ব্যক্তিচরিত্রগুলি দুর্যোগের বজ্রাগ্নিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহারা প্রধান হইয়া ওঠে নাই। এত দ্রুত ধাবমান ঐতিহাসিক ঘটনা-ধারার মধ্যে দরিয়া, বা মোবারক বা জেবউন্নিসার বিদীর্ণ হৃদয়ের হাহাকার আমাদের চমকিত করিয়া তোলে এবং ইতিহাসের রথচক্রই যে তাহাদিগকে নিষ্পিষ্ট করিতেছে—এই ধারণা জাগাইয়া তোলে। ঐতিহাসিক উপন্যাস কখনোই পুনর্লিখিত ইতিহাস মাত্র নয়। অতীতের ঘটনাগুলির মধ্যে প্রাণ-সঞ্চারের জন্য ঘটনাগুলির মধ্যে কার্যকারণ-সূত্র রচনা করিতে হয়। আদ্যন্ত যুক্তিশৃঙ্খলায় সংবদ্ধ অখণ্ড কাহিনীর মধ্যে একটি যুগের ইতিহাসের সামগ্রিক রূপ সংহতভাবে তুলিয়া

ধরিয়া এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। দ্রুত ধাবমান বহু শাখা সম্বলিত ঘটনার ধারা এবং ব্যক্তি-চরিত্রগুলির স্বতন্ত্র রূপান্তরের ধারা উভয়কে একটি পরিকল্পনায় সমন্বিত করিয়া খণ্ডে খণ্ডে, পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে সমগ্র কাহিনীটিকে বঙ্কিমচন্দ্র নিপুণ স্থপতির মতো গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের গঠনগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে একসঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয় বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব করিতে হইয়াছে—কেহ কাহারও অগ্রবর্তী না হয় এ বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের দুখানি প্রধান উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' ও 'চন্দ্রশেখর'-এ ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। দুটি উপন্যাসের মূল কাহিনী পারিবারিক এবং সামাজিক বৃত্তের মধ্যে কেন্দ্রিত, কিন্তু নিপুণ কৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র এই পারিবারিক কাহিনীর চার পাশে দূর বিস্তারিত ইতিহাসের বর্ণাঢ্যতা রচনা করিয়া তুলিয়াছেন। প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের কাহিনীর সহিত দুর্ভাগা নবাব মীরকাশেমের ভাগ্যবিপর্যয় ও তদানীন্তন রাজনীতির কুটিল, আবর্তসংকুলতা যুক্ত হওয়ায় চন্দ্রশেখর সামাজিক উপন্যাসের সীমা অতিক্রম করিয়া ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সের পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। রচনার কালানুক্রম অনুযায়ী কপাল-কুণ্ডলা (১৮৬৬) বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস এবং এই উপন্যাসেই বঙ্কিম-চন্দ্রের সৃষ্টিক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটির কাহিনী সাধারণ নয়। আরণ্য প্রকৃতির পরিবেশে লালিত কপালকুণ্ডলাকে সমাজের মধ্যে স্থাপন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটা বিচিত্র ভঙ্গিতে যেন আমাদের সামাজিক সংস্কারগুলির মূল্য বিচার করিতে চাহিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা চরিত্রটিকে ঘিরিয়া তাঁহার অত্যুচ্চ কবিত্ব শক্তি পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। রহস্যময় সৌন্দর্যের মূর্তি কপালকুণ্ডলা এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। নবকুমার তাহাকে বিবাহের সূত্রে সাধারণ জীবনের মধ্যে একান্তভাবে পাইতে চাহিয়া যে ট্র্যাজেডির সম্মুখীন হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যার অতীত। কাহিনীটির মধ্যে পারিবারিক জীবনের বাস্তব আবহ বা ইতিহাসের ঘটনাবর্ত—কোনটাই প্রধান হইয়া ওঠে নাই। প্রকৃতি-পালিতা মানসকন্যা কপালকুণ্ডলার রহস্য-বিজড়িত সৌন্দর্য-মূর্তি রচনাই এখানে কবি বঙ্কিমের প্রধান লক্ষ্য। তবুও উপন্যাসটিতে কাহিনীর জটিলতা সৃষ্টির জন্য মতিবিবি চরিত্রের সূত্রে ঐতিহাসিক উপকরণ ব্যবহার করিয়া ইহার মধ্যে ইতিহাস-রস সঞ্চার করিয়াছেন। তাই এক অর্থে ইহাকে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স বলা চলে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ রচনা সীতারাম উপন্যাসের সহিত ইতিহাসের যোগ ক্ষীণ। এখানে প্রধানত জনশ্রুতির উপর লেখক নির্ভর করিয়াছেন; তাই সীতারামকে ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করা চলে না।

৪। প্রশ্ন: বঙ্কিমচন্দ্রের গার্হস্থ্য জীবন বিষয়ক উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এই শ্রেণীর রচনায় ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠত্বের কি নিদর্শন দেখা যায় তাহা নির্ণয় কর। [ক. বি. বি এ. পার্ট ওয়ান. ১৯৬৬]

উত্তর: সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে ব্যক্তির জীবনসমস্যার এবং অবিমিশ্র-ভাবে বাস্তব জীবনের পটভূমি ব্যবহারে খাঁটি নভেল রচনার দৃষ্টান্ত 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), '**কৃষ্ণকান্তের উইল**' (১৮৭৮), [ক. বি. ১৯৬৭] এবং 'রজনী' (১৮৭৭) —এই তিনটি উপন্যাস। সমাজবাস্তবতা-নির্ভর উপন্যাসরচনার ধারা সূচিত হইয়াছিল 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি কোন এক নির্দিষ্ট বক্তব্যের সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে না পারিলে নভেল হইয়া ওঠে বিচ্ছিন্ন ঘটনা চিত্র। এইরূপ শিল্পগত ত্রুটি 'আলালের ঘরের দুলাল' এ সহজলক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্রই ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট ধারণার ভিত্তিতে আখ্যানের মধ্যে পূর্বাপর সামঞ্জস্য এবং কেন্দ্রীয় সংহতি রক্ষা করিয়া নভেলের শিল্পগত সমস্যার সমাধান করেন। একটু বিশ্লেষণ করিলেই বঙ্কিমচন্দ্রের দুখানি সামাজিক উপন্যাস বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইলের মূল সমস্যাগুলির মধ্যে মিল পাওয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই বিবাহিত নায়ক দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা রক্ষার নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে রূপলাবণ্যময়ী বাল-বিধবা প্রতিনায়িকার প্রতি রূপজ মোহের জন্য। কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রনাথের মোহ এবং রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের মোহ প্রায় একই ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। সূর্যমুখী এবং ভ্রমরের মধ্যে ব্যক্তিত্বের দুটি রূপ দেখা যায়। সূর্যমুখী নীরব দুঃখ বরণের মধ্য দিয়া যে মর্যাদালাভ করিয়াছে তাহার দুঃখা-হত সেই প্রেমই নগেন্দ্রনাথের মনে আত্মধিক্কার জন্মাইয়া সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে। অন্যপক্ষে ভ্রমরের ব্যক্তিত্বের জন্যই গোবিন্দলাল তাহাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে না পারিয়া মানসিক সঙ্কটে পীড়িত হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই ফল হইয়াছে নায়কের প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব। কুন্দনন্দিনী এবং রোহিণীর মৃত্যুতে উপন্যাস দুটির কাহিনী গ্রন্থিমুক্ত হইয়াছে। 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে ঘটে নাই এবং ইহা অনিবার্য ছিল বলিয়াই মনে হয় না। আর কৃষ্ণ-কান্তের উইলে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে রোহিণীর শোচনীয় মৃত্যুতে বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিপরায়ণ মনেরই পরিচয় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই ঘটনা দুটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পবোধ এবং নীতিবোধের দ্বন্দ্ব প্রকট হইয়া

উঠিয়াছে এইরূপ সমালোচনা করা হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ শিল্পের দিক হইতে এই ত্রুটি যদি মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেও উপন্যাস দুটিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহার মূল্য বিন্দুমাত্র কমে না। প্রেম এবং রূপমোহ দুই বিপরীত শক্তির মতো নগেন্দ্রনাথ এবং গোবিন্দলালের মনের জগতে বিপরীত আবেগের তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই তাহাদের ব্যক্তিস্বরূপের অনন্যসদৃশ রূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অন্যপক্ষে যুগ্মনারী চরিত্রের মাধ্যমে আদর্শ দাম্পত্য প্রেম এবং প্রবৃত্তিতাড়িত রূপমোহ রূপায়িত হইয়াছে। তাই সূর্যমুখী-ভ্রমর এবং কুন্দ-রোহিণীর—প্রত্যেকে নিজেদের হৃদয়গত সমস্যার জটিলতা লইয়া নারী-ব্যক্তিত্বের অনন্যসদৃশতায় মণ্ডিত। সামাজিক মূল্যবোধের স্থির আদর্শের সহিত এইসব চরিত্রের সংঘর্ষে উপন্যাসের বিশাল পটভূমি তরঙ্গমুখর হইয়া উঠিয়াছে। দুই উপন্যাসেই কাহিনীর গতি অতিমাত্রায় ক্ষিপ্র এবং প্রধানতঃ ঘটনা-নির্ভর।

আঙ্গিকের বৈচিত্র্যের দিক হইতে 'রজনী' উপন্যাসটিও গুরুত্বপূর্ণ। রজনীতে লেখক সাধারণ উপন্যাসের মতো নিজে কাহিনী বর্ণনা না করিয়া চারিটি প্রধান চরিত্রের আত্মবিবরণের মাধ্যমে কাহিনীটি উপস্থাপন করিয়াছেন। উপন্যাসের অন্ধনায়িকা 'রজনী' চরিত্রে লর্ড লিটন প্রণীত Last Days of Pompei উপন্যাসটির 'নিদিয়া' চরিত্রটির প্রভাব আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান উপন্যাসগুলির সহিত রজনীর নাম করা হয় না, কিন্তু এই উপন্যাসে শচীশ রজনী এবং লবঙ্গলতা-অমরনাথের দুই বিপরীতধর্মী প্রেমের কাহিনী রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

৫। প্রশ্ন: বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বমূলক উপন্যাসগুলির পরিচয় দাও।

উত্তর: চিন্তানায়ক এবং তত্ত্বদর্শী বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষার পরিচয় আছে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি রচনায়। 'বিবিধ-প্রবন্ধের বহু প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র জাতির উদ্দেশ্যে দেশাত্মবোধের বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের এই দিকটিরই পরিচয় পাওয়া যায় 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪) এবং 'দেবী-চৌধুরাণী' (১৮৮৪) উপন্যাসে। আনন্দমঠে তিনি উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে দেশপ্রেম এবং দেশাত্মবোধের আদর্শ চিত্র আঁকিয়াছেন। নিষ্কাম কর্মব্রতী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্বদেশী আন্দোলনের যুগে প্রেরণার উৎসস্বরূপ হইয়াছে। আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মাতৃবন্দনা 'বন্দেমাতরম্' গানটি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদালাভ করিয়াছে। 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্যই রচিত হইয়াছিল। অতি সাধারণ পরিবারের কন্যা প্রফুল্ল ভবানী-পাঠকের শিক্ষার গুণে গীতার নিষ্কামকর্মের আদর্শ এবং পারিবারিক কর্তব্যের

আদর্শ আত্মস্থ করিয়া এক অসাধারণ চরিত্রে পরিণত হইয়াছে। উপন্যাসটি অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য ঘটনায় পরিপূর্ণ। স্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলক এইসব রচনায় শিল্প নীতি পদে পদে লঙ্ঘিত হইয়াছে। তাই উপন্যাস হিসাবে 'দেবী-চৌধুরাণী'র সাহিত্যিক মূল্য নিতান্তই নগণ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই বাংলা উপন্যাসের একটি ধ্রুপদী আদর্শ গড়িয়া উঠিল। কাহিনীর গঠন, চরিত্র-পরিকল্পনায় বিমিশ্রতা, নির্দিষ্ট বক্তব্যের দৃঢ়-বন্ধনে সমগ্র কাহিনীর মধ্যে অসাধারণ সংহতিসাধন এবং বিষয়বস্তুর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষার ঐশ্বর্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সাহিত্যের এই শাখাব এক অক্ষয় সম্পদ। তাঁহারই প্রতিভার সামর্থ্যে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসেব শিল্পমাধ্যম স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

৬। প্রশ্ন : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার সাহিত্য-কীর্তির বৈশিষ্ট্য দেখাও। [ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬২]

অথবা,. **উপন্যাসক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের দানের মূল্য নিরূপণ কর।**

[ঐ, ১৯৬৩]

উত্তর : ৩ ও ৪ নং প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে লিখ।

৭। প্রশ্ন : বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র দত্তের কীর্তির পরিচয় দাও।

উত্তর : ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, এবং অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণায় রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষাই ছিল তাঁহার জ্ঞানচর্চার মাধ্যম। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় এই মনীষী মাতৃভাষায় সাহিত্যসাধনায় উৎসাহী হইয়া উঠেন। রমেশচন্দ্রের সাহিত্যরুচি এবং শিল্পবোধও একান্তভাবে বঙ্কিমপ্রভাবিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অনুগামী লেখক-দের মধ্যে তিনি যে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ছাত্রজীবন হইতেই ইতিহাস ছিল রমেশচন্দ্রের সবচেয়ে প্রিয় বিষয় এবং ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসগুলি পাঠ করিয়া ইতিহাসের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। স্বভাবতঃই যখন নিজে উপন্যাসরচনায় ব্রতী হইয়াছেন তখন স্কটের আদর্শ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্কট এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ও স্বীয় ইতিহাসপ্রীতির বশে রমেশচন্দ্র উপন্যাস রচনায় ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর প্রতিই আকৃষ্ট হইয়াছেন। **বঙ্গবিজেতা** (১৮৭৪), **মাধবীকঙ্কণ** (১৮৭৭), [ক. বি. ১৯৬৭], **মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত** (১৮৭৮) ও **রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা** (১৮৮৯)—এই চারখানি উপন্যাসে রমেশচন্দ্র সুপরিকল্পিতভাবে মুঘলযুগের একশত

বৎসরের পটভূমি ব্যবহার করিয়াছেন। স্কটের রচনার সহিত রমেশচন্দ্রের রচনার তুলনা প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা প্রধান আকর্ষণ এই যে, ইহারা আমাদিগকে এই নীরস যন্ত্রবন্ধ, বণিগ্‌ধর্মী জীবন হইতে অতীতের এক বীরত্বপূর্ণ, গৌরব-মণ্ডিত যুগে লইয়া যায়, যেখানে আমরা একটি মুক্ততর বিশালতর জীবনের আস্বাদ পাই, সেখানে জীবন দুইটি পরস্পর বিরোধী মহান আদর্শের দ্বন্দ্ব ক্ষেত্র, যেখানে কেবল বাঁচিয়া থাকিবারই প্রবল চেষ্টায় মানুষের সমস্ত জীবন-শক্তি ব্যয়িত হইত না। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসেও আমরা বিপৎ-সংকুল, গৌরবময় বীরত্বকাহিনীপূর্ণ অতীত যুগে নীত হই। এই হিসাবে রমেশচন্দ্র স্কটের পাশে স্থান পাইবার যোগ্য।' রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস চারিটির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার তারতম্য আছে। প্রথম দুইটি উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' এবং 'মাধবীকঙ্কণে' ইতিহাসের কাঠামোটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাহিনী পরিকল্পনায় তিনি কল্পনার উপরেই বেশি নির্ভর করিয়াছেন। আকবরের রাজত্বকাল 'বঙ্গবিজেতার' পটভূমি আর 'মাধবীকঙ্কণে'র পটভূমি সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকাল। আকবরের রাজত্বকালে বাংলাদেশের শাসনকর্তা টোডরমল-এর বিরুদ্ধে জমিদার অমরসিংহের বিদ্রোহের ইতিহাস বঙ্গবিজেতায় ব্যবহৃত হইয়াছে। বঙ্গবিজেতার চেয়ে মাধবীকঙ্কণে ইতিহাস-নির্ভরতা অপেক্ষাকৃত কম। এই উপন্যাসের কাহিনী পরিবার-কেন্দ্রিক, নায়ক নরেন্দ্রনাথের গৃহত্যাগের সূত্রে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পরোক্ষভাবে মাধবীকঙ্কণে স্থান পাইয়াছে। 'বঙ্গবিজেতা' তথ্যাভাব পীড়িত অস্বচ্ছন্দ রচনা। লেখক এখানে সংগৃহীত উপকরণগুলি সৃষ্টি-কল্পনার স্পর্শে একটি অখণ্ড অবয়বের মধ্যে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে সক্ষম হন নাই। বঙ্গবিজেতার তুলনায় মাধবীকঙ্কণ উৎকৃষ্টতর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। পারিবারিক জীবনের বৃত্তের সহিত ঐতিহাসিক পটভূমির বর্ণোজ্জ্বল বিচিত্রতা যুক্ত হওয়ার দ্বিতীয় উপন্যাসটি যথার্থ রোমান্স-এর স্তরে উন্নীত হইয়াছে। মাঝে মাঝে কল্পনার বিশালতা এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্যসৃষ্টির পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে করাইয়া দেয়। ইতিহাসকে বিকৃত না করিয়া তথ্যের বন্ধন স্বীকার করিয়াও যে বিন্যাসের কৌশলে অতীতকে প্রাণময় এবং সৌন্দর্যপূর্ণ করিয়া তোলা যায়—'মাধবীকঙ্কণে' মুঘল দরবার ও হারেমের বর্ণনায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্রের পরিণত প্রতিভার পরিচয় 'জীবনপ্রভাত' এবং 'জীবন-সন্ধ্যা' উপন্যাস দুইটিতে। অবিমিশ্র ইতিহাসের ব্যবহারের দৃষ্টান্তরূপ এই উপন্যাস দুটি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া আছে। 'জীবন-প্রভাতে'র বিষয়বস্তু ঔরংজেবের রাজত্বকালে শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের জাতীয় জাগরণ। আর জীবন-সন্ধ্যার বিষয়বস্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে অস্তায়মান রাজপুত-জীবনের

শেষ গৌরবময় দিনগুলি। উনবিংশ শতাব্দীর দেশাত্মবোধমূলক কাব্য উপন্যাসে সদ্যোজাগ্রত স্বদেশপ্রেম অতীতের মহারাষ্ট্র এবং রাজপুতনার ইতিহাসের আবরণে প্রকাশ করার রীতিই রমেশচন্দ্র অনুসরণ করিয়াছেন এই উপন্যাস দুইটিতে। মহারাষ্ট্রের জাতীয় জাগরণ ও রাজপুতনার পতনের যুগের ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায়। দেশপ্রীতি, জাতিপ্রেম এবং বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের সেই ইতিহাস রমেশচন্দ্রের কল্পনার স্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটি ঐতিহাসিক যুগের রূপ সামগ্রিকভাবে পরিস্ফুট করিয়া তোলার দিকেই রমেশচন্দ্র এখানে সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র বা জীবন সমস্যা স্বভাবতঃই এই ধরনের উপন্যাসে গুরুত্ব পাইতে পারে না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের রহস্যময়তা এই উপন্যাস দুটির কোথায়ও নাই, নিছক তথ্য গাঁথিয়া গাঁথিয়া একটি যুগের সামগ্রিক রূপ অখণ্ড আকারের মধ্যে রূপায়িত করিয়া তোলা হইয়াছে। এমন বিপুল তথ্যের সুনিপুণ বিন্যাসে রমেশচন্দ্র যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণযোগ্য। পুঞ্জিত তথ্যের বিপুলতা সত্ত্বেও উপন্যাস দুইটিতে শেষপর্যন্ত পাঠকের আগ্রহ অক্ষুণ্ণ থাকে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতোই সামাজিক উপন্যাসেও রমেশচন্দ্র সৃষ্টি-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪) নামক সামাজিক উপন্যাস দুটিতে রমেশচন্দ্র দত্তের ভাবাবেগবর্জিত বস্তুনিষ্ঠ মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। 'সংসার' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যা বিধবাবিবাহ এবং 'সমাজ' নামক উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় সমস্যা অসবর্ণ বিবাহ। উভয় ক্ষেত্রেই রমেশচন্দ্রের প্রগতিশীল মনের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেমন তাঁহার অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়,—এই সামাজিক উপন্যাস দুইটিতে তেমনই বাস্তবজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। গদ্যময় বাস্তবতার উপরে একান্ত-ভাবে নির্ভর করিয়া 'সমাজ' ও সংসার' গ্রন্থদ্বয়ে রমেশচন্দ্র খাঁটি নভেল-রচয়িতা হিসাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়া রমেশচন্দ্রের প্রতিভাকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মনে হইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অসাধারণ কল্পনাশক্তির ঐশ্বর্য তাঁহার প্রতিভায় ছিল না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই তাঁহাকে স্থান দেওয়া যায়।

৮। প্রশ্ন : বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তাহার বিকাশের ধারাটি অনুসরণ কর।

[ক. বি. ১৯৬৬]

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'উপন্যাস'—নূতন কালের ফসল। বাংলা উপন্যাসের জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসের উপাদান অবলম্বনে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত হানা ক্যাথারিন মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টা। একদিকে যেমন প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর বা কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে হুতোম পঁ্যাচার প্রচেষ্টায় বাংলা সামাজিক উপন্যাসের উদ্ভবের পথ ক্রমশ সহজ হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখনীমুখেও ঐতিহাসিক উপন্যাসের আগমন বার্তা ঘোষিত হইয়াছিল। ইতিহাসের রোমান্স লইয়া রচিত ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থ ১৮৫৭ খৃঃ প্রকাশিত হয়। ইহাতে আছে দুইটি কাহিনী : প্রথমটি 'সফল স্বপ্ন'—একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাত্মক আখ্যান এবং দ্বিতীয়টি 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'—উপন্যাসধর্মী রচনা। এই উপন্যাসটিতে অর্ধ-ঐতিহাসিক কাহিনী আছে বটে তবে তাহা বিকৃত নহে ; সুতরাং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-কেই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রাথমিক প্রয়াস বলা চলে।

[ইহার পর ৩নং ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর অংশ যোগ করিতে হইবে]

৯। প্রশ্ন : **শরৎচন্দ্রের প্রধান উপন্যাসগুলির পরিচয় দাও এবং বাংলা উপন্যাসের সমৃদ্ধিসাধনে তাঁহার কৃতিত্ব বিষয়ে আলোচনা কর।**

অথবা, **শরৎচন্দ্র ছিলেন প্রকৃতই একজন দরদী কথাশিল্পী। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তসহ এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদন কর।**

[ব. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান ১৯৬২]

উত্তর : জনপ্রিয়তায় শরৎচন্দ্র বাঙালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় লেখক। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের পাঠকসমাজে তাঁহার অপরিসীম সমাদর অক্ষুণ্ণ আছে। শরৎচন্দ্রের এই অসাধারণ জনপ্রিয়তার হেতু অনুসন্ধান করিতে গেলে তাঁহার উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং তাঁহার রচনাভঙ্গির বিশিষ্টতা বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। উপন্যাসে সামাজিক পটভূমির ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে 'আলালের ঘরের দুলালে'র যুগ হইতেই শুরু হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনায় রূপান্তরশীল সমাজ এবং ব্যক্তির জীবন-সমস্যার নানামুখী জটিলতার প্রায় সর্বায়ত রূপ ধরা পড়িয়াছিল। সুতরাং সমাজজীবনের কাহিনীকার রূপে শরৎচন্দ্র পথিকৃতের মর্যাদা দাবি করিতে পারেন না। তবুও তাঁহার রচনায় পূর্বগামী লেখকদের তুলনায় যে একটি সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে। দৃষ্টিভঙ্গির এই স্বাতন্ত্র্যই

শরৎচন্দ্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথে আমাদের সমাজের যে সমস্যাগুলি ধরা দিয়াছে—তাহা অনেক পরিমাণে সাধারণীকৃত এবং তাঁহাদের রচনায় আবহের মধ্যে সেই মানসিক সমস্যাগুলি একান্তভাবে বাঙালী জীবনের সহিত সংবন্ধ হইয়া থাকে নাই। অর্থাৎ তাঁহারা বাঙালী জীবনের মধ্য হইতে যে চরিত্রগুলি নির্বাচন করিয়া লইয়াছেন তাহাদের মধ্যে চিরকালের মানব-জীবনের সাধারণ সমস্যাই স্থান লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকারা বাঙালী লইয়াও এক অর্থে বিশ্বমানবেরই প্রতিভূ। এই আদর্শায়িত চরিত্রগুলিকে শেষপর্যন্ত আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের বাস্তব-মৃত্তিকা হইতে দূরবর্তী মনে হয়। অন্যপক্ষে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি একান্তভাবে বাঙালী জীবনেরই কেন্দ্রে নিবদ্ধ। বাঙালীর জাতিগত প্রকৃতি, তাহার সমাজ-বন্ধনের বিশিষ্টতা, বাঙালীর রক্তে মজ্জায় মিশ্রিত সামাজিক প্রথার আনুগত্য এবং সেই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে অভিমানক্ষুব্ধ বিদ্রোহ সর্বপ্রকার সরলতা-দুর্বলতা লইয়া বাঙালীর যাহা প্রকৃত এবং বিশিষ্ট রূপ শরৎচন্দ্রের শিল্পী-সত্তা একান্তভাবে তাহারই মধ্যে সৃষ্টির উপকরণ খুঁজিয়াছে। মহত্ত্ব এবং নীচতার কোন বিমূর্ত ধারণা তিনি কল্পনা করিয়া লন নাই। আমাদের জীবনের প্রত্যক্ষ পটভূমিতে নিতান্ত সাধারণ ঘটনার মধ্যে মানবিক মহত্ত্ব এবং মনুষ্যত্বের অপচয়ের যে-সব দৃষ্টান্ত সহজেই চোখে পড়ে তিনি তাহারই উপরে একান্ত ভাবে নির্ভর করিয়া চরিত্র গড়িয়াছেন। বাঙালী জীবনে যাহা নাই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও তাহা নাই। তাই শরৎচন্দ্রের রচনায় বাঙালী পাঠক আজন্মের পরিচিত জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া তৃপ্তিবোধ করিয়াছে। যেখানে তাহার বেদনা শরৎচন্দ্র সেই স্থানগুলি করুণতর করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন, যেখানে তাহার মহত্ত্ব শরৎচন্দ্র তাহার উপরে গৌরবের কনক-কিরীট পরাইয়া দিয়াছেন, যে ক্ষুদ্রতায় নীচতায় বাঙালী সমাজ পীড়িত, শরৎচন্দ্র তাহার নগ্ন চিত্র আঁকিয়া জাতির আত্মগ্লানি জাগাইয়া তুলিয়াছেন। বাঙালী পাঠক তাঁহার উপন্যাসে নিজেরই জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছে। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার মূল কারণ এইটি। তাঁহার জনপ্রিয়তার আর একটি হেতু গল্পের রস জমাইবার অসাধারণ দক্ষতা। সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করিলে শরৎচন্দ্রের রচনার ভাষায় নানাবিধ ত্রুটি আবিষ্কার করা যায়, কিন্তু সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁহার ভাষা গল্পের নিবিড় রসধারা বহনের দিক হইতে অসামান্য শক্তিসম্পন্ন। এই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ভাষার গুণেই তাঁহার কাহিনীগুলি শেষপর্যন্ত পাঠকের অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া রাখে। চরিত্রের অন্তর ও বাহিরের রূপ ধীর মন্থর ভঙ্গিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি অনায়াসে প্রত্যক্ষবৎ করিয়া তুলিতে পারিতেন। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব যেমনই হউক না কেন—উপন্যাসের প্রথম গুণ পাঠোপযোগিতা ; যে-কোন গল্পকেই পাঠযোগ্য রূপে

পরিবেশন করিবার সহজাত ক্ষমতা শরৎচন্দ্রের ছিল। ভাষার গুণে পাঠককে সহজে গল্পের মর্মবস্তুর মধ্যে নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিতেন সাধারণ বাঙালী জীবনের সহিত নিবিড় পরিচয় এবং এই ভাষাভঙ্গির বিশিষ্টতার জন্যই শরৎচন্দ্র বাঙালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়।

শরৎচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে আর তাহা। শেষ উপন্যাস 'বিপ্রদাস' প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯৩৫ সালে। তাঁহার এই বাইশ বৎসরের সাহিত্যিক জীবনে তিরিশখানি উপন্যাস ও গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে রচনানৈপুণ্য এবং বিষয়বস্তুর গুরুত্বে 'শ্রীকান্ত ৪র্থ খণ্ড,' 'দেবদাস', 'পল্লীসমাজ', 'চরিত্রহীন,' গৃহদাহ' এবং 'দেনাপাওনা'- বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা। আঙ্গিকের দিক হইতে শ্রীকান্ত শুধু শরৎ সাহিত্যই নহে—সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই অনন্য উপন্যাস। এখানে চারিটি খণ্ডে অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বিবৃত হইয়াছে। আত্ম জীবনীর রচনাভঙ্গিতে কাহিনীর নায়ক শ্রীকান্তের জবানীতে কাহিনীগুলি বলা হইয়াছে। শ্রীকান্ত চরিত্রে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত চরিত্রের ছায়া স্পষ্ট এবং এইজন্য ইহাকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসও বলা যায়। যে সব খণ্ড খণ্ড episode রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে যোগসূত্র শ্রীকান্তের চরিত্রটি। শ্রীকান্তের কোন সক্রিয় ভূমিকা নাই, কাহিনীগুলির গতি সে কোন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নাই। উৎসুক সহানুভূতিশীল মন লইয়া এই ছন্নছাড়া মানুষটি জীবনের পথে যাযাবরের মতো ঘুরিয়াছে। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাহার মনের ঝুলি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে অবশ্য রাজলক্ষ্মী চরিত্রটিকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া ওঠা কাহিনীর বৃত্তটি প্রধান এবং এই কাহিনীটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের কাহিনীর আকার লাভ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর কাহিনীটিকে মূল প্রসঙ্গরূপে গ্রহণ করিলে আর যে-সব উপকাহিনী থাকে তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'অন্নদা দিদি'র গল্প। রচনা-সৌন্দর্যে 'শ্রীকান্তের' প্রথম খণ্ডটিই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। শরৎচন্দ্রের শিল্পী-মনের পরিচয় বুঝিবার পক্ষে চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ শ্রীকান্ত উপন্যাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা।

বাঙালী সমাজের মধ্যে নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কে এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর সম্বন্ধ এবং ন্যায়নীতি-সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাগুলি যে বিশ্বাস এবং সংস্কারের উপরে প্রতিষ্ঠিত, শরৎচন্দ্র তাহার মূল্য যাচাই করিতে চাহিয়াছেন। এই বিচার-বিশ্লেষণে বুদ্ধির পথে নহে, একান্তভাবে মানবিক হৃদয়বৃত্তির দিক হইতেই তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। ব্যক্তি চরিত্রগুলি সদ্য মানবিক হৃদয়বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু

তাহার উন্মীলনের পথ সংস্কারের পথে অবরুদ্ধ হওয়ায় হৃদয়ের মধ্যে রক্ত ক্ষরিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র বিশেষভাবে নারীচরিত্রগুলিতে এই রক্তাক্ত হৃদয়ের ছবি পরম সহানুভূতির সহিত রচনা করিয়া তুলিয়াছেন। নারী-চরিত্রগুলির পরিণাম আমাদের প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের অন্তঃসার-শূন্যতা প্রকট করিয়া তোলে। এই প্রশ্ন জাগাইয়া তোলাতেই শরৎচন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব। "ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়ে বড়ো।"—শরৎচন্দ্রের এই উক্তিতে তাঁহার জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা প্রতিফলিত হইয়াছে। সমাজ যাহাকে বর্জনীয় বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে—সেই পতিত মানুষের মধ্যেও কোথাও অবিনাশী আত্মার আলোক প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। শরৎচন্দ্র সেই আত্মার জ্যোতিই অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। সমাজের ছকবাঁধা বিচারের পদ্ধতিতে মানুষের শেষ বিচার হয় না—শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মানুষগুলি এই কথাটা প্রতিপন্ন করে। শ্রীকান্তের অন্নদা-রাজলক্ষ্মী যেমন এই কথার প্রমাণ, তেমনই সাবিত্রী, কিরণময়ী, অচলা বা ষোড়শী চরিত্রেও প্রথার চাপে অবরুদ্ধ নারীব্যক্তিত্বের বিচিত্র শক্তি বেদনায় আরক্তিম হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রধান ত্রুটি মাত্রাতিরিক্ত ভাবালুতা। তাঁহার হাতে প্রায় সব কাহিনীই একটা করুণ সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয় এবং তিনি করুণ রসসৃষ্টির সুযোগ পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করেন। কিন্তু করুণরস সর্বত্র নিবিড় হইয়া উঠে নাই, অতি মাত্রায় ভাবালুতার ফলে তরল উচ্ছ্বাসটাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সহজ কৌশলে পাঠকের চিত্ত অশ্রুভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবার আগ্রহে উপন্যাসের মধ্যে জীবনের গভীর তাৎপর্য অভিব্যঞ্জিত করিয়া তুলিতে তিনি সমর্থ হন নাই। একমাত্র 'গৃহদাহ' উপন্যাসটিই এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে মুক্ত এবং গৃহদাহই তাঁহার শ্রেষ্ঠতম কীর্তি।

শরৎচন্দ্র বিশেষভাবে ঔপন্যাসিক প্রতিভারই অধিকারী। উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমি ভিন্ন তিনি বক্তব্য যথাযথভাবে পরিস্ফুট করিতে পারেন না, ফলে ছোটগল্প রচনায় তেমন সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। সংযত সংহত নিটোল কোন একটি মুহূর্তের পটে দু'একটি মাত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়া ছোটগল্পে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর আভাসের মতো সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মধ্যে জীবনের গভীর ও ব্যাপক রূপ ব্যঞ্জিত করিয়া তুলিবার যোগ্য কল্পনা শরৎ-চন্দ্রের ছিল না। তাই 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি গল্পে তিনি ছোটগল্পের রস সৃষ্টি করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। রচনাগুলি ছোটগল্পের সীমা অতিক্রম করিয়া উপন্যাসেরই সংক্ষিপ্ত রূপ লাভ

করিয়াছে। যে সামান্য কয়েকটি ছোটগল্পে শরৎচন্দ্রের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে 'মহেশ' গল্পটিই শ্রেষ্ঠ।

১০। প্রশ্ন: ছোটগল্পে প্রভাতকুমারের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও। **[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫]**

উত্তর: রবীন্দ্র সমসাময়িক ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩—১৯৩২) সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এবং তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য। রবীন্দ্রনাথই তাঁহাকে ছোটগল্প রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তোলেন, এমন কি প্লট দিয়াও সাহায্য করিতেন। নবকথা (১৯০০), ষোড়শী (১৯০৬), দেশী ও বিলাতী (১৯১০), গল্পাঞ্জলি (১৯১৩), গল্পবীথি (১৯১৬), পত্রপুষ্প (১৯১৬), গহনার বাক্স (১৯২১), হতাশ প্রেমিক (১৯২৩), বিলাসিনী (১৯২৭), যুবকের প্রেম (১৯২৮), নূতন বউ (১৯২৯) ও জামাতা বাবাজী (১৯৩১) তাঁহার গল্পের বই।

"তাঁহার গল্পের বিষয়বস্তু পরিদৃশ্যমান জীবনের সহজ অনুকৃতি। পারিপার্শ্বিক উদ্বেলিত জীবনের নানা ঘটনাংশ কল্পনার আলোকপাতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। গল্পাঞ্জলির ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "আমি মনঃকল্পিত ঘটনা লইয়াই অধিকাংশ গল্প লিখিয়া থাকি—তবে ক্বচিৎ কখনও বাস্তব জীবনেরও দুই একটা ঘটনা থাকে বটে। এই কল্পিত ঘটনার মধ্যে রসের প্রাধান্য থাকিলেও বাস্তবরসের প্রতিফলন অপ্রধান নয়।" (ছোটগল্পের বিচিত্র কথা—ডঃ সরোজমোহন মিত্র)।

প্রভাতকুমারের অনেকগুলি গল্প প্রেম ও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কীয়। অঙ্গহীনা, হিমানী, রসময়ীর রসিকতা, বিলাত ফেরতের বিপদ, শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি প্রভৃতি প্রেম ও দাম্পত্য বিষয়ক গল্প। এই সমস্ত গল্পে প্রভাতকুমার পুরাতনপন্থী। শ্রেয়-বোধকেই তিনি সংসারে স্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। দাম্পত্য জীবনে প্রভাতকুমার অনেকটা পুরাতনপন্থী হইলেও ধর্ম বা সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে তিনি পুরাতন পন্থাকে সমর্থন করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম মনোভাবাপন্ন। সন্ন্যাসী এবং অন্ধভক্তিসঞ্জাত কালীসাধকের জীবনে ফাঁকিই তাঁহার 'ভুল ভাঙ্গা' এবং 'দেবী' গল্পের উপজীব্য। এই দুই গল্পের রবীন্দ্রনাথের 'উদ্ধার' এবং 'বোষ্টমী' গল্পের প্রভাব অনুভূত হয়।

সমসাময়িক জীবনাবলম্বনে প্রভাতকুমারের কাহিনীগুলি তখনকার এক সুন্দর আলেখ্য প্রদান করে। বাঙালীর ইতিহাস প্রণয়নে উহারা এক একটি অমূল্য রত্ন। তাঁহার 'দেশী ও বিলাতী' গল্প সঙ্কলনে তিনি যেমন এদেশীয়

ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার তীব্র সমালোচনা করিলেন, তেমনি বিলাতী-সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালী ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রাকেও সমর্থন করেন নাই। 'মাদুলী', 'উকীলের দুর্বুদ্ধি', 'হাতে হাতে ফল' প্রভৃতি গল্পে তাঁহার স্বাদেশিকতা বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রভাতকুমারের 'আদরিণী' পাঠ্য-পুস্তকের কল্যাণে বহু পরিচিত গল্প। তাঁহার উপন্যাসের মত ছোট-গল্পেও কোন অপরিজ্ঞাত জীবনরহস্য অনুসন্ধান বা জীবনের গূঢ় গভীর তাৎপর্য উন্মোচনের আগ্রহ প্রকাশ পায় নাই। নিতান্ত ঘরোয়া বাঙালী জীবনের পটভূমি এবং নিত্যকার জীবনে প্রতিদিন দেখা মানুষের চরিত্র অবলম্বন করিয়া 'ইমোশনের স্বর্ণরেখায় উদ্ভাসিত' বহু নিটোল রসপূর্ণ গল্প তিনি রচনা করিয়াছেন।

প্রভাতকুমারের ছোটগল্প রচনার মূলে ফরাসী প্রভাব অনুভূত হয়। তিনি ফরাসী ছোটগল্পের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষেও প্রযোজ্য। 'ফরাসী ছোটগল্পে রসের প্রাধান্য পরিস্ফুট। বিষয়টি কিছুই নহে—ঘটনাটা তুচ্ছ বলিলেও হয়, কিন্তু পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয়ে বিচিত্র ভাবের লহরী খেলিতে থাকে।' সেজন্য অনেকে প্রভাতকুমারকে 'বাংলা ছোটগল্পের মোপাসাঁ' বলিয়া অভিহিত করেন। অবশ্য আঙ্গিকের দিক হইতে সত্য হইলেও দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁহারা সম্পূর্ণ পৃথক! মোপাসাঁর ছিল গভীর জীবনদৃষ্টি। তিনি তাঁহার সমকালীন সমাজ, ধর্ম ও নীতির মুখোস খুলিয়া দিয়াছেন। কৌতুক-ব্যঙ্গের ছুরির ফলায় সমাজকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রভাতকুমার সেদিকে দৃষ্টি দেন নাই। সমাজ-জীবনের কতকগুলি কৌতুকপূর্ণ ঘটনাকেই তিনি ছোটগল্পের অপূর্ব আঙ্গিক কুশলতায় সার্থক করিয়াছেন। ফরাসীদের মত তুচ্ছ এক জীবনাংশ লইয়া তিনি গল্প ফাঁদিতে পারেন। চুঁচুড়ার সুবোধচন্দ্র সপ্তদশী স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় থিয়েটার দেখিতে গেলেন। হাওড়া স্টেশনে ভীড়ের মধ্যে দুইজন দুইদিকে ছিটকাইয়া পড়েন! ঘটনাটি খুবই তুচ্ছ। কিন্তু ইহাকে লইয়াই প্রভাতকুমার অনুপম গল্প সৃষ্টি করেন। এই গল্পায়নের কৌশল সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'উপন্যাসে নানা ঘটনার ভিতর দিয়া এক একটি চরিত্র বিকশিত হইয়া উঠে। ছোটগল্পে চরিত্র বিকাশের স্থান নাই। বর্ণিত চরিত্র বিকশিতভাবেই পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয় এবং ঘটনাটির সঙ্গে সে চরিত্রের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিতে পারিলেই লেখকের কার্য সম্পন্ন হইল। সুতরাং সে ঘটনাটি এমন হওয়া চাই, যাহাতে পর্দায় পর্দায় চরিত্রটির সঙ্গে মিলিয়া যায় অথচ তাহার কোন অংশ নিরর্থক পড়িয়া না থাকে। ...যদি ছোটগল্পে এমন কোন ঘটনা ঘটে, যাহা বর্ণিত চরিত্রের সংগে বেশ মিলিয়া যাইতেছে না অথবা সে চরিত্রটি বুঝিবার পক্ষে সে ঘটনাটি অত্যাবশ্যক নয়,

করিয়াছে। যে সামান্য কয়েকটি ছোটগল্পে শরৎচন্দ্রের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে 'মহেশ' গল্পটিই শ্রেষ্ঠ।

১০। প্রশ্ন: ছোটগল্পে প্রভাতকুমারের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও। [ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫]

উত্তর: রবীন্দ্র সমসাময়িক ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩—১৯৩২) সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এবং তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য। রবীন্দ্রনাথই তাঁহাকে ছোটগল্প রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তোলেন, এমন কি প্লট দিয়াও সাহায্য করিতেন। নবকথা (১৯০০), ষোড়শী (১৯০৬), দেশী ও বিলাতী (১৯১০), গল্পাঞ্জলি (১৯১৩), গল্পবীথি (১৯১৮), পত্রপুষ্প (১৯১৬), গহনার বাক্স (১৯২১), হতাশ প্রেমিক (১৯২৩), বিলাসিনী (১৯২৭), যুবকের প্রেম (১৯২৮), নূতন বউ (১৯২৯) ও জামাতা বাবাজী (১৯৩১) তাঁহার গল্পের বই।

"তাঁহার গল্পের বিষয়বস্তু পরিদৃশ্যমান জীবনের সহজ অনুকৃতি। পারিপার্শ্বিক উদ্বেলিত জীবনের নানা ঘটনাংশ কল্পনার আলোকপাতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। গল্পাঞ্জলির ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "আমি মনঃকল্পিত ঘটনা লইয়াই অধিকাংশ গল্প লিখিয়া থাকি—তবে কচিৎ কখনও বাস্তব জীবনেরও দুই একটা ঘটনা থাকে বটে। এই কল্পিত ঘটনার মধ্যে রসের প্রাধান্য থাকিলেও বাস্তবরসের প্রতিফলন অপ্রধান নয়।" (ছোটগল্পের বিচিত্র কথা—ডঃ সরোজমোহন মিত্র)।

প্রভাতকুমারের অনেকগুলি গল্প প্রেম ও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কীয়। অঙ্গহীনা, হিমানী, রসময়ীর রসিকতা, বিলাত ফেরতের বিপদ, শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি প্রভৃতি প্রেম ও দাম্পত্য বিষয়ক গল্প। এই সমস্ত গল্পে প্রভাতকুমার পুরাতনপন্থী। শ্রেয়-বোধকেই তিনি সংসারে স্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। দাম্পত্য জীবনে প্রভাতকুমার অনেকটা পুরাতনপন্থী হইলেও ধর্ম বা সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে তিনি পুরাতন পন্থাকে সমর্থন করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম মনোভাবাপন্ন। সন্ন্যাসী এবং অন্ধভক্তিসঞ্জাত কালীসাধকের জীবনে ফাঁকিই তাঁহার 'ভুল ভাঙ্গা' এবং 'দেবী' গল্পের উপজীব্য। এই দুই গল্পের রবীন্দ্রনাথের 'উদ্ধার' এবং 'বোষ্টমী' গল্পের প্রভাব অনুভূত হয়।

সমসাময়িক জীবনাবলম্বনে প্রভাতকুমারের কাহিনীগুলি তখনকার এক সুন্দর আলেখ্য প্রদান করে। বাঙালীর ইতিহাস প্রণয়নে উহারা এক একটি অমূল্য রত্ন। তাঁহার 'দেশী ও বিলাতী' গল্প সঙ্কলনে তিনি যেমন এদেশীয়

ধর্মীয় সংকীর্ণতার তীব্র সমালোচনা করিলেন, তেমনি বিলাতী-সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালী ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রাকেও সমর্থন করেন নাই। 'মাদুলী', 'উকীলের দুর্বুদ্ধি', 'হাতে হাতে ফল' প্রভৃতি গল্পে তাঁহার স্বাদেশিকতা বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রভাতকুমারের 'আদরিণী' পাঠ্য-পুস্তকের কল্যাণে বহু পরিচিত গল্প। তাঁহার উপন্যাসের মত ছোট-গল্পেও কোন অপরিজ্ঞাত জীবনরহস্য অনুসন্ধান বা জীবনের গূঢ় গভীর তাৎপর্য উন্মোচনের আগ্রহ প্রকাশ পায় নাই। নিতান্ত ঘরোয়া বাঙালী জীবনের পটভূমি এবং নিত্যকার জীবনে প্রতিদিন দেখা মানুষের চরিত্র অবলম্বন করিয়া 'ইমোশনের স্বর্ণরেখায় উদ্ভাসিত' বহু নিটোল রসপূর্ণ গল্প তিনি রচনা করিয়াছেন।

প্রভাতকুমারের ছোটগল্প রচনার মূলে ফরাসী প্রভাব অনুভূত হয়। তিনি ফরাসী ছোটগল্পের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষেও প্রযোজ্য। 'ফরাসী ছোটগল্পে রসের প্রাধান্য পরিস্ফুট। বিষয়টি কিছুই নহে—ঘটনাটা তুচ্ছ বলিলেও হয়, কিন্তু পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয়ে বিচিত্র ভাবের লহরী খেলিতে থাকে।' সেজন্য অনেকে প্রভাতকুমারকে 'বাংলা ছোটগল্পের মোপাসাঁ' বলিয়া অভিহিত করেন। অবশ্য আঙ্গিকের দিক হইতে সত্য হইলেও দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁহারা সম্পূর্ণ পৃথক! মোপাসাঁর ছিল গভীর জীবনদৃষ্টি। তিনি তাঁহার সমকালীন সমাজ, ধর্ম ও নীতির মুখোস খুলিয়া দিয়াছেন। কৌতুক-ব্যঙ্গের 'ছুরির ফলায় সমাজকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রভাতকুমার সেদিকে দৃষ্টি দেন নাই। সমাজ-জীবনের কতকগুলি কৌতুকপূর্ণ ঘটনাকেই তিনি ছোটগল্পেব অপূর্ব আঙ্গিক কুশলতায় সার্থক করিয়াছেন। ফরাসীদের মত তুচ্ছ এক জীবনাংশ লইয়া তিনি গল্প ফাঁদিতে পারেন। চুঁচুড়ার সুবোধচন্দ্র সপ্তদশী স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় থিয়েটার দেখিতে গেলেন। হাওড়া স্টেশনে ভীড়ের মধ্যে দুইজন দুইদিকে ছিটকাইয়া পড়েন! ঘটনাটি খুবই তুচ্ছ। কিন্তু ইহাকে লইয়াই প্রভাতকুমার অনুপম গল্প সৃষ্টি করেন। এই গল্পায়নের কৌশল সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'উপন্যাসে নানা ঘটনার ভিতর দিয়া এক একটি চরিত্র বিকশিত হইয়া উঠে। ছোটগল্পে চরিত্র বিকাশের স্থান নাই। বর্ণিত চরিত্র বিকশিতভাবেই পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয় এবং ঘটনাটির সঙ্গে সে চরিত্রের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিতে পারিলেই লেখকের কার্য সম্পন্ন হইল। সুতরাং সে ঘটনাটি এমন হওয়া চাই, যাহাতে পর্দায় পর্দায় চরিত্রটির সঙ্গে মিলিয়া যায় অথচ তাহার কোন অংশ নিরর্থক পড়িয়া না থাকে। ...যদি ছোটগল্পে এমন কোন ঘটনা ঘটে, যাহা বর্ণিত চরিত্রের সংগে বেশ মিলিয়া যাইতেছে না অথবা সে চরিত্রটি বুঝিবার পক্ষে সে ঘটনাটি অত্যাবশ্যক নয়,

তাহা হইলে সে ছোট গল্প ভাল হইল না। ঘটনায় ও চরিত্রে যদি জমাট না বাঁধিল তাহা হইলে দুই-ই বিফল।"

"প্রভাতকুমারের গল্পের আঙ্গিকের মধ্যে ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের সামঞ্জস্য সাধনই বড় কথা। সেইজন্য তাঁহার গল্পের মধ্যে ঘটনা আসে প্রথমে এবং তাহার বিকশনের জন্য প্রয়োজন হয় চরিত্র এবং সম্ঘাতের ; গল্পের শেষে আসে বিস্ময়।" (ছোটগল্পের বিচিত্র কথা)

ফরাসী টেকনিকের ভক্ত হইলেও প্রভাতকুমার তাঁহার কিছু গল্পে গাঁথুনি শক্ত করিতে পারেন নাই। আঁটসাঁট বাঁধুনির অভাবে গল্প জমাট হইয়া উঠে নাই। উদাহরণ-স্বরূপ 'কুড়ানো মেয়ে', 'কাজির বিচার', 'শ্রীবিলাসের বুদ্ধি' প্রভৃতি গল্পের নাম করা যায়।

১১। ছোটগল্প লেখকরূপে প্রভাতকুমার বা শরৎচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচয় দাও। [ক. বি. ১৯৬৮]

উত্তর-সংকেত : ৯ ও ১০নং প্রশ্নের উত্তরের সাহায্যে উত্তর রচনা করিতে হইবে।

॥ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ॥

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭—১৮৪৮)

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫]

সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের যুগের একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। প্রথমে তিনি রামমোহন রায়ের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'সম্বাদ-কৌমুদী' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু সমাজ-সংস্কার বিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি তিন মাস পরে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন (মার্চ, ১৮২২)। তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী। তিনি ইংরেজী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াও রক্ষণশীলতা পরিহার করিতে পারেন নাই। প্রতিভা ও মনস্বিতায় রামমোহনের সমকক্ষ না হইলেও তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা রাম-মোহনকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। তিনি তৎকালীন কলিকাতার সমাজের কুৎসিত আচার-আচরণকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া কতকগুলি সরস আখ্যান রচনা করেন। তাঁহার স্বনাম ও ছদ্মনামে এই গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয় : কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩), নববাবুবিলাস (১৮২৩), কীর্তিবিলাস (১৮২৫) এবং নব-

বিবিবিলাস (১৮৩০)। এই নক্‌শা শ্রেণীর ব্যঙ্গ বিদ্রূপপূর্ণ আখ্যায়িকাগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যে রসসৃষ্টির একটা উল্লেখযোগ্য স্বাধীন প্রয়াস বলিয়া ঐতিহাসিকের স্মরণযোগ্য। ভবানীচরণের একটি বড় কাজ হইতেছে পুঁথির আকারে শ্রীমদ্‌ভাগবত, ভগবদগীতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থেব মুদ্রণ।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩—১৮৯১)

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫]

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটির লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই একটিমাত্র গ্রন্থের জন্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। ইংরেজী সাহিত্যেব 'রোমান্স' ও 'নভেল'—উপন্যাসের এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র রোমান্সের প্রতিই অধিকতর আকর্ষণ বোধ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাসের যে রূপ গড়িয়া উঠিল তাহাতে ইংরেজী রোমান্সেরই আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। সমাজবদ্ধ মানুষের অতি সাধারণ জীবনের বাস্তবরূপেব পরিবর্তে সুদূর ইতিহাসের বর্ণাঢ্য পটভূমিতে কল্পনানির্ভর আখ্যান রচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেন। ফলে তাঁহার উপন্যাসগুলি এক ধরনের গদ্যকাব্যে পরিণত হইয়াছে। তিনি যেখানে সামাজিক বিষয়বস্তু ব্যবহার করিয়াছেন সেখানেও সমাজ-বাস্তবতার বন্ধন পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করেন নাই। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি খাঁটি নভেলের পর্যায়ে পড়ে না। বাংলাদেশের ঘরোয়া জীবনযাত্রার পারিবারিক জীবনের মধ্য হইতে উদ্ভূত সমস্যার আবর্তনের মধ্যে সাধারণ বাঙালী নরনারীর চরিত্রের যে বিশিষ্টতা প্রকাশ পায়, একান্তভাবে তাহারই উপরে নির্ভর করিয়া তারকনাথ 'স্বর্ণলতা' বইটিতে যথার্থ নভেল রচনার আদর্শ স্থাপন করেন। বস্তুতঃ বাংলাদেশের ঘরোয়া জীবনযাত্রার এমন সত্যনিষ্ঠ ছবি ইতিপূর্বে অন্য কোন বাংলা উপন্যাসে পরিস্ফুট হয় নাই। স্বর্ণলতায় শশিভূষণের ও বিধুভূষণের যৌথ পরিবারের মধ্যে যে সঙ্কট ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে নিহিত আছে অতিবাস্তব অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে। অর্থনৈতিক কারণেই বাংলাদেশের যৌথ পরিবারের বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া যায়। জীবিকার তাড়নায়, অন্নবস্ত্রের চিন্তায় বিধুভূষণকে গৃহত্যাগী হইতে হয়। কলিকাতা মহানগরী তখন ভাগ্যান্বেষণকারীদের তীর্থ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সারা বাংলাদেশের মানুষের দৃষ্টি তখন কলিকাতার দিকেই নিবদ্ধ। বিধুভূষণের কলিকাতা যাত্রাটা সেই সামাজিক সত্যের প্রতীকের মতো। কাহিনীটির উত্তরাংশে গোপাল ও হেমচন্দ্রের উপকাহিনীটিতেও নূতন শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত যুবকদের উদার মানসিকতাবোধ প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রমদা ও প্রমদার মায়ের চরিত্রে বাংলাদেশের দুটি টাইপ মহিলাকে লেখক নিপুণভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

ইহাদের কুটিলতার পাশে অশ্রুমুখী সরলার মৌন দুঃখভোগের ছবি পাঠকের চিত্তকে সহানুভূতিতে পূর্ণ করিয়া তোলে। উপন্যাসের মূল কাহিনীর সহিত আবশ্যিক সংযোগে যুক্ত না হইলেও নীলকমল চরিত্রটিই সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। এই হাস্য-করুণ চরিত্রটিতে তারকনাথের অসাধারণ হিউমার-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। নিছক কৌতুক রস সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই হয়তো তিনি গল্পের মধ্যে এই চরিত্রটি আনিয়াছিলেন—কিন্তু নীলকমল অহাব শিল্পীজনোচিত দম্ভ, জীবন সম্পর্কে উদ্ভট ধারণা, আচার-আচরণ ও বাচন-ভঙ্গির বিসদৃশতা প্রভৃতি অসঙ্গতি সত্ত্বেও আমাদের করুণা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া নেয়। তারকনাথের বাস্তব জীবনদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম হিউমার-বোধের জন্য উপন্যাসটি আজও জনসমাদর হারায় নাই।

'স্বর্ণলতা' ভিন্ন 'ললিত সৌদামিনী', 'অদৃষ্ট', 'বিধিলিপি' প্রভৃতি কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস তারকনাথ রচনা করিয়াছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫—১৯৩২)

ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা রূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্য সাধনা শুরু করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী দেবী সমাদৃতা লেখিকারূপে সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। নাটক ও কবিতা রচনায় স্বর্ণকুমারী দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষভাবে উপন্যাসেই তাঁহার কৃতিত্ব বেশি। সেকালের অন্যান্য প্রধান লেখকদের মতো ঐতিহাসিক এবং সামাজিক—এই উভয় শ্রেণীর উপন্যাসই তিনি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মিবাররাজ' (১৮৮৭), 'বিদ্রোহ' (১৮৯০) এবং 'ফুলের মালা' (১৮৯৫)। এই উপন্যাসগুলি ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার দিক হইতে রমেশ-চন্দ্রের রচনাবলীর সহিত তুলনীয়; কোন কোন ক্ষেত্রে কাহিনী বিন্যাসে এবং বিশ্লেষণের নিপুণতায় তিনি রমেশচন্দ্র অপেক্ষাও বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিন্ন মুকুল (১৮৭৯), স্নেহলতা (১৮৯৩) এবং কাহাকে (১৮৯৮)। ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতি বিষয়ে অতিমাত্রায় বিচার-বিতর্ক প্রবণতার জন্য স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক উপন্যাসে গল্পরস অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে। স্নেহলতা উপন্যাসটিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫]

রবীন্দ্র প্রভাব আত্মস্থ করিয়া যে-সব সৃষ্টি-কুশল লেখক বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় স্থায়ী কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলা কথাসাহিত্যে, বিশেষভাবে ছোটগল্পে প্রভাতকুমার চিরদিন একজন প্রথম শ্রেণীর লেখকের সম্মান পাইবেন। একদিকে রবীন্দ্রনাথের অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার জ্যোতিতে বাংলা কথাসাহিত্য যখন উজ্জ্বল সেই সময়ে কাহারো পক্ষে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সহজসাধ্য ছিল না। প্রভাতকুমার স্বকীয়তার গুণে সেই পরিবেশের মধ্যেও সাহিত্য রসিকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসের সংখ্যা ১৪ খানি। ইহাদের মধ্যে রমাসুন্দরী (১৯০৮), নবীন সন্ন্যাসী (১৯১২), রত্নদ্বীপ (১৯১৫), সিন্দুর কৌটা (১৯১৯) প্রভৃতি উপন্যাস ব্যাপকভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। প্রভাতকুমারের উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মতো গভীর জীবনবোধ এবং স্বদেশ জিজ্ঞাসার পরিচয় নাই, শরৎচন্দ্রের মতো সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে ব্যক্তির বাসনা কামনার জটিলতা ও আবর্ত তুলিয়া ধরিতেও তিনি আগ্রহ বোধ করেন নাই। কিন্তু প্রীতিস্নিগ্ধ ঘরোয়া বাঙালী জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখের কথা মর্মস্পর্শীভাবে কাহিনীর মধ্যে অনায়াসে রূপায়িত করিয়াছেন। তাঁহার স্বচ্ছন্দ বর্ণনাভঙ্গির গুণে একান্ত সাধারণ কাহিনীই পাঠকদের নিকট স্পৃহনীয় হইয়া উঠিত। প্রভাতকুমারের প্রীতিস্নিগ্ধ মনের স্পর্শ তাঁহার রচনাগুলিতে একটা অনন্যসাধারণ স্বাদ আনিয়া দিয়াছে।

ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রভাতকুমারের কীর্তির মূল্য সম্পর্কে সংশয় আছে, কিন্তু ছোটগল্পে তাঁহার প্রতিভার শক্তি তিনি তর্কাতীত ভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন। গল্প লেখার শক্তি সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে না পারায় প্রথম দিকে প্রভাতকুমার 'শ্রীরাধামণি দেবী' ছদ্মনামে কয়েকটি গল্প লেখেন। ছদ্মনামে লেখা এই গল্প স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাই প্রভাতকুমারকে অসঙ্কোচ আত্মপ্রকাশের সাহস যোগাইয়াছিল। ষোড়শী (১৯০৬), দেশী ও বিলাতী (১৯০৯), গল্পাঞ্জলি (১৯১৩), গল্পবীথি (১৯১৬), পত্র পুষ্প (১৯১৭), গহনার বাক্স (১৯২১), হতাশ প্রেমিক (১৯২৪), বিলাসিনী (১৯২৬) প্রভৃতি গ্রন্থে প্রভাতকুমারের প্রায় ১২০টি মৌলিক এবং অনূদিত ছোটগল্প সঙ্কলিত হইয়াছে।

রাজশেখর বসু (১৮৮০—১৯৬০) [ক. বি.বি. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩]

হাস্যরস প্রধান বাংলা সাহিত্যে রাজশেখর বসু বা পরশুরামের স্থান প্রমথ চৌধুরীর পরেই। পরশুরামের হাস্যরসের মধ্যে একটা স্বতঃ-উৎসারিত প্রাচুর্য ও অনাবিল বিশুদ্ধি আছে। তাঁহার হাস্যরসের প্রধান উপাদান হাস্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভাবন-নৈপুণ্য। তিনি হাস্যরসিকের দৃষ্টি লইয়া জীবনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ খণ্ডাংশগুলি দেখিয়া তাহাদের মধ্যে হাস্য প্রবাহ ছুটাইয়াছেন। তিনি তাঁহার গল্পে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যাহার ফলে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। তাঁহার গড্ডলিকা (১৩৩২), কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন (১৩৫০), গল্পকল্প (১৩৫৭) ও ধুস্তুরী মায়া (১৩৫৯) প্রভৃতি গল্প সংগ্রহের মধ্যে আছে তাঁহার উদ্ভট ও অনাবিল হাস্যরসের অফুরন্ত নির্ঝর।

বাংলা সাহিত্যে রাজশেখর বসুর পরিচয় প্রধানতঃ হাস্যরসিক হইলেও ইহা তাঁহার একমাত্র পরিচয় নহে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য বৈজ্ঞানিক রাজশেখর বসু বাংলা সাহিত্যে একজন বিদগ্ধ মানুষ। তিনি বাংলা অভিধানের (চলন্তিকা) রচয়িতা। রামায়ণ-মহাভারতের সহজ সংক্ষিপ্তকার। রাজশেখরের স্টাইল সহজ সরল স্পষ্ট ও লক্ষ্যভেদী। প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁহার অনন্যতা পরিস্ফুট। এ অনন্যতা শুধু রচনারীতিতে নয়, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় ও স্বচ্ছতায়ও। তাঁহার মিতভাষিতা প্রবন্ধগুলির আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে।

পঞ্চম পর্ব

॥ রবীন্দ্রনাথ ॥

১। প্রশ্ন : রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন পর্বের প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলির পরিচয় দাও।

উত্তর : প্রতিভার অফুরন্ত শক্তি রবীন্দ্র-কাব্যে যেভাবে অজস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা চিরদিন বিস্ময়ের কারণ হইয়া থাকিবে। জীবনের পর্বে পর্বে রবীন্দ্রনাথ কাব্য আঙ্গিকের নূতন নূতন পরীক্ষার এবং জীবনোপলব্ধির নব নব বৈচিত্র্যে বাংলা কবিতার অপরিজ্ঞাত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। 'চিরযুবা' বিশেষণটি একমাত্র তাঁহার সম্পর্কেই যথার্থ-ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। জীবনের এক একটি পর্বের শেষে কবির কণ্ঠে চিরসমাপনের বিষণ্ণ সুর জাগিয়াছে, কিন্তু অচিরে কবির সমগ্র সত্তা আবার নবীন উদ্দীপনায় সম্পূর্ণ নতুন কাব্যরূপ নির্মাণের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার এই অপরিসীম মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। জরার আক্রমণ দেহকে পঙ্গু করিয়াছে কিন্তু প্রতিভার অগ্নিশিখাটিকে ম্লান করিতে পারে নাই। পৃথিবীতে এমন কবি প্রতিভা অনেক আছে কোন আকস্মিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় যাঁহাদের প্রতিভা আকস্মিক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং কোন পূর্বপ্রস্তুতিহীন ভাবেই তাঁহারা অসামান্য কবিতা রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় এইরূপ আকস্মিক উদ্ভাস নাই। রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষ, ক্রমবিকাশ এবং পরিণাম—নির্ঝর হইতে মহানদীর উদ্ভব এবং বিচিত্রের পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়া মহাসমুদ্রে চরম পরিণতি লাভের সহিতই তুলনীয়। রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশ মন্থর ভাবে ঘটিয়াছে—কিন্তু তাহার প্রতিটি স্তরের মধ্যে আছে পূর্বাপর ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্নতা এবং ক্রমিক ব্যাপ্তি।

'মানসী' (১৮৯০) কাব্যকেই রবীন্দ্রনাথ প্রবেশিকা উত্তীর্ণ প্রথম পরিণত কাব্য মনে করিতেন। মানসীর পূর্ব যুগের কবিতাসংগ্রহ সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২), প্রভাতসঙ্গীত (১৮৮৩), ছবি ও গান (১৮৮৪) এবং কড়ি ও কোমল (১৮৮৬)। এই পর্বটিকে প্রতিভা উন্মেষের কাল বলা যায়। সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত এবং ছবি ও গান বই তিনটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে এগুলি অপরিহার্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে, বিশেষ ভাবে শেষ তিন দশকে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আখ্যান কাব্যের পরিবর্তে গীতিকাব্যের সম্ভাবনাই

প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। —এই সময়ের অন্যান্য কবিদের গীতি কবিতার পটভূমিতে স্থাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথের উন্মেষ পর্বের কাব্যকয়টির বিচার করিলে বুঝা যায় কি ভাবে রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িকদের অগভীর এবং শিল্প-সচেতনতাহীন প্রয়াসের প্রভাব অতিক্রম করিয়া গীতি-কবিতার ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে মৌলিক রূপান্তর সাধন করিয়াছিলেন। প্রকৃতি-প্রীতির অর্থ যে শুধু দৃশ্য-জগতের প্রতিচিত্র রচনা নয়, প্রেমচেতনার অর্থ যে শুধু সংযমহীন ভাবালুতা নয়—কল্পনার সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলিতে রূপময় বিশ্ব অনুরণন তুলিয়া যে বিচিত্র সুরের ঐকতান সৃষ্টি করে, হৃদয়ানুভূতির উত্তাপ ও আবেগ সর্বায়ত জীবনানুধ্যানের বশীভূত হইয়া যে গূঢ় প্রেমের অনুভব জাগায়, একান্তভাবে কবিব্যক্তির ব্যক্তিস্বরূপে আশ্রিত সেই সৌন্দর্য ও প্রেমই যে উৎকৃষ্ট গীতি কবিতার বিষয় হইতে পারে—রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষামূলক কাব্যগ্রন্থ-গুলিতে ধীরে ধীরে এই সত্যই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। রূপ ও রসের অন্বয় মিলনে সার্থক কবিতার অবয়ব নির্মিত হইয়াছে এই পর্বের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'কড়ি ও কোমলে'। রূপময় বহিঃপ্রকৃতি এবং নারীর দেহগত সৌন্দর্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এই কাব্যের কবিতাগুলিকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করিয়াছে। প্রত্যক্ষ রূপের প্রতি আকর্ষণের এরূপ প্রাবল্য রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন কাব্যে দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের কবিমানস এবং কবিতার শিল্প-রূপ বিষয়ে তাঁহার ভাবনার বিশিষ্টতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে **মানসী** (১৮৯০) কাব্যে। কবির নিজ ভাষায়, "মানসী থেকে আরম্ভ করে বাকি বইগুলির কবিতায় ভালো মন্দ মাঝারির ভেদ আছে, কিন্তু আমার আদর্শ-অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।" মানসীর কবিতাগুলিতে কবিচিত্তের বিরোধী ভাবনার দ্বন্দ্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম এবং সৌন্দর্য বিষয়ে একটি পরিপূর্ণতার আদর্শ কবি কল্পনা করিতেছেন, অন্য দিকে পার্থিব জগতের সীমার মধ্যে সৌন্দর্য ও মানবিক প্রেমের যে রূপ বিকীর্ণ হয়, তাহার প্রতিও কবিহৃদয়ের আকর্ষণ দুর্নিবার। এই সীমা এবং সীমাতীতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কবি উৎকণ্ঠিত। আদর্শ ও বাস্তবের এই দ্বন্দ্বই মানসীর কবিতাগুলির মূল বৈশিষ্ট্য। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটিতে কবিহৃদয়ের এই প্রবল দ্বন্দ্ব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাতেও প্রকৃতির প্রসন্ন এবং রুদ্র রূপ কবিকে যে সংশয়িত করিয়াছে,—তাহার প্রমাণ 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতা। এই কাব্যের মেঘদূত, অহল্যার প্রতি—প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতায় কবির সৌন্দর্য ভাবনা ও বিশিষ্ট জীবনবোধের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। মানসীর কতকগুলি কবিতায় বাঙালী সমাজের বিকার বিকৃতি এবং কর্মবিমুখ উদ্যমহীন মানসিকতার প্রতি তীব্র

বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে। বক্তব্যের দিক হইতে যেমন, তেমনই কবিতার আঙ্গিকের দিক হইতেও 'মানসী' রবীন্দ্রকাব্যধারায় প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাব্য। এই কাব্যে ছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বহু নূতন পরীক্ষা করিয়াছেন। আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ এই কাব্যেই প্রথম উদ্ভাসিত হয়।

মানসীর পরে 'সোনার তরী' (১৮৯৪) 'চিত্রা'র (১৮৯৬) যুগকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী পরিচালনা সূত্রে শিলাইদহ-পতিসর অঞ্চলে বসবাস করিতেন। বাংলার প্রকৃতি এবং বাংলাদেশের মানুষের নিবিড় সান্নিধ্যে তাঁহার প্রতিভা পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত হইয়া উঠে। কবিতা এবং গদ্যে এই যুগে কবি যে বিপুল সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন—তাঁহার জীবনের অন্য কোন পর্বের সহিত তাহার তুলনা চলে না। সোনার তরী ও চিত্রা কাব্যের পটভূমি বিশেষ-ভাবে বাংলাদেশের প্রকৃতি। এই দুটি কাব্যের আবহাওয়ায় বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ওতপ্রোত হইয়া আছে। যে মৌলিক ধারণাগুলি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের চিন্তা ভাবনার ভিত্তি সোনার তরী-চিত্রাতেই তাহা সুস্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। 'বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনায়' এই সময়ে কবির মনে এক অখণ্ড জীবনবোধ জাগ্রত হইয়া উঠে। এই অখণ্ড জীবনবোধের সূত্রে তিনি ব্যক্তিজীবনের সুখদুঃখ, অন্তর-বাহিরের বিরোধ—সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা গভীর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পান। কবির ব্যক্তিজীবন এবং বিশ্বজীবন একটা আনন্দ সূত্রের গ্রন্থনে বৃহৎ তাৎপর্য লাভ করে। এই যে নূতন উপলব্ধি, ইহারই প্রকাশ ঘটিয়াছে সোনার তরী-চিত্রা পর্বের কবিতায়। শুধু প্রকৃতির বাহিরের রূপের প্রতি আকর্ষণের পরিবর্তে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবির ব্যক্তিজীবনের একটা 'অনবচ্ছিন্ন যোগ, এক চির-পুরাতন একাত্মতার ভাব' সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি কবিতাকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করিয়াছে। 'বিশ্বাত্মবোধ' এই যুগের প্রকৃতি প্রীতির প্রধান বিশেষত্ব। বিশ্বের সহিত নিজেকে সামঞ্জস্যে মিলিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই কবি জগতে অণুপরমাণুতে অসীম বিস্ময় ও আনন্দের উপকরণ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। নিত্য সচল প্রাণময় প্রকৃতি তাঁহাকে যেমন আকর্ষণ করিয়াছে, তেমনই মানবজীবনের বহমান ধারার প্রতি আকর্ষণে তিনি কল্পলোক হইতে বাস্তবজীবনের প্রত্যক্ষতার মধ্যে মুক্তি পাইতে চাহিয়াছেন। মানবলোকে নিজেকে মুক্তি দিবার আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হইয়াছে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়। এই মনোভাবটি বিশ্লেষণ করিয়া কবি একটি গদ্য রচনায় লিখিয়াছিলেন, "প্রকৃতি তাহার রূপ রস গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি মন স্নেহ প্রেম লইয়া, আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে

মন্তই করিতেছে ; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে।" একদিকে কবির ব্যক্তিজীবন অন্যদিকে বিশ্বজীবন, এই দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য গড়িয়া উঠিতেছে—তাহারই প্রকাশ কবির কাব্যে। কিন্তু কে এমন করিয়া বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ? চিত্রার বহু কবিতায় এই সমন্বয় সাধনকারী এক রহস্যময় শক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে বিচিত্র ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি এই শক্তিকে নাম দিয়াছেন 'জীবন দেবতা'। নিজেরই অন্তরস্থিত জীবন দেবতা নামক এই শক্তির সহিত লীলার কথা চিত্রার অনেকগুলি কবিতায় আছে।

চিত্রার পরে দুখানি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ **চৈতালি** (১৮৯৬) এবং **কল্পনা** (১৯০০)। চৈতালি কাব্যের সংহতকায় সনেটগুলিতে একদিকে সুপরিণত ব্যক্তিগত জীবন ভাবনা যেমন নিটোল কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে তেমনি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সৌন্দর্যলোক পরিক্রমার এক নূতন আগ্রহ অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যলোকে প্রবেশে কবির সহায় মহাকবি কালিদাস। সুদূর অতীতের উৎকণ্ঠা রোমান্টিক কবিপ্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রমানসের এই দিকটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় 'কল্পনা' কাব্যে। সংস্কৃত কবিদের সৃষ্ট সৌন্দর্য জগৎটিকে কবি যেন নূতন ভাবে আবিষ্কার করিলেন। প্রাচীন ভারতের কবি-কল্পনায় যে অখণ্ড পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের জগৎটি রচিত হইয়া উঠিয়াছিল সেই জগতের রূপ রস যেমন 'কল্পনা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ কালগত ব্যবধানের বিচ্ছেদ রসে আবিষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনি সেই প্রাচীন ভারতের সরল নির্মোহ অন্তরের শক্তির উপরে নির্ভরশীল জীবনের আদর্শের দিকটি তুলিয়া ধরিয়াছেন **নৈবেদ্য** (১৯০১) কাব্যের সনেটগুলিতে। কল্পনা এবং নৈবেদ্য কাব্যের সিরিয়াস কবিতাগুলির পাশে '**ক্ষণিকা**' (১৯০০) কাব্যের লঘুরসের লিরিকগুলি স্বাদ-বৈচিত্র্যের দিক হইতে আকর্ষণীয়। তত্ত্বভাবনার ভারমুক্ত এমন নিটোল লিরিক কবিতার ফসল রবীন্দ্রকাব্যের অন্য কোন পর্বে বিরল।

বিচিত্র ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ রবীন্দ্রজীবনের এই পর্বের সমাপ্তি হইয়াছে **খেয়া** (১৯১০) এবং **গীতাঞ্জলি** (১৯১০) কাব্যে। খেয়ার কবিতায় একটা বিষাদের ছায়া সর্বব্যাপী। কবির ব্যক্তিগত জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই বিষণ্ণতার হেতু বোঝা যায়। পারিবারিক জীবনে মৃত্যু এবং নানাবিধ দুঃখ-দায়ক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কবির মন বাহির হইতে অন্তরের মধ্যে ফিরিয়া কোন অক্ষয় সত্যে নির্ভর লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। একদা দেশের প্রত্যক্ষ রাজনীতির সহিত কবি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে জড়িত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সেই উদ্দীপনার শেষ না হইতেই দেখা গেল—

দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সহিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারার পদে পদে বিরোধ ঘটিতেছে। এইসব কারণেই কবি যেন ক্ষুব্ধ মনে কাজের পথ হইতে বিদায় লইতে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। 'বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই' বলিয়া কাজের পথ হইতে বিদায় লইলেন, কিন্তু অন্তরের মধ্যে নূতন অনুভূতির স্পন্দন দেখা গেল। বিশ্বের বিচিত্রতার অন্তরালবর্তী কোন এক সর্বময় শক্তির প্রতি প্রবল বিশ্বাস অনুভব করিলেন। খেয়ার বহু কবিতায় এই ঈশ্বর বিশ্বাসের আভাস আছে। যিনি দুঃখের মধ্যে, বেদনার মধ্যে বার বার আসেন, সেই ঈশ্বর তাঁহার জীবনের সকল গ্লানি মুছিয়া দিবেন। তাঁহারই পায়ে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য কবি প্রস্তুত হইতেছেন। গীতাঞ্জলি কাব্যে আত্মনিবেদন সম্পূর্ণ হইয়াছে। খেয়া এবং গীতাঞ্জলিতে আধ্যাত্মিক অনুভূতিই প্রধান। এই কারণে সাধারণ কবিতার রূপ ও রসের সহিত ইহার একটা ভিন্নতা আছে। খেয়ায় একটা অস্পষ্টতার আবরণ থাকায় কবির সহিত তাঁহার ঈশ্বরের মিলন-বিরহের মধ্যে একটা রহস্যময় আলো-আঁধারের খেলা কবিতাগুলিকে মরমিয়া (mystic) সাধকদের গানের সগোত্র করিয়া তুলিয়াছে। গীতাঞ্জলিতে কোন রহস্যের আবরণ নাই। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির শুদ্ধ ভূমি হইতে কবি অনলঙ্কৃত ভাষায় কথা বলিয়াছেন। বর্ণ বৈচিত্র্যহীন শুভ্রতাই গীতাঞ্জলির কবিতাগুলির পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে।

রবীন্দ্রকাব্যের উত্তর পর্বের শুরু বলাকা (১৯১৯) হইতে। গীতাঞ্জলিতে কবি জীবনের হাটে বেচাকেনা সাঙ্গ করিয়া প্রশান্ত আত্মসমাহিতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যাশিত শান্তির নীড়টি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঝঞ্ঝায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। তখন পৃথিবীব্যাপী এক মহাপরিবর্তনের আয়োজন শুরু হইয়াছে। মানব সভ্যতার ইতিহাস এক মহাক্রান্তিক্ষণে উপস্থিত। যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্য দিয়া পৃথিবী একটা নূতন যুগে উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে—এই চেতনা কবির মনে প্রবল হইয়া দেখা দিল। বস্তুত প্রথম মহাযুদ্ধ হইতেই পৃথিবীতে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। এই যুগ গতির যুগ। জীবনের প্রাচীন মূল্যবোধগুলি এই বক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে চূর্ণ হইয়া গেল, সমাজ জীবনের দ্রুত রূপান্তর দেখা দিল। আশা আশ্বাসহীন অন্ধকার চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া আনিল। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীব্যাপী এই সঙ্কটের মধ্যেও নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি নিজের জীবন দর্শনের সহিত সঙ্গতিরক্ষা করিয়া এই দুর্ভোগকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জে, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়ে, লোভীর নিষ্ঠুর লোভে, জাতি-অভিমানে যে পাপ যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে—এই মহাযুদ্ধ

পৃথিবীর মানুষের পক্ষে যেন সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন। দুঃখের অগ্নিতপস্যার পাপমুক্ত মানুষ আবার নূতন উষার স্বর্ণদ্বারের সন্ধান লাভ করিবে—এই আশার বাণী কবি পৃথিবীকে শুনাইলেন। বিশ্বব্যাপী দ্রুত রূপান্তরশীলতা কবির চিন্তাভাবনাগুলিকে প্রবলভাবে আলোড়িত করিয়াছে। ফলে এই সর্বব্যাপী গতির চেতনা কবির মনে একটা দার্শনিক প্রত্যয়ের আকার লাভ করিয়াছে। প্রেম, প্রকৃতি বা মৃত্যুচেতনা—কবির বিষয় যাহাই হউক না কেন—বলাকার সকল কবিতাতেই এই গতিতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায় 'শাজাহান' বা 'ছবি'র মতো কবিতায় কবি নিত্য পরিবর্তনশীল জীবনের মধ্যে মানবিক অনুভূতিগুলির সত্য মূল্য সন্ধান করিয়াছেন। আবার 'বলাকা' বা 'চঞ্চলা'য় বিশুদ্ধ গতির তত্ত্বকেই কাব্য বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

পলাতকা (১৯১৮) , **পূরবী** (১৯২৫), **মহুয়া** (১৯২৯)—এই কাব্য তিনখানি বলাকা পর্বেরই অন্তর্ভূত। পলাতকায় বাস্তব সংসারের প্রতি কবির আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় নূতন ভাবে। সাংসারিক জীবনের ছোটখাট সুখ-দুঃখের তরঙ্গগুলি এই কাব্যের কবিতাগুলিতে গল্পের আকারে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ছড়ার ছন্দের বিচিত্র ব্যবহারের দিক হইতেও কাব্যটি গুরুত্ব-পূর্ণ। 'বলাকা' কাব্যের গভীর দার্শনিকতার অনুবৃত্তি পাওয়া যায় পূরবী কাব্যে। পূরবী হইতে মৃত্যুভাবনা রবীন্দ্রমানসের একটা নতুন তন্ত্রীরূপে স্থায়ী হইয়া উঠিয়াছে। জীবন-গোধূলির ম্লান ছায়ায় কবি যেন পৃথিবীর সহিত তাঁহার সম্পর্কের তাৎপর্য নূতনভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'তপোভঙ্গ', 'সাবিত্রী' প্রভৃতি এই যুগের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা পূরবী কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। আর 'মহুয়া' কাব্যে প্রৌঢ় কবির মনে যৌবন দীপ্তি বিস্ময়কর-ভাবে বিকশিত হইয়াছে।

মহুয়ার পরে কবিজীবনের অবশিষ্ট দশ এগারো বৎসরে তেরখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। সত্তর বৎসর বয়সের পরেও সৃষ্টির এইরূপ অফুরন্ত শক্তি আমাদের বিস্মিত করে। কবি শুধু গতানুগতিকভাবে পূর্ব অভ্যাস-বশতঃ কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা নয়, প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং কাব্য আঙ্গিক বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা তাঁহার অজর মনের অপরিমিত সৃষ্টি ক্ষমতারই পরিচায়ক। আঙ্গিকের দিক হইতে কবির জীবন সায়াহ্নের এই কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'পুনশ্চ' (১৯৩২)। কবি যখন ইংরেজী-গীতাঞ্জলির জন্য নিজের কবিতা অনুবাদ করেন তখন ছন্দোবদ্ধ ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী গদ্যেই অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে এই গদ্যানুবাদ কাব্যরূপেই সমাদৃত হয়। তখন হইতে গদ্য-কবিতার সম্ভাবনা বিষয়ে কবি সচেতন হইয়া উঠেন এবং প্রথম 'লিপিকা' কাব্যে গদ্য-

কাব্যের পরীক্ষা করেন। পুনশ্চতেই কবি গদ্য-কবিতার পূর্ণাঙ্গরূপ সৃষ্টি করিলেন। বাংলা কবিতার আঙ্গিকের ইতিহাসে এই কাব্যটি বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। এই পর্বের অন্যান্য রচনার মধ্যে প্রধান শ্যামলী (১৯৩৬), সেঁজুতি (১৯৩৮), নবজাতক (১৯৩৮), রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১) প্রভৃতি। কবির জীবনের অন্তিমপর্বে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের অসুস্থ আবহাওয়ার মধ্যে তিনি সারাজীবনের বিশ্বাসগুলি বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়াছেন। প্রবল নৈরাশ্য মাঝে মাঝে তাঁহার চিন্তা ভাবনায় বিষণ্নতা সঞ্চার করিয়াছে। মৃত্যুচেতনা ও রোগজীর্ণ দেহের গ্লানিও কোন কোন কবিতায় অবসাদের ছায়া ফেলিয়াছে। সঙ্কটাপন্ন মানব সভ্যতার জন্য আশঙ্কা এবং দুজ্ঞেয় জীবন-রহস্যের মর্মভেদ করিবার অক্ষমতাবোধ শেষদিকের কবিতা-গুলিকে বেদনাকরুণ করিয়া তুলিয়াছে।

কবির মৃত্যুর পরবৎসরে শেষ কয়েকদিনের রচনাগুলি 'শেষলেখা' (১৯৪২) বইটিতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

২। প্রশ্ন : রচনার কালক্রম অনুসারে রবীন্দ্রনাথের নাট্য সাহিত্যের পরিচয় দাও।

উত্তর : বাংলা থিয়েটার গড়িয়া তুলিতে যাঁহারা প্রথম উদ্যোগী হইয়া-ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার তাঁহাদের অন্যতম। গুণেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় ঠাকুরবাড়িতে অভিনয় চর্চার আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়া-ছিল। এই পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলিই রবীন্দ্রনাথকে অভিনয় এবং নাটক রচনার দিকে আকৃষ্ট করে। তাঁহার প্রথম গীতিনাট্য **বাল্মীকি প্রতিভা**"(১৮৮১) প্রভূত জনসমাদর লাভ করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রেরণায় দেশী-বিদেশী সঙ্গীত লইয়া পরীক্ষার সূত্রে গীতিনাট্য রচনার দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ হইয়াছিল। এই সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য গীতিনাট্য **মায়ার খেলা** (১৮৮৮)।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪) হইতেই রবীন্দ্রনাট্যধারার যথার্থ সূচনা হইয়াছে বলা যায়। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে কবি লিখিয়াছেন, "এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত।" প্রকৃতির প্রতিশোধের প্রধান চরিত্র একজন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী জাগতিক স্নেহপ্রেমের বন্ধনগুলি ছিন্ন করিয়া মুক্তির সাধনায় মগ্ন ছিল। শেষ পর্যন্ত একটি বালিকার প্রতি স্নেহের আকর্ষণে সে পৃথিবীর পথে ফিরিয়া আসে এবং স্নেহপ্রেমের মধ্যেই মহামুক্তির স্বাদ লাভ করে। জগৎকে স্বীকার করিয়াই সত্যকে লাভ করা যায়—এই মূল আইডিয়া প্রকৃতির

প্রতিশোধে নাট্যরূপ লাভ করিয়াছে। নাটকটিতে আত্মকেন্দ্রিক সন্ন্যাসীর সংলাপগুলি কাব্যে রচিত, সাধারণ মানুষের কথোপকথনের ভাষা গদ্য। প্রকৃতির প্রতিশোধের কেন্দ্রীয় আইডিয়াটির অনুবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনায়ও লক্ষ্য করা যায়, এই দিক হইতে নাটকটি গুরুত্বপূর্ণ।

ইহার পরে শেক্‌সপীয়রীয় নাট্য-রীতি অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ রাজা ও রানী (১৮৮৯) এবং বিসর্জন (১৮৯০) [ক. বি. ১৯৬৬] রচনা করেন। মালিনী (১৮৯৬) নাটকটিকেও এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত—বিভিন্ন দৃশ্যে বিন্যস্ত জটিল প্লট লইয়া রচিত 'রাজা ও রানী'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। জালন্ধর এবং কাশ্মীর—এই দুই বিরাট পটভূমির মধ্যে রাজা ও রানীর কাহিনীটি স্থাপিত। জালন্ধররাজ বিক্রমদেব রানী সুমিত্রার প্রতি ঐকান্তিক মোহে রাজার কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট। রাজার কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিবার জন্য সুমিত্রা স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃভূমি কাশ্মীরে উপনীত হন। বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হইয়া পরিণত হইয়াছে দুর্দান্ত হিংস্রতায় আত্মঘাতী প্রেম বিশ্বঘাতী হইয়া উঠিয়াছে। বিক্রম কর্তৃক সুমিত্রার পিতৃভূমি কাশ্মীর আক্রমণের সূত্রে নাটকটি চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু এই দ্বিতীয় পর্যায়ে মূল কাহিনীর তুলনায় সুমিত্রার ভ্রাতা, কাশ্মীরের যুবরাজ কুমারসেন ও ইলার প্রেমের কাহিনী অসঙ্গতভাবে প্রাধান্য লাভ করায় নাট্যকাহিনী দুর্বল হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ওই লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করছে ইলা ও কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসঙ্গত।" কাহিনীর পরিণামে কুমার ও সুমিত্রার মৃত্যু ঘটে নিতান্ত অতি-নাটকীয় ভাবে। নাটকটির এই দুর্বলতা সম্পর্কে কবি সচেতন ছিলেন—তাই পরবর্তিকালে 'তপতী' (১৯২৩) নাটকে কাহিনীটির নতুন রূপ দিয়াছিলেন। এই পর্বের রচনাবলীর মধ্যে বিসর্জনই (১৮৯০) শ্রেষ্ঠ নাটক। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত রীতির নাটকের মধ্যেই বিসর্জন শ্রেষ্ঠ রচনা। বিসর্জন ইতিপূর্বে রচিত রাজর্ষি উপন্যাসের নাট্যরূপ। অবশ্য উপন্যাসের কাহিনীটি নাটকে অনেক পরিমাণে রূপান্তরিত হইয়াছে। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের সহিত পুরোহিত রঘুপতির সংঘর্ষই বিসর্জনের নাট্য বিষয়। ভিখারিণী বালিকা অপর্ণার ছাগশিশু ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে বলি দেওয়া হইয়াছে। শোকার্ত অপর্ণার কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—'এত রক্ত কেন?' এই ব্যাকুল প্রশ্নের প্রতিক্রিয়ায় বিচলিত গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরারাজ্যে বলিদান বন্ধ করিয়া দেন। গোবিন্দমাণিক্য পূজার নামে রক্তপাত বন্ধ করিয়া দীর্ঘদিনের একটি সর্বজন-স্বীকৃত প্রথা উচ্ছেদ

করিলেন। পুরোহিত রঘুপতি এই আদেশকে রাজ্যের অধিকার বহির্ভূত কাজ মনে করে এবং রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিতে থাকে। রাজার বিরুদ্ধে রঘুপতি, রানী গুণবতী এবং রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায় একের পর এক আঘাত উদ্যত করিয়া তুলিয়াছে। প্রেমের ধর্ম এবং হিংসার মধ্যে এই প্রচণ্ড সংঘর্ষে স্পষ্টভাবে কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে পারে নাই একমাত্র জয়সিংহ। রঘুপতির পালিত পুত্র জয়সিংহ প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত আত্মোৎসর্গ করে। রঘুপতির কাছে রাজরক্ত আনিয়া দিবার প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ জয়সিংহ নিজের বুকের রক্ত দিয়া সব বিরোধের অবসান ঘটায়। জয়সিংহকে হারাইয়া শেষ পর্যন্ত নিদারুণ দুঃখের মধ্যে রঘুপতি প্রেমধর্মের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে। জয়সিংহের আত্মোৎসর্গেই প্রেমধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। কাহিনীর যুক্তিসংগত বিকাশে এবং চরিত্র রূপায়ণে কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও বিসর্জন অভিনয় সাফল্যের দিক হইতে রসোত্তীর্ণ রচনা। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যে বিসর্জনই সর্বাধিকবার অভিনীত হইয়াছে। মালিনী (১৮৯৬) নাটকেরও মূল বিষয় বিসর্জনেরই মতো প্রথাবদ্ধ ধর্ম এবং উদার মানবিক ধর্মের মধ্যে বিরোধ। স্বপ্নলব্ধ এই নাটকের কাহিনী কবি একটি বৌদ্ধজাতক কাহিনীর সহিত মিশ্রিত করিয়া পূর্ণাঙ্গ নাটকের রূপটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। জয়সিংহের মতো সুপ্রিয়র মৃত্যুতে এখানে প্রেমধর্মের জয় ঘোষিত হইয়াছে। এখানে সুপ্রিয় মৃত্যুবরণ করিয়াছে বন্ধু ক্ষেমঙ্করের আঘাতে। ক্ষেমঙ্করের পৌরুষদৃপ্ত চরিত্রটি একটি অসাধারণ সৃষ্টি।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রাজা' নাটক হইতে রবীন্দ্রনাট্যের একটি সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। **রাজা** (১৯১০), **ডাকঘর** (১৯১২), **অচলায়তন** (১৯১২), **ফাল্গুনী** (১৯১৬), **মুক্তধারা** (১৯১২) এবং **রক্তকরবী** (১৯২৬) রবীন্দ্র নাট্যধারার উত্তর পর্বের বিশিষ্ট সৃষ্টি। এই নাটকগুলিকে রূপক, সাঙ্কেতিক বা তত্ত্বনাট্য নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় এবং ইংরেজী সাহিত্যে রূপক নাটকের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিশেষভাবে মেটারলিঙ্ক-এর নাটক হইতে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। রূপক নাটকে বাহিরের ঘটনার চেয়ে ভাবেরই প্রাধান্য। নাটকে ঘটনা এবং চরিত্রগুলি এক একটি ভাবেরই প্রতিমূর্তি রূপে গড়িয়া উঠে। বিমূর্ত ভাবনাগুলি নানা ধরনের প্রতীকের সাহায্যে রূপক নাট্যে আকারবদ্ধ করিয়া তোলা হয়। ঘটনায় এবং চরিত্রের আচরণে বাস্তবধর্মিতার চেয়ে বিমূর্ত ভাবব্যঞ্জনাই প্রধান হইয়া উঠে। ঘটনা এবং চরিত্রগুলিকে ঘিরিয়া কল্পনার মায়ালোক সৃজিত হয়—এবং তাহার মধ্যে এক একটি প্রতীক অবলম্বন করিয়া নাটকারের মানসধৃত গূঢ় জীবন-ভাবনার..

বিশিষ্টতা বাঞ্ছিত হয়। রূপক নাটকের কাহিনী এবং ঘটনা ও চরিত্রের টানা-প'ড়েনে বাস্তব জীবনের রূপ নহে—আইডিয়ার জগৎটিকেই উদ্ঘাটিত করা হয়। সংলাপগুলির আপাত অর্থের মধ্যে গূঢ়তর ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। প্রেম, প্রকৃতি-চেতনা এবং সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার বিশিষ্টতাগুলিই তাঁহার রূপক নাটকে বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হইয়াছে। মনের দৃষ্টি উন্মোচিত না হইলে সুন্দরকে কখনো পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না—এই সত্যটি 'রাজা' নাটকে একটি বৌদ্ধজাতক কাহিনীর সহায়তায় রূপায়িত হইয়াছে। রানী সুদর্শনার রূপতৃষ্ণাই ছিল তাহার প্রেমের পথে অন্তরায়। কুৎসিত রাজা কখনো রানীকে নিজের রূপ দেখিতে দেন নাই। অন্ধকারে রাজার সত্যরূপ কেহ জানে না, এই সুযোগটি গ্রহণ করিয়া প্রতারক 'রাজবেশী' রানীকে কলুষিত করে। নিদারুণ লজ্জায়, আত্মগ্লানিতে রূপের মোহ ভুলিয়া সুদর্শনা অন্তরের দৃষ্টিতে যখন তাহার রাজার দিকে চাহিয়া দেখিল তখনই তাঁহাকে মনে হইল 'অনুপম'। সুদর্শনা দুঃখের মধ্য দিয়া সত্যকে একান্তভাবে অন্তরের মধ্যে লাভ করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছে। 'ডাকঘর' নাটকটিও 'রাজা'রই সগোত্র। এখানেও একজন অদৃশ্য রাজা আছেন যাহার আহ্বানে বালক অমলের আত্মা উৎকণ্ঠিত। বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালবর্তী যে স্রষ্টা, অমল তাহারই ডাক শুনিয়াছে। রাজার চিঠির জন্য তাহার উৎকণ্ঠা যেদিন শেষ হইল সেদিন দেখা গেল অমল চিরনিদ্রায় অভিভূত। অন্তরের মধ্যে সত্যকে যেদিন পরিপূর্ণভাবে লাভ করা যায় সেদিন বাহিরের আড়ম্বর থাকে না, অন্তর সেই বিরাটের মধ্যে কখন নিঃশব্দে মিশিয়া যায়। এই সংক্ষিপ্ত নাটকটি একটি অতুলনীয় রচনা। নাটকেও যে নিটোল লিরিক রচনা সম্ভব বাংলা সাহিত্যে ডাকঘরই তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নির্যাসিত সত্য রাজা এবং ডাকঘরে অপরূপ নাট্যকায়া লাভ করিয়াছে।

'অচলায়তন' আঙ্গিকের দিক হইতে রূপক-নাট্য হইলেও বিষয়ের দিক হইতে বিসর্জন ও মালিনীর সগোত্র। ধর্মের নামে যে নিষ্ঠুর প্রথাগুলি ভারতবর্ষীয় সমাজ জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া বিরাজিত, অচলায়তন নাটকে রবীন্দ্রনাথ তাহারই প্রতীক রচনা করিয়াছেন। এই নাটকের ঘটনা এবং চরিত্র পরিকল্পনায়, সংলাপ রচনায় রবীন্দ্রনাথের মনে বিদ্রূপ-পরায়ণতা যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে অন্য কোন নাটকে তেমন নির্মম বিদ্রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। অমানবিক এবং যুক্তিহীন আচার ও প্রথার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামশীল রবীন্দ্রনাথের মনের রুদ্ররূপ অচলায়তন নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে। যে গুরুর নামে মহাপঞ্চক অচলায়তনের অবরোধের মধ্যে প্রাণহীন আচারের শুদ্ধতা রক্ষার উৎকট আয়োজন ব্যতিব্যস্ত—সেই গুরুই

অস্পৃশ্য শোনপাংশুদের লইয়া প্রাচীর ভাঙিয়া বৃহৎ জগতের সহিত অচলায়তনকে একাকার করিয়া দেন। শুচিঅশুচি বিচারের ভারমুক্ত হইয়া এখানকার মানুষগুলি স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে মুক্তি পায়।

মুক্তধারা এবং **রক্তকরবী** নাটকে প্রতিরূপ হইয়াছে আধুনিক সভ্যতার মর্ম-নিহিত সংকট। মুক্তধারায় শিবতরাই রাজাকে বশীভূত করিবার জন্য উত্তরকূটের রাজা যন্ত্রশক্তির সহায়তায় এক মহাকায় বাঁধ রচনা করিয়া শিবতরাই-এর তৃষ্ণার জলধারার গতিরোধ করিয়াছে। জাতি-অভিমান এবং মানুষের মর্মগত লোভ বিজ্ঞানের অপব্যবহারের দ্বারা জীবনে যে সংকট সৃষ্টি করে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিশ্বমহাযুদ্ধ দুটি। মুক্তধারা নাটকে সেই ইতিহাসেরই প্রতীকাভাস পরিস্ফুট। কুমার অভিজিৎ আপন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া মুক্তধারার বাঁধ ভাঙিয়া দিয়াছে, শিবতরাই-এর মানুষের তৃষ্ণার জল তাহাদের ফিরাইয়া দিয়াছে। যন্ত্রের এবং মানুষের লোভের কবলমুক্ত বাধাহীন প্রাণ-প্রবাহের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে মুক্তধারার প্রবাহ। রক্তকরবী নাটকেও অনুরূপভাবে যন্ত্রশক্তি নির্ভর ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা অপহরণ ও মনুষ্যত্বের নিরন্তর অবমাননার নগ্নরূপ তুলিয়া ধরা হইয়াছে। রক্তকরবীর জগতে শোষণ ব্যবস্থার কেন্দ্রে আছে রাজা—যে যন্ত্রের সহস্রবাহু দ্বারা ভূগর্ভ হইতে সোনার পিণ্ড আহরণ করিয়া পুঞ্জিত করিয়াছে। এই বিপুল ঐশ্বর্য কাহার কোন্ প্রয়োজনে লাগিবে কেহ জানে না। এখানকার সমাজ ও মানুষগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক যান্ত্রিকভাবে রচিত। উৎপাদন ব্যবস্থায় সহায়তা ভিন্ন মানুষের অন্য কোন মূল্য এখানে স্বীকার করা হয় না। রক্তকরবীর সমাজব্যবস্থায় আধুনিক পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটিয়াছে। এই যান্ত্রিকতার মধ্যে বন্ধনমুক্ত সহজ প্রাণের প্রতীক নন্দিনীর উপস্থিতি নাটকটিতে বহুমুখী দ্বন্দ্বের সূচনা করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত নন্দিনীর হাত ধরিয়া রাজা সহজ জীবনের জন্য ব্যাকুলতা লইয়া অগ্রসর হইয়া যায়। যে কিম্ভূত জালাবরণের আড়ালে রাজা বাস করিত তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকগুলির মধ্যে ডাকঘর এবং এই রচনা দুটি নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত শিল্প-সিদ্ধির নিদর্শন।

সিরিয়াস নাটকে যেমন, প্রহসন এবং কমেডিজাতীয় লঘুরসের নাটকেও রবীন্দ্রনাথ সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার লঘুরসের রচনার মধ্যে **বৈকুণ্ঠের খাতা** (১৮৯৭), **চিরকুমার সভা** (১৯২৮), **শেষরক্ষা** (১৯২৮) বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রহসনগুলি সামাজিক সমস্যার উপরেই একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। বিভিন্নশ্রেণীর মানুষের চারিত্রগত বিকার-বিকৃতির প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ ছিল এই শ্রেণীর রচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ কৌতুকরস সৃষ্টির জন্য ব্যক্তি-চরিত্রের উপরে নির্ভর করিয়াছেন। ব্যক্তি-চরিত্রের কৌতুকবহ অসঙ্গতিই তাঁহার কমেডির উজ্জ্বল হাস্যরসের উৎস

জীবনের একেবারে শেষপর্বে কবি নাটকের সম্পূর্ণ একটি নূতন মাধ্যম উদ্ভাবন করেন। জীবনের সূচনায় গীতিনাট্য রচনাদ্বারা শিল্পের এই শাখায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন আর অন্তিমপর্বে সঙ্গীতের সহিত নৃত্যের সংযোগে নৃত্যনাট্যের এক অসাধারণ শিল্প-মাধ্যম সৃষ্টি করিলেন। তাসের দেশ (১৯৩৩), চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), চণ্ডালিকা (১৯৩৮) এবং শ্যামা (১৯৩৯) নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথের শিল্প প্রতিভার একটি সম্পূর্ণ নূতন রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য, এই নাটকগুলি সঙ্গীত এবং নৃত্য-বাহিত বলিয়া সাহিত্যের গণ্ডির মধ্যে পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের মতো এমন বিপুল সৃষ্টিবৈচিত্র্য এবং শিল্পোৎকর্ষের নিদর্শন আমাদের অন্য কোন নাট্যকারের রচনায় নাই। রবীন্দ্রনাথের নাটক বাংলা নাটকের ধারাবাহিক ইতিহাসের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জগৎ। বাংলাদেশের পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কখনো নিবিড় ছিল না। দু'একজন উৎসাহী পরিচালক তাঁহার নাটক ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অভিনয়ের আয়োজন করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। এই ব্যর্থতায় অবশ্য রবীন্দ্র-নাথের নাটকের অভিনয়যোগ্যতার অভাব প্রমাণিত হয়। মনে হয় আমাদের রঙ্গমঞ্চে যে ধরনের পুরাণ-ইতিহাস আশ্রিত নাটকের প্রচলন ছিল নাট্যরসিক রুচি তাহারই প্রভাবে গঠিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের রসগ্রহণ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের লইয়া তাঁহার নাটকগুলি অভিনয় করিয়াছেন। কখনো শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেও অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই। কালের পরিবর্তনে লোক-রুচিরও পরিবর্তন হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ক্রমেই বাংলা দেশের জনরুচিকে পরিশীলিত করিয়া তুলিয়াছে। আজ দেখা যাইতেছে, রবীন্দ্রনাথের নাটক বিভিন্ন অভিনেতৃ সংঘ কর্তৃক ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বহুবার অভিনীত হইতেছে। এতদিন রবীন্দ্রনাট্য-সাহিত্যকে মঞ্চের সহিত সম্পর্ক-রহিত নিছক সাহিত্য হিসাবে দেখা হইত কিন্তু সাম্প্রতিক কালের নতুন অভিনেতৃগোষ্ঠীগুলির চেষ্টায় এই ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একটু বিলম্বিত হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার প্রভাব যে দূরপ্রসারী হইবে ইহাও নিশ্চিত।

৩। রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাটকগুলির নাট্যকলা ও রস-আবেদন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ। [ক. বি. ১৯৬৭]

উত্তর-সংকেত ঃ ২ নং প্রশ্নের উত্তরের নিম্ন অংশ লিখিতে হইবে ঃ—১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজা নাটক···চূড়ান্ত শিল্পসিদ্ধির নিদর্শন।

(১২৬-২৮ পৃঃ)

৪। প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রনাথের প্রধান উপন্যাসগুলির পরিচয় দিয়া বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁহার রচনার বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা, উপন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

[ব. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫]

উত্তর ঃ বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির পাশে স্থান পাইতে পারে এমন বাংলা উপন্যাসের কথা ভাবিতে গেলে একমাত্র 'গোরা'র নাম মনে আসে। রবীন্দ্রনাথই মহত্তর বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের মত লিরিক প্রতিভার মধ্যে ঔপন্যাসিকের বস্তুনিষ্ঠ জীবন সৃষ্টির এবং ব্যাপক পটভূমিতে জীবনের জটিল বিন্যাসের তাৎপর্য বিশ্লেষণের যোগ্য বীক্ষণ শক্তির অস্তিত্ব বিস্ময়কর। অথচ কাব্যের মতোই উপন্যাসও রবীন্দ্র প্রতিভার আত্মবিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মাধ্যম। উপন্যাসের শাখাতেও আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক হইতে তাঁহার নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একটি ধারাবাহিক ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে।

কালের হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুখানি উপন্যাস **বৌঠাকুরানীর হাট** (১৮৮৩) এবং **রাজর্ষি** (১৮৮৭) উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাসের ধারার অন্তর্ভুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মতো রবীন্দ্রনাথের উপরেও এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অনিবার্যভাবে পড়িয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলিই কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরস পিপাসা নিবৃত্ত করিত—একথা কবি নিজেই বলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে সুদূর ইতিহাসের পটভূমির মধ্যে কল্পনাকে অবাধ মুক্তি দিবার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন—রমেশচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান ঔপন্যাসিকগণ সেই দৃষ্টান্তই অনুসরণ করিয়াছেন। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে ইতিহাস হইতেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের এই প্রাথমিক রচনারও প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় নাটকীয় ঘটনার সমারোহ এবং যুদ্ধবিগ্রহের উত্তালতা কোথাও নাই। ঐতিহাসিক পটভূমির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কজাল ও সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তির লীলার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। **বৌঠাকুরানীর হাটে** প্রতাপাদিত্যের পারিবারিক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে প্রতাপাদিত্যকে জাতীয়-বীর রূপে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যকে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর চরিত্র রূপেই আঁকিয়াছেন। উপন্যাসটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বসন্ত রায় চরিত্রটি। উদয়াদিত্য এবং বিভার জীবনের ব্যর্থ পরিণামই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় রসের অবলম্বন। রাজর্ষি উপন্যাসের পটভূমি ত্রিপুরা। রাজা গোবিন্দমাণিক্য এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে বলিদান বন্ধ করিয়া দেওয়ায় গোবিন্দমাণিক্য এবং পুরোহিত রঘুপতির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের ভ্রাতৃদ্রোহের সূত্রে এই বিরোধ জটিলতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র জয়সিংহ। জয়সিংহের ভাবুকতা এবং প্রকৃতি প্রেমের বর্ণনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা অবাধ মুক্তির সুযোগ পাইয়াছে। রাজর্ষি উপন্যাসে যে প্রেম ও প্রতাপের দ্বন্দ্বের কথা বলা হইয়াছে সেই আইডিয়াটি রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নে দেখা একটি ঘটনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অবশ্য উপন্যাসের মূল ঘটনাগুলি প্রকৃত ইতিহাস-নির্ভর। চরিত্র চিত্রণ এবং ঘটনা বিন্যাসের দিক হইতে বৌঠাকুরানীর হাটের তুলনায় রাজর্ষি অনেক পরিণত রচনা।

বাংলা উপন্যাসের ধারায় যুগান্তর ঘটে রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি উপন্যাসে। রাজর্ষির বেশ কিছুদিন পরে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে চোখের বালি প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে কথা সাহিত্যের ছোটগল্প নামক নূতন শাখাটি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই ছোটগল্প রচনাকে কবি কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন 'ছোট গল্পের উল্কাবৃষ্টি'। প্রত্যক্ষ জীবনের যে রূঢ়স্পর্শ ছোট-গল্পগুলিতেই প্রথম অনুভব করা যায়, চোখের বালিতে সেই বাস্তব সংসারের জীবনযাত্রারই পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ দেখা গেল। চোখের বালির বিষয়টি সামাজিক পটভূমি আশ্রিত, কিন্তু ইহাই চোখের বালির বিশিষ্টতা নহে। সামাজিক পটভূমি-নির্ভর উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রও লিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ কিংবা রমেশচন্দ্রের সমাজ, সংসার এবং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর স্বর্ণলতার পটভূমি সামাজিক। পূর্ববর্তী সামাজিক উপন্যাসগুলি হইতে চোখের বালি ভিন্ন। জীবনের সমস্যাগুলি উপস্থাপনের ভঙ্গিতে গল্প রচনার এই ভঙ্গিগত ভিন্নতার মূলে আছে জীবনসৃষ্টিরই বিভিন্নতা। কথাটা রবীন্দ্রনাথ নিজে চোখের বালির ভূমিকায় সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন : "আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রসসম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। কিন্তু সেই প্রথম পালার পনরাবৃত্তি হতে পারে না। ...এবারকার গল্প বানাতে হবে এ-যুগের কারখানা ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হত এখনও হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখানকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজ-সজ্জায় অলংকারে তাকে আছন্ন করলে

তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানাঘরে, যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনী থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানব জীবনে বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণ পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায়নি।... সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের কথা বের করে দেখানো।" সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মানুষগুলি যেন ছিল বাহিরের ঘটনার জগতের মানুষ। আধুনিক লেখকেরা মানুষকে দেখেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে। মনের জগতের রহস্যলোক যদি উদ্ঘাটন না করা যায় তাহা হইলে চরিত্রের সব কয়টি dimension লেখার মধ্যে পরিস্ফুট হয় না। 'আঁতের কথা' বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো তাই আধুনিক উপন্যাসে নূতন পদ্ধতিরূপে দেখা দিয়াছে। সাহিত্যে ইহারই পারিভাষিক নাম মনো-বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালিতেই চরিত্র রূপায়ণের এই নূতন পদ্ধতি প্রথম প্রযুক্ত হয়, সুতরাং চোখের বালিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস বলা যায়। চোখের বালির প্রধান চরিত্র চারিটি—বিনোদিনী, মহেন্দ্র, বিহারী ও আশা। পারস্পরিক আকর্ষণ বিকর্ষণের টানে ইহাদের মধ্যে এক জটিল সম্পর্কের জাল রচিত হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্রগুলির মনোলোকের বিচিত্র প্রবৃত্তির তাড়না পরস্পরের উপরে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে—মনো-বিশ্লেষণের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই বিশ্লেষণ এবং চরিত্রগুলির সম্পর্ক গ্রন্থিজটিল করিয়া তোলার প্রতিটি স্তর বাস্তবতার দিক হইতে যুক্তিসংগত। চোখের বালির এই রূপায়ণ পদ্ধতি বাংলা উপন্যাসে নূতন যুগের সূচনা করিয়া দেয়।

চোখের বালির পরের উপন্যাস নৌকাডুবিতে (১৯০৬) রবীন্দ্রনাথ তেমন সৃষ্টিনৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই।

ইহার কিছুদিন পরে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'গোরা' উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ জিজ্ঞাসা ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের যে মর্মবাণী উদ্ঘাটন করিয়াছিল—সেই বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যের বাণীই গোরা উপন্যাসের মর্মগত বক্তব্য। গোরা স্বদেশের প্রকৃত স্বরূপ জানিবার ব্যাকুলতা লইয়া বৃহৎ জনসমাজের সহিত নিজেকে মিলাইতে চাহিয়াছে। কিন্তু তাহার নিজেরই মধ্যে ছিল এই উপলব্ধির পথে প্রচণ্ড বাধা। গোরা কায়মনোবাক্যে হিন্দু জীবনাদর্শকেই অবলম্বন করিয়াছে, নিষ্ঠাবান হিন্দুর আচারকেই সে শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ বলিয়া জানে। তাহার এই স্থির বিশ্বাস যেখানেই

প্রতিহত হইয়াছে সেখানেই সে তাহার প্রবল ব্যক্তিত্বের শক্তি লইয়া সংগ্রাম করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজকে হিন্দুয়ানির আদর্শের মধ্যে যে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করা যায় না পদে পদে গোরা তাহা অনুভব করিয়াছে। যে গোরা ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্য হইতে প্রকৃত ভারতবর্ষের রূপটি আবিষ্কার করিতে চায়—অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের হাতের জলপান করিতে তাহার চিত্ত সঙ্কুচিত হয়। গোরা এই ভিতর বাহিরের দ্বন্দ্বের পথে অগ্রসর হইয়াছে, জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসায় তাহার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত ; শেষ পর্যন্ত একদিন জানিতে পারে যে সে নিজে হিন্দুর সন্তান নয়—হিন্দুর ঘরে লালিত হইয়াছে মাত্র। এই সংবাদ তাহার অন্তরের ভিতরের সঙ্কীর্ণতার প্রাচীরটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাকে যেন যথার্থ মুক্তির স্বাদ দিল। গোরা বিস্মিত আনন্দে আনন্দময়ীর মধ্যেই সমগ্র ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করিয়াছে। বিজাতীয় মানুষের পরিত্যক্ত সন্তান গোরাকে আনন্দময়ী যে অকৃত্রিম স্নেহে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন—তাহার মধ্যে তো এতটুকু ফাঁকি ছিল না। ভিন্ন জাতীয় বলিয়া গোরার প্রতি তাঁহার চিত্ত তো কোন দিন বিমুখ হয় নাই। ভারতবর্ষ আনন্দময়ীর মতোই সকলকে আপন নীড়ের মধ্যে আশ্রয় দিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া আছে। গোরার এই উপলব্ধিতে উত্তরণেই উপন্যাসটি শেষ হয়। বিশাল পটভূমির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জীবনাচরণ এবং ভিন্নমুখী জীবন-বিশ্বাসের সংঘর্ষের মধ্য দিয়া গোরার আত্মোপলব্ধির স্তরগুলি উন্মীলিত করিয়া তুলিয়াছেন ; পটভূমির বিশালতা উপন্যাসটিকে মহাকাব্যের মহিমা দান করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশ জিজ্ঞাসারই ভিন্নতর প্রকাশ দেখা যায় **ঘরে বাইরে** (১৯১৬), **চতুরঙ্গ** (১৯১৬), এবং **চার অধ্যায়** (১৯৩৪) উপন্যাসে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে নানা সংশয় ছিল। দেশের জনসাধারণের মনে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করিয়া তোলা এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কার্যক্রমকেই রবীন্দ্রনাথ প্রধান কর্তব্য মনে করিতেন। অথচ বিভিন্ন সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে নিষ্ঠাহীন, দুঃখের সাধনার প্রতি বিমুখ উত্তেজনাসর্বস্ব প্রমত্ত উচ্ছ্বাসটাকেই বড়ো করিয়া তুলিবার প্রয়াস লক্ষ্য করিয়াছেন। সাময়িক উত্তেজনার মধ্যে শক্তির অপচয় কবিকে পীড়িত করিত। এই প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে ঘরে বাইরে এবং চার অধ্যায় উপন্যাসে। ঘরে বাইরের বিমলা এবং চার অধ্যায়ের এলার জীবনের বিপর্যয়ে এই মনুষ্যত্ব ও ন্যায়নীতি বিরোধী রাজনৈতিক প্রমত্ততার শোচনীয় দিক উদ্ঘাটিত হইয়াছে। চতুরঙ্গের শচীশ চরিত্রে গোরার মত প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নায়ক কল্পনার অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। শচীশ এবং গোরার জীবন সমস্যার অবশ্য কোন সাদৃশ্য নাই। অশান্ত

অনুসন্ধিৎসায় চঞ্চল শচীশ যে শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যে আত্মমগ্ন হইয়া সত্যের সন্ধান লাভ করিল—এইরূপ একটি অস্পষ্ট পরিণতি ঘটায় উপন্যাসটিতে গোরার মতো কোন বলিষ্ঠ বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ একটি বৃহৎ উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা লইয়া **যোগাযোগ** (১৯২৯) উপন্যাসটি শুরু করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল তিন পুরুষের জীবনের পটভূমি এই উপন্যাসের অঙ্গীভূত করবেন, কিন্তু শুধু প্রথম পর্বটিই রচিত হইয়াছে। অবশ্য কাহিনীটি যে ভাবে শেষ হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে অসম্পূর্ণ রচনা মনে হয় না। যোগাযোগ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুমুদিনী বা কুমু। তাহার মনের প্রধান সমস্যা দাদা বিপ্রদাসের শিক্ষার সহিত স্বামী মধুসূদনের জীবনাদর্শের সামঞ্জস্য বিধানের অক্ষমতা হইতে জাত। কুমু চরিত্রে নারী-ব্যক্তিত্বের একটি অপূর্ব রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রাচীন আভি-জাত্যের আবহাওয়ায় লালিত কুমু আধুনিক বিত্তবান মধুসূদনের সর্বগ্রাসী প্রভুত্ব এবং বিত্তের অহমিকাকে কিছুতেই অন্তরের সহিত মানিয়া লইতে পারে না। স্বামী সম্পর্কে তাহার মনে যে আইডিয়া ছিল মধুসূদনের মধ্যে সে তাহার বিরূপতাই দেখিয়াছে। উপন্যাসটির মূলে আছে দুটি পৃথক জীবনা-দর্শেরই বিরোধ। উপন্যাসটির প্রধান অংশ কুমুর মানসিক সংগ্রামের ইতিহাস। বিচিত্র ঘটনার সমবায়ে এবং বিস্তৃত মনোবিশ্লেষণে উপন্যাসটিতে একটি জটিল কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। পটভূমির বিশালতা এবং রচনা নৈপুণ্যের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে গোরার পরেই যোগাযোগের স্থান।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা **'শেষের কবিতা'** (১৯২৯)। যোগাযোগের মতো সিরিয়াস উপন্যাস লেখার পর কবির মন যেন অন্যতর রসের ক্ষেত্রে মুক্তি চাহিতেছিল। শেষের কবিতায় লিরিকের প্লাবনটাই মুখ্য। অমিত, লাবণ্য, শোভনলাল, কেটির প্রেমের কাহিনী এমন একটা বাস্তবতার স্পর্শরহিত আবহাওয়ায় স্থাপিত যে, ইহার কোন সমস্যাই উপন্যাসোচিত হইয়া উঠে নাই। উপন্যাস হিসাবে শেষের কবিতার মূল্য খুব বেশি না হইলেও এই বইটিতে গদ্য ভাষার এক নূতন ঐশ্বর্য কবি বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন। শেষের কবিতার অনিন্দ্যসুন্দর ভাষাই পাঠকের চিত্ত হরণ করে, কিন্তু জীবনের বাস্তব মৃত্তিকার সহিত সম্পর্ক রহিত এই লিরিক প্রেমের বিচিত্র উপাখ্যান ঠিক খাঁটি উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে না।

৪। প্রশ্ন ঃ ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে আলোচনা কর। [ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫]

বা, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ও রসোৎকর্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৬]

বা, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬২, ১৯৬৩]

বা, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পল্লীজীবনের সহিত লেখকের বাস্তব ও অন্তরঙ্গ পরিচয় সূত্রটি নির্দেশ কর। [ক. বি. ১৯৬৮]

উত্তর: বিশ্বসাহিত্যে 'ছোটগল্প' আধুনিকতম শাখা, কোন সাহিত্যেই ছোট গল্পের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। কিন্তু কথাসাহিত্যের এই শাখায় পৃথিবীতে এমন কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহাদের সৃষ্টি নৈপুণ্যে ছোটগল্প একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্পকার্যের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সার্থক প্রবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ আজ পর্যন্ত একটি বিশেষ মর্যাদার আসন অধিকার করিয়া আছেন। উপন্যাসের সহিত তুলনা করিলে ছোটগল্পের স্বরূপ সহজে বোঝা যায়। উপন্যাসে যেমন গদ্য ভাষার বাস্তব জীবনের পটে মানুষের বিচিত্র হৃদয়বৃত্তি এবং জীবন-সমস্যা রূপায়িত করা হয়, ছোটগল্পের বিষয়ও সেইরূপ জীবনের বাস্তব মৃত্তিকা হইতেই সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু উপন্যাস ও ছোটগল্পের রূপায়ণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপন্যাসে পটভূমির বিশালতা এবং জীবনের বিচিত্র জটিল রূপ যেভাবে রূপায়িত হয়—মহাকাব্যের সহিত তাহা তুলনাযোগ্য। অন্যপক্ষে ছোটগল্পের একটি আবেগঘন মুহূর্তের পটে জীবনের গূঢ়তর তাৎপর্য কোন চরিত্র বা ঘটনার মধ্যে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে। গীতি-কবিতার মতো সংহত এবং ব্যঞ্জনাময় ভাবে একটি নিবিড় পরিবেশের মধ্যে ক্ষণিক আলোকের দীপ্তিতে জীবন রহস্যের গভীরতম রূপ উন্মোচন ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছোটগল্প লেখককে জীবনের বিশাল পটভূমি হইতে এমন কোন একটি অংশ নির্বাচন করিয়া লইতে হয়, যাহার মধ্যে সংক্ষিপ্ত পরিসরেও সমগ্রের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট করা সম্ভব। এই দিক হইতে ঔপন্যাসিক এবং ছোট গল্প-কারের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত পৃথক। উপন্যাস ও ছোটগল্পের পার্থক্য শুধু রচনার আয়তনের পরিমাণগত পার্থক্য নয়, ছোটগল্প-লেখক জীবনকে যে দৃষ্টিতে দেখেন তাহা ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে পৃথক।

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনা শুরু করিয়াছিলেন সাময়িক পত্রিকার তাগিদে। 'হিতবাদী' পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের জন্য প্রতি সপ্তাহে রচনা সরবরাহের প্রতিশ্রুতি পালন ছোটগল্প রচনার প্রত্যক্ষ হেতু। কিন্তু এই শিল্প-মাধ্যমটির

বিষয়ে কবি যে ইতিপূর্বেই মনের মধ্যে প্রেরণা বোধ করিয়াছিলেন—তাহার প্রমাণ হিসাবে ১২৯১ সালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত 'ঘাটের কথা' নামক রচনাটির কথা উল্লেখ করা যায়। 'ঘাটের কথা' এবং 'রাজপথের কথা' রচনা দুটিতে ছোটগল্পের যে আভাস দেখা দিয়াছিল তাহারই পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা গেল হিতবাদী পত্রিকায় পর পর প্রকাশিত—'দেনাপাওনা', 'গিন্নী', 'পোস্ট-মাস্টার', 'ব্যবধান' প্রভৃতি গল্পে। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহ পতিসর অঞ্চলে বসবাস করিতেন। বাংলাদেশের উদার আকাশ এবং প্রান্তর—বাংলাদেশের নদী এবং পল্লীগ্রামের খাঁটি বাঙালী জীবনযাত্রার নিবিড় সান্নিধ্য কবির মনে নূতন অভিজ্ঞতার স্বাদ আনিয়াছিল। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের কল্পনা বাস্তব সংসারের মধ্যে যথার্থভাবে মুক্তি পায়। নদীপথে ঘুরিয়া বেড়ানোর সেই দিনগুলিতেই কবি খুব অন্তরঙ্গভাবে বাংলাদেশের মানুষের বিচিত্র সুখ-দুঃখে আন্দোলিত জীবনযাত্রার পরিচয় জানিবার সুযোগলাভ করিয়াছিলেন। নিত্য সচল মানব জীবনের ধারা কবির মনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করিয়া তুলিতেছিল ছোটগল্পের ধারায় তাহারই প্রকাশ ঘটিয়াছে। রচনাকাল এবং রচনার পরিবেশের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়। ছোটগল্পের প্রথম যুগটির পটভূমি বিশেষভাবে পদ্মা তীরবর্তী পল্লীজীবন এবং বাংলার পল্লীপ্রকৃতি। এই পর্বের বিখ্যাত গল্প অতিথি, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, শাস্তি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, ক্ষুধিত পাষাণ, নষ্টনীড়, পোস্ট মাস্টার প্রভৃতি। বিষয়বস্তু বিশিষ্টতার জন্য কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম সত্ত্বেও এই পর্যায়ের গল্পে সাধারণভাবে বাংলাদেশের পল্লীপ্রকৃতির স্নিগ্ধতা এবং বিশেষভাবে বাঙালী জীবনের বৈচিত্র্যহীন পটভূমির ছোট ছোট সুখ-দুঃখের তরঙ্গগুলিই নিবিড় নিটোল রসরূপ লাভ করিয়াছে। এই সব গল্পে যে মানুষগুলি আমাদের চিত্তের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তাহারা আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের চেনা মানুষ। ইহাদের জীবনসমস্যায় হয়তো বিশ্বজনীন জীবনসমস্যার ছায়া পড়িয়াছে কিন্তু ইহারা একান্তভাবে বাঙালী সমাজেরই মানুষ। নিতান্ত সহজ সরল প্রাণের ছোট ছোট আনন্দ-বেদনার স্পন্দন, আপাতদৃষ্টিতে যাহা একান্ত তুচ্ছ—এই গল্পগুলিতে তাহারই নিটোল রসরূপ রচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পের মধ্যে এই পর্যায়ের রচনাগুলিই শ্রেষ্ঠতম।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়টি 'সবুজপত্র' পত্রিকার সহিত যুক্ত। এই পর্বের গল্পের মধ্যে হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, স্ত্রীর পত্র প্রভৃতি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। জীবনের সমস্যাগুলি এখানে কবি নিতান্ত বুদ্ধিগত-ভাবে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বাভাবিক হৃদয়ানুভূতির নিবিড়তার পরিবর্তে এই পর্যায়ের গল্প বুদ্ধির আলোক-দীপ্তিতে উজ্জ্বল। সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের সহিত নূতন ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবিত মানুষের দ্বন্দ্ব

বিরোধের মধ্যে আধুনিক মানসিকতাই এই গল্পগুলিতে প্রতিফলিত। ভাষার ভঙ্গিতেও দেখা দিয়াছে শাণিত বুদ্ধির দীপ্তি।

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় এবং শেষ পর্যায়ের গল্পের মধ্যে 'তিন সঙ্গী'র তিনটি গল্পের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবিবার, শেষ কথা এবং ল্যাবরেটোরি একান্ত ভাবে আধুনিক জীবনের জটিল সমস্যাগুলির উপরে নির্ভর করিয়া রচিত। এই গল্পের ভাষাশৈলী, চরিত্র রূপায়ণ পদ্ধতি এবং সমস্যার গ্রন্থি উন্মোচনে তীক্ষ্ন বুদ্ধিগত কলা-কৌশলের প্রয়োগ চমকপ্রদ—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্ব যুগের গল্পগুলির মতো নিবিড় রসাস্বাদ এই গল্পে নাই।

রবীন্দ্রনাথের বিপুল সংখ্যক ছোটগল্পের মধ্যে মানুষের হৃদয়ানুভূতির রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে। বিচিত্র ধরনের মানুষ তাহাদের জীবন সমস্যার অনন্যতা লইয়া রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের জগৎটিকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই মানুষগুলি আমাদের মনের জগতে অক্ষয় হইয়া বিরাজ করে এবং, জীবনের এক-একটি আনন্দোজ্জ্বল বা বেদনাদীর্ণ মুহূর্তের স্মৃতি জাগাইয়া রাখে। বাস্তব সংসারে যে-সব অনুভূতি নিয়ত আমাদের হৃদয়ে উন্মীলিত নিমীলিত হয়—রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের জগতে তাহার সামগ্রিক রূপ চিরকালের ভাষায় অঙ্কিত হইয়া আছে। এই সমগ্রতাই তাঁহার সৃষ্টিকে মহৎ সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত করিয়াছে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখকের মর্যাদা দেওয়া হয়।

ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের স্টাইল বা রচনারীতি তাঁহার গল্পগুচ্ছকে অমর করিয়াছে। স্বকীয়তা মহৎ প্রতিভার ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প তাঁহার স্বকীয় ঔজ্জ্বল্যে অত্যুজ্জ্বল। বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সময়েই রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে তাঁহারা সাহিত্যের এই বিশেষক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন কবি হিসাবে। কিন্তু কবিখ্যাতি বাদ দিলেও গল্পলেখক হিসাবে তাঁহার স্থান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখকদের নীচে নহে। তাঁহার গল্পের উৎকর্ষ—ভাবগাম্ভীর্য, রস নিষ্পত্তিতে, আঙ্গিক কুশলতায়; রচনারীতির ঔজ্জ্বল্যে, ব্যঞ্জনায়, প্রতীতির সমগ্রতায়।

৫। প্রশ্ন : রবীন্দ্র সমসাময়িক ও পরবর্তী কয়েকজন প্রখ্যাত ছোট-গল্প লেখক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

উত্তর : একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করিয়া ছোটগল্পে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রচনা সংখ্যায় বিপুলতায় প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে

আপাততুচ্ছ বিষয়বস্তুর মধ্যেই অসাধারণ রসস্ফূর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। গল্প রচনার জন্য তিনি একান্তভাবে বাঙালীর পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের সহজ ধারাটির উপরেই নির্ভর করিয়াছেন। ছোটগল্পের রসসৃষ্টিতে বিষয়বস্তুর চেয়ে রচনা নৈপুণ্যই যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাতকুমারের গল্প আমাদের বার বার এই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। তুচ্ছতম বিষয়ও রচনা নৈপুণ্যে অমূল্য শিল্পকলায় পরিণত হইতে পারে—প্রভাতকুমার তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো কল্পনার ঐশ্বর্য এবং অনায়াসে গভীরতর জীবন রহস্য ব্যঞ্জিত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা, তাঁহার ছিল না, কিন্তু প্রভাতকুমার একটি কৌতুকোজ্জ্বল পরিমার্জিত মনের অধিকারী ছিলেন। ওই কৌতুক রসের মিশ্রণেই তাঁহার গল্প উপভোগ্য হইয়া উঠে। অনাবিল কৌতুকরসের শিল্প হিসাবে প্রভাতকুমারের 'মাষ্টার মহাশয়', 'বলবান জামাতা', 'রসময়ীর রসিকতা' প্রভৃতি গল্প বাংলা সাহিত্যের সম্পদরূপে চিরদিন সমাদৃত হইবে। তাঁহার করুণরসের গল্পের মধ্যে 'আদরিণী' এবং 'দেবী' বিখ্যাত।

বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক **শরৎচন্দ্র** কিন্তু ছোট-গল্পের ক্ষেত্রে তেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। শরৎচন্দ্র বিশেষভাবে ঔপন্যাসিকের প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে ছোটগল্প—ছোটগল্পের আয়তন সীমা ছাড়াইয়া যায়। ফলে রামের সুমতি বা বিন্দুর ছেলের মতো রচনায় উপন্যাসেরই একটা সংক্ষিপ্ত আকার গড়িয়া উঠে, ছোটগল্প হয় না। তাঁহার যে সামান্য কয়েকটি রচনায় ছোটগল্পের আয়তন-সীমা অক্ষুণ্ণ আছে তাহার মধ্যে 'অভাগীর স্বর্গ' এবং 'মহেশ'ই রসোত্তীর্ণ রচনা।

প্রমথ চৌধুরী প্রাবন্ধিক হিসাবেই বিখ্যাত, কিন্তু তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে বাংলা ছোটগল্পও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রমথ চৌধুরীর মন ছিল য়ুরোপীয় সাহিত্য চর্চায় পরিমার্জিত। য়ুরোপীয় সাহিত্যের, বিশেষভাবে ফরাসী সাহিত্যের ছোটগল্পের কলানৈপুণ্যকে তিনি আদর্শ মনে করিতেন। তাঁহার রচনায় ফরাসী লেখকদের কলাকৃতি অনুবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। 'রাম শ্যাম', 'ভূতের গল্প', 'ফরমায়েসী গল্প'—প্রভৃতি রচনায় প্রমথ চৌধুরী ছোটগল্পের আঙ্গিকে নতুন আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি-দীপ্ত শাণিত ভাবাভঙ্গিই এই গল্পগুলিকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করিয়াছে।

আধুনিক কালের বাংলা কথা সাহিত্যে উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পের শাখাটিই অধিকতর সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র পরবর্তী লেখকদের রচনায়

ছোটগল্পের শিল্পরূপ যে পরিমাণ উৎকর্ষলাভ করিয়াছে—সাহিত্যের অন্য কোন শাখায় অনুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে বাংলা ছোটগল্প বিস্ময়কর সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। একালের ছোটগল্পের শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পরশুরাম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র। গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত পরশুরামের গল্পগুলিতে বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে তিনি যে হিউমার রস সৃষ্টি করিয়াছেন বাংলা সাহিত্যে তাহা অতুলনীয়। পরশুরামের গল্পের জগৎটিকে যতোই উদ্ভট মনে হউক একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায় আসলে আধুনিক সমাজের বাস্তব পটভূমির উপরেই তিনি একান্তভাবে নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রগুলি এক একটি অস্বাভাবিক প্রবণতার আতিশয্যের জন্য উদ্ভট আকার ধারণ করে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে জীবনের যে সব অসঙ্গতি হাস্যকরভাবে প্রকট হইয়া উঠে সেইরূপ অসঙ্গতি আমাদের জীবনের প্রতি পদে পরিস্ফুট হইতে দেখি। আর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পরশুরামের রচনার আঙ্গিকের বিশিষ্টতার কথা। তিনি যে উদ্ভট পরিবেশ রচনা করেন তাহার প্রতি পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কোন ভূমিকা বা কৈফিয়তের প্রয়োজন বোধ করেন না। একেবারে প্রথম ছত্র হইতেই আমরা গল্পের মধ্যে নিমজ্জিত হই। তাঁহার সংক্ষিপ্ত শাণিত বাক্যগুলি মর্মভেদী শরের মতো, কিছুতেই তাহার লক্ষ্য ভুল হয় না। পরশুরামের প্রথম দিকের গল্পের সহিত যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁকা যে ব্যঙ্গচিত্রগুলি থাকিত তাহা এই গল্পগুলির এক অপরিহার্য অলঙ্কার স্বরূপ।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের আর একজন অসাধারণ শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ ছিলেন জন্ম-রোমান্টিক। কিন্তু তাঁহার রোমান্টিক মন বাংলাদেশের অতি পরিচিত সাধারণ জীবন ও প্রকৃতির পরিবেশের মধ্যেই অসীম বিস্ময়ের জগৎ আবিষ্কার করিয়াছিল। বাস্তবকে তিনি পরিহার করেন নাই, বাস্তবের উপরেই আপন স্বপ্নদৃষ্টির মায়া বিস্তার করিয়া দিয়াছেন। বাংলাদেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ, নিতান্ত অসচ্ছল সাধারণ বাঙালী পরিবারের দুঃখবেদনার মধ্যে স্নেহ-প্রীতির স্নিগ্ধতা, বাংলাদেশের আকাশ এবং মৃত্তিকা—তাঁহার রচনায় অসাধারণ রসমূর্তি লাভ করিয়াছে। বিভূতিভূষণের মনের অফুরন্ত বিস্ময়রস তাঁহার গল্পের অতি সাধারণ ঘটনা ও পরিবেশগুলির চারিপাশে এমন একটা রহস্য যবনিকা রচনা করিয়া তুলিয়াছে যাহার মধ্য দিয়া নিতান্ত চেনাকেও অচেনা এবং সুদূর মনে হয়। বিভূতিভূষণের শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন হিসাবে 'উপেক্ষিতা', 'পুঁই-মাচা', 'মৌরিফুল', 'কিন্নরদল' প্রভৃতি গল্পের নাম করা যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথা সাহিত্যে অভিজ্ঞতার দিক্‌সীমা নূতনভাবে প্রসারিত করিয়াছেন। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন কোন দিক হইতে মিল আছে। জীবনের রূঢ় বাস্তবতার নগ্নরূপ ইহাদের কল্পনাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। বাস্তবতা বলিতে ইঁহারা জীবনের একেবারে প্রত্যক্ষ ভূমিতে জীবন সংগ্রামের মধ্যে মানুষের যে কঠিন চরিত্র প্রকাশ পায় তাহাকেই বোঝেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পে পূর্ব বাংলার পল্লীপ্রকৃতির প্রেক্ষাপট ব্যবহৃত হইয়াছিল, তারাশঙ্কর বাংলাদেশের আর এক অঞ্চলের পটভূমিতে গল্প লিখিয়াছেন। তাঁহার গল্পের পটভূমি রাঢ় অঞ্চলের রুক্ষ প্রকৃতি। রাঢ়ের দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর, কঙ্করাকীর্ণ লালমাটির রুক্ষতা, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাহ এবং বর্ষায় বন্যার তাণ্ডব—সব মিলাইয়া তথাকার জীবনের চারিপাশে একটা কঠোরতার আবেষ্টন রচনা করে। জনসমাজের মধ্যেও জমিদারী তন্ত্রের একটা বিশিষ্ট রূপ সাধারণ কৃষক এবং তাহাদের প্রতিযোগী আদিবাসী শ্রমিকশ্রেণী মিলাইয়া জীবনের রূপ এখানে বাংলার অন্য অঞ্চল হইতে ভিন্নতর। ক্ষীয়মাণ জমিদার পরিবারগুলির প্রাচীন আভিজাত্যবোধের পাশে কয়লার খনিগুলিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠা আধুনিকতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা জীবনের মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বিপরীত জীবনাদর্শের সংঘাত সৃষ্টি করে। ইহার মধ্যেই আছে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত লোক-সংস্কৃতির বিচিত্র প্রবাহ। তারাশঙ্কর এই আঞ্চলিক বিশিষ্টতাগুলির পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহার গল্পে এবং উপন্যাসে। তাঁহার গল্পগ্রন্থের মধ্যে 'ছলনাময়ী', 'জলসাঘর', 'রসকলি', 'বেদেনী' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাস্তব জীবন পর্যবেক্ষণের দিক হইতে তারাশঙ্করের সহিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিল আছে। কিন্তু গল্পের রূপায়ণ পদ্ধতির দিক হইতে তারাশঙ্কর যেখানে নাটকীয় ঘটনা সংস্থাপনের উপরে নির্ভর করেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে ক্ষেত্রে চরিত্রের জটিল মানসিকতা পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেই অধিকতর আগ্রহী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিকের রচনায় ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে জীবনের আপাতরূপের অন্তরালবর্তী গূঢ় প্রবৃত্তিকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখানোর অসাধারণ দক্ষতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিচুতলার জীবন হইতেই তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সঙ্কলনগুলির মধ্যে প্রধান অতসী-মামী; প্রাগৈতিহাসিক, মিহি ও মোটা, কাহিনী, হলুদপোড়া এবং আজ কাল পরশুর গল্প।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকেই বাংলা কথা সাহিত্যে সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ সূচিত হইয়াছিল। এই যুগের অন্যতম প্রধান লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের মন বিশেষভাবে নগরাশ্রিত জীবনের মধ্যেই গল্পের উপকরণ সন্ধান করিয়াছে। মধ্যবিত্ত মানুষের সংগ্রাম, তাহাদের স্বপ্ন সাধ এবং তাহার ব্যর্থতাজনিত ট্র্যাজেডি প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে নিটোল রসমূর্তি লাভ করিয়াছে। পঞ্চশর, বেনামী বন্দর, পুতুল ও প্রতিমা, মৃত্তিকা—প্রভৃতি গল্প প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যে এই নূতন শাখাটির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাহার জীবৎকালের মধ্যেই সাহিত্যের এই শাখাটিতে বহু শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব হয়। বাংলা ছোটগল্পের ধারা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিকেই অগ্রসর হইয়াছে এবং সেই ধারা এখনও অনবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত।

৬। প্রশ্ন: বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রোত্তর যুগের ছোটগল্পের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি সম্বন্ধে একটি সাধারণ আলোচনা কর।

[**উত্তর-সংকেত:** ৫ নং প্রশ্নের উত্তরের সাহায্যে উত্তর রচনা করিতে হইবে।]

নিবেদিতার সেই চমৎকার মন্তব্যটি : 'He often did the habit of the monk seem to slip away from him, and the armour of the warrior stand revealed!' সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন তাঁহার অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িত বারংবার ; দেখা যাইত, গৈরিকের নীচে যোদ্ধার বর্ম।

বিবেকানন্দ ঝড়কে আনিয়াছিলেন সঙ্গে করিয়া। তাঁহার জীবনের আকাশে ঝোড়ো মেঘদের আনাগোনার বিরাম ছিল না। ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে কখনও আনন্দলোকের নীলিমা দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু জগজ্জননীর পদপ্রান্তে রামকৃষ্ণ যে একটি অনাবিল নিরবচ্ছিন্ন শান্তি উপভোগ করিতেন সেই শান্তি বিবেকানন্দের ছিল না। নির্দ্বন্দ্ব তিনি ছিলেন না। শেলীর স্কাইলার্কের মত পৃথিবীর বহু উর্ধ্বে সেই জ্যোতির্লোকের অসীমে তিনি উধাও হইতে পারেন নাই। তিনি যেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্কাইলার্ক, একদিকে ধরণীর মৃত্তিকা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছে, আর একদিকে চিরনীল আকাশ তাঁহাকে ডাকিয়াছে। রোমাঁ রলাঁ বলিয়াছেন : 'Battle and life for him was synonymous.' তাঁহার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আত্মার সংগ্রামের অন্ত ছিল না। বর্তমান আর অতীত, প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য, ধ্যান এবং কর্ম—কাহাকে তিনি পশ্চাতে রাখিবেন এবং কাহাকেই বা স্থান দিবেন পুরোভাগে ?

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের একখানি পত্রে বিবেকানন্দ জনৈক আমেরিকানকে লিখিয়াছেন : "কয়েকটা বৎসর যদি একদম চুপচাপ থাকিতে পারিতাম! এইসব জাগতিক সংগ্রামের জন্য আমি সৃষ্ট হই নাই। আমি স্বভাবতই কর্মকে এড়াইয়া চলিতে চাহি। ধ্যানের দিকেই আমার স্বাভাবিক প্রবণতা। জন্ম হইতেই আমি আদর্শবাদী, ধ্যানের জগতে বাস করিতেই আমার ভাল লাগে। যাহা পার্থিব তাহার সংস্পর্শ আমার ধ্যানকে বিচলিত করে, আমাকে দুঃখ দেয়। কিন্তু হে প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

নির্বিকল্প সমাধির মধ্যে ডুবিয়া থাকিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার স্বপ্ন। ঈশ্বরের সন্ধানেই তো তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর পূজারী ব্রাহ্মণটির নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। ধন ক্ষণস্থায়ী, রূপ ক্ষণস্থায়ী, জীবন ক্ষণিকের, যৌবনই বা কত দিনের ? ঈশ্বর শাশ্বত, ভক্তি চিরকালের। পৃথিবীর বিবেকানন্দেরা কি

সুখ-সম্পদ, মায়া-মমতার বন্ধনে বাঁধা পড়িতে পারেন? অবতার পুরুষ যাঁহার আত্মাকে নিজের হাতে তৈয়ারী করিয়াছিলেন পরম আদরে, তিনি রত্ন বর্জন করিয়া কাচ লইয়া কেমন করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিবেন? স্বামীজীর একখানি পত্রে দেখিতে পাই: 'Wealth goes, beauty vanishes, life flies, powers fly,—but the Lord abideth for ever, love abideth for ever."

শৈশব হইতেই নরেন্দ্রের মন ঈশ্বরে। ঈশ্বরের অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে চরম দারিদ্র্যের অন্ধকারেও নরেন্দ্রনাথ নিজের ঐহিক সুখ প্রার্থনা করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'মা! আমায় বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও!' এহেন বিবেকানন্দের মর্মের গভীরতম আকুতি ছিল, ঈশ্বরের পদপ্রান্তে নিঃসঙ্গ মুক্ত জীবন যাপন করিবেন, ডুবিয়া থাকিবেন ঈশ্বরীয় অমৃত সাগরের মধ্যে। তাই তো চিকাগোর ধর্মসভার সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতার পর হিন্দু সন্ন্যাসীর জয়ধ্বনি যখন আমেরিকানদের কণ্ঠে কণ্ঠে তখন গৌরবের সেই উত্তুঙ্গচূড়ায় স্বামীজী কাঁদিতেছেন—আনন্দের আতিশয্যে নহে, দুঃখে। নির্জনে সচ্চিদানন্দের ধ্যানের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবেন, সংসারের অরণ্যে বন্য কুঞ্জরের মত অপার মুক্তির সন্ধানে একা একা ঘুরাইয়া বেড়াইবেন।—হায় সেই মুক্ত জীবনের স্বপ্ন ইহজীবনে আর বুঝি ফলবান হইবার নহে! অজ্ঞাতবাসের পালা ফুরাইয়া গিয়া এখন হইতে শুরু হইল রণপর্ব। এখন হইতে শুধু কাজ আর কাজ, জনসভার পর জনসভায় বক্তৃতার পর বক্তৃতা। বাধার পর বাধার সঙ্গে সংগ্রামের পর সংগ্রাম। রোমাঁ রলাঁ লিখিয়াছেন স্বামীজীর জীবনীতে: 'What did he think of his victory? He wept over it. The wandering monk saw that his free solitary life with God was at an end.'

এত বড় জয়! কিন্তু স্বামীজীর মনোভাব কি? তিনি কাঁদিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর নির্জনে মুক্ত জীবন যাপনের পালা শেষ হইয়া গেল।

কিন্তু পরিব্রাজকের অজ্ঞাতবাসের পালায় ছেদ পড়িল—সে তো সন্ন্যাসীর নিজের ইচ্ছায়। জীবনের ভীষ্ম পর্বের আঘাত-সংঘাতের মধ্যে তিনি গাণ্ডীব-ধন্বার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন, কাহারও উপরোধ বা অনুরোধে নহে।

রামকৃষ্ণের উদার যুগবাণীকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিতে, বেদান্তের অমৃত বাণী জগতকে শোনাইতে, প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলনের স্বর্ণসেতু রচনা করিতে। কিন্তু আরও একটি জরুরী প্রয়োজনে বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের দুঃখমোচনের প্রয়োজনে। আমেরিকা ধন-কুবেরদের দেশ আর ভারতবর্ষের জনসাধারণ দুঃসহ দারিদ্র্যে জীবন্মৃত। ডলারের দেশ হইতে সাহায্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মৃতকল্প স্বদেশবাসিগণকে বাঁচাইবার প্রেরণাও স্বামীজীকে আমেরিকায় যাইতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষেরা শুধু জ্ঞানের সম্পদ লইয়া আসেন না; তাঁহাদের সংবেদনশীল হৃদয়ে আর্ত মানবতার জন্য অপরিসীম করুণা লইয়া আসেন।' জ্ঞান আর করুণার মণি-কাঞ্চন-যোগ ঘটিয়াছিল বিবেকানন্দের জীবনে। বুদ্ধি তাঁহার খুবই স্বচ্ছ ছিল। অন্ধ ভাবাবেগ তাঁহার প্রজ্ঞার নির্মল দীপ্তিকে কোন সময়েই আবিল করিতে পারিত না। আর অনাবিল জ্ঞানেব শুভ্র আলোকে তিনি পরিষ্কার দেখিতেন, জগতের দুঃখমোচনের জন্য আমরা যাহা করি তাহার কোন মূল্য নাই। তিনি কর্মযোগে বলিয়াছেন : No parmanent or everlasting good can be done to the world , if it could be done the world would not be this world.'

কিন্তু ভারতবর্ষের ঐ লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট অর্ধ-উলঙ্গ চলন্ত নরকঙ্কালগুলি যে তাঁহার ভাই। তাহাদের দুঃসহ দারিদ্র্যের জলন্ত জতুগৃহের মধ্যে রাখিয়া দিয়া তাঁহার শান্তি কোথায়? মুক্তি কোথায়? ধর্ম কোথায়? রক্তের প্রতিটি কণা দিয়া তিনি যে অনুভব করিয়াছেন তাহাদের অসহনীয় দৈন্যের যাতনাকে! সেই প্রেমের অনুভূতি এমনই সুতীব্র ছিল যে, আমেরিকার ধনীদের গৃহে চরম বিলাসিতার মধ্যেও তিনি বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন। সমুদ্র পারে তাঁহার দুঃখিনী জন্মভূমির ক্রোড়ে অজ্ঞানের অন্ধকারের মধ্যে যাহারা ডুবিয়া আছে, দারিদ্র্যে যাহাদের জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মূঢ় ম্লান মুখগুলির কথা বারবার তাঁহার মনে পড়িত আর তিনি মেঝেতে শুইয়া ছটফট করিতেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইত অস্ফুট আর্তনাদ। তাঁহার হৃদয়ের নিকট আর্ত মানবের আবেদন ছিল দুর্বার। তাঁহাকে স্বদেশের ভাগ্যহত নরনারীদের কান্না থামাইবার জন্য সহস্রবার তাঁহাকে যদি জন্মগ্রহণ করিতে হয় তাহাতেও তিনি

প্রস্তুত। নিবেদিতা লিখিয়াছেন: 'Our Master has come and he has gone, and in the priceless memory he has left with us who know him, there is no other thing so great as this, his love of man.'

বিবেকানন্দ যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত গুরুদেবের কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠেও কর্মযোগেরই জয়ধ্বনি। তাহার মন্ত্র তো বীর্যেরই মন্ত্র। তবু তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে স্বামীজীর দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পাওয়া যাইবে। সেই দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়াছে অন্ধকারের পারে যিনি জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবার আকুতি হইতে।

একটি ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করিবার জন্য বিবেকানন্দ একাকী লড়াই করিয়া চলিয়াছেন পর্বতপ্রমাণ তামসিকতার বিরুদ্ধে। রণক্লান্ত ঈগলের ডানা দুইটি হিমালয়ের শান্তশীতল ক্রোড়ে বিশ্রামের জন্য মাঝে মাঝে উন্মুখ হইয়া উঠিত। ঈগলের ইচ্ছা করিত গুরুদেবের মত শুভ্র রাজহংস হইয়া তিনি যদি শান্ত ছন্দে সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতে পারিতেন!

অদ্বৈত আর আর্ত মানবতা—দুই-এর সমান আকর্ষণ ছিল বিবেকানন্দের নিকট। রোমাঁ রলাঁ যথার্থই বলিয়াছেন: 'He never could satisfy the one without partially denying the other.'

তবু আশ্চর্য হইতে হয় তাঁহার ক্ষমতায়। আপাতবিরোধী সুরগুলিকে তিনি মিলাইতে পারিয়াছিলেন একটি অপূর্ব সিম্ফনির মধ্যে।

অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের গৈরিকের নীচে একটি বিরাট প্রাণকে যখন আমরা আবিষ্কার করি তখন শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়।

সংবাদপত্রের প্রভাব

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫]

মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার এবং সংবাদপত্রের প্রচলন সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইহার ফলে মানুষ একস্থানে বসিয়াই সংবাদপত্রের মাধ্যমে

বহু খবর এবং মতামত জানিতে পারে ; নানা স্থানে আর ঘুরিতে হয় না। এখন প্রতিদিন সকালবেলায় সংবাদপত্রের উপর একবার চোখ বুলাইলেই পৃথিবী পরিক্রমার কাজ হইয়া যায়। মানুষের অজানাকে জানিবার অদম্য আগ্রহ এই সংবাদপত্রের দ্বারা অনেকখানি তৃপ্ত হইয়াছে। এখন ইহা মানুষের অন্যতম নেশার মত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাত্যহিক জীবনে সংবাদপত্রের নেশাও মানুষকে পাইয়া বসিয়াছে। মানুষের ক্ষুদ্র গণ্ডী আজ বৃহতের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। বৃহৎ এই পৃথিবীর চাঞ্চল্যকর সংবাদের সঙ্গে তাহার মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা যায়।

মুদ্রণযন্ত্রের প্রথম আবির্ভাব ঘটে চীন দেশে। শোনা যায় ভারতবর্ষে মোগল আমলে হস্তলিখিত সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল। বাংলা দেশে মিশনারীদের উদ্যোগেই উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটে। ইউরোপে সংবাদপত্রের প্রচলন প্রথম দেখা যায় ইতালীতে এবং তারপর সারা ইউরোপে তাহা ব্যাপ্তিলাভ করে। বর্তমানে এমন কোন দেশ নাই যেখানে বহু বিচিত্র সংবাদপত্রের প্রচলন নাই।

সংবাদপত্রের প্রচলনের পূর্বে মানুষের গণ্ডী ছিল সীমাবদ্ধ। সেই সীমার বাহিরে যে অসীম পৃথিবী আছে এবং তাহার বুকে যে প্রতিনিয়ত নানা ঘটনা সংঘটিত হইতেছে সে তাহার কোন খবর রাখিত না। একে অন্যের মুখে নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী জানিয়া নিজের কৌতূহল নিবৃত্তি করিত। ভ্রমণ ব্যতীত তখন দূরান্তের সংবাদ জানা সম্ভব হইত না। একের বক্তব্য বহুর সম্মুখে উপস্থিত না হইয়া ব্যক্ত করা সম্ভব হইত না। কিন্তু মানুষ দীর্ঘদিন এই অসুবিধাকে সহ্য করে নাই। তাহার আগ্রহ ও কৌতূহলকে চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার উদ্ভাবনী শক্তি এই সংবাদপত্রের আবির্ভাবকে সম্ভব করিল।

সুতরাং মানুষের একান্ত প্রয়োজনে যাহার আবির্ভাব হইয়াছে তাহার প্রভাব মানজীবনেও সর্বাধিক হইবে। সংবাদপত্র নানাদিক হইতে যেমন মানুষের কৌতূহল এবং আগ্রহকে নিবৃত্ত করিতেছে তেমনি নানাভাবে মানব-জীবনে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সেই প্রভাব এমন চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে যে, সংবাদপত্রবিহীন জীবনযাত্রা আজিকার দিনে শিক্ষিত মানুষের পক্ষে কল্পনাতীত।

সংবাদপত্র মুখ্যতঃ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যম। নানাদেশের বিচিত্র উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয়। ইহার ফলে মানুষের জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সংবাদ ছাড়াও ইহার মধ্যে থাকে বিজ্ঞাপন, সম্পাদকীয়, নানা আলোচনা প্রভৃতি। ইহার ফলে মানুষের ব্যবহারিক, শারীরিক, মানসিক নানাপ্রকার উপকার সাধিত হয়।

সংবাদপত্র কেবল মাত্র বিচিত্র সংবাদ এবং আলোচনা পরিবেশনের দ্বারা মানুষের জীবন এবং মনকে সমৃদ্ধই করে না, তাহার দ্বারা পাঠকের মতামত গঠনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তাও করে। নানা সংবাদপত্রের বিভিন্ন পর্যালোচনা, রাষ্ট্রের নানা কার্যের আলোচনা ও সহালোচনা এবং সাহিত্য-বিষয়ক নানা তর্কবিতর্কের দ্বারা সংবাদপত্র এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহারা জনমত তৈয়ারী করিয়া গণতন্ত্রের পুষ্টিসাধন করিতেছে। সেজন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবাদপত্রের এক বিশেষ স্থান আছে। মানুষের মনে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার আলোড়ন দেখা দেয় সংবাদপত্র তাহাকেই অবলম্বন করিয়া জনমতের অভিব্যক্তি ঘোষণা করে। জনসভা এবং সংবাদপত্রই মানুষের মতামত প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সাধারণতঃ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। অন্য দলগুলি বিরোধীদল হিসাবে কাজ করে। কিন্তু উভয়েরই প্রয়োজন সংবাদপত্রের। শাসকদল সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাহাদের নীতি, দেশ গঠনের পরিকল্পনা যেমন একদিকে প্রকাশ করে, তেমনি অন্যদিকে বিরোধীদলগুলি এই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তাহাদের সমালোচনা করিয়া বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে। আর যাহারা কোন দলভুক্ত নহে তাহারা এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দলের মত ও পথ সম্বন্ধে অবহিত হয়। তাহা ছাড়া এই সংবাদপত্রগুলিও সরকারের ক্রটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করিয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাহাদের মতামত প্রকাশ করে। সরকারী কার্যে কোন দুর্নীতি দেখা দিলে তাহাও সংবাদপত্রের পাতায় ফলাও করিয়া ছাপা হয়। সেজন্য সরকারী দপ্তরেও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সরকারী দপ্তরখানায় কোথায় কি ঘটিয়াছে, তখন কি নীতির পরিবর্তন হইতেছে, ভবিষ্যৎ কোন পরিকল্পনা সম্বন্ধে কী জল্পনা কল্পনা চলিতেছে জনসাধারণের পক্ষে তাহা জানা সম্ভব নহে। কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ সর্বদাই সর্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। সেজন্য তাহাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধাও দেওয়া

হয়। তাঁহাদের নিকট কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। ইহা কেবলমাত্র সরকারী কার্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহাদের অত্যন্ত আগ্রহ। এইসব খবর সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা প্রতিদিনের সংবাদপত্রের পাতা ভরিয়া তোলেন আর নিত্যনূতন খবরে মানুষের কৌতূহলী মন পরিতৃপ্ত হয়।

চিঠিপত্রের স্তম্ভে বা আলোচনার মাধ্যমে কোন বিতর্কিত প্রশ্নে বা মত প্রকাশে বাদ-প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ইহা ছাড়াও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অভাব অভিযোগও চিঠিপত্রের মারফত প্রকাশিত হয়। সরকারের বা কর্তৃপক্ষের সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

এইরূপে দেখা যায়, মানবজীবনে সংবাদপত্র একটি প্রাত্যহিক সঙ্গী। ইহার প্রভাব মানবজীবনে অসামান্য। সেজন্য বর্তমানে দেখা যায় সংবাদপত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ স্বার্থে পরিচালিত হয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সেই স্বার্থেরই প্রচার করা হয়; এবং সেই বিশেষ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সংবাদ পর্যন্ত পরিবেশন করা হয়। সেইজন্য এখন নিরপেক্ষ সংবাদপত্র কম দেখা যায়। নিরপেক্ষতা একটা মুখোশ মাত্র। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তাহা সম্ভবও নহে। সাধারণ মানুষ অনেক সময় তাহা ধরিতে পারে না। সেজন্য তাহারা সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ বা মতামতের দ্বারা অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়।

বর্তমানে সংবাদপত্রগুলির পরিচালক কে সে দিকে লক্ষ্য রাখিলেই এই কথার সত্যতা বুঝা যায়। কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক বৃহৎ আন্দোলনের পট-ভূমিকায় কোন সংবাদপত্রের জন্ম হইলেও পরে দেখা যায় তাহা কোন ধনিক বা ধনিকগোষ্ঠীর কুক্ষিগত হইয়াছে। ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় এই ছোট ছোট সংবাদপত্রগুলি বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছু হটিয়া যায় এবং পরিশেষে অবলুপ্ত হইয়া যায় অথবা বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠীর নিকট বিক্রীত হয়। এইরূপ এক একটা বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠী একাধিক সংবাদপত্রের মালিক হয় এবং সংবাদ এবং জনমতকে নিয়ন্ত্রিত করে। বর্তমানে যাঁহারা শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাঁহারা সাধারণ মানুষের ভোটে জিতিলেও তাঁহারা সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর মানুষ নহেন। সেজন্য তাঁহাদের নিয়মকানুন, পরিকল্পনা প্রভৃতি বিত্তবানদের স্বার্থেই পরিচালিত। সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ দারিদ্র্যের কবলে পতিত হয়। তাহারা

সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও তাহাদের মতামতের কোন মূল্য থাকে না। বিত্তবানের স্বার্থে শাসক এবং বিত্তবানের টাকায় পরিচালিত সংবাদপত্র একত্রীভূত হয়। সেখানে সাধারণ মানুষের কোন স্থান নাই, কিন্তু তাহা স্পষ্ট করিয়া কখনও বিত্তবানেরা প্রকাশ করে না। সকলেই মুখে জনদরদী সাজে। সংবাদপত্রের পাতায় ফলাও করিয়া বড় বড় বিবৃতি বা বক্তৃতা ছাপা হয়। সাধারণ মানুষ এই কপটতার আড়ালে অনেক সময়ই আসল সত্যকে ধরিতে পারে না।

বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ। কথায় আছে 'যা রটে তার কিছুটাও বটে।' কোন মিথ্যাকেও যদি বারে বারে সত্য বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহা হইলে সেই মিথ্যাও সত্য হইয়া উঠে। সংবাদপত্রের মত প্রচারের এমন সুযোগ্য বাহন আর নাই। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এই মিথ্যা সহজেই প্রচারিত হয়। এমন করিয়া দিনের পর দিন মিথ্যা খবর পড়িয়া পাঠক তাহাকে সত্য বলিয়া ভ্রম করে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচারকের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়।

সংবাদপত্রের মুদ্রণ ও সাজসজ্জা এত ব্যয়বহুল যে বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষক ছাড়া সংবাদপত্র প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু কেবল প্রকাশ করিলেই চলিবে না। তাহাকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইবে। কেবলমাত্র সংবাদপত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাহার ব্যয়সঙ্কুলান হয় না। তাহার জন্য বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন। আর এই বিজ্ঞাপন দেন বড় বড কোম্পানীর মালিকগোষ্ঠী। সংবাদপত্র যদি তাঁহাদের স্বার্থবিরোধী হয় তাহা হইলে তাঁহারা সেই কাগজে বিজ্ঞাপন দেন না। বিজ্ঞাপনের অভাবেও কোন সৎ ও আদর্শবাদী সংবাদপত্র টিকিয়া থাকিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার উপরও মাঝে মাঝে সরকারী খড়্গহস্ত নামিয়া আসে। সরকার নানা আইনের মারপ্যাচে তাহার কণ্ঠরোধ করে; না হয় সংবাদপত্র বেআইনী ঘোষণা করিয়া তাহার সব মূলধন বাজেয়াপ্ত করে। এমনি করিয়া সৎ সংবাদপত্রের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। স্বভাবতই বিত্তবানের স্বার্থে সাধারণ মানুষের কথা বিসর্জন দিয়া তাহাদের এক পিচ্ছিল পথে চলিতে হয়। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম পূর্বেও ছিল, এখনও আছে, যাঁহারা বিত্তবানের তোষামোদ করিয়া, রাষ্ট্রশক্তির স্তুতিবাদ করিয়া অনায়াসলভ্য আরামের পথ গ্রহণ করেন নাই। আমাদের দেশের হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, রামানন্দ

চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বনামধন্য সাংবাদিক কোন প্রলোভনেই তাঁহাদের নীতি হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। অবশ্য বাংলা সংবাদপত্রে এখন এই মহাপুরুষগণের আদর্শ বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

অতএব মানবজীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব আলোচনা করিতে গেলে বর্তমান সংবাদপত্রের অবস্থাও চিন্তা করিতে হইবে। নানা স্বার্থে অধিকাংশ সংবাদপত্রই এমনভাবে সংশ্লিষ্ট যাহাতে জনসাধারণের পক্ষে প্রকৃত সংবাদ বা পথের সন্ধান পাওয়া শক্ত হইয়া পড়ে। নানা মিথ্যা সংবাদ ও প্রচারে তাহারা বিভ্রান্ত হয়। অনেকে স্বার্থের বলি হয়। আমাদের দেশে এখনও শিক্ষিতের হার অনেক কম। সেজন্য পাশ্চাত্যের মত তাহারা নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন নয়। আর্থিক অবস্থাও তাহাদের প্রতিকূল। নানা সংবাদপত্রের মধ্যে সঠিক সংবাদ বাছিয়া লওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যতদিন এই অবস্থার পরিবর্তন না হইবে ততদিন সংবাদপত্রের প্রভাব হইতেও মুক্ত হওয়া সম্ভব হইবে না।

বাঙালী যুবক কি শ্রমবিমুখ ?

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬২]

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক মনীষীই বাংলাদেশের অর্থ-নৈতিক অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে বাঙালী তরুণদের শ্রমবিমুখতাকে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন এখন ইহা অনেকটা প্রবাদ বাক্যের মতই প্রচলিত। বস্তুতঃ দীর্ঘকাল হইতেই একদিকে যেমন বাংলাদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শ্রমসাধ্য কাজ-গুলিতে ভিন্ন প্রদেশবাসীদের প্রাধান্য—তেমনি অন্যদিকে চাষবাস ও কুটিরশিল্প সংক্রান্ত কর্মাদি বিশেষ শ্রেণীগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে দেখা যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণেরা কেরাণীগিরি, শিক্ষকতা, আইন ও চিকিৎসাব্যবসায় প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত স্বল্পশ্রমের জীবিকাগুলিকেই অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। সীমাবদ্ধ জীবিকাগুলিতে শিক্ষিত বাঙালী যুবকেরা ভিড় করায় বাংলাদেশে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই দেখা দিয়াছিল, বঙ্গবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে তাহা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। এই সমস্যাকে সমগ্রভাবে

পর্যালোচনা না করিয়া তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বাঙালী তরুণদের উপর চাপাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

সাম্রাজ্যশাসন পরিচালনার সুবিধার্থে কেরাণী তৈয়ার করার উদ্দেশ্যেই ইংরেজ এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিল, তাহার ফলে চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ইংরেজ আমলে দেশে শিল্পোন্নয়ন বিশেষ হয় নাই। তাহার ফলে চাকুরিজীবী ভদ্রশ্রেণী ও শ্রমসাধ্য জীবিকা অবলম্বনকারী অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণী এইরূপ শ্রেণীভেদ ও তৎসঞ্জাত সংস্কার সমাজে প্রচলিত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্র পাইয়া যেমন করিয়াই হউক একটি চাকুরী সংগ্রহ করিয়া ভদ্রসমাজে মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে, তাহা না হইলে স্বসমাজে কোথাও মর্যাদা পাওয়া যাইবে না, এই কুসংস্কার অবশেষে সমাজে বদ্ধমূল হয়। ভিন্ন প্রদেশবাসীরা বাঙালীদের এই মোহান্ধতার সুযোগ লইয়া এই প্রদেশের ব্যবসায় বাণিজ্য ও শ্রমসাধ্য কার্যগুলিকে করতলগত করিয়াছে।

বস্তুতঃ উপরিউক্ত সামাজিক বিন্যাস ও তৎসম্পর্কিত সংস্কারের জন্যই বাঙালী তরুণা শ্রমসাধ্য কার্যগুলিকে পরিহার করিয়া তথাকথিত ভদ্র চাকুরিগুলিকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করে। তাহাদের 'মজ্জাগত শ্রমবিমুখতা' ইহার জন্য দায়ী নহে। স্বাধীনতা লাভের পরও এবং অর্থনৈতিক দুর্গতি দিনের পর দিন উত্তরোত্তর তীব্র হইলেও এই বৈষম্যমূলক সামাজিক অবস্থা এবং মনোভাবের কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নাই। বাঙালী তরুণদের চাকুরী-লোলুপতাকে আমরা নিন্দা করি, কিংবা চাষীর ছেলেকে ভদ্রলোকের চাকুরী লইয়া ভদ্র হইবার চেষ্টা করিতে দেখিলে তাহাকে ধিক্কার দিই, কিন্তু আমরা কি শ্রমের মর্যাদা দিতে শিখিয়াছি? শ্রমজীবী মানুষ আমাদের সমাজে কতটুকু সম্মান বা স্বীকৃতি পায়? দেশের তরুণদের নিন্দা করিলেই কি বাঁচিবার পথ উন্মুক্ত হইবে!

বাস্তুহারা সমস্যা, শিক্ষিত বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যায় বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গের তরুণেরা দিনের পর দিন সকল শ্রমসাধ্য জীবিকা গ্রহণে উৎসাহ দেখাইয়া বাঙালী যুবকের শ্রমবিমুখতার অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তাহা প্রমাণ করিয়াছে। এই সকল কার্যে নিজেদের দক্ষতা ও নিষ্ঠার প্রমাণও তাহারা দিয়াছে। তাহারা যে শ্রমসাধ্য যে-কোনও জীবিকা গ্রহণে ইচ্ছুক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের বিবরণ হইতেই তাহা সন্দেহাতীতরূপে বুঝা যায়। কিন্তু

দুর্ভাগ্যের বিষয়, যথোপযুক্ত কারিগরি শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের পর সেই অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত করিবার সুযোগ বিধান, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন ইত্যাদির মাধ্যমে বাঙালী তরুণদের নিকট জীবিকার ক্ষেত্রটিকে উন্মুক্ত করা যায় নাই। এদেশে অবাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা বাঙালী তরুণদের সুযোগদানে যে কুণ্ঠিত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সামাজিক আন্দোলনে, বাঙালী তরুণদের শ্রমসাধ্য জীবিকালাভের ও নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সমস্ত বাধার অপসারণে এবং জীবিকার সুযোগ সৃষ্টিতে তাহাদের জীবিকা বিস্তারের ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

বাঙালী তরুণেরা যে কোন ধরনের কার্যের জন্য উদ্‌গ্রীব এবং প্রস্তুত। বাংলাদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের পক্ষে অনুকূল না হইলেও তাহারা শ্রমসাধ্য কর্মের সকল দুরূহতা বরণে পশ্চাৎপদ নয়। তবে একথা সত্য যে, তাহারা অন্যান্য প্রদেশের শ্রমজীবীদের তুলনায় হয়ত কিছুটা স্পর্শকাতর বা আত্মমর্যাদাবোধ-সচেতন। কিন্তু শ্রমবিমুখতার মত ইহা নিশ্চয়ই অমার্জনীয় ত্রুটি নয়। যুগের দাবি অনুসারে তাহারা নিশ্চয়ই নিজেদের দৃঢ় ও সকল প্রকার আঘাত সহিষ্ণু করিয়া লইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমগ্র প্রদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটাইয়া বাঙালী তরুণদের কর্মশক্তির সদ্ব্যবহার করিতে উদ্যোগী হইবেন, ইহা আমরা নিশ্চয়ই আশা করিতে পারি। তরুণদের যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দান করিলে পশ্চিমবঙ্গ অপচয়িত, লক্ষ্যভ্রষ্ট তারুণ্যের ব্যর্থতার জ্বালায় এমনভাবে দগ্ধ ও অস্থির হইবে না।

আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধে সাহিত্য বলিতে সহিতত্বকে বুঝাইয়াছেন। সাহিত্য কথাটির মধ্যে সহিতত্বের অভাব আছে। একের সঙ্গে অপরের সংযোগ। লেখকের মনের সহিত পাঠকের মনের সংযোগ। ভাবের সহিত ভাষার সংযোগ। এই সংযোগটি যখন আনন্দের দ্বারা বিধৃত হয়, তখনই তাহা হইয়া ওঠে সার্থক। সাহিত্য মানুষেরই সৃষ্টি, মানুষের জন্য। মানুষের সমগ্র জীবনটি তাহার আশা-আনন্দ, বেদনা-দ্বন্দ্ব লইয়া সাহিত্যে প্রতিফলিত। সাহিত্যের উপজীব্য যেমন মানব জীবন—তেমনি জীবনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয় সামাজিক বিবর্তনের ফলে। চলমান পৃথিবী, তাহার পরিবর্তনের সাক্ষ্য আমাদের প্রত্যক্ষ জীবনের নানা স্তর। সে পরিবর্তন যেমন দ্রুত আবার তেমনি জটিল ও গভীর। শিল্প সাহিত্যেও এ অভিজ্ঞতা সক্রিয়।

সাহিত্যের সৃষ্টির প্রথমপর্বে কবিচেতনার নিবাধ প্রাধান্যই বোধ হয় ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই ইহা বলা চলে যে, আদি যুগের অধিকাংশ সাহিত্য সৃষ্টিই ছিল অবকাশ-রঞ্জিনী, আর মন্ময়তাই ছিল এই সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আত্মাভিমান যত বড়ই হউক না কেন, সমাজ-মানসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই দেখা গিয়াছে, যুগে যুগে সমাজ চেতনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের রূপও পরিবর্তিত হইয়াছে। জীবন ও সাহিত্য দ্বন্দ্বের মন্দাক্রান্তা সুর প্রথম ধাক্কা খাইল প্রথম শিল্প-বিপ্লবের ফলে। সযত্নলালিত ভাব-ভাবনাগুলি একই সঙ্গে কেমন ওলটপালট হইয়া গেল। ইহার মূলে ছিল বিজ্ঞানের অগ্রগতি যাহা অর্থনীতির সমগ্র রূপকে বদলাইয়া দিতে শুরু করিল, মানুষের শিল্প-সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন সম্বন্ধীয় চিরকালীন ধারণাগুলিও ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

পর পর দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ভীষণ তাণ্ডবলীলার ভিতর দিয়া অতি ভীষণ অভিজ্ঞতা লইয়া আগাইয়া আসিয়া আবার একটি যুদ্ধের আশঙ্কায় বলীয়ান হইয়া মানুষ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করিয়া আপন ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আগাইয়া চলিতেছে। আজ বিশ্ব দুই বিপরীত শক্তির

সম্মুখীন। একদিকে ধ্বংসের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের অপেক্ষা আর একদিকে নূতন সৃষ্টি উন্মাদনা। সভ্যতার এক হস্তে সুধাপাত্র, অপর হস্তে বিষভাণ্ড। একদিকে সৃষ্টির আবেগ, আর একদিকে ধ্বংসের লীলা। বিশ্বের সমস্ত দেশের সাহিত্য-কৃতি আলোচনা করিলে আমরা জীবনের এই দুই প্রতিচ্ছবিই দেখিতে পাই। তাই একদিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সাহিত্যে দলীয় রাজনীতির কণ্ডুয়ন, কিংবা বিকৃত মানসিকতার প্রতিবিম্ব অথবা বিকৃত অপরাধ প্রবণতার উষ্ণ প্রস্রবণ। যে প্রচণ্ড মত্ততা আজ মানুষের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে সেই ভীষণ মত্ততাই সাহিত্য সূর্যকে রাহুগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং বিশ্বের সমস্ত চিন্তাশীল মনীষীই সাহিত্যের ভবিষ্যৎ তথা সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত। অনেকের মতে তাই পৃথিবীর সৃজনী প্রতিভা বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বন্ধ্যাত্ব শুধু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নহে, সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে দেখা দিয়াছে।

পৃথিবীর এই সঙ্কটের স্বরূপটি কি? তাহা হইল সংস্কৃতিতে জীবনের প্রতি আস্থাহীনতার প্রকাশ। সমগ্র জীবনবোধই যেন ধাক্কা খাইয়াছে। বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যে জীবনের জয়গান আর ধ্বনিত হয় না। পরিবর্তে সাহিত্য ও শিল্পে বিকৃত জীবন দৃষ্টির অভিব্যক্তি।

মূলতঃ এই সঙ্কট বর্তমান কালের সভ্যতারই সঙ্কট। দুইটি প্রধান বিরোধী শক্তির সঙ্ঘর্ষে পৃথিবীতে যে অশান্তি, অস্থৈর্য দেখা দিয়াছে, সংস্কৃতিতে তাহারই প্রভাব পড়িয়াছে। সাহিত্যের সুস্থ চেতনা বিনষ্ট হইতেছে। স্বভাবতই বাংলা-সাহিত্য-জগতে তাহার প্রভাব পড়িয়াছে। কারণ, দুনিয়ার অধৈর্য হতাশা আর অশান্তি সাহিত্যেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আবার সাহিত্য সংস্কৃতি তাহারই অচেতন কিংবা সচেতন বাহক হইয়া জনমানসে বিভ্রান্তি ও হতাশাকে, জীবন-বিমুখীনতাকে দৃঢ়ভিত্তিক করিয়া তুলিয়াছে। সাম্প্রতিক কালের কাব্যে কথা-সাহিত্যে তাহারই চক্রাবর্ত চলিতেছে।

সামাজিক সমস্যা, আশা-হতাশা সাহিত্যে স্বভাবতই বিম্বিত হইবে, কিন্তু যেহেতু সাহিত্য অচেতন অনন্তনির্ভর দর্পণ নহে, যেহেতু তাহার রূপকারকে একটি চেতনসত্তার পথে বাহিত হইয়া রূপায়িত হইতে হয়, সুতরাং স্রষ্টা সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে ব্যঞ্জিত হয়। বাংলা-সাহিত্যেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। 'আলালের ঘরের দুলাল' হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত কথা-সাহিত্যে সামাজিক সমস্যা প্রবলভাবেই স্থানলাভ করিয়াছে।

বর্তমানে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে অন্যত্র। জীবনের সমস্যার স্বীকৃতি অথবা অস্বীকৃতির মধ্য দিয়া অপরাজেয় জীবনের জয়গান।

কি করিবেন সাহিত্যিক? সাহিত্যের কোন্ পথ শ্রেয় বা প্রেয়? সাহিত্য যদি অকারণ, মূল্যহীন লীলা-বিলাসের উপকরণ না হয়, তবে স্বভাবতই সমাজ ও জীবনের প্রেয়-বোধ সাহিত্যে বর্জিত হইতে পারে না—একথা সর্বকালের সাহিত্যিকেরাই স্বীকার করেন।

বাংলা সাহিত্যের এক স্বর্ণযুগ ছিল, রবীন্দ্রনাথে যাহার সর্বোত্তম দীপ্তি ও সমাপ্তি। উনিশ শতক হইতে রবীন্দ্রযুগ পর্যন্ত সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমরা একটি সুনির্দিষ্ট ধারা পাইয়াছি—যাহা আমাদের রুচিবোধকে, মননশক্তিকে উন্নত করিয়াছে। এই সাহিত্যকৃতিতে আমরা জীবন সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ত্রুটিহীন না হইলেও সুস্থ ও একটানা একটি দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করিয়াছি।

জীবন সম্বন্ধে একটি দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাবই সাহিত্যকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া তোলে। সাহিত্য শুধু অবসর বিনোদনের সামগ্রী হইলে তাহা লইয়া এত আলোচনা অর্থহীন হইত। সে সম্বন্ধে বৃহত্তর গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলিয়াই সাহিত্য লইয়া আমাদের এত উৎসাহ, কারণ জীবন-রসে জারিত করিয়া, বৃহত্তম অভিজ্ঞতায় ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়া মানব-মনকে গঠন করাই সাহিত্যের অন্যতম সার্থকতা। সঙ্কটের যন্ত্রণার মধ্য দিয়াই এই নব শিল্পসৃষ্টির উদ্বোধন ঘটে। শুধু তাহার প্রয়োজন একটি আত্মিক চেতনার, যাহার দ্বারা বাহিরের সমস্ত অভিজ্ঞতা অন্তরের আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিবে। জীবনে জীবন যোগ করা সার্থক হইবে।

সাহিত্যে যুগমানসের প্রতিফলন

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান ১৯৬৮]

[**উত্তর-সংকেত:** 'আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি' প্রবন্ধটির সাহায্য অবলম্বনে উত্তর রচিত হইবে।]

রম্যরচনা

সংসারে এক ধরনের মানুষ আছে যাহারা ভাবনার যোগানদার নহে, অথচ রসের যোগানদার। ইহারা অনায়াসে কাজের বাড়ীতে একটু ফাঁক খুঁজিয়া ইয়ার বন্ধু লইয়া হাসির হর্‌রায় মাতিয়া উঠে। আবাব নিঃসঙ্গ মানুষের মনের শূন্যতাকে তাহার সরব উপস্থিতি দিয়া পূর্ণ করিয়া দেয়। ইহারা কোন কাজে আসে না কিন্তু অবসরের সঙ্গী হিসাবে ইহাদের জুড়ি মেলা ভার। তেমনি সাহিত্যের আসরে এক ধরনের রচনা আছে যাহা কোন গভীর তত্ত্ব বা বিচার অথবা প্রগাঢ় জীবনরস দেয় না, অথচ ক্ষণিকের পরিতৃপ্তি দান করে। এ রচনা যেন লেখক-চিত্তের অকারণ পুলকের ফলশ্রুতি— খুশির খেয়াল, মরসুমী ফুলের স্তবক। পাঠক ও এই পুলকটুকুই নিজের বলিয়া গ্রহণ কবে। বাগানে মরসুমী ফুল ফুটিয়াছে, হউক না সে গন্ধবিহীন, না হয় মধুব সঞ্চয় হইতে সে বঞ্চিত, কিন্তু ধরিত্রীর খুশি যে বিচিত্র বঙেব খেয়ালে নিজেকে সেখানে প্রকাশ করিয়াছে দু'চোখ মেলিয়া তাহাকে দেখিতে ক্ষতি কি!

'রম্যরচনা' এ নামটিও তাই নিরর্থক নয়। 'রম' ধাতুর অর্থ 'আনন্দ' 'বিলাস', 'সুখ', অর্থাৎ রম্যরচনার মূলকথা হইল তথ্য ও তত্ত্বভার বর্জিত চিত্ত-সুখকর এক শ্রেণীর রচনা। ইহার বিষয়ের গণ্ডী কোথায় তাহার ঠিকানা নাই। জগৎ ও জীবনের এমন কোন দিকই নাই যাহা ইহার বিষয়বস্তু হইতে পারে না। দৈনন্দিন জীবনের ঘরোয়া কথা, সমাজচিত্র, দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা, হালকা গল্প, ক্ষণিক চিন্তা, আবেগ উচ্ছ্বাস, দর্শন কিংবা ধর্মতত্ত্ব, কিংবা দুর্জ্ঞেয় মানবহৃদয় সবকিছুই রম্যরচনার বিষয়বস্তু হইতে পারে। আর সেইজন্যই এ রচনার আঙ্গিকও বিষয়ভেদে নানান রূপ গ্রহণ করিতে পারে। কোন আনন্দবর্ধন কিংবা অ্যারিস্টটল-এর মত এখানে অচল। কখনও প্রবন্ধ-শৈলীতে, কখনও ছোট-গল্পের নিটোল মুক্তার মত ভঙ্গীতে, কখনও উপন্যাস বা আত্মজীবনীর ছদ্মরূপে ধীর-বিলম্বিত লয়ে এ রচনা শিল্প-সার্থকতা লাভ করে। কোন্ রূপটি গ্রাহ্য হইবে সেটি নির্ভর করিবে লেখকের মর্জির উপর—কারণ, কি বলা হইতেছে সে কথা এখানে গৌণ। কেমন করিয়া বলা হইতেছে সেইটাই বড় কথা। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, 'Style is the man himself'। এ রচনায় লেখকের পরিচয়ও মিশিয়া থাকে তাঁহার ঐ বিশেষ রচনা-কৌশল বা Style-এর

মজে। তাই লেখকের ব্যক্তিত্বভেদে এই শ্রেণীর রচনায় রূপরীতির পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পাঠকও তাহাতে আপত্তি করে না, কারণ শাস্ত্রেই আছে পিণ্ডখর্জুরে অরুচি হইলে বদরীতে মুখ বদলানো ভাল, বিচিত্র রসের ভোজনের আসরে মধুপ-চিত্ত সহজেই প্রলুব্ধ হয়।

সাহিত্যক্ষেত্রে রম্যরচনার প্রথম আবির্ভাব বোধহয় এই মুখ বদলানোর আগ্রহেই। ফরাসী দেশের 'বেল লেতর' জাতীয় রচনাকেই আধুনিক রম্যরচনার পূর্বসূরী বলা যায়। ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া স্বভাবগম্ভীর জনবুল-এর দেশ ইংলণ্ডে ইহার রকমফের দেখা দিল Personal Essays-এর মধ্যে। বোঝা গেল ফরাসী মঁতেন আর ইংরেজ ল্যাম্ব্‌-এর মেজাজ আলাদা হইলেও আসলে ইহারা সাহিত্যের আসরে একই পঙ্‌ক্তিভুক্ত। সংবাদকে মনোহারী করিবার জন্য যখন সংবাদসাহিত্যের আবির্ভাব হইল তখন হইতেই রম্যরচনার গোড়াপত্তন। সাংবাদিকতার সূত্রেই ইহার আবির্ভাব, সাময়িক পত্রের বৈচিত্র্য-বর্ধনে ইহার স্থায়িত্ব। রম্যরচনার বিকাশের এই ইতিহাস যেমন পাশ্চাত্য দেশে সত্য, তেমনি আমাদের দেশেও।

বাংলা ভাষায় 'রম্যরচনা' শব্দটি হাল আমলের। এ শব্দটি আবিষ্কারের গৌরব হয়ত সাংবাদিকদের প্রাপ্য, কিন্তু এই রচনা-ধারা দীর্ঘদিন হইতেই এদেশে প্রবাহিত। এদেশে সাংবাদিকতার প্রথম যুগ হইতেই এই রচনার আবির্ভাব। 'সমাচার দর্পণে' 'বাবু' চরিত্র, সাংবাদিক ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়' রম্যরচনার উজ্জ্বল উদাহরণ। তারপর সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যখন স্বীকৃত হইল, সাহিত্যে ব্যক্তির আত্মমুক্তির পথ প্রশস্ত হইল, তখন হইতে ইহার যৌবন বিকাশ। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' এই যুগের রচনা। অবশ্য ইহারও অনেক পূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে যদি এই ধরনের রচনার দৃষ্টান্ত খুঁজিতে যাই, বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র বর্ণনাংশে ইহার নজীর কিছু মিলিবে। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথই রম্যরচনার পথকে অনেক সরল করিয়া দিলেন তাঁহার 'ছিন্নপত্র', 'বিচিত্র প্রবন্ধ' প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়া। বিচিত্র প্রবন্ধের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই মন্তব্য করিয়াছেন, "এর যদি কিছু মূল্য থাকে, তবে তা বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনা-রস সম্ভোগেই।" লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, এই গ্রন্থের রচনাগুলিতে বক্তব্য সযত্ন পারিপাট্য উপস্থিত নয়। আনন্দের রংমশাল জ্বালাইয়া কবি তাঁহার

ব্যক্তিহৃদয়ের আনন্দের অজস্র ঐশ্বর্য ছড়াইয়াছেন। প্রবন্ধ শিল্পের যুক্তি-তর্কের আঁটসাঁট বাঁধুনি এখানে অনুপস্থিত কিন্তু তবুও ইহার নিজস্ব বন্ধন আছে—তাহা ভাবের বন্ধন। অনায়াসে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সঞ্চার করা যায় যদি ভাবের সূত্রটি অক্ষুণ্ণ থাকে। লেখক চিত্রে, সংগীতে নিত্যদিনের জগৎকে অপরূপ মোহিনী মায়ায় সাজাইয়া তুলিয়াছেন। নববর্ষাগমে গিরিপদমূলে যে ব্যস্ততা, পথচলতি পথিকের কলগুঞ্জন, শ্রাবণের জনবিরল গ্রামপথ, সবুজের বিচিত্র সমারোহ, ব্রাহ্মণ বৈশাখ—সবকিছুই কবির কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কবির এই আনন্দের ভাগ হইতে পাঠকও বঞ্চিত হয় নাই। ইহার পরে বুদ্ধদেব বসুর 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি,' প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বৃষ্টি এলো' রম্যরচনার পথকে বিস্তৃত করিয়া দিল। ইহারা দুজনেই স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ কবি। তবু ইহাদের আরও একটা সত্তা আছে, সে সত্তা দর্শকের, ভাবুকের। যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' আধুনিক রম্যরচনার চমৎকার উদাহরণ। রাজধানীর অতিরিক্ত শ্রেণীসচেতনতা, ব্যর্থ প্রাণের শূন্যতার বোঝা, জীবন সমস্যা সম্পর্কে দুই-একটি কষায়-কটু-অম্লরসাত্মক মন্তব্য আর ছবির পর ছবি রচনাটিকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। সৈয়দ মুজতবা আলির 'দেশে বিদেশে' অকস্মাৎ বই-এর বাজারে যেন বিপ্লব আনিয়া দিল। আলিসাহেব এখন সহস্র লেখকের একজন নন—তিনি একটি ব্যক্তিত্ব। তাঁহার পঞ্চতন্ত্র, চাচা কাহিনী এই ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সজীব—পাঠকের অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার। বিদগ্ধতার সঙ্গে রসিকচিত্তের সম্মিলনেই আলিসাহেবের সিদ্ধি। এতদ্ভিন্ন রঞ্জন, রূপদর্শী প্রভৃতি লেখকের নাম এখনকার সাহিত্যজগতে রম্যরচনাকার হিসাবে পরিচিত।

রম্যরচনা আধুনিক পাঠকের একটি প্রিয় সাহিত্যসম্ভার। আধুনিক মন সাহিত্যের এই শাখাটির পৃষ্ঠপোষকতা করে তাহার কারণ ইহার লবণাক্ত, ইহার অম্লমধুর আস্বাদ। 'সাহিত্যের আনন্দের ভোজে' এই রসটির এতদিন প্রাচুর্য ছিল না। যথার্থ ভোজন রসিক যেমন স্বাদ ফিরাইয়া আনার জন্য চাটনির আদর করেন, আধুনিক সাহিত্যসাধকও তেমনি রম্যরচনার আদর করেন। তবুও একটি কথা মনে রাখা দরকার—জনসন ইহাদের যতই 'loose sally of mind' বলুন না কেন, আধুনিক সমালোচক 'দায়িত্বহীন রচনা' বলিয়া যতইনাসাকুঞ্চিত করুন না কেন, লেখক চিত্তের গভীরতার স্পর্শ হইতে এ রচনা একেবারে বঞ্চিত নয়। আশ্বিনের হালকা মেঘ আকাশের যত উঁচু দিয়াই উড়িয়া যাক না কেন,

হঠাৎ যখন সেই মেঘ হইতে বৃষ্টিধারা নামে তখনি বুঝি তাহার জন্ম সেই গভীর সমুদ্র হইতেই। রম্যরচনা লেখকের খুশির হালকা মেঘ।

রবীন্দ্র সাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রভাব

অনেকেই মনে করিয়া থাকেন সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরস্পর-বিরোধী। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ কোন বিরুদ্ধতা স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, কারণব্যাপক অর্থে বিজ্ঞান হইতেছে বিশেষ জ্ঞান। তবে বক্তব্যটিকে অন্যভাবেও প্রকাশ করা চলে। পর্যবেক্ষণলব্ধ বিশেষ জ্ঞানই বিজ্ঞান। যে সব কবির দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা আছে তাঁহাদের রচনায় পরিলক্ষিত হয় এক বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন কবি সাহিত্যিকের রচনার মধ্যে সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র সুর অনুরণিত হয় তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যের যে অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয় তাহার মূলে তাঁহার এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথ আনন্দরসের কবি। কাব্যরসের তরঙ্গোচ্ছ্বাস তাঁহাকে প্লাবিত করিয়া ভাসাইয়া লইতে পারে, তাহার কারণও তাঁহার বৈজ্ঞানিক মেজাজ। কবি-মনেব উচ্ছ্বাসের প্রান্তে আসিয়া বাধা সৃষ্টি করিয়াছে তাঁহার বৈজ্ঞানিক মন। সুস্থ স্বাভাবিক পথে পরিচালনা করিয়া এক রসোত্তীর্ণ জগতে পৌঁছাইয়া দিয়াছে কবির বিজ্ঞান-রসিক সত্তা। কবির বৈজ্ঞানিক চেতনা যে তাঁহার কল্পনাব জগতের কোন ক্ষতি করে নাই, এই প্রসঙ্গে কবি নিজেই লিখিয়াছেন, 'জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণ বিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে তা অনুভব করিনে।'

এক শ্রেণীর সাহিত্যিক এবং কবি আছেন যাঁহারা সাহিত্যের এলাকায় বিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র প্রবেশও সহ্য করিতে পারেন না। অনেক সাহিত্যিক বিজ্ঞান না জানায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। অথচ বিশ্বকবি বলিয়াছেন, "শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে বিজ্ঞানের যে প্রভাব অনুভব করিয়াছেন তাহা আকস্মিকভাবে ঘটে নাই। শৈশব হইতে জীবনের সায়াহ্ন পর্যন্ত বিজ্ঞানের নানা মহলে তাঁহার মন আনাগোনা করিয়াছে।

তিনি নানা বৈজ্ঞানিক বিষয় হইতে মানস-গঠনের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। একথা সত্য যে, উপনিষদের ধ্যান-গম্ভীর পরিবেশে তিনি লালিতপালিত, কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা চলে না যে, মহর্ষি হইতে শুরু করিয়া গৃহশিক্ষক পর্যন্ত সকলেই কিছু না কিছু বৈজ্ঞানিক রসের সন্ধান কবিকে দিয়াছিলেন তাঁহার বাল্যকালেই। মনে হয়, শৈশবে তিনি বিজ্ঞানের তত্ত্ব লইয়া যে অনুশীলন করিয়াছিলেন তাহারই ফলশ্রুতি রূপে তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন বৈজ্ঞানিক মেজাজের।

প্রভাত-সঙ্গীত হইতে শুরু করিয়া নবজাতক পর্যন্ত নানা গ্রন্থে বিজ্ঞানের নানাবিধ তত্ত্বের সার্থক প্রতিফলন অনুভব করা গিয়াছে। প্রভাত সঙ্গীতের অন্তর্গত 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' কবিতাটির নাম তাহার বাণী বহন করিতেছে। জগৎজোড়া নিয়মের রাজত্ব দেখিয়া কবি বিস্ময়াবিষ্ট। তিনি লিখিয়াছেন---

"থেমে এল প্রচণ্ড কল্লোল, গ্রহগণ নিজ অশ্রুজলে,
নিভে এল জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস, নিভাইল নিজের হুতাশ।"

আবার একস্থানে আছে,

"সৃজনের আরম্ভ সময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার।"

এই উদ্ধৃতিপাঠে সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে, পৃথিবীর তথা গ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টির তত্ত্ব এখানে বিধৃত হইয়াছে।

যাঁহারা স্যার জেমস্ জীন্‌স-এর 'দি ডাইং সান্' প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ইহার মর্মার্থ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সৃষ্টির রহস্য তিনি অনুসন্ধান করিয়াছেন বিজ্ঞানের পুঁথির মধ্যে, উপনিষদের কল্পলোকে নহে। বিজ্ঞানীরা বলেন, সৃষ্টির উষাকালে অগ্নিপিণ্ড সূর্যের সামনে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছিল ওরই সমতুল্য আর একটি নক্ষত্র। দুই-এর মধ্যে আকর্ষণের ফলে সৃষ্ট হইল বিরাট তরঙ্গ। পরিশেষে বিক্ষিপ্ত অগ্নিগোলকগুলি অবিরাম সূর্য-পরিক্রমা শুরু করিল। শেষ পর্যন্ত পিণ্ডগুলি তাহাদের প্রচণ্ড উত্তাপ হারাইয়া ফেলিল। এমনি একটির নাম পৃথিবী। পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল

হইয়া সৃষ্টি করিল নূতন প্রাণের জন্য উপযুক্ত বাসভূমি, আবহাওয়া। তাহার পর বহু পরে জন্ম লইল প্রাণ। যে প্রাণের সৃষ্টি হইয়াছে আজ, তাহা দীর্ঘদিন পূর্বে এই পৃথিবীর মাটিতেই বিলীন হইয়া ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার সেই প্রাণী ও পৃথিবীর সহিত বর্তমানের এই পৃথিবীর আছে নাড়ীর সম্বন্ধ। কবির নানা রচনায় বিজ্ঞানের এই মহাসত্যটির প্রকাশ হইয়াছে। 'সোনার তরী' (১৩০০) কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা, বিশেষতঃ 'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা দুইটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১৮৯২ সালের ৯ই ডিসেম্বর কবি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ৺ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে লিখিয়াছেন, 'এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মেকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকালের নতুন ও আমাদের দুজন-কার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশুনা আছে...”

ইহাতো নিছক কল্পনা-বিলাস নহে, ইহা প্রখর বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত। বারংবার কবির চিত্তে এই একই কথা ধ্বনিত হয় যে, পৃথিবীর ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রতিটি বস্তু তাহার চিরসঙ্গী, সৃষ্টির প্রাগান্ধকারকাল হইতে ক্রমে ক্রমে তিনি বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। আজ যখন সেই সৃষ্টিরহস্যের কথা তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া ওঠে তখনই পৃথিবীর পরিচিত প্রত্যেকটি কণিকার সঙ্গে তিনি আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করেন। চৈতালি (১৩০৩) গ্রন্থের 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় এই সুরের রেশ অনুভব করা যায়। উৎসর্গ (১৩১০:) কাব্যের 'প্রবাসী' কবিতাতেও এই মহাসত্যই উদ্ঘাটিত। নৈবেদ্য ও ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থেও বৈজ্ঞানিক তথ্যের সামান্য উল্লেখ আছে।

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে কবি এই মহাসত্যটিকে কাব্যরূপ দিয়াছেন,

“মনে আজি পড়ে সেই কথা
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।”

'বিচিত্রিতা' কাব্যগ্রন্থের মূল সুর একই। 'পত্রপুট' গ্রন্থের অন্তর্গত 'পৃথিবী'

কবিতায়—পুরাণ ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সমন্বয় হওয়ায় এই কবিতাটি অনির্বচনীয় সুষমায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

"স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী তুমি নিত্য নবীনা
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষে।"

(২৯শে আশ্বিন, ১৩৪২)

'বনবাণী' (১৩৩৩-৩৪) গ্রন্থে কবির সহিত বিশ্বপ্রকৃতির—উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-জগতের আত্মীয়তা আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। জন্মদিনে (১৩৪৩) কাব্য-গ্রন্থের ৫ সংখ্যক কবিতায় ডারুইন কথিত ক্রমাভিব্যক্তিবাদের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। 'বনবাণী' গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন, "আমার ঘরের আশে-পাশে যে সব বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হ'য়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছলো। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা।"

নৈবেদ্যের পরবর্তী রচনাসমূহে গড়িয়া উঠিয়াছে এক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল। সেখানে বিজ্ঞানের বিশেষ প্রভাব নাই। একমাত্র খেয়া কাব্যের 'প্রতীক্ষা' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। এই কবিতায় জোয়ারের বর্ণনায় কবির প্রাকৃতিক জ্ঞানের সুস্পষ্ট পরিচয় বর্তমান। চন্দ্রের সহিত জোয়ার ভাঁটার যে চিরন্তন সম্পর্ক আছে এই কবিতায় সেই বৈজ্ঞানিক সত্যটি উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

এইরূপ বিশ্লেষণ করিতে থাকিলে রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা—যেমন পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রভাব ও প্রকাশ অনিবার্য ভাবেই লক্ষ্যগোচর হইবে। কারণ কবিমানস এই বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত পরিচিত ছিল।

কবি জীবনের শেষ পর্বে বিজ্ঞান সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া উঠেন। আইনস্টাইন, জগদীশচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের প্রভাবও তাঁহার উপর কম নহে। ইতিমধ্যে প্রাণিবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের রাজ্যে নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে পুরাতন তথ্য ও যুক্তি ভাঙ্গিয়া গিয়া বিপ্লবের সৃষ্টি হইল। এই বিপুল অগ্রগতি সম্পর্কে কবি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। ইহারই ফলশ্রুতি

ঘটিয়াছে তাঁহার বিভিন্ন কবিতায়। বিশ্বপরিচয় বাদ দিলেও খাপছাড়া, প্রহাসিনী, নবজাতক প্রভৃতি কাব্যে বিজ্ঞানের নব নব তথ্যগুলি ছড়াইয়া আছে রত্নকণিকার মতো।

একথা নিঃসংশয়ে সত্য যে, কাব্যের মধ্যে বিজ্ঞানের কয়েকটি আবিষ্কারের উল্লেখ থাকিলে বৈজ্ঞানিকতা হয় না। বিজ্ঞানের যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হইলে ব্যক্তি মানসের পটে বিশ্বসম্পর্কে একটি সামগ্রিক বক্তব্য গড়িয়া উঠে। এই বক্তব্যকে যথাযথ অনুসরণ করাই বিজ্ঞানবুদ্ধি। কাব্য জগতেও তাহা থাকা চাই। রবীন্দ্রনাথের দর্শনে ও কাব্যে এই বিজ্ঞানবুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণেই তাঁহার মানসলোকে সৃষ্টি হইয়াছে সহজ ও বাস্তবানুগ বুদ্ধি। পরম আশ্চর্যের সহিত লক্ষ্য করিতে হয়, জীবনের শেষ ধাপে পৌঁছিয়াও তিনি যৌবনের অধ্যাত্মজগতে পশ্চাদপসরণ করেন নাই। প্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া তিনি বিস্ময়কর বিজ্ঞান-দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

একথা সর্বাংশে সত্য যে, আর্টের সহিত বিজ্ঞানের যোগসন্ধান করিতে হইলে তাহা যান্ত্রিক পন্থায় সম্ভব হইবে না। সাহিত্য ও বিজ্ঞান উভয়ই নিত্য প্রবহমান, নিত্য পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানে গতি ক্রমশই দ্রুততর হইতেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের পুরাতন সমাজের ভিত পাল্টাইয়া দিতেছে। বিজ্ঞান সমাজকে পরিবর্তিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার প্রভাব বিস্তৃততর হইয়াছে দর্শন ও শিল্পের এলাকায়। বিজ্ঞানের বহু তথ্য ও তত্ত্ব রূপান্তরিত হইয়া প্রবেশ করিয়াছে দর্শনে ও সাহিত্যে। এই প্রভাব অপ্রতিরোধ্য।

সরকারী ভাষারূপে ইংরেজী ভাষার সংরক্ষণের যুক্তিযুক্ততা

[ক বি. বি. এ. ১৯৬৫]

১৯৪৭ সালের পর ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্রিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহার ফলে ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে বর্তমানে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশে ইংরেজী ভাষার প্রচলন হইয়াছে ইংরেজদের মাধ্যমে। তাহারা এদেশে রাজত্ব করিতে আসিয়া শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রধানতঃ এদেশীয় কিছু মানুষকে

ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে—যাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে রাজা ও প্রজার মধ্যখানে অবস্থান করিয়া রাজার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে পারে।

ইংরেজ আগমনের পূর্বে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার কোনো প্রশ্নই উঠে নাই। কিন্তু পরবর্তিকালে এদেশীয়রা দেখিল ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিলে তাহাদের বহু লাভ হইতে পারে। প্রথমতঃ, চাকুরীর সুবিধা। তখন ইংরেজীই শাসনকার্যের মাধ্যম। অতএব ইংরেজী না জানিলে সেই কাজ করা সম্ভব নয়। ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মানুষদের কাছে ইহা একটা প্রলোভন-রূপেই দেখা দিল। দ্বিতীয়তঃ, তখনকার বুদ্ধিজীবী মহল দেখিল পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের ফল তাহাদের নিকট ভাষাজ্ঞানের অভাবে দূরে রহিয়াছে। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ক্ষীণঃস্রোতা ভারতীয় চিন্তার রাজ্যে যেন প্লাবন আনিয়া দিল। ভৌগোলিক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এদেশীয়রা বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম বোধ করিল। তৃতীয়তঃ, পূর্বে প্রতিভার বিকাশ পথ ছিল সীমিত। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ফলে তাহার গতি হইল অবাধ। কারণ ইংরেজী ভাষা ত কেবলমাত্র এখন আর ইংরেজদের নাই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ মানুষের ইহা মাতৃভাষা। এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে ইহাই রাষ্ট্রভাষা। যেখানে যেখানে ইংরেজদের উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানেই এই ভাষাও স্থানীয় ভাষা অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অতএব এই একটি মাত্র ভাষা পরিচয়ে পৃথিবীর বহু মানুষের সঙ্গে তাহার পরিচয় সম্ভব হইয়াছে। জাতীয় দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আন্তর্জাতিকতা প্রবেশ করিয়া ইহাকে উদার করিয়া তুলিয়াছে।

ভারতে ইংরেজে আধিপত্য লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এখন কথা উঠিয়াছে ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। যাঁহারা ইংরেজীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিয়াছেন তাঁহাদের দাবির পিছনে আছে দীর্ঘদিনের শোষিত মানুষের অন্তর্জ্বালা। ইংরেজ আমাদের গোলাম করিয়া রাখিয়াছিল আর ইংরেজী ছিল তাহার বাহন। সেজন্য ইংরেজী এদেশীয় মানুষের কাছে গোলামীরই প্রতীক। তাহা ছাড়া ইংরেজী ভাষা প্রাধান্য লাভ করিবার ফলে এদেশীয় আঞ্চলিক ভাষাগুলি উপেক্ষিত হইয়াছে। তাহাদের স্বাধীন বিকাশে ইংরেজী প্রতিবন্ধকতা

করিয়াছে। সেজন্য ভারতে ক্ষমতা এদেশীয়দের হাতে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে দাবি উঠিয়াছে 'ইংরেজী হটাও'। এই ইংরেজীর প্রাধান্য অবসিত না হইলে আঞ্চলিক ভাষাগুলির সমৃদ্ধি সম্ভব হইবে না। স্বাধীন ভারতবর্ষে যদিও এই আঞ্চলিক ভাষাগুলির প্রতি কিছুটা দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে তথাপি তাহারা উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ এখনও শিক্ষিত মানুষের প্রধান ভাষা ইংরেজী। সারা ভারতবর্ষের চিন্তার মাধ্যম, ভাব প্রকাশের বাহন এবং যোগাযোগের মাধ্যম এই ইংরেজী ভাষা।

সেজন্য শিক্ষিত লোকেরা দাবি তুলিয়াছেন ইংরেজীই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে লেখা ছিল ১৯৬৫ সাল হইতে হিন্দী হইবে ভারতের রাষ্ট্রভাষা। তাহা লইয়া ইংরেজীর পক্ষে এবং বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন চলিল। ইংরেজী ভাষার জন্য মাদ্রাজে অনেক যুবক আগুনে আত্মাহুতিও দিল। সারা ভারতবর্ষব্যাপী তুমুল হিংস্র আন্দোলন দেখা দিল। তাহাদের বক্তব্য হইল, ইংরেজী নাকি আন্তর্জাতিক ভাষা। ইহাকে কেবলমাত্র গোলামীর ভাষা বলিয়া ভাবা উচিত নহে। ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান থাকিলে এই পৃথিবীর কোথায়ও তাহার যাতায়াতে অসুবিধা হইবে না। যে কোন বিষয়ে উন্নত জ্ঞান লাভ করিতে ইংরেজী ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। ভারতীয় কোন ভাষায় তাহা লাভ করা সম্ভব নহে। দেশে বিদেশে নানা মানুষের চিন্তার ফল এই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ লাভ করিয়া থাকে। ইংরেজী ভাষা এই দেশে অবহেলিত হইলে এই জ্ঞানলাভ আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাহা ছাড়া এতদিনের অভ্যাসের ফলে ইংরেজী এখন আমাদের অনেকটা সহজ-আয়ত্ত হইয়াছে। শিক্ষিত মানুষের পক্ষে ইহা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। সারা ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষের ইহা সাধারণ ভাষা রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এখন এই ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে যদি 'হিন্দী ভাষা' রাষ্ট্রভাষা রূপে চালু করা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের অহিন্দী-ভাষী অঞ্চলে আবার নূতন করিয়া হিন্দী শিখিতে হইবে। তাহা শ্রমসাধ্য। তাহা ছাড়া হিন্দী ভাষা কোন অংশেই ইংরেজীর সমকক্ষ নহে। মানুষের উন্নততর ভাব ও চিন্তা প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবেও তাহা এখনও উন্নত হয় নাই। এই ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলিও অনূদিত হয় নাই। এমনি একটি

অপরিণত ভাষাকে ইংরেজীর আসনে বসাইতে অহিন্দীভাষী অঞ্চলের ঘোরতর আপত্তি। এই আপত্তি শেষ পর্যন্ত হিংসাত্মক আন্দোলনে পরিণতি লাভ করিল। নেহরু সরকার গণ আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করিলেন। ইংরেজী আরও দশবৎসর হিন্দীর সঙ্গে সমান মর্যাদার অধিকারী হইল। এই দশবৎসর হিন্দী ধীরে ধীরে ইংরেজীর স্থান গ্রহণ করিবে—এই মর্মে সংবিধান সংশোধিত হইল।

আন্দোলন শেষ হইল। ইংরেজী তাহার পূর্বতন মর্যাদায় রহিয়া গেল। হিন্দীর দিকে অহিন্দীভাষী ভারতবাসীরা এখনও আগ্রহী হইয়া উঠেন নাই। হিন্দী যে কোনদিন ইংরেজীর স্থান দখল করিতে পারিবে সেই আশা সুদূর-পরাহত। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীও যে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করিবে, সেই সম্ভাবনাও বিশেষ নাই। কারণ ইতিমধ্যে নূতন প্রশ্ন এবং দাবি উঠিয়াছে।

সেই দাবি আঞ্চলিক ভাষার দাবি। ভারতবর্ষের প্রধান চৌদ্দটি ভাষাকেই সমান মর্যাদা দিবার দাবি। প্রদেশে প্রদেশে আঞ্চলিক ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বাংলা পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হইয়াছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কার্যকরী করিবার সক্রিয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হইয়াছিল। সেজন্য বর্তমানে আর কোন একটি ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষা রূপে গণ্য করিবার দাবি সোচ্চার নহে। প্রধান প্রধান আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে স্বীকার করিয়া লইবার দাবি বৈজ্ঞানিক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এইরূপেই ভাষা সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। বহু ভাষাভাষী দেশ সোভিয়েট রাশিয়ায়ও এইরূপে ভাষা-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইয়াছে। সেখানে সকল ভাষাই সমান মর্যাদার অধিকারী। সকল ভাষাই নিজ নিজ পথে বিকাশ এবং উন্নতি লাভ করিতে পারে। এক ভাষার উপর অন্য ভাষাকে সেখানে চাপাইয়া দিবার প্রশ্ন উঠে না। ভারতবর্ষেও যদি এই নীতি স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ভারতে ইংরেজী ভাষার স্থান হইবে গৌণ।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজী এখনও প্রধান ভাষা। আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়নের প্রশ্ন উঠিবার ফলে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই এখন স্নাতক-পূর্ব শিক্ষার মাধ্যম আঞ্চলিক ভাষা। কিন্তু সাম্মানিক এবং উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও ইংরেজীই

শিক্ষার মাধ্যম। তাহা ছাড়া শিক্ষার একেবারে গোড়া হইতে ইংরেজীও মাতৃভাষার সঙ্গে অবশ্যপাঠ্য। ইহাকে দ্বিতীয় ভাষা রূপে স্বীকার করা হইয়াছে। তারপর বর্তমানে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে আরও একটি ভাষা শিক্ষা করিতে হয়; এই ত্রি-ভাষা শিক্ষার মধ্যে ইংরেজী সংখ্যার দিক হইতে দ্বিতীয় হইলেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মর্যাদার দিক হইতে প্রথম।

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এই ত্রি-ভাষা ফর্মুলা লইয়াও নানা তর্ক-বিতর্ক দেখা দিয়াছে। সংসদীয় দলের এক উপ-সমিতি এই ত্রি-ভাষাকে ছাত্রদের উপর জুলুম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ছাত্রদের ভাষা শিক্ষা করিতেই বেশীর ভাগ সময় নষ্ট হইয়া যায়। অন্য বিষয়-শিক্ষা সেখানে গৌণ হইয়া পড়ে। সেজন্য তাঁহারা সুপারিশ করিয়াছেন, শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হইতে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। ইহার দ্বারা ছাত্রদের অনাবশ্যক অন্য ভাষা শিক্ষার জন্য সময় এবং শক্তি অপব্যয় করিতে হয় না। আর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করিলে উহা অল্পসময়ের মধ্যেই ছাত্রদের উপলব্ধি করিতে সুবিধা হইবে। আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী হইতে মাতৃভাষা করিবার জন্য তাঁহারা সুপারিশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ছাত্ররা আরও একটি ভাষা শিক্ষা করিবে। তাহা প্রথম পাঁচ বৎসরে নহে। পরবর্তিকালে ইংরেজী বা হিন্দী তাহারা দ্বিতীয় ভাষা রূপে শিক্ষা করিবে।

এই দুই ভাষা শিক্ষার সুপারিশ খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ছাত্ররা ভাষা শিক্ষার গুরুভার হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি অধিক সময় ব্যয় করিবার সুযোগ পাইবে। শিক্ষার মান উন্নত হইবে কিন্তু নানা রাজনৈতিক কারণে এই প্রস্তাব সম্পর্কে আপত্তি উঠিয়াছে। তাহা হইলে স্বভাবতঃই ছাত্ররা বিশেষ করিয়া অহিন্দী-ভাষী অঞ্চলে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীই গ্রহণ করিবে। হিন্দীর স্থান গৌণ হইয়া পড়িবে। হিন্দীর উৎসাহী প্রচারকগণ ভারতবর্ষের সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দীভাষী মানুষদের এই হিন্দীর নামে যে বিভ্রান্ত করিবার সুযোগ পাওয়া যাইত তাহা হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়ে এই প্রস্তাবে ভীষণ আপত্তি তুলিয়াছেন। তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই।

মীমাংসা না হইলেও ইংরেজী ভাষা ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইবে না।

ছাত্রদের পক্ষে দুই ভাষা বা তিন ভাষা যাহাই শিক্ষনীয় হইবে তাহাদের মধ্যে ইংরেজী অন্যতম ভাষা হিসাবে থাকিবেই। অবশ্য তাহা ইংরেজ জাতির ভাষা বলিয়া নহে। স্বাধীন ভারতবর্ষে তাহার কোন স্থান নাই।

ইংরেজী একটি বিশ্বভাষা। বিশ্ববাসী হিসাবে সেই ভাষা শিক্ষা করিলে পৃথিবীর সভ্য সমাজের সহিত আত্মিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিতে আমরা সমর্থ হইব। এই কারণেই ইংরেজী বর্তমানের পরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের নিকট গ্রহণীয় হইবে। ইহাতে উগ্র স্বাদেশিকদেরও আপত্তি করিবার কারণ থাকিবে না।

অবশ্য ইহার দ্বারা স্বাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজীকে যে স্থান দিবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহা হইবে না। সেই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। কোন এক বিশেষ শ্রেণীর সুবিধালাভের জন্য ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবিও উঠিয়াছিল। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষাকে স্বীকার করিয়া লইবার ফলে তাহা ব্যাহত হইয়াছে। সেই দাবি এখন আর গ্রহণযোগ্য নহে। স্বাধীন ভারতে ইংরেজী একটি সমুন্নত ভাষা হিসাবে যে স্থান পাইবার যোগ্য সেই স্থানই শ্রদ্ধার সঙ্গে লাভ করিবে। তাহার অধিক নহে।

যুদ্ধ ও সাহিত্য

যে কালে যুদ্ধ সর্বগ্রাসী ছিল না, রাজায় রাজায় শুধু যুদ্ধ হইত, সমাজের বেশির ভাগ লোকই তাহার খবর রাখিত না, তখনও যুদ্ধের সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। মূল মহাভারত, রামায়ণের অনেকখানি এবং হোমরের ইলিয়াড এই যুদ্ধেরই সাহিত্য। সাহিত্য যে জীবনের সহিত সম্পর্কিত এ সংজ্ঞা তখন হয়ত স্থিরীকৃত হয় নাই। পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে যুদ্ধের বৃত্তান্ত বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু তখনও যুদ্ধ হইয়াছে—যবনের সহিত, শক ও হূণের সহিত এবং রাজার সহিত রাজার। ইহাদের উল্লেখমাত্র নাই এমন নহে। মালবিকাগ্নিমিত্র

স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকে যুদ্ধের সংবাদ আছে, কিন্তু মহাভারতের মতো এগুলি যুদ্ধের সাহিত্য নহে, মূলতঃ প্রেম-কাহিনী। মুসলমান আমলে যুদ্ধ লইয়া রাজপুত চারণেরা কিছু কিছু সাহিত্য তৈয়ারী করিয়াছেন। বৃটিশ রাজত্বের সূচনায় 'পলাশীর যুদ্ধ' বহুদিন পরে বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।

যুদ্ধের রেওয়াজ ভারত অপেক্ষা ইউরোপে বেশি। সম্ভবতঃ সেখানকার মধ্যযুগীয় ক্রুশেডের মতো যুদ্ধ লইয়া কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য তৈয়ারী হয় নাই। নেপোলিয়ানের যুদ্ধ ফরাসী সাহিত্যে স্তাঁদালে এবং রুশ সাহিত্যের টলস্টয়ে স্থান পাইয়াছে। ফরাসীবিপ্লব – ভিক্টর হুগোর নাইন্টি থ্রি উপন্যাসের উপজীব্য। প্রথম মহাযুদ্ধের পর দুইটি জার্মান উপন্যাস (অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট এবং রোড ব্যাক) এবং একটি ইংরেজী নাটক (জার্নিস এণ্ড) সার্থক সাহিত্য হিসাবে অভিনন্দিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উপর ফরাসী জ্যাঁ-পল-সত্রের উপন্যাস এবং কিছু রুশ উপন্যাস রচিত হইয়াছে। যুদ্ধ-সাহিত্যে আমেরিকান ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ের নামও অবিস্মরণীয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কোন কোন অপরিচিত লেখকের দুই-একটি ছোট গল্প লেখা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত কাজী নজরুলও খানিকটা যুদ্ধের সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিধ্বংসী প্রভাব লইয়া কিছু কিছু বাংলা কবিতা রচিত হইয়াছে। কিন্তু সম্ভবতঃ একথা বলা অসঙ্গত নহে যে, যুদ্ধ লইয়া তেমন উল্লেখযোগ্য বাংলা সাহিত্য রচিত হয় নাই। কিন্তু একথা সত্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুনের ছোঁয়া বাংলা দেশেও লাগিয়াছিল; তাহারই অবক্ষয়ী প্রভাবে মন্বন্তর ঘটিয়াছে। মন্বন্তরের উপরই ভিত্তি করিয়া শ্রীপ্রবোধ সান্যালের 'অঙ্গার' একটি উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প। ইহা ব্যতীত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি লেখকও মন্বন্তর অবলম্বনে গল্প রচনা করিয়াছেন।

নৃশংস যুদ্ধ সভ্যতার শত্রু, মানবতার শত্রু। তাহা লইয়া যে সাহিত্য রচিত হইতে পারে তাহা ঘৃণার সাহিত্য, ব্যথার সাহিত্য। যুদ্ধের বীরত্বও শান্তিপ্রিয় মানবতাবাদীর দৃষ্টিতে হেয়বস্তু। যেহেতু সাহিত্যিকেরা প্রায়ই মানবতাবাদী তাই যুদ্ধ-সাহিত্য রচয়িতার সংখ্যাও অল্প; এবং যাঁহারা আছেন

তাঁহারা ব্যথাটাকেই স্পষ্ট করিয়া সার্থক করিতে চাহিয়াছেন। মানবজীবন শান্তির প্রত্যাশী, যুদ্ধের নৃশংসতা তাহার কাম্য নহে। তাই উপজীব্য হিসাবে যুদ্ধ-সাহিত্য উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু একটি প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক: সাহিত্যে যুদ্ধকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখা উচিত কিনা? যুদ্ধ আছে এবং আধুনিক কালের সর্বগ্রাসী যুদ্ধ সমাজের প্রত্যেকের জীবনকে দংশন করে। কাজেই জীবনের সহিত যদি সাহিত্যের পা ফেলিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে যুদ্ধকে বাদ দিয়া তাহা সম্ভব নহে। মনে হয়, যুদ্ধ লইয়া সেইরূপ সাহিত্য রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহা যুদ্ধের ইচ্ছাকে তিরোহিত করিবে। এরিখ মারিয়া রেমার্কের রচনা সে বিচারে সার্থক যুদ্ধ-সাহিত্য হিসাবে চিহ্নিত হইতে পারে।

যে সমাজে যুদ্ধ থাকিবে না, সে সমাজব্যবস্থা এখনও অনাগত। সাহিত্যিকেরাই পারেন সাহিত্যে সেই অনাগত কালের চিত্র অঙ্কন করিতে। যুদ্ধকে গৌরবান্বিত করিয়া সাহিত্যরচনার দিন নিঃশেষিত—হউক না তাহা ধর্মযুদ্ধ। যুদ্ধমাত্রেই যখন অধর্ম তখন ধর্মযুদ্ধ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। মানবসভ্যতা যুদ্ধবিহীন শান্তির ক্ষেত্রে উপনীত হইতে চাহে। সভ্যতার পুরোধা শিল্পী সাহিত্যিকবৃন্দের ঐদিকেই লক্ষ্য হওয়া একান্ত প্রত্যাশিত।

বৃহত্তর কলিকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনা

বিশাল সৌধের পাশেই জীর্ণ কুটিরের বস্তি ও তাহার অপরিচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, কোলাহলমুখরিত রাজপথের চারিপাশেই অজস্র অন্ধকার গলি এবং তাহাদের উভয়দিকে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া আলো-বাতাস হইতে চিরবঞ্চিত সারি সারি পুরাতন বাড়ী, রাস্তার কলে নিম্নবিত্ত মানুষের ভিড়, মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলিবার মতো স্বল্পপরিসর জায়গারও অভাব। কলিকাতা নগরীর যে কোনও অঞ্চলেই দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, ইহার সম্প্রসারণের মূলে কোনও প্রকার পরিকল্পনা ছিল না। জব চার্ণকের সুতানটি গ্রাম বৃটিশ বণিকের সাম্রাজ্য-স্বার্থের প্রয়োজন ও ভৌগোলিক অবস্থানের বিশেষ সুবিধার জন্য যদৃচ্ছভাবে বৃদ্ধি পাইয়া বিরাট জনসংখ্যাবহুল, শ্রীহীন, অস্বাস্থ্যকর কলিকাতা নগরীতে পরিণত

হইয়াছে। এই নগরীকে সুবিন্যস্ত করার দিকে কর্তৃপক্ষের কোনও দৃষ্টি বা চিন্তা ছিল না।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও নানাবিধ জীবিকার সুযোগ-সুবিধা থাকায় কলিকাতায় কেবল বাংলাদেশেরই নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতেই অজস্র লোক আসিয়া ভিড় করিয়াছে। কিন্তু এই অভিশপ্ত 'দুঃস্বপ্নের', 'মিছিলের,' 'উচ্ছৃঙ্খলতার' নগরীর প্রতি তাহারা কোন আত্মীয়সুলভ মমতা বোধ করে নাই। বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হইবার পর কলিকাতায় এবং উহার আশেপাশে পূর্ববঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বস্তি বা জীর্ণ বাসাবাড়ীতে সাধারণ মানুষেরা এক ভয়াবহ নারকীয় অবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করিতে বাধ্য হয়। এই বিপুলসংখ্যক অধিবাসীদের পরিস্রুত জলসরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশন, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং ব্যাধির চিকিৎসা প্রভৃতি নিম্নতর নাগরিক জীবনের সুযোগ-সুবিধাদানের ব্যবস্থাগুলি শোচনীয়ভাবে অপর্যাপ্ত। প্রতিটি বৎসর কলিকাতায় কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধি মহামারীর বিভীষিকায় আসিয়া উপস্থিত হয়। যক্ষ্মায় মৃত্যুর হারের ক্রমাগত বৃদ্ধিও কম আতঙ্কজনক নয়।

স্বাধীনতালাভের পর কিছুকাল ধরিয়াই পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃপক্ষ মহল কলিকাতার সমস্যা সমাধানের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। সম্প্রতি বিশ্বব্যাঙ্ক এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দুইটি প্রতিনিধিদল কলিকাতার বিভিন্ন সমস্যা পর্যালোচনা করিয়া বৃহত্তর কলিকাতা-গঠনের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে কলিকাতার উন্নয়নের সমস্যাকে যে কোনও স্থান দেওয়া হয় নাই, তাহা সত্যই বেদনাদায়ক। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের বিবরণীতে বলা হইয়াছে, কলিকাতার বন্দরের স্থান পূরণ করিতে পারে এইরূপ বিকল্প বন্দর নির্মাণের সুযোগ নাই। কলিকাতা এবং ইহার পশ্চাদ্‌ভূমির প্রয়োজন ও শিল্পপ্রসারের সুযোগের সদ্ব্যবহার—এই দিকে কোনও দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। কলিকাতা নগরীর বেকারসমস্যা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠার স্থানসংকুলান, উদ্বাস্তুদের বাসগৃহের ব্যবস্থা এবং যানবাহন চলাচলের উপযোগী রাস্তার অভাব প্রভৃতির সমস্যা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে গুরুতর বাধাস্বরূপ। কলিকাতা নগরী ব্যাপক দুর্গতির পটভূমিকায়ই বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধি দল এই মহানগরীর পুনর্গঠনের দায়িত্ব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত হইতে বলিয়াছেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিরাও কলিকাতার বিপজ্জনক

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের অবসানের জন্য পরামর্শ দান করিয়া গিয়াছেন ও এই নগরীর জলসরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীর শোচনীয় অবস্থার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। দুইটি প্রতিনিধিদলের সুপারিশেই কলিকাতা বন্দর রক্ষার জন্য ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণ এবং হলদিয়ায় একটি উপবন্দর নির্মাণ-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিদল কলিকাতার সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধানের অন্য 'দি ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান অথরিটি' নামে একটি সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী বৃহত্তর কলিকাতার, অর্থাৎ বজবজ হইতে কল্যাণী পর্যন্ত সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে এই সংস্থার অধীনে আনয়ন করিয়া তিন শত বর্গমাইল ব্যাপী বৃহত্তর কলিকাতা গঠিত হইবে। বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসরবরাহের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করিবার জন্যই তাঁহারা বলিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগেই বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়ন সাধনের জন্য সম্প্রতি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিকল্পনা অনুসারে 'দি ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন অর্গ্যানিজেশন' সংস্থাটি গঠিত হইয়াছে। এই সংস্থাটি ইতিমধ্যেই বৃহত্তর কলিকাতার অবস্থা পর্যবেক্ষণ নাগরিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমীক্ষা, পরিসংখ্যান গ্রহণ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুগোশ্লাভিয়ার সহায়তায় কলিকাতার পূর্বাঞ্চলের লবণহ্রদ বুজাইয়া একটি উপনগরী নির্মাণের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। এই প্রাদেশিক সরকারের ব্যবস্থাপনায় কল্যাণীতেও একটি উপনগরী গড়িয়া উঠিয়াছে।

দি ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান অর্গ্যানিজেশনের কর্মসূচী আরও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। কলিকাতার আশেপাশে যে সকল উদ্বাস্তু উপনিবেশ এলোমেলোভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের দিকেও যথাযথ দৃষ্টি দিতে হইবে। ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান অর্গ্যানিজেশন এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্যাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়নের পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকারকেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। কলিকাতা কেবল পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী নয়, সমগ্র পূর্বভারতেরই স্নায়ুকেন্দ্র; সুতরাং ইহার রক্ষা ও উন্নয়নের দায়িত্ব সমগ্র দেশের।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। বয়ঃকনিষ্ঠ যে দুইজন মাত্র সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না, তাঁহারা হইলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও কবি প্রমথ চৌধুরী। জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ অন্য কোন সমসাময়িক সাহিত্যিকের, বিশেষতঃ কবির নাম স্মরণ করা কঠিন যাহার রচনা রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত। প্রমথ চৌধুরী একাধিক কাব্য গ্রন্থের প্রণেতা হইলেও তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি প্রাবন্ধিক, কারণ এই তীক্ষ্ণধী সাহিত্যিক জানিতেন যে, তাঁহার ছন্দোবদ্ধ রচনাগুলি কবিত্ব-সমৃদ্ধ নহে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের প্রধান পরিচয় নাট্যকার হিসাবে হইলেও তাঁহার কবিতাগুলি সম্পর্কে একথা বলা চলে না। সেই হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল তৎকালীন একমাত্র কবি যিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট থাকিয়াও এবং রবীন্দ্র প্রতিভার অনুরাগী হইয়াও স্বকীয় কাব্যরচনায় রবীন্দ্র প্রভাব আত্মসাৎ করেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল 'রবীন্দ্রবিরোধী' বলিয়া সুপরিচিত হইলেও তিনি যে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন এবং রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে যে নাটকের আসর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বহু বৎসর সজীব থাকিয়া রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার প্রাথমিক প্রেরণা যোগাইয়াছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুকাল সেই আসরে নিয়মিত যোগদান করিতেন। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার খুব হৃদ্য সম্পর্ক ছিল। 'বিরহ' নামে প্রহসনটি দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং এই নাটকটি ঠাকুরবাড়ীতে অভিনীতও হইয়াছিল। প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্রকাব্য আক্রমণ করিবার পরেও দ্বিজেন্দ্রলাল যে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিতেন, তাহার প্রমাণ দ্বিজেন্দ্রলালের বিভিন্ন চিঠিপত্রে ও উক্তিতে পাওয়া যায়। তবু যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। বস্তুত মেজাজ ও মনোভঙ্গিতে এই দুই সমসাময়িক কবি যেন কাব্যলোকের দুই সীমান্তবাসী রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কবিরূপে দ্বিজেন্দ্রলালের যথার্থ পরিচয় পাইতে হইলে

তাঁহার বিশিষ্ট মনোভঙ্গি ও তাঁহার কবিত্বের প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে কবিত্বের অনুভূতির এমন এক প্রবণতা ছিল যাহা বাংলা সাহিত্যে সুলভ নহে। ভাবপ্রবণ অনেক কবির ক্ষেত্রে যাহা ঘটে, অনুভূতির তীব্র বেগে কাব্যের বাঁধুনি বা শিল্প ক্ষুন্ন হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে সেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। কেননা প্রথমতঃ, তিনি ভাবপ্রবণ ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, কাব্যশিল্পের সকল কলা-কৌশল তাঁহার সহজায়ত্ত ছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার সহজ সাবলীলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এইরূপ একজন কবি—যাঁহার আবেগ সত্য ও আন্তরিক, প্রকাশ সহজ ও সরল, শিল্পকৌশল করায়ত্ত, তিনি কাব্যসাহিত্যে মহত্তর স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন না কেন,—এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ইহার পিছনে কয়েকটি কারণ নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, রবীন্দ্র প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি অন্যান্য সমসাময়িক কবির মতো দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য প্রতিভাকেও কিছুটা আচ্ছন্ন করিয়াছে। দ্বিতীয় কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং। নাট্যকার রূপে তিনি যে বিপুল খ্যাতি ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কবিখ্যাতির অন্তরায় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তৃতীয় এবং সর্বাধিক প্রবল কারণ বোধ হয় এই যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার স্পষ্টতাই তাঁহাকে পাঠক মনের গভীর স্তরে প্রবেশ করিয়া স্থায়ী হইতে দেয় নাই, নদীস্রোতে ভাসমান ফুলের মতোই তাহা ক্ষণিক প্রীতি ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিয়া বিস্মৃতির দিগন্তে হারাইয়া গিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল-রচিত আটখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে একটি ইংরেজীতে রচিত, নাম 'The lyrics of Ind'। এই গ্রন্থখানি বাদ দিলে অপর সাতখানির মধ্যে 'আর্যগাথা' দুই ভাগ ও 'হাসির গান'-এর রচনাগুলিতে কবি সুর সংযোগ করিয়াছিলেন। 'আষাঢ়ে' বইটি ছন্দোবন্ধে রচিত হইলেও গ্রন্থকার এইটিকে 'গুটিকয়েক হাসির গল্প' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'মন্দ্র', 'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেণী'ই শুধু কবিতা পুস্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রকারভেদ সত্ত্বেও 'ছন্দোবন্ধে রচিত দ্বিজেন্দ্রলালের সাতখানি বই-ই তাঁহার কাব্যপ্রতিভার পরিচয় বহন করে।

আর্যগাথা প্রথম ভাগ কবির উনিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত হয়। এই

কবিতাগ্রন্থের কবিতাগুলি অপরিণত বয়সের রচনা হইলেও তাহার মধ্য হইতেই দ্বিজেন্দ্রলালের কবিমানসের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি "প্রকৃতি বিষয়িণী গীতি" সমষ্টি। প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য দেখিয়া কবির মনে যে সকল ভাব উদিত হইয়াছে, আর্যগাথায় তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার ভাবগুলি সুন্দর কিন্তু সে ভাবে আকুলতা নাই, তাহার শব্দবিন্যাস ও ছন্দ ঝঙ্কার অপূর্ব কিন্তু তাহা বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে নাই, তাঁহার সৌন্দর্য সম্ভোগ ইন্দ্রিয়ে সীমাবদ্ধ অতীন্দ্রিয়লোকে বিরাজ করে না বলিয়া তাহা পাঠকের চক্ষুস্পর্শকে তৃপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয়, পাঠক মনে তাহার অনুরণন সৃষ্ট হয় না। বলা চলে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিদৃষ্টি কিছু পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সংঘাতে হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়া জাগে, দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে তাহারও প্রকাশ আছে সত্য, কিন্তু সে অনুভূতি এরূপ গভীর স্তরের নহে যাহা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয় না। অপরদিকে ভাষা ও ছন্দের উপর দ্বিজেন্দ্রলালের এরূপ প্রভুত্ব ছিল যে, মনের অগভীর স্তরে ভাসমান এই অনুভূতিগুলিকে তিনি অনায়াসে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাষান্তরিত করিতে পারিতেন। এ কারণে তাঁহার কবিতায় কোন অস্পষ্টতা দেখা দিত না। ঐ একই কারণে, অপরের যেখানে ভাব স্পষ্টরূপে ভাষায় ধরা পড়ে নাই বলিয়া তাঁহার মনে হইত তাহাকে তিনি দুর্বল কবিত্ব বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের কবিতার অর্থহীনতা ও অস্পষ্টতা সম্বন্ধে তাঁহার অভিযোগ।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের ভাব সকল লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, তাঁহার মন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অপেক্ষা সামাজিক বা সম্প্রদায়গত অভিজ্ঞতায় বেশি আন্দোলিত হইত। অর্থাৎ প্রেমের গভীরতায় মগ্ন হওয়া অপেক্ষা স্বাদেশিকতার প্রবর্তনায় বা সামাজিক হীনতার গ্লানিতে বেশি আলোড়িত হইবার প্রবণতা তাঁহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, অন্তর্মুখিতা অপেক্ষা বহির্মুখিতা, ভাবালুতা অপেক্ষা বাস্তববোধ দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে বেশি প্রকট। এই জাতীয় কবিদৃষ্টি নাট্যরচনা ও আখ্যায়িকা কাব্যরচনার পক্ষেই অধিক উপযোগী। এই কারণেই মনে হয়, তাঁহার অধিকাংশ কবিতা কিছু পরিমাণে গল্প বা কাহিনীর সহিত জড়িত। 'আষাঢ়ে', 'মন্দ্র', 'হাসির গান' ও 'আলেখ্য' বইগুলির অধিকাংশ কবিতায় কিছু কিছু গল্প আছে। ঐ এক কারণেই

তিনি নাট্যরচনায় যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, গীতিকাব্যে সে সাফল্য লাভ করি৮ ৩ পারেন নাই।

হাস্যরসকে সাহিত্যে সার্থক করিয়া তোলার জন্য প্রয়োজন প্রবল সমাজ চেতনা, সূক্ষ্ম বাস্তব-দৃষ্টি এবং নিপুণ ভাষাবিন্যাস। এই সকল গুণই দ্বিজেন্দ্রলা৷ রায়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাই বাংলা হাস্যরসাত্মক সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্র লাল অদ্বিতীয় হইয়া আছেন। বাংলা কাব্যসাহিত্যে অন্যান্য যে সকল হাস্যরসিক, লেখক আছেন তাঁহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথের রচনা বিদ্রূপাত্মক। সুকুমার রায়ের রচনা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। প্রমথ চৌধুরীর রচনা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উইট আশ্রিত। রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। বোধ হয় লঘুতার স্তরে মনকে সীমাবদ্ধ রাখা তাঁহার পক্ষে সহজ ছি। না; কিন্তু সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি-জীবনের সকল অসঙ্গতি দ্বিজেন্দ্রলালের চোখে সহজেই ধরা পড়িত এবং অসাধারণ বাক্‌বৈদগ্ধের ফলে তিনি তাহ নিখুঁতভাবে তুলিয়া ধরিতে পারিতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসাত্মক রচনার আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, কি বিদ্রূপে, কি বুদ্ধিগ্রাহ্য বাক্-চাতুর্যজনিত হাস্য বা উইট-সৃষ্টিতে, কি নিছক কৌতুকে তিনি সমান অবলীলায় বিচরণ করিতেন।

'আষাঢ়ে'র কবিতাগুলির বিষয় প্রধানতঃ সামাজিক ও পারিবারিক। জাতীয় জীবনে বেদনা ও গ্লানি এগুলির প্রেরণা যোগাইয়াছে। সেই কারণে এ রচনাগুলি তীব্র বিদ্রূপাত্মক। কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে হাস্যরস সমভাবেই উৎসারিত হইয়াছে। সর্বত্রই দেখা যায় হাস্যরসকে কবি যত সহজে নিপুণতায় সার্থক করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন, অন্য রসের ক্ষেত্রে তিনি ঠিক সেই পরিমাণে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই।

জীবনে বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রভাব

[ক. বি বি. এ পার্ট ওয়ান, ১৯৬৪]

পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা লব্ধ যে বিশেষ জ্ঞান তাহাই বিজ্ঞান। প্রকৃতিকে জয় করিয়া মানবজীবনের প্রয়োজনীয় নানা জিনিস আবিষ্কার করিয়া তাহার

অব্যাহত জয়যাত্রা। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের উন্নতিসাধন করাই বিজ্ঞানীর উদ্দেশ্য। সেই আদিম যুগে মানুষ যখন হিংস্র প্রকৃতির দ্বারা আবেষ্টিত, প্রবৃত্তির তাড়নায় পশুর মত এদিকে ওদিকে ছুটিত তখনও মানুষের উন্মেষশালিনী বুদ্ধি আগুনের আবিষ্কার করিল। পাথরের নানা সরঞ্জাম তৈয়ার করিয়া মানবসমাজের অগ্রগতির পথ পরিষ্কার করিল। বিজ্ঞানের ইতিহাস শুরু হইল। তারপর হইতে তাহার নিরন্তর প্রয়াস চলিতেছে পার্থিব বস্তুর আবিষ্কার করার। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতিকে বশ করিয়া মানব জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত করিয়াছে।

বিজ্ঞান কোন বস্তুকেই সত্য বা শাশ্বত বলিয়া মনে করে না। বিজ্ঞানীর অতন্দ্র সাধনা নানা রহস্যের সত্য আবিষ্কার করিতে চায়। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের সুপ্ত আশা, কামনা বাসনা নূতন নূতন আবিষ্কারের প্রেরণা লাভ করে। বিজ্ঞান দিনের পর দিন অতন্দ্র সাধনায় মানবজীবনের দুঃখ বেদনাকে নানা অসুবিধাকে দূর করিয়া জীবনকে সুখী ও সুন্দর করিয়া তুলিতেছে। সেজন্য আজ মানবজীবনের প্রতি পদক্ষেপে এত সুখ এত স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যায়। মানুষ তাহার কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়া সৃষ্টির গোপন রহস্যকে উন্মোচন করিয়াছে, পর্যবেক্ষণ করিয়াছে। এই বিজ্ঞানের বলে প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকে বিশ্লেষণ করিয়াছে, পর্যবেক্ষণ করিয়াছে। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ দূরকে নিকট করিয়াছে। প্রকৃতি আজ মানুষের কাছে নতি স্বীকার করিয়াছে।

জেমস ওয়াট বাষ্পশক্তি আবিষ্কার করিয়া মানবজীবনের গতিবেগ বহুগুণ বৃদ্ধি করিলেন। তারপর বিজ্ঞান আবিষ্কার করিল বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার চেহারা পরিবর্তিত হইয়া গেল। পৃথিবী আজ যেন অনেক সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানের বলে আবিষ্কৃত যন্ত্রাদির সাহায্যে আমরা এখন অতি সহজে দূর দূরান্তরে যাইতে পারি। উড়োজাহাজ, স্টীমার, রেলগাড়ী, মোটর, জাহাজ প্রভৃতি আমাদের যাতায়াতকে করিয়াছে দ্রুতগামী, সহজ এবং আরামপ্রদ। প্রখর উত্তাপ বা বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা, শীতের প্রাবল্য হইতে মুক্তি, অন্ধকার হইতে মুক্তি এই সকল বিজ্ঞানের আশীর্বাদেই সম্পন্ন হইয়াছে। আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে শত শত মাইল দূর হইতে প্রিয়জনের সংবাদ আসে টেলিগ্রামে, বেতারে, টেলিফোনে। ঘরে বসিয়া মানুষ বিশ্বের

অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর শুনিতেছে, তাহার মূর্তি দেখিতেছে, জীবন্তরূপে ছায়াছবি আজ কথা বলিতেছে, শব্দতরঙ্গ অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছে, ক্ষুদ্র পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি বিচ্ছুরিত করিয়া মানুষ মুহূর্তে লক্ষ হস্তীর কাজ করিতেছে। বস্তুর নিলয় ঘটাইয়া বিজ্ঞানীরা আলোকের গতি লাভের স্বপ্ন দেখিতেছেন আপনার ল্যাবরেটরীতেই, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সৃষ্টি করিতেছেন সূর্যমণ্ডলের তাপ।

বিজ্ঞান মানুষকে দিয়াছে স্বাচ্ছন্দ্য। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত একটি শহরের মানুষের জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, বিজ্ঞান আবিষ্কৃত নানা জিনিসই তাহার প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী। সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে রাত্রিতে আবার নিদ্রার প্রাক্‌মুহূর্ত পর্যন্ত সে নানাভাবে এই বিজ্ঞানের কল্যাণে উপকৃত। সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর স্টোভ, হিটার বা গ্যাসের উনুনে তৈয়ারী করা চা পান, তাহার সঙ্গে আছে সংবাদপত্র পাঠ। এই সংবাদপত্রও বিজ্ঞানের এক বিশেষ দান। বিজ্ঞানের দানেই কত মনীষীর শিক্ষা, উপদেশ ও বাণী, সারা বিশ্বের কত বিচিত্র সংবাদ টেলিপ্রিণ্টার যোগে আনিয়া রোটারি মেসিনে মুদ্রিত হইয়া প্রতিদিন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। পৃথিবীর কোন এক দূর প্রান্তে কী ঘটনা ঘটিল, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র এক গ্রামে বসিয়াও তাহা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানিতে পারা যায়। তারপর শাওয়ারের জলে স্নান, দ্রুতগামী যানে অফিস গমন, বৈদ্যুতিক পাখার নীচে অথবা এয়ার-কণ্ডিশনড ঘরে বসিয়া কাজ, তারপর ছুটি। মেট্রো কিংবা লাইট হাউসে সিনেমা দেখা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের মধ্যেই বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ দান অনুভূত হয়। এই ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, বিজ্ঞান আমাদের দিয়াছে চিত্তবিনোদনের উপকরণ, দিয়াছে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য, দিয়াছে প্রাত্যহিক জীবনধারণের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক।

গ্রামের কৃষকও আজ বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের দ্বারা উপকৃত। অশোক বৃক্ষের আমলের লাঙ্গল আর গরুর উপর ভরসা করিয়া এখন আর চাষ হয় না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কলের লাঙ্গল, নিড়ানি, রাসায়নিক সার প্রভৃতির সাহায্যে চাষবাস করিয়া তাহার উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিজ্ঞান মৃত্যুপথ-যাত্রীকে দিয়াছে আশার আলো, তাহার প্রাণে জাগাইয়াছে নিশ্চিত বিশ্বাস। বিজ্ঞান এমন সব ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছে যাহা অনেক

দুরারোগ্য ব্যাধিকে সহজেই নিরাময় করিয়া দিতে পারে। জার্মান বিজ্ঞানী 'রণ্টজেন' রঞ্জন-রশ্মি (X-Ray) আবিষ্কার করিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্র যুগান্তর সাধন করিয়াছেন। বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে যে মনুষ্যদেহের অভ্যন্তরের পূর্ণাঙ্গ চিত্র গ্রহণ করা সম্ভব তাহা পূর্বে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। ইহার দ্বারা মানব-সমাজের অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। তারপর জলাতঙ্কের ঔষধ আবিষ্কার করিলেন ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর। ইহার দ্বারাও নানা দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা সম্ভব হইয়াছে। এণ্টিবায়োটিক ও রেডিয়াম থেরাপির আবিষ্কারও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এইরূপে দেখা যায়, মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রার পক্ষে আবশ্যকীয় সকল কিছুই বিজ্ঞানের দান। বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত বর্তমান যুগে দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ করা অসম্ভব ব্যাপার। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে বিজ্ঞান আমাদের কাজে সহায়ক হইয়াছে। সেজন্য বিজ্ঞান চিন্তা বর্তমানে আর কেবলমাত্র বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, আমাদের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস প্রভৃতি সকল বিষয়েই রহিয়াছে বিজ্ঞানের প্রভাব। পূর্বে অলৌকিক বা অপ্রাকৃতিক শক্তির উপরে মানুষের ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। নিয়তি বা ভাগ্যের উপর মানুষ তাহার অদৃষ্টকে অনেকখানি ছাড়িয়া দিত। কোন অঘটনকে দৈবের নির্বন্ধ বলিয়া মানিয়া লইত। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, অনাচার প্রভৃতি মানব-জীবনকে দুর্বহ করিয়া তুলিলেও তাহার পিছনে কোন মানবগোষ্ঠী বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়কে তাহারা কল্পনা করিতে পারে নাই। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া মুখ বুজিয়া সব সহ্য করিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে সেদিন আর নাই। মানুষ এখন কার্য-কারণ সম্পর্ক না জানিতে পারিলে তৃপ্ত হয় না। এতকাল যা একান্ত ভাবে বিশ্বাস করিত তাহাও যুক্তিতর্ক দ্বারা যাচাই করিয়া লয়। বিনা যুক্তিতে কোন কিছুকে শিরোধার্য করিয়া লইবার প্রবণতা আর নাই। মানব জীবনের প্রতিটি কার্যে এই যুক্তিপ্রবণতা বর্তমানে পরিলক্ষিত। সাহিত্যে, শিল্পে দর্শনে সর্বত্র যুক্তিগ্রাহ্য বাস্তবতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই যে যুক্তিপ্রবণতা ইহাও বিজ্ঞানের দান, আমাদের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ দান। প্রত্যক্ষভাবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে আমরা নানা জিনিস লাভ করিয়াছি। তাহার দ্বারা মানুষের জীবন সহজ-সাধ্য, আরামপ্রদ এবং সুখকর হইয়াছে। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও প্রধান কথা হইল, মানুষ এই বিজ্ঞানের প্রভাবে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ

অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর শুনিতেছে, তাহার মূর্তি দেখিতেছে, জীবন্তরূপে ছায়াছবি আজ কথা বলিতেছে, শব্দতরঙ্গ অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছে, ক্ষুদ্র পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি বিচ্ছুরিত করিয়া মানুষ মুহূর্তে লক্ষ হস্তীর কাজ করিতেছে। বস্তুর নিলয় ঘটাইয়া বিজ্ঞানীরা আলোকের গতি লাভের স্বপ্ন দেখিতেছেন আপনার ল্যাবরেটরীতেই, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সৃষ্টি করিতেছেন সূর্যমণ্ডলের তাপ।

বিজ্ঞান মানুষকে দিয়াছে স্বাচ্ছন্দ্য। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত একটি শহরের মানুষের জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, বিজ্ঞান আবিষ্কৃত নানা জিনিসই তাহার প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী। সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে রাত্রি আবার নিদ্রার প্রাক্‌মুহূর্ত পর্যন্ত সে নানাভাবে এই বিজ্ঞানের কল্যাণে উপকৃত। সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর স্টোভ, হিটার বা গ্যাসের উনুনে তৈয়ারী করা চা পান তাহার সঙ্গে আছে সংবাদপত্র পাঠ। এই সংবাদপত্রও বিজ্ঞানের এক বিশেষ দান। বিজ্ঞানের দানেই কত মনীষীর শিক্ষা, উপদেশ ও বাণী, সারা বিশ্বের কত বিচিত্র সংবাদ টেলিপ্রিন্টার যোগে আনিয়া রোটারি মেসিনে মুদ্রিত হইয়া প্রতিদিন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। পৃথিবীর কোন এক দূর প্রান্তে কী ঘটনা ঘটিল, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র এক গ্রামে বসিয়াও তাহা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানিতে পারা যায়। তারপর শাওয়ারের জলে স্নান, দ্রুতগামী যানে অফিস গমন, বৈদ্যুতিক পাখার নীচে অথবা এয়ার-কণ্ডিশনড ঘরে বসিয়া কাজ, তারপর ছুটি। মেট্রো কিংবা লাইট হাউসে সিনেমা দেখা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের মধ্যেই বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ দান অনুভূত হয়। এই ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, বিজ্ঞান আমাদের দিয়াছে চিত্তবিনোদনের উপকরণ দিয়াছে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য, দিয়াছে প্রাত্যহিক জীবনধারণের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক।

গ্রামের কৃষকও আজ বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের দ্বারা উপকৃত। অশোক বুদ্ধের আমলের লাঙ্গল আর গরুর উপর ভরসা করিয়া এখন আর চাষ হয় না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কলের লাঙ্গল, নিড়ানি, রাসায়নিক সার প্রভৃতির সাহায্যে চাষবাস করিয়া তাহার উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিজ্ঞান মৃত্যুপথ-যাত্রীকে দিয়াছে আশার আলো, তাহার প্রাণে জাগাইয়াছে নিশ্চিত বিশ্বাস। বিজ্ঞান এমন সব ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছে যাহা অনেক

দুরারোগ্য ব্যাধিকে সহজেই নিরাময় করিয়া দিতে পারে। জার্মান বৈজ্ঞানী 'রণ্টজেন' রঞ্জন-রশ্মি (X-Ray) আবিষ্কার করিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রে যুগান্তর সাধন করিয়াছেন। বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে যে মনুষ্যদেহের অভ্যন্তরের পূর্ণাঙ্গ চিত্র গ্রহণ করা সম্ভব তাহা পূর্বে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। ইহার দ্বারা মানব-সমাজের অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। তারপর জলাতঙ্কের ঔষধ আবিষ্কার করিলেন ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর। ইহার দ্বারাও নানা দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা সম্ভব হইয়াছে। এন্টিবায়োটিক ও রেডিয়াম থেরাপির আবিষ্কারও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এইরূপে দেখা যায়, মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রার পক্ষে আবশ্যকীয় সকল কিছুই বিজ্ঞানের দান। বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত বর্তমান যুগে দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ করা অসম্ভব ব্যাপার। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে বিজ্ঞান আমাদের কাজে সহায়ক হইয়াছে। সেজন্য বিজ্ঞান চিন্তা বর্তমানে আর কেবলমাত্র বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, আমাদের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস প্রভৃতি সকল বিষয়েই বাহিয়াছে বিজ্ঞানের প্রভাব। পূর্বে অলৌকিক বা অপ্রাকৃতির শক্তির উপরে মানুষের ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। নিয়তি বা ভাগ্যের উপর মানুষ তাহার অদৃষ্টকে অনেকখানি ছাড়িয়া দিত। কোন অঘটনকে দৈবের নির্বন্ধ বলিয়া মানিয়া লইত। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, অত্যাচার প্রভৃতি মানব-জীবনকে দুর্বহ করিয়া তুলিলেও তাহার পিছনে কোন মানবগোষ্ঠী বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়কে তাহারা কল্পনা করিতে পারে নাই। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া মুখ বুজিয়া সব সহ্য করিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে সেদিন আর নাই। মানুষ এখন কার্য-কারণ সম্পর্ক না জানিতে পারিলে তৃপ্ত হয় না। এতকাল যা একান্ত ভাবে বিশ্বাস করিত তাহাও যুক্তিতর্ক দ্বারা যাচাই করিয়া লয়। বিনা যুক্তিতে কোন কিছুকে শিরোধার্য করিয়া লইবার প্রবণতা আর নাই। মানব জীবনের প্রতিটি কার্যে এই যুক্তিপ্রবণতা বর্তমানে পরিলক্ষিত। সাহিত্যে, শিল্পে দর্শনে সর্বত্র যুক্তিগ্রাহ্য বাস্তবতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই যে যুক্তিপ্রবণতা ইহাও বিজ্ঞানের দান আমাদের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ দান। প্রত্যক্ষভাবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে আমরা নানা জিনিস লাভ করিয়াছি। তাহার দ্বারা মানুষের জীবন সহজ-সাধ্য, আরামপ্রদ এবং সুখকর হইয়াছে। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও প্রধান কথা হইল, মানুষ এই বিজ্ঞানের প্রভাবে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ

করিয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি রাজনীতি এবং সমাজনীতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হওয়ায় সার্থক পটপরিবর্তন দেখা যাইতেছে। প্রগতির পথে মানব সমাজ সামন্ততন্ত্র. ধনতন্ত্র হইতে এখন সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকিয়াছে। ভাবালুতা সংযত হইয়াছে। যুক্তি এর কার্য কারণ সম্পর্ক প্রধান্য লাভ করিয়াছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের এই দান মানুষের নিছক কল্যাণ এবং মঙ্গল সাধনই করে নাই, বিজ্ঞান মানবজীবনে নানা অমঙ্গলেরও সৃষ্টি করিয়াছে। প্রতিটি জিনিসের ভাল মন্দ দুই দিক আছে। এই জগতে আলোর সঙ্গেই রহিয়াছে অন্ধকার। সৃষ্টির সঙ্গে আছে বিলয়। সেইরূপ বৈজ্ঞানিক উন্নতি মানবজীবনের যেমন স্বাচ্ছন্দ্য আনিয়াছে তেমনি চরম দুর্গতিও আনিয়াছে।

সমাজ এবং রাষ্ট্রিক জীবনের যাহারা কর্ণধার তাহারা বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে তাহাদের স্বার্থেও নিয়োজিত করিয়াছে। তাহাদের লোভ এবং শোষণের যন্ত্রে বিজ্ঞান হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহারা বিজ্ঞানকে ব্যবহার করিতেছে মানুষের অকল্যাণে, মানুষ মারিবার উপায় হিসাবে। বর্তমানে মারণাস্ত্রের তাণ্ডব লীলায় মানুষের বহু যুগের সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংসের মুখে পড়িয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদী ধনিক গোষ্ঠীর স্বার্থে দেশে দেশে যুদ্ধ বাধে। তাহাদের মুনাফা মৃগয়ায় মানুষ কাতারে কাতারে বলির পশুর মত প্রাণ হারায়। আর তাহার ফল ভোগ করে স্বার্থপর সেই সাম্রাজ্যগর্বীর দল। তাহারা অর্থের লোভে বিজ্ঞানীকে তাহাদের এই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কাজে নিযুক্ত করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ব্যবহার করা হইল দুইটি জাপানী শহর ধ্বংস করিবার জন্য। বর্তমানেও দেশে দেশে চলিতেছে এই আণবিক বোমা তৈয়ারীর মহড়া তাহার উপরেও আছে হাইড্রোজেন বোমা। সেজন্য বার্ট্রাণ্ড রাসেল মনে করেন,- "এমন যুদ্ধ বাধিতে পারে যাহার ফলে সকলে, প্রায় প্রত্যেকে শেষ হইয়া যাইতে পারি। যুদ্ধ যদি নাও হয়, গ্রহ উপগ্রহের উপর আক্রমণ চলিবে এবং হয়ত সেগুলি ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে পারে। চাঁদ ভাঙ্গিয়া, গুঁড়াইয়া, গলিয়া যাইতে পারে। বিষাক্ত খণ্ডিত অংশ মস্কো, ওয়াশিংটন বা অপেক্ষাকৃত নিরীহ দেশগুলির উপর পড়িতে পারে।"

সেজন্য অধ্যাপক জুলিও কুরি বলিয়াছিলেন, "Disarmament was necessary for the present disturbed world to settle down."

ইহা ছাড়াও স্বার্থান্ধ ধনপতিরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির একচেটিয়া ব্যবসায় দ্বারা কোটি কোটি টাকা মুনাফা লোটে। ইহা সম্ভব কারণ, বর্তমানে অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্রশাসনযন্ত্র তাহাদের হাতে। তাহাদের হাত হইতে রাষ্ট্রক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া সাধারণ মানুষের কর্তৃত্ব সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে বিজ্ঞানের এই অপব্যবহারকে রোধ করা সম্ভব নয়। সেজন্য বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ না করিয়া অভিযোগ করা উচিত রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বিরুদ্ধে, ধনিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। তাহাদের অপসারণের জন্য চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে মানব-সমাজ শোষণ মুক্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের আস্বাদ লাভ করিতে পারে।

চরিত্র গঠনে খেলাধুলার প্রভাব

[ক. বি বি এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩

মানবজীবনের পরম লক্ষ্য তাহার প্রবৃত্তিনিচয়ের সুসমঞ্জস প্রকাশের মধ্য দিয়াই। মানুষের সমাজ প্রতিদিন তাহার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া চলিতেছে, শিক্ষা তাহার মনোবিকাশে সাহায্য করে, তাহার বর্ধিষ্ণু জীবনধারাকে টিকাইয়া রাখিতে সহায়তা করে। গতানুগতিক কাজের মধ্যে বুনানিতে নিশ্ছিদ্র এই জীবনটাতে অবসর চাই, বদ্ধশালার চার দেওয়ালের মধ্যে আলোর প্রবেশের বাতায়নের প্রয়োজন রহিয়াছে।

জীবনসচেতন মানুষ যুগের প্রেরণায় তাই তাহার বিচরণের বাহিরে রাখিয়াছে খেলার মাঠ। কারখানা ঘর আর অফিস ঘরের চৌহদ্দির বাহিরে রাখিয়াছে খোলা ময়দান। প্রাণ সেখানে বুক ভরিয়া তাজা হাওয়া লইবে, মন সেখানে হঠাৎ মুক্তির আনন্দে রৈ রৈ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবে।

মানুষের জীবনে অবসরের একান্ত প্রয়োজন। এই অবকাশের সঙ্গে আনন্দের যোগসাধনের জন্যই আদিমকাল হইতে মানুষের নানান উৎসবের সৃষ্টি। শিকারের শেষে একত্রিত হইয়া তাহারা অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া নানা অঙ্গবিক্ষেপের দ্বারা এক উদ্দাম আনন্দকে লাভ করিতে চাহিয়াছে। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনচেতনার পরিবর্তন ঘটে, তাহার ফলে সেই অবকাশের মুহূর্তে বর্তমানের

প্রয়োজন ক্রীড়া-অঙ্গন। শিক্ষায়তনের শেষ প্রহরের ঘণ্টাটি ক্লান্ত ছাত্রে পার ক... দেয় বাহিরের খোলা মাঠে তাহার খেলার সঙ্গীদের সহিত মিলনের আশ্বাসে মাঠের কৃষকের ক্লান্তি তাহার আসন্ন কবাটী প্রতিযোগিতার কথা ভাবিয়া দূর হইয়া যায়।

খেলাধূলার অর্থ জীবনের কর্মকে অবহেলা নয়, কাজেরই রসদ যোগানো। আমাদের জীবনধারণের জন্য যেমন জল, মাটি, হাওয়ার দরকার ঠিক তেমনই জীবন বিকাশের জন্য লেখাপড়া ও কর্মশালার শিক্ষানবিশী ছাড়াও খেলাধূলার প্রয়োজন।

এ কথা সকলেই জানে যে খেলাধূলা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে প্রয়োজন। খোলা হাওয়ায় মুক্ত অঙ্গনে দৌড়াদৌড়ি, লাফ ঝাঁপ, স্নায়ু ও পেশীকে সুস্থ ও সবল করিয়া বুকের দম বাড়ায়। কিন্তু এই ব্যায়ামের দিক ছাড়াও ইহার চিত্ত বিনোদনের য ক্ষমতা আছে, ক্লান্ত মানুষকে উৎসাহ দানের যে সম্ভাবনা আছে—এই দিকটি বর্তমানকালে যেভাবে সমাজবিদ বা শিক্ষাবিদের নিকট স্বীকৃতি পাইয়াছে প্রাচীন কালে এই মূল্যায়ন হয় নাই।

আমাদের প্রাচীন গুরুমহাশয়ের বেত্রাস্ফালন এতদিন শুধু এই কথাই জানাইয়াছে "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ।" অতীতে পাশ্চাত্যেও অনুরূপ প্রবচন All work no play এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। খেলাধূলা চটুলতার পরিচায়ক, মনকে বিক্ষিপ্ত করে, একাগ্রতা বিনষ্ট হয়, এই ধারণা প্রাচীনকালের। কিন্তু নূতন কালে নবদিগন্তে নূতন বাণী ধ্বনিত হইতেছে। পাশ্চাত্যের বৈষয়িক বুদ্ধি যখন খেলার মাঠের ধূলিকণাকে কর্মশালার বিভূতি বলিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে না, তখন প্রাচীনের অহঙ্কৃত শিক্ষাসূত্র যে ঈষৎ অবনমিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি। বিশেষ করিয়া জীবনযুদ্ধে যখন বারংবারই আমরা পিছু হটিতেছি। পাশ্চাত্যে যুগ প্রয়োজনে জীবনবোধের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু আমাদের দেশ অচলায়তনের নিয়ম পরিবর্তনের ঝুঁকি লইতে চাহে না। অতীতের প্রয়োজনের সীমানায় বর্তমানকে বাঁধিবার প্রয়াসী আমরা।

কিন্তু পশ্চিমের ভাবতরঙ্গের প্রবল প্রবাহে আমাদের 'চৈতন্য'ও আজ আন্দোলিত, তাই এই অতি আধুনিক কালে পূর্ব পশ্চিম দুই দেশের খেলাধূলাকে ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া চিন্তা করা হইতেছে। শিশুর অক্ষর পরিচয়ও আজ খেলাধূলার মাধ্যমে করার জন্য মন্তেসরী কিংবা

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থা। শিক্ষাকে চিত্তগ্রাহী করিয়া তুলিবার জন্য এই প্রয়াস। ইহাতে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ নিবিড়তর হইতে পারে। তেমনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবিক চিদ্বৃত্তিগুলিরও বিকাশ সাধনের চেষ্টা চলিয়াছে খেলাধুলার মধ্য দিয়াই। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। তাঁহার জীবনস্মৃতি হইতে জানিতে পারি একই সঙ্গে শরীরচর্চার ও মেধাচর্চার ব্যবস্থা ছিল তাঁহার পরিবারে। তিনি ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর নিঃসন্দেহে কিন্তু তাঁহার জীবনের সামগ্রিক সাফল্যলাভের পশ্চাতে এই বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাগুরু হিসাবে ব্যাকরণ শিখাইবার জন্যে গ্রামার ড্রিল'-এর ব্যবস্থা পর্যন্ত করিয়াছিলেন। মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে প্রায় সমুদয় গুণই খেলাধুলার মাধ্যমেই পাওয়া সহজ। ঐক্যবোধ, সাহস, প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব, দৃঢ়সঙ্কল্প, সহযোগিতার মনোভাব ও জয় পরাজয়কে সমানভাবে মানিয়া লইবার ক্ষমতা—সাধারণভাবে এইগুলির প্রায় সব কয়টিই সম্পূর্ণতঃ লাভ করিতে পারি খেলার মাঠ হইতে। দলগত শক্তিতে আস্থা, সহযোগিতা ও দৃঢ় সঙ্কল্প সর্বোপরি শৃঙ্খলাবোধ, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলার দিকে তাকাইলেই লক্ষ্য করা যাইবে এইগুণগুলিই আমাদের বৃহত্তর কর্মজীবনে নানাভাবে প্রয়োজন হইবে। একজন সেণ্টার ফরোয়ার্ডের প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব একজন সৈনিকের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হইবে। একজন Captain বা দল পতির পর্যবেক্ষণশক্তি, নেতৃত্বশক্তি একটি সেনাবাহিনীকে পরিচালিত করিবে। খেলার মাঠে জয়লাভের আশা ও উদ্যম জীবনের যাত্রাপথে সমস্ত পরাজয়ের গ্লানিকে সরাইয়া দিয়া নূতন করিয়া চলিবার প্রেরণা দিবে।

বর্তমানে বহু শিক্ষায়তনে শিক্ষক নিয়োগ কালে, কিংবা অফিস বা কারখানায় কর্মী নিয়োগ কালে খেলাধুলার যোগ্যতাকে একটি আবশ্যকীয় যোগ্যতা বলিয়া মনে করা হয়। কারণ বর্তমান চিন্তাশীলগণ বলেন, যে শিক্ষক খেলার মাঠের সঙ্গী, স্কুলের ক্লাসরুমের তিনিই সার্থক শিক্ষক, যে-কর্মী ক্রিকেট ব্যাট হাতে লইতে জানে, কেরাণীর কলম বা কারখানার হাতুড়ি হাতে লইলেও সে নিজেকে অসম্মানিত বোধ করিবে না। সব কিছুকেই তাহারা খেলোয়াড়ী দৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে পারিবে।

পরিশেষে, একটি কথা মনে করাইয়া দেওয়া দরকার যে, 'সর্বমত্যন্ত গর্হিতম্।'

খেলাধুলাকে জীবনের আর পাঁচটা দিকের পরিপূরক হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। পেশাদারী খেলোয়াড়কে আমরা খেলার ব্যবসাদার ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি না। সে খেলোয়াড়েরর নৈতিক মান হইতে নীচে নামিয়া আসিতে বাধ্য। আসল কথা খেলাধুলাকেও জীবন-শিল্পের এক আনন্দময় বিকাশ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

জাতীয় ঐক্যের পথে বাধা ও উহা দূর করার উপায়

[ক. বি. বি. এ পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩]

ভিনসেণ্ট স্মিথ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের নানা বৈপরীত্যের মধ্যে একটি মৌলিক ঐক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষ একদিকে যেমন বহুবিধ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের, অপর দিকে তেমনি বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি এবং উহাদের বিবিধ প্রকার ধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রথার দেশ। এই মহাসমুদ্রে বহু নদীর ধারা আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। বৃহত্তর সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনে ও কবিসাধকের চিন্তায় ধ্যানে মোটামুটিভাবে এই ঐক্যকে অনুভব করা যায়। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সমাজ-জীবনের দৈনন্দিন আচরণে ও সম্পর্কে এই ঐক্যানুভূতি যে কতটা পরিমাণে কার্যকরী হইয়াছিল তাহা সন্দেহের বিষয়। ঐক্যচেতনা যদি আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের জনসাধারণকে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিত তবে অন্তঃকলহে, গোষ্ঠীগত বিবাদে অবসন্ন, দুর্বল এই দেশ বার বার বৈদেশিক আক্রমণের নিকট এমনি অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিত না। বর্ণাশ্রমধর্মের বৈষম্যমূলক বিধিব্যবস্থায়, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধে ভারতীয় সমাজ দীর্ঘকাল হইতে পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে। আমাদের সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি বাস্তব ঐক্যচেতনা পরিব্যাপ্ত হইত, তবে এই বিশাল দেশকে দুই শত বৎসরেরও অধিককাল ব্রিটিশ-শাসকদের অধীনে পরাধীনতার দুর্বিষহ বোঝা বহন করিতে হইত না।

ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে ভারতীয় সমাজজীবনের এই সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সচেতনতা দেখা দেয়। কেবল ভাবগত বা সাংস্কৃতিক ঐক্য লইয়া

একটি জাতি যে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, অনেকেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করেন। কাব্য-গাথায়, জনপদের কাহিনীতে, ছড়ায়, শিল্পভাস্কর্যে, বিশ্বাসে, চিন্তায় ও কল্পনায় যে সূক্ষ্ম অন্তর্লীন ঐক্য বিরাজমান, তাহার মহত্ত্ব স্বীকার করিলেও তাহা যে জাতীয় ঐক্যের দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণে পর্যাপ্ত নয়, বহু আঘাতে অপমানে তাহা আমাদের বুঝিতে হইয়াছে। স্বাধীনতার আন্দোলন করিতে গিয়া দেখিয়াছি, বর্ণবিভেদে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের ব্যবধানে, হিন্দু-মুসলমানের তিক্ত সম্পর্কে, সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক স্বার্থচেতনায় আমাদের জাতীয় ঐক্যবোধ কুণ্ঠিত। রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিজ দেহকে খণ্ডিত করিয়া পাকিস্তান সৃষ্টিতে ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্যবোধের শিথিলতার চরম মূল্য দিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর অনৈক্যের সকল বিষ হইতে মুক্ত হইয়া ঐক্যের সঞ্জীবনী ধারায় জাতীয় জীবন বিকাশের শক্তি সঞ্চয় করিবে, আমরা সেই আশাই করিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের সেই স্বপ্ন এখনও সফল হয় নাই। স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই গান্ধীজীকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নিতে আত্মাহুতি দিতে হয়। তাহার পরও ভারতবর্ষে কয়েকবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে প্রাদেশিকতার সমস্যাই সর্বাপেক্ষা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির দূরদর্শিতার অভাবই সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভাষাগত ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস দিয়াছিল। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যথাযোগ্য দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সহিত সেই কর্মসূচীকে রূপায়িত করা হয় নাই। ভাষা-সংক্রান্ত প্রতিটি বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে ভাষাগত ভিত্তিতে প্রদেশগঠনের দাবি সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন, পরে যখন সেই দাবির আন্দোলন চতুর্দিকে সর্বনাশের আগুন ছড়ায়, তখন তাঁহারা তাহাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এইভাবেই অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হইয়াছে এবং ভয়াবহ, রক্তাক্ত দাঙ্গার পর গুজরাট ও মহারাষ্ট্র প্রদেশ গঠিত হইয়াছে। আন্দোলন এবং অনেক অপচয় ও ক্ষতির পরই নাগাদের স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইয়াছে। আকালীদের স্বতন্ত্র পাঞ্জাবী সুবা গঠনের আন্দোলনে সমগ্র পাঞ্জাব বিক্ষুব্ধ-চঞ্চল হইয়াছে। কিছুকাল আগে আসামে বাঙালীদের উপর যে নারকীয় অত্যাচার হইয়া গেল তাহা সমগ্র দেশের পক্ষেই ক্ষতি ও অবমাননাকর। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই প্রাদেশিকতায় ইন্ধন যোগাইয়া নিজেদের স্বার্থ সাধনে রত।

কিছুকাল আগে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সরকার জাতীয় ঐক্যবিধানে কতকগুলি কর্মসূচীও গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল আন্দোলনে জাতীয় ঐক্য দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। পাকিস্তানের সহিত তিক্ত সম্পর্ক, চীনদেশের সহিত সীমান্ত বিরোধ, পূর্ব সীমান্তে মিজো ও নাগাবিদ্রোহের পটভূমিকায় জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে জীবনের সর্বস্তরে জনসাধারণকে যেমন সচেতন হইতে হইবে, তেমনি ভারত সরকারকেও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া প্রাদেশিক সরকারগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং ন্যায়সঙ্গত ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে স্বীকার করিয়া জাতীয় ঐক্যের দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণে উদ্যোগী হইতে হইবে। জাতীয় ঐক্যের উপর জাতীয় অস্তিত্ব নির্ভরশীল, সুতরাং এই ক্ষেত্রে কোনও প্রকার বিচ্যুতিকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। অতীতের দুর্ভাগ্য ও লাঞ্ছনার ইতিহাস যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। বিভেদের মধ্যেই ঐক্যের সন্ধান করিতে হইবে। খণ্ডকে বাদ দিয়া সম্পূর্ণতার কথা বিশৃঙ্খলাকেই ডাকিয়া আনিবে। মনে রাখিতে হইবে ভারতবর্ষ একটি ফেডারাল ইউনিয়ন। ফুলের মালার মত। বিভিন্ন ফুলের সমন্বয়েই পূর্ণ মালার সৌন্দর্য।

দেশাত্মবোধক সাহিত্য

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই মন্ত্রেই বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের প্রথম সুর ধ্বনিত হইয়াছে। তারপর কত রাজার বদল হইয়াছে কত রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটিয়াছে কিন্তু সে সুর আজও অবিরাম আমাদের প্রাণের মধ্যে বাজিতেছে। যে সুর একদিন একতারার একটি মাত্র তারে বাজিয়াছিল আজ তাহা বিচিত্র ঐকতানে বাজিয়া উঠিয়াছে।

এমন যে হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! সাহিত্য তো মানবজীবন বিচ্ছিন্ন কোন শিল্প নহে। ইহাতে আকাশ-গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত হয় না। সমকাল এবং সমকালীন জীবনের প্রবাহ সাহিত্যিকের জীবনকে স্পন্দিত করে এবং সেই স্পন্দন সাহিত্যে সঞ্চারিত হয়। বিপুল এই পৃথিবী, কালও নিরবধি,

নাই দেশে দেশে কত কবি আবির্ভূত হইয়াছেন তাহার সীমা সংখ্যা নাই। কিন্তু যিনি যাহাই রচনা করিবেন তাহা দেশ কালকে অস্বীকার করিবে না—অন্ততঃ সাহিত্যের ধর্ম এইরূপ নহে। দেশ এবং কালের পরিধি সাহিত্যকে যেন ক্রমে আটকাইয়া রাখে।

বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের সুর প্রথমে শোনা গিয়াছে আমাদের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ পর্ব হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ইংরেজের রাজশক্তি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। এমন সময় এক বাঙালি কবি গাহিয়া উঠিলেন—

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বল পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়।' তবুও রঙ্গলালের এই সঙ্গীত তাঁহার সমকালে জাতীয় চেতনাকে তেমন করিয়া প্রবুদ্ধ করিতে পারে নাই, যেমন করিয়াছিল আরও কয়েক দশক পরে। রঙ্গলালের সহিত নাম করিতে হয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের। তিনি 'বিদেশের ঠাকুর' ফেলিয়া দেশের কুকুর' ধরিতে চাহিয়াছেন। ঈশ্বরগুপ্তও তাঁহার স্ববিরোধী চিন্তাধারার জন্য প্রথম জাতীয় কবি আখ্যা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে এমন একটি জিনিস ছিল যাহা মানুষকে নিজের দিকে ফিরিয়া তাকাইতে শিখাইয়াছে, ভাবাইয়াছে, গঠন কার্যে উৎসাহ দান করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীই বাংলা দেশাত্মবোধক সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের যুগ। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠার সময় হইতে এই নব জাগরণের চেতনা একটি নূতন বেগ ও গতি লাভ করে। 'মিলে সব ভারত সন্তান' গানটি এই মেলাতেই প্রথম গাওয়া হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয় ভাবাত্মক রোমান্টিক নাটক 'পুরুবিক্রম' 'শরৎ সরোজিনী,' 'অশ্রুমতী' লিখিলেন। ঠাকুরবাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া নূতন ভাবের স্রোত বাঙালির প্রাণ মন অধিকার করিয়া বসিল। কিন্তু মাতৃবন্দনার বীজমন্ত্রটি তখনও পর্যন্ত কেহ উদ্ভাবন করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ এই বীজমন্ত্রের ধারক। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র আজও আমাদের জাতীয় মন্ত্র, সন্তান সম্প্রদায়ের আত্মবিসর্জনের আদর্শ আমাদের প্রেরণা।

নাট্য সাহিত্যের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলালের। গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজী', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীর কাশিম' ইত্যাদি নাটক এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন', 'দুর্গাদাস' ইত্যাদি জাতীয় ভাবাত্মক দেশাত্মবোধক নাটকগুলি রচিত হইয়াছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ মুহূর্তে।

গান বাঁধিলেন অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ—"বাংলার মাটি, বাংলার জল"।—বাউল চারণ গান ধরিল—"আমরা মিলেছি মায়ের ডাকে।"

উপন্যাস সাহিত্যে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বরূপটি স্পষ্ট করিলেন এবং পথ নির্দেশ করিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ঘরে বাইরে' ও 'গোরা' উপন্যাসে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদী কর্মধারার এক চমৎকার আলেখ্য উপাস্থিত করিলেন। ইহার কিছু পূর্বেই শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' রচিত হইল। সুদূর বর্মা দেশে রচিত হইল স্বাধীনতা ভিত্তির পাদপীঠ। রোমান্টিক সন্ত্রাসবাদ, প্রচুর ইংরেজ বিদ্বেষ, কঠোর তীক্ষ্ণ নিয়মানুবর্তিতা "পথের দাবী"তে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই উপন্যাসে অসংলগ্নতা প্রচুর, রোমান্টিক উচ্ছ্বাস বেশি কিন্তু বাঙালি চিত্তে ইহার প্রভাব যথেষ্ট। তাই ইংরেজ সরকারকে এই বইটিকে বাজেয়াপ্ত করিতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের পরেই বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান প্রেরণায় একসময় দ্বিজেন্দ্রলালের "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা" ইত্যাদি জাতীয়তামূলক সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গত নজরুলের নাম উল্লেখযোগ্য। অতি সাম্প্রতিককালে মনোজ বসুর 'ভুলি নাই' ৪২-এর আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত দেশাত্মবোধক উপন্যাস। সাম্প্রতিক চৈনিক আক্রমণে মুহূর্তে দেশবাসীকে কর্তব্য সচেতন করিবার জন্য মন্মথ রায়ের 'সীমান্তের ডাক' নাটকটি উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য দেশেও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের অভাব নাই। আইরিশ সাহিত্য তো এই দিক দিয়া বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। আইরিশ নাটক আজও বহু দেশের জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণাস্থল। আমেরিকান সাহিত্যে ওয়াল্ট হুইটম্যান, হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান কবি ইকবালকে তাঁহার জাতীয় সঙ্গীত রচনার জন্য জাতীয় কবি আখ্যা দান করিয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যে বায়রণ তাঁহার দেশপ্রেমমূলক কবিতার জন্য প্রসিদ্ধ। স্কচ চারণ গীত স্কটল্যাণ্ডের জনসাধারণের মনে দেশাত্মবোধকে উদ্দীপিত করে।

যাঁহারা সাহিত্যের মধ্যে কোন তত্ত্ব বা মত প্রচার পছন্দ করেন না তাঁহারাও অনেক সময়ই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই দেশপ্রেমের কবিতা, গান রচনা করেন কারণ দেশের মাটির টান প্রত্যেক মানুষের রক্তের সহিত মিশিয়া আছে

ইহাকে অতিক্রম করিতে পারা শক্ত। একজন বক্তা যেখানে যুক্তির পর যুক্তি দিয়া আবেগপূর্ণ বাষ্পগদগদ ভাষায় দেশকে ভালবাসিবার কথা জানায়, শ্রোতার মনে সবসময় তাহা বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি নাও করিতে পারে। কিন্তু একটি দেশাত্মবোধক উপন্যাস, একটি দেশপ্রেমের সঙ্গীত, একটি নাটকাভিনয়ের দৃশ্য অনেক নির্জীব প্রাণকেও আত্মাহুতিদানে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। কারণ সাহিত্য আমাদের হৃদয়ের মাঝে লেখকের ভাবকেই জাগাইয়া তোলে, সাহিত্যিক আমাদের অজ্ঞাতেই মনকে স্বমতে আকর্ষণ করেন। বর্তমান কালে আমরা আগেকার মত দেশপ্রেমের অগ্নিবাণীতে উদ্বুদ্ধ কোন সাহিত্যিকের আবির্ভাব লক্ষ্য করিতেছি না। কিন্তু ইহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। জাতির দেশাত্মবোধক সাহিত্য তাহার হৃদয়ের বেদনা হইতেই জাগে। বিরাট বেদনা, স্বদেশের মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতিই গভীর দেশপ্রেমের সাহিত্য রচনার প্রেরণা। সে দুঃখ আমরা যেদিন তেমন করিয়া অনুভব করিতে পারিব, দেশের সমস্ত মানুষের সহিত নিজেকে মিলাইয়া দিতে পারব, নূতন করিয়া দেশাত্মবোধক সাহিত্য রচিত হইবে তখনই।

ভুদান ও গ্রামদান আন্দোলন

আর্থিক বৈষম্যভিত্তিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজ সকল অশান্তি ও দুর্গতির মূল কারণ। এক শ্রেণী চিরকাল সমাজের সুখসম্পদ ভোগের অধিকার পাইবে, আর এক শ্রেণী মানবিক অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখযন্ত্রণার বোঝা বহন করিয়া চলিবে—এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুগে নানা ধরনের বিদ্রোহ হইয়াছে। বিশ্বের মনীষীরা বৈষম্য লোপের বিভিন্ন পন্থার চিন্তা-ভাবনায় ব্যাকুল হইয়াছেন কিন্তু সমাধানের প্রকৃত পথ মেলে নাই। রক্তাক্ত বিপ্লবে সামাজিক বৈষম্য অবসানের যে সকল চেষ্টা হইয়াছে, সর্বাংশে তাহা কল্যাণপ্রদ হয় নাই। বিপ্লবের রক্তপাতে, অবিশ্বাস, সন্দেহ ও ঘৃণার তিক্ত অসুস্থ পরিবেশে সাম্যের মঙ্গলাদর্শটি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া এক বিশেষ গোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ উৎপীড়ন ও ক্ষমতালাভের পথ প্রশস্ত হয়। সন্দেহ মিশ্রিত জিঘাংসায় উহা অকারণে আরও প্রাণ বলিদানের আয়োজন করে। গান্ধীজী এইরূপ শ্রেণীসংঘর্ষে বৈষম্য অবলোপের

পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন না। উহা যে ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রাণধর্মের বিরোধী তাহা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আত্মচেতনার শুদ্ধিতে, কল্যাণের ধ্রুব আদর্শের প্রেরণায় ধীরে ধীরে সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হইয়া সমাজের মঙ্গলের জন্য একত্রিত হইয়া শতদল পদ্মের ঐক্যের সৌন্দর্যে সামাজিক প্রতিটি মানুষ বিকশিত হইবে, গান্ধীজী সেই সর্বোদয়ের, পূর্ণ মনুষ্যত্বের সমাজগঠনের ব্রতই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত সর্বোদয় সেবাসংঘের দেশের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের উদ্যোগে গান্ধীজীর আর্থিক বৈষম্য ও শোষণমুক্ত, সুস্থ, শুচি সমাজগঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই সর্বোদয় পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল ভূদান ও গ্রামদান আন্দোলন। গান্ধীজীর শিষ্য এবং তাঁহার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রথম সৈনিক আচার্য বিনোবা ভাবে এই আন্দোলনের পুরোহিত। ভারতবর্ষের গ্রামীণ জীবনের সংস্কার সাধনই ইহার লক্ষ্য। ভারতের গ্রামগুলিই উহার হৃৎপিণ্ডস্বরূপ। এদেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এখনও কৃষিভিত্তিক এবং ইহার সভ্যতা গ্রামীণ। অথচ অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে ভারতের অধিকাংশ কৃষিজীবীই ভূমিহীন, বুকের রক্ত-জল-করা পরিশ্রমে ফসল ফলাইয়া তাহারা চিরবঞ্চিত ও উপবাসী থাকে। ভারতীয় কৃষির অনগ্রসরতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল তাহার ভূমির অধিকারবঞ্চিত কৃষকদের দুঃস্থতা। সেই জন্যই ভূমি-সংস্কার ভারতীয় কৃষির তথা সমগ্র দেশের উন্নতির জন্য অপরিহার্য। ভূমিসংস্কারের আইন প্রচলিত করা হইয়াছে সত্য কিন্তু আইনগত বিধি নৈতিক সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহা হইতে সত্যকারের সুফল পাওয়া যায় না। ভূদান আন্দোলনের লক্ষ্যই হইল মানুষের নৈতিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিয়া ভূমি-সংস্কার প্রবর্তন।

সকলের শুভেচ্ছা ও অহিংস বিপ্লবের মধ্য দিয়া ভূমিহীনকে ভূদানের উদ্দেশ্যে আচার্য বিনোবা ভাবে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভূদান আন্দোলন আরম্ভ করেন। জমির মালিকদের নৈতিক দায়িত্বচেতনা উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ভূমিহীন কৃষকদের জন্য জমিসংগ্রহের উদ্দেশ্যে আচার্যের নেতৃত্বে এই আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে। ৫ কোটি একর জমিসংগ্রহ আচার্য ভাবের লক্ষ্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রামগুলি পরিক্রমা করিয়া তিনি এবং তাঁহার

অনুবর্তীরা এই আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছেন। সরকারী মহলও এই আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া উহাকে সর্ববিধ সহায়তা দান করিতেছেন। এই আন্দোলনে পরিকল্পনাসংক্রান্ত ভূমি-সংস্কার কার্যাবলীতে নিঃসন্দেহে শক্তি সঞ্চারিত হইবে। চার-পাঁচ বৎসর পূর্বেকার হিসাবে দেখা যায়, ভাবেজী প্রায় ৪৪ লক্ষ একর জমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ ৮৩ একর জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টিত হইবে।

আচার্য ভাবে যখন গ্রামদান আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন অনেকেই ভাবিয়াছিলেন গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি ত্বরান্বিত হইবে। গ্রামবাসীরা সকলে মিলিয়া সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে যদি তাহাদের গ্রামগুলিকে দান করিতে পারে, তবে যৌথ প্রচেষ্টায় উহাদের উন্নতি ঘটিবে। গ্রামদান আন্দোলন ভূদান আন্দোলনেরই পরিণত রূপ হইবে।

কিন্তু বাস্তব ফলাফলের সাহায্যে আচার্য বিনোবা ভাবের আন্দোলনের পরিমাপ করিলে দেখা যাইবে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সম্ভব হয় নাই। সর্বোদয় আন্দোলনকারীরা নাটকীয় চমকপ্রদ ফলের আশা করিয়াছিলেন। আচার্যের আন্দোলন অনেক স্থলেই বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিল। এই কর্ম-প্রচেষ্টাই অনেকের আগ্রহ দেখা দিয়াছিল এবং মোটামুটিভাবে ভূমিসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নৈতিক সচেতনতার অনেক কথাও শোনা গিয়াছিল, কিন্তু এই সম্বন্ধে হঠাৎ যেমন সোচ্চার প্রচারণা দেখা দিয়াছিল তেমনি হঠাৎ আবার সব নীরব হইয়া গেল। ভূমিহীন কৃষকদের সমস্যা মেটে নাই। ভারতবর্ষের কৃষি-সমস্যার সমাধান হয় নাই। ১৯৪৮ সালে সারা ভারতে যে কৃষক আন্দোলনের জোয়ার আসিয়াছিল ইহার ফলে তাহাতে ভাটা পড়িয়াছিল মাত্র। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ সমাধান কখনও হয় নাই। ভারতেও হইল না।

সমাজ সেবার আদর্শ

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩]

সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করা মানবজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ নির্মম প্রকৃতি, হিংস্র পশু ও অজানা ভয়ের সম্মুখীন হইয়া সমাজবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছে। নিতান্ত জৈবিক প্রয়োজনেই মানুষ

সেইদিন পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যাযাবর জীবনের শেষে স্থায়ী সমাজ গঠন করিয়াছে। আর সহযোগিতার এই প্রাথমিক স্তরের উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে পরবর্তীকালের মানব সভ্যতার ইমারত। মানুষের সমাজ-বোধ একটি পারস্পরিক কর্তব্যবোধ ছাড়া আর কিছুই নহে। সমাজবিবর্তনের ধাপে ধাপে এই কর্তব্য অকর্তব্য নূতন করিয়া নির্ণীত হইল। যুগের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মানব-জীবনের মহান আদর্শগুলির জন্ম হইল। কিন্তু সভ্যতার সেই প্রথম প্রত্যুষকাল হইতেই মানুষ এই কথাটি স্পষ্ট অনুভব করিল যে, দুর্লভ তাহাদের মানবজন্ম, দুর্লভ তাহাদের প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক।

মানুষের ঈশ্বর যেদিন হইতে মানুষের চেতনায় ধরা দিল সেই দিন হইতেই মানুষ নিজেকে সেই শক্তির অংশ বলিয়া জানিয়াছে। সমগ্র মানবসমাজকে এক এবং অবিভাজ্য বলিয়া মনে করিয়াছে। মানুষ উপলব্ধি করিয়াছে, সে অমৃতের পুত্র, Son of the God। তাই বহুযুগ হইতেই ঋষি, কবি, ধর্মবেত্তা, একই কথা বলিয়া আসিতেছেন, 'শিব জ্ঞানে জীবসেবা কর,' 'মানুষকে ভালবাস,' 'তোমার প্রতিবেশীকে তোমার হৃদয়ের অংশ দাও'। ঈশা, মূশা, শ্রীচৈতন্য সেই একই মানব প্রেমের বাণী যুগ-যুগান্তরে দেশ-দেশান্তরে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের দুঃখ তবুও ঘুচিল না। ধর্মবৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্য, জাতিবৈষম্য মানুষকে এক হইতে দেয় নাই, সম্পূর্ণ হইতে দেয় নাই। মানবসমাজের এই বহুবিচ্ছিন্ন রূপ মনীষীদের মনে বেদনা জাগাইয়াছে। কেহ চাহিয়াছেন প্রেমের পথে এই বৈষম্য দূর করিতে, কেহ চাহিয়াছেন সমাজের গঠনকে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন সমাজ পত্তন করিতে, আর কেহ এই ভাঙচুরের মধ্যে না গিয়া সংস্কারের মধ্যে দিয়াই সমাজকে সুন্দর করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

কি উপায়ে সমাজের সমস্ত মানুষের মঙ্গল বিধান সম্ভব এ কথা শুধু আধুনিক মানুষই চিন্তা করে নাই, প্লেটো হইতে রুশো, মার্কস হইতে ল্যাস্কি, গৌতমবুদ্ধ হইতে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত অনেকেই এবিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্লেটো চাহিয়াছিলেন একটি আদর্শ রাষ্ট্র, রুশো চাহিয়াছিলেন বন্টনব্যবস্থার সাম্য এবং সামাজিক মানুষের মধ্যে একটি সহযোগিতার চুক্তি, মার্কস দেখিয়াছেন এতদিনকার সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থায় কোন-না কোন উপায়ে

মুষ্টিমেয় মানুষ অধিকাংশ মানুষকে শোষণ করিতেছে। তিনি চাহিলেন অর্থ-নৈতিক-রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন। গান্ধীজী বলিলেন সত্যমেব জয়তে, সততাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

আমাদের কিন্তু মনে হয় এই সমস্ত মত একটিমাত্র পথেরই নির্দেশ দিতেছে, সে মানব-কল্যাণের—মানব-প্রেমের পথ।

'Survival of the fittest' আজিকার পৃথিবীর জীবন-মন্ত্র। যোগ্যতমের উদ্বর্তনের এই তত্ত্ব মানুষকে অপর মানুষকে পিছনে ফেলিয়া যাইতে বলে। তুমি যোগ্যতম—তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া অর্থোপার্জন করিতে পারিতেছে, সংগ্রামের মধ্য দিয়া জয়ের পথ প্রস্তুত করিতেছে, অতএব বাঁচিবার অধিকার একমাত্র তোমারই আছে—ইহা জানা যোগ্যতমের পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক বটে, কিন্তু কোটি কোটি মানুষ, যাহারা সংগ্রাম করিয়াও জিতিতে পারিল না, তাহাদের পক্ষে এ কথা কোন আশার বিদ্যুৎগর্ভ বাণী উচ্চারণ করে না, পরাজয়ের গ্লানিকে আর একটু গভীর করিয়া লেপিয়া দেয়।

সেইজন্য সমাজকল্যাণের আদর্শ বিশেষ বিবেচনা সহকারেই গ্রহণ করিতে হইবে। আগেকার দিনে সুশাসক রাজা, প্রজাপালক জমিদার প্রভৃতির জনহিতকর কার্যাবলীর কথা শুনা যাইত বটে, কিন্তু সেই দূর অতীতেও প্রতিটি মানুষ সেবাধর্মের সহিত জীবনধর্মকে একত্র করিয়া দেখিত বলিয়া সাংগঠনিক কর্ম প্রচেষ্টার প্রয়োজন তেমন অনুভূত হইত না। 'দরিদ্রদেবো ভব', 'অতিথিদেবো ভব' এ মন্ত্র সকলেই মানিতেন। কিন্তু আধুনিক কালে গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে রাজা জমিদারদের উক্ত ভূমিকা অনুপস্থিত। অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের ভূমিকা প্রজাপালন নহে, প্রজাপীড়ন। সাধারণ মানুষও স্বার্থপরতাকেই একমাত্র সাধ্যবস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কেহ-বা পরিবার পরিজনের সুখ সুবিধার জন্যই সচেষ্ট থাকে, অপর কাহারও দিকে ফিরিয়া তাকাইবার অবসর কাহারো জুটে না। এ অবস্থায় রাষ্ট্রকেই জনকল্যাণ বা সমাজকল্যাণমূলক আদর্শ গ্রহণ করিতে হয়। রাষ্ট্র দেশের সমস্ত মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য দায়ী। আধুনিককালে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ও সমাজবিদ্ হারল্ড ল্যাস্কি তাঁহার পরিকল্পিত Welfare State-এ রাষ্ট্রের এই সর্বাত্মক জনকল্যাণমূলক আদর্শ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই মূলতঃ সমাজসেবার আদর্শ

গ্রহণ করিবে। ভারতের সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই রচিত হইয়াছে।

কিন্তু জনসেবার ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং ছোটখাটো সংগঠনের ভূমিকাও কম নহে। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগ হইতে আজ পর্যন্ত দেশের নানা বিপদ-আপদে আমরা যুবক সম্প্রদায়কে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেখিতেছি। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ, দাঙ্গায় আর্তমানবের সেবায় রাষ্ট্রশক্তির পাশাপাশি এই সমস্ত জনসেবামূলক সংগঠনগুলির দানও কম নহে। আধুনিক কালে রেডক্রস সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি বিশ্ববিস্তৃত জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু ইসলাম, খ্রীষ্টান প্রত্যেক ধর্মেই জনসেবাকে মানবজীবনের একটি সুমহান আদর্শরূপে ঘোষণা করা হইয়াছে। চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ ইহাকেই ঈশ্বর সান্নিধ্যের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন সংসারে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।" প্রত্যেক মানুষকেই অপরের দিকে চাহিয়া নিজের কিছু সুখ হয়ত ছাড়িতে হইবে, কিন্তু ইহাতে সামাজিক কল্যাণ ভিন্ন কাহারও ব্যক্তিগত ক্ষতি হওয়া সম্ভব নয়। প্রাচীন গৃহিণীগণ সংসারে একটি মুষ্টিভিক্ষার সঞ্চয়পাত্র রাখিতেন। প্রতিদিন রন্ধনের চাউল লইবার সময় এক মুঠা চাউল ইহাতে রাখিয়া দিতেন। এই সঞ্চয়ের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, দরিদ্র-ক্ষুধার্তের জন্যই উহা সঞ্চিত হইত। জনসেবার আদর্শকে এইভাবে হৃদয় হইতে উদ্‌বুদ্ধ করিতে হইবে, ধর্মের সহিত তাহাকে মিলাইয়া দিতে হইবে।

গণতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র

আধুনিক যুগে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া যে প্রবল বিতর্ক চলিয়াছে তাহা অন্য কোনও বিষয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংঘর্ষের ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছে একথা বলিলে বোধহয় বিশেষ অত্যুক্তি করা হয় না। পৃথিবী বর্তমানে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই দুইটি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত। তাহাদের পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিষবাষ্পে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত। সাধারণ

মানুষ আতঙ্কবিস্ফারিত চক্ষে এবং উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে দুইটি পক্ষের বাদবিসংবাদ এবং অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করিতেছে। মানবসভ্যতার এই অনিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে মনীষীরা চিন্তান্বিত।

গণতন্ত্র মানবসভ্যতার অগ্রগতির একটি বিশিষ্ট পর্যায়। মধ্যযুগে সর্ববিধ ক্ষমতা পুরোহিত সম্প্রদায় ও অভিজাততন্ত্রের করতলগত ছিল। বংশানুক্রমিক শ্রেণীবিন্যাসে সমাজের গঠন ছিল কঠোরভাবে নির্দিষ্ট। বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও কর্মপ্রচেষ্টায় যে সকল মানুষ বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়াছে, তাহারা সমাজতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া দেশের ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তির অংশ পাইতে চাহিল। সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতে লাগিল। মানুষকে অনেক দুঃখবরণে, রক্ত-অশ্রুতে আঘাতের কণ্টকময় ক্ষুধার্ত দুর্গম পথে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি অর্জন করিতে হইয়াছে। নির্বাচন প্রচার মাধ্যমে দেশশাসনব্যবস্থা প্রচলিত হইলেও সমাজের কয়েকটি শ্রেণী দীর্ঘকাল নির্বাচনের অধিকার লাভ করে নাই। ইংলণ্ডের মত উন্নত দেশের নারীদেরও ভোট দিবার অধিকার পাইবার জন্য বহুদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছে।

গণতন্ত্র মানবসভ্যতাকে বহুদিক হইতে সমৃদ্ধ করিয়াছে সন্দেহ নাই। জাতি-ধর্ম স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীন চিন্তা-বিশ্বাস পোষণের এবং নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী জীবন বিকাশের অধিকার আছে—এই গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ঐতিহ্য মানবসভ্যতার মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কতটুকু অধিকার ভোগ করে তাহা বিবেচ্য বিষয়। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও অর্থনৈতিক বৈষম্য রহিয়া গিয়াছে। এই সকল দেশে মুষ্টিমেয় শ্রেণীর হাতে বিপুল পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হয়, উহার ফলে তাহারাই সমাজের সুযোগসুবিধা সুখস্বাচ্ছন্দ্য বেশী পরিমাণে ভোগ করিয়া থাকে। অনাহারে, বেকারীতে, ব্যাধিতে, চিকিৎসার অভাবে, জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় আর্থিক বৈষম্যের অভিশাপের বোঝা নিম্নবিত্ত শ্রেণীকে বহন করিতে হয়। ইহাতে গণতন্ত্রের মূল্যবোধ অনেক পরিমাণেই অস্বীকৃত হয়।

কার্ল মার্কস সেইজন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থার পরিবর্তে আর্থিক বৈষম্যহীন

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দর্শন প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়া কার্ল মার্কস-এর সমাজ দর্শন গ্রহণ করিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তারা বলেন যে, গণতন্ত্রের অধিকারগুলি তাত্ত্বিক মাত্র, বাস্তবক্ষেত্রে যাহাদের হাতে অর্থ আছে তাহারাই গণতান্ত্রিক সমাজের সকল সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। আর্থিক বৈষম্য জীবনের পূর্ণতা বিকাশের প্রতিকূল, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাশিয়ার আর্থিক অসাম্য দূর করিয়া প্রতিটি মানুষের শিক্ষা, চাকুরিলাভ, চিকিৎসা ইত্যাদির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই দেশের নেতৃবৃন্দ দাবি করেন যে, অদূর ভবিষ্যতেই এখানে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু রাশিয়ার সমাজতন্ত্র ত্রুটিহীন নয়, একদলীয় শাসনে এবং মতবাদের যান্ত্রিকতায় ব্যক্তি-মানুষের চিন্তা-ভাবনা এবং শিল্পসৃষ্টিকে সেখানে অনেকটা পরিমাণে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখা হইয়াছে। গণতন্ত্রের আর্থিক বৈষম্যের মত চিন্তার স্বাধীনতার এই খর্বতাও মানবজীবনের পূর্ণ-বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর।

সেই কারণেই আধুনিক যুগের অনেক মনীষী পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর গণতন্ত্র অথবা রাশিয়ার সমাজতন্ত্র এই দুইটির মধ্যে যে কোনও একটিকে গ্রহণ করিতে মানুষ বাধ্য, এই অভিমত স্বীকার করেন না। তাঁহারা একটি বিকল্প মধ্যপন্থা উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। তাঁহারা একদিকে যেমন গণতন্ত্রের মৌল স্বাধীনতায় প্রত্যয়ের অপরদিকে তেমনি সমাজতন্ত্রের আর্থিক সাম্যের মূল স্বীকার করেন। গণতন্ত্রের স্বাধীনতায় যদি সমাজতন্ত্রের সাম্য না থাকে তবে তাহা যেমন মূল্যহীন হইয়া পড়ে, তেমনি সমাজতন্ত্রের সাম্য গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা-বর্জিত হইলে মানুষের হৃদয় পীড়িত হয়। সুতরাং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সামঞ্জস্যবিধানের উপরই মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ঐতিহ্যের মত সমাজতন্ত্রের সমানাধিকারের মানবিকতাকেও অগ্রাহ্য করিবার কোনও উপায় নাই। গান্ধীজীর সমাজদর্শনে এই দুই সমাজ ব্যবস্থার সমন্বয়বিধানের পথনির্দেশই লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষও গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সামঞ্জস্য-বিধানের দুরূহ পরীক্ষায় রত, সেই কারণেই তাহার দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ। বিবদমান কোনও শিবিরে যোগ না দিয়া এই দেশ যেভাবে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে, তাহা সকলেরই নিকট মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

ছাত্র-বিশৃঙ্খলা ও তাহার সমাধানের উপায়

সারা ভারতবর্ষব্যাপী গত কয়েক বৎসর যাবৎ ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে এই বিশৃঙ্খলার সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। এই বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য সরকার দমননীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। ছাত্রদের উপর লাঠি চলিয়াছে, গুলি চলিয়াছে। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যাই সরকারের নিকট প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য লাঠি, গুলি, জেল দিয়াও ছাত্রদের দমন করা সম্ভব না হওয়ায় দিল্লীতে পুলিশের ইন্‌সপেক্টর জেনারেলদের সব প্রদেশ হইতে ডাকিয়া আনিয়া সম্মেলন করা হইয়াছিল। তাঁহারা ছাত্রদের মধ্যে পুলিশ কর্তৃপক্ষের বক্তৃতা মাঝে মাঝে দিতে চাহিয়াছিলেন।

ছাত্রদের এই বিশৃঙ্খলার জন্য দেশের সকলেই চিন্তিত। নানা শিক্ষাবিদ্, রাজনীতিক, সমাজবিদ্ এই বিষয়ে তাঁহাদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতামতের মধ্যে কেহ কেহ ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতির প্রসারকে দায়ী করিয়াছেন। কেহ ইহার জন্য পিতামাতা ও শিক্ষকদেরই দায়ী করিয়াছেন। আবার কেহ-বা ইহার পিছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলিয়াছেন, ছাত্রদের রাস্তায় নামিয়া আন্দোলন করা উচিত নয়। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি যেন ছাত্রদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার না করেন। অবশ্য এই রাজনৈতিক দল বলিতে তিনি বিরোধী দলগুলির কথাই বলিয়াছেন।

এইসব মতামতগুলি সবই আংশিক সত্য। কারণ তাঁহারা ছাত্রজীবনের অভাব অভিযোগের গভীরে প্রবেশ করিয়া বিচার বিবেচনা করেন নাই। করিলে হয়ত ইহার একটা সদুত্তর তাঁহারা দিতে পারিতেন।

বস্তুত বিগত কয় বৎসরে আমাদের দেশে নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে—খাদ্যসমস্যা, বেকারসমস্যা, শ্রমিকসমস্যা, কৃষকসমস্যা, মধ্যবিত্ত কর্মচারীসমস্যা, শিক্ষাসমস্যা, শিক্ষকসমস্যা, ছাত্রসমস্যা, স্বাস্থ্যসমস্যা, গৃহসমস্যা। এই সমস্যাগুলি লইয়া অনেক পরিকল্পনা, অনেক কমিশন এবং অনেক কমিটি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু কোন সমস্যারই সমাধান হয় নাই। সমাধানের আন্তরিক চেষ্টাও হয় নাই। এই সব সমস্যা কেবল স্বাধীনতা-উত্তর যুগের নহে তাহারও পূর্বেকার ক্ষমতা হস্তান্তরের

সময় বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীকে এইগুলি উপহার দিয়া গিয়াছিল। এই সমস্যাগুলির জন্য দেশে বিরাট আন্দোলন দেখা দিয়াছে। নানা অর্থনৈতিক সমস্যা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। দেশের মানুষ তিক্ত অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করিয়াছে, বর্তমান সরকারের পক্ষে ইহার কোন সমাধানই সম্ভব নহে। ইহারা কেবল সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে, সমাধান করিতে পারে না। অতএব দেশের এই বহুবিধ সমস্যার প্রতিকারের জন্য সরকারেরও পরিবর্তন প্রয়োজন।

অন্য সমস্যার মত ছাত্রদের সমস্যাও এই সরকার সমাধান করিতে পারে নাই। তাহারা আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টি লইয়া তাহাদের উপর কেবল দমননীতি প্রয়োগ করিয়াছে। লাঠি এবং গুলি দিয়া সেই উত্তাল যৌবন-তরঙ্গকে বাধা দিতে পারে নাই। উত্তরোত্তর তাহা বাড়িয়া চলিয়াছে। সমস্যা সমাধানের জন্য গোড়ায় হাত না দিয়া উপর উপর চেষ্টা করিলে তাহা হইতে বাধ্য। তাহাদের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি লইয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করা হয় নাই। এই কারণেই কেবল ছাত্রদের সমস্যা নহে, নানা পর্যায়ের শিক্ষকদের সমস্যারও সরকার সমাধান করিতে পারেন নাই। ছাত্র আন্দোলন দেশজোড়া সংগ্রামী আন্দোলনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতএব বিচ্ছিন্নভাবে ইহাকে দেখিলে ভুল হইবে।

এই ভুল অনেক পণ্ডিতলোকেরাও করিয়া থাকেন। তাঁহারা সমাজের দিকে না তাকাইয়া ছাত্রদের কেবল নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। এমন কি বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদেরও সম্মান করে না, এমন কথাও প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু অভিযোগকারীরা মনে রাখিলেন না যে, শ্রদ্ধা শূন্যগর্ভ উপদেশ অথবা বলপ্রয়োগে পাওয়া যায় না। জননীকে ভালবাসিবার জন্য 'মাকে ভালবাস'— শিশুকে এই উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। 'মায়ের স্নেহের' স্বরূপ অনুভব করিয়াই শিশু মাকে ভালবাসে। বর্তমানে শিক্ষকেরা শিক্ষকের কাজ সঠিকভাবে করিতে পারেন না। পূর্বে তাঁহারা আদর্শনিষ্ঠ ছিলেন। এখন একমাত্র আদর্শ হইল কর্তৃপক্ষকে খুশী রাখার চেষ্টা। না হইলে তাঁহারা জীবনে কোন উন্নতি করিতে পারিবেন না। সঠিকভাবে পড়াইতে গেলে, সত্য কথা বলিলে, রাজনীতির দোষে দুষ্ট হইবেন।

আসলে যে সমাজে ছাত্ররা বাস করে সেখানকার অবস্থাও লক্ষ্য করিতে হইবে। এই সমাজেও আদর্শের কোন স্থান নাই। দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে; দলীয় রাজনীতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, দারিদ্র্য, বেকারী

চরিত্র নষ্ট করিয়া তুলিতেছে। অশ্লীল সাহিত্য, অশ্লীল সিনেমা, অশ্লীল বিজ্ঞাপন এবং নেতাদের অশ্লীল জীবন ইত্যাদির দ্বারা ছাত্রছাত্রীর চরিত্র নষ্ট হইতেছে। শিক্ষকরা তাঁহাদের বিবেকমত কাজ করিতে পারেন না। তাঁহাদেরও চাকুরী যাইবার ভয়। ছাত্রদের সঠিক পথে চালিত করিবে কে? তাহা ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মতামতের কোন মূল্য দেওয়া হয় না। প্রথম হইতেই একটি ধারণা থাকে যে ছাত্ররা শৃঙ্খলা মানে না, উদ্ধত, পড়াশুনায় ফাঁকি দেয়, রাজনীতি করে। অতএব তাহাদের বক্তব্য নায্য হইলেও ধর্তব্য নয়; ধরিলে তাহারা প্রশ্রয় পাইবে।

ছাত্রজীবনে আজ নানা সমস্যা। দারিদ্র্য তাহাদের নিত্যসঙ্গী। বই কিনিবার টাকা নাই। মাহিনা নিয়মিত দেওয়া সম্ভব নয়। কাগজ-কলম-কালির কথা আর যাতায়াতের খরচের কথা তারই সঙ্গে ধরিতে হইবে। খাদ্য, বস্ত্র, থাকিবার উপযুক্ত ঘর, ঔষধপত্র, জিনিসপত্রের দুর্মূল্য প্রভৃতি চারিদিক হইতে তাহাদের জীবনকে অহরহ পিষ্ট করিতেছে। খাদ্যের অভাবে ছাত্রদের নানা রোগ হইতেছে। ছাত্রদের অসুখ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয়াবহ রিপোর্ট আছে। অপুষ্টিই এই রোগের প্রধান কারণ। থাকিবার ঘর, পড়িবার জায়গার অসুবিধা সম্বন্ধেও কমিশনের রিপোর্ট আছে। মাহিনা দিতে না পারার জন্য বাধ্য হইয়া বহু অভিভাবক ছাত্রদের পড়া বন্ধ করিয়া দেন। এদিকে চাকুরীর পথও বন্ধ। পূর্বে পাশ করিলে একটি আশা থাকিত, এখন তাহাও নাই। স্কুলে কলেজে এক এক শ্রেণীতে ক্ষমতার অতিরিক্ত ছাত্র। শিক্ষার প্রহসন ছাড়া সেখানে আর কিছু সম্ভব নয়। বড় বড় স্কুল-কলেজ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিণত হইয়াছে। ভালবাসা এবং আদর্শ সেখানে একান্ত ভাবেই গৌণ।

অবশ্য এই বিশৃঙ্খলার জন্য ছাত্ররা মোটেই দায়ী নয় তাহা নয়। সমাজে সর্বত্র যেখানে নানা দুর্নীতি বাসা বাঁধিয়াছে ছাত্ররাও তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারে না। এমন অনেক কাজ তাহারা করে যাহা তাহাদের করা উচিত নয়। একটা ঔদ্ধত্য, একটি প্রতিবাদ যেন তাহাদের স্বভাবগত হইয়া পড়িয়াছে। আসলে সরকারী অবহেলা এবং অত্যাচার, স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষের অবহেলা এবং অত্যাচার, শিক্ষক সমাজের ছাত্র-আন্দোলনের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা, প্রভৃতি কারণে ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাত্যহিক জীবনে তাহারা দেখিতেছে

পরিবারের নিদারুণ দারিদ্র্য, অভাব, বেকারী, রোগ, আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য। এই অবস্থায় মন সুস্থ রাখা কাহারও পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব নয়। সেজন্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কঠিন হইলে তাহারা চেয়ার-টেবিল ভাঙে। আবার কেহ কোন ছাত্রের উপর হামলা করিলে ছাত্র-সমাজ ক্ষেপিয়া ট্রামে বাসে আগুন ধরায়। এইগুলি বিক্ষোভের প্রকাশ। কিন্তু তাহার কারণ কি তাহা আমাদের সমাজে খুব কম লোকই তলাইয়া দেখিতে চাহেন।

আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে, দেশ জোড়া যে বিক্ষোভের তরঙ্গ বহিতেছে ছাত্র বিক্ষোভ তাহারই অনিবার্য পরিণতি। দমননীতি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে কিছুতেই শান্ত করা যাইবে না, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত তাহা আরও জ্বলিয়া উঠিবে। অতএব ছাত্র-বিশৃঙ্খলা রোধ করিবার জন্যই প্রয়োজন সমাজে শৃঙ্খলা আনয়ন করা। এমন সুস্থ স্বাভাবিক সমাজের প্রয়োজন যেখানে ছাত্রদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়ই অন্ধকারময় থাকিবে না। এমন শাসক দরকার যাঁহারা সহানুভূতির সঙ্গে তাহাদের অভাব অভিযোগ শুনিবেন, তাহার প্রতিকারের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, প্রতিশোধের জন্য মরিয়া হইয়া উঠিবেন না। শিক্ষক সমাজও যেন সুস্থ এবং স্বাভাবিক ভাবে কাজ করিতে পারেন তাহার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ ছাত্র-বিশৃঙ্খলা শিক্ষা সমস্যারই একটি অঙ্গ। আবার শিক্ষককে বাদ দিয়া শিক্ষা সমস্যার সমাধান করা কখনও সম্ভব নয়। শিক্ষককেই ছাত্র-সমাজের নেতৃত্ব নিতে হইবে। তাহাদের সৎপথে চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সেই কাজ কখনই সম্ভব নয় যতদিন না সরকার শিক্ষক সমাজের অসন্তোষ দূরীকরণের দায়িত্ব লইবেন।

ভারতবর্ষে চতুর্থ নির্বাচনের পরে কোন কোন প্রদেশে রাষ্ট্র-ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। বাংলাদেশে যুক্তফ্রন্ট সরকার ছাত্র সমাজের দীর্ঘকালীন সমস্যার প্রতি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে দৃষ্টি দিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের বহুদিনের আন্দোলন শান্ত হইয়া গিয়াছিল। ছাত্ররাও নিজেদের মর্যাদা ফিরিয়া পাইয়াছিল। বর্তমান সরকারও এ সম্পর্কে সচেতন। সেজন্য বর্তমানে আর পূর্বের মত ছাত্র-বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না। বরং ছাত্ররাই প্রতি কাজে সরকারের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ইহা সম্ভব হইয়াছে একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের দ্বারা। ইহা ছাড়া ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা রক্ষার আর কোন উপায় নাই।

ছাত্রজীবনে সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিল্প, সাহিত্য, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি বিষয়ে একটি জাতি যতই উন্নত হউক না কেন, সমাজজীবনের সর্বস্তরে নিয়মানুবর্তিতা ব্যাপ্ত না থাকিলে সে জাতি কখনও আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা তাহাই দেখি। এই দেশ শৃঙ্খলার চর্চা করে নাই বলিয়াই বার বার বৈদেশিক আক্রমণের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। স্বভাবসিদ্ধ জড়তায়, আত্মসন্তুষ্টিতে আমরা কোনও দিন নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

স্বাধীনতা লাভের পর এই সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হইতে হইয়াছে। সমাজজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নানাবিধ শৈথিল্য ভারতবর্ষের জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যাহত বা খণ্ডিত করিতেছে। প্রত্যেকটি নাগরিকের যে সমাজের প্রতি কতকগুলি নির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে, সুশৃঙ্খলভাবে তাহা পালন করিতে হইবে, এই বোধ আজ পর্যন্ত আমাদের চেতনায় সঞ্চারিত হয় নাই। ট্রামে, বাসে, স্কুল-কলেজে, শোভাযাত্রায়, শবযাত্রায়, রাজনৈতিক সভা ও নানা অনুষ্ঠানে সর্বত্রই মনে হয়, একটা উচ্ছৃঙ্খল জনতা আসিয়া ভিড় করিয়াছে, যে যেমন খুশি, যদৃচ্ছভাবে চলাফেরা ও আচরণ করিতেছে, সুশৃঙ্খল সামাজিক আচরণ-বিধির আবশ্যতা সম্বন্ধে কাহারও কোন মাথাব্যথা নাই। এদেশে তুচ্ছতম কারণেই কুৎসিত বচসা ও তাহা হইতে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধে, উত্তেজনার তাণ্ডবে যানবাহন, দোকানপাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়, নিরীহ নাগরিকেরা বিপর্যস্ত হয়।

ছাত্রসমাজই এ উচ্ছৃঙ্খলতার সর্বপ্রধান বলি। পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত দেশে ছাত্রজীবনের শিক্ষায় ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের ভিত্তিকে নির্মাণ করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত সেই শিক্ষার কোনও বলিষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় নাই। এক একটি বিদ্যায়তনে দলে দলে ছাত্র আসিয়া ভিড় করে, নিয়মানুবর্তিতা চর্চার বিন্দুমাত্র আয়োজনও সেখানে থাকে না। ছাত্রেরা সহজেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শিকার হয় এবং বিপথগামী হয়। তারুণ্যের প্রাণপ্রাচুর্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিশ্চয়ই এক বস্তু নহে। আমাদের দেশের ছাত্রদের জীবন তারুণ্যের প্রাণশক্তিতে বিকশিত হইবার পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খলতায় অপচিত হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে চীন-ভারত সীমান্তে বিরোধের পটভূমিকায় শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা নূতনভাবে উপলব্ধি হইয়াছে। সেই জন্যই বহু পূর্বে ছাত্রদের

মধ্যে যে আংশিক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাকে বাধ্যতামূলক করিয়া সম্প্রসারিত করিবার কর্মসূচী কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের এবং যাহারা শারীরিক কারণে অক্ষম কেবলমাত্র তাহাদেরই ইহা হইতে বাদ দেওয়া হইবে। সরকার এন. সি. সি. ট্রেনিং এইভাবে সমগ্র দেশে ছড়াইয়া দিবার জন্য উদ্যোগী হইযাছেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা সর্বত্রই অভিনন্দিত হইয়াছে।

ছাত্রজীবনে সামরিক শিক্ষার গুরুত্ব সহজেই বুঝা যায়। কেবল নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যেই শত্রুর আক্রমণকে প্রতিরোধ করা যায় না, রণক্ষেত্রের পশ্চাতে কঠোর শৃঙ্খলায় প্রত্যেকটি অঞ্চলেই প্রতিরোধের কঠিন, দুর্ভেদ্য প্রাচীর করিযা তুলিতে হয়। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও মনোবল বজায় রাখিবার জন্য মোটামুটি সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় একটি বাহিনী প্রস্তুত করিয়া রাখা দরকার। ছাত্রদের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তনে সরকার সেইদিকেই দৃষ্টি দিয়াছেন।

কেবল বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের প্রয়োজনেই এই সামরিক শিক্ষার উপযোগিতা সীমাবদ্ধ নয়, ইহার প্রভাব সুদূর প্রসারী। সামরিক শিক্ষা ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বহনের জন্য ছাত্রদের উপযোগী করিয়া তুলিবে। দেহে এবং মনে ভবিষ্যৎ জীবন সংগ্রামের জন্য তাহাদের প্রস্তুত করিয়া তোলার পক্ষে সামরিক শিক্ষা একটি কার্যকরী পন্থা। এই শিক্ষায় ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা অনেকটা পরিমাণে নিবারিত হইবে আশা করা যায়। সামরিক শিক্ষার নিয়মানুবর্তিতার চর্চায় ছাত্ররা কর্মঠ, উদ্যোগী, সপ্রতিভ, দায়িত্বসচেতন হইবে এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে একসঙ্গে মিলিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা ও মনোভাব অর্জন করিবে।

বস্তুত সামরিক শিক্ষা ছাড়া ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতায় দীক্ষিত করিয়া তুলিবার মত কার্যকরী উপায় আর কিছু নাই। বিভিন্ন শিবিরে সামরিক শিক্ষা গ্রহণকালে তাহাদের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমগুলিতেও অংশ গ্রহণ করিতে হয়। তাহারা এইভাবে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিবার মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সুশৃঙ্খলভাবে একসঙ্গে থাকার ফলে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীও ভাবালুতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতার সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া উদার, যুক্তিপূর্ণ

হইবে। যে-কোনও অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লওয়ার ক্ষমতা সামরিক শিক্ষার আর একটি মূল্যবান দান। সামরিক শিক্ষা কোনও সাময়িক ব্যাপার নয়, ইহা জীবনেরই শিক্ষা; সুতরাং ইহাকে সফল করিয়া তুলিবার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকলেরই গ্রহণ করিতে হইবে।

শিক্ষাসমস্যা ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা

"নানান দেশে নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা -"

আধুনিককালে বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কোন আলোচনা করিতে গেলেই উক্তিটি মনে পড়ে। কারণ, নিজ বাসভূমে এতদিন পরবাসী ছিলাম আমরা। দুইশত বৎসরের ইংরেজ শাসনের আওতায় থাকিয়া যে শিক্ষা আমরা পাইয়াছি ইহার সহিত আজও আমাদের জীবনের যোগ ঘটে নাই। এই শিক্ষা এতদিন ছিল কেরানী তৈয়ারীর কল। আর এই আংশিক অসম্পূর্ণ শিক্ষাধারাকেই আমরা মহানন্দে উচ্চশিক্ষা বলিয়া মাথায় তুলিয়াছি।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেকলের পরামর্শ অনুযায়ী লর্ড বেন্টিঙ্ক ভারতীয়দের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করিলেন তাহা ভারতীয় জীবনধারার ঐতিহ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই সুপারিশে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে এ দেশীয় মানুষকে শিক্ষিত করিয়া তোলার ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু তাহা রূপায়ণের মাধ্যম ছিল ইংরেজী ভাষা। ইহাতে গোড়ায় গলদ রহিয়া গেল। এ কথা ঠিক ঐ শিক্ষা পাইয়াই আমাদের দেশে হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন, রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মত প্রতিভার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল কিন্তু তবুও ঐ শিক্ষাধারা আমাদের ভিতরের জিনিস, একেবারে নিজের জিনিস হইয়া উঠিল না। স্কুল-কলেজের কারখানা ঘরে বৎসর বৎসর রাশি রাশি পণ্যের মত রাশি রাশি বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র তৈয়ারী হইল কিন্তু তাহারা নিজেদের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে অর্থাৎ ইংরেজীজানা-বাবু শ্রেণীতে পরিণত হইল, সাধারণ মানুষ সে শিক্ষার সামান্য অংশও পায় নাই।

কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার এই ব্যবস্থাটা আমাদের ছাত্রদের সহজে হজম হইল না। যাহা পড়িতে হইবে, জানিতে হইবে, ভাবিতে হইবে, সে সবই যদি ইংরেজীর

মাধ্যমে আয়ত্ত করিতে হয়-তবে ইংরেজী ভাষাকেই প্রথম আয়ত্ত করা দরকার ফলে বুদ্ধিমান ছাত্রের ছাত্রজীবনের প্রথম অধ্যায়টা ইংরেজী ব্যাকরণের বিভীষিকার রক্তচক্ষুর সম্মুখ দিয়াই কাটিয়া যায়। শিক্ষালাভ তাহার ঘটে না। অসঙ্গতিটা ধরা পড়ে তখনই যখন বুঝি অন্য ভাষায় আমরা যত পাণ্ডিত্যই দেখাই না কেন, চিন্তা করি নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই। ফলে শুরু হয় 'বিলিতি তলোয়ারের খাপে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম'। ইহাতে না জানি বিষয়কে, না জানি আপনাকে। বিলাতী শিক্ষাব্যবস্থার অপর দোষ এই যে, ইহাতে বিরাট বিরাট স্কুলবাড়ীর বরাদ্দ আছে, আসবাবপত্র ও সুখের উপকরণের অভাব নাই, কিন্তু আমাদের মনের খাদ্য ফলাইবার কোন উপকরণই ইহাতে নাই।

ইহা ছাড়াও যে পরীক্ষা-পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত তাহা ছাত্রের মেধা, উদ্ভাবনী শক্তি ও বিচার ক্ষমতার পরীক্ষা নয়, নোটবই-এর মুখস্ত ক্ষমতা কাহার কতখানি তাহারই পরীক্ষা চলিতেছে। ইহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টকর নহে। যে বিদ্যা আমাদের নিজের হয় নাই, যাহা কেবলমাত্র মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভরশীল, যাহাকে নিজের ভাষায় চিন্তা পর্যন্ত করি না, তাহার পরীক্ষা মুখস্ত বিদ্যারই পরীক্ষা। এই অসঙ্গতি দূর হইতে পারে যদি মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়। ইংরেজী না জানার লজ্জা থাকিবে না ; পাঠোদ্যোগের অধিকাংশই বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে না। আমরা স্কুল-কলেজে কারিগরী বিদ্যা শিখিলাম কিন্তু তাহাকে অবলম্বন করিয়া নিজে কিছু নূতন সৃষ্টি করিতে পারিলাম না, পরের বিদ্যার বোঝা বহন করিয়া রহিলাম। ফলে "আমাদের বিলাতী বিদ্যাটা কেবল স্কুলের জিনিস হইয়া সাইনবোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না"। উপরোক্ত মন্তব্যটি রবীন্দ্রনাথের। তিনি এই প্রসঙ্গে জাপানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জাপানে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহা কোন বিদেশী শক্তির রক্তচক্ষুর নির্দেশে হয় নাই। মধ্যযুগীয় প্রাচ্য জাপান আধুনিক বিশ্বে প্রতিযোগিতার জন্যই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া লইতে চাহিয়াছে। নিজের ভাষায় বিদেশী শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিজের জিনিস করিয়া লইয়াছে। সংস্কৃত-দুহিতা বাংলা ভাষার শব্দ-সম্পদ উপেক্ষণীয় নয়, ইহার নূতন শব্দসৃষ্টির ক্ষমতাও প্রচুর। কাজেই

বাংলায় মাধ্যমিক পর্যায় হইতে উচ্চতর পর্যায়ে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার পঠন-পাঠনে বাধা কি ?

এ কথা নিসংন্দেহ যে, কাজটি দুরূহ। বাঙালীর মনের খাদ্য তাহার ঘরের পাশে ফলাইয়া তুলিতে হইলে যে উদ্যোগ আয়োজন প্রয়োজন তাহা বিরাট। একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ই পারে সেই বিরাট কর্মের ভার লইতে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী এবং "বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা যমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালী শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে।"

ইহা লজ্জার কথা যে, স্বাধীনতা লাভের ২৭ বৎসর পরে আজও আমাদের ইংরেজীনবীশ পণ্ডিতেরা উচ্চতর শিক্ষাকে ইংরেজীর দুর্গম গুহায় আবদ্ধ রাখিতে চান, ইহাদেরই কেহ কেহ কলেজে বিজ্ঞান কিংবা অন্য বিষয় মাতৃভাষায় পড়াইতে অসুবিধা বলিয়া অভিযোগ করেন। ইহাতে অসুবিধা কয়জন মুষ্টিমেয়ের কিন্তু সুবিধা আপামর জনসাধারণের, দেশের ভবিষ্যতের। একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, জ্ঞানের বনিয়াদ মাতৃভাষাতেই পোক্ত হয়। জ্ঞান আহরণের পদ্ধতিটি যদি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজ না হয়, মাতৃস্তন্য পানের মত স্বাভাবিক না হয়, তাহা হইলে ফিডিংবটলে দুধ খাওয়াইয়া, অক্সিজেন দিয়া নবজাতকে সুস্থ জীবন দান করা কিরূপে সম্ভবপর ?

আমরা যখন স্মরণ করি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে বাংলা ভাষার মাধ্যমেই প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কারকে বাংলা ভাষায়ই সাধারণ্যে প্রচার করেন তখন আমরা আশান্বিত হইতে পারি। আধুনিক কালেও বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সত্যেন বসু স্নাতকোত্তর পদার্থবিদ্যার পাঠ দিতে গিয়া বাংলা ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন।

অতএব মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষাদান সম্ভব নহে, এই মত গ্রাহ্য হইল না। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে আমাদের আবেদন এই যে, "আজ কোনো ভগীরথ বাংলা ভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন, দেশের যে সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে তা বেঁচে উঠুক, পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার

লজ্জা দূর হোক, বিদ্যা-বিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।"

ভারতের ভাষা-সমস্যা

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাসমূহ পর্যালোচনা করিয়া একদা স্যর জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন্ হিসাব দিয়াছিলেন—ভারতীয় ভাষাগুলির সংখ্যা ১৭৯ এবং উপভাষার সংখ্যা ৫৪০। এই সংখ্যা হইতে ভারতবর্ষের ভাষাগত বৈচিত্র্যের একটা ধারণা পাওয়া যায়। অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষার সরকারী ভাবে স্বীকৃতি দান সম্ভব নয়। যে কয়েকটি ভাষা সাহিত্য, শিক্ষার মাধ্যমরূপে —পরিবার ও বিশিষ্ট সমাজের বাহিরে অবস্থিত বৃহত্তর জনসমাজে ব্যবহৃত হয় সেইগুলিকেই আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে স্বীকার করা যাইতে পারে। ভারতের সংবিধানে এইরূপ অনুমোদিত ১৪টি আঞ্চলিক ভাষার নাম (১) অসমীয়া, (২) বাংলা, (৩) গুজরাটী, (৪) হিন্দী, (৫) কানাড়ী, (৬) কাশ্মিরী, (৭) মালয়ালম্, (৮) মারাঠী, (৯) ওড়িয়া, (১০) পাঞ্জাবী, (১১) সংস্কৃত, (১২) তামিল, (১৩) তেলেগু ও (১৪) উর্দু। ভারতবর্ষীয় সাংস্কৃতিক জীবনে এই ১৪টিই মুখ্য ভাষা। ইংরেজ আমলে সরকারী কাজকর্মের সহিত শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক জগতেও ইংরেজী ভাষা আমরা ব্যবহার করিতে কতকটা বাধ্যই হইয়াছি। আবার ইংরেজ আমলে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা এবং আগ্রহও দেখা দেয়। বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে মাতৃভাষা চর্চার উদ্দীপনায় আধুনিক প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়াছে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম লইয়া। ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের ঐক্যকেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ভয় করিত। তাহাদের চেষ্টা ছিল প্রদেশের বিরোধ এবং বিভেদের দিকগুলি বড়ো করিয়া দেখানোর দিকে। ভাষার বৈচিত্র্যকেও তাহারা ভারতবর্ষে ঐক্যবদ্ধ একজাতি গঠনের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধারূপে দেখাইত। এই বক্তব্যের প্রতিবাদেই সেদিন জাতীয় কংগ্রেস হইতে ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্য একটি ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে মানিয়া

লইবার আহ্বান আসে এবং হিন্দী ভাষা এই মর্যাদা লাভ করে। তখন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উদ্দীপনায় হিন্দীভাষাকে স্বীকৃতি দিতে কোন অঞ্চলের মানুষই আপত্তি করেন নাই, কিন্তু হিন্দীর দাবির ন্যায্যতা যে সব দিক হইতে বিচার করিয়া দেখা হইয়াছিল এমন কোন প্রমাণ নাই। সমস্যাটি জটিল আকার ধারণ করে স্বাধীনতা লাভের পরে। সংবিধান রচনার সময়ে গণপরিষদে জাতীয় ভাষারূপে হিন্দির দাবি সম্পর্কে প্রবল মতভেদ দেখা দেয়। গণপরিষদের অধিবেশনে এই প্রশ্নে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ভোট গ্রহণের সময় পক্ষে এবং বিপক্ষে সমান ভোট পড়ে। পরের দিন পুনরায় ভোট গ্রহণ করা হয় এবং ৭৩—৭২ ভোট, অর্থাৎ একটি মাত্র ভোটের মেজরিটিতে হিন্দীকে সংবিধানে রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য, এইভাবে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাড়াহুড়া করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হয় নাই।

সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী ইংরেজীর স্থানে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহারের ক্রমিক পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য ১৯৫৫ সালের ৭ই জুন অফিসিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজ কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের সভাপতি ছিলেন বি. জি. খের। খের কমিশনে অন্যান্য সদস্যরূপে কাজ করেন শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপি. সুব্বারায়ণ, শ্রীমগনভাই দেশাই প্রভৃতি। সরকারী কাজকর্মে এবং সুপ্রীম কোর্টে ইংরেজীর স্থান সঙ্কুচিত করিয়া ক্রমে হিন্দী প্রবর্তনের পদ্ধতি এবং সময়সীমা বাঁধিয়া দেওয়াই ছিল এই কমিশনের কাজ। এই কমিশন সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহ করিয়া নিজেদের বক্তব্য প্রস্তুত করেন। এই কমিশনের সদস্যগণ সুপারিশের ব্যাপারে একমত হইতে পারেন নাই। মূল রিপোর্টে সারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে যে ভাবে হিন্দী চাপাইয়া দিবার পরিকল্পনা পেশ করা হয় তাহাকে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন একটি হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনা। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মূল রিপোর্টে স্বাক্ষর না করিয়া পৃথক রিপোর্ট পেশ করেন। এই সময় হইতেই শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধি শ্রীসুব্বারায়ণ মূল রিপোর্টে স্বাক্ষর না করিয়া পৃথক ভাবে রিপোর্ট দেন এবং জোর করিয়া হিন্দী চালানোর বিরোধিতা করেন।

ভাষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন হয়।

বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি একমাত্র হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি করিয়া আসিতেছে। এই আন্দোলনের ফলেই খের কমিশনের রিপোর্ট বা সংবিধানের নির্দেশ—কোনটাই এখনও পর্যন্ত কাযকরী করা হয় নাই। সরকারী কাজে সর্বস্তরে হিন্দী চালাইবার সময়সীমা অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সরকারী কাজে আংশিকভাবে হিন্দী ব্যবহার করা হইলেও সমান্তরালভাবে ইংরেজীও ব্যবহার করা হইবে—এই নীতি কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে অনুসরণ করিতেছেন। অহিন্দী অঞ্চলের মানুষের মনে কোনরূপ আঘাত না দিয়া ধীরে ধীরে ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। অত্যুৎসাহী প্রচারকেরাই ভাষা প্রশ্নে দেশের মধ্যে বিরোধের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রশ্নটি স্থিরভাবে বিচারের পরিবর্তে সমর্থক এবং প্রতিবাদী উভয় দলই আবেগের বশে চালিত হইতেছেন।

সকল দিক হইতে বিচার করিলে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ভারতের প্রজাতন্ত্রের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে প্রশাসনিক দিক হইতে সংহতি রক্ষা করিতে হইলে একটি কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষারূপে হিন্দীর দাবি বহুদিক হইতে প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানে আইনসিদ্ধ. এক্ষেত্রে হিন্দীকে মানিয়া নেওয়াই উচিত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ভাষা ব্যবহারের পরিধি সুনির্দিষ্ট ভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। হিন্দী 'সরকারী ভাষা', 'একমাত্র জাতীয় ভাষা' নয়। ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা কোন একটি নয়, অনুমোদিত ১৪টি ভাষাই জাতীয় ভাষা। সুনির্দিষ্ট সরকারী কাজে এবং অন্তর্ভারতীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে হিন্দী ব্যবহারের সীমা যদি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে অন্যান্য ভাষাভাষীদের আপত্তির বিশেষ কোন কারণ থাকিবে না। এদেশে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রে আমরা যে ইংরেজী ভাষা শিখিয়াছি তাহাতে লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। দেশের মধ্যে বিদ্যাচর্চার উচ্চমান যদি বজায় রাখিতে হয় তাহা হইলে "আংরেজি হটাও" আন্দোলন প্রতিরোধ করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা উচিত। পাশ্চাত্য জগতের বিদ্বৎসমাজের ধ্যানধারণার সহিত সংযোগ রাখার জন্য ইংরেজীর চর্চা দেশের মধ্যে সুষ্ঠুভাবেই হওয়া উচিত। ইংরেজী ভাষাকে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজ-এর মর্যাদা হইতে অপসারিত করা হইলেও আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এই ভাষাকে

সর্বপ্রযত্নে পবিপোষণ কবিতে হইবে। জাতীয় স্বার্থেব খাতিবেই এই ব্যবস্থা প্রযোজন।

হিন্দীকে বাষ্ট্রীয ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওযাব সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থায কোন একটি স্তবে অহিন্দী অঞ্চলেব ছেলেদেব এই ভাষা শিখাইবাব প্রশ্নও অবশ্যম্ভাবীরূপেই দেখা দেয। অহিন্দী অঞ্চলেব বিদ্যালযে হিন্দী শিখাইবাব ব্যবস্থা কবাব অর্থ ছাত্রদেব ইংবেজী, নিজস্ব মাতৃভাষা এবং হিন্দী লইযা তিনটি ভাষা শিখিতে হইতেছে। অন্য পক্ষে হিন্দী যাহাদেব মাতৃভাষা তাহাদেব ইংবেজী এবং মাতৃভাষা শিখিলেই কাজ চলিযা যায। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয সবকাবেব পক্ষ হইতে যে ত্রিভাষা নীতি প্রবর্তনেব চেষ্টা হইতেছে তাহা সমর্থনযোগ্য। এই নীতি অনুসাবে হিন্দী অঞ্চলেব ছাত্রদেব জন্যই ইংবেজী এবং হিন্দীব সহিত অপব একটি প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষাব ব্যবস্থা কবা হইবে।

ভাবতবর্ষে ভাষাব প্রশ্নটি এত জটিল যে, এ প্রসঙ্গে নীতি নির্ধাবণ এবং নীতি প্রযোগেব প্রতিটি ধাপে অনুত্তেজিত ভাবে অগ্রসব হওযা উচিত। ভাবতবর্ষেব সমস্ত অঞ্চলেব মানুষেব অনুমোদন গ্রহণ কবিযা প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবা প্রযোজন। জাতীয সংহতি এবং ঐক্যবদ্ধ ভাবতবর্ষ গডিযা তোলাব মূল উদ্দেশ্য যদি ব্যাহত হয তাহা হইলে দেশেব সর্বনাশ হইবে। এই দিক হইতে সবকাবী ভাষা হিসাবে হিন্দীকে ব্যবহাবে কেন্দ্রীয সবকাব মন্থবভাবে অগ্রসব হইবাব যে নীতি গ্রহণ কবিয়াছেন তাহা সর্বথা সমর্থনযোগ্য। হিন্দী প্রচাবকদেব উগ্রতা যেমন নিন্দনীয, প্রাদেশিক ভাষাব প্রতি মমত্ব বশতঃ একটি কেন্দ্রীয সবকাবী ভাষা প্রবর্তনেব চেষ্টাব সহিত অসহযোগেব মনোভাবকেও তেমনই প্রশ্রয দেওযা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের তৈল ও মৎস্য-সংকট

তেল-জল আব মাছ-ভাতেই বাঙালীব জীবন গডিযা উঠিযাছে। এই প্রবাদ বাক্যটিব মধ্যে বাঙালীব জীবনধাবাব বৈশিষ্ট্যেব ধাঁচেব পরিচযটিই ফুটিযাছে। বাঙালী তাহাব সকল প্রকার রন্ধনকার্যে সবিষাব তৈল ব্যবহাব কবে, মাছ ছাডা তাহার ভোজন সম্পূর্ণ হয় না। অথচ অদৃষ্টেব নির্মম পবিহাসে এবং

অসাধু ব্যবসায়ীদের কৃপায় বাঙালীর জীবনযাত্রার এই দুইটি উপাদান আজ দুর্মূল্য এবং তাহা পাওয়া এক কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একেই ত চালভোজী বাঙালীর পক্ষে ন্যায্য দরে চাল সংগ্রহের সৌভাগ্য আর অদৃষ্টে ঘটিতেছে না, তাহার উপর **তৈল এবং মৎস্য-সঙ্কট** তাহার জীবনকে সত্যই দুর্বহ করিয়া তুলিয়াছে : তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহার জের আজ পযন্তও চলিতেছে। সম্প্রতি বাজাব হইতে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য কখনও কখনও অদৃশ্য হইতেছে।

প্রথমে সরিষার তৈলের সঙ্কটের কথাই ধরা যাক। গত কয়েক বৎসর এই আহায তৈলের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অবশেষে ১৯৭৪ সালে উহা চরমে পৌছায়। সরকার ১৯৬৪সালে সরিষা তৈলের মূল্য বাঁধিয়া দিলে উহা খোলা বাজার হইতে উধাও হয় এবং জনসাধারণেব দুর্গতি অবর্ণনীয় হইয়া ওঠে। সরকার কয়েকটি পযায়েই তৈলের দাম বৃদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু ব্যবসায়ীদের হিংস্র মুনাফার ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবে কেন? পশ্চিমবঙ্গে **সরিষার উৎপাদন অত্যন্ত কম,** সেইজন্য সরিষার বীজ এবং তৈলেব জন্য এই প্রদেশকে অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়ীদের মর্জিব উপরই নির্ভর করিতে হয়। সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারগুলির নিকট হইতেও সহযোগিতা পাওয়া যায় না। কলিকাতা এবং অন্যান্য শহরে খোলাবাজারে তেল যখন পাওয়া যায় নাই, তখন মুনাফাশিকারী ব্যবসায়ীরা কালোবাজারে অবাধে যথেচ্ছ দামে **ভেজাল মিশ্রিত তৈল** বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রগুলিতে অভিযোগ করা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে এই ক্ষেত্রে যথোচিত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই, সে সম্বন্ধে সংবাদপত্রে উদাহরণ দিয়া বলা হইয়াছে, ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসেই কলিকাতা পুলিশ বাহির হইতে আনীত সরিষার বীজ তেলকলগুলির মধ্যে এই শর্তে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন যে, উৎপন্ন তেলের শতকরা ২০ ভাগ তাঁহারা নিজেবা ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করিবেন, অবশিষ্ট খুচরা বিক্রেতাদের দিবেন। মিল ও খুচরা ব্যবসায়ীরা কে কত তৈল বিক্রয় করিতেছেন তাহা খাদ্যদপ্তরকে জানাইবেন এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাহার পর জানা যায়, এই হিসাব দেওয়া হয় নাই। সরিষার তৈলের **বিকল্প হিসাবে** পশ্চিমবঙ্গের অনেকেই **বাদাম তৈল** ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু উহাব মূল্যও দুই তিন মাসের মধ্যেই প্রতি কিলো ২.৬০ টাকা হইতে ৩.২০ টাকা, অবশেষে ৪ টাকা হইয়াছিল। চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাও

চোরাবাজারে চলিয়া গিয়াছিল। খোলাবাজার হইতে বনস্পতি ঘিও উধাও হইয়া গিয়াছিল। সরিষার তৈলের বিকল্প হিসাবে বাঙালীর পক্ষে অন্য কিছু ব্যবহার করা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সম্পর্কে কোনও পরিকল্পনাও গ্রহণ করেন নাই। এতদিনে ব্যবসায়ীদের মুনাফাবাজি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ, **ক্রেতা সমবায় ভাণ্ডার ব্যবস্থা সম্প্রসারণ** এবং সরকারী সংস্থার অধীনে সরিষার বীজ ও তৈল উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারকে তৈলসঙ্কট নিবারণে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কিছুই হয় নাই। চায়ের বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের যে পরিকল্পনা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অবাস্তব। বর্তমানে, ১৯৭৫ সালেও তৈল সঙ্কটের সুরাহা হয় নাই। বর্তমানে উহার মূল্যের ঊর্ধ্বগতি কমিয়া কিছুটা নিচের দিকে নামিয়া আসিতেছে।

এইবার **মৎস্য-সঙ্কটের কথা**। বছরের পর বছর দেখা যাইতেছে কলিকাতা ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মৎস্য সরবরাহের চূড়ান্ত ঘাটতি। অসাধু মৎস্য ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে মৎস্যের **কৃত্রিম অভাব** সৃষ্টি হয়। নিম্নবিত্ত জনসাধারণকে তাহাদের এই নিত্য আহার্য বস্তুটি হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। কলিকাতায় গঙ্গার ইলিশমাছ প্রতিটি ২৫ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে, এই ঘটনা সত্যই অভূতপূর্ব। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষিসংস্থা তাঁহাদের ১৯৬৩-৬৪ সালের বার্ষিক রিপোর্টে বলিয়াছিলেন ভারতে মাথা-পিছু **মাত্র ছয় গ্রাম বাস্তব প্রোটিন** পাওয়া যায়। নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের পক্ষে মাছের পরিবর্তে দুধ। তাহাও ত ভেজালে পূর্ণ এবং দুর্মূল্য। মাংস, ডিম এবং তরিতরকারি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা সম্ভব নয়; একটু মাছের ঝোল আর ভাত হইলেই তাঁহাদের আহার তৃপ্তিদায়ক ও পুষ্টিকর হয়। মৎস্য চাষ পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি প্রধান স্থান অধিকার করিলেও মৎস্য সরবরাহে এ পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বাহির হইতে আমাদের প্রচুর মাছ আমদানি করিতে হয়। সরকারের গভীর সমুদ্রে মৎস্য সংগ্রহ পরিকল্পনা সফল হয় নাই। মৎস্যজীবীদের **সমবায় সংস্থাগুলির** কার্যকলাপও বিশেষ **আশাপ্রদ নয়**। যে সকল জলকর ইতিমধ্যে সরকারের আয়ত্তে আসিয়াছে এবং যেগুলিতে মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে অথবা সরাসরি সরকারী দপ্তরের দ্বারা মৎস্য চাষ হইতেছে সেইগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে একটি অর্ডিনান্স জারী করিয়াছিলেন, ইহাতে

রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনমত বিল, বাওড় ও ভেড়ির মালিকানা স্বহস্তে তুলিয়া লইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। জমিদারী উচ্ছেদ আইনে বিল, বাওড় ও ভেড়ির মালিকানা **রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার** কোনও বিধান ছিল না। সরকারী সূত্র হইতে জানা যায় নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলায় ৪২ হাজার একর ভেড়ি এলাকা আছে। ইহার মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ লবণ হ্রদ হইতেই কলিকাতায় প্রত্যহ এক হাজার মণ মাছ সরবরাহ করা সম্ভব।

কিন্তু মৎস্য চাষের উন্নয়ন এবং মৎস্য সরবরাহ বৃদ্ধি করিতে হইলে কেবল কতকগুলি জলকর রাষ্ট্রায়ত্ত করিলেই হইবে না, **বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে** প্রচুর অর্থ লগ্নি করিয়া ইহাদের সংস্কার ও উন্নয়ন করিতে হইবে। **টাউন য়্যাণ্ড কানট্রি প্ল্যানিং কমিশনের** রিপোর্টে বলা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে শুধু বদ্ধ জলাশয়ই ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার একর পরিমাণ হওয়া সত্ত্বেও বৎসরে যে মাত্র ২ লক্ষ মণের বেশী মৎস্য সংগ্রহ করা যায় না তাহার একটি প্রধান কারণ হইল, জলকরগুলি সংস্কার করার জন্য যে বিপুল পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন তাহার সংস্থান নাই। রাজ্য সরকারকে এই অভাব দূর করিতে হইবে। কলিকাতার মৎস্যাভাব দূর করিবার জন্য ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে **কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে গঠিত মৎস্য-বিপণন সংস্থায়** কেন্দ্রীয় সরকার শতকরা ৫১ ভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহার ২৫ ভাগ অংশীদার হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছিল। স্থির হয় যে মৎস্য উৎপাদনকারী অন্যান্য যে সকল রাজ্য এই সংস্থার মাধ্যমে কলিকাতায় মৎস্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অবশিষ্ট ২৪ ভাগ অংশ গ্রহণ করিবেন। **সংস্থার মূলধন** দুই কোটি টাকা হইবে বলিয়া প্রাথমিকভাবে স্থির হইয়াছিল। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে সংস্থার কাজ সম্পূর্ণরূপে চালু হইলে মে মাসের পর ঘাটতির সময়ে সংস্থা কলিকাতায় মৎস্য সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবেন আশা করা গিয়াছিল। স্থির হয় যে এই সংস্থা প্রথমতঃ **কলিকাতা কর্পোরেশনের** সুপারিশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট খুচরা মৎস্য ব্যবসায়ীদের মারফত মৎস্য বিক্রয় করিবেন। যাহাদের আচরণ সম্বন্ধে কোনও অভিযোগ নাই ঐরূপ খুচরা মৎস্য ব্যবসায়ীদেরই মৎস্য বিক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হইবে। ইহার সঙ্গে সংস্থা নিজস্ব খুচরা বিক্রয়-কেন্দ্রও স্থাপন করিবেন কিন্তু এই পরিকল্পনায় কলিকাতায় মৎস্য সরবরাহের কোন উন্নতি আজও পরিলক্ষিত হয় নাই।

হলদিয়া—এক সম্ভাবনাময় বন্দর

হুগলী নদীর প্রাণোচ্ছল ধারার দাক্ষিণ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বিশেষভাবে কলিকাতা বন্দরের সমৃদ্ধি। কিন্তু আজ সেই ধারা শুষ্কপ্রায়। ফলে **কলিকাতা বন্দর সঙ্কটের সম্মুখীন**। এই সঙ্কটের হাত হইতে কলিকাতা বন্দরকে রক্ষা করিবার জন্য একদিকে যেমন প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে, বিশেষভাবে **ফরাক্কা পরিকল্পনার** রূপায়ণ হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি এই বন্দরকে উপযুক্ত সাহায্যের আশ্বাস লইয়া **সম্ভাবনাময় হলদিয়া বন্দরের** জন্ম হইয়াছে পূর্ব ভারতের অতীত বাণিজ্য কেন্দ্র তাম্রলিপ্তে।

মেদিনীপুর জেলার যে গ্রামটি কয়েক বৎসর পূর্বেও ছিল অখ্যাত ও প্রায় অজ্ঞাত, আজ সেই স্থানটি সকলের নিকট একটি সুপরিচিত নাম। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব হইতেই পশ্চিমবঙ্গের **তাম্রলিপ্ত বন্দর** হিসাবেই ছিল সুপরিচিত। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থের পৃষ্ঠায় তাহার নাম বহুবার উল্লিখিত। শুধু তাহাই নহে, মহামতি অশোক এখানে নির্মাণ করিয়াছিলেন একটি বৌদ্ধস্তূপ, ছিল বহু বৌদ্ধ মঠ, তাই অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাম্রলিপ্ত সমৃদ্ধ অধ্যায় রচনা করিয়াছিল। কিন্তু অষ্টম-নবম শতাব্দীতে এই গৌরব-রবি অস্তাচলে গিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে আবার সেই অস্তমিত সূর্য পূর্বাকাশে অনেক সম্ভাবনার আলোক বিচ্ছুরণ করিয়া উদিত হইয়াছে। মৃত্যুমুখী কলিকাতা বন্দরকে রক্ষা করিতে আজ উদ্ভূত হইয়াছে 'হলদিয়া'। গঙ্গার মূল ধারায় পুষ্ট হুগলী নদী আজ গঙ্গার ধারা হইতে বঞ্চিত হওয়ায় ক্রমেই পলিমাটি সঞ্চয়ে স্তিমিত হইয়া পড়িতেছে, ফলে বড় বড় জাহাজ আজ কলিকাতা বন্দরে সহজে আসিতে সক্ষম নহে। একমাত্র **সহায়ক বন্দরের** সাহায্যেই জাহাজগুলির কলিকাতা আগমন সম্ভব। জাপানের দিকে তাকাইলে দেখা যায় টোকিয়োর ইয়োকোহামা এইরূপ একটি সহায়ক বন্দর। হলদিয়াও কলিকাতার সহায়ক বন্দর রূপেই গড়িয়া উঠিতেছে। **কলিকাতা মেট্রোপোলিটান প্ল্যানিং সংস্থা** ইহার ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন, "The importance of the deep sea port at Haldia as an auxiliary to the port of Calcutta has been well established with the development of the Haldia Port, urbanization of the immediate vicinity would be inevitable."

হুগলী ও হলদি নদীর সঙ্গমস্থলে, হলদি নদীর বামকূলে অবস্থিত এই স্থানটি মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত। হুগলী আজ গঙ্গার মূল ধারা হইতে বঞ্চিত, তাই মৃতপ্রায়। কিন্তু হলদি নদী **কাঁসাই ও কেলেঘাই**-এর যুগ্মধারা পুষ্ট। নদীধারা সঞ্জীবিত এই স্থানটি কৃষির একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র। শিল্পসম্পদেও এই স্থানটি কম সমৃদ্ধ নহে। এতদিন পর্যন্ত এই স্থানটির সকল দ্রব্যই কলিকাতা বন্দরে চালান হইত কিন্তু এখন সে নিজেই তাহা বহির্বিশ্বে পাঠাইতে পারিবে। এই বন্দরের **পশ্চাদ্‌ভূমি রূপে** সে পাইবে সমগ্র পূর্বভারত—বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম।

এই পশ্চাদ্‌ভূমিকে বন্দরের সঙ্গে উপযুক্ত ভাবে যুক্ত করিবার জন্য ব্যাপক **রেলপথের প্রয়োজন**। এখন হইতে তাহার পরিকল্পনা চলিতেছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পাঁশকুড়া স্টেশনের সহিত ব্রডগেজ রেলপথ দ্বারা এই স্থানটি সংযুক্ত হইবে। ইহার জন্য খরচ হইবে আনুমানিক ৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। শুধু রেলপথই নহে, ইহার জন্য **সড়ক ও জলপথের** ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করিতে হইবে।—জলপথের সুব্যবস্থার ক্ষেত্রে উড়িষ্যা ক্যানেল ও হিজলি টাইড্যাল ক্যানেল অন্যতম। সড়কের ক্ষেত্রে হলদিয়া হইতে সুতাহাটা ও তমলুক হইতে পাঁশকুড়া দ্রুত যানের উপযোগী করিয়া তৈয়ারী করা হইতেছে। বিশেষ ভাবে মাত্র ৫৬ মাইল দূরে অবস্থিত কলিকাতার সহিত তাহার যোগ নিবিড় হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বন্দরের সমৃদ্ধি অনেকখানি পরিমাণে সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।

কলিকাতার সামান্য দূরে অবস্থিত এই নূতন বন্দরে থাকিবে **পাঁচটি বার্থ** সমন্বিত একটি ডক। এই পাঁচটি বার্থের দুইটি কয়লার, দুইটি সাধারণ জাহাজী মাল ও একটি আকরিক লৌহের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার সহিত **তৈলের জন্য একটি জেটিও** থাকিবে। কারণ ইতিমধ্যেই ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি তৈল শোধনাগারের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আনুমানিক ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই নূতন বন্দরটি অনেক আশার আলোক লইয়া পশ্চিমবঙ্গের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আনুষঙ্গিক ভাবে কয়েকটি শিল্পপ্রকল্পের কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। মার্কিন প্রতিষ্ঠান ফিলিপস্ পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর সহায়তায় হলদিয়ায় আনুমানিক ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি রাসায়নিক সার কারখানা

স্থাপনের পরিকল্পনা ও পশ্চিমবঙ্গের সারের চাহিদার সন্তোষজনক **সমাধানে সহায়ক** হইবে।

হলদিয়া শুধু পশ্চিমবঙ্গের নহে, সমগ্র ভারতের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে। তাই এই বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছে। **ভারতীয় অনুসন্ধান সমিতি** হলদিয়া বন্দরের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রস্তাব করিয়াছেন, "**Engineering exports from the Haldia Port would be brightened if substantial measure of economic freedom and tax relief be granted in the Haldia zone.**" অর্থাৎ এই বন্দরকে '**free port**' করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। এই সমিতি সর্বদিক হইতে এই বন্দরটিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার সুপারিশ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভবত এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ একসময় কেন্দ্রীয় জাহাজী মন্ত্রী শ্রী রাজবাহাদুর হলদিয়ায় এক সভায় বলেন যে, কাণ্ডলা বন্দরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই হলদিয়া বন্দরকে **অবাধ বাণিজ্য বন্দর** রূপে স্থাপন করা হইবে।

ভারতীয় স্থপতি সমিতি এই বন্দরকে '**অবাধ আমদানি অঞ্চল**' রূপে চিহ্নিত করিবার পক্ষপাতী। প্রাচ্যে হংকং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি বন্দরের মতই এই বন্দরটি গড়িয়া উঠিবে। ইহার জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে। কাহারও কাহারও মতে ইহা ১২৫ বর্গমাইল, কাহারও কাহারও মতে ইহা অন্তত ২৪০ বর্গমাইল। হুগলী নদী, হলদি নদী ও হিজলী টাইড্যাল ক্যানেলের মধ্যবর্তী অঞ্চলই অবাধ বাণিজ্যঅঞ্চল বলিয়া পরিচিত হইবে। অবাধ বাণিজ্যের সম্ভাবনাকে সার্থকরূপে বাস্তবায়িত করিতে হইলে এই স্থানে শিল্প সম্ভাবনার দিকটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। এই অঞ্চলের সুযোগ সুবিধা গ্রহণের জন্য অগ্রসর দেশগুলি আগাইয়া আসিলে ভারতীয় কারখানা-গুলির সহিত তাহাদের প্রতিযোগিতা গড়িয়া উঠিবে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলিকে বিশেষজ্ঞদের পরিচালনায় যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে এবং ইহার জন্য প্রয়োজন হইবে আমদানি ও রপ্তানি উভয়বিধ কর হইতে এই কারখানাগুলিকে অব্যাহতি দেওয়া। এই প্রসঙ্গে এই সমিতি যে সুপারিশগুলি করিয়াছেন, তাহা হইল: এক, অঞ্চলটি ভারতীয় শুল্ক আওতার

বাহিরে থাকিবে ; দুই, আভ্যন্তরীণ বাজারেও সে এই সুবিধা ভোগ করিবে, তিন, ভারতীয় ও বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির সামান্যতম বিধিনিষেধের মধ্যে থাকিয়া কারখানা স্থাপন ও যন্ত্র-যোজনা করিতে পারিবে, চার, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতির অংশ-বিশেষ ও মূলধনী দ্রব্য শুল্কবিহীন ভাবে আমদানি করিতে পারিবে ; পাঁচ শ্রমিকেরা দেশী ও বিদেশী হইতে পারিবে, ছয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, হইবে সুবিধাজনক।

এইভাবে নানাদিক হইতে পর্যালোচনা করিয়া সমিতি তাহার রিপোর্টে এই বন্দরের **ভবিষ্যৎ ভূমিকার** কথা বর্ণনা করিতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, এক, বিদেশী কল-কারখানাগুলির সহিত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে বলিয়াই ভারতীয় কারখানাগুলি শক্তিশালী হইয়া উঠিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। দুই, বিঘোষিত সুযোগ সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যেই বহু বিদেশী প্রতিষ্ঠান আকৃষ্ট হইয়া বাণিজ্যের পসরা লইয়া উপস্থিত হইবে, তাহাদের উপস্থিতি এই দেশের বাণিজ্য-সম্ভাবনাকে আরও বর্ধিত করিবে। তিন, এই বন্দরে যে সমস্ত কলকারখানা স্থাপিত হইবে, তাহাদের আবশ্যকীয় উপকরণ ভারত হইতেই সংগৃহীত হইবে। ইহার অর্থ বৈদেশিক-মুদ্রা অর্জন। এই বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাঙ্ক, বীমা ও জাহাজী ব্যবসায়-এর মাধ্যমেই অর্জিত হইবে। চার, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ মজুত রাখিবে, তাহাতে ভারতের সাহায্য হইবে। পাঁচ, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি যে সমস্ত উৎপন্ন ও আংশিক উৎপন্ন দ্রব্য ভারতকে দিবে তাহা ভারতেই যোজনা করিতে হইবে এবং সরবরাহের জন্য প্যাকিং-এর ব্যবস্থাও করিতে হইবে। ফলে অনেক ভারতীয় সামগ্রী কাজে লাগিবে ; নিযুক্ত হইবে ভারতীয় শ্রমিক। ইহাতে **দ্বিবিধ সুবিধা** হইবার সম্ভাবনা। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান।

কিন্তু শুধু উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিকটির দিকে তাকাইয়া **ক্ষতির দিকটি** অগ্রাহ্য করা সমীচীন নহে। হলদিয়ায় উৎপন্ন রপ্তানি-যোগ্য পণ্য বিদেশের বাজারে অবাধে প্রবেশাধিকার পাইবে, কিন্তু ভারতীয় পণ্যকে শুল্ক দিয়া সেই বাজারে প্রবেশ করিয়া তবে প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। ইহাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সহজসাধ্য হইবে না। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্যান্য আশঙ্কার কারণও বর্তমান। বিশেষ ভাবে পৃথিবীর অন্যান্য অবাধ বাণিজ্য বন্দরের দিকে তাকাইলে দেখা যায়,

সেই সমস্ত স্থান **দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী** কাযকলাপের কেন্দ্র হইয়াছে। হলদিয়া যদি **চোরাকারবার, দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী কার্যের কেন্দ্র** হইয়া উঠে তবে তাহা ভারতের পক্ষে দুবিষহ। বর্তমান সরকার অনেক ক্ষেত্রেই দুর্নীতি দমনে, চোরাকারবার দমনে ব্যর্থ -এক্ষেত্রেও সেই অভিজ্ঞতা সত্য হইয়া দেখা দিতে পারে—ইহাই আশঙ্কা।

ফরাক্কা বা গঙ্গা-বাঁধ পরিকল্পনা এবং কলিকাতা বন্দরের উন্নয়ন

গঙ্গার তীরে অবস্থিত হওয়ার জন্যই কলিকাতা নগরী তাহার গুরুত্বপূর্ণ বন্দরটি লইয়া সমগ্র পূর্ব ভারতবর্ষের ব্যবসায়-বাণিজ্যের **স্নায়ুকেন্দ্রে** পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার তথা পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধি অনেকটা পরিমাণেই কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে যে আমদানি-রপ্তানি ঘটিয়া থাকে তাহার উপর নিভরশীল। কিন্তু এই গঙ্গানদীর নাব্যতা দিনের পর দিন হ্রাস পাইবার ফলে কলিকাতা বন্দর বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার জাহাজগুলি সহজে হুগলী বা গঙ্গা নদী দিয়া চলাচল করিতে পারে না, জোয়ার ভাঁটার উপর দীর্ঘ সময় নিভর করিয়া থাকিতে হয়। গঙ্গানদীর খাত ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়া কলিকাতার পক্ষে এক গুরুতর সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে **ভৌগোলিক কারণে** গঙ্গানদীর প্রধান স্রোত এই ভাগীরথী নদী হইতে পদ্মা নদীর দিকে সরিয়া যায়। তাহার ফলে পদ্মানদী গঙ্গার প্রধান জলপ্রবাহে পরিণত হয় এবং ভাগীরথীর স্রোতের বেগ হ্রাস পায়। সেইজন্য কলিকাতা বন্দর নানাদিক হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। ভাগীরথী ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইবার ফলে ভাগীরথী, হুগলী নদীতে পলিস্তর ক্রমাগত জমিতে থাকে। অজয়, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদীর বালি কাদাও হুগলী নদীতে আসিয়া জমা হয়। স্রোতের জোর কম হওয়ার জন্য হুগলী নদীর পক্ষে এই পলি, বালুকা ও কর্দমস্তর সরাইয়া ফেলা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রায়

সারা বছর ধরিয়াই এই পলিমৃত্তিকার সঞ্চয় ড্রেজার যন্ত্রের সাহায্যে সরাইয়া ফেলিতে হয় এবং পাইলট বা পথপ্রদর্শকের সাহায্যে সমুদ্রগামী জাহাজকে বন্দরে লইয়া আসিতে হয়। **ড্রেজার ও পাইলটের ব্যবস্থার** জন্য কলিকাতা বন্দরের পরিচালক সংস্থা **ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনার্সকে** অজস্র টাকা ব্যয় করিতে হয়। নদীতে জলাভাবের জন্য উত্তর ভারতের সহিত কলিকাতার নৌসংযোগ রক্ষায় অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। জলের পরিমাণ হ্রাসের জন্য সমুদ্রের নিকটবর্তী এই নদীর জলে লবণের অনুপাত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার ফলে কলিকাতার পানীয় জল লবণাক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহার জন্য এই নগর ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নানাবিধ রোগ দেখা দেয়। এই **লবণাক্ত জল** পরিস্রুত করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন বহু অর্থব্যয়ে বিদেশ হইতে যে সকল মূল্যবান যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে, সেইগুলি লবণাক্ত জলের জন্য তাড়াতাড়ি অকেজো হইয়া পড়ে।

কলিকাতা বন্দরের বিপদ এবং ঐ **অসুবিধাগুলি** দূরীকরণের জন্য প্রথমত ৪৫ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালে **শ্রীবিশ্বেশ্বরায়ার** সভাপতিত্বে একটি কমিশন ফরাক্কা বাঁধের প্রস্তাবকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া মোকামাতেই ঐ বাঁধ নির্মাণের সুপারিশ করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৯৬৪ সালে **সেণ্ট্রাল পাওয়ার অ্যাণ্ড ওয়াটার কমিশন** ভারত সরকারের নির্দেশ অনুসারে গঙ্গাবাঁধের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন।

এই পরিকল্পনা অনুসারে **মুর্শিদাবাদ জেলায়** ধুলিয়ানের নিকটস্থ তিলডাঙ্গা নামক স্থানে গঙ্গার উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করা স্থির হয়। ঠিক হয় যে এই বাঁধের পশ্চাৎ দিক হইতে একটি খাল কাটিয়া ভাগীরথীর সহিত যুক্ত করা হইবে। সুতরাং তাহার ফলে গঙ্গা নদীর প্রধান স্রোত ভাগীরথী নদীতে ফিরিয়া আসিবে এবং ভাগীরথী-হুগলী নদীতে পূর্বের ন্যায় জলবৃদ্ধি হইবে। এই জলবৃদ্ধির জন্য পলিমৃত্তিকা ও বালুচর ধৌত হইয়া সমুদ্রে গিয়া পতিত হইবে। হুগলী নদীর নাব্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে, কলিকাতা বন্দরে ড্রেজার ও পাইলটের প্রয়োজন কমিয়া যাওয়ার দরুন অনেক খরচ বাঁচিয়া যাইবে, কলিকাতার পানীয় জল আর লবণাক্ত হইবে না, ব্যাধির প্রকোপ কমিয়া

যাইবে এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের **জল পরিশোধনের যন্ত্রপাতিও** সহজে নষ্ট হইবে না। কলিকাতা হইতে উত্তর ভারতের মধ্যে নৌ-চলাচলের সুবিধাও হইবে।

ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপযোগিতা আছে। পূর্বে কলিকাতা হইতে রেলপথ বা স্থলপথে **উত্তরবঙ্গের সহিত সরাসরি সংযোগ** স্থাপনের কোনও পথ ছিল না। এই বাঁধের উপর দিয়া ট্রেন ও মোটরগাড়ী চলাচলের জন্য নির্মিত পথে তাহার মাধ্যমে এখন দক্ষিণবঙ্গের সহিত উত্তরবঙ্গের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে রেলপথে ও স্থলপথে সরাসরি উত্তরবঙ্গে যাতায়াত করার সুবিধা হইয়াছে। ভাগীরথী ও হুগলী নদীতে জল বৃদ্ধির ফলে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে।

বস্তুত **ফরাক্কা-বাঁধ পরিকল্পনা** পশ্চিমবঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যেমন তেমনি উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষের ব্যবসায় বাণিজ্যের স্নায়ুকেন্দ্র কলিকাতা বন্দরটিকে রক্ষা করিবার জন্যও একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাটি লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া যে **টালবাহনা** হইয়াছে তাহা সত্যই বেদনাদায়ক। ১৯৫৩ সালেই এই পরিকল্পনা মোটামুটি একটি রূপ পাইলেও **কেন্দ্রীয় সরকার ইহাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্বভারতীয় দায়িত্বের মর্যাদা দিতে চাহেন নাই।** আলোচনা পর্যালোচনা, বিবিধ বৈঠকে অনেক সময় নষ্ট হইবার পর অবশেষে এই পরিকল্পনা তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। **বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার** একটি প্রতিনিধিদলও ফরাক্কা-বাঁধ নির্মাণের গুরুত্ব নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। সুখের কথা, এতকাল পরে সম্প্রতি এ বাঁধের কাজ শেষ হইয়াছে। ইহার ফলে কলিকাতা বন্দরের উন্নতির আশা আছে।

পঞ্চায়েত-রাজ

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান সভ্যতার দেশ। দীর্ঘকাল হইতেই ইহার সমাজ মূলত **গ্রাম-কেন্দ্রিক।** ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই দেশে গ্রামগুলি

ছিল অনেকাংশেই স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি ইউনিট। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং **প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসনের কল্যাণেই** ইহারা বহু বৈদেশিক শক্তির আক্রমণের ও সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের বিপর্যয়ের মধ্যেও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতে পারিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে **স্যার চার্লস মেটকাফ** বলিয়াছেন, গ্রামীণ সমাজগুলি যেন এক একটি ছোটখাট গণতান্ত্রিক রাজ্য। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর হইতেই গ্রাম-পঞ্চায়েতের বিকেন্দ্রিত গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিটিকে আঘাত করিয়া ব্রিটিশ শাসনকর্তৃপক্ষ সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অশিক্ষায়, দারিদ্র্যে, মহামারীতে, নেতৃত্বের অভাবে গ্রামগুলির অবস্থা দিনের পর দিন শোচনীয় হইতে লাগিল অন্যদিকে গ্রামের উদ্যমশীল ও অর্থবান ব্যক্তিরা শহরে আসিয়া বাস করিতে থাকায় শহরগুলি স্ফীত হইতে আরম্ভ করিল। বৃটিশ শাসনকর্তৃপক্ষ গ্রামগুলিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকটি শহরে **স্বায়ত্তশাসন** প্রবর্তনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু শহরাঞ্চলেও ইহার অগ্রগতি মোটেই আশাপ্রদ ছিল না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে **দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে** সর্বপ্রথম গ্রাম্য পঞ্চায়েতকে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ১৯০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে **বিকেন্দ্রীকরণ** সম্বন্ধে যে রয়াল কমিশন বসিয়াছিল, তাহার সুপারিশের গুরুত্ব তদানীন্তন ভারত-সচিব কর্তৃক স্বীকৃত হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই বিষয়ে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাই দেখা যায় না। ১৯০৯ সালে কংগ্রেস কর্তৃক বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য দাবি জানানো হয়, ১৯১৬ সালেও উহার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে সর্বপ্রথম বাংলা দেশেই **ইউনিয়ন বোর্ড** নামক পঞ্চায়েত স্থাপনের আইন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত ও প্রবর্তিত হয়। অন্যান্য প্রদেশেও পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার আইন প্রণয়ন ও দুই-একটিতে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন বোর্ড ও পঞ্চায়েতগুলির নিকট হইতে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে কল্যাণজনক সুফল বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই। পঞ্চায়েতের উপরই ভারতের প্রকৃত কল্যাণ নির্ভরশীল, গান্ধীজির কণ্ঠে এই বাণী বার বার উচ্চারিত হইয়াছিল।

স্বাধীনতালাভের পর ভারতের নূতন সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করার সময়

পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতেই **সমষ্টিগত উন্নয়ন** (Community Development) পরিকল্পনা অনুসারে পল্লীগ্রামের আর্থিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে ইহা উপলব্ধি করা গিয়াছিল যে, পল্লী উন্নয়নের প্রয়াস বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানের এবং ত্রুটি সংশোধনের পথ নির্দেশের জন্য ১৯৫৭ সালে সংসদ সদস্য **শ্রীবলবন্ত রাও মেহতার** নেতৃত্বে একটি **পর্যবেক্ষক কমিটি** গঠন করা হয়। এই কমিটি পঞ্চায়েত-রাজ সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান নির্দেশ দান করেন। কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে বলেন, আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের অভাবে গ্রামোন্নয়নে গ্রামবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতা না পাওয়ায় কেবল **জাতীয় উন্নয়ন বা জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থাই** (National Extension Service) নয়, পল্লী উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। মেহতা কমিটি সেইজন্য সুপারিশ করিয়াছেন, সুষ্ঠুভাবে পল্লীউন্নয়ন প্রকল্পগুলির রূপায়ণের জন্য গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত, কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত লইয়া অঞ্চল পঞ্চায়েত, প্রতি উন্নয়ন ব্লকে **আঞ্চলিক পরিষদ** এবং জেলাগুলিতে **জেলা পরিষদ** গঠন করা এবং এই সকল বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযোগ রক্ষাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই পঞ্চায়েতগুলিকে স্ব-স্ব উন্নয়ন ক্ষেত্রে সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করা দরকার। ইহার জন্য যে অর্থব্যয় হইবে তাহার উপর পূর্ণ কর্তৃত্বের দায়িত্ব পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই থাকিবে। মেহতা কমিটির এই সুপারিশ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ নীতিগতভাবে গ্রহণ করেন। তদনুযায়ী প্রথমে অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে এই নূতন ধরনের পঞ্চায়েত-রাজ স্থাপিত হয়। পরে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে এবং সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সংগঠনে, কর্মপদ্ধতিতে ও কর্মক্ষেত্রের ব্যাপকতায় পুরাতন পঞ্চায়েত হইতে **এই নূতন পঞ্চায়েত-রাজ মৌলিকভাবেই স্বতন্ত্র**। পঞ্চায়েত-রাজের প্রধানতম দিক হইল এই: গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের সহিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামোন্নয়নের ভার প্রথমত গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর, দ্বিতীয়ত উন্নয়ন

ব্লকে আঞ্চলিক পরিষদের উপর ও তৃতীয়ত, জেলাপরিষদের উপর অর্পিত হইয়াছে। ইহাই **ত্রিস্তর** বিশিষ্ট স্বায়ত্তশাসনের সংগঠন নামে অভিহিত। চৌকিদার, দফাদার প্রভৃতির সাহায্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত, কিংবা স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতিই পঞ্চায়েতের একমাত্র দায়িত্ব নয়, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বৃহত্তম কাঠামোয় কৃষি-উন্নয়ন, ছোটখাট শিল্পে অধিকতর লোক নিয়োগ, সমবায় সমিতির উন্নতিসাধন প্রভৃতির কর্মসূচীর ভারও তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের শাসনকেন্দ্র দিল্লী হইতেই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া গ্রামবাসীদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে না, গ্রামোন্নয়ন ব্লকের ভিত্তিতে গ্রামবাসীরা তাহাদের **প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই** প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য নিজ নিজ পরিকল্পনা রচনা করিবেন। এব একটি ব্লকের মধ্যে প্রায় একশতটি গ্রাম থাকে। ব্লকের এলাকার আয়তন ১৫০ হইতে ২০০ বর্গ মাইল এবং উহার লোকসংখ্যা ষাট হইতে সত্তর হাজার। এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া এক একটি পঞ্চায়েত গঠিত হয়। দশখানি গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের জন্য সরকার নিযুক্ত এক একজন গ্রামসেবক থাকেন। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা ও সাহায্য যাহাতে গ্রামবাসীদের কাজে আসে তাহার ব্যবস্থা করাই তাঁহাদের দায়িত্ব। অঞ্চল পঞ্চায়েতের নির্বাচিত **সভাপতি** পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হইয়া থাকেন। ইহাতে কয়েকজন মনোনীত নারী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদেরও গ্রহণ করা হয়।

ব্লক উন্নয়ন অধ্যক্ষ (Block Development Officer) এবং কৃষি, পশুপালন, সেচ, সমবায় প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি আটজন বিশেষজ্ঞ বা সম্প্রসারণ কর্মচারী (Extension Officer) আঞ্চলিক পরিষদকে সাহায্য করিয়া থাকেন। রাজ্যের পরিকল্পনার জন্য কত অর্থ ব্যয় করা যাইতে পারে তাহা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারগুলিকে জানাইয়া দিলে তাহারা সেই অনুযায়ী ব্লকগুলিকে তাহাদের প্রয়োজনমত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দেন। পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চায়েতগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের অঞ্চলের পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করে। পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চায়েতগুলির সাহায্যে গ্রামীণ পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের ও উহার অগ্রগতির

পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। আঞ্চলিক পরিষদের উপরের স্তরে আছে জেলা পরিষদ। আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি পদাধিকার বলে ইহার সদস্য হন। জেলা হইতে যে সকল ব্যক্তি সংসদ এবং রাজ্যের বিধান সভায় প্রতিনিধিত্ব করেন তাহারাও ইহাতে সভ্যরূপে গৃহীত হন। জেলা পরিষদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিভিন্ন উন্নয়ন বিভাগের বিশেষজ্ঞের সহায়তা লইয়া আঞ্চলিক পরিষদগুলিকে তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করিয়া থাকে। জেলা পরিষদ জেলাসংক্রান্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য দায়িত্বশীল। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ নয়, উপদেশদানই ইহার কাজ। পূর্বের জেলা বোর্ডগুলি অধিকাংশ রাজ্যেই এখন বিলুপ্ত। পঞ্চায়েতের ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেক রাজ্যে জমির খাজনার একাংশ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চায়েত রাজের নীতি এবং কর্মপদ্ধতির যে সকল সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহাদের পর্যালোচনা করিয়া দেখিবার পূর্বে **পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত রাজের প্রবর্তন** সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। গ্রাম্য শাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একটি নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। ১৯১৯ সাল হইতেই এখানে **ইউনিয়ন বোর্ডগুলি** স্বায়ত্তশাসনমূলক রাজকর্ম শুরু করে। এই কাজের জন্য ইউনিয়ন বোর্ড সম্পূর্ণ ট্যাক্স গ্রামবাসীদের কাছ হইতে আদায় করিত। ভারতবর্ষে আর কোনও প্রদেশে গ্রামীণ সংস্থার এ জাতীয় কাজের নজীর নাই। **পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত-রাজ** প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের মত একটি পুরাতন সংস্থার কাঠামো সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া নতুন করিয়া পঞ্চায়েত গঠন সরকার সমীচীন মনে করেন নাই, অথচ ইউনিয়ন বোর্ডকে গ্রাম পঞ্চায়েতে রূপান্তরিত করিলে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব নয়, তাহাও অনুভব করা গিয়াছিল। সেইজন্য রাজ্য সরকার এ রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে ধাপে ধাপে গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েত গড়িয়া তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই দুই পঞ্চায়েত ঠিকভাবে গড়িয়া উঠিলে ব্লক ও জেলা পঞ্চায়েতও ঠিকভাবে চলিবে বলিয়া মনে করা হয়। ১৯৫৭ সালে পঞ্চায়েত আইন পাশ হওয়ার পর হইতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েত ও আট হইতে দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি করিয়া অঞ্চল পঞ্চায়েত স্থাপন করা হয়। গ্রামস্তরে পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা আশাপ্রদ হওয়ায় ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্লকস্তরে আঞ্চলিক ও জেলা

স্তরে জেলা পরিষদ এই দুইটি স্তরে পঞ্চায়েত গঠনে অগ্রসর হন। পশ্চিমবঙ্গের এই বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

গ্রামবাসীদের জন্য চাষ-আবাদ, পানীয় জল সরবরাহ, পথঘাটের সংস্কার, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি সব রকম স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং স্থানীয় উন্নয়নের ব্যবস্থা করাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ। ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করা, এলাকায় চৌকিদার ও দফাদারের ব্যবস্থা ও ছোটখাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য ন্যায়-পঞ্চায়েত গঠন করাই অঞ্চল পঞ্চায়েতের কাজ। ব্লক এলাকার কৃষি, পশু-পালন, কুটির-শিল্প, সমবায় আন্দোলন, পানীয় জল সরবরাহ, সেচ, স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসা, পথঘাটের উন্নতি, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইল আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব।

ইহা ব্যতীত ব্লক এলাকার অঞ্চল পঞ্চায়েতের কাজের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানও আঞ্চলিক পরিষদের কর্তব্য। আঞ্চলিক পরিষদ যথাসম্ভব অঞ্চল ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সেই পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করিবে। তবে যে প্রকল্পগুলি একাধিক অঞ্চলের সঙ্গে জড়িত সেইগুলি রূপায়ণের পূর্ণ দায়িত্ব **অঞ্চল পঞ্চায়েতের**। ১৯৬৪ সালের ২রা অক্টোবর অর্থাৎ গান্ধীজীর পুণ্য জন্মদিবস হইতেই পশ্চিমবঙ্গে জেলাপরিষদও প্রবর্তিত হইয়াছে। জেলার কৃষি, কুটির-শিল্প, পানীয় জল সরবরাহ, সেচ, রাস্তা নির্মাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতি যাবতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্ব জেলাপরিষদের। জেলার সমগ্র উন্নয়ন কার্য মোটামুটি **আঞ্চলিক পরিষদের** মাধ্যমেই সম্পন্ন হইবে। আঞ্চলিক পরিষদগুলিকে তাহাদের কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা ও তাহাদের কাজের তত্ত্বাবধান করা জেলাপরিষদের মূল কাজ, তবে যে সকল পরিকল্পনা দুই বা ততোধিক আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত, তাহার রূপায়ণের দায়িত্ব **জেলাপরিষদের**। আঞ্চলিক পরিষদের বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদনের ভারও জেলাপরিষদের উপর ন্যস্ত।

আমরা এইবার পঞ্চায়েত-রাজের নীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদেরা যে সকল সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা উপস্থাপন করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতে পারি। পঞ্চায়েতগুলি গ্রামবাসীদের গণ-তান্ত্রিকতার শিক্ষা লাভ এবং তাহা লাভ করিয়া জাতীয় উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে

যথাযথভাবে অংশ গ্রহণের প্রস্তুতির পীঠস্থান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখা যায়, পঞ্চায়েতগুলিতে কয়েকটি **বিশেষ বর্ণের** (caste group) পরিবারের ব্যক্তিদের গোষ্ঠীগত বা পারিবারিক আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ গোষ্ঠীগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। গ্রামীণ-সমাজের দুর্বলতম অংশগুলিকে সাহায্য করাই পঞ্চায়েত-রাজের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, পঞ্চায়েত-রাজ তাহাদের বিশেষ উপকার করিতে পারে নাই, সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদ গ্রামীণ সমাজের অংশগুলির উন্নয়নের উপকরণগুলির লাভ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। সমাজের দুর্বলতম অংশগুলির উপকৃত না হইবার কারণ, কৃষিঋণ, সহায়ক বৃত্তি (Subsidy) প্রভৃতি সাহায্য পাইতে হইলে জমি ও স্থাবর সম্পত্তি থাকা প্রয়োজন। গ্রামীণ সমাজের দুর্বলতম অংশ গুলিকে যদি উন্নয়ন-মূলক কর্মসূচীর সুবিধাগুলি পাইতে হয়, তবে এই নিয়মকে পরিবর্তিত করা দরকার। **আচার্য বিনোবা ভাবে** এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য : আজ সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতেরই যেন ব্যতিব্যস্ত অবস্থা। ইহার কারণ এই যে, আমরা গ্রামে বৈষম্য বজায় রাখিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করি। ফলে যাঁহাদের শিক্ষা অধিক, অর্থ অধিক, যাঁহাদের অধিকার অধিক, সুযোগ-সুবিধা ও ভূ-সম্পত্তি অধিক তাঁহারাই পঞ্চায়েতের মুখ্য ব্যক্তি হইয়া দাড়ান এবং সমস্ত ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে **কেন্দ্রীভূত** হয়। তারপর সেই সত্তাই এক বিকেন্দ্রিত শোষণ যন্ত্ররূপে পরিণত হয়। গ্রামপঞ্চায়েতের উদ্দেশ্য ইহা নয়, কিন্তু গ্রামে বৈষম্য থাকাকালীন উহা অনিবার্য। যে সকল লক্ষ্যসাধনের জন্য পঞ্চায়েত-রাজ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহাদের বাস্তব রূপায়ণের সাফল্যই ইহার উপযোগিতা বিচারের প্রকৃত মানদণ্ড। এই লক্ষ্যগুলি তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্দেশিত হইয়াছে। (১) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, (২) গ্রামীণ শিল্পসমূহের উন্নয়ন, (৩) সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির পুষ্টিবিধান (৪) স্থানীয় জনশক্তি এবং অন্যান্য সঙ্গতিসমূহ, এবং পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি যে সমস্ত বিভিন্ন ধরনের সঙ্গতি লাভ করে—ইহাদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার, (৫) গ্রামীণ সমাজে যে সকল অংশ অর্থ নৈতিক দিক হইতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তাহাদের সাহায্যদান, (৬) স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া কর্তৃত্ব এবং উদ্যোগের (Initiative) ক্রমান্বয়ে বিকেন্দ্রীকরণ, (৭) সংহতির পুষ্টিসাধন

এবং সমাজের আত্মনির্ভরতার বোধকে উৎসাহদান। কিন্তু এই সকল লক্ষ্য এবং পঞ্চায়েতগুলির বাস্তব কর্মপরিচালনার মধ্যে গুরুতর বৈষম্য দেখা যাইতেছে। পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় বলিয়াছিলেন, সরকারী নির্দেশ ও পরিদর্শন সাপেক্ষে বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে যে সকল পন্থা গ্রহণ করা হইতেছে তদনুসারে ব্লক উন্নয়ন কর্মসূচীর রূপায়ণের সর্বশেষ দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে গ্রাম প গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং জেলা পর্যায়ে জেলাপরিষদের সহিত ব্লক পঞ্চা সমিতির উপর পড়িবে। পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ ইহাকেই বলিয়াছেন, Plann from below, বা সমাজের তলদেশ হইতেই পরিকল্পনার কাঠামোকে গ। তোলা। পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতগুলির যথাযথ ভূমিকা পালনের মধ্য দি জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ সম্ভব, যাহা ছাড়া কোন গণতান্ত্রিক পরিকল্পনাই সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। পঞ্চায়েতগুলি বর্তমানে মোটামুটিভাবে সরকার নিযুক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সহযোগে সরকারের একটি শাখা হিসাবেই পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ নির্বাহ করিতেছে। পঞ্চায়েতগুলি ক্রমশই তাহাদের স্থানীয় এবং বিকেন্দ্রিত চরিত্র হারাইয়া আমলাতান্ত্রিক ধাঁচে রাজ্য-সরকারের শাসনযন্ত্রের নিছক একটি অংশ হিসাবেই কার্য নির্বাহ করিতেছে। পরিকল্পনার কৃষি-উন্নয়নের লক্ষ্যের পূর্ণতার জন্য গ্রামীণ উৎপাদন পরিকল্পনাগুলির যথোপযুক্ত প্রস্তুতির মাধ্যমে ছোট বড় সকল শ্রেণীর কৃষকদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ আবশ্যক। বর্তমানে আমরা তথাকথিত যে গ্রামীণ পরিকল্পনা পাই, তাহা আসলে গ্রামের কয়েকজন বৃদ্ধ এবং পঞ্চায়েতের সদস্যদের সহিত পরামর্শ করিয়া গ্রামীণস্তরের কর্মচারিবৃন্দ কর্তৃক কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়া রচিত কাগজে পরিকল্পনা মাত্র। প্রত্যেক ধরনের শস্য এবং প্রতিটি পরিবারের জন্য উৎপাদন লক্ষ্যসমেত যথাযথ গ্রামীণ পরিকল্পনা রচনার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে না, ইহাতে প্রতিটি পরিবারের উৎপাদনক্ষমতাও হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না।

পঞ্চায়েতগুলিকে সঙ্গতি সরবরাহ এবং উহাদের সঙ্গতি সংগ্রহের ব্যবস্থাও অসন্তোষজনক। রাজ্যসরকার ভূমিরাজস্বের যে অংশ জেলাপরিষদগুলিকে দিয়া থাকেন তাহার দ্বারা সকল প্রকার ব্যয়, বিশেষত পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলির কর্মসূচী চালাইয়া যাইবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, তাহা মিটান

যায় না। **ঘাটতি ব্যয় সংকুলানের** জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় এবং ভূমিরাজস্বের অংশকে **নূতন উন্নয়ন কর্মসূচীর** জন্য ব্যয় করা সম্ভব হয় না। পঞ্চায়েত-রাজের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং কর্মপরিচালনা সম্বন্ধে **শান্তনম কমিটি** যথার্থই বলিয়াছেন: উন্নয়নমূলক এবং অন্যান্য প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাদি (agency function) যাহা তাহাদের উপর অর্পিত হইবে তাহার দায়িত্বপালন ছাড়াও সুনির্দ্ধারিত কার্যাবলীর দায়িত্ব এবং যথোপযুক্ত অর্থনৈতিক সঙ্গতির অধিকারসহ পঞ্চায়েত-রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির স্বায়ত্তশাসনের ইউনিট হিসাবেই গড়িয়া ওঠা উচিত। গ্রামের লোকদের কর দানে অনিচ্ছা পঞ্চায়েতগুলির সঙ্গতি সংগ্রহে অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া থাকে। পঞ্চায়েত-সমিতিগুলির সঙ্গতি বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত **পঞ্চায়েত রাজস্ব পর্যবেক্ষণ কমিটি** বাধ্যতামূলক কর স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছেন. কিন্তু ইহা সমস্যার প্রকৃত সমাধান নয়। পঞ্চায়েত সমিতিগুলি যদি স্থায়ী এবং সাধারণ ধরনের করস্থাপনের পরিবর্তে প্রতি বৎসর এক একটি প্রকল্পের জন্য—যেমন একটি রাস্তা, কি সেচের জন্য একটি বাঁধ নির্মাণে কর স্থাপন করে, তবে প্রদত্ত কর এবং প্রাপ্ত সুবিধার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অনুভব করিয়া গ্রামবাসীরা কর দিতে ইচ্ছুক হইতে পারে।

জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা এবং পঞ্চায়েতের কার্যাবলীর মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধিত হয় না। সম্প্রসারণ কর্মচারীদের সাধারণত কর্মক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা, যথোপযুক্ত শিক্ষা ও স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে না। কৃষি-উন্নয়ন, পশুপালন, সমবায় ইত্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণ কর্মচারীরা পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে ডেপুটেশনের ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়। তাহাদের আবার **বিকাশ অধিকারীর** (Block Development Officer) অধীনে কাজ করিতে হয় এবং অন্যদিকে যে সকল বিভাগ হইতে তাহাদের প্রেরণ করা হইয়াছে উহাদের অধীনেও থাকিতে হয়। ইহার ফলে পঞ্চায়েতের কাজকর্মে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় এবং কর্মচারীদের দায়িত্বহীনতাবোধের সুযোগও দেওয়া হয়। গ্রাম অধিকারী এবং বিকাশ অধিকারীর মধ্যে মতভেদও পঞ্চায়েতের কাজে সংকট সৃষ্টি করিতে পারে। অনেক সময়ই পঞ্চায়েত এবং সমবায় সমিতির কার্যধারার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় না। কখনও কখনও উহাদের কাজকর্ম পরস্পরের প্রতি বৈষম্যমূলকও হয় এবং এই দুই সংস্থার কার্যধারা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হওয়ার ফলে

পঞ্চায়েতগুলি সমাজসেবার প্রতিষ্ঠান হইবার পরিবর্তে রাজনৈতিক দলাদলি ও রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থা কোনও মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। পঞ্চায়েত সমিতির প্রধানের **পরোক্ষ নির্বাচন** পদ্ধতিও গ্রামীণ গণতন্ত্রের বিকাশের পক্ষে সহায়ক নয়। এই সকল ক্রটিবিচ্যুতি দুব কবিযা পঞ্চায়েত-রাজের গণতান্ত্রিক ভিত্তিটিকে সবল কবিযা তোলা প্রয়োজন। কাবণ ইহার উপর আমাদেব গ্রামগুলিব উন্নয়ন নির্ভরশীল।

চতুর্থ পরিকল্পনা

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কার্য একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সীমিত না হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমে ক্রমে রূপায়িত হইতে থাকে। অনগ্রসর ভাবত ১৯৫১ সাল হইতে যে **অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার** কাজ হাতে লইয়াছে তাহাও নির্দিষ্টকালের সীমায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া ভবিষ্যতেব দিকে অগ্রসব হইয়া চলিয়াছে। ফলে ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ পাঁচ বৎসবের মধ্যেই শেষ হইয়া যায় নাই। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনা ১৯৫৬ সালে শেষ হইলেও তাহার পর বৎসর হইতেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণেব কাজ শুরু হইয়া গিয়াছিল। সেই পরিকল্পনার কাজ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত তৃতীয় পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই পরিকল্পনাব কাল শেষ না হইতেই, গত দুই বৎসর ধরিয়া চতুর্থ পরিকল্পনা লইয়া নানা গবেষণার কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন এই গবেষণার ফল হিসাবেই জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের নিকট তাঁহাদেব পরিকল্পনা সংক্রান্ত **স্মারক পত্র** পেশ করেন। বলা বাহুল্য, অতীতের মূল্যবান অভিজ্ঞতা পবিকল্পনা কমিশনের গবেষণার নিয়ামক। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ এই স্মারক লিপিতে প্রস্তাবিত আকাব, লক্ষ্য এবং উপায় গ্রহণ করিয়াছে। সম্পদ, কৃষি, শিল্প, শক্তি, পরিবহণ ও সমাজসেবা প্রভৃতি সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের প্রস্তাব বিবেচনা করিবার জন্য এই পরিষদ রাজ্য- খ্য মন্ত্রীদের লইয়া ইতিমধ্যেই **চারিটি** উপসমিতি গঠন করিয়াছে।

কমিশন মনে করেন, প্রথমে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত লক্ষ্যগুলি স্থির করিয়া একটি সম্পূর্ণ কাঠামো তৈয়ারী করিতে

হইবে। ইহার পর প্রতিটি ক্ষেত্রের পৃথক কর্মসূচীকে বিশেষভাবে পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। একটি **সামগ্রিক কর্মসূচী** না থাকিলে একদিকে যেমন প্রতিটি পৃথক কর্মসূচী নির্ধারণ করা যাইবে না তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মসূচীর মধ্যে সামঞ্জস্য ও পরস্পর নির্ভরশীলতার স্বরূপ নির্ণয় করাও সম্ভব হইবে না।

দারিদ্র্য হইতে মুক্তিলাভের বলিষ্ঠ সঙ্কল্প লইয়া ভারতবর্ষ তাহার অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার কাজে হাত দিয়াছে। এই লক্ষ্যে পৌছাইতে হইলে সুউচ্চ হারে দীর্ঘকাল ধরিয়া উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রথম দুইটি পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩·৫ ভাগ, তৃতীয় পরিকল্পনায় এই হার বর্ধিত হইয়া দাড়ায় শতকরা ৫%, চতুর্থ পরিকল্পনায় না৷ দক হইতে বিচার করিয়া ১৯৬৬ ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ১০ বৎসর সময়কালে বাৎসরিক আয় বৃদ্ধির হার নির্ধারিত হইয়াছে শতকরা ৭·৫ ভাগে। এই ভিত্তিতে হিসাব করিয়া বলা হইয়াছে যে **পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার** শেষে জাতীয় আয়ের পরিমাণ দাড়াইবে বৎসরে ৩০,০০০ কোটি টাকায় (১৯৬০-৬১ মূল্য-সূচক অনুসারে) অর্থাৎ, ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ দাড়াইবে ৫২০ টাকায়। ইহা ১৯৫০ ৫১ সালের দ্বিগুণ। আয় বৃদ্ধির এই হারকে লাভ করিতে হইলে ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যানুযায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ হইবে ২৪,৩৩০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সরকারী খাতে বরাদ্দ হইবে ১৬,৪১৫ কোটি এবং বেসরকারী খাতে হইবে ৭,৯১৫ কোটি টাকা। কিন্তু এই হিসাবই শেষ হিসাব নহে। নানা ভাবে আলোচনা চলিলেও শেষ পর্যন্ত **সম্পদ** (resource) **সংগ্রহের সম্ভাব্যতার** দৃষ্টিকোণ হইতেই বিষয়টি বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে পূর্ণতম প্রয়াসের দ্বারা সমগ্র দেশে অর্থ সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ ১৪,৫০০ কোটি টাকা অতিক্রম করিবে না, ইহার সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৭,০০০ কোটি টাকা ধরিলে চতুর্থ পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাড়াইবে ২২,৫০০ কোটি টাকা।

বলা বাহুল্য, চতুর্থ পরিকল্পনা রচনা করিবার সময় কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনার **ব্যর্থতার** কথা স্মরণ রাখিয়াই এই কর্মসূচী রচনা করিয়াছেন। তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, ১৯৬০-৬১ সালের ১৪,৫০০ কোটি টাকা জাতীয় আয় ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৯,০০০ কোটি টাকায় পৌছাইবে এবং ১৯৭৫-৭৬ সালে দাঁড়াইবে ৩৪,০০০ কোটিতে। এবং মাথাপিছু আয়ের

হিসাবে বলা হইয়াছিল যে ১৯৬০-৬১ সালের ৩৩০ টাকা ১৯৬৬, ১৯৭১ ও ১৯৭৬ সালে যথাক্রমে দাঁড়াইবে ৩৮৫, ৪৫০ ও ৫৩০ টাকায়। কিন্তু বাস্তবে ইহা সত্য হয় নাই। কারণ তৃতীয় পরিকল্পনার ৫ বৎসর সময় কালে শতকরা ৩০ ভাগ জাতীয় আয় বর্ধিত হইবার প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে এই হার দাড়াইয়াছে শতকরা মাত্র ১০ ভাগে। শেষের দুই বৎসর পূর্ণ সাফল্যের কথা ধরিয়া লইলেও ১৯৬৫-৬৬ সালে জাতীয় আয় ১৭,৪০০ কোটি টাকার (১৯৬০-৬১ মূল্যস্তর অনুযায়ী) বেশী হইবে না বলিয়াই পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন এবং মাথাপিছু আয়ও লক্ষ্য মাত্রায় পৌছাইবে না। অনেকগুলি কারণের মধ্যে ইহার অন্যতম প্রধান কারণ **জনসংখ্যার হিসাব** নির্ণয়ে ত্রুটি। তৃতীয় পরিকল্পনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাবে ৩০ লক্ষ লোক কম দেখান হইয়াছে।

চতুর্থ, পরিকল্পনায় সামগ্রিক জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ধরা হইয়াছে বাৎসরিক শতকরা ৬'৫ ভাগ। কৃষি-উন্নয়নের প্রত্যাশিত হার শতকরা ৫ ভাগ, শিল্পে শতকরা ১১ ভাগ। পরিবহণ, ব্যাঙ্ক বীমাক্ষেত্রে ধরা হইয়াছে শতকরা ৮ ভাগ। এই প্রসঙ্গে পরিকল্পনা কমিশন কতকগুলি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অশোক মেহেতা বলেন, **কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব** না ঘটাইয়া শিল্প বিপ্লব ঘটান সম্ভব নহে, সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনাতেও কৃষির উপর যথোযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। কমিশনের স্মারকলিপিতে প্রস্তাব করা হইয়াছে : এক, কৃষিক্ষেত্রে বাৎসরিক শতকরা ৫ ভাগ হার অর্জন করিবার জন্য সার, কীটপতঙ্গ নাশক দ্রব্য এবং কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণে জোর দিতে হইবে ; দুই, ভোগ্যপণ্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য বস্ত্র, চিনি, ঔষধপত্র, কেরোসিন ও কাগজ প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদন বর্ধিত করিতে হইবে ; তিন, বসতবাটীর সমাধানকল্পে সিমেন্ট ও অন্যান্য গৃহনির্মাণ দ্রব্য উৎপাদন বর্ধিত করিতে হইবে, চার, ধাতু, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, খনিজ দ্রব্য, বৈদ্যুতিক শক্তি ও পরিবহণের উন্নতি বিধান করিবার জন্য সমস্ত কর্মসূচীকে সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে ; পাঁচ, মানুষকে উপযুক্তভাবে উৎপাদনের কাজে লাগাইবার জন্য বেশী করিয়া সমাজসেবামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে ; ছয়, এই সমস্ত লক্ষ্যগুলিতে পৌছাইবার জন্য এমনভাবে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে অধিক

সংখ্যক মানুষ কর্মে নিযুক্ত হয় এবং সমাজের **বৈষম্য দূরীভূত** হইয়া সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলি বিশ্লেষণ করিলে সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, কৃষি ও সমাজসেবামূলক কর্মসূচীকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং কৃষিক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী সেচব্যবস্থার পরিবর্তে **দ্রুত উৎপাদন সহায়ক সেচ পরিকল্পনাকে** অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। শক্তি ও পরিবহণ সমেত শিল্পের প্রাধান্য কমিয়াছে।

অর্থ বরাদ্দের মোট পরিমাণ নির্ধারিত হইলেও কোন কোন ক্ষেত্র হইতে এই অর্থ সংগৃহীত হইবে সেই সম্পর্কে এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট আলোচনা সম্ভব নহে। তবে সরকারী খাতের জন্য **বৈদেশিক সাহায্যের** পরিমাণ স্থির করা হইয়াছে ২,৫০০ কোটি টাকা। কমিশন মনে করেন, বৈদেশিক সাহায্যের উপর অধিক নির্ভরশীলতা আর বাঞ্ছনীয় নহে। এই সংস্থার মতে, বর্তমানে জাতীয় আয়ের ১০ হইতে ১২% বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্য লওয়া হয় তাহাও বাঞ্ছনীয় নহে। এই পরনির্ভরতা ক্রমে ক্রমে কমাইয়া আনা একান্ত প্রয়োজন। তাঁহারা আশা করেন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ভারত বৈদেশিক সাহায্য না লইয়া নিজেই দাড়াইতে সক্ষম হইবে। বর্তমানে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ মোট বিনিয়োগের ১/৫ অংশ। এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌছাইতে হইলে **আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার** বৃদ্ধি করিতে হইবে। রপ্তানি হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ ও উপকরণ সংগ্রহের প্রচেষ্টাকে বর্ধিত করিতে হইবে। দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও বিনিয়োগকে পূর্ণ ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে হইবে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৫,১০ কোটি টাকা এবং পি. এল ৪৮০ সাহায্য ব্যতিরেকে আমদানির পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে ৭,২০০ কোটি টাকা অর্থাৎ এই খাতে ঘাটতির পরিমাণ দাড়াইতেছে ২,১০০ কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত এই পরিকল্পনাকালে ভারতকে অনেক বৈদেশিক ঋণ শোধ ও ঋণের সুদ প্রদান করিতে হইবে। ইহার পরিমাণ ১,১০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ৫০০ কোটি টাকা ঋণ শোধ করিতে হইবে এবং ৬০০ কোটি টাকা সুদ প্রদান করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি

ও প্রদানের ব্যবধান, ৩,২০০ কোটি টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্যের জন্য ভারতকে বিভিন্ন বৈদেশিক সরকার ও সংস্থার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য **কর্মসংস্থান**। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে বেকারের সংখ্যা ছিল ৮০ লক্ষ। তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্মযোগ্য লোকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ। অথচ তৃতীয় পরিকল্পনা কালে ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হইয়াছে, ফলে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে এই বিরাট সংখ্যক বেকারের সহিত ২ কোটি ৩০ লক্ষ কর্মী সংখ্যা যুক্ত হইয়া কর্মপ্রার্থী লোকের সংখ্যা দাঁড়াইবে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ। ১৯৭০-৭১ সালে পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য মাত্রায় পৌছাইতে হইলে চতুর্থ পরিকল্পনা কালে এই সংখ্যক কর্মপ্রার্থীব কর্মসংস্থান করার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু কমিশনের হিসাবানুযায়ী এই পরিকল্পনা কালে অকৃষি ক্ষেত্রে ১ কোটি ৪০ লক্ষ এবং কৃষি ক্ষেত্রে ৪৫ লক্ষ লোকের বেশী নিযুক্ত করা সম্ভব নহে। ইহার অর্থ তৃতীয় পরিকল্পনা কালের বেকারের তুলনায় চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ১৯৭০-৭১ সালে ৩০ হইতে ৪০ লক্ষ লোক বেকার থাকিবে। এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া কমিশন তাই বর্ধিত **গ্রামীণ কর্মসূচী** গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

মুখ্যত, এই বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া 'চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া' রচিত হইয়াছে। ইহাই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হয় নাই—ইহা প্রস্তাবাকারে আলোচিত হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও চতুর্থ পরিকল্পনা চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয় নাই। তাহার কাজও বিলম্বিত হইতেছে। এই বিলম্বের কারণ বৈদেশিক দান আশানুরূপ পাওয়া যাইতেছে না। নিউইয়র্কে বসিয়াও এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের মন্ত্রীরা আলোচনা করিয়াছেন। কন্তু এখনও আমেরিকা তাহার ছাড়পত্র দেয় নাই। এবং দানের টাকা কত পাওয়া যাইবে তাহা না জানিয়া পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া সম্ভব হইতেছে না।

ইতিমধ্যে দেশে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছে। নানা ভুলে ভরা এই পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে নানা বিরূপ সমালোচনা দেখা দিয়াছে। সেজন্য বর্তমানে অনেকেই মনে করেন, তিন তিনটি ব্যর্থ পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা বিচার

করিয়া আমাদের দেশীয় সম্পদের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত, বৈদেশিক দানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পনা তৈয়ারী করিতে গেলে বৈদেশিক নানা নির্দেশকেও হজম করিতে হয়। তাহার ফলে দেশের প্রকৃত উন্নতিসাধন হয় না, কিছু টাকা অপব্যয় করা হয় মাত্র। দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া একটি স্বাধীন চতুর্থ পরিকল্পনা গ্রহণ করাই হইবে শ্রেয়।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রত্যাশা ও ফলাফল

অনগ্রসর ও অনুন্নত অর্থনীতির **জড়তা ও নৈরাশ্যকে** দূর করিয়া তাহার বুকে জীবন স্পন্দন সৃষ্টি করাই পরিকল্পিত অর্থনীতির লক্ষ্য। দুইশত বৎসরের শোষণের ফলে রিক্ত দরিদ্র, অনুন্নত ভারতীয় অর্থনীতিকে **প্রগতিশীল** করিয়া তুলিবার ও জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নত করিয়া তুলিবার বলিষ্ঠ সঙ্কল্প লইয়াই ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির জয়যাত্রা শুরু হইয়াছে ১৯৫১ সালে। সূচনা কাল হইতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরে দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভাল মন্দ **মিশ্রিত অভিজ্ঞতা** লইয়া ভারত তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্রতী হইয়াছিল। এই অভিজ্ঞতা এক দিকে যেমন অতীতের সাফল্য ও ব্যর্থতার সাক্ষী অন্যদিকে তেমনি ভবিষ্যতের নিয়ামক। এই পরিকল্পনার কাজ শুরু হইয়াছিল ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল।

পববর্তী দুইটি পরিকল্পনা কৃষি এবং **মৌলিক ও ভারীশিল্পের** উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া জাতীয় অর্থনীতির বনিয়াদটি দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় আমাদের দায়িত্ব ছিল অর্থনীতিকে **স্বয়ংক্রিয় ঊর্ধ্বগতি** দান করা, স্বনির্ভর করিয়া তোলা।

পরিকল্পনাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিচার করা চলে না, কারণ একটি পরিকল্পনা অন্যটির সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি পরিকল্পনাতে নিজস্ব কতকগুলি বিশেষ লক্ষ্যে পৌছিবার প্রচেষ্টা আছে। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল: এক, জাতীয় আয় বার্ষিক শতকরা তিন ভাগ হারে বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের এই হার পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে বজায় রাখা। দুই, খাদ্যদ্রব্যে

স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ ও শিল্প রপ্তানির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কৃষি পণ্যের উৎপাদন। তিন, স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পের ভিত্তি রচনার জন্য ভারী ও মৌলিক শিল্পের দ্রুত প্রসারণ। চার, দেশের সম্পদের যথাসম্ভব পূর্ণতর ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থান করা। পাঁচ, আয় ও সম্পদের দুস্তর বৈষম্য হ্রাস ও অর্থ নৈতিক ক্ষমতার সুষম বণ্টন।

বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় পরিকল্পনার গঠনরীতি ও অর্জিত অভিজ্ঞতা তৃতীয় পরিকল্পনা রচনার সহায়ক। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে **'বিষম উৎপাদন কৌশল'** (**unbalanced growth technique**) গ্রহণ করা হইয়াছিল এই ক্ষেত্রেও তাহা অব্যাহত রাখা হইয়াছে। তবে প্রয়োজনানুসারে যে বিষয়গুলির উপর এই পরিকল্পনায় গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কৃষি অন্যতম। কারণ ভারতীয় অর্থ নৈতিক অগ্রগতির অন্যতম বিঘ্নস্বরূপ হইল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির স্বল্পহার। ইহা অতীতের অভিজ্ঞতা, তাই এই পরিকল্পনায় খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য যেমন ৭৬ মিলিয়ন টন হইতে ১০০ মিলিয়ন টনে, তেমনি কৃষি উৎপাদনের সূচককে বর্তমান ১৩৫ হইতে এই পরিকল্পনার শেষে ১৩৬ মিলিয়ন টনে লইয়া যাওয়া অর্থাৎ শতকরা ৩০ ভাগ বর্ধিত করা। শুধুমাত্র কৃষিই নহে. শিল্প, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানও পরিকল্পনায় যথাযোগ্য গুরুত্ব লাভ করে। হিসাব অনুসারে এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল শিল্পকে শতকরা ৭০ ভাগ বর্ধিত করা এবং ১৭ মিলিয়ন কর্মপ্রার্থীর মধ্যে ১৪ মিলিয়ন কর্মপ্রার্থীর কর্মসংস্থান করা হইবে, এবং পরিকল্পনার শেষে তাই জাতীয় আয় বর্তমান ১৪,৫০০ কোটি টাকা হইতে ১৯,০০০ কোটিতে এবং মাথাপিছু আয় ৩০০ টাকা হইতে ৩৮৫ টাকায় পৌঁছিবে বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহার জন্য মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ১১,৬০০ কোটি টাকা ধরা হয়, যাহার মধ্যে ৪,৫০০ কোটি টাকা সরকারী খাতে, বাকী অংশ বেসরকারী খাতে।

অনেক আশার আলোক-বর্তিকা লইয়াই এই পরিকল্পনার যাত্রা শুরু হইলেও প্রথম হইতেই তাহাকে নানা **বিরুদ্ধ-শক্তির** সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, ফলে প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হইতে পারে নাই। তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তাহার ফলাফল সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য **মধ্যকালীন সমীক্ষা** (**Midterm appraisal**)-র ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সমীক্ষাই সাফল্য ও ব্যর্থতার চিত্রটি

সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। এই পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির যে প্রত্যাশা ছিল তাহা পূর্ণ হয় নাই, কারণ ১৯৬১-৬২ সালে জাতীয় আয় বৃদ্ধি হইয়াছে ২.১ শতাংশ হারে। ১৯৬৩ সালে লোকসভায় তৎকালীন পরিকল্পনা মন্ত্রী যে তথ্য প্রদান করেন তাহা নৈরাশ্যজনক। কারণ পরিকল্পনার বারো বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিলেও গ্রামে দৈনিক মাথাপিছু আয় ২৮ পয়সা ও শহরে মাথাপিছু আয় ৩৩ পয়সায় জনসংখ্যার দশ-শতাংশ মানুষের জীবনধারণের অবর্ণনীয় দুরবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

স্বয়ংনির্ভর অর্থনীতি গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প লইয়া কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন এবং সেচ ও শক্তিখাতে নির্ধারিত ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১,০৬৮ কোটি টাকা ও ১,৬৫২ কোটি টাকা হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বর্ধিত তো হয়ই নাই, উপরন্তু ৩০ হইতে ৫০ লক্ষ টন ঘাটতি হইবার সম্ভাবনা প্রবল হইয়া দেখা দেয়। অন্যান্য লক্ষ্যেও পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। যদিও সেচের সুবিধা লাভ করিয়াছে ৭ লক্ষ একর জমি, ভূমি সংরক্ষণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ৪৪ লক্ষ একর ভূমি, ৪৫০ লক্ষ একর জমিতে উন্নত ধান্য বীজ সরবরাহ করা হইয়াছে, ৬০ লক্ষ একর জমিতে শস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে, নিবিড় চাষের সুযোগ লাভ করিয়াছে ১৭টি জেলা, সমাজ উন্নয়ন ব্লকের সংখ্যা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ৫,১৮৩টিতে। তাহা সত্ত্বেও এখন নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থল দূরবর্তীই রহিয়া গেল, তখনই কারণ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই অনুসন্ধানের ফলে যে কারণগুলি দেখা গেল তাহা হইল—এক, কৃষি ও অন্যান্য বিভাগের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাব, দুই, বহুমুখী নদী পরিকল্পনায় বিপুল অর্থ অপচয়, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরেই এই ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৪.৫ কোটি টাকা। নীতি নির্ধারণ, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-বিচ্যুতিই এই হতাশাজনক অবস্থার কারণ, ইহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

শুধুমাত্র কৃষিই এই ব্যর্থতার বোঝা বহন করিতেছে না, শিল্পও তাহার সঙ্গী। শিল্প ও খনিজ খাতে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ ১,৭৪৮ কোটি টাকা। মূলত ইস্পাত, সিমেন্ট, এলুমিনিয়াম, কলকব্জা, সালফিউরিক এসিড, নাইট্রোজেন সার, সুতী ও রেশম বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করিলেও কয়লা উৎপাদনের ঘাটতি ও শক্তি (power), রেলওয়ে পরিবহণের জন্য ওয়াগন ও শক্তি চালিত পাম্প উৎপাদনের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার অক্ষমতা শিল্পক্ষেত্রের

ব্যর্থতাই সূচিত করে। বিশেষ **ভোগ্যপণ্য** (consumer goods) উৎপাদনের ব্যর্থতার ফলেও এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়বরাদ্দ নির্ধারিত হইয়াছিল ১,৪৮৬ কোটি টাকা, তাহার মধ্যে ১৯৬০-৬১ সাল হইতে ১৯৬১-৬২ সালে মোট খরচ হইয়াছিল ৬৫৪ কোটি টাকা এবং ইহার দ্বারা ঐ একই সময়ে পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১,৫৩০ লক্ষ টন হইতে ১,৭৩০ লক্ষ টনে, সুতরাং পরিবহণের ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা পরিমাণে অগ্রগতি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায় নাই। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও সামান্য অগ্রগতি হইয়াছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র ভর্তির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ আসন সংখ্যা বর্ধিত হইয়াছে। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩৪২ কোটি টাকার মোট ধার্য পরিমাণের মধ্যে দুই বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ১৩৩ কোটি টাকা। ১৯৬৩-৬৪ সালে ব্যয়বরাদ্দ হয় ৭০ কোটি টাকা। আশা করা হয় ইহার ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আশাপ্রদ উন্নতি ঘটিবে।

আমাদের অর্থনীতিতে **উত্তরোত্তর কর্মসংস্থান** বৃদ্ধির যে প্রচেষ্টা করা হইতেছে তাহা কোন সময়েই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাইতে সক্ষম হয় নাই। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, পূর্ণ ও প্রচ্ছন্ন বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ ইহাদের পুরাপুরি ভাবে কর্মে নিয়োগ করিতে পারে নাই। তৃতীয় পরিকল্পনায় ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি থাকিলেও সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয় নাই। ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব অর্পিত হয় চতুর্থ পরিকল্পনার উপর।

একথা সত্য, ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে আমাদের সীমান্ত বিরোধের কালে দেশে যে **জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইয়াছিল** তাহার ফলে নির্ধারিত কর্মসূচীতে অনেক পরিবর্তন অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। জনকল্যাণমূলক বিনিয়োগের ক্ষেত্রটি সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া **সামরিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা** অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক প্রস্তুতির জন্যই কৃষি ও শিল্প যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল। দেশের সমর প্রস্তুতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য বিদেশী সাহায্য ও সমরোপকরণ প্রয়োজন। এই প্রচেষ্টায় বিদেশের সহিত আলাপ আলোচনা আংশিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে এবং

প্রয়োজনকে পূর্ণভাবে মিটাইতে আভ্যন্তরীণ পুঁজি সংগ্রহের দিকে মনোযোগ দিতে গিয়া যে কর্জ-ব্যবস্থার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, তাহাতে অবশ্যম্ভাবী রূপে পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দেখা দিয়াছে। ইহার সহিত জরুরী অবস্থার সুযোগ লইয়া এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী অতি মুনাফার লোভে অবস্থাকে আরও দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে।

১৯৬১-৬২ হইতে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে সরকারী খাতে ৪,২৪২ কোটি টাকা ব্যয়িত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অর্থনীতি স্বয়ংনির্ভর ও স্বয়ংক্রিয় হইয়া উঠিতে সক্ষম হয় নাই। ফলে বৈষয়িক উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষা এখনও অপূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। ভারতবাসী তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত সুখী জীবনের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে এবং করিতেছে। বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াও পরিকল্পিত অর্থনীতির ত্রয়োদশ বৎসরেও সেই আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নই রহিয়া গিয়াছে। ইহা সম্ভবত নূতন ভাবে চিন্তার ইঙ্গিত দিতেছে। কারণ প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের ফল মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির হাতে সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু অগণিত জনসাধারণ দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিলে ভারতীয় গণতন্ত্রের সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়িবার সংকল্প ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

ভারতের পণ্যদ্রব্য মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা ও মধ্যবিত্ত সমাজ

ভারতবর্ষের অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা নূতন নয় দীর্ঘকাল হইতে উহা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে আমরা এই জটিল সমস্যাকে দেখিয়াছি, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে ইহা গুরুতরভাবে দেখা দিয়াছিল। ১৯৬২ সালের শেষভাগ এবং ১৯৬৩ সালের মধ্যভাগ এই সময়ের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য প্রায় ৭% হারে এবং ১৯৬৪ সালের জুন মাস হইতে ইহা আরও ১০% হারে বৃদ্ধি পায়। এখনও সমভাবেই ইহার গতি ঊর্ধ্বমুখী। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বুলেটিনগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়, এই হার ক্রমবর্ধমান। বিশেষত খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি অত্যন্ত আশংকাজনক। স্বল্প আয় গোষ্ঠির ভোগ্যপণ্য ব্যবহারকারীদের

উপর ইহার প্রতিক্রিয়া সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর। চাল, সরিষার তৈল, আটা, ময়দা, ডাল, তরিতরকারি, মৎস্য, বস্ত্র—প্রতিটি পণ্যই দুর্মূল্য। বাঙালীর রন্ধনের একমাত্র উপকরণ সরিষার তৈল উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইতেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই শোচনীয় দিনগুলির দৃশ্য যেন আবার দেখা দিতেছে। বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রিয় খাদ্য মৎস্যও ন্যায্য মূল্যে এবং যথোপযুক্ত পরিমাণে পাইবার উপায় নাই। এমন কি হরলিক্স জাতীয় রোগীর পথ্য এবং শিশুর খাদ্য বেবিফুড পর্যন্ত খোলাবাজার হইতে মাঝে মাঝে উধাও হয় এবং কালো-বাজারে অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হয়।

আমাদের এই মূল্যবৃদ্ধির সংকট গম্ভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখা দরকার। অর্থনৈতিক আর সামাজিক উভয়ক্ষেত্রেই ইহার প্রতিক্রিয়া অশুভ এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভবিষ্যৎ এবং নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। এই সংকট নিরাকরণে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর না হইলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা গুরুতরভাবে ব্যাহত হইবে। এই পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে মূল্যবৃদ্ধির কারণ এবং যে সকল শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সাময়িকভাবে মূল্যবৃদ্ধি হয় এবং যে সমস্ত শক্তির চাপ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরিয়াই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পড়িতেছে, তাহাদের পার্থক্য নির্ধারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মূল্যবৃদ্ধির কারণগুলি যথাযথভাবে নিরূপণ করিতে না পারিলে আমরা পরিকল্পনা-সংক্রান্ত যে সকল নীতি গ্রহণ করিব তাহা পরিণামে সুফলপ্রসূ হইবে না, নীতি এবং তাহার বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে বিরাট ফাঁক থাকিয়া যাইবে।

পণ্যদ্রব্যের মূল্যস্তরের উপর যে শক্তিগুলি চাপ সৃষ্টি করে তাহাদের মোটামুটি ভাবে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, চাহিদা-সম্পর্কিত এবং সরবরাহ-ঘটিত। ইহাদের প্রত্যেকটিরই আবার দুইটি বিশিষ্ট দিক আছে। প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক নীতি এবং পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষার ব্যয় এবং পরিকল্পনা-সংক্রান্ত উন্নয়ন, যাহাদের একটি অর্থে autonomous বা স্বয়ংক্রিয় বলা যায়, তাহা হইতে প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট চাপ (যেমন চাহিদার ক্ষেত্রে সরকারি পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষার ব্যয় এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে শস্যফলনের ব্যর্থতার দরুন যে চাপ উৎপন্ন হয়), দ্বিতীয়তঃ উহাদের জন্য পরোক্ষভাবে যে অতিরিক্ত চাপ pressure সৃষ্ট হয়। যেমন উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষার ব্যয়ের ফলে যাহাদের আয়বৃদ্ধি ঘটে তাহাদের মাধ্যমে যে অতিরিক্ত চাহিদাজনিত চাপ সৃষ্ট হয়,

অথবা সরবরাহের ক্ষেত্রে কৃষিজ কাঁচামালের স্বল্পতার জন্য শিল্প-পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের হ্রাসজনিত যে চাপ সৃষ্ট হয়। প্রথম দিকটিকে পরিমাণগতভাবে নির্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু দ্বিতীয়টিই অধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়া মূল্যবৃদ্ধি ঘটাইতে পারে।

ভারতবর্ষে যে সকল কারণে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয় তাহা প্রধানতঃ **চাহিদাঘটিত**। জাতীয় অর্থনীতিতে লগ্নিবৃদ্ধি এবং কৃষি-সম্প্রসারণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য খাতে সরকারের নিরবচ্ছিন্ন লগ্নিবৃদ্ধি যে ঐরূপ চাহিদা বৃদ্ধির প্রধান উৎস, তাহা কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করা যাইতেছে। সাম্প্রতিককালে প্রত্যক্ষ চাহিদা-বৃদ্ধির অপর দুইটি কারণ বা উৎসও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, প্রতিরক্ষার ব্যয় এবং রপ্তানি। নিম্নের সাত বৎসরের তালিকা হইতেই ইহার চিত্রটি পরিষ্কার হইবে :

স্বয়ংক্রিয় বিনিয়োগ যাহা অর্থনীতিতে আয়বৃদ্ধি ঘটায়
(কোটি টাকা হিসাবে)

বৎসর	সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার মোট বিনিয়োগ (পণ্যদ্রব্যের মজুত-ভাণ্ডারে অতিরিক্ত যোগান বাদ দিয়া)	সরকারী ভোগব্যয় (প্রশাসন, রপ্তানি, প্রতিরক্ষা, উন্নয়নমূলক কার্য এবং সমাজ সেবা-সমূহ)	
১৯৫২-৫৩	৬১০	৬০৫ (১৮৫)	৬০০
১৯৫৫-৫৬	৮৬০	৮৮০ (১৯০)	৬৭০
১৯৫৬-৫৭	১০৬০	৯৭০ (২১০)	৬৩২
১৯৬০-৬১	১৩৬০	১৪৪০ (২৮০)	৬৩০
১৯৬১-৬২	১৫১০	১৫০০ (৩১৫)	৬৭০
১৯৬২-৬৩	১৬৬০	১৭৯০ (৪৭৫)	৬৮০
১৯৬৩-৬৪	১৮৮০	২২২০ (৮১০)	৭৮০

বেসরকারী ক্ষেত্রে পণ্যদ্রব্যের মজুত পরিমাণ (stock), পরিমাণ বৃদ্ধিও চাহিদা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এই ভাণ্ডারের কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া না গেলেও বেসরকারী এবং সমবায় সংস্থাগুলিতে প্রদত্ত ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেই এই মজুতদারি (hoarding) সম্বন্ধে মোটামুটি

ভাবে একটি ধারণা করা যায়। ১৯৫৫-৫৬ সালের শেষভাগে তফসিলভুক্ত ব্যাংকগুলি কর্তৃক বেসরকারী সংস্থাগুলিকে প্রদত্ত বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭৬০ কোটি টাকা। আর সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংক যে ঋণ দিয়াছে তাহার পরিমাণ আরও ১২ কোটি টাকার মত। সেই ক্ষেত্রে ১৯৬০-৬১ সালে এই দুই জাতীয় ঋণের পরিমাণ ১,৪৩০ কোটি টাকারও বেশি এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের শেষভাগে উহা প্রায় ২,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের সমবায় সংস্থাগুলি যে ঋণ পায়, তাহা সমৃদ্ধ চাষীদের হাতে গিয়াই পড়ে এবং উহারা তাহাব সাহায্যে মজুতদারি করে। দেশীয় মহাজন এবং ব্যাংকগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাংকের শিথিল হওয়ার দরুন ব্যবসায়ীরা খাদ্যশস্যের মজুতদারি, ও ফাটকাবাজির সুযোগ পায়। মুদ্রাস্ফীতির জন্য প্রচুর অর্থ কালোবাজারেও জমা হয়, এই হিসাববহির্ভূত **কালোটাকার** সন্ধান সরকার পান না, উহাব সাহায্যেও অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের ফাটকাবাজি চলে। দেশে অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি একটি সাধারণ হিসাব হইতেই বোঝা যায়, ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি নগদ অর্থ প্রচলনের পরিমাণ ছিল ১৯৭৭ কোটি টাকা, বর্তমানে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২,৫০০ কোটি টাকাও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

পরপৃষ্ঠার তালিকায় প্রত্যক্ষ চাহিদার যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, গত কয়েক বৎসরে চাহিদার দিক হইতে কি ধরনের মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হইতে বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর আয়বৃদ্ধির ফলে যে পরোক্ষ চাহিদাব সৃষ্টি হইয়াছে৹ তাহাও ইহার সহিত যোগ করিলে ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় ১৯৬৩-৬৪ সালে মোট চাহিদা বৃদ্ধির পরিমাণ অন্ততঃ ৪,০০০ কোটি টাকাব মত হইবে।

সরবরাহেব ক্ষেত্রে দুইটি দিক বিবেচ্য, **আমদানি** এবং **আভ্যন্তরীণ উৎপাদন**। ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৬২-৬৩ সালে আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ ৫% ভাগেরও কম হইয়াছিল এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে উহা ৫% বৃদ্ধি পাইয়াছে ধরিয়া লইলে এই তিন বৎসরের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালেব মূল্যস্তর অনুযায়ী মাত্র ১,৪০০ কোটি টাকার মত হইবে। ১৯৬৩-৬৪ সালেব আমদানির পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালের পরিমাণ অপেক্ষা ১০০ কোটি টাকার বেশি হইবে না। সুতরাং প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকার মত চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় মোট সরবরাহের পরিমাণ মাত্র ১,৫০০ কোটি টাকার মত হইবে।

১৯৬০-৬১ হইতে ১৯৬৩-৬৪ পর্যন্ত চাহিদার প্রত্যক্ষবৃদ্ধি (কোটি টাকা হিসাবে)

বৎসর	গত বৎসরের অপেক্ষা মোট বিনিয়োগের বৃদ্ধি	গত বৎসর অপেক্ষা সরকারী ক্ষেত্রে ভোগে (Consumption) বৃদ্ধি	গত বৎসর অপেক্ষা রপ্তানি বৃদ্ধি	গত বৎসর অপেক্ষা পণ্যদ্রব্যের মজুত (ব্যাংক ঋণ) বৃদ্ধি	গত বৎসর অপেক্ষা চাহিদার মোট বৃদ্ধির পরিমাণ
১৯৬১-৬২	+১৫০	+ ৮০	+ ৪০	+১৩০	+৪০০
১৯৬২-৬৩	+১৫০	+২৭০	+ ১০	+১৯৫	+৬২৫
১৯৬৩ ৬৪	+১৫০	+৪৩০	+১০০	+২৪০	+৯২০
	+৪৫০	+৭৮০	+১৫০	+৫৬৫	+১৯৪৫

চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে এই অসঙ্গতির প্রতিক্রিয়া পণ্যদ্রব্যের মূল্যস্তরে কিছুকাল হইতেই দেখা দিতেছে। কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের হার সর্বাপেক্ষা কম বলিয়াই ইহাদের উপর মূল্যবৃদ্ধির চাপ স্বভাবতই অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। সরবরাহ এবং গবর্ণমেণ্টের খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডারের তুলনায় চাহিদা যখন এই ভাবে বেশি হয় তখন অসাধু ব্যবসায়ীদের ফাটকাবাজি এবং মজুতদারি সংকটকে তীব্রতর করিয়া তোলে।

মূল্যবৃদ্ধির সংকটের **প্রতিকারের** উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে মধ্যবিত্ত সমাজের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। **পশ্চিমবঙ্গের** দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের অগ্নিমূল্যে মাসিক নির্দিষ্ট আয়ের বেতনভোগী মধ্যবিত্তদের জীবনযাত্রা দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। পরিকল্পনার ফলে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইয়াছে, মধ্যবিত্ত সমাজ তাহার ফলভোগী বিশেষ হয় নাই। শ্রমিকদের মতো বোনাস বা ওভারটাইম ইত্যাদি জাতীয় বাড়তি আয়ের সুযোগ-সুবিধা তাহাদের নাই। অন্যদিকে সামাজিকতা, রোগের চিকিৎসা, পুত্রকন্যার শিক্ষাদান, বাড়িভাড়া ইত্যাদি খাতে ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। একটি শ্রমিক পরিবারের স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রায় সকলেই সাধারণতঃ উপার্জন করিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারে উপার্জনকারী একটি ব্যক্তিকেই ন্যূনতম ভদ্র জীবনযাত্রার মান রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণান্ত হইতে হইতেছে। দুর্মূল্য ভাতার সামান্য পাঁচ দশ টাকা বৃদ্ধিতে নিম্ন আয়-গোষ্ঠীর মধ্যবিত্তদের এমন কিছু সুবিধা হয় না বরং উহা মুদ্রাস্ফীতিকে সাহায্য করে। অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি মধ্যবিত্তদের অস্তিত্বে যে কঠিন সংকট সৃষ্টি করিয়াছে সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি পড়া দরকার।

অদূর ভবিষ্যতে যখন উল্লেখযোগ্য ভাবে সরবরাহ বৃদ্ধির কোনও সম্ভাবনা নাই, তখন ভারতবর্ষের কোনও কোনও মহল বলিয়াছেন, পরিকল্পনায় বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের জন্যই যে **মুদ্রাস্ফীতি** সৃষ্ট হইয়াছে তাহাই মূল্যবৃদ্ধির কারণ। একটি সাধারণ হিসাব হইতেই পরিকল্পনার পরবর্তী পর্যায়গুলিতে কি ভাবে যে মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে তাহা বুঝা যায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে সাধারণ মূল্যস্তর ২৭·২% হারে হ্রাস পায়, শস্যের মূল্যস্তর ১৩·২% শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য ১৩·৩% এবং শিল্পজাত কাঁচামাল ৩৫·১% হারে হ্রাস পায়। দ্বিতীয়

পরিকল্পনা কালে সাধারণ মূল্যস্তর ৩০% হারে বৃদ্ধি পাইলেও শস্যের মূল্যবৃদ্ধির হার মাত্র ১৬·৩% ভাগ ছিল, আর শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের এবং শিল্পজাত কাঁচা-মালের মূল্য যথাক্রমে ২৫·৭% এবং ৪৫·৪% হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সাধারণ মূল্যস্তর ৩০% বৃদ্ধি পাইলেও সাম্প্রতিক কালের মত জনসাধারণের অসন্তোষ এত তীব্র হয় নাই, কারণ শস্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মূল্যস্তর বৃদ্ধির অর্ধেক ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৯৬১ সালের মার্চ হইতে ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সাড়ে তিন বৎসরেই সাধারণ মূল্যস্তর ২৩·৭% হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু শস্যাদির মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৪৭% ভাগ, আর শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য এবং শিল্পজাত কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৫·৭% এবং ৬৮% ভাগ। শস্যাদির মূল্যবৃদ্ধির হার সাধারণ মূল্যস্তর বৃদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া আকাশ-ছোঁয়া হইয়াছিল বলিয়াই জন-সাধারণের মধ্যে উহার প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তীব্র। সেই জন্যই তাঁহারা বলেন পরবর্তী পরিকল্পনায় ভারী মূলশিল্প সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস এবং ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের উৎপাদন এবং কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

মূল্যস্তরনীতি নির্ধারণের দুইটি দিক আছে, দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিলে উপরের প্রস্তাবিত সমস্যা সমাধানের সূত্র আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। উন্নত দেশগুলিতে যে সকল চিরাচরিত পদ্ধতিতে মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলে, বেকার সমস্যা ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাজর্জরিত ভারতবর্ষে তাহাদের অনুসরণ অযৌক্তিক। শিল্প সম্প্রসারণে জাতীয় আয়বৃদ্ধির চেষ্টায়ই এই সমস্যার প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধান নিহিত। তাহা না হইলে এই সমস্যা বারবার আত্মপ্রকাশ করিবে। সুতরাং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার শিল্পায়নের কর্মসূচীর কাঠামোই মূল্যস্তর সংক্রান্ত সকল নীতিকে বিচার করিয়া সুসমঞ্জসভাবে বিন্যস্ত করিতে হইবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমিকায় মূল্যস্তর নির্ধারণের সমস্যা-সমাধান প্রধানত তিনটি সূত্রের উপর নির্ভরশীল;

(ক) পরিকল্পনার আয়তন অথবা মোট বিনিয়োগ।

(খ) ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের বৃদ্ধির হার।

(গ) বিনিয়োগের আয়তন এবং ধাঁচ নিয়ন্ত্রিত করিয়া একটি সহনীয় মূল্যস্ফীতির সীমার উপরের দুইটি দিকের সামঞ্জস্যবিধান।

এই সামগ্রিক পটভূমিকায়ই মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণের সকল দিকগুলিকে পরিচালিত করিতে হইবে। কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন (তৃতীয় পরিকল্পনায় যাহার অগ্রগতি নৈরাশ্যজনক) এবং ভোগ্যপণ্যদ্রব্যে ব্যবহারকারীদের ক্রয়ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই উৎপাদক চাষীদের লাভজনক সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তার আশ্বাস দিয়া তাহাদের কৃষিকার্যে উৎসাহ দান, পরিকল্পনার উৎপাদনের মূল লক্ষ্যগুলির জন্য কর্মসূচীর যে সকল অগ্রাধিকার (Plan priorities) স্থিরীকৃত হয়, তাহাদের পরিবর্তে অন্য খাতে অর্থনৈতিক সঙ্গতিগুলি যাহাতে ব্যয়িত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে একটি উপযুক্ত ফিস্ক্যাল ও সংযুক্ত মূল্যনীতি গ্রহণ, সরকারী এবং বেসরকারী সর্বস্তরে কঠোর হস্তে অপচয় নিবারণ পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সহিত সঙ্গতিবিধান করিয়া যথাসম্ভব অত্যাবশ্যক ভোগ্য-পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা, ব্যাংকগুলির ঋণদান যথোপযুক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির সাহায্যে এই সংকট নিবারণের জন্য দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হওয়া দরকার।

পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় বলিয়াছিলেন, উন্নয়নশীল অর্থনীতির পক্ষে মূল্যবৃদ্ধির আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার প্রয়োজন আছে। আমদানির দ্বারা যখন আভ্যন্তরীণ গম সরবরাহের ঘাটতি পূরণ করা হইবে, তখন চালের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিতে পারে। যে কোন বৎসর শস্যোৎপাদনের আংশিক ক্ষতি হইতে পারে। মজুতদারেরা অধিক লাভের আশায় শস্য মজুত করিতে পারে। সাম্প্রতিককালে অন্য যে একটি সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা হইলে মূল্যমানের বড় ধরনের আঞ্চলিক বৈষম্য। যথাযোগ্যভাবে এই সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইলে যথোপযুক্ত সরকারী বিধানের মাধ্যমে মূল্যমানের নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়, সমবায় মাধ্যমে বিপণন ও বন্টন অবশ্য অবশ্যকর্তব্য। তাহা ছাড়া, অর্থনীতির অবশিষ্টাংশে মূল্য-প্রবণতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করিয়া খাদ্য বিষয়ক মূল্যনীতিকে দেখিতে হইবে এবং বিভিন্নক্ষেত্রে মূল্যমানের মধ্যে একটা যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে। ১৯৬৪ সালের জুন মাসে প্রদত্ত পশ্চিমবঙ্গের দ্রব্য-মূল্যানুসন্ধান কমিশন-এর রিপোর্টটিও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। কমিশনের মতে অধিক পরিমাণে সরকারী অর্থব্যয়ে এবং বন্টন কাঠামোয় ব্যবসায়ীদের মুনাফালাভের ফলে মূল্যস্তরের এই সংকট সৃষ্টি হইয়াছে। সর্ববিধ পণ্যদ্রব্যের মূল্যস্তরের ভারকেন্দ্র হইল খাদ্যশস্যের মূল্য।

খাদ্যশস্যের মূল্য নিম্নাভিমুখী থাকিলে ডাল, মৎস্য, বস্ত্র, সরিষার তৈল ইত্যাদি নিত্য-ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। কমিশন বলিয়াছেন, চাষীদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে ফসল ক্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া ভোগ্যপণ্য দ্রব্য ব্যবহার-কারীদের নিকট বিক্রয় পর্যন্ত সকল স্তর সরকারী মালিকানায় তাহার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মারফতই পরিচালিত হওয়া উচিত।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মূল্যস্তরের নীতি সম্পর্কিত এই সকল ষ্ট্র্যাটেজি বা কৌশল সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলিও দৃঢ়চিত্ততা এবং তৎপরতা দেখাইতে পারেন নাই। পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রবর্তন, খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বিপণন এবং সমবায় সংস্থার মাধ্যমে অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্য বণ্টন প্রভৃতি সম্বন্ধে রাজ্যগুলির শাসন কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট দৃঢ়-নীতির অভাব মূল্যস্তর সম্বন্ধে এখনও একটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। যে রাজ্যগুলি খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত, তাহাদের নিকট হইতে যথোপযুক্ত সহযোগিতা মিলিতেছে না। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ **শ্রী ভি কে আর ভি. রাও** হিসাব বহির্ভূত কালো টাকা, যাহা মূলত ফাটকাবাজির জন্য দায়ী, তাহার উৎস খুঁজিয়া বাহির করিবার এবং তাহাকে সরকারী আয়ত্তে আনিবার জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য যে সকল আংশিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন উহা পর্যাপ্ত নয়। তাঁহাদের একটি সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই রাষ্ট্রীয় বিপণন এবং সমবায় বণ্টনের মাধ্যমে এই সংকট নিবারণে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। সেই সঙ্গে ক্রেতা সাধারণকেও সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়া অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সংঘবদ্ধ-ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা ও ভারতবর্ষ

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব ও চমকপ্রদ অগ্রগতি যেমন পরম আশীর্বাদ হইয়া দেখা দিয়াছে, তেমনি চরম অভিশাপ রূপেও উহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান যখন মানবকল্যাণে নিয়োজিত হয়, তখন সে ঈশ্বর

প্রেরিত দেবদূত, আর যখন উহা নারকীয় ধ্বংসকার্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহা শয়তানের অনুচর দানবরূপেই প্রতিভাত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৫ সালে আমেরিকার জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর দুইটির উপর পারমাণবিক বোমা বর্ষণেই বিজ্ঞানের আসুরিক শক্তি যে কত ভয়াবহ, আতংকজনক হইতে পারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট হিরোশিমার উপর এবং ৯ই আগস্ট নাগাসাকির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি অ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই বিস্ফোরণে জাপনী শহর দুইটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত এবং ১,৪৪,০০০ জাপানী নাগরিক নিহত হয়। যাহারা প্রাণে বাঁচিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই অন্ধ, মারাত্মকরূপে বিকলাংগ হইয়া লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হইয়া শোচনীয়, মর্মান্তিক অভিশাপের বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছে।

মানবতার সেই অন্ধকার মুহূর্তেই পারমাণবিক শক্তি মানব কল্যাণে নিয়োজিত হইলে সুখ ও সমৃদ্ধির উজ্জ্বলতম দিনগুলিকে যে বহন করিয়া আনিতে পারিবে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তিকালে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির যে উৎসাহ দেখা গেল, মানব-কল্যাণে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের পরীক্ষায় তাহা আমরা পাইলাম না। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণ করে। তাহার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্স অ্যাটম বোমা অপেক্ষাও বহুগুণে শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। ১৯৬৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত একুশ বছরে যে ৪২৫ বার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটান হয়, তাহার ধ্বংসশক্তি প্রায় ৫০৪ মেগাটন, অর্থাৎ বিশ্ব-সভ্যতা নিশ্চিহ্ন করার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। কয়েক বৎসর পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি পঞ্চাশ মেগাটন পারমাণবিক বিস্ফোরণ করিয়া ইহার ব্যাপক ধ্বংসক্ষমতার আর একটি প্রমাণ বিশ্ববাসীর নিকট তুলিয়া ধরিয়াছে।

দীর্ঘকাল হইতেই বিশ্বজনমত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির পারমাণবিক অস্ত্রের উন্মাদ প্রতিযোগিতা আতংকের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের ফলে উহার তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি বায়ুতাড়িত হইয়া বিস্ফোরণ স্থল হইতে বহুদূরে ছড়াইয়া পড়ে এবং ধীরে ধীরে ভূপৃষ্ঠে নামিয়া আসে এবং জলে, মাটিতে, গাছপালায়, শাকসব্জি ও অন্যান্য ফসলের উপর পতিত

হয়। তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশিপূর্ণ ঘাস যদি গরুতে খায় তবে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় উপাদান গোদুগ্ধের মাধ্যমে শিশু ও বয়স্কদের দেহে সংক্রামিত হইয়া ক্যান্সার ও লিউকোমিয়া জাতীয় দুরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি করে। এই পরীক্ষা যে মানবসভ্যতার অস্তিত্বকেই ক্রমাগত বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে, সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে সচেতনতা দেখা দেয়। অবশেষে ১৯৬৩ সালে মস্কোতে বিশ্বের **প্রধান ত্রিশক্তি**—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা আংশিক নিষিদ্ধকরণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বলা হয়, বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি বায়ুতাড়িত হইয়া অন্য দেশে নীত হইতে পারে এইরূপ কোনও পরিবেশে বায়ুমণ্ডলে বা জলের নীচে বিস্ফোরণ ঘটানো যাইবে না। ত্রিশক্তি ছাড়া আরও ১০৫টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়াছে, **ফ্রান্স ও চীন** দেয় নাই।

স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই ভারতবর্ষ বৈদেশিক সম্পর্কে দৃঢ় ও অবিচল ভাবে শান্তির নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। বিশ্বশান্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। গান্ধীজীর আদর্শের উজ্জ্বল দীপবর্তিকাটি সম্মুখে রাখিয়া এই শান্তির পথ অনুসরণ করার জন্য ভারত ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক রাষ্ট্রের নিকট হইতেই অভিনন্দন লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ সাগ্রহেই **মস্কো চুক্তিতে** স্বাক্ষর দিয়াছে। কিন্তু ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের সশস্ত্র সংঘর্ষে আত্মরক্ষার জন্য তাহার সামরিক প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। তারপর চীন ১৯৬৪ সালের ১৬ই অক্টোবর পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। চীনের এই বিস্ফোরণে বিশ্বের জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, ভারতবর্ষেরও ইহা চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চীনের এই বিস্ফোরণ জনিত **সম্ভাব্য বিপদের** বিরুদ্ধে ভারত কিভাবে প্রস্তুত হইতে পারে সে সম্বন্ধে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষের কোনও কোনও মহল বলিয়াছেন, ভারতকে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ করিয়া দৃঢ়ভাবে এই সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। এই অস্ত্র যাহার হাতে থাকে তাহার শক্তিকে সকলেই মান্য করে, প্রবল প্রতিপক্ষকে অন্য কোনও ভাবে নিরস্ত করা যায় না। ভারতের পারমাণবিক গবেষণার ভারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক পরলোকগত **ডঃ হোমি ভাবা** বলিয়াছিলেন, একটি দশ কিলোটন পারমাণবিক বোমার জন্য ১৮ লক্ষ টাকা

এবং দুই মেগাটন বোমার জন্য ৩০ লক্ষ টাকার বেশী অর্থ ব্যয় হইবে না এবং বছরখানেকের মধ্যেই ইহা নির্মাণ করা যাইবে। ডঃ ভাবার এই উক্তিও এই সকল মহলকে উৎসাহিত করিয়াছে। পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ সমর্থনকারীদের কেহ কেহ ভারত এই অস্ত্র নির্মাণ না করিলে তাহাকে পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর পারমাণবিক অস্ত্রের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন।

পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ বিরোধীরা বলিয়াছেন, পশ্চিমী শক্তিজোটে আশ্রয় গ্রহণ ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করিবে এবং তাহার নিরপেক্ষতানীতির বিসর্জনের ফলে অনেক রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব হারাইবে। দ্বিতীয়তঃ, চীনের কয়েকটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে আমাদের চিন্তার কারণ থাকিলেও আতংকে অস্থির হওয়া অযৌক্তিক। একটি এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণ আর শক্তিশালী বোমারু বিমানবাহিনী ও দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদির সংযোগে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জায় শক্তিশালী হইয়া উঠা দুইটি এক জিনিস নয়। চীনের পক্ষে দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছিতে এখনও বহু সময় লাগিবে। আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট এবং প্রাক্তন সমর নেতা মিঃ আইজেনহাওয়ার বলিয়াছেন, চীনের পারমাণবিক অস্ত্র বিস্ফোরণে তিনি ভারতের পক্ষে আসন্ন বিপদের কোনও কারণ দেখিতে পান না। ব্রিটেনের শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন, এই বিস্ফোরণে এশিয়ার সামরিক পরিস্থিতি বা শক্তির ভারসাম্য বিশেষ বিচলিত হয় নাই। তৃতীয়তঃ, মস্কো চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে এই বিষয়ে ভারতের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। ভারত তাহা লঙ্ঘন করিলে পুনরায় বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করিয়া ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতার তাণ্ডব শুরু হইয়া যাইতে পারে। চতুর্থতঃ, আমেরিকাকে বাদ দিয়া চীন কখনোই এই অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবে না। ভারত এই বিষয়ে অগ্রসর হইলে পাকিস্তানও নিশ্চয় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে না এবং পরিণামে সংকট নিবারিত হইবার পরিবর্তে উহা তীব্রতর হইবে। ভারতের শান্তিবাদী ভূমিকার রূপান্তর ঘটিলে আফ্রিকা-এশিয়ার বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলির সহিত তাহার সম্বন্ধে সমস্যা দেখা দিতে পারে। পঞ্চমতঃ, একটি পারমাণবিক বোমা-নির্মাণের ব্যয়ের যে হিসাব ডঃ ভাবা দিয়াছেন, তাহা অন্যান্য মহলে সমর্থিত হয় নাই। যতদূর তিনি প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যয় ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ব্যয়ের হিসাব ধরেন নাই; শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির

তুলনায় ভারতের ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশী হইবে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন, একটি অ্যাটম বোমার খরচ ৩০ হইতে ৫০ কোটি টাকা পড়িবে। ১৯৪২ সালেই পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ পরিকল্পনার খাতে আমেরিকার প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ফ্রান্সে পরমাণু অস্ত্রখাতে বাজেট বরাদ্দ হইল ২২৮ কোটি টাকা, আর অসামরিক গবেষণা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১৬০ কোটি টাকা। বৃটেনের প্রতিরক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ২,৭৫০ কোটি টাকার মধ্যে দশ শতাংশ অর্থাৎ ২৭৫ কোটি টাকা পরমাণু অস্ত্র তৈয়ারীর জন্য সাধারণতঃ ব্যয় করা হয়। ভারতের মত অনুন্নত দেশ মারণ-অস্ত্রের জন্য বিপুল পরিমাণ ব্যয় করিলে দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিচলিত এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। শাস্ত্রীজীর পারমাণবিক বোমা নির্মাণ সম্পর্কিত নীতি ঘোষণায় এই চিন্তাগুলিই প্রতিফলিত হইয়াছে: ভারত তাহার পরমাণু নীতি পরিবর্তন করিবে না, পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের জন্য ভারত তাহার প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখিবে এবং ভারতের পারমাণবিক কমিশনের সকল কাজ ও উদ্দেশ্য থাকিবে পূর্ববৎ, অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ কাযে পরমাণু শক্তির প্রয়োগবিধি উদ্ভাবন—যাহা ভারত সম্প্রতি করিয়াছে।

ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ সম্পর্কিত এই বাদপ্রতিবাদ পর্যালোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, এই বিষয়ে কোনও প্রকার ভাবাবেগের উত্তেজনাকে প্রশ্রয় না দিয়া স্থির এবং যুক্তিশীল দৃষ্টিতে সমগ্র পরিস্থিতি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। বর্তমানে অস্ত্র নির্মাণের সমর্থনকারী ও বিরোধী দুইদলই যেভাবে তর্কবিতর্কে মুখর হইয়াছেন তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। এই ক্ষেত্রে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় ভারতের জাতীয় স্বার্থ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সহিত তাহার যথাসম্ভব সামঞ্জস্য সাধন। আমাদের এখনই পারমাণবিক বোমা নির্মাণ করিতে হইবে, এইরূপ দাবি লইয়া চিৎকার অথবা কোনদিনই উহা নির্মাণ করিব না, বলিয়া বিশ্ববাসীর নিকট শান্তিনীতির উচ্চকণ্ঠ, প্রগল্ভ প্রচারও পরিণত ও বিচক্ষণ রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দেয় না। এই জাতীয় প্রগল্ভতাকে প্রশ্রয় দিয়া বিশ্বজগতের নিকট নিজেদের হাস্যাস্পদ না করিয়া শান্ত ও স্থিরভাবে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন ও তাহার পরবর্তী ভারতবর্ষ

১৯৬৭ সালে ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে আরও তিন তিনটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে এই নির্বাচনের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। চতুর্থ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেসই ছিল একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কিন্তু নির্বাচনের পর তাহা পরিবর্তিত হয়। কংগ্রেসের শক্তি অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আটটি প্রদেশে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হন। বঙ্গ-বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাব-মাদ্রাজের মত প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশগুলি কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়। সারা ভারতীয় কংগ্রেসের প্রধান কর্ণধার এবং সভাপতি মাদ্রাজের একজন ছাত্র নেতার নিকট পরাজিত হন। অতুল্য, প্রফুল্ল, কামরাজ, পাতিল, রেড্ডি প্রভৃতি দিকপালেরা নির্বাচনে জয়লাভ করিতে পারেন নাই। অবশ্য কেন্দ্রে কংগ্রেসদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিলেও পূর্বের তুলনায় ইহা অনেক হ্রাস পায়। নিরংকুশ সংখ্যাধিক্যের জোরে কংগ্রেস বহুবার ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করিয়াছে, কিন্তু চতুর্থ নির্বাচনের পর পট পরিবর্তিত হয়। সেজন্য এই চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন ভারতীয় জনজীবনে নূতন তাৎপর্য বহন করিয়া আনে।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর অর্থাৎ ১৯৬২ সাল হইতেই ভারতবর্ষে নানা সমস্যা তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ মানুষের জীবন শোষণ-জর্জর হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্যার তীব্রতর পর্যায়ে শাসকদলের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই নানা দ্বন্দ্ব এবং ভাঙন দেখা দিয়াছিল। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে অভাবিত ভাবে চীন-ভারত সম্পর্কের অবনতি দেখা দিল। দীর্ঘ দিনের একটি সীমান্ত বিরোধ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রূপান্তরিত হইল। এশিয়া ভূখণ্ডের দুইটি বৃহৎ দেশ দুই বিবদমান শিবিরে দ্বিধাবিভক্ত হইল। চীনা সেনাদলের হাতে ভারতীয় সেনাদল পর্যুদস্ত হওয়ায় সামরিক খাতে অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইল। বিদেশ হইতে নানা সামরিক অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করিতে হইল। অল্পকালের মধ্যেই চীন-ভারত যুদ্ধ থামিয়া গেলেও ভারতীয় সামরিক ব্যয় হ্রাস পাইল না। তাহা আরও বাড়িয়া চলিল। চীন-ভারত যুদ্ধের পর দেখা দিল পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ। কচ্ছের রান সীমান্ত লইয়া প্রবল

অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব দেখা দিল। ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তে যাহা বারবার দেখা দেয়, সেই ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তের মধ্যস্থতায় তাহা সাময়িকভাবে মিটিলেও কাশ্মীরে হানাদার প্রেরণের ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। শেষ পর্যন্ত তাসখন্দ চুক্তির মধ্য দিয়া দুই দেশেরই যুদ্ধ-পূর্ব স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হয়। এই যুদ্ধের দ্বারা আমাদের কোন লাভই হয় নাই। কেবল দেশের নানা সমস্যা তীব্রতর হইয়াছে। দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়াছে। খাদ্যসমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। অথচ সরকার দেশের প্রতিরক্ষার নামে জরুরী আইন, লাঠি এবং পুলিশ দিয়া কঠোরতম দমননীতি প্রয়োগ করিয়াছে। ছাত্র বিশৃঙ্খলা এক সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। এই সব সমস্যা সমাধানে একদিকে চলিয়াছে কঠোর দমননীতি, অন্যদিকে চলিয়াছে নানা কমিটি, কমিশন নিয়োগ। ইহার ফলে মানুষের অসন্তোষ আরও বাড়িয়াছে। নানা আন্দোলন দেখা দিয়াছে।

এই পটভূমিকায় চতুর্থ নির্বাচন পর্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নানা রাজনৈতিক দল গত নির্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছিল। গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসদল শাসন ক্ষমতায় আসীন ছিল। স্বভাবতই সরকারী পৃষ্ঠপোষণায় তাহারাও নির্বাচনে নামিয়াছিল। ভোট-যুদ্ধে বিভিন্ন দল তাহাদের নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছিল। নানা তর্ক-বিতর্ক, প্রচার প্রবোচনার পর নির্বাচন শেষ হইল। নির্বাচনের ফলাফলে অবশ্য কুড়ি বৎসরের ব্যবস্থার পরিবর্তন হইল। কংগ্রেস তাহার পূর্ব কর্তৃত্ব হারাইল। দেশে কংগ্রেস বিরোধী নানা দল প্রাধান্য লাভ করিল।

এই নির্বাচনে জনমতের রায় ঘোষিত হইলেও এই নির্বাচন বহু ব্যয়সাধ্য। বিত্তবান ছাড়া এই ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ গরীব মানুষের এই নির্বাচনের কথা কল্পনা করাও শক্ত। সেজন্য ভারতবর্ষের অধিকাংশ বিত্তবান ব্যক্তিরাই নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করেন। সত্যকার মেহনতী মানুষের এই নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব হয় না। অবশ্য সম্ভব হয়, যদি তাহাদের খুবই শক্তিশালী সংগঠন থাকে। চতুর্থ নির্বাচনের দিকে তাকাইলেই দেখা যায় কেবল প্রদেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে

বিত্তবানদের প্রতিনিধিই বেশী। স্বভাবতঃই তাঁহারা যে নীতি নির্ধারণ করিবেন তাহার দ্বারা মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলিলেও কার্যতঃ তাহা কখনও সত্য হইতে পারে না।

নির্বাচনের পর যে সব প্রদেশে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হইয়াছিল, সেখানে মাদ্রাজ ছাড়া কোন স্থানে কোন কংগ্রেস বিরোধী দলই বিধান সভার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি জনসাধারণের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করিয়া এক নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে কংগ্রেস বিরোধী সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। তথাপি কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার রাজ্যশাসনের জন্য কেবলমাত্র প্রশাসনিক এবং পুলিস বিভাগের উপর নির্ভর করেন নাই। তাঁহারা জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতায় কাজ করিয়াছিলেন। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি, কোন মন্ত্রীর সফর কালে বহু পুলিশ সঙ্গে থাকিত। তাঁহাদের বাড়ীতেও পুলিশ মোতায়েন থাকিত। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের এই সকল মন্ত্রীদের সাধারণ মানুষের মত সাধারণ মানুষের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে দেখা গিয়াছিল। তাহার জন্য কোন পুলিশ প্রয়োজন হয় নাই। সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁহারা পুলিশ ব্যবহার করেন নাই। কোন সঙ্কটজনক অবস্থায় কেবলমাত্র পুলিশের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেরাই ঘটনাস্থলে গিয়া জনসাধারণকে শান্ত করিয়াছেন।

অনেকগুলি প্রদেশে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার বিদ্যমান ছিল। আমাদের সংবিধানে কেন্দ্রের উপরই সকল প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রগুলিকে প্রায় সব ব্যাপারেই বিশেষ করিয়া অর্থ এবং খাদ্যের জন্য কেন্দ্রের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাহাছাড়া সব বিষয়েই মৌলিক নীতি নির্ধারণ করে কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানে রাজ্য সরকারগুলির বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী বিশেষ কিছুই করিবার নাই। নির্বাচনের পর কেন্দ্র এবং রাজ্যে পৃথক পৃথক দলের প্রাধান্য থাকায় ইহা এক সমস্যা রূপে দেখা দিয়াছিল। কেন্দ্রের নিকট হইতে রাজ্যগুলি যদি অধিক ক্ষমতা এবং অর্থ লাভ না করিতে পারে তাহা হইলে তাহারা নিজ নিজ কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করিতে পারে না। ফলে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যগুলির সম্পর্ক তিক্ত হইতে বাধ্য। চতুর্থ নির্বাচন

এই সমস্যাকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছিল। পূর্বে কেন্দ্রে ও রাজ্যে একটি দলের শাসন ক্ষমতা থাকায় ইহা কোন সমস্যারূপে দেখা যায় নাই।

বর্তমানে ঘাটতি রাজ্যগুলিকে তীব্র খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। খাদ্য সম্পর্কে একটি সর্বভারতীয় নীতি নির্ধারণ করেন কেন্দ্রীয় সরকার। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানির দায়িত্ব তাহার। ভারতবর্ষের খাদ্যনীতিই এই খাদ্য সমস্যার মূল কারণ। চতুর্থ নির্বাচনের পরেই ইহা স্পষ্ট হইয়াছিল। অনেক রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য আশাতীত কমিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ইহা যেমন হঠাৎ দেখা দিয়া দিয়াছিল আবার হঠাৎ তাহা তিরোহিত হইয়াছিল। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য আবার উচ্চমুখী হইয়াছিল। প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বহুবার বলিয়াছেন দেশে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য। চোরাকারবারী এবং মজুতদারেরা সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিটি জিনিসের মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ ইহাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করা সম্ভব নহে। তাহার আইনগত বাধা আছে আর সেই আইন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। জনসাধারণ অনেক আশা করিয়াই কুড়ি বছরের কংগ্রেসী কুশাসনের অবসান করিয়াছিল। তাহারা চোরাকারবারী আর জোতদারদের খপ্পরে পড়িতে চায় না। কিন্তু কেন্দ্রের চক্রান্তে অনেকগুলি রাজ্যেই অকংগ্রেসী সরকারের পতন ঘটিয়াছিল। রাজ্যের সমস্যাগুলি লইয়া একদিকে কেন্দ্র ফাট্‌কাবাজীর অনুরূপ কার্য করিয়াছে, অন্যদিকে দরিদ্রের প্রকৃত প্রতিনিধি নহে বলিয়া যাহাদের কথা বলা হইয়াছে তাহাদিগকে অর্থ ও পদ প্রভৃতির দ্বারা ক্রয় করিয়া কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গসহ অনেকগুলি রাজ্যের অকংগ্রেসী সরকারের পতন ঘটাইয়াছিল।

বর্তমানে পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের পর অকংগ্রেসী সরকারগুলির অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে। বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারসমূহে কংগ্রেস সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণ অনেক আশা লইয়াই চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে, অনেক রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার গঠনে সহায়তা করিয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিরোধী দলগুলি লইয়া গঠিত সরকার লজ্জাজনক দলাদলি লইয়া ব্যস্ত থাকায় তাহাদের আশা পূর্ণ হয় নাই। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারসমূহে একদলীয় শাসন-ব্যবস্থায়ও ভারত সুখ-সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে—এই আশাও জনগণ আর করে বলিয়া মনে হয় না।

পরিচয় ইহাই। কিন্তু সে যে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে, তাই সে আর নিজেকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে অসমর্থ। ক্ষুদ্রতম 'আমি'-ত্বের বন্ধন হইতে যে মানুষ একটুখানি আগাইয়াছে, তাহার সন্তুষ্টিও একটুখানি পিছাইয়া গিয়াছে। সে আর নিজের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকিতে অসমর্থ। পারপার্শ্বিক মানব, মানব-প্রকৃতি ও দৃষ্টির অতীত বিশ্বপ্রপঞ্চ সম্পর্কে তাহার কৌতূহল। আধুনিক মানুষ তাহার অতীতের যুগযুগের মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে জ্ঞান-বৃক্ষের ফলকে পরিপাক করিয়াছে পরিপূর্ণ ভাবে। তাই তাহার জ্ঞানস্পৃহা, তাহার কৌতূহল ধাবিত হয়—'Beyond the utmost bound of human knowledge'-এর দিকে। নিজের মধ্যে সে ত সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। বর্তমান-অতীত-ভবিষ্যতের মানুষের পরিপূর্ণ রূপ সম্পর্কে তাহার কৌতূহল। সেই কৌতূহলের একদিকের সামান্যতম পরিতৃপ্তি আসিতে পারে সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায়। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার মধ্য দিয়া অতীত মানুষের কর্মকাণ্ডের, চিন্তা-চেতনার, কল্পনা-ভাবনার বিবর্তনের অনুভূতি জন্মায়। এখানেই সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় আনন্দের স্বরূপ। 'অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যম্'—কিন্তু জীবন যে স্বল্পতম, শক্তি যে তদাপেক্ষাও স্বল্পতম, তাহাও আবার কর্মক্লান্তি ও কর্মচাঞ্চল্যে প্রয়োজনের ছুনিয়াতেই ব্যয়িত হইতেছে। তাই অনন্ত জ্ঞানের ক্ষুধা হইতে সামান্যতম পরোক্ষ অনুভূতিতেই পরিতৃপ্ত থাকিতে হয়। সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্য দিয়াই অতীত যুগের সাহিত্য রসাস্বাদনের ক্ষুধা মিটাইয়া আনন্দলাভ করিতে হয়। তাহার মধ্য দিয়াই মানুষের পরিপূর্ণ-রূপের অতীত বিবর্তনধারা সম্পর্কে সামান্যতম পরোক্ষ অনুভূতির আনন্দে পরিতৃপ্ত হইতে হয়। তাহা ছাড়া এই খণ্ডিত জীবনে উপায় নাই।

কলেজ গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের প্রয়োজন

মনে করা যাক একটি ছাত্র কোন ছাত্রাবাসে অবস্থান করিয়া কোন কলেজে পড়াশুনা করিতেছে। তাহার অভিভাবক ছাত্রাবাসে তাহার অবস্থান ও আহারের জন্য প্রতিমাসে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিতেছেন। ছাত্রাবাস হইতে সে যে খাদ্য পাইতেছে, তাহাতে তাহার শরীর ধারণ করিতে হইতেছে। কিন্তু

সেই প্রধান নির্দিষ্ট আহারেই তাহার চলিতে পারে না। তাহার রহিয়াছে বিচিত্র খাদ্যসম্ভার আস্বাদনের মানসিক ক্ষুধা এবং জলযোগের শারীরিক প্রয়োজন। এই উভয় প্রয়োজন মানুষ মাত্রেরই রহিয়াছে। বিচিত্র খাদ্যের আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের শরীরের পুষ্টি না ঘটাইলেও তৃপ্তিদান করে। ছাত্রের পক্ষে এই মানসিক তৃপ্তি তাহার পাঠাভ্যাসের এবং প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে তাহা তাহার কর্মপ্রেরণার অনুকূলেই যায়। অনুরূপ ভাবেই নির্দিষ্ট পাঠ্য-তালিকাবদ্ধ পুস্তকগুলির দ্বারা ছাত্রের জ্ঞানাকাঙ্ক্ষার বৈচিত্র্য ধর্ম পালিত হইতে পারে না। কেবলমাত্র পাঠক্রমের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া একপ্রকার অবসাদও ছাত্রগণের মধ্যে দেখা দেয়। তাই মানসিক সুস্থতার জন্য তাহার জলযোগেরই মতো তাহার পাঠক্রমের বাহিরে কিছু বাহিরের পুস্তক পাঠের প্রয়োজন রহিয়াছে।

ছাত্র মাত্রেই শিক্ষার্থী। মানবতার পরিপূর্ণতা তাহার শিক্ষাকালে ঘটে না—এই পরিপূর্ণতার জন্যই ছাত্রকে শিক্ষারূপ পরিচর্যার মধ্য দিয়া চলিতে হয়। এমন অবস্থায় তাহার বাহিরের কোন সাধারণ পাঠাগারের সাহায্য নেওয়া চলিবে না। কলেজের নিয়ন্ত্রণে যে সকল পুস্তক পাওয়া যাইবে তাহারই মধ্যে তাহাকে অতিরিক্ত জ্ঞানাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে হইবে। পাঠ ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত সাধারণ পাঠাগারে যদি সে প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহার পদস্খলনের সম্ভাবনা থাকিবে। কিন্তু কলেজ গ্রন্থাগারের শিক্ষাবিদ্‌গণের দ্বারা নির্দিষ্ট গ্রন্থের মধ্যে ছাত্রসমাজ তাহাদের বিচিত্র জানার বাসনার পরিতৃপ্তি ঘটাইতে পারিবে অথচ তাহাদের কিশোর মনে প্রবৃত্তির অবাঞ্ছিত আকর্ষণ দেখা দিবে না।

নির্দিষ্ট পাঠক্রমও সকল সময় নির্দিষ্ট কয়েকখানি পুস্তকের সাহায্যে লাভ করা সম্ভব হয় না। কলেজী শিক্ষা উচ্চশিক্ষা। একই বিষয়কে বিভিন্ন মনীষী বিচিত্র দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করেন। সকলের পক্ষে সকল পুস্তক ক্রয় করা সম্ভব নহে। আবার উচ্চতর কলেজী বিদ্যাশিক্ষার জন্য যে সকল পুস্তকের প্রয়োজন হয়, তাহা সকল সময় বাজারে ক্রয়যোগ্য অবস্থায় পাওয়াও যায় না। ঐসকল ক্ষেত্রে কলেজ গ্রন্থাগারের সাহায্য লইতেই হয়।

কলেজ গ্রন্থাগারের সহিত একটি পাঠাগারও সংযুক্ত থাকিতে হইবে। এমন বহু গ্রন্থ কলেজ গ্রন্থাগারে থাকে যাহা ছাত্রগণ গৃহে লইয়া যাইতে অনুমতি পায়

না, বা অনুমতি দেওয়াও যায় না। আবার বিভিন্ন বিষয় উচ্চতর মানের পত্র-পত্রিকাদিতে আলোচিত হয়। শিক্ষকগণের নির্দেশে ছাত্রগণ উহা পাঠাগারে বসিয়া আয়ত্ত করিবে। প্রয়োজন হইলে তাহা সংক্ষিপ্তাকারে লিখিয়া লইবে।

আজকাল কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে প্রায় সকল কলেজেই পাঠ্যপুস্তক-গ্রন্থাগার বা Text-Book-Library স্থাপিত হইয়াছে। ইহা কলেজ গ্রন্থাগারের একটি অংশ মাত্র। জাতীয় প্রয়োজনে শিক্ষাকে আজ আর সমাজের উচ্চমধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। মাত্র Text-Book Libraryর গ্রন্থগুলির সাহায্যেই দরিদ্র ছাত্রও কলেজে বসিয়া তাহার পাঠ্য-বিষয় আয়ত্ত করিয়া উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে পারে। তাহা ছাড়া এখানে একই বিষয়ে বহু গ্রন্থকারের বহুতর গ্রন্থ থাকে। কলেজের পরিণত ছাত্রগণ নির্দিষ্ট পাঠক্রমকে একাধিক অতিরিক্ত গ্রন্থের সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে ও পরিপূর্ণ রূপে সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারে।

পূর্বে আমাদের দেশে অনেক কলেজে কলেজ-গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালনার জন্ম যথোপযুক্ত পরিচালন যন্ত্রের একান্ত অভাব ছিল। হয়ত বা অনেক ক্ষেত্রে একজন অধ্যাপককে তাঁহার অধ্যাপনার অতিরিক্ত এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইত। বর্তমানে সেই পুরাতন প্রথা আর নাই। একজন গ্রন্থাগার পরিচালন-ব্যাপারে বিশেষভাবে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে কলেজ-গ্রন্থাগার ও পাঠাগার বর্তমানে চালিত হয়। ঐ গ্রন্থাগারিকের অধীনে কতিপয় কর্মচারীও গ্রন্থাগারের কর্মে নিযুক্ত থাকেন। নির্দিষ্ট 'কাউণ্টার' হইতে ছাত্রগণ পুস্তক গ্রহণ করে ও পাঠাগারে বা গৃহে ঐ গ্রন্থ লইয়া তাহা কাজে লাগায়। পূর্ব ব্যবস্থায় কলেজ গ্রন্থাগারে গ্রন্থের সংখ্যা, তালিকা ও আদান প্রদান রীতি কিছুই বিজ্ঞানসম্মতভাবে হইত না। ইহার ফলে অনেক গ্রন্থই অনেক সময় হারাইয়া যাইত বা নষ্ট হইত। কিন্তু বর্তমানে উপরোক্ত পরিচালন-ব্যবস্থা গ্রহণ করায় আর বড় একটা অনুরূপ ঘটনা ঘটে না।

উচ্চতর কলেজী শিক্ষায় পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট বিশেষিত জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা আছে। ইহাকে বলা হয় অনার্স পাঠক্রম। অনার্স পঠন-পাঠন এবং স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা যে-সকল কলেজে থাকিবে সেখানে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ও ছাত্রগণের জন্ম তাহার সম্যক্ ব্যবহারের ব্যবস্থা না থাকিলে কোন শিক্ষাই সম্ভব হয় না। অনার্স ও স্নাতকোত্তর শিক্ষায়

বিরাট বিভূতি ও ব্যাপ্তি কোন ক্রমেই কোন ছাত্রের পক্ষে সকল পুস্তক ক্রয় করিয়া আয়ত্ত করা সম্ভব হইতে পারে না। আর সকল পুস্তক সকল সময়ে পাওয়াও যায় না।

কলেজ গ্রন্থাগারের সুমহান দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তমানে আমাদের দেশের জনসাধারণ ও সরকার বুঝিতে পারিতেছেন এবং তাহার ব্যবস্থাও হইতেছে। ইহা খুবই সুখের বিষয়। কিন্তু তাহার অপব্যবহার নিবারিত করিবার জন্য ছাত্র সমাজকেও এ বিষয়ে দায়িত্বশীল হইতে হইবে।

মানবতার মূল্য ও জীবনের বৈষয়িক উন্নতি

মানুষের পরিচয় সম্বন্ধে একটা উক্তি প্রচলিত আছে যে, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সামাজিকতা ও সামাজিক কর্তব্যবোধেই মানুষের মানবতা তথা অন্য জীব হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য। সমাজবদ্ধতা দাবি করে স্নেহ-প্রেম, দয়া-মায়া—মানুষের জন্য মানুষের অনুভূতি। মানুষের এই সকল বৃত্তিই তাহাকে সামাজিক করিয়াছে। পশু তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সংরক্ষণেই ব্যস্ত। তাহার কোন সামাজিক দায়িত্ব নাই। কিন্তু জীব হিসাবে মানুষের মধ্যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সংরক্ষণের প্রয়োজন কোন সময়েই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। বরং ঐ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সংরক্ষণের প্রবৃত্তি একদিকে মার্জিত ও অপরদিকে কৌশলপূর্ণ হইয়া বৈষয়িকতা রূপে সামাজিক ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশমান হইল। এখন এই উভয়বিধ বিপরীত প্রবণতার মধ্যে মানুষের জীবনাচরণ চলিতেছে। এই বিপরীত-প্রবণতা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বর্তমান।

মানব সমাজের সৃষ্টি হইতে আজ পর্যন্ত তাহার ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে—সমাজরূপের যুগে যুগে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যুগে যুগে মানুষ তাহার সামাজিক সঙ্ঘবদ্ধতার ন্যায়-নীতি ও মানব-ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটাইয়া নূতন সমাজব্যবস্থার পত্তন করিয়াছে। কিন্তু দেহীর দেহে যেমন শৈশব-কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্য রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে সামাজিকের সমাজে। কোন সমাজ-পদ্ধতি যখনই পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তখনই তাহার বুকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে প্রভুত্বকামনা। প্রভুত্বের কামনা লইয়া, তাহার ভোগের বাসনা লইয়া

অপরের ভোগের অধিকারকে সে গ্রাস করিয়াছে। তাহার প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া সমাজপতি সামাজিকের প্রতি অন্যায়ে রত হইয়াছে। আবার একের প্রতিষ্ঠা অপরকে প্রতিষ্ঠায় প্রলোভিত করিয়া অন্যায় কৌশলের মাধ্যমে বিষয়কে করায়ত্ত করিতে প্ররোচিত করিয়াছে। এইভাবেই সমাজ চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু বৈষয়িক উন্নতি একেবারে না হইলেও চলে না; বিষয় না হইলে সমাজের বুকে বাঁচিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়াও বটে, আবার সমাজের মধ্যে পাঁচজনের একজন হইবার আকাঙ্ক্ষাতেও বটে, বিষয়-সম্পদ সংগ্রহ করিতে হয়। আমাদের বর্তমান শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে বিষয় না হইলে ব্যক্তির প্রতিভারও প্রকাশ ঘটিতে পারে না। আবার, যে মানবিকতার জন্য বিষয়কে মূল্যহীন ভাবি, সেই মানবিকতার প্রকাশ ঘটাইতে হইলেও এই শ্রেণী সমাজে বিষয়-সম্পদের প্রয়োজন। তাই মানুষের মধ্যে বৈষয়িক উন্নতির পিছনে ছুটিবার প্রবণতা দেখা দিবেই। যাহার সম্পদ রহিয়াছে, সে নিজের পাপাচারকে সহজেই গোপন করিতে পারে। প্রভুত্বকামীর বিরুদ্ধে শক্তির প্রয়োগ ঘটাইতে মানুষ ভয় পায়।

তবে কি মানবতার কোন মূল্য নাই? প্রভুত্বের কামনায়, প্রতিষ্ঠার কামনায় নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের কামনায় মানুষ যদি নিরন্তর মানবতাকে অবমাননা ও হনন করিতে থাকে তাহা হইলে পরস্পরের অনাচারের হানাহানিতে সমগ্র মানবসমাজ যে আবার পশুত্বের পর্যায়ে ফিরিয়া যাইবে, নতুবা ধ্বংস হইতে বসিবে। তবে অনাচারী ধার্তরাষ্ট্রগণই কি এই পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করিতে থাকিবে? মানবতার কি কোন ভবিষ্যৎই নাই? এই সকল প্রশ্নে যখন মানুষ মানবতার ভবিষ্যৎ সম্পকে আশাহীন হইয়া পড়ে, তখন তাহার কর্ণে সমাজেতিহাসের শিক্ষাই আশা দান করিতে পারে; সমাজেতিহাসের শিক্ষাই মনুসংহিতায় ভাষা পাইয়াছে নিম্নরূপে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

অন্যায়ের মাধ্যমে অমানবিক কৌশল আশ্রয় করিলে বৈষয়িক উন্নতি ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহার স্থায়িত্ব কয় দিনের! সার্বিক ধ্বংসের দিকেই ঐ বৈষয়িক উন্নতি ব্যক্তিকে বা জাতিকে লইয়া যায়।

মানুষের জন্য সমাজ। মনুষ্য-সমাজে একের উন্নতি যখন অপরকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহাকে কোন মতেই উন্নতি বলা চলিবে না। আবার মানুষের জন্যই মানুষের বিষয়সম্পদ। কাজেই মানবতার স্থান যে সর্বোচ্চ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মানবতার বিনিময়ে যে বৈষয়িক উন্নতি, তাহার হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে প্রলুব্ধ হইলে চলিবে না। যে অনাচারী তাহার সাধনায় রত হইবে তাহার চরম বিনষ্টি ঘটিবে। যে সেই সাময়িকতার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া ঐ অনাচারীর পথে ধাবিত হইবে বা তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবে সেও অগ্নির প্রতি ধাবিত পতঙ্গেরই মত বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

মানুষের গড়া সমাজ। মানবিকতা তাহার প্রয়োজনের দাবিরই স্বীকৃতি। যুগে যুগে অনাচারী প্রভুত্বকামিগণ ইহাকে কলুষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ মানব তাহার প্রতিকারে, মানবিকতার সংরক্ষণে কৃতসঙ্কল্প। তাই সর্বপ্রযত্নে মানবতার মূল্যকে স্বীকৃতি দিতেই হইবে। বৈষয়িক উন্নতি যদি মনুষ্যত্বের বিনিময়ে হয় তবে তাহাকে কোন মতেই গ্রহণ করা চলিবে না। ইহাকেও এক প্রকারের বৈষয়িক চেতনারূপেই দেখিতে হইবে। মনেবতার মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়া যে বৈষয়িক উন্নতি, তাহার পরিণাম চরম বিনষ্টি।

শিক্ষা-বিস্তারে ছায়াচিত্রের উপযোগিতা

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৭]

চিত্তবিনোদনে চলচ্চিত্রের উপযোগিতা আজ অনস্বীকার্য। চলচ্চিত্র শিল্প আজ রঙ্গালয়কে কোণঠাসা করিয়া ফেলিয়াছে। অভিনেতৃবৃন্দের একবারের মাত্র অভিনয়কে যন্ত্রসাহায্যে ধরিয়া রাখিতে পারিলে একই চলচ্চিত্রের প্রদর্শনে যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের চিত্তবিনোদন চলিতে পারে। সচল চিত্রের মুখের কথাটি পর্যন্ত যখন যন্ত্র ধরিয়া রাখে তখনই তাহা হয় পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র। বিজ্ঞানের সহায়তায় ছবির মাধ্যমে অভিনয় প্রদর্শন আজ চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকগণ করিতেছেন এবং আমরা চলচ্চিত্ররূপে তাহাকেই দেখিতেছি। ইহার প্রথম স্তরই ছায়াচিত্র। ছায়াচিত্রের যুগে চিত্রগুলির সচলতাও ছিল না, বাক্‌শক্তিও ছিল না। আলোক-সম্পাতের দ্বারা পর্দায়

উপর মানুষের একটি বিশেষ অভিব্যক্তি সম্পন্ন চিত্রের ছায়া ফেলা হইত। তাহা দেখিয়াই সে-দিন মানুষ আনন্দ লাভ করিয়াছে। তাহার পর দ্বিতীয় স্তরে বিজ্ঞান ঐ চিত্রগুলিকে সচল করিল। চিত্রে যখন মানুষের জীবনাচরণের অভিব্যক্তি চলিত, তখন বাহির হইতে কেহ ঐ চিত্রগুলির বক্তব্য সংক্ষেপে বলিয়া দিত এবং মানুষ তাহাতেই আনন্দলাভ করিত। তৃতীয় স্তরে আসিল সবাক্-সচল চিত্র। ইহাই আজিকার সিনেমা বা চলচ্চিত্র।

আজকাল ইংলণ্ডে British Film Institute, London Film School, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান শিক্ষার কাজে চলচ্চিত্রকে ব্যবহারের জন্য নানা শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রস্তুত করিতেছে। এই যখন অবস্থা 'তখন ছায়াচিত্রকে যে শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহাতে কোন সংশয় নাই। ঐ সকল প্রতিষ্ঠান প্রকৃতি-বিজ্ঞান জীববিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত ও গবেষিত নব নব জ্ঞান চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

কিন্তু শিক্ষকের নিকট প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা গ্রহণের সময় ছাত্রগণ শিক্ষকের নিকট সান্নিধ্যে যাহা পায় তাহা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না। শিক্ষাকে চলচ্চিত্র-নির্ভর করিলে তাহা একান্তভাবে খণ্ডিত হইয়া পড়ে। শিক্ষাকে এইভাবে যান্ত্রিক ব্যাপার করিয়া তুলিলে তাহা সার্বিক মঙ্গলের কারণ হইতে পারে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের উপযোগিতা সীমাবদ্ধ হইলেও, ছায়াচিত্রের ব্যাপক প্রয়োগ বিশেষভাবে বিজ্ঞানশিক্ষার সহায়কই হইবে। বিজ্ঞানশিক্ষার 'ক্ষেত্রে, ছাত্রকে গবেষণাগারে হাতে-কলমে অধীত বিদ্যার প্রয়োগ শিক্ষা করিতে হয়। গবেষণাগারে তাহার কাজগুলিকে যদি শিক্ষক বা অধ্যাপক মহাশয় সাধারণ ক্লাসের বক্তৃতার সময় ছায়াচিত্রের সাহায্যে ব্যাপারটি ছাত্রের দৃষ্টিগোচর করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে ইহা ছাত্রের হৃদয়ের সহিত গ্রথিত হইয়া যাইবে। বিজ্ঞানের যে-কোন শাখার শিক্ষাদান ব্যাপারে ছায়াচিত্রের প্রয়োগ হইতে পারে। শারীরবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে তো কথাই নাই—নৃবিদ্যা, প্রাচীন জীবতত্ত্ব, ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে যে-সকল ক্ষেত্রে মাটির মডেল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, সে-সকল

ক্ষেত্রে অনায়াসেই ছায়াচিত্রের ব্যবহার হইতে পারে। ইহাতে যন্ত্রের ব্যবহার অপেক্ষা খরচও কম পড়ে।

যন্ত্রবিদ্যা ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে তো ইহার প্রয়োগে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। যাহাকে খড়িমাটি ও ছবির সাহায্যে প্রাণহীন ভাবে পরিবেশন করিতে হইতেছে, সেই শিক্ষাকেই ছায়াচিত্রের মাধ্যমে প্রাণবন্ত করিয়া তোলা যায়। পরিসংখ্যান বিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞানের শিক্ষা-ব্যাপারে তালিকা ও table প্রয়োজন হয়। এইগুলি ছায়াচিত্রের মাধ্যমে ছাত্রগণকে দেখাইয়া শিক্ষক-মহাশয় বক্তৃতা করিতে পারেন। ইহাতে ঐগুলি সংরক্ষণও সহজতর হয়।

মানবিক বিদ্যাগুলির চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রেও আজকাল ছায়াচিত্রের প্রয়োগ হইতেছে। পুরাতন পাণ্ডুলিপি আলোকচিত্রের মাধ্যমে গ্রহণ ও ধারণ করার প্রথা বেশ কিছুদিন চলিতেছে। বহু গবেষকের ব্যবহারে তাহাও অনেক সময় অব্যবহার্য হইতে দেখা যাইতেছে। তাই আজকাল বড় বড় গ্রন্থাগারে পুরাতন পাণ্ডুলিপি, এমনকি অতি পুরাতন পত্রিকাদি পর্যন্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ছায়াচিত্রে প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইতেছে।

রোগ-নিরাময়ের জন্য জনশিক্ষার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র ব্যবহারের ফল ভালই হইতেছে। চলচ্চিত্রের মধ্যদিয়া জনমনে রোগের বিষময় ফল গাঁথিয়া দেওয়া চলে; গাঁথিয়া দেওয়া চলে তাহাদের প্রতিকারের পথ ও নিরাময় পদ্ধতি। মোটকথা, চলচ্চিত্র ও ছায়াচিত্রকে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগে সুফলই পাওয়া যায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশবাসী ও সরকার এই ব্যাপারে পরিপূর্ণ মাত্রায় সচেতন ও সচেষ্ট নহেন। ছায়াচিত্র ও ক্ষেত্র বিশেষে চলচ্চিত্রকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইলে বর্তমানে সরকারকেই অগ্রণী হইতে হইবে; সরকারের শিক্ষা-বিভাগকে এই কাজ উৎসাহ দিতে হইবে। ইহাতে শিক্ষা ব্যাপারটা অধিক আনন্দের হইয়া উঠিবে।

ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ব্যাঙ্ক এবং ঋণ-ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। একদিকে প্রয়োজন ঋণ-ব্যবস্থার চলনশীলতা ও শিল্পোন্নতি এবং ব্যবসায় প্রসারের জন্য যে সংযোগ ব্যবস্থা, তাহার প্রসার ঘটান—অপর দিকে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের অন্যতম কার্য হিসাবে প্রয়োজন সামাজিক প্রয়োজনে ঋণ-ব্যবস্থার সুনিয়ন্ত্রণ। কিন্তু

নিয়ন্ত্রণাধিক্য ঘটিলে অত্যন্ত ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে কার্য-সম্পাদন অনেক সময়েই প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে অক্ষম হয়। আবার যদি নিয়ন্ত্রণের অভাব একান্ত ঘটে তাহা হইলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা অসাধু ব্যবসায়িগণের আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়ায়।

এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা জাতীয়করণের দাবি বহুদিন হইতেই উঠিয়াছে। কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে বলেন, মূল্যস্তর ঠিক রাখিবার জন্যই ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা প্রয়োজন। আবার অনেকের মতে ধনের সুষম বণ্টন ব্যবস্থাকে একটি কার্যকরী রূপ দিবার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রের আওতায় আনিতে হইবে। আধুনিক কালে আমাদের দেশে সাধারণভাবে ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন-ব্যবস্থা বড় বড় শিল্পপতিগণের হাতে আসিয়া পড়ায় ক্ষুদ্র ও মধ্য শ্রেণীর শিল্পের প্রয়োজনে ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যবহার করা যাইতেছে না-বলিয়া সাধারণভাবে অভিযোগ করা হইতেছে। ঐ সকল বড় বড় শিল্পপতিগণ ব্যাঙ্কব্যবস্থা নিজেদের কল্যাণেই ব্যবহার করিতেছেন। ফলে—কৃষি, সমবায় হইতে রপ্তানি বাণিজ্য পর্যন্ত কোন ব্যাপারেই ব্যাঙ্কগুলি হইতে সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না। এমনি অবস্থায় ব্যাঙ্ক পরিচালন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটা কিছু করিবার কথা সকলেই ভাবিতেছিলেন। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসদলের মধ্যেও এই ভাবনা দেখা দেওয়ায় ১৯৬'-র দশদফা কর্মসূচীর মধ্যে ইহার উল্লেখ করা হইল এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা জাতীয়করণের পার্থক্য, কোথায় তাহা আলোচনা করা দরকার। জাতীয়করণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সকল ব্যাঙ্কের মালিক হইয়া পড়ে। আরো পাঁচটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বা উদ্যোগের মতোই বিভাগীয় কর্মচারিগণ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত কোন পর্ষদের দ্বারা ব্যাঙ্কব্যবসা সেক্ষেত্রে পরিচালিত হইত। কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্রণে তাহা হইল না। ব্যাঙ্কের মালিকানার কোন প্রকারভেদ সমাজিক নিয়ন্ত্রণে বোঝায় না। তবে ইহার ফলে পরিচালনা ও কর্মবিধি ব্যাপারে সরকারের নির্দিষ্ট পথেই ব্যাঙ্কগুলিকে চলিতে হইবে।

ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা হিসাবে তৎকালীন

উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ১৯৬৭-র ১৪ই ডিসেম্বর লোকসভায় একটি খসড়া পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ব্যাঙ্কগুলিকে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আওতায় আনা স্থির হয়। বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলিও ইহার আওতা হইতে বাদ পড়িবে না। তবে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন-সংস্থায় যে পরিবর্তন আনা হইবে, তাহা বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প-সমবায় ও বহির্বাণিজ্য—এই তিন ক্ষেত্র হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন সমিতিকে গ্রহণ করিতে হইবে। পরিচালন-সমিতির সভাপতিকে অবশ্যই পুরা সময়ের ব্যাঙ্কার হইতে হইবে।

উপ-প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি জাতীয় দাদন পরিষদ গঠন করা স্থির হয়। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর পদাধিকার বলে জাতীয় দাদন পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি রূপে কাজ করিবেন। ঋণ-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও ঋণদান ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই পরিষদই করিবে। এই পরিষদের সিদ্ধান্ত যদি কোন ব্যাঙ্ক অমান্য করে তবে তাহাকে জাতীয়করণ করা হইবে বলিয়া প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় বলা হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণভাবে বর্তমান অবস্থায় সরকার ব্যাঙ্ক-ব্যাবসা জাতীয়করণের বিষয় চিন্তা করিতেছেন না।

ব্যাঙ্ক ব্যবসার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নামে আরো যে একটা ব্যবস্থা চালু করিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং শিল্পপতি-গণের পক্ষে লাভজনক। ব্যাঙ্কের মালিকানা শিল্পপতিগণেরই থাকিতেছে। স্বভাবত তাহারা কর্মচারিগণের ন্যায়সঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করে। ভারতের শিল্পপতিগণ এবং তাহাদের প্রভাবে ও নিয়ন্ত্রণে সরকার বর্তমানে অটোমেশন চালু করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। ইহার বিষময় পরিণামের বিষয় চিন্তা করিয়া দেশের শ্রমিক-কর্মচারিগণ ইহাতে বাধা দিতেছেন। এমন অবস্থায় সরকারের তথাকথিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে অটোমেশন চালু করিবার ও কর্মচারিগণের ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকার খর্ব করিবার চেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

ক্ষুদ্রশিল্প, কৃষি, সমবায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি সাহায্য করিতেছে—একথা সর্বাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখা যায়

যে, ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে ঐ সকল ব্যাপারে বরাদ্দকৃত ১৫০ কোটি টাকার মাত্র ৫৭% ভাগ ব্যয়িত হইয়াছিল। এমন অবস্থায় বলা চলিতে পারে যে ক্ষুদ্র শিল্প, কৃষি প্রভৃতি নয়, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়া বৃহৎ পুঁজিপতিগণের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সংরক্ষণ ও মধ্যস্তরের পুঁজিপতির ঋণের ব্যবস্থা করাই সরকারের লক্ষ্য।

এই ব্যাবস্থার আরো একটি ক্ষতিকর দিক রহিয়াছে। পরিচালন ব্যবস্থায় নূতন প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ করিয়া দিয়া সরকার পুরাতন ব্যাঙ্কারগণের অভিজ্ঞতা হইতে এই ব্যবসাকে বঞ্চিত করিতেছেন। ইহার ফল শুভ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ইহাকে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা জাতীয়করণের প্রথম ধাপ বলিয়া চালানো হইতেছে। কিন্তু বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়া বৃহৎ শিল্প সম্প্রসারণে সরকারী উদ্যোগের প্রসার ঘটিতেছে। একচেটিয়া পুঁজিপতির সহিত মধ্যস্তরের পুঁজিপতির যে সংঘাত তাহাতে সরকার মধ্যস্তরের পুঁজিপতির জন্য কিছু সুযোগ করিয়া দিতে সচেষ্ট হইতেছেন মাত্র। ইহার ফলে ঐ সংঘাতের তীব্রতা হ্রাস পাইবে। তাহাতে বৃহৎ শিল্পপতিগণের শক্তি সংরক্ষণই ঘটিবে, তাহাদের পুঁজিবৃদ্ধির পথ বাধামুক্ত হইবে।

ভ্রমণ ও শিক্ষা

আজিকার দিনের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভ্রমণ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। ভূগোল-ইতিহাস-বিজ্ঞান পাঠ করিয়া যাহা জানা যায়, ভ্রমণের মাধ্যমে সেই সব বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। তথ্য ও বাস্তব জ্ঞানের মিলনেই শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ হয়।

জ্ঞান পিপাসা মনুষের স্বভাবজাত ধর্ম। তাই যুগে যুগে মানুষ নূতনের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। বর্তমান বিশ্বে মানুষের জ্ঞান শুধু বইয়ের পাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকিতেছে না। বইয়ের পাতার শিক্ষাকে তাহারা বাস্তবের সঙ্গে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। তাই দেখা যায় বিশ্বের মানুষ দিকে দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। ভ্রমণের মাধ্যমেই দূরের মানুষ কাছে আসিতেছে। বিশ্বের মানব-সমাজের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়িয়া উঠিতেছে।

মানুষ বৈচিত্র্য ভালবাসে। সে একই জায়গায় আবদ্ধ থাকিয়া জীবন-যাপন করিতে চাহে না। বন হইতে বনান্তরে বিচরণের মধ্য দিয়াই সে খুঁজিয়া পায় অপার আনন্দ, খুঁজিয়া পায় মুক্তির স্বাদ। মানুষের চির-ক্ষুধিত মনও এক জায়গায় আবদ্ধ থকিতে চাহে না। তাই সে সুদূরের আহ্বানে নূতনের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে। ভ্রমণের এই নেশা, নূতনকে জানিবার এই আনন্দ মানুষকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত চঞ্চল করিয়া রাখে। এই নেশা কোন দিনই স্তব্ধ হইবার নহে। একটি নূতন আবিষ্কারের পর সে আর একটির সন্ধানে ছুটিয়া চলে। এক জায়গা ভ্রমণ শেষে সে যখন ঘরে আসিয়া বসে, তখনই তাহার ক্ষুধিত মন বলিয়া ওঠে—চরৈবেতি—আগাইয়া চলো। তাই আজীবন বিশ্বের সমস্ত প্রান্তর পরিভ্রমণ করিয়াও শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথকে বলিতে শুনি—'বিপুলা এই পৃথিবীর কতটুকু জানি।'

ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন দেশের আচার-ব্যবহার, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। বিভিন্ন দেশের শিল্প ও সাহিত্য, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য তাহার জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। ভ্রমণের মাধ্যমে সে অন্য দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা, জীবনযাত্রা প্রণালী প্রভৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইতে পারে।

বর্তমানে যে বিশ্বের মানুষ সমস্ত বিশ্বকে একজাতি একরাষ্ট্র বলিয়া ভাবিতেছে তাহাও সার্থক হইতে পারে ভ্রমণের মাধ্যমে। ভ্রমণ এক দেশের মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের ভাব ও ভাষার মিলন ঘটাইতে সহায়তা করে। ভ্রমণের মাধ্যমেই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত হয়, তাহার মন উদার হয় এবং পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়া তাহার জ্ঞান যুক্তি-তর্ক ও বাস্তবের সমন্বয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

ভ্রমণ মানুষকে শুধু নূতন নূতন বিষয়ে শিক্ষাই দেয় না, ভ্রমণের মাধ্যমে সে পায় অনাবিল আনন্দ উপভোগের উপকরণ। তাহাতে মানুষের শারীরিক ও আত্মিক উন্নতি ঘটে। মানুষ লাভ করে সুস্থ মন ও সবল দেহ। বিপুলা এই পৃথিবী দিকে দিকে প্রকৃতিকে নব নব সাজে সাজাইয়া রাখিয়াছে। হিমালয় ডাকে নূতন সৌন্দর্যের ডালি সাজাইয়া, সমুদ্র ডাকে অসীমের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করিবার জন্য। বন-জঙ্গল ডাকে আদিমতার সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র-আবিষ্কারের

তাগিদে। এমনই ভাবে মানুষ সীমিত জীবনে অসীমের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করিয়া মানব জীবনকে সার্থক করে।

পর্যটনে বাহির হইয়া কত দুঃসাহসী জীবন :পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছে। এই আনন্দকে কখনই ছোট করিয়া দেখা ঠিক হইবে না। আজ পর্যন্ত কত দুঃসাহসী এভারেস্ট অভিযানে নিজেদের জীবনকে শেষ করিয়া দিয়াছে। মেরু রহস্য একবার মাত্র দেখিয়া মন তৃপ্তিলাভ করে নাই। তাই পুনঃ পুনঃ মেরু যাত্রা করিয়া তাহাতেই প্রাণ বিসর্জন দিলেন স্যার আরনেস্ট হেনরী স্যাকলটন। সেই সুদূর অতীতেই মার্কোপোলোর দৌত্যকার্যে চীন যাত্রা কি শুধু রাজকীয় কর্তব্য পালন? তিনি ইহাকে বাছিয়া লইয়াছিলেন জীবনে আনন্দ সম্ভোগের উপায় ও উপকরণ হিসাবে। প্রকৃতি তাহার নানা মোহিনী রূপের পাখা বিস্তার করিয়া পৃথিবীর নানা প্রত্যন্তে নানারূপে বিরাজ করিতেছে। তাহাকে না জানিতে পারিলে যে জীবনের জানা শেষ হয় না, জীবনের শিক্ষা শেষ হয় না।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের বাঙালী জীবন গৃহ-গণ্ডিবেষ্টিত, পরিজন লালিত। বাঙালী জীবনাচরণ পদ্ধতির এই Traditionকে আজ সর্বতোভাবে আঘাত করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। তাইতো রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গ জননী'র কাছে আবেদন করিয়াছেন—'সাত কোটি সন্তান'কে 'বাঙালী' করিয়া না রাখিয়া 'গৃহহীন লক্ষ্মীছাড়া' করিয়া দিতে। বাঙালী জীবনে এই স্থবিরতার গ্লানি কোন মতেই আজ সহ্য করা চলিবে না। ইহার মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, প্রজ্ঞা ও প্রতিষ্ঠা কি আছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু জীবনের উল্লাস ও চাঞ্চল্যের একান্তই এখানে অভাব। বন-প্রান্তর, মরু-মেরু, গহন সাগর, চঞ্চল নদীমালার মধ্যে আজ জীবনের উল্লাসকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে।

স্কুল-কলেজে বিতর্কসভার প্রয়োজনীয়তা

[ক. বি. পার্ট. ওয়ান, ১৯৬৭]

ছাত্রজীবন মানুষের প্রস্তুতির জীবন। এই প্রস্তুতি শুধুমাত্র স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক পঠন-পাঠনের মাধ্যমেই সম্পূর্ণ হয় না। পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত নানা বিষয়ে পড়াশুনা এবং যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নিজেদের জীবনে সেগুলিকে কাজে

লাগাইলেই জ্ঞানের পরিধির বিস্তার ঘটে। ছাত্রসমাজে জ্ঞান ভাণ্ডারের বিস্তৃতি এবং মানসিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিতর্কসভা এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বিতর্কসভার মাধ্যমে বিতর্কমূলক এবং সমস্যামূলক নানা বিষয়ে আলোচনা হইয়া থাকে। দুই ভাবে এই বিতর্কের আয়োজন করা হয়। প্রথমতঃ, কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় পূর্বেই জানাইয়া দেওয়া হয় এবং ছাত্রগণ সেই বিষয়ে পড়াশুনা করিয়া নানাভাবে নিজেদের প্রস্তুত করিয়া বিতর্কসভায় উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় ভাবে বিতর্কসভার আয়োজন হইতে পারে কোন নির্দিষ্ট বিষয় পূর্ব হইতেই জানাইয়া না দিয়া। সভায় উপস্থিত হইলে যাহাকে যে বিষয়ে বলা হয় সেই বিষয়ের উপরেই তাহার বক্তব্য উপস্থিত করিতে হয় নানা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে। সুতরাং এই সভায় অংশ গ্রহণ করিতে হইলে বিভিন্ন সমস্যামূলক বিষয়ে বিশেষভাবে পড়াশুনা করিতে হয়।

বিতর্ক সভাকক্ষকে বলা হয় 'হাউস'। এখানে প্রথমে প্রস্তাবক কোন বিষয়ে তাহার প্রস্তাবকে নানা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে উপস্থিত করে। তারপর তাহার প্রস্তাবের সপক্ষে এবং বিপক্ষে বিতর্ক চলিতে থাকে। উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বুঝানো যাইতে পারে। মনে করি, "হিন্দী ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত নয়" বা "মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা উচিত" প্রভৃতির একটি বিষয়ে বিতর্কসভা ডাকা হইয়াছে।

এই দুইটি বিষয়ের সপক্ষে ও বিপক্ষে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করিতে পারে। বিতর্ক সভার জন্য সাধারণতঃ দুইটি দলের প্রয়োজন। একদল থাকে প্রস্তাবের সমর্থক এবং অপর দল প্রস্তাবের বিরোধী। ইহাদের বক্তৃতার সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করিতে হয়। মূল প্রস্তাবক অবশ্য কিছু বেশী সময় পাইয়া থাকে। পক্ষ বিপক্ষের সমস্ত বক্তৃতার শেষে সভার পরিচালক বিতর্কের ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে বিষয়টি লইয়া আলোচনা করেন এবং তারপর 'হাউসে'র মতামতে ঠিক হয় কোন্ দল যুক্তিপূর্ণ অবতারণা করিতে পারিয়াছে এবং জয়লাভ করিয়াছে।

উদাহরণ প্রভৃতির সাহায্যে যে অন্যের যুক্তি খণ্ডন এবং নিজের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে তাহার বক্তব্যই জোরালো হয় এবং সে ভাল বক্তা হিসাবে প্রশংসা অর্জন করিয়া থাকে। বক্তার বক্তব্য বিষয়ে স্বচ্ছ জ্ঞান থাকা

বাঞ্ছনীয়। বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের নিষ্ঠাবান এবং ধৈর্যশীল হইতে হইবে। কোন রকমেই তাহাকে উত্তেজিত হইলে চলিবে না। তাহার বক্তব্য হইবে সংক্ষিপ্ত কিন্তু যুক্তিপূর্ণ।

পূর্বেই বলিয়াছি স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মন এবং চরিত্র গঠনে বিতর্কসভা এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহার মাধ্যমে ছাত্রদের চিন্তাশক্তি, উপস্থাপন পদ্ধতি এবং যুক্তিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্বের নানা ঘটনাপ্রবাহ এবং সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। বিতর্ক সভায় যাহারা শুধু বিতর্কে অংশগ্রহণ করে তাহারাই যে লাভবান হয় তাহা নহে, যাহারা শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকে তাহারাও বক্তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে সেই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।

বিতর্কসভার মাধ্যমেই ছাত্ররা বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করে এবং উত্তর জীবনে জনসাধারণের কাছে ভাল বক্তা হিসাবে সুনাম পাইয়া থাকে। প্রথমেই সহস্রাধিক লোকের সভায় কেহ বক্তৃতা করিতে উঠিলে সে ঘাবড়াইয়া যাইবে এবং তাহার বক্তব্য সে রাখিতে পারিবে না। স্কুল-কলেজের বিতর্কসভা সীমায়িত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং এখানে শ্রোতা হিসাবে সাধারণতঃ পরিচিত ছাত্রবন্ধুরাই উপস্থিত থাকে। সুতরাং ছাত্রদের এখান হইতে ভালভাবে বক্তৃতা করিবার অভ্যাস হইলে পরবর্তী জীবনে সে বক্তা হিসাবে সুনাম অর্জন করে।

স্কুল-কলেজে বিতর্কসভার বিষয় নির্বাচনে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা হয় যাহাতে সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ছাত্রসমাজ লাভবান হইতে পারে। স্কুলের ছাত্রদের বয়স কম এবং তাহাদের জ্ঞানের পরিধিও থাকে অল্প। সুতরাং বিষয় নির্বাচনের সময় তাহাদের বয়স ও বুদ্ধির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ বিষয় নির্বাচনই শ্রেয়। কিন্তু কলেজের বা বিশ্ববিত্তালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা সমস্যা সম্পর্কে তাহাদের ওয়াকিবহাল থাকিতে হয়। সুতরাং তাহাদের বিতর্কের বিষয়বস্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের মেজাজ সব

সময় ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। এখানে কোন বিষয়ের উপর বিতর্ক হইবে কিন্তু ঝগড়া হইবে না। এখানে যুক্তি থাকিবে কিন্তু অস্থিরতা থাকিবে না। এখানে আক্রমণ থাকিবে, কিন্তু সে আক্রমণের অস্ত্র যুক্তি, অন্য কিছু নহে। কোন বিষয়ে বিতর্ক করিতে উঠিয়া যদি ছাত্রদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং তাহা কলহের রূপ গ্রহণ করে, তবে তাহা ছাত্র সমাজের উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী করিবে। সুতরাং বিতর্কসভার সার্থকতা নির্ভর করে ছাত্রদের ধৈর্যধারণ করিয়া যুক্তির মাধ্যমে বিপক্ষকে আক্রমণ করায়। বিতর্কে রত প্রতিটি পক্ষ এবং প্রতিটি ছাত্রকে দৃঢ় ধৈর্যে, অকম্পিত কণ্ঠে, বিদ্বেষ ও অসূয়াশূন্য চিত্তে নিজের বক্তব্যকে সভার সম্মুখে প্রতিষ্ঠা দান করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে।

বিতর্কসভার সর্বাপেক্ষা বড় উপযোগিতা উপস্থিত বুদ্ধির চর্চা। সমাজ জীবনে দেখা যায় উপস্থিত বুদ্ধি ও প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইবার সম্যক্ শক্তির অভাবে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যাবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তরুণগণ অনেক ক্ষেত্রে জীবন সংগ্রামে নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে অপরাগ হন। উপস্থিত বুদ্ধির চর্চা, প্রতিকূল পরিবেশে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার কলা-কৌশল জীবন সংগ্রামে অবশ্য প্রয়োজন। ছাত্রজীবন হইতেই ইহার অভ্যাসও সেই জন্যই প্রয়োজন। সেই অভ্যাস, সেই শিক্ষাই বিতর্কসভার আয়োজনের মধ্য দিয়া ছাত্রগণ পাইতে পারে। কাজেই স্কুল-কলেজে বিতর্কসভার অনুষ্ঠান একটি আবশ্যিক ব্যাপার হিসাবে গণ্য করা উচিত। প্রত্যেকটি ছাত্র যাহাতে বিতর্ক সভায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে উৎসাহ পায় তাহার জন্য শ্রেষ্ঠ তার্কিকগণের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

বাংলার প্রকৃতি-বৈভিন্ন্য ও ঋতুবৈচিত্র্য

বাংলা দেশটি সম্পর্কে সর্বাগ্রে ধারণা স্পষ্ট করিয়া লইয়া পরে তাহার প্রকৃতির বৈভিন্ন্য ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করিলেই ভালো হয়। সুদূর অতীত কালে পাঁচটি বিভিন্ন অঞ্চল ছিল—রাঢ়, বরেন্দ্র, সমতট, বঙ্গ ও কামরূপ—এই পাঁচ নামে। ইহাদের সমবায়ে রাষ্ট্রীয় পঞ্চগৌড় (বা গৌড়) দেশ গড়িয়া উঠিল। ক্রমে পাঁচটি অঞ্চলের লোক মোটামুটি যে সাধারণ ভাষা বলিতে লাগিল তাহার নাম হইল বাংলা ভাষা। তাই পাঁচটি অঞ্চলের সমবায়ে অখণ্ড বঙ্গভূমি দেখা দিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক সংঘাতে আজ অখণ্ড বঙ্গভূমি খণ্ডিত। তবে

আজিকার এই প্রকৃতি-বৈভিন্ন্য ও ঋতুবৈচিত্র্যের বিচার-বিশ্লেষণ কালে আমরা সাময়িক ভাবে ভুলিয়া যাইব জননীর ঐ খণ্ডন দশাকে।

বাংলার ভাগীরথী-পশ্চিমে রাঢ়দেশ। লালমাটির এই দেশ। ছোটখাটো পাহাড়-পর্বত এখানে বেশ দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের তুলনায় এখানে অভাব আছে জলের—অভাব আছে নদী-নালার। বর্ষার আবির্ভাব এখানে বিলম্বে। মূল বঙ্গভূমির তুলনায় এখানকার প্রকৃতির রূপ—পশ্চিমের প্রদেশগুলির কতকটা অনুরূপ। উত্তরের বরেন্দ্রভূমির উত্তরাংশে ও কামরূপ অঞ্চলে পাহাড় পর্বত দেখা যায় প্রচুর। কিন্তু প্রকৃতিতে রুক্ষতা নাই। স্নেহশীতল তাহার রূপ। এখানে শৈত্যের প্রাবল্য দেখা যায়। কিন্তু পশ্চিমের রাঢ়ের মতো বরেন্দ্র-কামরূপে কোন জলাভাব নাই। নদী-নালা যেমন আছে, তেমনি পাওয়া যায় উপযুক্ত সময়ে বর্ষা। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য চট্টল অঞ্চলের সামান্য অংশকে বাদ দিলে বঙ্গসমতটে কোন পার্বত্যভূমি নাই, নাই প্রকৃতির কোন রুক্ষতা। মাতৃরূপিণী ভূমি এখানে অনেক-সময়ে অনেক ক্ষেত্রে বৎসরে তিনটি বা চারটি ফসলও দান করেন। আবার পূর্ববঙ্গের বা পূর্বোক্ত পঞ্চগৌড়ের বঙ্গভূমিতে বৎসরের তিনমাস তো পথ-প্রান্তর, মাঠ-ঘাট, জলপ্লাবিত থাকে। উচ্চভূমিতে সেখানকার মানুষ ঘর বাঁধিয়া বাস করে। জননী প্রকৃতি যেন বর্ষার মধ্য দিয়া এই সকল অঞ্চলের জীবনের মালিন্য, দেহের ব্যাধি প্রভৃতি ধুইয়া দেন এবং বন্যার মধ্য দিয়া জমিতে নূতন পলি-মাটি ফেলিয়া পর বৎসরের ফসলের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করিয়া দেন। আবার মধ্যদক্ষিণের বন-ভূমি যাহা সুন্দরবন-অঞ্চল নামে খ্যাত, সেখানে মাতৃপ্রকৃতি যেন নিত্য 'সাগর জলে সিনান করি' পবিত্র হইয়া সন্তানের জন্য নিত্য ফসলের সম্ভার প্রস্তুতে রতা থাকেন। এই তো বঙ্গের প্রকৃতি বৈভিন্ন্যের রূপ।

বাংলার বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলের সর্বত্রই ষড়ঋতুর লীলাখেলা দেখা যায়। ঋতুতে ঋতুতে বঙ্গপ্রকৃতির নব নব রূপ। রবীন্দ্রনাথ একবার বাংলার ঋতুপর্যায়-গুলির জাতিভেদ করিয়াছিলেন। আমরা কবি নহি। আমরা ঋতুগুলির প্রয়োজনের দিককে এবং সৌন্দর্যের দিককে ব্যাখ্যা করিব। বাঙলার ঋতু পর্যায়কে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদের মধ্যে না দেখিয়া বঙ্গদেশকে বিশ্বপ্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালা রূপে দেখাই ভালো। কোন্ ঋতু কোন্ সময় চলিয়া যায়, পটপরিবর্তনের পর

দেখা দেয় নূতন ঋতু, তাহা যেন বুঝিতেই পারা যায় না। বৈশাখের রুদ্র মূর্তি ধীরে ধীরে বিজয়ী বর্ষার বিজয়াভিযানে ঢাকা পড়িয়া যায় এই বাংলা দেশে। এই ভাবেই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—ছয় ঋতুর পর্যায়ক্রমিক লীলায় বাংলা দেশের বৎসর অতিক্রান্ত হয়।

বৎসরের প্রথম দুইটি মাস—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠকে লইয়া গ্রীষ্মকাল। প্রকৃতির এক তপঃক্লিষ্ট রুক্ষতা এই দুই মাসে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ এই ঋতুর জাতি নির্দেশ করিয়াছেন ব্রাহ্মণ বলিয়া। মানুষের অন্তরের মালিন্যকে এই ঋতু দগ্ধ করিয়া অন্তরকে নির্মল করে। দিবাভাগের রৌদ্রপ্রখরতা অপরাহ্ণ বিপ্লবী ঝড়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়। রুদ্রভৈরবের তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে সে যেন সকল অবাঞ্ছিত কলুষ হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করিতে চায়। ভোগের বা সম্ভোগের আয়োজন ইহার কিছুই যেন নাই। সামান্য কিছু কিছু ফুল যদিও ফোটে, কিন্তু ফুলের সমারোহ সম্ভার ইহার নাই। ফুলের আয়োজন যাহা আছে তাহাকে কিছু সাত্ত্বিক ফুলের সম্ভার বলাই ভালো। জ্যৈষ্ঠে যখন কলুষ মুক্তি ঘটিয়াছে তখনি সাত্ত্বিক ফলাহারের আয়োজন করিয়া দেয় রুদ্র-গ্রীষ্ম। আমের তো কথাই নাই। সেতো অমৃত ফল।

নদী-দীঘির জলের শূন্যতা, বাতাসের রুক্ষ শুষ্কতার মধ্যে মানবের কলুষমুক্তির সাধনাকে সার্থক ও পূর্ণতর করিবার জন্যই যেন গ্রীষ্ম আম, জাম, লিচু, কাঁঠালের সমারোহ ঘটায়।

ইহার পর 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈঃ' বর্ষার আবির্ভাব রাজকীয় মূর্তিতে। ধরণী শোভায় সবুজে নানা ফুলের সৌন্দর্যাভরণ ধারণ করিয়া আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। মাটিতে রসের যোগান দিয়া সারা বৎসরের ফসলের জন্য সে সচেষ্ট থাকে। মানুষকে বর্ষা কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তি দেয়। সাধারণ লোকের উন্মুক্ত চিত্ত প্রান্তরও কাব্য ভাবনা ও সাধনায় ভরিয়া তোলাই বর্ষার কাজ।

বর্ষার শেষ দিকেই মাঠে সবুজ ফসলের জন্য প্রস্তুতি চলে। শরতে একদিকে আউশধান্যে পরিপক্ব ফসলে মানুষের প্রাণ নাচিয়া উঠে, অপর দিকে প্রধান ফসল আমন ধান্যক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ বর্ণে প্রাণ নাচিয়া উঠে। শেফালিকার পুষ্প-সম্ভারে জবা, জুঁই, মালতী আর পদ্মের সমারোহে বাঙালীর প্রাণ উৎসবে মাতিয়া উঠে।

দুর্গোৎসবে বাঙালীর জাতীয় উৎসবের রূপ দেখা যায়। বাংলার ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর বন্দনা। শরৎ ঋতু বাংলার উৎসবেরই ঋতু। আগমনী-বিজয়ার গানে যেন বাঙালী ঋতুরানীর আগমনী-বিজয়াই পালন করে।

হেমন্তে হিমেল হাওয়ায় প্রথম শীতের ভাব দেখা দেয়। ফসল ঘরে ওঠে। সবুজমাঠে এখন সোনালী রং ধরে। নানা ভোগ্য দ্রব্যের সমারোহের মধ্যে হেমন্ত শীতে পর্যবসিত হয়। ফুলের মধ্যে গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকার সমারোহ সর্বাধিক। নানা মিষ্টান্ন, পিঠা, পরমান্ন প্রভৃতি ভোগের কাল এই শীতকাল।

শীতের শেষে পলাশের ও শিমুলের লাল রং-এ রাঙাইয়া বসন্তের আবির্ভাব ঘটে। গাছপালার নূতন পাতায়, আম্রমুকুলের সৌরভে, নানা ফুলের সমারোহে বসন্ত তারুণ্যের আগমনী গান গায়। প্রাণচাঞ্চল্যের ঋতু এই বসন্ত, তাইতো দোল উৎসবে প্রাণের রং-এ দেহকে রাঙাইবার জন্য হোলি খেলার হুল্লোড়।

এমন ভাবেই বাংলার ষড়্‌ঋতু বাংলার মানুষের প্রাণেও বৈচিত্র্যের সাড়া জাগায়। মানুষকে লইয়া যেন বাংলার ঋতু পর্যায় পরিপূর্ণ। ষড়্‌ঋতুর এই অনন্ত লীলা বৈচিত্র্যেই বাংলার পরিচয় ও বাঙালীর পরিচয়।

বাংলাদেশের বিশিষ্টতম ঋতু

[ক. বি. বি. এ. ১৯৬৮]

[উত্তর সংকেত : বাংলার প্রকৃতি-বৈভিন্ন্য ও ঋতু-বৈচিত্র্য শীর্ষক প্রবন্ধের সাহায্যে উত্তর রচিত হইবে।]

বাংলার লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য লোকসাহিত্য হয় তাহার সৃজন ব্যাপারের মধ্য দিয়া। সমাজের অনভিজাত জনের জীবনে ধর্ম-কর্ম, রীতি-নীতি প্রভৃতির সম্পর্কে তাহাদের সহজবুদ্ধিতে যে চেতনা গড়িয়া উঠে লোকসাহিত্য তাহাকেই ধারণ ও পোষণ করে। লোকসাহিত্যের অনেক শাখাতেই স্রষ্টার নাম পাওয়া যায়,

কিন্তু সৃষ্টি-ব্যাপারে তাহা হইয়া পড়ে গৌণ। লোকসমাজের শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর করিয়া যুগযুগ ধরিয়া লোকসাহিত্য জীবিত থাকে। জীবন ধারণের পথে শ্রুতি-স্মৃতি-নির্ভর এই সাহিত্য নিরন্তর পরিবর্তনকে স্বীকার করে। তাই লোকসাহিত্যের যে সকল শাখায় স্রষ্টা থাকে সেখানেও সেই স্রষ্টা উপলক্ষ্যমাত্র জানিতে হইবে।

তরলোচ্ছল হাসিকান্নায় ভরা বাঙালী লোকজীবন। অগভীর তাহার ধর্মচিন্তা, সরল তাহার জীবনাচরণ, পারিপাট্যহীন উচ্ছ্বাসময় তাহার লোক উৎসব। এই সকলের সঙ্গেই গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার লোক-সাহিত্য।

অগভীর ন্যায় অন্যায় বোধকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে নানা লোক-উপাখ্যান—বিজয়-বসন্তের কাহিনীর মতো অনেক লোক উপাখ্যান সন্ধ্যার বৈঠক-গুলিকে একদিন জাঁকাইয়া রাখিত। ইহাদের মধ্যেই একটি শাখা শিশু-লোক-সাহিত্য বা রূপকথা। শিশুর ঘুম পাড়ানোর সামগ্রী হইলেও ঐ রাজপুত্র-কোটালপুত্রের গল্প, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প প্রভৃতি বয়সে প্রাচীন। বয়স্ক লোকদের জন্য যে সকল লোক-উপাখ্যান তাহা নিত্য নূতন জন্ম লয়। আবার আয়ুও তাহাদের রূপকথাগুলির তুলনায় নিতান্ত অল্প।

ধর্মপূজা, বিবাহ অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে নানা লোকগীতি শুনিতে পাওয়া যায়। আবার বহুশ্রুত ও বাংলার সর্বত্র প্রচলিত আগমনী-বিজয়ার গানগুলিও ধর্মমূলক লোকগীতি। রামপ্রসাদের সাধনায় আগমনী গানগুলি অভিজাত সাহিত্যের পর্যায়ে আজ উন্নীত। শুধু কি লোক-ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়াই লোক-ধর্মগীতিগুলি? বাউল-মুর্শিদের গান প্রভৃতিও ধর্মমূলক লোকগীতি। বাউল মুর্শিদের চেতনায় ধর্ম ও দর্শন একাকার হইয়া গিয়াছে। ধর্মভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার স্থান এই গীতগুলির মধ্যে নাই। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বিসর্জন দিয়াই বাউল গান তাহার মনের মানুষের সাধনা করে—

ও আমি রটিলাম বিভাশে রে—
না পাইলাম মনের মানুষ
না ডাকলাম তারে।

গাজীর গীত, গোপীচন্দ্রের গীতি, ময়নামতীর গীত প্রভৃতিও ধর্মমূলক গীতি—বিষয় ইহাদের বিশুদ্ধ লোক-ধর্ম।

মেয়েলী ব্রত-পার্বণকে লইয়া নানা ব্রতকথা গড়িয়া উঠিয়াছে। এগুলিকে মেয়েলী লোককথা বলা চলিতে পারে। ইহাদের মধ্যে নানা কাহিনী পুরাণাদিতে স্থানলাভ করিয়াছিল। সাবিত্রী ব্রতের কাহিনীটি নিশ্চয় মূলে লোককাহিনী। চণ্ডীমঙ্গল বা মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাহিনীরও মূলে লোককাহিনী। পরবর্তিকালে অভিজাত জনের দ্বারা ইহাদের স্বীকৃতির ফলে ইহারা লেখ্য-সাহিত্যের পর্যায়ে উঠিয়াছে। এখানে বহুতর মেয়েলি ব্রতকথা মেয়েদের মুখে মুখে বাঁচিয়া আছে।

সভাশ্রয়ী গীতিকা সাহিত্য পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিশেষ গৌরবের বস্তু। পূর্ববঙ্গ কেন ? সমগ্র বঙ্গদেশেরই এই সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য শাখাটি গৌরবের বস্তু। তাই ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। কাঞ্চনমালা, লীলা, চন্দ্রাবতীর উপাখ্যান সত্যই লোক-সাহিত্যের উন্নত মানের পরিচায়ক। সহজ, স্বাধীন প্রেমের অস্তিত্ব বাংলার সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়ই বহন করে। মহুয়া ও নদ্যার ঠাকুরের প্রেমের স্বীকৃতি সমাজ নিশ্চয়ই দিয়াছিল। আর যদি নাই দিয়া থাকে তবুও এই গীতিকাগুলি প্রমাণ করে যে, নর-নারীর সহজ প্রেম-মিলন-বিরহের বেদনানন্দ বাংলার লোকসমাজ হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে জানিত। বাংলার অভিজাত জনের সাহিত্যে প্রেমের অস্তিত্ব ছিল এবং আছে। কিন্তু অভিজাত জনের মানস-কৌটিল্যের সঙ্গে ধর্মনীতির বেড়াজাল সেই প্রেমকথাকে কখনও করিয়াছে বৈকুণ্ঠবাসী, আবার কখনও-বা তাহা সামাজিক বোধের সঙ্গে সংঘাতশীল হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের আস্বাদ্যতা জটিল নয়। প্রেমের পথে কাজল-রেখার সহিষ্ণুতা, মহুয়ার ক্রিয়াশীল বিচিত্র প্রেম, মলুয়ার ও চন্দ্রমালার নিষ্ঠা, কাঞ্চনমালার জীবনাহুতি প্রভৃতি কাহিনীর মধ্যে সংস্কার-মুক্ত সত্যকার প্রেমই আস্বাদ্য।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সমৃদ্ধ কবিগানকেও অনেকে লোকসাহিত্যের পর্যায়ে ফেলেন। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু ও মধুসূদনের আবির্ভাবের মধ্যবর্তীকালে অভিজাত জনের সাহিত্যের শূন্যতাকেই পূর্ণ করিয়াছিল কবিগানের চকমকি। আভিজাত্যের কলুষ ইহাদের সর্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। কবিয়ালগণ লিখিত সাহিত্যের মত কবিগানগুলির কলুষ-কৌটিল্য সুকুমার মার্জিত আবরণে আবৃত করিতে

পারে নাই বলিয়াই তাহাকে লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত না করা কোন মতে সংগত হইবে না।

বাংলার ধর্ম, বাংলার উৎসব, বাংলার নীতিনিষ্ঠা এমনকি বাঙালীর কর্মজীবন পর্যন্ত অনেকখানি পরিমাণে একদিন নিয়ন্ত্রিত করিত বাংলার প্রবচনগুলি। প্রবচনগুলিও বাংলার লোকসাহিত্যের শাখা মাত্র। ইহাদেরই মধ্যে প্রাচীনগুলিকে সমাজ 'খনার বচন' বলিয়া সযত্নে আজিও রক্ষা করিতেছে। খনার বচনগুলিতে ধর্মকর্মের সহিত লোকসমাজের প্রকৃতি বিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান ও কৃষিকার্য-বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

লোকসংগীতে উচ্ছল বাঙালীর লোকজীবন কর্মমুখরতার মধ্যেও লোকসংগীতের সংযোগে উল্লাসে মাতিয়া উঠিত। গান গাহিয়া মাঠে কৃষক ধান কাটিত, মাঝি দাঁড় টানিত, জেলে জাল ফেলিত। কৃষকেরা যখন পাট কাটিতে মাঠে নামে তখন একসঙ্গে কাস্তে চালাইবার তালে তালে তাহাদের প্রাণ গাহিয়া ওঠে—

সোমান সোমান চলরে ভাই জোরে চালাও হাত।
আগল দীঘল সামাল কইর‍্যা শক্তে বাইন্ধো পাত॥
হাকিমপুরের মকিম শেখের হাঁইকে কাঁপে হাতি।
তাহার খাতায় কাম করিতে ডোবায় কেনে জাতি॥

আবার, শ্রমিকেরা যখন কর্মরত থাকে তখন কর্মক্লান্তি অপনোদনের জন্য গাহিয়া ওঠে—

আরও জোরে—হেইও!
সাবাস জোয়ান্—হেইও!
একটু আরও—হেইও!

লোকজীবনের প্রত্যেকটি কর্মে রত 'কামিন' তাহার কর্মজীবনের সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া গান বাঁধিত।

বাংলার লোকজীবন বৈচিত্র্যে ভরা ছিল। তাহার ধর্ম-কর্ম সকলই ছিল উৎসবের রূপে রূপায়িত, তাই প্রতিদিনের জীবনে লোকসাহিত্যের উন্নতির অসীম সম্ভাবনা ছিল। আজিকার বাংলাদেশে এই সম্ভাবনা লুপ্ত। কালের গতিতে

ধনবাদী সভ্যতা ও তাহার শিল্পসমৃদ্ধি, তাহার জৌলুষ—আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন লোকসাহিত্যের আর কোন সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না।

ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরেজীর স্থান

[ক. বি. ১৯৬৯]

ইংরেজ শাসনাধীনে আসার পর হইতে ভারতবর্ষ ইংরেজী ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। কালক্রমে এই ভাষা প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। এক সময়ে ইংরেজী ভাষাই ছিল আমাদের ধ্যান জ্ঞান ও সাধনার বিষয়। ইংরেজী ভাষা না জানিলে সমাজে অপাংক্তেয় হইয়া থাকিতে হইত। শিক্ষার ক্ষেত্রে, চাকুরীর ক্ষেত্রে কিংবা ব্যবসার ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা ছিল অপরিহার্য। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে না পারিলে জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হইত না।

ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের মূলে ছিল বিদেশী সরকারের স্বার্থবুদ্ধি। কিছু সংখ্যক দেশীয় লোককে ইংরেজ সরকারের শাসনকার্য চালাইবার উপযুক্ত করিয়া তোলাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। তাহারা থাকিলে তাহাদের শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধা হইবে এবং একদল রাজভক্ত অনুগত প্রজাও পাওয়া যাইবে। ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, ভারতবাসীর পক্ষে ইহা শাপে বর হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার যোগ্যতম বাহন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে এক নবজাগরণের সূচনা হইয়াছে। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক মোহিতলাল মজুমদারের কথায় বলিতে গেলে, এই জাগরণ আমাদের 'প্রাণ মন ও আত্মার সুপ্তিভঙ্গ'। আর এই জাগরণ সম্ভব হইয়াছিল নব্য ইউরোপের প্রতীকরূপ ইংরেজ তথা ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসার ফলে। 'ইউরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর কোনো বিদেশী জাত কোনো দিন এমন করে আসতে পারে নি। ইউরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে

বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।' সেইজন্য ভারতবর্ষ ইউরোপের জঙ্গম চিত্তের প্রভাব সেইদিন সহজে ও সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহার ফলে আমাদের ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়।

বহুদিনের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া আমাদের দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে। বিদেশী ইংরেজ শাসক আমাদের দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমাদের মনে এখন নূতন করিয়া প্রশ্ন জাগিয়াছে, স্বাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষার ভবিষ্যৎ কি হইবে। কোন মর্যাদাসম্পন্ন দেশ একটি বিদেশী ভাষাকে চিরকালের জন্য রাষ্ট্রভাষার স্থান দিতে পারে না। 'ভাষা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহন'। এমন কি নিজের দেশের ভাষা অনুন্নত হইলেও অন্য দেশের ভাষাকে নিজের দেশের উপর চাপাইয়া দেওয়া কোন জাতির পক্ষেই গৌরবজনক হইতে পারে না। কোন জাতিই মাতৃভাষা ব্যতীত বিদেশী ভাষা অবলম্বন করিয়া বড় হইতে পারে নাই। স্বয়ং ইংরেজ জাতিও পারে নাই। সেইজন্য ইংরেজ জাতি একদিন ল্যাটিন ভাষার বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপন মাতৃভাষাকে বরণ করিয়া লইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তখন হইতে ইংরেজ জাতির উন্নতির সূচনা হয়।

যে কোন বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়। ছাত্র জীবনের প্রথম অধ্যায়টা ভাষা শিখিতেই কাটিয়া যায়। শিক্ষা তাহার ঘটে না। ইহাতে না জানি বিষয়কে না জানি আপনাকে। স্কুল-কলেজে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্যের জন্য শুধু মাতৃভাষা উপেক্ষিত হয় নাই, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইতিহাস সব কিছুই শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাদের উপযুক্ত স্থানলাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য আমাদের স্কুল কলেজের কারখানা ঘরে রাশি রাশি পণ্যের মত বিলাতী শিক্ষিত ছাত্র তৈয়ারী হইল, কিন্তু এই শিক্ষা আমাদের ভিতরের জিনিস, একেবারে নিজের জিনিস হইয়া উঠিল না। এখানে আমরা প্রাচ্য জাপানের উল্লেখ করিতে পারি। জাপান নিজের গরজে নিজের ইচ্ছাতেই পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়াছে। জাপানে পাশ্চাত্য শিক্ষার যে ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে তাহা কোন বিদেশী শাসকের নির্দেশে হয় নাই। মধ্যযুগীয় প্রাচ্য জাপান আধুনিক

বিশ্বে প্রতিযোগিতার জন্যই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া লইতে চাহিয়াছে। নিজের ভাষায় বিদেশী শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিজের জিনিস করিয়া লইয়াছে। আর এদিকে হইতে যে জাপান সফল হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার আর একটি ফল হইল ইংরেজী জানা একটি অধিকতর সুবিধাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে, দেশের সঙ্গে তাহাদের অন্তরের যোগ কোথায়? রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, তিলক, গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষিগণ সকলেই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রাণ ছিল খাঁটি স্বদেশের। ইঁহাদের কথা বাদ দিলে মুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় বরাবর নিজেদের স্বতন্ত্র করিয়াই রাখিয়াছে।

প্রায় দুইশত বৎসর আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে শতকরা কত জন ইংরেজী শিক্ষা আয়ত্ত করিয়াছে? দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র এই শিক্ষা পাইয়াছে। সমস্ত শরীরকে বঞ্চিত করিয়া দেহের কোন এক জায়গা স্ফীত হইলে যেমন তাহাকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা যায় না তেমনি দেশের মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যক্তি এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও তাহা সমস্ত দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইতে পারে না।

দীর্ঘকালের সংগ্রামের পর আজ আমরা স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীন ভারতে আজ আমাদের অবহেলিত মাতৃভাষাকেও সসম্মানে অভিষিক্ত করিতে হইবে। মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশ মানুষের জন্মগত অধিকার। মাতৃভাষাতেই একমাত্র মানুষের চিত্তের বন্ধনমুক্তি সম্ভব। জাপান ও সোভিয়েত দেশ ইহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতে মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চতর বিজ্ঞানের সাধনা মোটেই কঠিন নয়, বরং ইহাই অধিকতর সমীচীন। যে সকল ইংরেজীনবিশ পণ্ডিত বিজ্ঞান কিংবা অন্য বিষয় মাতৃভাষায় পড়াইতে অসুবিধা বলিয়া অভিযোগ করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় হয় মাতৃভাষাতেই।

এখন কথা হইতেছে ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে আমরা ইংরেজী ভাষাকে

কি একেবারে নির্বাসন দিব? বর্তমান ভারতে একদল উগ্র হিন্দী-প্রেমিক 'আংরেজী হঠাও' আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজী ভাষার প্রতি এই-রকম উগ্র মনোভাব মানসিক সংকীর্ণতারই পরিচয় বহন করে। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, ইংরেজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। এই ভাষার মাধ্যমে আমরা পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার ধারা লাভ করিয়াছি। আমাদের রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার বাণী ইংরেজী ভাষার ছন্দেই আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইয়াছে, ইহা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে। তাই এই ভাষা একেবারে বর্জন করা কিছুতেই সমীচীন হইবে না। আমাদের শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষাই হইবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক জ্ঞান আহরণ ও বিশেষজ্ঞদের জন্য ইংরেজী ভাষার প্রয়োজন কোনদিন ফুরাইয়া যাইবে না। কাজেই ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে ইংরেজী ভাষাকে একেবারে বর্জন করিলে তাহা আমাদের দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না।

বারোয়ারী পূজা

[ক. বি. ১৯৬৯]

বাঙালী হিন্দুসমাজে বারোমাসে তেরো পার্বণ প্রচলিত। এই পূজাপার্বণ-গুলির মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক হইতে দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতী পূজাই প্রধান। বাংলাদেশে মধ্যযুগেই এই পূজাগুলি প্রচলিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ সমাজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন জমিদার ও বণিকশ্রেণী মহাসমারোহের সহিত পূজাদি করিত। পল্লীর সাধারণ মানুষও অবশ্য এই আনন্দের ভাগ পাইত। সেই সঙ্গে কাঙালী-ভোজন ও দরিদ্রের বস্ত্র বিতরণ প্রভৃতি ছিল পূজার অপরিহার্য অঙ্গ।

এক সময়ে আমাদের দেশে জমিদারী প্রথা লোপ পাইল। বর্তমানে জমিদারদের পূর্বের ন্যায় অবস্থা নাই। জমীদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির পূজা—বংশানুক্রমিক পূজারও অবসান ঘটিল। জমিদার ও অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থেরা শহরে আশ্রয় লইল। একদিন পল্লীর ধনীগৃহে মহাসমারোহে যে পূজাদি হইত তাহা আসিয়াছে এখন জনসাধারণের হাতে। এখন তাহারা

সকলে মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া এই উৎসব করে। ইহাই বারোয়ারী পূজা। ইহার আর এক নাম সর্বজনীন পূজা।

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাই আমাদের পূজাপার্বণ উৎসবাদিতেও ইহার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অন্য সকল প্রকার কমিটির মতো আমরা সকলে মিলিয়া মিশিয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পূজা কমিটি গঠন করি। পূর্বে যাহা ছিল মুষ্টিমেয় ধনী ও জমিদারদের মধ্যে আবদ্ধ, বর্তমানে তাহা আমাদের সকলের হইয়াছে। বারোয়ারী পূজা গণতান্ত্রিক সমাজ চেতনারই পরিণতি।

পূর্বে জমিদার বা ধনীগৃহে যে পূজা হইত তাহাতে নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপে বঞ্চিত হতভাগ্য মানুষগুলি শুধু দূর হইতেই এই উৎসব দেখিতে পাইত। কিন্তু আজ সর্বজনীন পূজার অঙ্গনতলে সকল মানুষের অবাধ আমন্ত্রণ, মাতৃপূজার অধিকার হইতে আজ আর কাহাকেও দূরে সরাইয়া দিবার উপায় নাই। ইহার ফলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ঘুচিয়া যাইতেছে, মাতৃপূজার বোধনমন্ত্রে সকলের প্রার্থনা এক সুরে ধ্বনিত হইতেছে। ইহা আমাদের জাতীয় সংহতির পক্ষেও বিশেষ কল্যাণপ্রদ। একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, ধর্মের ক্ষেত্রে মুসলমান হয় এক ও অভিন্ন আর হিন্দুরা হয় শতধা বিচ্ছিন্ন। এই ধারণা একেবারে অমূলক নয়। বর্ণাশ্রমশাসিত হিন্দুসমাজে নিম্নবর্ণের লোকেরা বরাবর অবহেলিত ছিল। সমাজের বৃহত্তর এক অংশকে এমনিভাবে অনাদরে অবহেলায় একপাশে সরাইয়া রাখিলে আমাদের সমাজদেহের শক্তি ও সুস্থতা রক্ষা করা কঠিন হইবে। তাই আজ যদি আমরা মাতৃপূজার অঙ্গনতলে সকলকে আহ্বান করিতে পারি তাহা হইলে মায়ের বোধন সার্থক হইবে।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে এক ধরনের বারোয়ারী পূজা হইত। দেশে কলেরা বসন্তের প্রকোপ দেখা দিলে গ্রামের ধর্মভীরু মানুষ চাঁদা তুলিয়া সকলে মিলিয়া শীতলা বা ওলাই চণ্ডীর পূজা করিত। তখনকার দিনের এই শীতলা বা ওলাই চণ্ডীর পূজা বর্তমান কালের ন্যায় তেমন সুসংগঠিত ছিল না।

বর্তমানে বারোয়ারী পূজার মাসাধিক কাল পূর্ব হইতে পূজা কমিটি গঠিত হইয়া যায়। ইহাতে তরুণদেরই উৎসাহ সর্বাপেক্ষা বেশী। তাহারা রাস্তায়

রাস্তায় পূজার বিজ্ঞাপন দেয় এবং সগৌরবে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা করে। তারপর সমিতির উৎসাহী সদস্যরা পাড়ায় চাঁদা তুলিতে বাহির হয়। চাঁদা দিতে দিতে অনেকেরই প্রাণান্ত হয়। অনেক সময় ইচ্ছা না থাকিলেও পাড়ার ছেলেদের উপদ্রবের ভয়ে চাঁদা দিতে হয়। বারোয়ারী পূজার নামে এই জোরজুলুমের ফলে অনেক সময় পূজার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। উদ্যোক্তাদের প্রতি মানুষের মনে বিরক্তির ভাব জন্মে।

সাধারণতঃ পূজার একদিন আগে সমারোহের সহিত প্রতিমা আনীত হয়। পূজামণ্ডপ ও আলোকসজ্জার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব দেখা যায়। আলোকসজ্জা ও মাইকের চিৎকারে উদ্যোক্তারা নিজেদের জাহির করে। সস্তা হিন্দী গানের রেকর্ড কান ঝালাপালা করে। ইহা উদ্যোক্তাদের অন্তঃসারশূন্যতারই পরিচয় দেয়।

পূজার উদ্বোধন করিবার সময় কোন রাজনৈতিক নেতার ডাক পড়ে কিংবা কোন ধনী ব্যক্তি প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। ইহাতে উদ্যোক্তাদের ভক্তির চেয়ে নিজেদের জাহির করিবার চেষ্টাই বেশী প্রকাশ পায়। বারোয়ারী পূজার নগ্ন বীভৎস রূপ প্রবল আকার ধারণ করে প্রতিমা-বিসর্জনের শোভাযাত্রায়। মনে হয় অসুর-দলনী মা অসুরদের উৎপীড়নে বিদায় লইতেছেন। সেই দৃশ্য অতি করুণ, মর্মান্তিক ও লজ্জাজনক। যে কোন সুরুচিসম্পন্ন মানুষের নিকট ইহা পরম বেদনাদায়ক।

বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে যে সভা-সমিতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তাহাও অনেক সময় যান্ত্রিক, গতানুগতিক; সেখানে প্রাণের স্পর্শ থাকে না। এই যান্ত্রিক গতানুগতিকতার মধ্যে কি আমরা দেবতার আশীর্বাদ প্রত্যাশা করিতে পারি? মনে হয় পূজা-মণ্ডপ হইতে দেবতা চিরতরে বিদায় লইয়াছেন।

পূজাপার্বণ ও উৎসবাদিতে জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন দেখা যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে বারোয়ারী পূজার নগ্নরূপের মধ্যে জাতীয় চরিত্রের অবনতির লক্ষণই প্রকাশ পায়। দেবতার আরাধনায় যে সংযম, শুচিতা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তাহা বারোয়ারী পূজায় সচরাচর দেখা যায় না। ইহাতে মানসিক দৈন্য ও ভক্তিহীনতার পরিচয়ই স্পষ্ট হইয়া উঠে। এইভাবে বারোয়ারী পূজা চলিতে থাকিলে জাতির প্রাণশক্তিরই বৃথা অপচয় হইবে। এই বিষয়ে আমাদের

দেশের তরুণ সমাজের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। তাহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অসুরত্ব ও পশুত্বকে বিনাশ করিয়া সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্যই শক্তিপূজার আয়োজন। আর কবির ভাষায় বলিতে গেলে—

"যে যথার্থ শক্তি সে তো শান্তিময়ী,
সৌম্য তাহার কল্যাণরূপ বিশ্বজয়ী।"

বারোয়ারী পূজার উদ্যোক্তাগণ এই কথা স্মরণ রাখিলে আমাদের মাতৃপূজার আয়োজন সুন্দর, সার্থক ও কল্যাণপ্রদ হইবে।

জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

[ক. বি. বি. এ. ১৯৬৯]

মানুষের মধ্যেই আছেন ভগবান। মানুষের সেবা করিলেই প্রকৃত ভগবানের সেবা করা হয়। শুধু ধূপ-প্রদীপ দিয়া পূজা করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভগবানকে পাইবার জন্য নির্জন গুহায় কিংবা অরণ্যে বাস করিয়া একান্তে ধ্যান-ধারণারও প্রয়োজন নাই। যে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূজারী ভগবানের আরাধনায় রত সেই মন্দিরের রুদ্ধ কপাটে নিষ্ফল মাথা ঠুকিয়া আর্ত অসহায় মানুষ ফিরিয়া যাইতেছে। মানুষের দুঃখে যাহার হৃদয় গলে না সে কি করিয়া ভগবানের প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করিবে? যে মন্দিরের দুয়ার হইতে ভগবানের সৃষ্ট জীবকে দুঃখ ও অপমানের বোঝা বহন করিয়া ফিরিয়া যাইতে হয় সেই মন্দিরের পাষাণ বেদীতে ভগবান অচল হইয়া থাকিতে পারেন না। সন্তানের বেদনা ভগবানের বুকেও বাজে।

আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মানুষ শুধু নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকে। অন্যের দুঃখে তাহার হৃদয় গলে না। মানুষের এই হৃদয়হীনতায় বিবেকানন্দের প্রাণে জাগিত দুঃসহ ব্যথা। মানুষের অন্তরেই ত ভগবানের অধিষ্ঠান। ভগবানকে পাইতে হইলে মানুষের সেবা করিতে হইবে, মানুষকে ভালবাসিতে হইবে। নিছক আধ্যাত্মিক ভাববিলাসের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না। তাই বিবেকানন্দ

মানুষের সেবার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। মানুষের দুঃখ মোচনের সংকল্প ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা। ইহার তুলনায় তিনি ভক্তি-মুক্তি কিংবা শুষ্ক পাণ্ডিত্যকে অতি তুচ্ছ মনে করিতেন। আর্ত ও নিপীড়িত মানবের কাতর-ক্রন্দনে যেমন মহাকারুণিক বুদ্ধ একদিন রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া ঘরছাড়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, তেমনি দুঃখদৈন্য নিপীড়িত চিরপতিত ভারতবাসীর কাতর আহ্বানে বিবেকানন্দ সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আপন জীবনের দুঃখের অভিজ্ঞতাও তাঁহার কম ছিল না। চোখের সম্মুখে দেখিয়াছেন অনাহারে ক্লিষ্ট মা-ভাই বোনের শীর্ণ মুখচ্ছবি। সেই দৃশ্য একদিন দেখিতে পাইলেন স্বদেশের বৃহৎ পটভূমিকায়। স্বদেশের অধঃপতিত মানুষের জন্য চিরদিন তাঁহার হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ হইয়াছে। দেশের মানুষকে তিনি যেভাবে ভালবাসিয়াছেন তেমন করিয়া আর কেহ' পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। দেশের এই নিরীহ পদদলিত মানুষের প্রতি তাঁহার অসীম ভালবাসা একটি পত্রে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

"এস, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরোহিত্য-শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদের জন্য প্রার্থনা করি। দিবারাত্র তাদের জন্য প্রার্থনা কর। বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্মপ্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালবাসি। ...তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বলো? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পারছে না—তারা শিক্ষা পাচ্ছে না—কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বলো? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক—এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাব, তাদের জন্য কাজ কর, তাদের জন্য সদাসর্বদা প্রার্থনা কর—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাকেই আমি মহাত্মা বলি, যার হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়, তা না হলে সে দুরাত্মা।"

প্রকৃতপক্ষে এই মানব সেবার আদর্শ ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ। নিখিলমানবের দুঃখমোচনের সংকল্প লইয়া একদিন ভগবান বুদ্ধ রাজ্য-সংসার সব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ত্যাগ ও প্রেমের দ্বারা তিনি মানব হৃদয়ে যে

স্থায়ী আসন লাভ করিলেন কপিলাবাস্তুর সিংহাসন তাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় যথার্থই বলিয়াছেন, "বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেকজাণ্ডার করেন নি।" বুদ্ধদেব ত্যাগের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, তাহাই সত্যকারের জয়। আর আলেকজাণ্ডার লোভের বশবর্তী হইয়া অস্ত্রের দ্বারা যে ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন তাহা সত্যকারের জয় নয়। সেইজন্য দেখা যায় আলেকজাণ্ডারের অস্ত্রবলে অর্জিত ভূখণ্ড কালক্রমে স্থায়ী হয় নাই; কিন্তু বিনা অস্ত্রে অর্জিত বুদ্ধদেবের প্রেমের সাম্রাজ্য মানবহৃদয়ে চিরদিন দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, "মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়া রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেইপ্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করিবে।" এই প্রেমের তুলনা কোথায়! আবার এই মহাগুরুর বাণীকে গ্রহণ করিয়া রাজচক্রবর্তী অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তারকার্যে, মঙ্গলকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মানবকল্যাণে নিয়োজিত মহাসম্রাট অশোক তাঁহার শিলালিপিতে ঘোষণা করিলেন এই বাণী—"সর্ব মনুষ্যগণ আমার সন্তান। যেমন সন্তান সম্বন্ধে আমি ইচ্ছা করি যে তাহারা আমার দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সর্বহিত-সুখে যুক্ত হউক, সকল মানুষ সম্বন্ধেও আমার সেইরূপই ইচ্ছা।" আর শুধু মানুষের জন্য নয়, অন্যান্য প্রাণীর হিতের জন্যও তিনি বহু সৎকর্ম করিয়াছেন। রোগীদের জন্য এমন কি পশুদের জন্যও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা, পশু ও মানুষের কল্যাণের জন্য পথিমধ্যে বৃক্ষরোপণ, কূপখনন প্রভৃতি বহুবিধ কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরিত ধর্মাচার্যগণ একদিন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করিয়া দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া পরদেশীয় ও বর্বরজাতীয়দের সদ্‌গতির জন্য দলে দলে এবং অকাতরে দুঃখ বহন করিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ যে সকল মানুষকে স্বীকার করিয়াছে তাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছেন মহাসম্রাট অশোক।

এই সেবাধর্মের আদর্শ আমাদের দেশে কোনদিন ম্লান হয় নাই। শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মনীষিগণ এই আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবকে শিবজ্ঞানে পূজা ও সেবা করিতে বলিতেন। পরস্পরের প্রতি হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার দিনে মানুষকে দেবতাজ্ঞান করা কি সহজ কথা?

ভগবান শুধু মন্দিরে বাস করেন না। নানা বেশে নানা রূপে আমরা তাঁহাকে সর্বত্র দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।

তিনি আছেন 'সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।' তাই আর্ত পীড়িত, বঞ্চিত ও হতভাগ্য মানুষের সেবাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ পূজা। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই মানুষ ধর্মের নামে মানুষকে ঘৃণা করে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মানুষকে নির্যাতন ও অপমান করে। মানুষের স্পর্শকে তাহারা প্রতিদিন দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়া আসলে মানুষের প্রাণের ঠাকুরকেই দূরে সরাইয়া দেয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা ধর্মমোহেরই নামান্তর। এই ধর্মমোহের চেয়ে এমন কি নাস্তিকতাকেও রবীন্দ্রনাথ বড় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছেন—

নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে প্রজ্ঞার আলো,
ধর্ম মানে না, মানে মানুষের ভালো।

আমাদের দেশে দীন-দরিদ্রকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করার কথা বলা হইয়া থাকে। সেইজন্য আমরা বলি দরিদ্র-নারায়ণ। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে অতিথি সেবাই ছিল পরম ধর্ম। বৌদ্ধযুগে জনসেবার জন্য গড়িয়া উঠিয়াছিল বহু প্রতিষ্ঠান। বর্তমানেও আমাদের দেশে রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রভৃতি বহু জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের সেবাপরায়ণতার কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধীও জনসেবার আদর্শে হরিজনদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

পৃথিবীর সকল দেশেই আর্ত ও পীড়িত মানুষ আছে। ইহাদের প্রতি রহিয়াছে সমাজের কর্তব্য। আন্তর্জাতিক রেডক্রস এইরূপ একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। ইহা ব্যতীত দাতব্য চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম প্রভৃতি সকল দেশেই আছে। আবার দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি আকস্মিক বিপৎপাতের সময়ও সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এই সময়ে দেশ-বিদেশের বহু

প্রতিষ্ঠান সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসে। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিলে মনে হয় মানুষ এখনও জনসেবার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় নাই।

নিঃস্বার্থ সেবার মধ্যে একটি অনাবিল আনন্দ লাভ করা যায়। ইহা মানুষের হৃদয়কে উদার ও মহৎ করে। সেবার আদর্শ অতি মহান্। তবে কোন কোন সময়ে স্বার্থপর ভণ্ড লোকেরাও জনসেবার মুখোস পরিয়া বেড়ায়। তাহারা মানুষের ক্ষুধার অন্ন, বস্ত্রহীনের বস্ত্র ও দাতব্য ঔষধালয়ের ঔষধপত্র আত্মসাৎ করে। এই সকল পাপাত্মারা সমাজের কলঙ্কস্বরূপ। ইহাদের সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। বর্তমানে আমাদের দেশের তরুণসমাজ বন্যাত্রাণ ও দুর্গতদের সেবায় আগ্রহী হইয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা বারোয়ারী পূজার উদ্বৃত্ত অর্থ দুর্গতদের সেবায় দান করেন। তাঁহারা সমবেতভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়াও টাকাপয়সা ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া দুঃস্থ মানুষদের সেবা করেন। এই স্বতঃস্ফূর্ত সেবার দৃষ্টান্ত দেখিলে গভীর দুঃখ ও নৈরাশ্যের মধ্যেও আমাদের মনে আশার সঞ্চার হয়।

শতবর্ষের আলোকে মহাত্মা গান্ধী

[ক. বি. ১৯৬৯]

১৯৬৯ সালের ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর শতবর্ষ-পূর্তির পবিত্র স্মরণতিথি পালিত হইয়াছে। আমাদের জাতীয় জীবনে এই পুণ্যতিথি স্মরণ করিবার বিশেষ সার্থকতা আছে। তাই সারা দেশে গান্ধী-শতবার্ষিকী উৎসব পালনের আয়োজন হইয়াছিল। তাঁহাকে লইয়াই এই উৎসব যাঁহার মধ্য দিয়া সমগ্র দেশের অন্তরের বেদনা ও বাণী প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা কোন গতানুগতিক উৎসব নয়। দেশের মানুষ তাঁহাকে ভক্তি করিয়া ভালবাসিয়া নাম দিয়াছে—মহাত্মা। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে, 'যাঁর আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা। যাদের আত্মা ছোটো বিষয়ে বদ্ধ, টাকাকড়ি-ঘরসংসারের চিন্তায় যাদের মন আচ্ছন্ন, তারা দীনাত্মা। মহাত্মা তিনিই, সকলের সুখ দুঃখ যিনি আপনার করে নিয়েছেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার ভালো বলে জানেন।' কেননা

সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান, তাঁর হৃদয়ে সকলের স্থান।' এইজন্যই ভারতবাসী সকলে মিলিয়া এই উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধী বলিতেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী।' তাঁহার বাণী সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছে তাঁহার জীবনে। আর তাঁহার সমগ্র কর্মজীবনে দেখিতে পাই এক অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা। ভয়ে কিংবা লোভে তিনি কখনও ক্ষমতার নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই। অন্যায়ের সঙ্গে ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী এক আপসহীন সংগ্রাম। যেখানে অন্যায় অসাম্য ও মানুষের লাঞ্ছনা দেখিয়াছেন সেখানে তাঁহার মন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মূলে ছিল মানুষের প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। মানবতার পূজারী মহাত্মা গান্ধী মানুষের অপমানকে কোনমতেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

গান্ধীজির সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সর্বপ্রথম শুরু হয় দক্ষিণ-আফ্রিকার নাটালে। সেখানে বহু ভারতীয় শ্রমিক ও ব্যবসায়ী ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ শাসকদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হইত। নাটাল সরকারের এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীজি আন্দোলন সুরু করিলেন। তিনি ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার জন্য গড়িয়া তুলিলেন অহিংস প্রতিরোধ। ইহাই তাঁহার প্রথম সত্যাগ্রহ সংগ্রাম। এই সময়ে তিনি বহু দুঃখ বহু অপমান সহ্য করিয়াছেন। কত আঘাত তাঁহাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। তিনি সমস্ত আঘাত মাথা পাতিয়া লইয়াছেন, কিন্তু নিজের সংকল্প হইতে বিচলিত হন নাই। শত্রুরা পর্যন্ত তাঁহার এই ধৈর্য ও মহত্ত্ব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। অবশেষে তাঁহার সংকল্প সিদ্ধ হইল, শ্বেতাঙ্গ শাসক সম্প্রদায় ভারতীয়দের ন্যায়সঙ্গত দাবি মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। জোর-জবরদস্তিতে তাঁহার এই সিদ্ধিলাভ হয় নাই; ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘ একুশ বৎসর নাটালে থাকিয়া 'নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস' গঠন করেন ও নানা সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এইখানেই গান্ধীজির কর্মজীবনের সূচনা।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। স্বদেশে তাঁহার কর্মজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। তিনি সাবরমতীতে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা ও সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই সময়ে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইয়াছে। ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের এই যুদ্ধে

সাহায্যদানের বিনিময়ে যুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে প্রতিশ্রুতি দান করে। কিন্তু যুদ্ধ অবসান হইবার পর সুচতুর ইংরেজ তাহার প্রতিশ্রুতি পালনের কোন প্রয়োজন দেখিতে পায় না। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষকে তাহারা কুখ্যাত 'রাউলাট আইন' উপহার দিল। ইংরেজ সরকারের এই অকৃতজ্ঞতার প্রতিবাদে সারা ভারতে হরতাল বিঘোষিত হইল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজি ভারতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে স্বৈরাচারী বিদেশী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করিলেন। মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধীজির এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

'পৃথিবীতে স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যলাভের ইতিহাস রক্তধারায় পঙ্কিল, অপহরণ ও দস্যুবৃত্তির দ্বারা কলঙ্কিত। কিন্তু পরস্পরকে হনন না করে, হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় না নিয়েও যে স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে, তিনি তার পথ দেখিয়েছেন। লোকে অপহরণ করেছে, বিস্তান দস্যুবৃত্তি করেছে দেশের নামে।...কিন্তু এই যে একটা অনুশাসন,, মরব তবু মারব না, এবং এই করেই জয়ী হব—এ একটা মস্ত বড়ো কথা, একটা বাণী। এটা চাতুরী কিংবা কার্যোদ্ধারের বৈষয়িক পরামর্শ নয়।' (রবীন্দ্রনাথ) গান্ধীজির সত্যাগ্রহের আসল কথা হইল শুধু উদ্দেশ্য মহৎ হইলে চলিবে না উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ও মহৎ হইতে হইবে। গান্ধীজি এই আধ্যাত্মিক শক্তিতে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে গতিদান করিলেন।

১৯২৪ সালে গান্ধীজি রাজনীতি ত্যাগ করিয়া অধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে তিনি খদ্দর প্রচার ও চরকার ব্যবহারের জন্য কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। গান্ধীজি উপলব্ধি করিলেন যে, ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র তাহার গ্রামগুলি। দেশকে জাগাইতে হইলে এই অবহেলিত গ্রামগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে, তাহাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতার বনিয়াদ রচনা করিতে হইবে। তাঁহার স্বরাজ-সাধনার মূলমন্ত্রই হইল সর্বশোষণমুক্ত স্বনির্ভর গ্রাম গঠন। সেখানে থাকিবে সামাজিক ন্যায়-বিচার, থাকিবে আত্মিক বিকাশের সমান সুযোগ ও অধিকার। এই শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজই ছিল গান্ধীজির-লক্ষ্য।

এইবার গান্ধীজির অন্তরে আবার এক নূতন প্রেরণা জাগিল। ১৯৩০ সালে তিনি 'লবণ-আইন' অমান্য আন্দোলন সুরু করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বোম্বাই-এর ডাণ্ডি অভিমুখে যে পদযাত্রা সুরু করেন, তাহা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমি যখন যাত্রা সুরু করিব, সারা ভারত সাগর-তরঙ্গের মত উথলিয়া উঠিবে।' গান্ধীজির এই উক্তি মিথ্যা হয় নাই। সেদিন সত্যই গান্ধীজির ডাকে আসমুদ্রহিমাচল ভারত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে গান্ধীজি বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে গেলেন ভারতবর্ষের জন্য স্বায়ত্তশাসন লাভের আশায়। কিন্তু সেখান হইতে তাঁহাকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৯৪২ সালে গান্ধীজি ইংরেজের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। ইহাই আগস্ট বিপ্লব বা 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। অবশেষে ইংরেজ ভারত ছাড়িতে বাধ্য হইল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইল—সৃষ্টি হইল ভারত ও পাকিস্তান এই দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এই খণ্ডিত ভারত গান্ধীজির কাম্য ছিল না। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়িয়া তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। স্বাধীনতা লাভের ঠিক এক বৎসর পূর্বেই তিনি দেখিয়াছিলেন নোয়াখালি ও কলিকতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ রূপ। ইহা তাঁহার মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁহাকে খণ্ডিত ভারত মানিয়া লইতে হইয়াছিল।

দেশ স্বাধীন হইল। কিন্তু স্বাধীন ভারতেও গান্ধীজিকে আর বেশিদিন বাঁচিতে হইল না। স্বাধীনতার পর এক বৎসর অতিবাহিত না হইতেই তিনি ১৯৪৮ সালের ৩০ শে জানুয়ারী আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন জাতির বহুযুগের সঞ্চিত পাপের। অহিংসার পূজারী হিংসার অনলে দিলেন আত্মাহুতি।

সত্য, অহিংসা ও মানবতার পূজারী মহাত্মা গান্ধী। সমাজে যাহারা অস্পৃশ্য ও পদদলিত তাহাদের জন্যও গান্ধীজির অপরিসীম বেদনা। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে আমরা মনুষ্যোচিত সম্মান হইতে যাহাদের বঞ্চিত করিয়াছি তাহাদের অগৌরবে আমরা সমস্ত দেশের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়াছি। 'এই কৌপীনধারী আমাদের দ্বারে দ্বারে আঘাত করে ফিরেছেন, তিনি আমাদের সাবধান করেছেন কোন্‌খানে আমাদের বিপদ।

মানুষ যেখানে মানুষকে অপমান করে, মানুষের ভগবান সেইখানেই বিমুখ। শত শত বছর ধরে মানুষের প্রতি অপমানের বিষ আমরা বইয়ে দিয়েছি ভারতবর্ষের নাড়ীতে নাড়ীতে। হীনতার অসহ্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি শত শত নত মস্তকের উপরে। তারই ভারে সমস্ত দেশ আজ ক্লান্ত, দুর্বল। সেই পাপে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি নে। আমাদের চলবার রাস্তায় পদে পদে পঙ্ককুণ্ড তৈরি করে রেখেছি; আমাদের সৌভাগ্যের অনেকখানি তলিয়ে যাচ্ছে তারই মধ্যে। এক ভাই আর এক ভাইয়ের কপালে স্বহস্তে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে, মহাত্মা সইতে পারেন নি এই পাপ।' (রবীন্দ্রনাথ)

আজ শতবর্ষের আলোকে মহাত্মা গান্ধীকে আমরা আরো উজ্জ্বলতর দীপ্তিতে দেখিতে পাইতেছি। শুধু অনুষ্ঠানের আয়োজন নয়, তাঁহার আদর্শকে সার্থক করিতে হইবে। এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশব্যাপী যে অনৈক্য ও বিভেদ রহিয়াছে তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। তাহা হইলে মহাত্মার প্রতি আমাদের এই শতবর্ষের প্রণাম সার্থক হইবে।

তোমার একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা

[ক. বি. ১৯৬৯]

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কত ঘটনা ঘটে কত রকমের অভিজ্ঞতা হয়। সব কথা আমরা মনেও রাখি না। আমাদের জীবনে এমন বহু তুচ্ছ ঘটনা ঘটে যাহা অল্পকাল পরে আমাদের মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায়। প্রাত্যহিক জীবনের এই সকল ঘটনা আমাদের মন হইতে মুছিয়া যায় বলিয়াই আমাদের মন ভারমুক্ত থাকে। তাহা না হইলে আমাদের জীবনের ভার বহন করা কঠিন হইত। কিন্তু আমাদের জীবনে কোন কোন সময়ে এমন ঘটনাও ঘটে, যাহা আমরা সারা জীবনে ভুলিতে পারি না। কোন একটি বিশেষ দিনের ঘটনা বা বিশেষ মুহূর্তের অভিজ্ঞতা চিরদিনের জন্ম আমাদের মনে দাগ কাটিয়া যায়।

আমার জীবনের এমনি একটি ঘটনার কথা আমি কোনদিন ভুলিতে পারিব না। সেই দিনের সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার ভয়ঙ্কর রূপটি আমার স্মৃতিপটে এখনও উজ্জল হইয়া আছে।

আমি গ্রামের ছেলে। সবে মাত্র তখন স্কুলের গণ্ডি ডিঙাইয়া কলেজে প্রবেশ করিয়াছি। পড়িতাম মফস্বল কলেজে। তখনও ভাল করিয়া শহর দেখি নাই। দাদা শহরের কলেজে পড়িতেন। দাদার সঙ্গে একবার কি দুইবার শহরে গিয়াছিলাম। কিন্তু ভাল করিয়া শহরের রাস্তাঘাট চিনিতাম না। কাজেই শহরে যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও একাকী যাইবার সাহস হইত না। গ্রামের ছেলের কাছে শহরের একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। আমারও তেমনি আকর্ষণ ছিল। আমি সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলাম। একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে সুযোগ পাইয়া গেলাম। মেজকাকা শহরে যাইতেছেন বাড়ির জিনিসপত্র কিনিবার জন্য। তিনি আমাকেও সঙ্গে যাইতে বলিলেন। বলা বাহুল্য আমি সানন্দেই রাজী হইলাম।

জলপথে আমাদের বাড়ি হইতে শহরের দূরত্ব মাইল পাঁচেকের মত হইবে। নৌকা করিয়াই যাইতে হয়। ভোরে উঠিয়া আমরা রওনা হইলাম। নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা কিছুদূর যাইতেই পালে হাওয়া লাগিল। নদীর দুই তীরের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা চলিলাম। শহরে পৌঁছিতে আমাদের ঘণ্টা দুয়েকের বেশী সময় লাগে নাই।

শহরে গিয়া আমরা যথারীতি কেনাকাটা সারিলাম। সেইদিন আমরা শহরের বহু জায়গায় ঘুরিয়াছিলাম। উপরন্তু মেজকাকা সেইদিন আমাকে এমন কয়েকটি জিনিস কিনিয়া দিয়াছিলেন যাহা দেখাইলে সহজেই বন্ধুদের ঈর্ষার উদ্রেক করা যায়। অন্ততঃ মনে মনে আমি সেই আনন্দেই আছি।

বিকালে আমাদের বাড়ি ফিরিবার পালা। তখন জোয়ারের সময় হইয়াছে। আমাদের নৌকা ছাড়িয়া দিল। জোয়ারের বেগে ও বাতাসের টানে নৌকা চলিতে লাগিল। মাঝি প্রাণ খুলিয়া ভাটিয়ালী গান ধরিয়াছে। কিছুদূর এমনি করিয়া যাইবার পর দেখা গেল বাতাসের গতি মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। পালে আর তেমন বাতাস লাগে না। এরপরে একেবারে থমথমে ভাব। মাঝি বলিল অবস্থা সুবিধার নয়। ইহা ঝড়ের পূর্বাভাস বলিয়া মনে হইতেছে। নৌকা তখন মাঝ দরিয়ায়। আমরা সকলে ভয়ে ভয়ে রহিলাম।

সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যাইতেছে। পশ্চিমাকাশে অস্তগামী সূর্যের সোনালী আভা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন আকাশের মুখে কে একমুঠো আবির ছড়াইয়া দিয়াছে। পাখীরা নীড়ে ফিরিয়া চলিয়াছে। আমাদের মনও ঘরের

দিকে। এমন সময়ে আমরা অনেক দূর হইতে একটা প্রচণ্ড সোঁ সোঁ শব্দ শুনিতে পাইলাম। দেখিতে দেখিতে আকাশ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। আকাশের মুখে যেন কে কালি লেপিয়া দিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুতের আলো ঝলসিয়া উঠিতেছে। এ যেন কোন মায়াবিনী রাক্ষসীর এক ভীষণ ক্রূর হাসি। যাত্রীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইল। একজন যাত্রী মাঝিকে বলিলেন, 'মাঝি, এইবার নৌকা সামাল দাও। তীরের দিকে চলো।' তাঁহার কথা শেষ হইতে পারিল না। প্রচণ্ড এক ঝড়ের ঝাপটা আসিয়া নৌকাটিকে যেন একবারে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। যেমন ঝড়ের বেগ তেমনি ঢেউয়ের নাচানাচি। এক-একটা ঢেউ যেন ছোটখাটো পাহাড়। ঢেউয়ের উপর ঢেউ আছড়াইয়া পড়িতেছে। ঢেউয়ের গর্জন আর যাত্রীদের চিৎকার মিলিত হইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে। নৌকার সবচেয়ে বৃদ্ধ আরোহী প্রাণভয়ে 'নারায়ণ নারায়ণ' বলিয়া একটানা ডাকিয়া চলিয়াছেন। বৃদ্ধা মুসলমান মহিলাটি কাতরকণ্ঠে আল্লার কাছে আর্জি পেশ করিতেছেন। নৌকা বাতাসের বেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া চলিতেছে।

প্রকৃতির এই রুদ্রলীলা দেখিয়া আমি বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছি। আমার মনে যুগপৎ ভয় ও আনন্দের সঞ্চার হইতেছে। আমি শুধু পায়ের জুতা-জোড়া খুলিয়া ফেলিলাম। হয়তো ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে। প্রস্তুত হইয়া থাকা ভাল। দুই দিকে চাহিয়া দেখিলাম তীরের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না। অন্ধকারে সব ঢাকিয়া গিয়াছে। দূর হইতে মধ্যে মধ্যে শুধু ভয়ার্ত চিৎকার ভাসিয়া আসিতেছে। যাত্রীরা সকলে মহা আশঙ্কায় আসন্ন চরম মুহূর্তের অপেক্ষা করিতেছে।

ভয় আমারও হইয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকে এক ভীষণ আনন্দের নেশায়ও পাইয়া বসিয়াছিল। মনে মনে ভাবিলাম এমন মুহূর্ত জীবনে তো আর নাও আসিতে পারে। কাজেই প্রকৃতির এই অপরূপ লীলা প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইব। দিগন্ত বিস্তৃত পুঞ্জীভূত ঘন অন্ধকারের মধ্যে দেখিলাম মহাশক্তিরূপিণী প্রকৃতির সেই ভীষণ সুন্দর রূপ। ঢেউগুলি সম্মুখে রক্তপিশাচের ন্যায় খল খল অট্টহাস্যে নৃত্য করিতেছে। তাহারা সহস্রবাহু মেলিয়া নৌকাখানি চূর্ণবিচূর্ণ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। অনায়াসে তাহারা আরোহী সমেত ক্ষুদ্র

নৌকাখানা গ্রাস করিতে পারে। এই ভীষণা প্রকৃতির কাছে মানুষের দম্ভ ও শক্তি কতটুকু !

ঝড়ের এই প্রবল মাতনের মধ্যে এইভাবে আমরা বহুক্ষণ কাটাইলাম। তারপর ঝড়ের বেগ ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। আকাশের কোলে দুই-একটি তারা উঁকি মারিতেছে। অবশেষে নৌকা আমাদের ঘাটে আসিয়া পৌছিল। কিন্তু ততক্ষণে আমরা সবাই একেবারে ভিজিয়া গিয়াছি। মাঝি পাল গুটাইতে গুটাইতে বলিল, 'এযাত্রা আমরা বাঁচিয়া গিয়াছি। খোদা মেহেরবান'। সকলেই মাঝির দক্ষতা ও সাহসের প্রশংসা করিল। আর এই যাত্রা যে বাঁচিয়া গিয়াছে তাহার জন্য হয়তো মনে মনে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। আর আমি কৃতজ্ঞতা জানাইলাম মেজকাকাকে। কারণ তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া না গেলে আমার এমন একটি অভিজ্ঞতা হইত না।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কয়েকটি অধ্যায়

[ক. বি. ১৯৬৯]

প্রায় দুইশত বৎসর বিদেশী ইংরেজ শাসকের অধীনে থাকিবার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমাদের পরাধীনতার অবসান হইয়াছে—স্বাধীন ভারত জন্মলাভ করিয়াছে। কিন্তু রাত্রির অবসানে যেমন প্রভাত আসিয়া মানুষের দরজায় হাজির হয়, ঠিক সেইরকম অবলীলায় আমাদের স্বাধীনতা আসে নাই। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এক সুদীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। কত দুঃখ-কষ্ট, দুর্যোগ ও আত্মত্যাগের দ্বারা অর্জিত হইয়াছে এই স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দেশমাতৃকার কত বীর সন্তান জীবন বিসর্জন দিয়াছেন, কত মহাপ্রাণ অসহ্য লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তবুও ভারতের এই স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনদিন ছেদ পড়ে নাই। নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী বিদেশী শাসকের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী বার বার বিদ্রোহ করিয়াছে। ভারতের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা আমাদের ইতিহাসে চিরদিন সোনার অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রবল সশস্ত্র অভ্যুত্থান হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়া। প্রকৃতপক্ষে ইহাই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয় বাংলাদেশের ব্যারাকপুরে। এইখানেই প্রথম ভারতীয় সিপাহীরা শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষের আদেশ মানিতে অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করে। ক্রমশঃ ইহা ভারতের অন্যান্য স্থানেও বিস্তার লাভ করে। মীরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী অধিকার করিয়া মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে। কানপুর এবং লক্ষ্ণৌতেও বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়ে। কানপুরে নানা সাহেব নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করেন। মধ্যভারতে মারাঠা-বীর তাঁতিয়া তোপী এবং ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রচণ্ড বিক্রমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ সফল হয় নাই। রাণী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন এবং তাঁতিয়া তোপী বন্দী হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। নানা সাহেব নেপালে পলায়ন করিলেন। আর হতভাগ্য বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ রেঙ্গুনে নির্বাসিত হইলেন। বিদ্রোহীরা সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ না হওয়ার দরুন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের এই প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থান সফল হইতে পারে নাই। কিন্তু এই বিদ্রোহ প্রমাণ করিয়াছিল যে, ইংরেজ যতই শক্তিশালী হউক না কেন, স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী স্বৈরাচারী বিদেশী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বিন্দুমাত্র ভীত হইবে না।

ইহার পর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। শাসনকার্যে সুবিধা হইবে অজুহাত দেখাইয়া বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে দুইভাগে ভাগ করিতে চাহিলেন। ইহার আসল উদ্দেশ্য ছিল দেশকে খণ্ডিত ও দুর্বল করা। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সারা দেশে তীব্র অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনে আগাইয়া আসিলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রাখীবন্ধন উৎসব করিবার জন্য তিনি দেশবাসীর নিকট আবেদন করিলেন। অন্যদিকে গোপনে শক্তিচর্চা করিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। যে কোন রকমে ইংরেজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া দেশছাড়া করিতে হইবে।

এই সময়ে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিল কিংসফোর্ড। তাহার

নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের তুলনা ছিল না। পনের বৎসরের বালক পর্যন্ত তাহার নির্যাতন হইতে রেহাই পায় নাই। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষকে জেলে দিয়া অত্যাচার করাইবার মূলেও ছিল কিংসফোর্ড। বিপ্লবীরা তাহার এই নির্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হইল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর উপর তাহাকে চরম দণ্ড দিবার ভার পড়িল। ইংরেজেরা ইহা অনুমান করিতে পারিয়া কিংসফোর্ডকে মজঃফরপুর বদলি করিয়া দিল। ১৯০৮ সালে অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়া ক্ষুদিরাম ভুলক্রমে দুইজন নিরপরাধ মহিলাকে হত্যা করিলেন। বিচারে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হইল। দেশের জন্য ক্ষুদিরাম হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিলেন। আর ধরা পড়িবার পূর্বে প্রফুল্ল নিজের গুলিতেই আত্মহত্যা করিলেন। কিন্তু প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে বিপ্লবের গতি মন্দীভূত হয় নাই। এই সময়ে মাণিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইল। এই বোমার মামলায় প্রাণ দিলেন কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু।

বিপ্লবীরা এইবার বিদেশ হইতেও সমরাস্ত্র আমদানির চেষ্টা করিলেন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ইংরেজের শত্রু জার্মানী। জার্মানী হইতে অস্ত্রশস্ত্র আনিবার ব্যবস্থা হইল। জার্মানীরাও ইংরেজদের নাজেহাল করিবার জন্য ভারতের বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র ও টাকাকড়ি দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল। ১৯১৫ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী সারা ভারতে বিপ্লবের আগুন জ্বালাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইল।

বৃটিশ সরকার কি করিয়া খবর পাইয়া গেল ভারতের বিপ্লবীদের জন্য দুই জাহাজ জার্মান অস্ত্রশস্ত্র আসিতেছে। তাহারা জাহাজগুলিকে ধরিয়া ফেলিল। বালেশ্বরের সমুদ্রের ধারে অস্ত্র নামাইবার জন্য বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সদলবলে অপেক্ষা করিতেছিলেন। গোয়েন্দা বিভাগ এই খবর পায়। লেফটেনাণ্ট রদারফোর্ড ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি এক বিরাট বাহিনী লইয়া তাহাদের অনুসরণ করে। বুড়িবালামের তীরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। একদিকে পাঁচজন বিপ্লবী অন্যদিকে বৃটিশ বাহিনীর তিন শতাধিক সিপাহী। তিন ঘণ্টা সমানে যুদ্ধ চলিল। সিপাহীরা এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। বহু সৈন্য নিহত হইল। পরে বিপ্লবীদের গুলি ফুরাইয়া আসিল। বুড়িবালামের তীরে সেইদিন যতীন্দ্রনাথ আহত হইয়া পরের দিন বালেশ্বর হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করিলেন। বিচারে

তাঁহার সঙ্গীদের কাহারও ফাঁসি হইল, কাহারও বা দ্বীপান্তর। সেইদিন বুড়িবালামের তীরে বিপ্লবীরা যে নূতন ইতিহাস রচনা করিলেন পরবর্তীকালে তাহার পূর্ণতর রূপ দেখিতে পাই আমরা চট্টগ্রাম বিপ্লব ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর যুদ্ধে।

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। ইহার পর জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে জালিয়ানওয়ালাবাগে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল। প্রায় দুই হাজার নিরস্ত্র জনতা বর্বর ও বলদর্পী ইংরেজের গুলিতে প্রাণ হারাইলেন। এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডে ভারতবর্ষের হৃদয় লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে বিদীর্ণ হইল। রবীন্দ্রনাথ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ইংরেজের দেওয়া স্যার উপাধি পরিত্যাগ করিলেন।

ইহার পর জাগ্রত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁহার হাতে ছিল সত্যাগ্রহের ব্রহ্মাস্ত্র। এই অহিংস ও অসহযোগ সত্যাগ্রহ স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অভিনব অস্ত্র। তিনি বলিলেন যে, একটা গোটা জাতি যদি চরম দুঃখের জন্য প্রস্তুত হইয়া আইন অমান্যের পথে অগ্রসর হয় তাহা হইলে কোন সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা নাই তাহার সেই বজ্রকঠোর সঙ্কল্পকে নোয়াইতে পারে। জাতীয় শক্তিকে সংহত করিবার মানসে মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সালে লবণ আইন ভঙ্গ করিবার জন্য ডাণ্ডি অভিযান করিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমি যখন যাত্রা সুরু করিব সারা ভারত সাগর-তরঙ্গের ন্যায় উথলিয়া উঠিবে।' বাস্তবিক সেদিন গান্ধীজির আহ্বানে আসমুদ্র হিমাচল বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সশস্ত্র বিপ্লবের গতিও একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায় নাই। ইহার প্রমাণ দিলেন মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্লবীরা। যে বৎসর মহাত্মা গান্ধী ডাণ্ডি অভিযান করেন সেই বৎসরই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইল, স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হইল বীরভূমি চট্টলায়। চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্লবীরা মাস্টারদার নেতৃত্বে জালালাবাদের শৈলশিখরে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম করিয়াছেন তাহা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

১৯৪২ সালে গান্ধীজি 'আগস্ট আন্দোলন' বা 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের

সূচনা করিলেন। এই সময়ে গান্ধীজিসহ বহু নেতা কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু এই আন্দোলন প্রচণ্ড আঘাতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিমূল একেবারে শিথিল করিয়া দিল। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ শাসক ভারত ছাড়িতে বাধ্য হইল।

কিন্তু আরেকজনের কথা না বলিলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র। ১৯৪১ সালে তিনি কলিকাতা হইতে কাবুল হইয়া সিঙ্গাপুরে পলায়ন করেন। সিঙ্গাপুরে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে গঠিত হইয়াছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র হইলেন তাহার সর্বাধিনায়ক। নেতাজী সেদিন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, 'আমাকে রক্ত দাও, আমি স্বাধীনতা দিব'। সেদিন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে নেতাজীর ডাকে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে আগাইয়া আসিল। ভারতীয় নারীরাও পশ্চাতে রহিলেন না। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনের নেতৃত্বে গঠিত হইল 'রাণী ঝান্সি বাহিনী'। অতঃপর আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হইল। ১৯৪৩ সালে এই সরকার ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে একযোগে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ১৯৪৫ সালের ১৮ই মার্চ ভারতের জাতীয় জীবনে এক স্মরণীয় দিন। ঐ দিন আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশ সৈন্যকে পরাজিত করিয়া ভারতের মৃত্তিকায় জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিল। কোহিমা ও ইম্ফলের পতনের পর আজাদ হিন্দ বাহিনী দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু রসদের অভাবে অকালে তাহাদের পরাজয় বরণ করিতে হয়। দুঃসহ পরাজয়ের গ্লানি লইয়া নেতাজী বিমানে জাপান যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজ যে অতুলনীয় সাহস ও শৌর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল তাহাতে ভারতের বন্ধন-মুক্তির ঝংকারই ধ্বনিত হইয়াছিল।

অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হইল। কিন্তু ইংরেজের ভেদনীতির ফলে ভারতবর্ষ হইল খণ্ডিত—ভারত ও পাকিস্তান দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্ম হইল।

বহুদিনের অভীপ্সিত স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি—আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু এই রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র কাম্য নয়।

আমাদের সংগ্রাম শেষ হইয়া যায় নাই। এইবার আমাদের দেশগঠনের পালা। এখন আমাদের সংগ্রাম দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও জড়তার বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামে যদি আমারা জয়ী হইতে পারি তাহা হইলে বহু শহীদের রক্তের মূল্যে পাওয়া আমাদের এই স্বাধীনতা সার্থক হইবে।

আমাদের উৎসব কি বিকৃতির পথে?

[ক. বি. ১৯৬৯]

উঃ 'বারোয়ারী পূজা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬২—১৯৬৯ পরীক্ষায় যে প্রবন্ধগুলি দেওয়া হইয়াছে সেগুলির উত্তর-সংকেত:

১। বাঙালী যুবক কি শ্রমবিমুখ? [ব. বি. ১৯৬২]

উঃ সং। [প্রবন্ধ অংশের ১০-১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

২। সমাজ সেবার আদর্শ। [ক. বি. ১৯৬৩

উঃ সং। [প্রবন্ধ অংশের ৫১-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

৩। চরিত্র গঠনে খেলা-ধুলার প্রভাব। [ক. বি. ১৯৬৪

উঃ সং। [প্রবন্ধ অংশের ৪১-৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

৪। জীবনে বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রভাব। [ক. বি. ১৯৬৪]

উঃ সং। আধুনিক যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বলিয়া অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞানের নানা তত্ত্বকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া মানুষ আজ অসাধ্য সাধন করিতেছে। বর্তমানে মানুষের জীবনযাত্রার সর্বত্রই বিজ্ঞানের প্রভাব স্পষ্ট কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মানুষের জীবন এই বৈজ্ঞানিক যুগেও বৈজ্ঞানিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত কি না। এ প্রশ্ন উঠিবার কারণ এই যে

বিজ্ঞানের কৌশলকে কাজে লাগানো এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হওয়া এক নহে। মানুষ যেদিন পাথর ঘষিয়া অস্ত্র নির্মাণ করিয়াছে সেইদিন হইতেই বিজ্ঞানের কৌশলের প্রয়োগ শুরু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তা মানুষের জীবনকে কতদূর প্রভাবিত করিতে পারিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিক চিন্তা বলিতে আমরা বুঝি, গবেষণার সময় বৈজ্ঞানিক যেমন অত্যন্ত সতর্ক হইয়া, অতিশয় সযত্নে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তদ্রূপ প্রচেষ্টার দ্বারা পরিচালিত হওয়া। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে আমাদের বিজ্ঞানীর ন্যায় সকল সংস্কার, সকল পক্ষপাত ত্যাগ করিতে হইবে। কেন না পূর্বসংস্কার এবং পক্ষপাত বিচারের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তাহার ফলে আমরা সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া যাই। সাধারণতঃ নিজের উপর অহেতুক গুরুত্ব অর্পণ করিয়া অথবা নির্বিশেষে সকল কিছু বিশ্বাস করিয়া আমরা বৈজ্ঞানিক চিন্তা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ি। এককালে মানুষ শাস্ত্রের নির্দেশকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিত এবং তদনুযায়ী অনেক অলীক বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হইত। আধুনিক মানুষও প্রচারযন্ত্রের প্রভাবে পরিচালিত হইয়া বিচারবুদ্ধি পরিহার করে। বলা বাহুল্য, এই উভয় মানসিকতাই অবৈজ্ঞানিক। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের চিন্তার দৈন্য লক্ষিত হয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, প্রত্যেক বিষয়ে মত স্থির করিবার পূর্বে যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হয়, তাহা হইলে জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রে ধারণা বা বিশ্বাস ভ্রান্ত প্রমাণিত হইলে তাহা পরিবর্তন করিতে পারাই মূল কথা। অথচ অভ্যাস বা ধারণা পরিবর্তন করা মানুষের পক্ষে কষ্টকর। এইজন্য ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া আধুনিক মানুষও ভ্রান্তপথে চালিত। প্রচারের গুণেই পাশ্চাত্য দেশের মানুষ বিশ্বাস করে যে, ভারতবর্ষে এখনও প্রাগ্‌ঐতিহাসিক জীবনধারা বহিয়া চলিয়াছে, ভারতবর্ষ এখনও জঙ্গল, সাপখোপ, সাধুসন্ন্যাসীর দেশ। প্রচারের এইজাতীয় বিস্ময় ফল আধুনিক পৃথিবীতে দুর্লভ নহে।

অথচ আমাদের চিন্তা বৈজ্ঞানিক পথ গ্রহণ করিলে আমরা যে জীবনে এবং পৃথিবীতে সোনার ফসল ফলাইতে পারি তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি বৈজ্ঞানিক চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হন তিনি জীবনকে ভ্রম-প্রমাদ [illegible] পরিহার করে

করিয়া সত্যের সন্ধান করেন। তাঁহার নিকট প্রবাদ বা জনশ্রুতি বা আপ্তবাক্য কখনই ধ্রুব সত্য নহে। তিনি প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ না করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন না। চিন্তার এই পদ্ধতি মানুষের জীবনে সহনশীলতা আনে, মানুষের মনকে উদার করিয়া তোলে, মানুষ অন্ধ বিশ্বাস বা ধারণার বশবর্তী হইয়া জীবনের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষ ধৈর্য সহকারে, বিচারবুদ্ধি অবলম্বনের সাহায্যে জীবনের পথে অগ্রসর হয় না, এবং হয় না বলিয়াই আজও পৃথিবীতে এত হানাহানি এত ভেদাভেদ। বৈজ্ঞানিক চিন্তা মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করিলে সত্যের এবং জ্ঞানের আলোকে তাহার জীবন পথ উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, বিশ্ব মানবসমাজ গৌরবের শীর্ষে পদক্ষেপ করিতে পারে।

৫। আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব। [ক. বি. ১৯৬৫]

অথবা

জাতীয় জীবনে সংবাদপত্রের শুভাশুভ প্রভাব। [ক. বি. ১৯৬৭]

উঃ সঃ। আধুনিক রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য মূল্যবান উপাদান তাহার প্রচারযন্ত্র এবং সংবাদপত্রই এখনও পর্যন্ত এই যন্ত্রের ব্যাপক, বৃহৎ, শক্তিশালী অঙ্গ। আধুনিক মানুষের জীবনের সহিত সংবাদপত্র একান্তভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। বর্তমানে মানুষ সংবাদপত্রের অস্তিত্বহীনতার কথা কল্পনাও করিতে পারে না। সংবাদপত্র তাহার নিকট সমগ্র পৃথিবীকে একমুহূর্তে আনিয়া হাজির করে। বর্তমান যুগে দ্রুতগামী যানবাহন যেমন পৃথিবীর দূরত্বকে মানুষের কাছে খর্বিত করিয়া দিয়াছে সংবাদপত্রও তেমনি পৃথিবীর দূরদূরান্তের মানুষকে যেন প্রতিবেশী করিয়া তুলিয়াছে।

প্রতিদিনের সংবাদপত্র যেন পৃথিবীর ইতিহাসের এক একটি পাতা। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র গৃহকোণে বসিয়াই কেবলমাত্র সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রতিদিনের পৃথিবীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করি। বিশ্বপৃথিবীর বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ, মানুষের সমাজের অসংখ্য সংবাদ পাঠ করিয়া আমরা আমাদের জানিবার কৌতূহল মিটাইতে পারি। জানিবার কৌতূহল মানুষের জন্মগত। এইজন্য

সংবাদপত্র আজ মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাসের অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদপত্র মানুষের নেশায় পরিণত হইয়াছে।

আধুনিক মানুষের জীবনে সংবাদপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ সংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদ হইতেই অনেক সময় তাহার কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করে, তাহার চিন্তা-ভাবনা বিন্যস্ত করে। অনুরূপভাবে, একটি জাতি বা দেশ সংবাদপত্রের মাধ্যমেই আপন পরিচয় ফুটাইয়া তুলে। এক সময়ে বলা হইত, একটি জাতিকে জানিবার পক্ষে তাহার রঙ্গমঞ্চ বিশেষ উপযোগী। বর্তমানে আমরা বলিতে পারি যে, সংবাদপত্রের মাধ্যমেই একটি জাতি বা দেশের পরিচয় লভ্য। এইজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এত গুরুত্ব আরোপ করেন। সংবাদপত্র সংবাদ পরিবেশনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা করে এবং প্রয়োজনীয় ভাষ্য রচনা করে। এই দিক দিয়া সংবাদপত্র জনমত গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এইজন্যই আধুনিক গণতন্ত্রে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সমধিক। সংবাদপত্র জনসাধারণের শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে বলিয়া জাতীয় জীবনে ইহার প্রভাব সুদূর-প্রসারী। জনসাধারণ, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতেই রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করে।

সংবাদপত্র জাতীয় জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও ইহার যে কোন অশুভ প্রভাব নাই একথা বলা চলে না। যখন সংবাদপত্র জনসেবার মহৎ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টির সাহায্যে সংবাদের বিন্যাস ও ভাষ্য করে, এবং তদ্দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করে তখন সংবাদপত্র জনসাধারণের হিতের পরিবর্তে অহিতই সাধন করে, অমৃত বিষে পরিণত হয়। ইহার ফলে কখনও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতা কখনও বা ভ্রান্ত রাজনৈতিক পরিবেশ সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। ইহাতে জাতীয় জীবনে নামিয়া আসে অন্ধকার। হীন স্বার্থের বশবর্তী হইয়া সাংবাদিক যখন ন্যায়ধর্ম, বিবেকবুদ্ধি ও নিরপেক্ষতা বিসর্জন দেয় তখন সংবাদপত্র জনসাধারণের মনে অশুভ প্রভাব বিস্তার করে।

আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব অপরিসীম বলিয়া, এবং জাতীয়

জীবনে সংবাদপত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়াই ইহার অন্তত দিকটি মনে রাখা প্রয়োজন।

৬। মানবচরিত্রের উপর প্রতিবেশ-প্রভাব। [ক. বি. ১৯৬৬]

উঃ সঃ। মানুষের জীবনে প্রতিবেশীর প্রভাব যেমন লক্ষ্য করা যায় প্রতিবেশের প্রভাবও তেমনি লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্র সৃষ্ট ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত অপেক্ষা নতুনদা ভিন্ন জাতের, কারণ নতুনদা শহুরে, শহরের আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, প্রচারমুখিতা নতুনদাকে আবাল্য লালন-পালন করিয়াছে। শুধু নতুনদা বা শুধু শহর নহে, মানুষের জীবনে প্রতিবেশের প্রভাব অল্পবিস্তর পড়িবেই। এইজন্যই শীতপ্রধান ও পার্বত্য অঞ্চলের লোক কঠোর পরিশ্রমী, উষ্ণ অঞ্চলের লোক অল্প পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়ে; আবার গ্রামের লোক সরল শান্ত ধীর হয় এবং শহরের লোক চালাক-চতুর ও চটপটে হয়। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে দেখা যায় না তাহা নহে। কিন্তু সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে, মানুষের চরিত্রে প্রতিবেশ প্রভাব বিস্তার করে।

সাহিত্যের জগৎ হইতেও উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তারাশঙ্করের উপন্যাস ও গল্পে রাঢ়বাংলার রুক্ষ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, বিভূতিভূষণের সাহিত্যে পরিস্ফুট হইয়াছে বাংলার শ্যামল রূপটি। পক্ষান্তরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে একটি প্রতিবেশ দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু সহরবাসের ইতিকথার ক্ষেত্রে অন্য প্রতিবেশ তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার করিলেও এই সত্য প্রমাণিত হইবে। কিন্তু উদাহরণ বাড়াইয়া লাভ নাই। এখন বিচার করা প্রয়োজন, কেন এমন হয়, প্রতিবেশ কি উপায়ে মানবচরিত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

মানুষের অভ্যাস, জীবনযাত্রার প্রণালী, এমন কি দৃষ্টিভঙ্গী বহুলাংশে প্রতিবেশের উপর নির্ভরশীল। শিল্পাঞ্চলের অধিবাসীর জীবন কলকারখানার নিয়মানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়, নির্দিষ্ট সময়ে ভোঁ বাজা মাত্র শয্যাত্যাগ হইতে শুরু করিয়া শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত সকল কাজ এখানে ঘড়ির কাঁটায় নিয়ন্ত্রিত। স্বভাবতই মানুষ নিয়মানুবর্তী হইয়া উঠে। কৃষি অঞ্চলের লোক প্রকৃতির

নির্দিষ্ট নিয়মকে অনুসরণ করিয়া চলে, তাহাদের জীবনে কখনও একটানা পরিশ্রম কখনও আলস্য। ব্যবসায়-বাণিজ্যের সংগে সংযুক্ত মানুষ সর্বদাই কাজের চাপে ব্যস্ত থাকে। বৃত্তিমূলক প্রতিবেশ এইভাবে মানুষের চরিত্র গঠিত করে। অন্যদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের রুচিরীতি, দক্ষতা, শারীরিক সামর্থ্য জন্মায়। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের সহিত সমতল ভূমির মানুষের শ্রমশক্তির তুলনা করিলে ইহা বুঝা যাইবে। এইভাবে মানুষের কাজের কর্মতা, অভ্যাস প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় প্রতিবেশের দ্বারা।

৭। শিক্ষাবিস্তারে ছায়াচিত্রের উপযোগিতা। [ক. বি. ১৯৬৭]

উঃ সঃ। চলচ্চিত্র বর্তমান কালে একটি অতি জনপ্রিয় প্রমোদ মাধ্যম। ইহার এই ব্যাপকতা লক্ষ্য করিয়া শিক্ষাবিদ্গণ শিক্ষা বিস্তারের কাজে চলচ্চিত্রকে লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিক্ষাবিদ্গণ দেখিয়াছেন যে, দৃশ্য-শ্রবণ পদ্ধতির (অডিও ভিস্যুয়্যাল) মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিশুমনে তাহার প্রভাব স্থায়ী হয়। শিশু কানে শুনিয়া চোখে দেখিয়া যাহা শেখে তাহা সহজেই তাহার হৃদয়ঙ্গম হয়। এইজন্য পশ্চাত্য দেশসমূহে বিশেষতঃ বিজ্ঞান পাঠের ক্ষেত্রে ছায়াচিত্রের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়।

এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ শ্রেষ্ঠ। আগুন সম্পর্কে শত কথা ব্যয় করা অপেক্ষা একটিমাত্র দেশলাই কাঠি জ্বালিয়া আগুনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সহজতর। জানিবার বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী করিয়া ছায়াচিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থিত করিলে তাহা তাহার নিকট সুগম হইবে। বর্ণনামূলক বিষয় অক্ষরের মাধ্যমে পাঠ করিলে যে পরিমাণে তাহা আমাদের স্মৃতিপটে মুদ্রিত হয় তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে হাজির করিলে তদপেক্ষা গভীরভাবে মুদ্রিত হয়। তেমনি একটি যন্ত্রের খুঁটিনাটি ছবির মাধ্যমে বা ড্রইং-এর মাধ্যমে হাজির করিলে বুঝাইবার পক্ষে যতটা ফল পাওয়া যায় ছায়াচিত্রের মাধ্যমে তাহা ব্যাখ্যা করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়। বর্তমানে তথ্যমূলক ছায়াচিত্র (ডকুমেন্টারী ফিল্ম) এইজন্যই এত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

অন্যদিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, ছায়াচিত্রের সাহায্যে শিক্ষাদান চালু করিলে অমনোযোগী ছাত্রছাত্রীর হৃদয়ও সহজে জয় করা যায়।

পাড়তে যাহার আলস্য, অক্ষরে বন্দী নীরস তত্ত্ব তাহার মনকে জয় করিতে না পারিলেও দৃশ্যের সাহায্যে সেই একই জিনিস যখন তাহার কাছে উপস্থিত করা হয়, তখন সে সহজে তাহা আয়ত্ত করে।

অবশ্য সম্পূর্ণভাবে ছায়াচিত্র-নির্ভর শিক্ষা হইতে পারে না। ইহাতে শিশুর কল্পনাবৃত্তি খর্বিত হয়। দৃশ্যের প্রভাব সহজে তাহার মন হইতে মোছে না বলিয়া সে বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্নমুখী চিন্তা করিতে পারে না। আবার, সকল বিষয় ছায়াচিত্রের মাধ্যমে উপস্থিত করাও যায় না। ছায়াচিত্র শিক্ষার মূল বাহন নহে, সহকারী, একথা মনে রাখতে হইবে।

৮। বাংলাদেশের বিশিষ্টতম ঋতু। [ক. বি. ১৯৬৮]

উঃ সঃ। পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশে ছয় ঋতুর কথা আমরা পড়ি বটে, কিন্তু শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা ব্যতীত অন্য তিনটি ঋতুর বিশেষ কোন পরিচয় আমাদের চোখে পড়ে না। এই ঋতু তিনটির মধ্যে আবার বর্ষার আধিপত্যই সমধিক। বর্ষাকেই বাংলার বিশিষ্টতম ঋতু বলিয়া অভিহিত করা সঙ্গত।

কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের ভূমিকায় বর্ষার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মঙ্গল কাব্যে এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষার প্রভাব স্পষ্ট, রবীন্দ্র সাহিত্যে বর্ষার রসের ধারা প্রবলভাবেই বর্ষিত হইয়াছে। কালিদাসের অমর কাব্য 'মেঘদূত' বর্ষারই বাব্য। কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশ যেমন বর্ষার আবির্ভাবে পুলকিত হয়, গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ বঙ্গপ্রকৃতিও তেমনি বর্ষার স্পর্শে শ্যামল শোভন হইয়া উঠে। প্রকৃতির রূপসৌন্দর্য গীতিমুখর বাঙালীর চিত্তে রসের স্রোত বহাইয়া দেয়।

এককথায় বলিতে পারা যায় যে, বাংলাদেশের জীবনধারা বর্ষা-নির্ভর। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে পূর্বদিগন্তে মেঘের সঞ্চারের কথা কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে ব্যক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা বাঙালীর মনে যেন স্থায়ী চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছে। সাহিত্য ও শিল্পকলায়, চিন্তায় ও ভাবনায় এমন কি বাস্তব জীবনযাত্রাতেও বাংলাদেশে বর্ষার প্রভাব সুস্পষ্ট।

রচনা-সূত্র

১। জীবনে শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব। [ক. বি. ১৯৬২]

রচনা-সূত্র। বিশ্বপৃথিবীর সমস্ত কিছুর মধ্যেই নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলা বিদ্যমান। আপাতদৃষ্টিতে যাহা শৃঙ্খলা বিহীন বলিয়া বোধ হয়, যাহাকে দৈব বা আকস্মিক বলিয়া মনে হয় তাহার অন্তরালেও সুনির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলা বিদ্যমান। নিয়ম-শৃঙ্খলার এই সত্যটি মানবজীবন সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

মানুষের জীবন বৃহৎ কর্মক্ষেত্র। কর্মের মাধ্যমেই মানুষ পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাহার ইচ্ছা এবং বাসনার অন্ত নাই। অন্যদিকে মানুষের জীবন নানা প্রতিকূলতায়, নানা বাধাবিঘ্নে পূর্ণ। এই সকল প্রতিকূলতা, বাধাবিঘ্ন লঙ্ঘন করিয়া আপন ইচ্ছাকে পূর্ণ করিতে হইলে নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলার পথ গ্রহণ করিতে হইবে। শৃঙ্খল যেমন একের পর এক গ্রথিত, মানুষের কর্ম ও চিন্তাও তদ্রূপ পরস্পর সংযুক্ত হওয়া উচিত। কর্ম ভুলিয়া মিথ্যা স্বপ্নে বিভোর হইয়া আলস্যে কাল কাটাইলে মানুষ স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে না এবং পরিশেষে ব্যর্থতার গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়। এক্ষেত্রে ছাত্রজীবনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। সারা বছর পড়াশুনা না করিয়া পরীক্ষার কয়েকদিন আগে বইপত্রের মধ্যে হুমড়ি খাইয়া পড়িলে ব্যর্থতার সম্ভাবনাই বেশী। 'খেলার সময় খেলা এবং কাজের সময় কাজ'—এই প্রবাদবাক্য কতদূর সত্য তাহা লব্ধপ্রতিষ্ঠ যে কোন ব্যক্তির জীবনী হইতে বুঝা যাইবে।

শৃঙ্খলাবোধ না থাকিলে জীবনে সার্থকতা লাভ করা যায় না সত্য কিন্তু যান্ত্রিক শৃঙ্খলায় মনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে যে, আমরা যেন যান্ত্রিক হইয়া না পড়ি।

২। মানব মনের উপর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর প্রভাব।

[ক. বি. ১৯৬২]

রঃ সুঃ। পূজার ছুটির সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় কত লোক কলিকাতা হইতে পাহাড়ে পর্বতে সমুদ্রতীরে অথবা মনোরম স্থানে ভ্রমণের

উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়াছে। দুই একদিনের ছুটিছাটাতেও কর্মক্লান্ত মানুষ প্রকৃতির শান্ত সান্নিধ্য লাভের জন্য ছুটিয়া যায়। একথা কলিকাতার মানুষের পক্ষেই নহে, সমগ্র মানবজাতি সম্পর্কে এ সত্য খাটে। পূর্বে তীর্থযাত্রার পশ্চাতে এই উদ্দেশ্যই সম্ভবতঃ প্রচ্ছন্ন ছিল। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে নবকুমারের দৃষ্টান্ত হইতে মানুষের প্রকৃতি প্রীতির পরিচয় লভ্য।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবকালে প্রকৃতির কোলই তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য তাহার চোখে স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়াছিল। আজও সেই স্বপ্নের রেশ তাহার মনে লাগিয়া আছে। এইজন্য এখনও মানুষ পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়া আনন্দ পায়, সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখিয়া মুগ্ধ হয়। প্রকৃতির সহিত মানুষের যোগসূত্র অবিচ্ছেদ্য। এইজন্যই মানব-মন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর দ্বারা প্রভাবিতও হয়। গভীর অরণ্যের স্তব্ধ গম্ভীর রূপ, সমুদ্রের সীমাহীন ব্যাপ্তি এবং প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস পর্বতের ধ্যানগম্ভীর শান্ত সৌম্য রূপ স্বভাবতঃ মানুষের মনের উপর স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, শীত গ্রীষ্ম বর্ষার প্রাকৃতিক রূপ মানুষের মনকে নাড়া দেয়, দেশ বিদেশের সাহিত্য এবং শিল্প হইতে আমরা তাহার অজস্র দৃষ্টান্ত লাভ করি। বাংলাদেশে শিল্প ও সাহিত্যে বিশেষতঃ বর্ষার ঘনঘোর রূপ প্রকটিত।

প্রকৃতির দৃশ্যাবলী মানবমনের উপর প্রভাব বিস্তার করে বলিয়াই ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের রুচিরীতি ভাবভাবনা নিয়ন্ত্রিত করে; মানুষের সংস্কৃতি এইভাবেই বিশিষ্ট হইয়া উঠে। সঞ্জীবচন্দ্রের মন্তব্য 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' যথার্থই সার্থক। অরণ্য প্রকৃতির উদার সরলতা যে ভারতের আদিবাসীদের সরল মন গড়িয়া তুলিয়াছে, একথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

৩। জাতীয় ঐক্যের পথে বাধা ও উহা দূর করিবার উপায়। [ক. বি. ১৯৬৩]

রূঃ সূঃ। একতাই বল, এ কথা চরম সত্য। আমরা উপদেশাত্মক নানা কাহিনী হইতে এ সত্যের সমর্থনে নানা কথা শুনিয়াছি, পৃথিবীর ইতিহাসের নানা ঘটনা হইতে এ সত্যের রূপ দেখিয়াছি। ঐক্যবদ্ধ রোমানরা বিশ্বজয়

করিয়াছিল, ঐক্যহীন রোমানরা তুর্কি আক্রমণের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। ঐক্যবদ্ধ মিত্রশক্তি হিটলার মুসোলিনীর দর্প চূর্ণ করিয়াছে। মানব সংসারে ঐক্যের এই শক্তি প্রতিনিয়তই জয়লাভ করিতেছে। একটি জাতির বা দেশের ক্ষেত্রেও ঐক্যের এই মহান শক্তির ভূমিকা অপরিসীম। ঐক্য আমাদের কাম্য কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হওয়াই কঠিন। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধ হইয়াছিল, কিন্তু ঐক্যহীনতার ফলে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ভারতের দেহে অস্ত্র হানিয়া ভারতকে ভাগ করা সম্ভব হইয়াছে।

ঐক্যের পথে বাধা কি, বিশেষতঃ জাতীয় ঐক্যের পথে বাধা কি তাহা বিশ্লেষণ কালে আমরা দেখিতে পাই যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিহীনতা শ্রদ্ধাহীনতা, অবিশ্বাস এবং বিবেচনাশূন্যতাই ঐক্যের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। একটি জাতিদেহে নানা মত ও পথের বিচিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকিতে পারে, ধর্মের ও ভাষার ভিন্নতা থাকিতে পারে এবং থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা অস্বীকার করিয়া কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় যদি নিজ মত ও পথকে সকলের উপর জোর করিয়া চাপাইতে চেষ্টা করে, তাহাতে ঐক্য নিঃসন্দেহে বিঘ্নিত হইবে।

ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত হইতে এ সত্য প্রমাণিত হইবে। রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষে যে কাণ্ড হইতেছে তাহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ভারতবর্ষ বহুভাষাভাষী দেশ। এখানে শুধুমাত্র ভোটের জোরে সকলের উপর হিন্দি চাপাইলে কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই হইবে। তাহার ইঙ্গিত আমরা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ঘটনা হইতে জানিয়াছি।

দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। মোট কথা, আমার যদি একটি জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যকার বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া লইয়া একটি সাধারণ সত্য আবিষ্কার করিতে পারি তাহা হইলে জাতীয় ঐক্যের পথের বাধা দূর করা সম্ভব হইবে, নচেৎ নহে।

৪। **সঙ্কটকালে জনসাধারণের মনোবল রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।**
[ক. বি. ১৯৬৪]

রঃ সূঃ। ব্যক্তিমানুষের জীবনে যেমন অতর্কিতে বিপদ-আপদ আসিয়া

সঙ্কট সৃষ্টি করে, রাষ্ট্রীয় জীবনেও তেমনি প্রাকৃতিক বিপর্যয় হেতু অথবা বহিঃশত্রুর আক্রমণ-জনিত অথবা রাজনৈতিক দলাদলিকে কেন্দ্র করিয়া সঙ্কট উপস্থিত হয়। অটুট আত্মবিশ্বাসের সাহায্যে এবং স্থির সিদ্ধান্তের পথে ব্যক্তিমানুষ যেমন ধীর শান্তভাবে আপন সঙ্কট কাটাইয়া উঠে, রাষ্ট্রও অনুরূপ ভাবে শক্ত হাতে হাল ধরিয়া সঙ্কট অতিক্রম করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রনেতারা যদি স্থির বিশ্বাসে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া সঙ্কটের কালে পথ নির্দেশ করেন তাহা হইলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত না হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করে।

সঙ্কটকালে জনসাধারণের মনোবল রক্ষার মুখ্য দায়িত্ব রাষ্ট্রনেতাদের। তাঁহারা যদি তাঁহাদের দৃঢ় প্রত্যয়, প্রবল বিশ্বাস জনসাধারণের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারেন, শত বিপত্তি সত্ত্বেও জনসাধারণকে মাভৈঃ বাণী শুনাইতে পারেন তাহা হইলে জনসাধারণের মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকে। এই ভাবেই চার্চিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ইংলণ্ডের মানুষের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, এইভাবেই স্বাধীন ভারত শত বাধা বিপত্তি উত্তীর্ণ হইয়া চলিয়াছে।

জনসাধারণের মনে প্রকৃত আস্থা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে দৃঢ় মনোভাব গড়িয়া তুলিয়া সঙ্কটকালে তাহাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। মনে রাখিতে হইবে যে, ফাঁকির দ্বারা এ কার্য হইবে না। জনসাধারণ যদি বুঝিতে পারে যে, তাহাদের নেতারা তাহাদের পাশে আছেন, তিনি তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন না তাহা হইলে তাহাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৫। আধুনিক যুগে সমাজ মানসের পরিবর্তন। [ক.বি. ১৯৬৪]

রঃ সূঃ। সমাজের স্বরূপ বা ধর্ম চিরকাল একই প্রকার থাকে না, তাহার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পুরাতন প্রথা, রীতিনীতি, বোধ পরিবর্তিত হইয়া যায়, তৎপরিবর্তে নূতন প্রথা, নূতন রীতিনীতি এবং নব বোধ উদ্ভূত হয়। এই ভাবেই যূথবদ্ধ আদিম মানবসমাজে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, সামন্ততন্ত্রের অবসানে আসিয়াছে সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং পরিশেষে আসিয়াছে,

সাম্যবাদী চিন্তাধারা। রাষ্ট্রনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী আধুনিক যুগকে আমরা গণতন্ত্রের যুগ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। একথাও বর্তমানে আমরা উপলব্ধি করিয়াছি যে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের জগদ্দল পাথর সমাজের বুকের উপর চাপিয়া থাকিলে গণতন্ত্র পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

দুইটি মহাযুদ্ধে রক্তস্নাত পৃথিবী, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বেড়াজালে বদ্ধ পৃথিবী আজ তাহার মানসিকতাকে দ্রুত পরিবর্তিত করিয়াছে। বর্তমানে পুরাতন মূল্যবোধ, পুরাতন বিশ্বাস ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। মানুষ দেখিয়াছে যে, অসহায় মানুষের উপর অতর্কিতে অ্যাটম বোমা ফেলিতে মানুষের বিবেকে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় না, মানুষ দেখিয়াছে যে, মানবতার মূল্য দিতে মানুষই কুণ্ঠিত, ইহার ফলে মানুষের মনে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ব্যাপক অনাস্থা আসিয়া গিয়াছে। সমবেত মানুষের শুভেচ্ছা ও কল্যাণবোধের উপর ক্ষমতামত্ত মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থপ্রণোদিত কু-ইচ্ছার পৈশাচিক নৃত্য দেখিয়া মানুষ আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়াছে। রাষ্ট্রনেতাদের বিসদৃশ আচরণও তাহাদের বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে।

এই সকল বাস্তব পরিস্থিতি মানুষকে অবিশ্বাসী এবং আত্মকেন্দ্রিক করিয়া তুলিয়াছে। পুরাতন সমাজের মূল্যবোধ অপসৃত হইয়া তৎপরিবর্তে সংশয়াচ্ছন্ন আত্মমুখী একটি চেতনা সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য এই সঙ্গে ধীরে ধীরে মানুষ বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে সংঘশক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া উঠিতেছে ইহাই আশার কথা।

৬। সাম্প্রতিক যুগে বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্পের অগ্রগতি।

[ক. বি. ১৯৬৫]

রং সূং। বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের, ইহার ইতিহাস শতবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসও কম দিনের নহে। বস্তুতঃ এই ইতিহাস পর্বের পর পর্ব অতিক্রম করিয়া সাম্প্রতিক কালে আসিয়া হাজির হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, রবীন্দ্রযুগ হইতেই বাংলা কাব্যধারার ন্যায় উপন্যাস ও ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত।

সাম্প্রতিক কালের বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের হিসাব নিকাশ, তাহার গতিপ্রকৃতির বিচার-বিশ্লেষণ কল্লোলযুগের পরবর্তীকাল হইতে করাই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য কল্লোলযুগের লেখকগোষ্ঠীই এখনও পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে প্রবীণ পুরুষ। এই প্রবীণদের মধ্যে রহিয়াছেন স্বর্গত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ সাহিত্যিকগণ। ইহাদের পরবর্তী স্তরে রহিয়াছেন স্বর্গত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু, গজেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি এবং নবীনদের মধ্যে রহিয়াছেন শঙ্কর, বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, বিমল কর প্রমুখ লেখক।

এই কালসীমায় উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিষয়ের, দৃষ্টিভঙ্গির এবং রচনারীতির নানা পরিবর্তন হইয়াছে। সাহেব-বিবি-গোলাম হইতে শুরু করিয়া লালকেল্লা পর্যন্ত ধারায় উপন্যাসের বিপুল আয়তনের একটি প্রচলন যেমন একদিকে-হাজির হইয়াছে, অন্যদিকে সংক্ষিপ্ততর আয়তনের উপন্যাসও আবির্ভূত হইয়াছে। আমাদের পরিচিত গণ্ডির ইতিহাস, দেশবিভাগ ও তজ্জনিত সামাজিক বিপর্যয় প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছে, আবার আত্মকেন্দ্রিক অহংমুখী মানুষের মানসিক দ্বন্দ্ববিক্ষোভও উপন্যাসে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, কাহিনীর গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে, মনস্তত্ত্বই গল্পের মুখ্য অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে।

সাম্প্রতিক কালের গল্প, উপন্যাস হইতে একটি সত্য স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, বাঙালী জীবনের জটিলতা শিল্পের এই ক্ষেত্রদ্বয়ে প্রকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

৭। ভারতের অন্যতম সরকারী ভাষারূপে ইংরেজী ভাষার সংরক্ষণের যুক্তিযুক্ততা। [ক. বি. ১৯৬৫]

[প্রবন্ধটি দুইভাবে লেখা যাইতে পারে, ইংরেজীর সপক্ষে যুক্তি দেখান যাইতে পারে, বিপক্ষেও যুক্তি দেখান যাইতে পারে।

(ক) সপক্ষে যুক্তি

রঃ সূঃ। ভারতবর্ষ বহুভাষাভাষী দেশ এবং কোন ভাষাই ব্যাপক ভাবে সর্বজনগ্রাহ্য নহে—হিন্দীকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণভারতে প্রবল আপত্তি উঠিয়াছে, অন্যান্য অঞ্চলেরও অসন্তোষ কম নহে। ইহা ভারতের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর।

ইংরেজী ভাষা ভারতের শিক্ষা জগতে দীর্ঘকাল রহিয়াছে, স্বাধীনতার পর হইতে ইংরেজীর মাধ্যমেই সরকারী কাজকর্ম চালিত হইয়াছে। ইহা একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। এই ভাষার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা ও আন্তর্জাতিক ভাষা—উভয় প্রয়োজনই সিদ্ধ হয়।

(খ) বিপক্ষে যুক্তি

ভারতবর্ষের ন্যায় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রাচীন পীঠস্থানে একটি বিদেশী ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করিয়া থাকিবে ইহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অন্যদিকে ভারতের জনগণের শতকরা পাঁচজনের বেশী ইংরেজী জানে না। এক্ষেত্রে একটি বিদেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে।

ভারতের একাধিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়াই বিধেয়। একটি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজী ভাষার সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয়।

৮। বাংলা নাটকের সাম্প্রতিক নবরূপায়ণ [ক. বি. ১৯৬৬]

রঃ সূঃ। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকের মাধ্যমেই বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে নব পদ্ধতি সূচিত হইয়াছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত এই নব নাট্যধারা বর্তমানে হুবহু অনুসৃত হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। বিষয়বস্তু ও গঠন প্রণালীর দিক হইতে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনিয়াছেন মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখ নাট্যকারগণ। তাঁহাদের নাট্য প্রচেষ্টার ফলে বাঙালী দর্শকের নাট্যরুচি পরিবর্তিত হইয়াছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, বিশেষতঃ উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া অদ্ভুত অবস্থা ইত্যাদি নাটকের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত করিয়াছে।

ব্যক্তিমানুষের জীবনের ক্ষেত্রেও এ সত্য লক্ষ্য করা যায়। পাঠ্যজীবনে ক্লাসে পড়াশুনার কাল হইতে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় তাহা কর্মজীবনের শেষ পর্যন্ত বর্তমান থাকে এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে মানুষের যোগ্যতা নির্ধারিত হয়।

প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করিলে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়—এই চেতনা মানুষকে নব নব কর্মোদ্যম দান করে।
